ভারতী

৩৬শ বর্ষ] কার্ত্তিক, ১৩১৯ [৭ম সংখ্যা

বাগ্‌দত্তা

(১৩)

গঙ্গামণির দিন ফুরাইয়া আসিয়া অপরাহ্নের শেষ রশ্মিটুকুর মত জীবন নদীর পশ্চিম কূলে অপেক্ষা করিতেছিল এমন সময় তাহাকে লইয়া কাশী আসা হইল।

গিরিজা সুন্দরী বোনকে দেখিতে আসিয়া তাঁহার অবস্থা দেখিয়া আর ফিরিয়া যাইতে পারেন নাই তাঁহার সঙ্গে কাশী আসিয়াছিলেন। গঙ্গামণি বুকফাটা আর্ত্তশ্বাস বক্ষেই রুদ্ধ রাখিয়া কহিলেন "গিরিজা,—আমার শচী এলো না!" তাঁহার দুর্ব্বল হৃদয় আলোড়িত করিয়া দুই চোকে জল ভরিয়া আসিয়াছিল, জীবনীশক্তির এই ক্ষীণাবস্থায় কত অল্পেই মনে আঘাত লাগে, আর তাঁহার পুত্র, কত স্নেহের ধন তাহার এই ব্যবহার! গিরিজা তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন "সে তো তোমার এত অসুখ জানে না দিদি. আমি তাকে আসতে লিখিয়ে দিচ্চি এখনি।"

মায়ের সকল দুঃখ মিটিয়া গেল! সে জানে না তাই, তা নইলে কথন চুপ করিয়া থাকিতে পারে!

শচীকান্ত মায়ের অবস্থা শুনিয়াই অবিলম্বে আসিল। ভোরের ট্রেন ছাড়িয়া সে যখন নৌকায় গঙ্গা পার হইতেছিল, তখন সবে মাত্র সকাল হইয়াছে। সদ্যঃ প্রকাশিত আদিত্যের সহস্র উজ্জ্বলরশ্মি অতি স্নিগ্ধভাবে পরপারের সৌধকিরীটের মস্তক স্পর্শ করিয়া বিশ্বাধিপতিকে প্রণাম করিতেছিল। মুকুলিত জগতকে ক্রমশই সেই নবীনালোক তাহার মন্ত্র স্পর্শনে অতি ধীরে ফুটাইয়া তুলিতেছিল। আকাশের গায়ে স্তরে স্তরে বর্ণরেখা ফুটিয়া উঠিয়া পূজাগৃহাভিমুখী সুরকন্যাগণের কৌষেয় বসন গুলির মত প্রতীয়মান হইতেছিল। সুর-জগতের মঙ্গল বার্ত্তা বহন করিয়া প্রভাত পবন সদ্য জাগরিত প্রত্যেক চিত্তকে দিবসের প্রধান কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া দিবার চেষ্টায় বারে বারে আনাগোনা করিয়া ফিরিতেছে। গঙ্গা বক্ষে নৌকার উপরে বসিয়া বসিয়া শচীকান্ত বিস্ময়পূর্ণ কৌতূহলে সম্মুখবর্ত্তী প্রাসাদমন্দির-মেখলা বিচিত্র নগরীর অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে লাগিল।

জহ্নুতনয়া দুই রজত বাহু বিস্তার করিয়া এইখানে যেন বিশ্বেশ্বরকে বিশ্বাসপরায়ণা ভক্তের মত ব্যগ্র আবাহন করিতেছেন। তাঁহার পরিতৃপ্ত বক্ষদর্পণে শত মন্দিরের দীর্ঘ ছায়া নবীন রৌদ্রে ঝিলমিল করিতে করিতে

বহু শত বৎসরের অতীত গাথা স্মরণ করাইয়া দিতেছিল। তীরভূমি হইতে পাশাপাশি প্রশস্ত প্রস্তর সোপানশ্রেণী গভীর জলের মধ্যে নির্ভীক শিশুর মত নির্ভয়ে অবগাহন করিয়া রহিয়াছে। মণিকর্ণিকায় এবং দশাশ্বমেধে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট ভিড় জমিয়াছে। প্রতিঘাটেই বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাগণ স্নানাদি প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিতেছিলেন। নৌকা যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল শচীকান্ত দেখিল সকলকার মুখেই যেন কমন একটু উদ্বিগ্ন ভক্তির ভাব, যেন বেলা বহিয়া যাইতেছে মন্দিরের পূজা সমাধা হইয়া যাইবে এমনি একটা উদ্বেগ সকলকার মুখ ভাবেই প্রকটিত হইতেছিল। সে বিস্ময়ের সহিত ভাবিল এ রকম আর কোনখানে দেখা যায় না। ঘাটের উপরেই গাছের তলায় বড় বড় ধুনী জ্বালাইয়া বৃহৎ জটাভার চূড়াকারে মাথার সম্মুখভাগে বাঁধিয়া কৌপিনধারী ভস্মাবৃত সন্ন্যাসীরা স্থানে স্থানে দগ্ধ কাষ্ঠ ঠুকিয়া অগ্নি নির্গত করিয়া গাঁজা সাজিতেছে, কেহ কলিকাটি নামাইয়া রাখিয়া রক্ত নেত্র অর্দ্ধ নিমীলিত করিয়া আপনার মনে দুলিতে দুলিতে কবিবর তুলসীর দোঁহা গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতেছিল। ইহাদের একজনের নিকটে এই প্রত্যুষকালেও অনেক পুরুষের এবং তাহা পেক্ষা অধিক পরিমাণে নারীর সমাগম হইয়াছিল। সন্ন্যাসীগণের ভাঁড়ে ভাঁড়ে দুগ্ধ ও কিছু কিছু ফল দান করিতে ইহাদের কেহই ভোলে নাই। অনেকেই মাটিতে পড়িয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া তদগদ্ চিত্তে পদধূলি গ্রহণ করিতেছিল। বিরক্তি বোধ করিলেও শচীকান্ত ঈষৎ কৌতূহলী হইয়া সেই ভিড়ের নিকটে আসিয়া একজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল ইনি মহাপুরুষ; হাত দেখিয়া ভূত, ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সকলি বলিয়া দিতে পারেন। জিজ্ঞাসা করিয়া আরও জানিল অতীতের চেয়ে ভবিষ্যতের সংবাদটাই ইহাঁর নিকট হইতে বেশি বেশি পাওয়া গিয়া থাকে, এবং যাহা পাওয়া যায় দু'চার সিকা খরচা করিলে আবার তাহা নূতন উইলের ন্যায় সংশোধিত হওয়ার একটা পথ থাকায় শ্রোতাদের পক্ষে বড়ই সুবিধা হয়। শুনিয়া শচীকান্তের ওষ্ঠপ্রান্তে ঈষৎ ঘৃণার মৃদুহাসি ফুটিয়া উঠিল। সে তৎক্ষণাৎ গমনোদ্যত হইয়া ফিরিতেছিল, কিন্তু ইতিমধ্যেই আমাদের ভবিষ্যৎবেত্তা পুরুষটির ক্ষুদ্র চক্ষের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ক্ষুধিত ব্যাঘ্র-চক্ষুর মত তাঁহার এই সুপরিচ্ছদধারী যুবা দর্শকটির উপর পতিত হইয়াছিল। তাহাকে ফিরিতে উদ্যত দেখিয়া তিনি থাকিতে না পারিয়া হঠাৎ মোটা গলায় ডাকিয়া উঠিলেন "আও বাবাজী, তেরা নসীব বড়ি আচ্ছা হ্যায়," কণ্ঠস্বরে আদেশের সঙ্গে অনুরোধের ব্যাকুলতা যথেষ্ট ছিল, শচীকান্ত হঠাৎ একটু কুতূহলী হইয়া উঠিল শোনাই যাক না কি বলে! সে সহাস্যমুখে গিয়া জ্যোতির্ব্বিদের সম্মুখে হাত পাতিয়া দিল।

প্রৌঢ় জ্যোতিষী বহুক্ষণ ধরিয়া সেই পরিচ্ছন্ন হাতখানি, আর তাহার উজ্জ্বল অঙ্গু-রীয়ক যুক্ত অঙ্গুলী স্তব্ধভাবে বারবার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া পরীক্ষা করিল, তারপর হঠাৎ মুখ তুলিয়া বলিয়া উঠিল, "যব রেখা আছে, বিদ্যা অনেক, ধন মধ্যম, উচ্চপদ—বাবু তুমি হাকিম হইবে।"

শচীকান্তের পিতা

পারদর্শী ছিলেন, কিন্তু তিনি এই বিদ্যা 'অফলা বিদ্যা' বলিয়া ইহার যথেষ্ট চর্চ্চা করিতেন না। বলিতেন ঈশ্বর যাহা বিধান করিবেন তাহা যথা কালেই জানা যাইবে। দণ্ড পুরস্কারের সংবাদ পূর্ব্ব হইতে জানা থাকিলে তাহার ফল ঠিক উপভোগ হয় না। কিন্তু তথাপি সময় সময় দায়ে পড়িয়া বা ছাত্র শিক্ষার্থ তাঁহাকে যেটুকু জ্যোতিষানুশীলন করিতে হইয়াছে তাহা হইতেই শচীকান্তের এই বিদ্যাটার উপর একটা বিশ্বাস না জন্মিয়া থাকিতে পারে নাই।

ভবিষ্যৎবেত্তার সংবাদটা নেহাৎ মন্দ নয়! একটু উৎসাহিত হইয়া শচীকান্ত ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল "আয়ু দেখুনতো—"জ্যোতির্ব্বিদ্ কনিষ্ঠা অঙ্গুলির তল হইতে সম্মুখে বিস্তৃত একটি রেখা বহুবার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কিছুক্ষণ গম্ভীর মুখে থাকিবার পর কহিল 'সামান্য পতাকী' আছে; সওয়া পাঁচ টাকা খরচ করিয়া একখানা লোহার অস্ত্র, কালো কম্বল দুইখানা, এবং সওয়া সের কৃষ্ণতিল উৎসর্গ করিলে সব দোষ কাটিয়া যাইবে। বাবু তোমার বিয়ে হয়েছে?" হাত টানিয়া লইয়া শচীকান্ত উঠিয়া দাঁড়াইল, "না বলিয়া পকেট হইতে একটি দুয়ানি বাহির করিয়া সন্ন্যাসীর সম্মুখে অবজ্ঞার সহিত ফেলিয়া দিল। শেষ সংবাদ তাহার পূর্ব্ব সংশয়কে নূতন করিয়া জাগাইয়া তুলিয়াছিল।

জ্যোতিষী একটু আশাহতভাবে দুয়ানিটি মাটী হইতে তুলিয়া লইল, একবার ক্ষুব্ধ নেত্রে এই বৃহৎ সাম্রাজ্যের সাম্রাজ্যেশ্বরীর ক্ষুদ্র মূর্ত্তির প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিল "তুমি বিয়ে করিও না, চলে যাচ্ছো—গ্রহশান্তির কিরূপ হবে?"

"কিছুই না" এই বলিয়া শচীকান্ত ভিড় সরাইয়া বাহির হইয়া আসিল, দাঁতে দাঁতে চাপিয়া মৃদুগর্জ্জনে বলিল 'রাস্কেল!" তারপর রাস্তায় পড়িয়া গতি দ্রুত করিয়া দিল। গঙ্গামণি পুত্রকে দেখিয়া প্রথমটা চমৎকৃত হইয়া গেলেন। সেই শচী তাঁহার সর্ব্বপ্রিয় কোলের সন্তান তথাপি তাহারই সুখের আশায় নিজের কাছছাড়া করিয়াছেন, বুঝি এ জীবনে আর দেখিবেন না ভাবিয়া মনের মধ্যে দিনরাত্রি কি অসহ্য কষ্ট ভোগ করিয়াছেন, সেই তাঁহার প্রাণাধিক পুত্র আজ দুই বৎসর পরে তাঁহাকে শেষ দেখা দেখিতে আসিয়াছে। দুই চ'খে প্রবলবেগে জলধারা বহিতে চাহিয়া বক্ষ যেন মথিত সমুদ্রের মত আলোড়িত হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু সর্ব্বংসহা ধরণীর চির প্রশান্তিভাব বিধাতা এই নিষ্কাম প্রেমের পূর্ণমূর্ত্তি চির সংযত মাতৃবক্ষেই শুধু দান করিয়া রাখিয়াছেন, মা কখন নিজের সুখদুঃখের কথা অধিকক্ষণ মনে স্থান দিতে পারেন না। বিশেষ যখন তাঁহার সন্তানটি সুস্থ, সুন্দর ও সজ্জিতমূর্ত্তি লইয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিয়া বলিতেছে, "তোমার এত অসুখ মা, তাতো আমি জানতুম না।" আর কি তখন মনে এতটুকু ক্ষোভ রাখা চলে? অশ্রুর আবেগে রুদ্ধকণ্ঠ জননী শীর্ণ কর পুত্রের মসৃণ ললাটে মুখে বুলাইয়া তাহার মস্তকে নীরব আশীর্ব্বাদের অজস্রধারা বর্ষণ করিয়া কোনমতে কহিলেন, "অসুখ বাড়ীতেই তো খবর দিয়েছি বাবা!" বলিলেন না যে তুমি কি খবর নিয়াছিলে?"

আত্মগ্লানিতে পূর্ণ হইয়া শচীকান্ত মায়ের

স্বভাবতঃই একটু কঠিন বটে, কিন্তু তাই বলিয়া সে নিষ্ঠুর বা নির্দ্দয় নয়, নিজের সুখটুকু বজায় রাখিতে চাহে বটে তবে অন্যকে দুঃখিত দেখিতে যে উৎসুক তাহা নহে; সাধারণ সকলেই আজিকালিকার দিনে যে রকম হইয়া থাকে সেও তাহার মধ্যে একজন,—না দেবতা না পিশাচ,—মানুষমাত্র।

শচীকান্ত করুণাময়ী ও গিরিজাসুন্দরীকে প্রণাম করিয়া মনীশের সহিত একটু পরে সহর দেখিতে বাহির হইয়া গেল। চা-পানের তৃষ্ণা প্রবল ভাবে প্রলোভিত করিতে থাকিলেও মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিল না। মনীশ কহিল 'এসো বিশ্বনাথ দর্শন করিয়ে আনি, যাবে?" "চলো" বলিয়া তাহার বন্ধু কোট ও জুতা বদলাইয়া লইল। আয়না ধরিয়া চুলটাও একটু ফিরাইতে ভুলিল না। মনীশ শুধু চাহিয়া দেখিল, সে কিছুই বলিল না।

গঙ্গাতীরে যে নগরীর অপূর্ব্বদৃশ্য দর্শককে ভক্তি বিস্ময়ে বিমুগ্ধ করিয়া তুলে, সহস্র গলি খুঁজির মধ্যে সেই দীর্ঘ মন্দির চূড়া যখন অদৃশ্য হইয়া যায় তখন আবার দর্শকের নেত্রে এমনি ঘৃণাজনক দৃশ্য সকল পতিত হয় যে তাহার চিত্তকে একেবারে ক্ষুব্ধ করিয়া দেয়। যে কাশীর অপূর্ব্ব আনন্দময় শোভা দেখিয়া দেবতার আবাস বোধ হইতেছিল, তাহারি একপ্রান্তে একি নরকের মুক্তদ্বার দেখা যাইতেছে! দেবতাহীন অপবিত্র অত্যন্ত কুস্থান সকল নরকের প্রত্যেক দৃষ্টান্তস্বরূপ স্বর্গের পাশাপাশি দাঁড়াইয়া আছে। কিছু দূর আসিয়া হঠাৎ শচীকান্ত কহিল "মনীশ এই স্বর্ণপুরী কাশী?"

মনীশ কথাটার অর্থ বুঝিল। কিন্তু সে কোন বিষয় তাহার স্থূল অর্থ দ্বারা বিচার করে না। কাশীর মাহাত্ম্য বা মহিমা কি এবং ইহা কাহার পক্ষে স্বর্গপুরী তাহা সে জানে। এই চিরদিনের কাশী অনাথা হিন্দু বিধবার ও সাধু মহাত্মার শেষ সম্বল, শান্তিহীনের সান্ত্বনার স্থল ইহা ভোগীর স্বর্গ নহে ত্যাগীর স্বর্গ। কিন্তু সে তর্ক পরিহার করিয়া কেবল কহিল "সোনায় কি খাদ থাকে না?" "খাদের অংশটা যে বেশি দেখাচ্চে।"

মনীশ একথার উত্তর করিল না। ক্রমে তাহারা দশাশ্বমেধে পৌঁছিয়া বিশ্বনাথের গলির মুখে আসিয়া পড়িল। সঙ্কীর্ণ পথের দুধারে বিচিত্র সাজে সজ্জিত বিপনিশ্রেণী, পথে লোক যেন ধরিতেছিল না। শচীকান্ত হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠিল "বাই-জোভ্! সর্দ্দিগর্ম্মি হয়ে কে মরতে যাবে!"

মনীশও তাহাকে থামিতে দেখিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের মৃদুহাস্যের সহিত কহিল "থিয়েটয়ে এর চেয়ে কম ভিড় হয় কি? সর্দ্দিগর্ম্মি হয় না তো!" "তোমার সকল তাতেই ঠাট্টা! আমি ওখানে যাবোনা, চলো ফেরা যাক্।"

মনীশ হঠাৎ কঠিন দৃষ্টিতে চাহিল, দৃঢ়স্বরে কহিল "আমি যাবো"। সে দৃষ্টিতে একটা অকথ্য তিরস্কার মিশ্রিত ছিল বুঝি এমন দৃষ্টিতে সে তাহার দিকে আর কোন দিনও চাহে নাই – সেদিন না—সেদিনও না—যেদিনের কথা আজও শচীকান্তের স্মৃতি পূর্ণ করিয়া রহিয়াছে। আহা সেই এক পক্ষ কালের সঙ্গিনী মেয়েটি! সে মুখখানা এখনও যেন অতীত স্মৃতির বিলুপ্ত মেঘের মধ্য হইতে থাকিয়া

থাকিয়া বিদ্যুৎ হানিয়া যায়। সে ঈষৎ বিরক্তি-নীরস স্বরে কহিল, “যাবে তবে চলো আমিও যাই, অজানা দেশে নৈলে আবার পথ হারাবো।”

মন্দিরে প্রবেশ করিয়া মনীশ তাহাকে দেখিতে পাইল না, ভিড়ের মধ্যে আছে স্থির করিয়া সে সংগৃহীত মাল্যপুষ্পাদি দ্বারা স্তূপান্তরালস্থিত বিশ্বদেবতাকে অর্চ্চনা করিল। সেদিন সোমবার মহাদেবের বিশেষ পূজার দিনে লোকের ভিড়ের সীমা ছিল না ‘হর হর মহাদেব! ধ্বনি উঠিতেছে। গম্ভীর নিঃস্বনে মন্দির ঘণ্টা বাজিতেছে রাশি রাশি পুষ্পচন্দন কুণ্ডের মধ্যে অজস্র ধারে নিক্ষিপ্ত হইতেছে। কোন মতে ভিড় সরাইয়া মনীশ বাহির হইয়া আসিল। দুই দণ্ড দাঁড়াইয়া দেখিবার সুযোগ ছিল না। মন্দির প্রদক্ষিণান্তে সে পরিচিত পাণ্ডার দ্বারা ‘রুলী’ চর্চ্চিত ও মাল্যভূষিত হইয়া তাহাকে কিছু প্রণামী দিয়া বন্ধুর খোঁজ করিতে লাগিল, কিন্তু কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইল না। একটা বৃহদাকার নিরীহ বৃষ ব্যস্ত মনীশের গলার মালাগাছির উপরে লোলুপ জিহ্বা বিস্তার করিয়া দিয়াছিল; তাহার মুখের উপর তাহার কাম্যফল নিক্ষেপ করিয়া সে বিস্মিত ভাবে বাহিরে আসিল। অল্পদূরেই একটা দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া শচীকান্ত একটা চিত্রকরা কাঠের ঘোড়া দর করিতেছে। মনীশ নিকটে আসিয়া অধীর ভাবে কহিয়া উঠিল “তুমি মন্দিরে মোটে ঢোকওনি নাকি?”

“না, দেখতো মনীশ এইটে চৌদ্দ আনা হবে কি না?”

“কারজন্যে?” “অপর্ণার খোকার জন্যে কিনেচি, এসো বেশিক্ষণ এই বদ্ধর মধ্যে থেকে ত লাভ কিছুই নেই।”

মনীশ বন্ধুর অনুসরণ করিল কিন্তু তাহার ব্যবহারে তাহার মনে ক্ষোভের সীমা রহিল না। স্পষ্ট করিয়া সে যে এই দেবতার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিল একি তাহার পিতার অগোচর থাকিবে? মৃত্যুশয্যাশায়িতা মায়ের কাছে কি এ বিদ্রোহ গোপন থাকিবে? তাঁহারা কি ভয়ানক আঘাতই না পাইবেন? এই ভাবিয়া সে অধিকতর দুঃখিত হইল। কিন্তু আর কোন কথা তাহাকে বলিতে প্রবৃত্তি হইল না। রাজপথে তখন রৌদ্র নামিয়াছে, পাথরের রাস্তা ইতিমধ্যেই একটুখানি তাতিতে আরম্ভ হইয়াছে ফুলশূন্য ফুলের সাজি দুলাইয়া এখানে ওখানে পঞ্চপত্রস্থিত জলের ছিটা দিতে দিতে কাশীবাসীগণ ঘরে ফিরিতেছিলেন। একটি বৃদ্ধা জাতিসুলভ কৌতূহলে যুবকদ্বয়কে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “হ্যাঁগা বাছারা কোথা থেকে আসচো?”

সম্মুখে ‘বেণী-মাধবের ধ্বজা’ অতীতের একটা অতি কঠোর স্মৃতির সাক্ষী স্বরূপ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। শচীকান্ত জিজ্ঞাসা করিল “ওটা কিসের মনুমেণ্ট?”

মনীশ জিনিষটার প্রকৃত ইতিহাস ব্যাখ্যা করিয়া কহিল “দেখতে যাবে?”

শচীকান্ত কহিল “যাবো বইকি চলো না।

মনীশ ফিরিল, কিন্তু সে এইবার একটা খোঁচা না দিয়া থাকিতে পারিল না, ব্যঙ্গের সহিত ঈষৎ হাসিয়া সে কহিল “আরঙ্গজেবের তবু ভাগ্যটা ভাল, বিশ্বেশ্বরের চেয়ে!”

শচীকান্ত [illegible]

"আরঙ্গজেব যে নিশ্চিত ছিলেন, ইতিহাস তার সাক্ষ্য দিচ্চে, বিশ্বেশ্বর যে আছেন তাঁর কোন প্রমাণ নেই, ও রকম অনিশ্চিত বস্তুর দাসত্ব করা আমার পোষায় না।"

প্রত্যাবর্ত্তন পথে দুজনেই গতি বর্দ্ধিত করিয়াছিল, তখন বেলা হইয়া গিয়াছে। দেবমন্দিরের ভোগরাগ শেষে দেবসেবকগণ যে যার স্থানে বিশ্রাম করিতেছে, পথের জনসংখ্যাও অনেক হ্রস্ব; শেষ শীতের মধ্যাহ্ণ সূর্য্য তাঁহার সহস্র কনকরশ্মি পশ্চিমাঞ্চলের প্রস্তর প্রাসাদ ও রাজবর্ত্মের উপর অজস্রধারে বর্ষণ করিতেছিলেন, যাজন শেষে নৈবেদ্যের স্বল্প ফলমূলাদি উত্তরীয় প্রান্তে বাঁধিয়া পুরোহিত ঠাকুর নিরুদ্যম চরণে গৃহে ফিরিতেছিল। কিছুদূর আসিবার পর উভয়ের মধ্যকার স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া শচীকান্তই প্রথমে কথা কহিল। বলিল "মনি, তুমি আমার ওপোরে ভারী চটেচ না? ভাব্‌চো বেল্লিকটা একেবারে জাহান্নমে গেছে।"

"চটিনি ঠিক,—যাক্ ওকথা আর কেন?" মনীশ একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া একটু বেগের সহিত চলিতে আরম্ভ করিল। শচী তাহাকে অনুসরণ করিয়া কহিল "রাগ করোনা ভাই, তোমাকে দুঃখিত করতে আমি একেবারেই ইচ্ছা করি না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি কতকগুলো অসঙ্গত সৃষ্টিছাড়া বিশ্বাস নিয়ে নিজের সঙ্গে প্রবঞ্চনার চেষ্টা করায় লাভ কি? ঈশ্বর ঈশ্বর করে চেঁচাচেচি করাতে কি কারুকে বিশেষ লাভবান হতে দেখতে পেয়েচ? তা যখন হয় না, চিরদিন সাহায্য পেয়ে শ্রম সফল করতে দেখিনে তখন কি হবে সে রকম অক্ষমশক্তির সাধনায়? থাকতে হয় তিনি তাঁর নিজের ঘরের বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে থাকুন, আমার সঙ্গে তাঁর কোন্ সম্বন্ধ? মানুষের পক্ষে তার ঈপ্সিতপথে তার নিজের শক্তি ও ইচ্ছা অনুসারে নিজের জীবন গড়ে নেওয়াতেই তা'র জীবনের সার্থকতা! আমার মতে তাকে দেবতা ও মানুষের কঠোর শাসন শৃঙ্খলে হাত পা বেঁধে চেপে না রেখে শুধু তার নিজের শক্তির উপর নির্ভর করতে দিলে মানুষ এখন যা আছে তার চেয়ে শতগুণে বড় হতে অবসর পায়, তাকে তাই করতে দাও। এই ক্ষুদ্র পৃথিবী গ্রহটুকু তার চলাফেরার পক্ষে যথেষ্ট প্রশস্ত; এর থেকে বেশি বেশি প্রকাণ্ড লোক সকলে তার কিছু দরকার করে না, তারা যেখানে আছে সেইখানেই থাক।"

এই বলিয়া সে নিতান্ত কৃপাভাবে বন্ধুর অকস্মাৎ উত্তেজনারক্ত মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিল। সে হাসি তাহার বন্ধুর সর্ব্ব শরীরের স্ফীত শিরাসমূহের মধ্যে যেন সহসা বিদ্যুবহন করিয়া লইয়া গেল, সে তীব্র কণ্ঠে কহিয়া উঠিল "ঈশ্বরকে জীবন থেকে বাদ দিয়ে মনুষ্যত্বকে জাগাতে চাও,—জানো মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব কোন শক্তির অংশ? তুমি যে মত প্রকাশ করলে তার নাম যথেচ্ছাচার, তার পরিণাম উন্নতি নয় ধ্বংস।"

শচীকান্ত হাসিয়া উঠিল "কিসে? পাশ্চাত্যদেশের বৈজ্ঞানিকেরা যে প্রমাণ করে দিচ্চেন আকাশ যেমন শূন্য তার অধীশ্বরও

অধিকাংশ লোকেই গ্রহণ করতে দ্বিধা করেনি তারা কি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে? না দিন দিন ধনেপুত্রে লক্ষ্মীলাভ করচে?"

মনীশের তুই চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল "কে বলতে পারে তাদের এই বৃদ্ধি জোয়ারের জলের মত মুহূর্ত্তের স্ফীতিমাত্র নয়? আমার কাছে যা বলো যা করো শচী সে আমি ধরিনে কিন্তু তোমার বাবা এই সব কথা শুনলে কি রকম দুঃখিত হবেন ভাবো দেখি? তিনি ভগবানকে নিত্য প্রত্যক্ষ করেন, আর তুমি তাঁর ছেলে হয়ে তাঁর সর্ব্ব প্রত্যক্ষ অধিষ্ঠানকে এমন করে অগ্রাহ্য করতে সাহস করো।"

"তাঁর কাছে আমি কখনও এসব কথা বলি দেখেছ? তুমি অবশ্য কিছু একথা তাঁকে বলতে যাচ্চোনা? ব্যস্ তাহলেই চুকে গেল, তিনি জানবেন কি করে? যদি কোন কথা ওঠে তাঁর মতে সায় দিয়েই যাবো না হয়।"

মনীশ ভ্রূকুটি করিয়া কহিল, একজন বিদ্বান ও বুদ্ধিমান লোক ভিতরে ও বাহিরে দুরকম মত পোষণ করতে পারে একথা আমি মনেও করতে পারিনে। বিশেষ বাপের কাছে মিথ্যাচরণ করা মোটেই সঙ্গত নয়।"

শচী তখনও সেইরূপ মৃদু মৃদু হাসিতেছিল, কহিল "তবে না হয় মনে কর ঈশ্বর আমায় যেমন গড়েছেন আমি সেই রকমই হয়েচি, কি করবো আমার তো হাত নয়।"

মনীশ ক্রুদ্ধ কটাক্ষ করিয়া সবেগে কহিল "ওকথা বল্লে শুনবো কেন, তুমিতো ঈশ্বরের অস্তিত্বই মানচো না।" "ধরে নাও মানচি।"

কর্ম্মফলদাতা, বিচারক, কর্ম্ম নিজেরই কৃত সেই তোমার বুদ্ধি বিকৃতির নিমিত্ত কারণ।"

বাড়ীর দ্বার খোলাই ছিল, দ্বারের কবাট সরাইতে সরাইতে শচীকান্ত সকৌতুক হাস্যের সহিত মনীশের দিকে চাহিয়া কহিল, "তোর জ্বালায় আর বাঁচিনে মনীশ, তুই একেবারে শঙ্করাচার্য্য হয়ে উঠ্লি যে।"

মনীশ ঈষৎ অপ্রতিভভাবে ক্ষোভের হাসি হাসিয়া চুপ করিয়া রহিল।

বেলা অনেক হইয়াছিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় পূজাউপাসনাশেষে পূজাগৃহের রুদ্ধদ্বার মুক্ত করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহার শুভ্র প্রশান্ত বক্ষে রজতসর্পের ন্যায় শুভ্র উপবীত গুচ্ছ মহাদেবের বক্ষে ফণিভূষণের ন্যায় ভূষিত রহিয়াছে। কৌষেয় বস্ত্র তখনও ছাড়া হয় নাই, ললাট ব্যাপিয়া চন্দনতিলক বিদ্যমান, শচীকান্ত সম্মুখে আসিয়া তাঁহার পদতলে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মনীশ প্রণামান্তে পদধূলি গ্রহণ করিল। উমাকান্ত সস্নেহে পুত্রের সুপারিপাট্যযুক্ত কেশের উপর হাত রাখিয়া করুণাপূর্ণ হাসির সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন "ভাল আছ? তোমায়তো বেশ ভালই দেখ্ চ্চে!"

শচীকান্ত যদিও দৃষ্টি নত করিয়া রাখিয়াছিল তথাপি কি একটা নূতনতর কৌতূহলে সে এক একবার তাহার নতদৃষ্টি তুলিয়া তাহার পিতার মুখে চকিতমাত্র স্থাপন না করিয়া যেন থাকিতে পারিতেছিল না। কি আশ্চর্য্য! দুই বৎসরমাত্র সে ইঁহাকে দেখে নাই, কিন্তু সহসা আজ মনে হইতেছে

কখনই পূর্ব্বে দেখিতে পায় নাই! মুখে যেন কি একটি উদার প্রসন্নতার ভাব মাখান আছে দেখিলে মন বেশ শান্ত হইয়া আইসে। জরার আক্রমণ কোনখানেই চিহ্ন ফেলিতে পারে নাই, এই বয়সে দেহও একটু নত হয় নাই। সে ঈষৎ বিস্ময়পূর্ণ সম্মানের সহিত উত্তর করিল "আমি ভালই আছি।"

ভট্টাচার্য্যমহাশয় পুত্রের দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া মনীশের দিকে চাহিলেন, "বেড়াতে গিয়াছিলে? মন্দিরে গিয়েছিলে দেখছি, কপালে তিলক"—বলিতে বলিতে পুত্রের ললাটের উপরে নেত্রপাত করিয়া দেখিলেন। মন্দিরের নাম উঠায় শচীকান্ত হঠাৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল। এইবার যদি তাহাকে সেইরূপ প্রশ্ন করা হয় তবেই ত মহাবিপদ। আত্মরক্ষার্থে চট্ করিয়া সে একটা উপায় অবলম্বন করিল;—"মা এখন কেমন আছেন?" বলিতে বলিতে সে তৎক্ষণাৎ ব্যস্ত ভাব দেখাইয়া গঙ্গামণির ঘরের দিকে চলিয়া গেল। মনীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জন্য কাচা ধুতী ও গামছা আনিয়া তাঁহার অনুসরণ করিল। (ক্রমশ)

শারীর স্বাস্থ্য-বিধান

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৮)

কায়িক পরিশ্রম ও ব্যায়াম।

যেমন কোন লৌহ-নির্ম্মিত যন্ত্র কিছু দিন ব্যবহার না করিয়া ফেলিয়া রাখিলে মড়িচা ধরিয়া উহা বিকল হইয়া যায়, সেইরূপ সমুচিত পরিশ্রমের কার্য্য দ্বারা আমাদিগের দেহ-যন্ত্রের পরিচালনা না করিলে তন্মধ্যে মরিচার ন্যায় নানাবিধ দূষিত পদার্থ সঞ্চিত হয় এবং উহা শীঘ্রই অপটু হইয়া পড়ে। শরীর অপটু হইলেই দেহস্থিত যাবতীয় যন্ত্র দুর্ব্বল হইয়া স্বভাব-নির্দ্দিষ্ট স্ব স্ব কার্য্য যথারীতি সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় না। মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হইলে অধ্যয়ন, চিন্তা, স্মৃতি, কল্পনা, বিচার প্রভৃতি মস্তিষ্কের কার্য্যাবলী সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না এবং সেই সঙ্গে দয়া, প্রেম, ভক্তি, কর্ত্তব্য-পরায়ণতা, পরার্থপরতা প্রভৃতি হৃদয়ের উচ্চ বৃত্তি গুলি সম্যক্ স্ফুরণ লাভ করিতে অসমর্থ হয়। হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস্ দুর্ব্বল হইলে রক্ত পরিশোধনের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না, সুতরাং দেহজাত নানাবিধ দূষিত পদার্থ রক্তমধ্যে সঞ্চিত হইয়া শরীরকে আরো বিকল ও রোগপ্রবণ করিয়া তোলে। পরিপাক যন্ত্র গুলির দুর্ব্বলতা হেতু খাদ্য সম্যক্ রূপে পরিপাক না হইয়া উহার অধিকাংশই অসার পদার্থরূপে আমাদিগের শরীর হইতে বহির্গত হইয়া যায়; কিয়দংশ মাত্র শরীর পোষণের নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়, অবশিষ্টাংশ বিকৃত ভাব প্রাপ্ত হইয়া শোণিত মধ্যে শোষিত হয় এবং রক্তকে দূষিত করিয়া নানাবিধ রোগ উৎপাদন করে। কলের মধ্যে মরিচা পড়িলে উহার ভালরূপে চলিবার যেমন প্রতি-

বদ্ধকতা উপস্থিত হয়, তেমনি পরিশ্রমের কার্য্য না করিলে আমাদিগের শরীরে অধিক পরিমাণ চর্ব্বি সঞ্চিত হইয়া হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ প্রভৃতি শারীরিক যন্ত্রাদির স্বাভাবিক ক্রিয়ার সম্পূর্ণ ব্যাঘাত জন্মায়। এইজন্য অলস ব্যক্তি অপেক্ষা পরিশ্রমশীল ব্যক্তিকে দীর্ঘজীবন, স্বাস্থ্য ও মানসিক সচ্ছন্দতা অধিক পরিমাণে ভোগ করিতে দেখা যায়।

সাধারণতঃ আমরা দুইটী কারণে পরিশ্রমের কার্য্য করিয়া থাকি—(১) জীবিকা নির্ব্বাহ উপলক্ষে, এবং (২) ইচ্ছা পূর্ব্বক অঙ্গচালনা করিয়া শারীরিক ও মানসিক সচ্ছন্দতা লাভ করিবার জন্য। এই শেষোক্ত শ্রেণীর পরিশ্রমকে আমরা ব্যায়াম (Exercise) বলিয়া থাকি। কোন না কোনরূপ অঙ্গচালনা ব্যতিরেকে আমাদিগের শরীর প্রকৃত স্বাস্থ্যের অধিকারী হইতে কথনই সমর্থ হয় না। পুনশ্চ শরীরের সহিত মনের এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে একের অসুস্থতা নিবন্ধন অপরটী বিশেষ কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে। ল্যাটিন্ ভাষায় একটী কথা প্রচলিত আছে যে নীরোগ দেহের আশ্রয় ব্যতীত শক্তিসম্পন্ন মন বাস করিতে পারে না; ইহা অতি সত্য কথা। দেহ অসুস্থ হইলে মন কিরূপ বিকার প্রাপ্ত হয়, তাহা কাহাকেও বুঝাইবার আবশ্যক নাই।

ব্যায়াম সম্বন্ধে চরক এইরূপ লিখিয়াছেন—

"শরীরচেষ্টা যা চেষ্টা স্থৈর্য্যার্থা বলবর্দ্ধিনী।
দেহব্যায়াম সংখ্যাতা মাত্রয়া তাং সমাচরেৎ ॥"

যে শরীরচেষ্টা দ্বারা দেহের স্থিরতা ও বলবর্দ্ধিত হয়, তাহাকে দেহব্যায়াম কহে; উপযুক্ত মাত্রায় ইহার সমাচরণ করিবে।

"লাঘবং কর্ম্মসামর্থ্যং স্থৈর্য্যং ক্লেশসহিষ্ণুতা।
দোষোপায়াহ গ্নিবৃদ্ধিশ্চ ব্যায়ামাদুপজায়তে ॥"

ব্যায়াম দ্বারা শরীর লঘু হয়, কর্ম্ম করিবার শক্তি, স্থিরতা, ক্লেশ-সহিষ্ণুতা ও পরিপাক-শক্তির বৃদ্ধি সাধিত হয় এবং দৈহিক বিবিধ দোষ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

চরক অপরিমিত হাস্য, বৃথা বাক্যব্যয় প্রভৃতি অন্যান্য কুঅভ্যাসের ন্যায় অতিব্যায়াম নিষেধ করিয়া গিয়াছেন—

"শ্রমক্লম ক্ষয়তৃষ্ণা রক্তপিত্তং প্রতানকঃ।
অতিব্যায়ামতঃ কাসো জ্বরশ্ছর্দ্দিশ্চ জায়তে ॥
ব্যায়াম হাস্য ভাষ্যাধ্ব গ্রাম্য ধর্ম্ম প্রজাগরান্।
নোচিতানপি সেবেত বুদ্ধিমানতিমাত্রয়া ॥"

শ্রম, ক্লান্তি, ক্ষয়, তৃষ্ণা, রক্তবমন, দৃষ্টিহীনতা, কাশি, জ্বর এবং সর্দ্দি অতিব্যায়াম হইতে উৎপন্ন হয়। ব্যায়াম, হাস্য, বাক্যকথন, ভ্রমণ, জাগরণ প্রভৃতি দৈহিক কার্য্য গুলি বিধেয় হইলেও বুদ্ধিমান ব্যক্তি উহাদিগের একটীও অতিমাত্রায় সেবন করিবে না।

আমাদিগের দেশের 'বড়মানুষেরা' কোন রূপ কায়িক পরিশ্রমের কার্য্য করা নিন্দনীয় মনে করেন। তাঁহারা ভাবেন যে 'বড়লোকেরা' পরিশ্রম করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করেন নাই, তাঁহারা কেবল খাইয়া, শুইয়া, গল্প ও আমোদ করিয়া সময় কাটাইবার জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সাধারণ লোকেরাই কায়িক পরিশ্রম করিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, সুতরাং যখন তাহারা 'মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া' জীবিকা অর্জ্জন করে, তখন তাহারা স্বভাবনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করে মাত্র। ইহাদের মধ্যে আবার অনেকে কর্ম্মফলের দোহাই দিয়া নিজেদের আলস্যপরায়ণ ও সাধারণ লোকের কর্ম্মবহুল জীবন ভগবানের অনুমোদিত বলিয়া উহার সমর্থন করিয়া থাকেন। শ্রমলব্ধ সাংসারিক সচ্ছন্দতা ভোগ করা যে কি সুখ

তাহা যে একবার জানিয়াছে, সে কখনই তাহা পরিত্যাগ করিতে চাহিবে না। আলস্য-পরায়ণ ব্যক্তি ক্ষুধা কাহাকে বলে, তাহা অনেক সময়ে জানিতে পারে না। সুতরাং বিবিধ ভোগ্যবস্তু আহার করিবার সুবিধা থাকিলেও ক্ষুধার অভাবে, আহারে যে অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তি লাভ করা যায়, তাহা তাহার ভাগ্যে কখনই ঘটিয়া উঠে না। ক্ষুধাই খাদ্যকে অমৃত তুল্য করে, ক্ষুধাবিহনে ভোগ্যবস্তুর আয়োজন বিড়ম্বনা মাত্র হইয়া থাকে। অলস ব্যক্তি দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়া এবং তাড়িত-ব্যজন দ্বারা সেবিত হইয়াও রাত্রে সুনিদ্রা লাভ করিতে সমর্থ হয় না; সুনিদ্রাবিহনে অনেক সময়ে তাহার "শয্যাকণ্টক" উপস্থিত হয়। কিন্তু শ্রমশীলব্যক্তি ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়াও বিরামদায়িনী নিদ্রা-দেবীর ক্রোড়ে দেবদুর্ল্লভ শান্তিসুখ লাভ করিয়া থাকে। পরিশ্রম ব্যতীত বিবিধ ভোগ্য বস্তুর প্রকৃত মর্য্যাদা বুঝিতে পারা যায় না। যাঁহাদের ভোগ্য বস্তুর অভাব নাই, তাঁহারা যদি নিজেদের দোষে তাহাদের প্রকৃত আস্বাদ গ্রহণে বঞ্চিত থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা যথার্থই কৃপার পাত্র। অবশ্য যাহারা প্রাণ-পাত পূর্ব্বক পরিশ্রম করিয়া নিজেদের সাংসারিক অভাব মোচন করিতে সমর্থ হয় না, তাহারা পরিশ্রম করে বলিয়াই যে প্রকৃত সুখ ও স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়, ইহা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়।

পরিশ্রমের কার্য্য করিতে হইবে বলিয়া সকলকেই যে "জনমজুরের" মত খাটিতে হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। কায়িক পরি-

কার্য্য, এই ভ্রান্ত ধারণা আমাদের দেশের অনেক লোকের মনে বদ্ধমূল হইয়া আছে বলিয়া এ সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এই অপৌরুষেয় বিশ্বাস হইতেই আমাদের দেশের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে। ইহার ফলে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করা এদেশে সমুচিত অপমানের কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হয় না। আত্ম-সম্মানের মস্তকে কুঠারাঘাত করিয়া মুষ্টিমেয় সাহায্যের জন্য সমস্ত দিন কোন ধনী ব্যক্তির বা দাতব্য সভার দ্বারে "ধর্ণা" দিয়া লোকে বসিয়া থাকিবে বরং তাহাও ভাল, তথাপি সবল ও সম্পূর্ণ সুস্থশরীর থাকিতেও "গতর খাটাইয়া "অন্নসংস্থানের চেষ্টা কখনই করিবে না, কারণ ইহাতে তাহার ব্যক্তিগত ও বংশগত মর্য্যাদার হানি হইবে! এইরূপ অলস জীবন কিছু দিন অতিবাহিত করিলেই এমন একটী কুঅভ্যাস দাঁড়াইয়া যায় যে ঐ ব্যক্তির পক্ষে কোনরূপ পরিশ্রমের কার্য্য করা একেবারে অসম্ভব হইয়া উঠে। দেশের মধ্যে যে কত লোকের জীবন এইরূপ চেষ্টাশূন্য ও উদ্যমবিহীন হইয়া একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইতেছে এবং তাহারা পরপুষ্ট জীবের (Parasite) ন্যায় সমাজ হৃদয়ের শোণিত শোষণ করিয়া সমাজকে দুর্ব্বল করিতেছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। জীবনের আশ্রম-বিশেষে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন শাস্ত্রানুমোদিত হইলেও সাধারণ লোকের পক্ষে, বিশেষতঃ সংসারীর পক্ষে, ইহা অপেক্ষা নীচবৃত্তি আর কিছুই হইতে পারে না। যাহারা এই বৃত্তি অবলম্বন করে এবং যাহারা ইহার প্রশ্রয়

অপরাধী এবং ইহার জন্য যে সামাজিক ও জাতিগত অবনতি সংঘটিত হইতেছে, তাহার জন্য দাতা ও গৃহীতা উভয়েই তুল্যভাবে দায়ী। পাশ্চাত্যদেশে শ্রমশীল লোকের সংখ্যা এত অধিক বলিয়া উহাদিগের গৃহে কমলা চিরদিন অচলা হইয়া রহিয়াছেন, আর আমরা আলস্য ও উঞ্ছ বৃত্তির সেবা করিয়া দিন দিন এইরূপ "লক্ষ্মীছাড়া" দশা প্রাপ্ত হইতেছি। নিঃসহায় অন্ধ, খঞ্জ, রোগার্ত্ত বা জরাপীড়িত ব্যক্তি সমাজের অবশ্য পোষ্য এবং এমন কোন দেশই নাই যথায় তাহাদিগের প্রতিপালনের জন্য কোন না কোন রূপ সুব্যবস্থা নাই। দুঃখীর দুঃখমোচন করা মনুষ্যোচিত কার্য্য। যে ব্যক্তি ক্ষমতাসত্তে এরূপ কর্ত্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হয়, সে মানব নাম ধারণের অযোগ্য। কিন্তু আলস্যের প্রশ্রয় না দিয়াও দুঃখীর দুঃখমোচন করিতে পারা যায় এবং প্রত্যেক সমাজহিতৈষীব্যক্তির ঐরূপ সদুপায় অবলম্বন করাই উচিত। সেই সকল সদুপায় কি, তাহা বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচনার বিষয় নহে, তবে ইহা সত্য কথা যে সুস্থ সবল "পেশাদার" ভিখারীকে ভিক্ষা দিয়া আমরা যেরূপ বিনা সঙ্কোচে তাহার আলস্যের এবং অনেক স্থলে তাহাদিগের কুচরিত্রের প্রশ্রয় প্রদান করি এবং তাহার ইহ ও পরকালের সর্ব্বনাশের পথ পরিষ্কার করিয়া দিই, এরূপ আর অন্য কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। যতদিন পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় এদেশেও কায়িক পরিশ্রম সম্মানের কার্য্য বলিয়া বিবেচিত না হইবে, তত দিন পর্য্যন্ত আমাদের পরমুখাপেক্ষিতা ঘুচিবে না, আমাদের হৃদয়ে আত্মমর্য্যাদাবোধ জাগরূক হইবে না, আত্ম-নির্ভরতা আমাদের জাতীয় চরিত্র সুশোভন করিবে না এবং কোন বিষয়েই আমাদের দৈন্যও ঘুচিবেনা।

কর্ম্ম করিবার জন্যই মানুষের জন্ম, কর্ম্ম করা ব্যতীত আমাদের অন্য উপায় আর নাই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন—

"নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ।
"কর্ম্মছাড়ি ক্ষণকাল থাকা নাহি যায়,
স্বাভাবিক গুণে কর্ম্ম আপনি করায়।" সত্যেন্দ্রনাথ।

সকল দেশের সকল ধর্ম্ম ও নীতিশাস্ত্র দ্বারা এই মত বিশেষ ভাবে সমর্থিত হইয়াছে। তবে অবস্থা ভেদে মানুষের কর্ম্মের প্রভেদ হইয়া থাকে। সাধারণ মানুষে কাজ না করিলে তাহার জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে না, সুতরাং কর্ম্ম তাহার জীবনের দোসর স্বরূপ। কিন্তু গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করিবার জন্য যাহাদের কর্ম্ম করিবার আবশ্যক হয় না, তাহারাও কোন না কোন রূপ কর্ম্ম না করিলে তাহাদের জীবনযাত্রা সচ্ছন্দে নির্ব্বাহিত হওয়া অসম্ভব হইয়া উঠে। মানুষকে কাজ করিতে দেখিয়া কাহারও অলস হইয়া বসিয়া থাকিবার প্রবৃত্তি কি রূপে জন্মিতে পারে, তাহা সহজে বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। যে মানুষের কণামাত্র আত্মসম্মান ও দায়িত্ব জ্ঞান আছে, সে কখনই অলস জীবন বহন করিতে স্বীকৃত হয় না। কর্ম্ম যদি ইচ্ছার বিরুদ্ধে সম্পন্ন করিতে না হয়, তাহা হইলে উহা অপেক্ষা সুখের উপায় আর কিছুই নাই। অবশ্য ইচ্ছাবিরুদ্ধ কর্ম্ম অনেকস্থলেই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির অন্তরায় হইয়া থাকে। কর্ম্ম অপেক্ষা সুশিক্ষার প্রকৃষ্ট উপায়

আর কিছুই নাই। কর্ম্মই মানুষকে শতশত বিভিন্ন প্রকৃতির মানব ও অবস্থার সংঘর্ষে আনয়ন করে, সুতরাং কর্ম্ম দ্বারাই তাহার অভিজ্ঞতার প্রসার ক্রমশঃ বাড়িয়া যায়। মহাপুরুষেরা জীবনব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারাই জগতের ইতিহাসে অবিনশ্বর কীর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। আজ পৃথিবীতে যাহা কিছু মনস্বিতার, যাহা কিছু জ্ঞানের, যাহা কিছু উন্নতির, যাহা কিছু উচ্চ অঙ্গের সভ্যতার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা যে অবিরাম শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের ফলে উৎপন্ন হইয়াছে, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

স্বামী বিবেকানন্দ বর্ত্তমান কর্ম্মভূমি আমেরিকার ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বরদর্শন করিয়া বলিয়া ছিলেন যে ইহার মধ্যে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম সামগ্রীটীও জীবনব্যাপী পরিশ্রম ব্যতীত উৎপন্ন হয়নাই। একজন ধর্ম্ম যাজক রহস্যচ্ছলে বলিয়া গিয়াছেন যে পরিশ্রম করা অপেক্ষা পরিশ্রম না করাই অধিক পরিশ্রমসাপেক্ষ। বাস্তবিক অলস ব্যক্তির জীবনের ভার অনেক সময়েই নিতান্ত দুর্ব্বহ বলিয়া তাহার মনে হয়। ধন, জন, যশ, সম্পদ, সুখ, সচ্ছন্দতা, সকলগুলিই পরিশ্রমশীল ব্যক্তির করতলগত থাকে; উদ্যোগী পুরুষসিংহই লক্ষ্মীর দ্বারা সেবিত হইয়া থাকেন।

যৌবন কালে আলস্যের ন্যায় অধঃপতনের সরল সোপান আর দ্বিতীয় নাই। এই সময়ে কর্ম্মে প্রবৃত্ত না থাকিলে মানুষের চরিত্র ও মহত্ত্ব উভয়ই চিরদিনের জন্য নষ্ট হইয়া যায়। একজন ধর্ম্ম-প্রচারক বলিয়া গিয়াছেন যে আলস্যই মনুষ্যের জীবন্ত সমাধি; সে যখন জীবিত থাকিয়া—না মনুষ্যের না ঈশ্বরের—কাহারো কার্য্যে লাগে না, তখন মৃত বা জীবিত অবস্থা, তাহার পক্ষে উভয়ই সমান। প্রাচীন গ্রীকগণ কায়িক পরিশ্রম সমাজরক্ষার জন্য এতই আবশ্যক মনে করিতেন যে, কেহ অলস হইয়া বসিয়া থাকিলে প্রকাশ্য বিচারালয়ে তাহার সমুচিত দণ্ডের ব্যবস্থা করিতেন। তাঁহারা বলিতেন যে পরিশ্রম সমাজে পাপস্রোত নিবারণের প্রকৃষ্ট উপায়। যে অলস, তাহাকে তাঁহারা চোর ডাকাতের সহিত তুলনা করিতেন। একখানি ইংরাজি গ্রন্থে লিখিত আছে যে অলস ব্যক্তির মস্তক পাপপুরুষের কারখানা স্বরূপ—কারণ যত কিছু গর্হিত কার্য্য পৃথিবীতে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই অলস ব্যক্তির মস্তক হইতে উদ্ভাবিত।

প্রত্যহ কোন না কোনরূপ ব্যায়াম অভ্যাস করা অবশ্য কর্ত্তব্য, কারণ ব্যায়াম না করিলে প্রকৃত স্বাস্থ্য লাভ করা যায় না। ব্যায়াম করা আমাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি; শিশু ও বালকদিগের স্বাভাবিক চঞ্চলতাই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সামর্থ্য অনুসারে যে অঙ্গ যত অধিক চালনা করিবে, ইহা ততই পুষ্টি ও শক্তি লাভ করিয়া অধিকতর কার্য্যক্ষম হইবে। হাত পায়ের ব্যবহার না থাকিলে উহাদের মাংসপেশী হীনবল ও শুষ্ক হইয়া যায়। পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর হস্তপদ বা ঊর্দ্ধবাহু সন্ন্যাসীদিগের হাত ইহার উত্তম দৃষ্টান্তস্থল। হস্তপদ যথারীতি চালনা করিলে পেশী সমূহ দৃঢ়, পুষ্ট ও সবল হইয়া থাকে। কামারের হাত, ডাকহরকরার পা, মাঝিদিগের বক্ষঃস্থল ও বাহু প্রভৃতি অঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত

করিলে এই কথার যাথার্থ্য প্রমাণিত হইবে।

ব্যায়াম করিলে হৃৎপিণ্ডের উত্তেজনা হইয়া সর্ব্ব শরীরে রক্ত উত্তমরূপে পরিচালিত হয় এবং হৃৎপিণ্ডের পেশীসমূহ সবল ও দৃঢ় হয়। যথারীতি ব্যায়াম না করিলে হৃৎপিণ্ড দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। তবে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যায়াম করিলে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন ও অন্যান্য দুরারোগ্য রোগ উৎপন্ন হইয়া স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, এজন্য অতিব্যায়াম অথবা দুর্ব্বল ব্যক্তি এবং যাহাদের কোনরূপ হৃদ্‌রোগ আছে, তাহাদের শ্রমসাধ্য ব্যায়াম করা কোনমতে উচিত নহে।

ব্যায়াম করিলে শ্বাসপ্রশ্বাস ঘন ঘন বহিতে থাকে, এইজন্য ফুস্‌ফুস্ অধিকতর অক্সিজেন্ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। এই অতিরিক্ত অক্সিজেন রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া সমস্ত শরীরে পরিচালিত হয় এবং এইরূপে রক্তের শোধনক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এস্থলে শ্বাস-ক্রিয়া সম্বন্ধে দুই একটি প্রয়োজনীয় কথার সংক্ষেপে উল্লেখ করিব। গভীর নিশ্বাস গ্রহণ করিলে স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধিত হয়। গভীর নিশ্বাস লইলে ফুস্‌ফুস্ সমধিক বিস্তৃত হয় এবং অধিক পরিমাণ বিশুদ্ধ বায়ু তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া রক্তকে শোধন করিবার সুবিধা প্রাপ্ত হয়। পুনশ্চ ফুস্‌ফুসের মধ্যে যে দূষিত বায়ু আসিয়া সঞ্চিত হয়, শ্বাস-ক্রিয়া গভীর হইলে তাহার অধিকাংশ শরীর হইতে বহির্গত হইয়া যায়। সর্ব্বদা সোজা ভাবে শরীর উন্নত করিয়া রাখা উচিত, নহিলে ফুস্‌ফুসের ক্রিয়া সুসম্পন্ন হয় না। কুঁজা হইয়া বসিলে অথবা কাত হইয়া বাঁকিয়া থাকিলে ফুসফুসের যথোচিত প্রসারণের ব্যাঘাত ঘটে, সুতরাং স্বাস্থ্যের পক্ষে ইহা অনিষ্টকর। আমরা পড়িবার বা লিখিবার সময় প্রায়ই কুঁজা হইয়া বসি, ইহা দ্বারা শ্বাসক্রিয়ার ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। আমাদিগের যোগশাস্ত্রে শ্বাসক্রিয়া গ্রহণ করিবার যে নিয়ম বর্ণিত আছে, তাহাতে সম্পূর্ণ সোজাভাবে উপবেশন করিয়া গভীর নিশ্বাস লইবার কথাই আছে।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে গভীর ভাবে নিশ্বাস গ্রহণ করিলে রক্ত পরিষ্কৃত হইবার বিশেষ সুবিধা হয়। এই অভ্যাস যদি আমাদের মধ্যে বদ্ধমূল হয়, তাহা হইলে যখন আমরা মুক্ত স্থানে ভ্রমণ করিয়া বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিয়া থাকি, তখন ইহার সুফল বিশেষভাবে লাভ করিতে পারি। গভীর শ্বাস-ক্রিয়া স্বাস্থ্যোন্নতির একটী বিশিষ্ট উপায়।

আমাদের নাসিকাই শ্বাসক্রিয়ার স্বাভাবিক পথ, সুতরাং মুখ দিয়া শ্বাস গ্রহণ করা কোনমতে উচিত নহে। নাসিকার অভ্যন্তর-প্রদেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রোম দ্বারা আবৃত থাকে। বায়ু মধ্যে ধূলিকণা, ভুষা প্রভৃতি সূক্ষ্ম নানাবিধ দূষিত পদার্থ বিদ্যমান থাকিলে উহারা ঐ রোমরাজির মধ্যে আবদ্ধ হইয়া যায়, সুতরাং শ্বাসবায়ুর সহিত ফুস্‌ফুসের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। ঘরে কেরোসিনের বাতি জ্বালাইলে নাসারন্ধ্রের মধ্যে পরদিন কিরূপ "কালি" জমিয়া থাকে, তাহা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। মুখ দিয়া নিশ্বাস লইলে এই সমস্ত দূষিত পদার্থ বায়ুর সহিত ফুসফুসের মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রভূত অনিষ্টের কারণ হইয়া থাকে। পুনশ্চ বাহিরের শীতল বায়ু

নাসিকার মধ্য দিয়া দীর্ঘপথ বাহিয়া যাইবার সময় অপেক্ষাকৃত উষ্ণ হইয়া ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করে, কিন্তু মুখ দিয়া নিশ্বাস লইলে বাহিরের শীতল বায়ু (বিশেষতঃ প্রবল শীতের সময়) একেবারে ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করিয়া ফুসফুসের প্রদাহ প্রভৃতি কঠিন রোগ উৎপাদন করিবার সম্ভাবনা।

যথারীতি ব্যায়াম করিলে বক্ষঃস্থল উন্নত ও প্রসারিত হয় এবং মাপে ৩।৪ ইঞ্চির অধিক বাড়িয়া যায়।

ব্যায়াম দ্বারা পরিপাক-ক্রিয়ার উন্নতি সাধিত হয়, ক্ষুধা বৃদ্ধি হয় এবং উদরের পেশী সমূহের চালনা হেতু মলত্যাগ সহজ ও সরল হইয়া থাকে। অধিক পরিমাণ মূত্র ও ঘর্ম্ম শরীর হইতে নিঃসারিত হইয়া যায়। সুতরাং দেহ মধ্যে সঞ্চিত বিবিধ দূষিত পদার্থ শীঘ্র শীঘ্র নির্গত হইবার অবসর প্রাপ্ত হয়।

ব্যায়াম করিলে মস্তিষ্ক সবল ও সতেজ হয় এবং কল্পনা ও চিন্তাশক্তি অধিকতর প্রসার লাভ করে।

ব্যায়াম করিবার সময় চর্ম্মের দিকে অধিক রক্ত সঞ্চারিত হয়, এজন্য ঐ সময়ে প্রচুর পরিমাণ ঘর্ম্ম নিঃসারিত হইতে থাকে। কিন্তু এত অধিক ঘর্ম্ম নিঃসারিত হইলেও যতক্ষণ ব্যায়াম করা যায়, ততক্ষণ বাহিরের বায়ু দ্বারা ঠাণ্ডা লাগিবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। তবে ব্যায়াম হইতে ক্ষান্ত হইবামাত্র ঘর্ম্ম-শোষক গরম কাপড় গায়ে দেওয়া উচিত। কারণ ঐ সময়ে চর্ম্মের রক্ত শীঘ্র শীতল হইয়া পড়ে সুতরাং ঘাম শুকাইবার সময় অধিক ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি কাশি প্রভৃতি জন্মিবার সম্ভাবনা।

মুক্ত স্থানে ব্যায়াম করাই প্রশস্ত; যদি গৃহের মধ্যে ব্যায়াম করার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে যে গৃহের মধ্যে অধিক আলো ও বাতাস আসে, তাহার সমস্ত বায়ুপথ উন্মুক্ত করিয়া তন্মধ্যে ব্যায়াম অভ্যাস করা কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বে আমাদের দেশে কুস্তি, বৈঠক, মুগুরভাঁজা লাঠিখেলা, দাঁড়টানা, ডনফেলা ইত্যাদি নানারূপ ব্যায়াম, কি ভদ্র কি ইতর, সকল শ্রেণীর লোকের দ্বারাই অল্পাধিক পরিমাণে অনুষ্ঠিত হইত। কপাটীখেলা, গুলি দাণ্ডা, দৌড়ান, লাফান, সাঁতার দেওয়া প্রভৃতি ব্যায়ামক্রীড়া আমাদিগের বালক ও যুবকদিগের অতিশয় প্রিয় ছিল। তখন গাড়িঘোড়া ও ট্রামওয়ের এত প্রাচুর্ভাব ছিল না; সহরের সম্পন্ন গৃহস্থলোকেরাও সাংসারিক কার্য্যোপলক্ষে দিনে ২।৪ ক্রোশ পদব্রজে ভ্রমণ করিতে কষ্টবোধ করিতেন না। এখন ট্রামওয়ের অনুগ্রহে ভদ্রলোকদিগের ত কথাই নাই, শ্রমজীবি লোকের পক্ষেও এক ক্রোশ ভ্রমণ কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। যে পয়সা তাহারা ট্রামওয়ের জন্য খরচ করে, পথ হাঁটিয়া যদি তাহা দ্বারা সারবান আহার্য্য সামগ্রী সংগ্রহ করে, তাহা হইলে, ব্যায়াম এবং পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ, উভয়েরই সুফলের অধিকারী হইয়া থাকে।

জিম্‌নাষ্টিক্ পরদেশী হইলেও আমাদের বাল্যাবস্থায় বালক ও যুবকেরা এই ক্রীড়ার প্রতি অতিশয় অনুরক্ত ছিল। স্বর্গীয় নবগোপাল মিত্র মহাশয় আমাদের দেশের যুবকদিগের মধ্যে যাহাতে এই ব্যায়াম বিশেষ ভাবে অনুশীলিত হয়, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। আজকাল জিম্‌নাষ্টিকে

ছেলেদের বেশী ঝোঁক দেখিতে পাওয়া যায় না। এখন ফুট্‌বল্, ক্রিকেট্ ও টেনিস্ খেলার উপরেই ছেলেদের বেশী ঝোঁক হইয়াছে, এবং এই সকল খেলায় তাহারা দিন দিন পারদর্শিতা লাভ করিতেছে। ফুট্‌বল্ ও ক্রিকেট্ খেলায় শুদ্ধ যে শারীরিক পরিশ্রম যথেষ্ট হয়, তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে সতর্কতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, কার্য্যে ক্ষিপ্রতা এবং একাগ্রতা প্রভৃতি জীবনযাত্রার উপযোগী সদ্‌গুণগুলি ক্রীড়াচ্ছলে সহজেই আয়ত্ব হইয়া যায়।

ক্রিকেট্ খেলা ইংরাজদিগের একটী জাতীয় ক্রীড়া। একটা ইংরাজি কথা আছে যে বিখ্যাত ওয়াটার্লু যুদ্ধ একদিনে জিত হয় নাই—ইংলণ্ডের প্রত্যেক ক্রিকেট্ প্রাঙ্গণে প্রত্যহ এই যুদ্ধজয়ের সূচনা হইয়া আসিয়াছে। একেলা ব্যায়াম করা অপেক্ষা অনেকে একত্রে ব্যায়াম করিলে সবিশেষ স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। যে সকল ক্রীড়ায় শরীর চালনার সহিত মানসিক শক্তিগুলির সবিশেষ পরিচালনা করিবার সুবিধা হয়, সেগুলি অন্য প্রকার ব্যায়াম হইতে যে শ্রেষ্ঠগুণসম্পন্ন, সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সে দিন মোহন বাগান "ফুট্‌বল ক্লবে"র বাৎসরিক পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে বিচারপতি ডাক্তার থর্ণহিল্ বলিয়াছিলেন যে ব্যায়াম ক্রীড়া দ্বারা সকল শ্রেণীর মনুষ্যের মধ্যে জাতিবর্ণ ও আভিজাত্যমূলক অভিমান অনায়াসে দূরীভূত হইয়া সহানুভূতি ও আত্মীয়তা যেরূপ প্রসার লাভ করে, সেরূপ আর কিছুতেই হয় না। এই জন্যই ইংরাজ পৃথিবীর সর্ব্বত্রই সমাদর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কুচবিহারের ভূতপূর্ব্ব মহারাজা নবনগরের জামসাহেব রাজা রঞ্জিৎ সিংহ প্রভৃতি এ দেশের রাজন্যবর্গকেও সাধারণ লোকের সহিত ক্রীড়া ভূমিতে আমোদ করিতে দেখা গিয়াছে।

দাঁড় টানিলে বাহু, হস্ত, বক্ষ ও উদরের পেশী সমধিক সবল ও পুষ্ট হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে নৌকার "বাচ"খেলা এদেশীয় যুবকদিগের একটী প্রিয় ক্রীড়া ছিল। পূজা ও উৎসবাদি উপলক্ষে নদীবক্ষে বিস্তর নৌকা "বাচ্"খেলায় নিযুক্ত থাকিত; আজকাল সে দৃশ্য নিতান্ত বিরল হইয়াছে। এই খেলাটী নানাকারণে এরূপ মনুষ্যত্ব-স্ফুরক যে ইহা পুনরায় দেশের মধ্যে বিস্তৃতভাবে প্রচলিত হওয়া উচিত। যাহারা "বাচ্" খেলিত, তাহারা প্রায় সকলেই সন্তরণ বিষয়ে বিশেষ পটু ছিল। সন্তরণ যে কেবল একটী উৎকৃষ্ট ব্যায়াম তাহা নহে, ইহা শিক্ষা করিলে নিজেকে এবং অপর লোককে অনেক সময়ে মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার করিতে পারা যায়। আজকাল যুবকদিগকে (বিশেষতঃ সহরে) সন্তরণ অভ্যাস করিতে প্রায় দেখা যায় না।

অশ্বারোহণ আর একটী উৎকৃষ্ট ব্যায়াম। ইহাতে শরীরের বল এবং মনের সাহস উভয়ই বাড়িয়া যায়। বাঙ্গালী ভিন্ন পৃথিবীর অপর সকল জাতি অশ্বারোহণে অভ্যস্ত। এই ব্যায়াম আমাদের দেশে বিস্তৃতভাবে প্রচলিত হইলে দেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।

আজকাল স্যাণ্ডোর উদ্ভাবিত ডম্বেল্ ও অন্যান্য যন্ত্রাদি লইয়া এদেশের অনেকেই ব্যায়াম অভ্যাস করিতেছেন। স্যাণ্ডোর উদ্ভাবিত প্রণালী যথারীতি অনুসরণ করিলে

ব্যায়াম করিলে শরীরের সমস্ত পেশীরই সম্যক্ পরিচালনা হইয়া থাকে, সুতরাং ইহা দ্বারা ব্যায়ামের পূর্ণফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাঁহারা 'স্যাণ্ডো' অভ্যাস করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে কত অল্পদিনের মধ্যে শরীর সবল ও মাংসাল হইয়া উঠে।

গ্রিপ্ ডম্বেল্ ভাঁজা, ডন্‌ফেলা ও বৈঠককরা একত্রে সম্পাদিত হইলে শরীরের প্রায় সমস্ত পেশীই সম্যক্‌রূপে পরিচালিত হইয়া থাকে। এই তিনটী ব্যায়াম সহজসাধ্য এবং সকল স্থানেই সর্ব্বসময়ে সকলেরই দ্বারা অনুষ্ঠিত হইতে পারে। এই তিনটী ব্যায়াম প্রত্যহ অভ্যাস করিলে দেহের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দৃঢ়, বলিষ্ঠ ও পূর্ণবিকাশ প্রাপ্ত হইতে পারে।

বয়স অধিক হইলে অথবা অন্য কোন কারণে শ্রমসাধ্য ব্যায়াম নিষিদ্ধ হইলে পদব্রজে ভ্রমণ অতি প্রশস্ত ব্যায়াম। সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে দুইবেলা অন্ততঃ ৩।৪ ক্রোশ ভ্রমণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহা না হইলে ভ্রমণের উপকারিতা লাভ করা যায় না।

দুর্ব্বল শরীরে কাহার কতটুকু ব্যায়াম করা উচিত, তাহার নির্দ্দেশ করা সুকঠিন। এরূপ অবস্থায় ব্যায়ামের মাত্রা কিঞ্চিদধিক হইলে শরীর আরো দুর্ব্বল ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। দুর্ব্বল ব্যক্তির বিশেষ ক্লান্তি অনুভব না করা পর্য্যন্ত ব্যায়াম করিলে কোন অনিষ্ট হয় না।

যাহাদের নিজ নিজ কার্য্যোপলক্ষে অধিক শারীরিক পরিশ্রম করিবার প্রয়োজন হয়, তাহাদের ব্যায়ামের পরিমাণ তদনুসারে কম হওয়া উচিত। তবে সমস্ত দিনের

প্রভৃতি স্বল্প শ্রমসাধ্য ব্যায়ামে নিযুক্ত থাকিলে শরীর ও মন উভয়েরই সচ্ছন্দতা সাধিত হইয়া থাকে।

এস্থলে আর একটী কথা বলিয়া ব্যায়ামের আলোচনা শেষ করিব। আমাদের সমাজে শিক্ষা প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় ব্যায়াম-অভ্যাসও স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে আবশ্যক বলিয়া আমরা মনে করি না। অবশ্য সাধারণ গৃহস্থ পরিবারের রমণীদিগের শ্রমসাধ্য গৃহকার্য্য করিবার আবশ্যক হয়, সুতরাং উহাদ্বারা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিচালনা কতক পরিমাণে সম্পাদিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই সকল কার্য্যে সমস্ত অঙ্গের পরিচালনার সুবিধা হয় না এবং অনেক স্ত্রীলোকের পক্ষেই ঐটুকু পরিশ্রম স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট নহে। নিম্নশ্রেণীর রমণীরা পথ চলা, জল তোলা, ধান ভানা, মোট বহা, নিজেদের কাপড় কাচা, বাটনা বাটা, বাসনমাজা, গো-সেবা প্রভৃতি নানাবিধ গৃহকার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া থাকে এবং সেইজন্য তাহাদের দেহের মধ্যে স্বাস্থ্য, সামর্থ্য ও সৌষ্ঠবের একত্র সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদিগের অবস্থাপন্ন "বড় লোকের" ঘরের মেয়েরা শ্রমসাধ্য গৃহকার্য্য হইতে অনেক সময়ে একেবারেই অবসর গ্রহণ করিয়া থাকেন, সুতরাং কোনরূপ অঙ্গচালনার অভাবে তাঁহাদের শরীর অতিশয় স্থূল ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। পরিশ্রমের অভাবহেতু অজীর্ণ কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি নানাবিধ রোগে তাঁহারা প্রায়ই কষ্ট পাইয়া থাকেন এবং তাঁহাদের মনও সর্ব্বদা অপ্রফুল্ল হইয়া থাকে। ইহাদ্বারা

পার্ব্বতীর শিবারাধনা

(প্রাচীন চিত্র)

[চিত্রের অধিকারী ডাঃ এ. কে. কুমারস্বামী মহাশয়ের প্রদত্ত ফটোগ্রাফ হইতে]

তাহা কাহাকেও বুঝাইবার আবশ্যক নাই। মাতার দেহ দুর্ব্বল ও অসুস্থ হইলে তাঁহার সন্তান সন্ততি কখনই সুস্থ ও সবল হইতে পারে না। বিশেষতঃ যখন মাতাকে দুগ্ধ দান করিয়া শিশু সন্তান পালন করিতে হয়, তখন তাঁহার দেহ সম্পূর্ণ নীরোগ ও সবল না হইলে, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে শিশু চিরদিনের জন্য রুগ্ন ও দুর্ব্বল হইয়া থাকে। সমাজ, একাঙ্গের উন্নতি দ্বারা, কখনই পূর্ণতা লাভ করিতে পারিবে না। স্ত্রী পুরুষের শিক্ষাপ্রণালী এক ছাঁচে গঠিত হওয়া উচিত নহে, ইহা আমরা অবশ্য স্বীকার করি, কিন্তু যেরূপ শিক্ষা স্ত্রীলোক ও পুরুষকে "মানুষ" করিয়া তুলিবার উপযোগী, তাহা সমভাবে অনুশীলিত না হইলে সমাজ কখনই সর্ব্বাঙ্গীন পরিপুষ্টি লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। এই জন্য পুরুষের ন্যায় রমণীদিগের কোন না কোনরূপ ব্যায়াম অভ্যাস করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

কোনরূপ যন্ত্রাদি লইয়া ব্যায়াম অভ্যাস করিতে অধিকাংশ মহিলাই সবিশেষ লজ্জা বোধ করিয়া থাকেন। যদি অবসর হয়, তবে যন্ত্রব্যতীত কিরূপ ভাবে ব্যায়াম করিলে সমস্ত শরীরেরই সম্যক পরিচালনা হইতে পারে এবং যাহা স্ত্রীলোকেরা অপ্রকাশ্যভাবে নিজ নিজ গৃহ মধ্যে অনুশীলন করিতে পারেন, তাহার একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ ভবিষ্যতে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচুনীলাল বসু।

স্বামী লড্ডু ও পেড়া

প্রথম পরিচ্ছেদ।

যাঁহারা "দগ্ধকচু" পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা সবিশেষ জানেন যে কতকগুলি অভাবনীয় ও রহস্যজনক ঘটনা চক্রে পড়িয়া আমার অপূর্ব্ব পদবী পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ছিলাম "মেঘনাদ মিত্র" এক্ষণে আমি "মেঘনাদ শত্রু" নামে সুপরিচিত।

সঙ্গগুণে কি না হয়? আমার নাম পরিবর্ত্তনের ইতিহাস বড়ই অদ্ভুত বটে,—কিন্তু আমার সঙ্গমাহাত্ম্যে স্বামী লড্ডু ও পেড়ার যে বিস্ময়জনক নাম পরিবর্ত্তন হইয়াছে কাহিনী বিবৃত করিতেছি—আপনারা অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন।—

প্লেগের দৌরাত্ম্যে জব্বলপুর ত্যাগ করিয়া, সিউনী ও বিলাসপুরে পাঁচ ছয় মাস যার পর নাই কষ্ট পাইয়া আবার ট্রেণে চাপিয়া জব্বলপুরে ফিরিয়া যাইতেছি। আমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্রয়—কুমার, শৈলেন ও গৌরীশঙ্কর। আমরা চারি জনেই এক কম্পার্টমেণ্টে বসিয়া আছি। বট্‌নী জংসন পঁহুছিবার কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে প্রায় রাত্রি নয়টার সময়ে ট্রেণ 'পেণ্ড্রা' ষ্টেশনে থামিল তখন একজন

সন্ন্যাসী আসিয়া আমাদের কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

বিড়ালচক্ষু, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, অতি স্থূল শরীর, প্রকাণ্ড ভুঁড়ি! তাঁহাকে দেখিলেই হাসি আসে। বহু কষ্টে হাস্যসম্বরণ করিয়া আমরা সকলে স্বামীজির পদধূলি গ্রহণ করিলাম। স্বামীজি হিন্দুস্থানী—আমাদের সাদর সম্ভাষণে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন "জীতে রহো বচ্চা"। স্বামীজি বাঙ্গালাও জানেন। যখন স্বামীজি অযাচিত হইয়া প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে "আমার নাম স্বামী লড্ডু ও পেড়া" তখন আমরা উচ্চরোলে হো হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলাম। স্বামীজি ঈষৎ রুষ্ট হইয়া বলিলেন "তোমরা হাসিতেছ কেন?" কুমার হাসিয়া উত্তর করিল "কি করি স্বামীজি!" রক্তমাংসের শরীর;—না হাসিয়া থাকিতে পারা যায় না। এমন সৃষ্টিছাড়া নাম ত কস্মিন্ কালেও শুনিনি! স্বামী অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, স্বামী চিব্বনানন্দ, স্বামী ভোজনানন্দ, স্বামী বম্ ভোলানাথ টন্ গণেশ, স্বামী ঘেঁও বা ভেঁও, কত আজগুবি নাম শুনিয়াছি! কিন্তু স্বামী লড্ডু ও পেড়াজি!—আপনি সকলকে নামগরিমায় পরাস্ত করিয়াছেন।

শৈলেন হাসিয়া বলিল "আর এক কারণে আমরা হাসিতে বাধ্য। আপনার গোলাকার উদরভাণ্ডটি একটি সুবৃহৎ globe বিশেষ। Eastern Hemisphere ও Western Hemisphere এর যত জ্ঞানামৃত ঐ ভাণ্ডে সঞ্চিত!" গৌরীশঙ্কর বলিল "স্বামী লড্ডু ও পেড়া না হইয়া আপনার নাম হওয়া উচিত ছিল—পূর্ণগোলাকারং।" স্বামীজি বলিলেন

—"ইহা আমার গুরুদত্ত নাম। স্বয়ং স্বামী আক্কেল পেট এই নামটি আমাকে দিয়াছেন!" তিনি একদা দর্শন দিয়া বলিলেন;—"বৎস, তুমি রাধাকৃষ্ণের ধ্যানে সর্ব্বদা নিমগ্ন থাক! রাধানাম লড্ডুর মত সুমিষ্ট ও কৃষ্ণনাম পেড়ার মত সুমিষ্ট,—এজন্য অদ্যাবধি তোমার গুরুদত্ত নাম রহিল—"স্বামী লড্ডু ও পেড়া!"—শৈলেন হাসিয়া বলিল—"আমরাও একএকটি প্রচ্ছন্ন স্বামীজি—প্রভেদমাত্র এই যে আমরা গেরুয়া বস্ত্র ধারণ করি না। আমার নাম "স্বামী খরমুজ ও তরমুজ!" কুমার হাসিয়া বলিল "আমার নাম স্বামী রাবড়ি ও মালাই।"

গৌরীশঙ্কর হাসিয়া বলিল—"আমার নাম—স্বামী কুল্‌ফি বরফ্!" আমি বলিলাম "আমার নাম স্বামী কুছ পরওয়া নহি।"

স্বামীজি উত্তর না দিয়া মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এই স্বামী লড্ডু ও পেড়া কে? আমাদের ঔৎসুক্যে ও আগ্রহাতিশয্যে ঘৃতাহুতি প্রদান করিবার জন্য যেন বিধাতা অবিলম্বে আর একটি লোককে পাঠাইয়া দিলেন! যখন ট্রেণ পালি ষ্টেশনে আসিয়া পঁহুছিল তখন একটী বৃদ্ধ আমাদের কক্ষে প্রবেশ করিল! সে বহুক্ষণ একদৃষ্টে বিস্ময়বিহ্বলনেত্রে স্বামীজির মুখারবিন্দ অবলোকন করিল! তাহার পর বলিল—"আপনার বাড়ী কি মিরজাপুর? আপনার নাম কি রামপ্রসাদ দূবে?"—বোধ হইল,—যেন স্বামীজি চমকিয়া উঠিলেন। তাহার পর বলিলেন—"কে?

রামপ্রসাদ দূবে? কই? আমি তাহাকে জানি না। আমার নাম—স্বামী লড্ডু ও পেড়া!" বৃদ্ধ কিঞ্চিৎ অপ্রস্তত হইয়া বলিল—"স্বামীজি, অপরাধ মাফ্ করিবেন। সে ব্যক্তির সহিত আপনার চেহারার বড়ই সাদৃশ্য—এই জন্য ভুল হইয়াছিল!"

আমরা সকলে সাগ্রহে বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলাম!—"রামপ্রসাদ দূবে লোকটা কে?" বৃদ্ধ বলিল, "সে ব্যক্তি মিরজাপুরে Cooly contractor ছিল। আসামে কুলি চালান দিত। বঞ্চকের শিরোমণি ছিল। তাহার প্রতারণায় অনেক যুবকযুবতীর সর্ব্বনাশ হয়। কাশী গোয়ালিনীর প্রেমে পড়িয়া তাহাকে লইয়া এই দূবে মিরজাপুর ত্যাগ করিয়া মণ্ডলায় পলাইয়া যায়। কাশীর স্বামী রামলাল পলাতকযুগলের অনুসরণ করিয়া মণ্ডলায় গিয়া উপস্থিত হয়। কাশীকে ধরিয়া তাহার মুখ Sulphuric Acid দিয়া পুড়াইয়া দেয়—কিন্তু দূবের মুখ পোড়াইতে পারে নাই। শুনিয়াছি দূবে পলাইয়া যায়;—দূবের পীঠ Sulphuric Acidএ পুড়িয়া গিয়াছিল। সে আজ দশ বৎসরের কথা তাহার পর আর আমরা রামপ্রসাদ দূবের সন্ধান পাই নাই?"

স্বামীজি মৌন হইয়া এসব কথা চিত্রার্পিতের মত শুনিতেছিলেন। যখন ট্রেণ অপর ষ্টেশনে আসিয়া থামিল, বৃদ্ধটি আমাদিগকে অভিবাদন করিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। আমরা চারিবন্ধু জনান্তিকে বলিতে লাগিলাম,—কিছুই বুঝা যাইতেছে না। এই স্বামীজিই কি সেই দ্রাবকদগ্ধ রামপ্রসাদ দূবে?"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আমরা গোপনে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলাম যে,—যদি স্বামীজি যথার্থই ভূতপূর্ব্ব রামপ্রসাদ দূবে হন, তাহা হইলে ইহাকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। মনের ভাব গোপন করিয়া আমরা আবার স্বামীজির পদধূলি লইলাম। সবিনয়ে বলিলাম—"স্বামীজি, এ দাসদিগের ধৃষ্টতা মাফ্ করুন, আমরা মূর্খ—আমরা আপনার মহিমা ও মর্য্যাদা কি বুঝিব?" আমাদের কাকুতি মিনতিতে সন্তুষ্ট হইয়া স্বামীজি বলিলেন, "আমি সাধু,—আমার চিত্তে 'গোস্বা' নাই,—আমি জব্বলপুরে যাইতেছি, তোমরাও জব্বলপুরে যাইতেছ, ভালই হইয়াছে!" আমি বলিলাম, "স্বামীজি, জব্বলপুর যাত্রীরা বট্‌নী ষ্টেশনে নামিয়া প্রায় এক ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া জব্বলপুরের ট্রেণে আরোহণ করে। আমরা ভোর বেলা সাড়ে চারটার সময় পঁহুছিব। এখন রাত্রি সবেমাত্র দশটা। আমাদের সঙ্গে ঘরে ঘৃতে ভাজা (ব্রাহ্মণী পাচিকা দ্বারা ভাজা) সুন্দর লুচি আছে—সুন্দর তরকারী আছে—সুন্দর মিষ্টান্ন আছে। আমরা এক্ষণে আহার করিব, আপনার সহিত আমাদের যখন এত আত্মীয়তা হইয়াছে তখন আপনিইবা সমস্ত রাত্রি উপবাসী হইয়া থাকিবেন কেন? আপনি গুরুতুল্য—আমরা আপনার শিষ্য। আপনি লুচি, তরকারি, মিষ্টান্ন, প্রসাদ করিয়া দিন, তাহাতে আমাদের কল্যাণ হইবে। ইহাতে আপনার আপত্তি আছে কি?" স্বামীজি সুপ্রসন্নচিত্তে বলিলেন "কোনো

স্বামীজি ও আমরা সপরিতোষে সমস্ত ভোজ্যদ্রব্যগুলিকে উদরসাৎ করিলাম। স্বামীজি বড়ই প্রফুল্ল হইলেন। ভোজনের সময়ে কেবল দুই একবার মুখ বিকৃত করিয়া বলিয়াছিলেন :—"ইয়হ করয়লা কা কলৌজি বহুতি কড়ুয়া হয়।" শৈলেন সহাস্যে বলিল "কেন স্বামীজি! করয়লা স্বভাবতঃই তিক্ত হয়।" ভোজনান্তে স্বামীজি ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। আমরা চারিজনে জাগিয়া পাহারা দিতে লাগিলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

যখন রাত্রি ৪টা ও ট্রেণ কট্‌নী জংসনের নিকটবর্ত্তী, তখন কুমার চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল!—"এইবার কট্‌নী,—সাবধান,—পোঁটলা পুট্‌লী সব ঠিক করিয়া রাখ, নামিতে হইবে।"

শৈলেন চীৎকার করিয়া বলিল "এ কে সটান পড়িয়া আছে?"

গৌরীশঙ্কর বলিল "এ যে স্ত্রীলোক,—এ মাগী আবার কোন্ সময়ে এ ঘরে ঢুকল? আশ্চর্য্য! ইহাকে আমরা দেখিতে পাই নাই!"

আমি বলিলাম "খুব আশ্চর্য্য! আমরা সমস্ত রাত্রি পাহারা দিয়াছি, কি পুরুষ, কি স্ত্রী, কাহাকেও ঢুকিতে দিই নাই!" এ আবার কোথা হইতে আসিল?"

শৈলেন বলিল "এ মাই, এ মাই, উঠো উঠো, কটনি আয়া! বাপ! এমন ঘুম ত কস্মিন্ কালেও দেখি নাই! এত হাঁকডাকে কুম্ভকর্ণেরও নিদ্রাভঙ্গ হইত!"

উঠাইয়া দাও", গৌরীশঙ্কর বলিল,—"শক্ত সমস্যা,—স্ত্রীলোকের গাত্রে কেমন করিয়া হাত দি!

শৈলেন বলিল "এ নিশ্চয় কোন মারহাট্টী স্ত্রীলোক; কাছার ঘটাটা দেখেচো!"

কুমার বলিল, কখনই মারহাট্টী নয়, মারহাট্টী হইলে এত ঘোমটার ঘটা!"

বাস্তবিক আমরা কখনও এমন অবগুণ্ঠনের ঘটা দেখি নাই!"

কুমার বলিল, "এ . ব খনই নিদ্রিতা—নয়, এ নেশায় চুর!"

আমি বলিলাম, "তা কখনও হয়? স্ত্রীলোক কখন নেশা করে? সম্ভবতঃ ইহার কোন ব্যারাম আছে!"

শৈলেন বলিল, "এখন উপায়!"

গৌরীশঙ্কর বলিল, "এই দেখুন, ইহার আঁচলে টিকিট বাঁধা। আশ্চর্য্য! এ স্ত্রীলোকটাও জব্বলপুরে যাইবে!"

টিকিটটা যথাস্থানে রাখিয়া গৌরীশঙ্কর বলিল, "এ স্ত্রীলোকটার আগমন বড়ই mysterious!"

কুমার হাততালি দিয়া বলিল, "She has dropped from the clouds! কিন্তু একি? স্বামী লড্ডু ও পেড়া কোথায়? কই? কই? এ compartmentএ তো তিনি নাই!"

শৈলেন বলিল, "Fled, bolted, mysteriously disappeared!"

গৌরীশঙ্কর একখানি খুর খাপে পুরিয়া যথাস্থানে পোর্টম্যাণ্টোর ভিতরে রাখিয়া সহাস্যে বলিল, "Murdered in cold

আমি বলিলাম, "ঠাট্টা নয়! তোমরা তাহাকে ছুড়িয়া trainএর বাহিরে ফেলিয়া দাও নি তে?"

কুমার সহাস্যে বলিল, "সম্ভবতঃ, দিয়াছি! The man richly deserved it!"

শৈলেন বলিল "স্বামী লড্ডু ও পেড়া!— Where art thou? Oh where?"

গৌরীশঙ্কর বলিল "An echo answers Where?"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ট্রেণ যথাসময়ে কট্‌নি জংসনে উপস্থিত হইল। কিন্তু স্বামীজি কোথায়? কই? তাঁহাকে ত দেখিতে পাইতেছি না!

Guard ও Ticket collectorকে জানাইয়া অর্দ্ধ সুপ্তোত্থিতা রমণীটিকে ধরাধরি করিয়া আমরা Jubbulpore যাইবার coresponding trainএ Female Comprtmentএ বসাইয়া দিলাম। সে অবগুণ্ঠন খুলিয়া একবার চারিদিকে তাকাইয়া দেখিল,—তারপর আবার ঢুলিয়া পড়িল। আশ্চর্য্য! এ কি নিদ্রা? না মাদকদ্রব্যের শক্তি?

অবশ্য আমরা অন্য এক compartmentএ গিয়া বসিলাম।

গৌরীশঙ্কর হাসিয়া বলিল, "Gumএর শিশিটা আমার পকেটে রহিয়া গিয়াছে। তোমরা বসিয়া থাক, আমি আমার সে কাজটাও সারিয়া আসি!"

গৌরীশঙ্কর ফিরিয়া আসিয়া trainএ বসিবার দশ মিনিট পর গাড়ি ছাড়িয়া দিল! তখন যদিও রাত্রি প্রায় ভোর—তবুও চারিদিকে ঘোর অন্ধকার। শৈলেন গান ধরিল!—

কত মায়া জান ওগো ভুবনমোহিনী!
কভু নর, কভু নারী, কভু গেরুয়া বস্ত্রধারী,
বলিহারী ওগো কুহকিনী!
কভু তব দাড়ি গোঁফ, অকস্মাৎ পায় লোপ,
কাছা আঁটি সাজ গো রমণী!

আমি বলিলাম, "আমরা এখন্ হাসিব না। হাস্যরস conserved হইয়া থাকুক! জব্বলপুর ষ্টেশনে পঁহুছিয়া খুব হাসিব!

* * * *

আমরা যখন জব্বলপুরে ষ্টেশনে গিয়া পঁহুছিলাম ও ট্রেণ হইতে নামিলাম,—তখন দেখিলাম, Femle Compartmentএ হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দ হইতেছে! কতকগুলি বীরাঙ্গনারূপিণী হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোক প্রাগুক্তা মারহাট্টাবস্ত্রধারিণী স্ত্রীলোকটীকে বেদম মারিতেছে! সে তখন সংজ্ঞালাভ করিয়া, "নারায়ণ! নারায়ণ! মারডালা! মারডালা! বলিয়া ঘোর চীৎকার করিতেছে! কোলাহলে আকৃষ্ট হইয়া, Station Master, Ticket Collector, Guard, Cooly, যাত্রীরা—এক রাশ লোক সেই স্থলে আসিয়া জড় হইল! Female Compartmentএর একটী প্রমীলাসুন্দরী চীৎকার করিয়া বলিতেছেন "ইহাকে পুলীশে দাও"; আর একটী চিত্রাঙ্গদা সকঙ্কণহস্তে মারিতে মারিতে বলিলেন, "মারো, মারো, বদমাস্ কো মারো!"

রেলওয়ে কর্ম্মচারীরা ধরাধরি করিয়া এই অদ্ভুত মূর্ত্তিটাকে বাহিরে টানিয়া আনিয়া Platformএ ফেলিয়া বেদম্ মারিতে লাগিল! সে মারের আর বিশ্রাম নাই। মূর্ত্তিটি

চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল "জান্ গয়া—মত্ মারো,—মত্ মারো!—মত্ মারো, হমারা কুছ কসুর নহি" কে কার কথা শুনে? শিলাবৃষ্টির মত মূর্ত্তিটির শরীরে কিল চাপড় বৃষ্টি হইতে লাগিল! তারপর, যখন মূর্ত্তিট "নারায়ণ নারায়ণ" করিয়া সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল ও বলিল "সাধুকো মত্ মারো, মত্ মারো, হম স্বামী লড্ডু ও পেড়া হ্যায়!" Station Master সহাস্তে বলিলেন "স্বামী কোন্?" মূর্ত্তি উত্তর দিল, "স্বামী লড্ডু ও পেড়া" তখন চতুর্দ্দিকে হো হো হো শব্দে হাস্যরোল উঠিল। শত শত হাস্যের ফোয়ারা ছুটিল! ষ্টেশন মাষ্টার উচ্চহাস্যে বলিলেন, "স্বামী লড্ডু ও পেড়া! Are you the Man who sings the laughing song in the Gramophone and makes our shoulders burst with laugh." একজন Booking Clerk বলিলেন, "yes! He was just come out in flesh and blood from the phonography.

শৈলেন উচ্চহাস্যে বলিলেন, "Look! Look! what is that on his face!" তখন সকলেই সবিস্ময়ে দেখিল স্বামীজির একগালে গোবর আর একগালে মাটী ও তাঁহার কপালে একখণ্ড কাগজ ও তাহাতে বড় বড় হিন্দি অক্ষরে লেখা আছে,—"স্বামী মট্টি ও গোবর!"

তারপর সেই Railway Platform এ যে হাসির তরঙ্গ উঠিল তাহা বর্ণনাতীত। এ যেন ষ্টার থিয়েটারে "যেমন কর্ম্ম তেমনি ফলে"র অভিনয় হইতেছে,—যেন এমারেল্ড থিয়েটারে

আমি সহাস্যে বলিলাম, "স্বামীজি! অদ্যাবধি আপনি, স্বামী মট্টী ও গোবর নামে দেশে দেশে পরিচিত হইবেন। আমার সঙ্গ গুণে আপনার নাম পরিবর্ত্তন হইল।" কুমার বলিল, "সব creditটা আপনার নয়। আমার এ হাতের সাফাইটা মানিতেই হইবে। কেমন খুব দিয়া স্বামীজির দাড়ি ও গোঁফ—এক মিনিটে সাবাড় করিয়াছি!" গৌরীশঙ্কর বলিল, "কতকটা হাতের সাফাই আমারও বটে! কেমন কাগজে, 'স্বামী, মট্টী ও গোবর' লিখিয়া স্বামীজির কপালে গঁদ দিয়া affix, করিয়া দিয়াছি,—ও কেমন চট্ করিয়া গিয়া কটনি ষ্টেশনে আমার Goods clerk বন্ধুর বাটী হইতে মাটী ও গোবরের সংগ্রহ করিয়া স্বামীজির দুই গাল মাটী ও গোবরে রঞ্জিত করিয়া দিয়াছি!" কুমার সহাস্যে বলিল "সকলের চেয়ে বেশি creditটা আমার! যদি Medical Collegeএ তিন বৎসর পাঠের অভিজ্ঞতা না থাকিত ও সঙ্গে chlorodyne ও Potassium Bromide না থাকিত তাহা হইলে বঙ্কুবিহারী হঠাৎ শ্রীমতী রাধিকাসুন্দরী হইতেন কিরূপে? শৈলেন বলিল, "আমারও কতকটা credit আছে। মারহাট্টী বাইর এই ২৪ হাতের অনন্ত দ্রৌপদীর সাড়ীখানি যদি আমার পোর্টম্যাণ্টোতে না থাকিত তাহা হইলে সবই ফাঁশ হইয়া যাইত! গৌরীশঙ্কর হাসিয়া বলিল "আমি কেমন গেরুয়া বস্ত্রের উপরই সাড়ি খানি পরাইয়া দিয়াছিলাম—কেমন ঘোমটার ঘটা হইয়াছিল। আমি বলিলাম, সকলের চেয়ে credit দৈবের! রাত্রি

পাহারা ও নিষেধ সত্ত্বেও যদি কোনো passenger গাড়িতে উঠিয়া পড়িত তাহা হইলে এ farceটা কখনই well-played হইত না।”

শৈলেন হাসিয়া বলিল, “passenger উঠিত কেমন করিয়া? এই দেখ, Railway চাবি!”

কুমার বলিল, “স্বামী, মট্টী ও গোবর, বৃদ্ধটী যখন আপনার কীর্ত্তি বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে আপনার নাম ধরিয়া ডাকিয়াছিল, তখন আপনি চমকিয়া উঠিয়াছিলেন? আপনি আহারান্তে যখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন তখন আপনার দ্রাবকদগ্ধ পীঠ ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া সমস্ত সন্দেহ ভঞ্জন করিয়াছি—তা না হইলে আপনার এতটা নাকাল হইত না!

স্বামীজি চিবুকে হস্ত দিয়া সখেদে বলিলেন “হামারো দাড়ি কহাঁ গয়া?”

সেই সময় মঢ়াতালের প্রসিদ্ধ হরবোলা সেখানে ছিল! সে বলিল “স্বামী মট্টী ও গোবর! কোয়েল হোকর আপকা দাড়ি উড় গয়া—কু-কু-কু-পাপিহা হোকর আপকা মোঁছ উড় গয়া—পিউ—পিউ—পিউ!

হাসিতে হাসিতে সকলের দম্ আট্‌কাইয়া যায়! ওঃ কি হাসি! কি হাসি!

একটি বাঙ্গালী ভদ্রলোক বলিলেন, “আমাদের গ্রামের বামী গোয়ালিনীর নাসিকাটি ঠিক বাঙ্গালা অক্ষর “ব” এর মত ছিল! তাহার নাকের নীচে নোলক দেখিয়া কমলাকান্ত ঠাকুরদাদা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোর নাম কি?”

সে উত্তর করিল “বামি”! ঠাকুরদাদা সহাস্যে বলিলেন “তোর নাসিকরূপ “ব”য়ের নীচে শূন্যরূপ নোলক রহিয়াছে, আজ হইতে বামি নস্—তুই ‘রামি’।

সে দিন আমরা খুব হাসিয়াছিলাম! আজ আবার সেই দম্ আট্‌কানো হাসি!

আর একটী বাঙ্গালী ভদ্রলোক বলিলেন, “বিলাসপুরে স্বামী ক্রোধানন্দ আসিয়া এক গৃহস্থের বাড়ীতে ছিলেন। গৃহস্থটি গরীব! সে স্বামীজিকে এক থাল লুচি না দিয়া—এক থাল পরোঠা দিয়াছিল। সার্থকনামা ক্রোধান্দ স্বামী ক্রোধান্ধ হইয়া পরোঠার থাল আছাড় মারিয়া উঠানে ফেলিয়া দেন! সেই অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া কতকগুলি গোঁয়ার গোবিন্দ লোক স্বামীজির সর্ব্বাঙ্গে চপেটাঘাত করিয়া বলে, “স্বামীজী, আজ হইতে আপনি স্বামী ক্রোধানন্দ নহেন,—আপনি স্বামী চপেটানন্দ!”—সে দিন আমি খুব হাসিয়াছিলাম—আজ আবার সেই হাসি!

মহারাষ্ট্রী বস্ত্রখানি পরিত্যাগ করিয়া যখন আমার এই রঙ্গরহস্য পূর্ণ গল্পের নায়ক রঙ্গভূমি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছিলেন, তখন সকলেই করতালি দিয়া বলিয়া উঠিল, “স্বামী, মট্টী ও গোবর কি জয়! স্বামী মট্টী ও গোবর কি জয়!”

শ্রীমেঘনাদ শক্র।

আমার বাল্যকথা

৬

পূর্ব্বে বলেছি যে পূর্ব্বে আমরা দুই কাকার সঙ্গে একান্নবর্ত্তী পরিবারভুক্ত ছিলাম। তখন ঠাকুর পরিবারের অন্যান্য শাখার মধ্যেও যথেষ্ট সদ্ভাব ও ঘনিষ্ঠতা ছিল। ভিন্ন ভিন্ন বাড়ীর ছেলেরা আমাদের বাড়ীর দালানে গুরুমশায়ের কাছে ক খ শিখতে আসত। গুরুমশায়ের কাছে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষায় হাতে খড়ি। সেই উগ্রচণ্ডা গুরুমশায় বেত্রহস্তে শেখাতে বসেছেন, কখনো বা সে বেত তাঁর কোন ছাত্রপৃষ্ঠে চালিত হচ্ছে—সে চিত্র মন থেকে কখন যাবে না। আমরা গুরুমহাশয়কে কি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মনে করতুম—ঠিক যেন Goldsmithএর সেই গ্রাম্য গুরুমশায়—

> And still they gazed and still the
> wonder grew
> That one small head could carry
> all he knew.

> অবাক্ হইয়া দেখে, না জানি কি ক'রে
> অত বিদ্যা ওই ক্ষুদ্র মাথার ভিতরে।

আমরা গুরুমশায়ের কাছে ক খ, বানান, নামতা কড়াঙ্কে ষটকে—এই সব শিখতুম, তাছাড়া চিঠিপত্র লেখা অভ্যাস করতুম। যত ওঁচা ফ্যালা, জিনিস মোড়বার মত ব্রাউন কাগজ আনা হত—শ্রীরামপুরে সাদা কাগজ যেদিন আসত খুব ভাগ্যি মনে করতুম। এই কাগজের উপর বাঙ্গলা কলম দিয়ে আঁচড়কাটা—সেই আমাদের পত্রলেখা। যতদূর মনে আছে 'আজ্ঞাকারী শ্রী'—দিনের পর দিন বদলে বদলে এই দুই পাঠ লেখা হচ্ছে। এখন দেখতে পাই বাঙ্গলা চিঠিতে পাঠ লেখা বড় সহজ ব্যাপার নয়। বয়োজ্যেষ্ঠ গুরুজন, স্নেহের সম্পর্কীয় কনিষ্ঠ, ছোট বড় আত্মীয় স্বজন বন্ধু, অপরিচিত দূরের লোক, formal informal—বাঙ্গলায় কাকে কি পাঠ, ও কোন্ সময় কি পাঠ লিখতে হয় সে এক বিষম সমস্যা। গুরুমহাশয় এই বিষয় আমাদের মনোযোগ দিয়ে শেখালে ভবিষ্যতে অনেক কাজ দেখত। তবে ওরূপ মূর্খ-পণ্ডিতের কাছে বেশী কিছু প্রত্যাশা করা অন্যায়, আমরা ঐ গুরুর কাছে লেখাপড়ায় বেশী দূর না এগিয়ে থাকি—নিদেন গোড়া পত্তন সেই।

উপনয়ন

৯ বৎসর বয়সে আমার উপনয়ন হয়, ঘটনাটি বেশ মনে পড়ে। কর্ণভেদ শিরো-মুণ্ডন এগুলি যদিও ভাল লাগেনি কিন্তু নাপিতের উপর বিদ্রোহাচরণ করেছিলুম বলে মনে হয় না। হবিষ্যান্ন ভোজনে বেস তৃপ্তি লাভ করতুম, ভালই হোক্ মন্দই হোক্ রোজকার ডালভাতের চেয়ে রুচিকর। ভিক্ষার ঝুলি কাঁদে করে 'ভবতি ভিক্ষাং দেহি' ব'লে উপবীতধারী ব্রহ্মচারী সাজা, তিন দিন ঘরে বন্ধ হয়ে থাকা পাছে শূদ্রের মুখ দেখে ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হয়, এই চিরন্তন হিন্দুপ্রথা অনুসারে আমার পইতা হ'ল। কারাবাস হতে মুক্তির পর ন্যাড়া মাথায় বাড়ীময় ঘুরে ব্যাড়ানো আর সকলের কাছ

মনে মনে কত গর্ব্ব হচ্ছে—যেন আমি কি একটা ধনুর্দ্ধর হয়েছি, অথচ ব্রহ্মচর্য্য কাকে বলে মানবক সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। ব্রহ্মচর্য্যের ব্যাখ্যা ক'রে আমাদের পুরুত ঠাকুর কোন উপদেশ দেন নাই। কেহ আমাদের বলে নাই 'আচার্য্যাধীনো বেদমধীস্ব'—আচার্য্যাধীন হইয়া বেদাধ্যয়ন কর,—অথবা 'অধীহি, ভোঃ সাবিত্রীং মে'—আমার নিকট গায়ত্রী শিক্ষা কর। 'মা দিবা স্বাপ্সীঃ,—দিবানিদ্রা যেয়োনা—বলে আমাদের কেহ সাবধান করে দেয়নি, আর আমরা ও আরামের জিনিসটা অনেকদিন পর্য্যন্ত আঁকড়ে ধরে ছিলুম। তিন দিন ঘরে বন্ধ থাকা যে দ্বাদশ বৎসর গুরুকুলে বেদাধ্যয়ন করা—তা আমরা বুঝি নাই। ব্রাহ্মণ শূদ্রের মধ্যে যে জাতিগত পার্থক্য (বৈদিককালে যেমন আর্য্য আর দস্যুর মধ্যে) সেই ভেদবুদ্ধি ফুটিয়ে তোলা যদি ঐ নিয়মের উদ্দেশ্য হয়, সেটা সিদ্ধ হয়েছিল বলতে হবে। কতকগুলি সন্ধ্যার মন্ত্র আবৃত্তি করতে শিখেছিলুম তার মানে না বুঝে।—এখন দেখছি যে শব্দগুলি আওড়াতুম তার অর্থ—বারিবন্দনা।

ওঁ শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ শমনঃ সন্তু কুপ্যাঃ শন্নঃ সমুদ্রিয়া, কুয়ার জল আমাদের মঙ্গল করুক—সমুদ্রের জল মঙ্গল করুক ইত্যাদি। কূপোদককে কথা শোনানো সহজ, সে জল পরিষ্কার রাখা আমাদেরই হাতে কিন্তু সমুদ্র সকল সময়ে রাস মানেন না, টাইটানিক জাহাজ ডুবিই তার জলন্ত প্রমাণ!—এই সন্ধ্যা তুবার আবৃত্তি করবার নিয়ম—কিন্তু ঐ নিয়ম বেশীদিন পালন করেছিলুম বলে বোধ হয় না। পরে আমরা মহর্ষির উপদেশে জানলুম যে উপবীত গ্রহণের মুখ্য তাৎপর্য্য—গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষা।—তা হতেই আমাদের নূতন জন্ম—তখন থেকে আমরা দ্বিজ। ব্রহ্মসাধনের অঙ্গরূপে গায়ত্রী মন্ত্রের উপর পিতৃদেবের কতটা আস্থা ছিল তা তাঁর আত্মচরিতে দেখতে পাই। তিনি বলছেন—

"পুরুষানুক্রমে আমরা এই গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া আসিতেছি। এই মন্ত্র আমাদের শিরায় শিরায়। যদিও আমি বুঝিলাম যে, ব্রহ্মোপাসনার জন্য গায়ত্রী সাধারণের পক্ষে উপযুক্ত নহে, কিন্তু আমি সেই সাবিত্রী দেবীকেই ধরিয়া রহিলাম, কখনো পরিত্যাগ করিলাম না। গায়ত্রীর গূঢ় ভাবার্থ আমার মনে দিন দিন আরো প্রকাশ হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে 'ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ' আমার সমস্ত হৃদয়ে মিশিয়া গেল। ইহাতে আমার দৃঢ় নিশ্চয় হইল যে, ঈশ্বর আমাকে কেবল মূক সাক্ষীর ন্যায় দেখিতেছেন, তাহা নহে। তিনি আমার অন্তরে থাকিয়া অনুক্ষণ আমার বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন। ইহাতে তাঁহার সহিত একটি ঘনিষ্ঠ জীবন্ত সম্বন্ধ নিবদ্ধ হইল।" ৪৫-৪৬ পৃঃ।

আমাদের মধ্যে উপনয়ন প্রথা সাধারণত যে ভাবে প্রচলিত আছে তাহা অর্থহীন আড়ম্বর মাত্র। বৈদিক ক্রিয়া সংক্ষেপে সারিয়া ফেলা—ঐ ক্রিয়ার সারভাগ পরিত্যাগ ক'রে যেন শুধু খোলসটা রাখা হয়েছে। পিতৃদেব যে ভাবে উপনয়নকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেছেন তাতে প্রাচীন প্রথার কাছাকাছি যতটা রাখা যেতে পারে তার চেষ্টা করা হয়েছে। আদি ব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠান

পদ্ধতির উপনয়ন ভাগ দেখলেই তাহা স্পষ্ট বোধগম্য হয়।

এই অনুষ্ঠানে গায়ত্রী মন্ত্রের শ্রেষ্ঠতা রক্ষিত হয়েছে। ব্রহ্মচারীর প্রতি উপদেশে এই মন্ত্রের বিশদ ব্যাখ্যা দৃষ্ট হবে। সেই উপদেশের সারমর্ম্ম এই ঃ—

"গায়ত্রী মন্ত্র তোমাদের ইহকালের অবলম্বন, পরকালের সম্বল। সেই মন্ত্র দ্বারা ঈশ্বরকে মনন করিবে, তাঁর জ্ঞান শক্তি ধ্যান করিবে। ওঁ বলিয়া ব্রহ্মকে অন্তরে জানিবে এবং ভূর্ভুবঃ স্বঃ বলিয়া স্বর্গমর্ত্ত্য অন্তরীক্ষ বহির্জ্জগতে তাঁহার আবির্ভাব দেখিবে। তিনি এই বিশ্বসংসার রচনা করিয়া আমাদের কাহারো নিকট হইতে দূরে নাই—তিনি আমাদের অন্তরে থাকিয়া আমাদের প্রত্যেককে শুভবুদ্ধি প্রেরণ করিতেছেন—'ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ'।" গায়ত্রী মন্ত্রের অর্থ এই।

পূজা

আমাদের বাড়ী দুর্গা ও জগদ্ধাত্রী—এই দুই পূজা হত। দুর্গোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হত। আমাদের উঠানের উপর সামিয়ানা খাটানো আর তিন দিন ধরে নৃত্য গীত আমোদ প্রমোদ, আমাদের আনন্দের আর সীমা থাকতো না। সেই তিন দিন আমরা যেন কল্পনাপ্রসূত এক নূতন রাজ্যে বাস করতুম —নূতন দেশ, নূতন ঋতু, আলো বাতাস সব নূতন। প্রথমে যখন প্রতিমার কাঠাম নির্ম্মাণ আরম্ভ হত তখন থেকে শেষ পর্য্যন্ত সমুদায় নির্ম্মাণ কার্য্য আমরা কৌতূহলের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করতুম। আমাদের চোখের সামনে যেন ছোট খাট একটি সৃষ্টি কার্য্য চলেছে। প্রথমে খড়ের কাঠাম তার উপর মাটি, খড়ির প্রলেপ তার উপর রং, ক্রমে চিত্র বিচিত্র খুঁটি নাটি আর আর সমস্ত কার্য্য, সবশেষে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি চালের পরে দেবদেবীর মূর্ত্তি আঁকা, তাতে আমাদের চখের সামনে বৈদিক, পৌরাণিক দেবসভা উদ্ঘাটিত হত। ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, কৃষ্ণলীলা, রামরাবণের যুদ্ধ, কৈলাসে
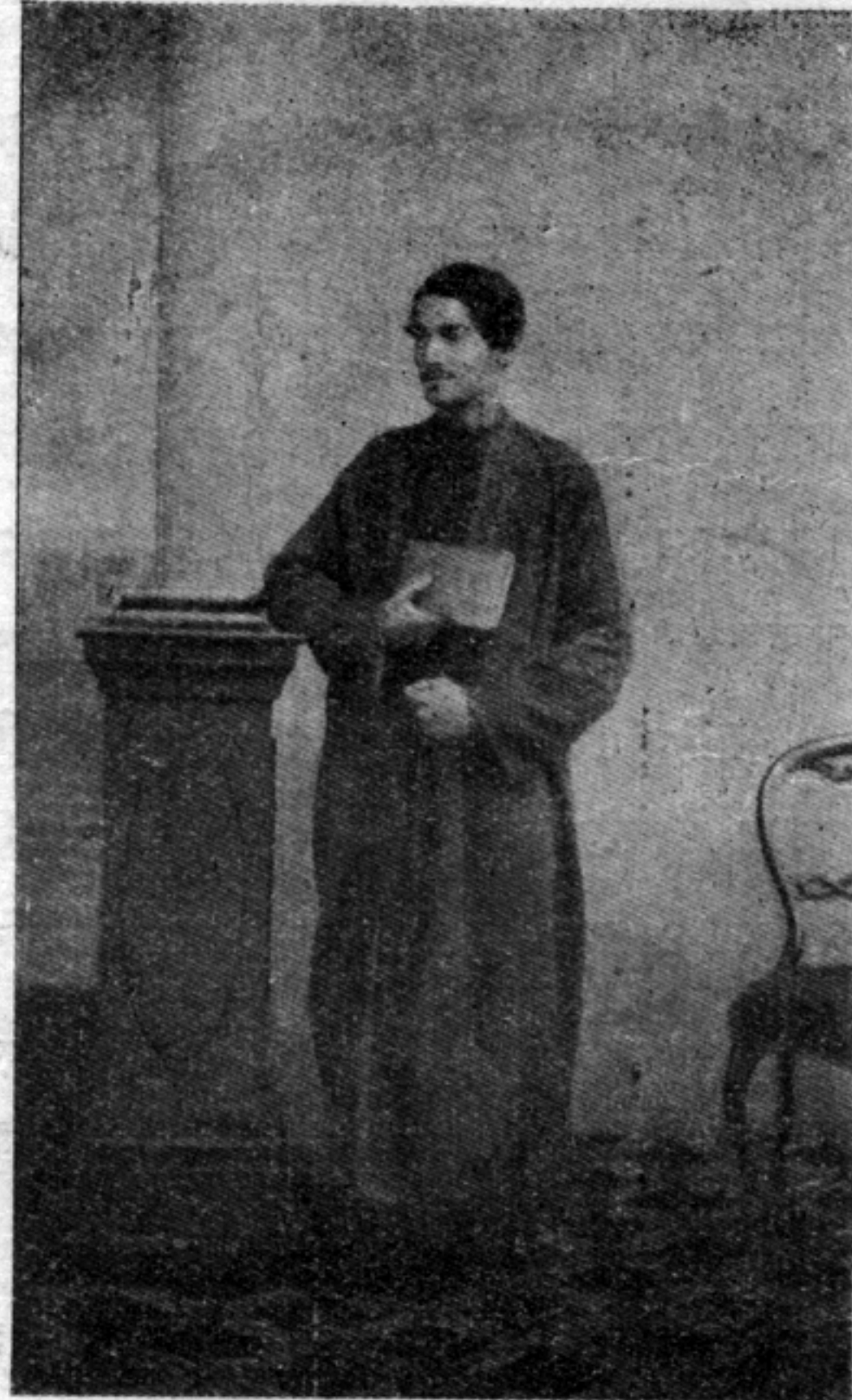
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাল্যচিত্র

হর পার্ব্বতী, নন্দী ভৃঙ্গি, হনুমান ও গন্ধমাদন, বীণাহস্তে নারদ মুনি, গরুড়বাহন বিষ্ণু, বিষ্ণুর অনন্ত শয্যা, নৃসিংহ অবতার, কিন্নর গন্ধর্ব্ব মিলিত ইন্দ্রসভা, গীতায় একাদশ সর্গে যেমন বিশ্বলোকের বর্ণনা আছে, আমাদের এই চর্ম্ম চক্ষে সেই বিশ্বলোক আবিষ্কৃত হত। রাংতা দিয়ে যখন ঠাকুরদের

দেহমণ্ডন, বসন ভূষণ সাজসজ্জা প্রস্তুত হত, আমাদের দেখতে বড়ই কৌতূহল হত। লক্ষ্মী সরস্বতীর চমৎকার বেশভূষা। লম্বোদর গজানন, গণেশ ঠাকুরের মূষিক তাঁর স্থূল দেহের আড়ালে লুকিয়ে থাকত কিন্তু,—কার্ত্তিকের প্যাখম ধরা ময়ূরের যে বাহার—তা আর কহতব্য নয়। কার্ত্তিক ঠাকুরের অপূর্ব্ব সাজ সজ্জা, তাঁর গুম্ফজোড়া, আকৃতি বেশভূষা, ফিনফিনে শান্তিপুরে ধুতি—দেখে মনে হত যেন একজন বাঙ্গালী বাবু ময়ূরের উপর এসে অধিষ্ঠান করেছেন। মহিষাসুর বেচারার অবস্থা বড় শোচনীয়, সিংহের কামড়ে তার দক্ষিণ হস্ত অসাড়, এদিকে আবার সিংহবাহিনী দশভুজার বর্ষাবিদ্ধ হওয়ায় তার আর নড়ন চড়ন নেই, এ সত্ত্বেও তার মুখে Milton এর সয়তান সদৃশ কেমন একটা অদম্য বীরত্ব ফুটে বেরচ্ছে।

পূজার সময় যাত্রা হত। কত রকম যাত্রার দল এসে মহল্লা দিত, তাদের মধ্যে যা সেরা তাই বেছে নেওয়া হত। যাত্রায় বহুলোক সমাগম হত, উঠানটা লোকে লোকারণ্য। আমরা আদ্যোপান্ত সমস্তটা দেখতে পেতুম না, কেবল প্রথম ও শেষ ভাগে এসে বসতুম। প্রহ্লাদ চরিত্রে যে ছেলেটি প্রহ্লাদ সাজত তার বড় মিষ্ট গলা, তার গানে সকলে মোহিত হয়ে যেত। প্রহ্লাদ কত প্রকার উৎপীড়ন সহ্য করছে, আমরা তার দুঃখে অশ্রুপাত করতুম। এত উৎপীড়নেও তার ভক্তির স্খলন নেই। সে আপনাকে শোধরাবার কত চেষ্টা করছে কিন্তু সহস্র চেষ্টাতেও তার চিরকালের অভ্যাস কোথায় যাবে?

কালী কালী বলে ডাকি সদা এই বাসনা
অভ্যাস দোষেতে তবু কৃষ্ণ বলে রসনা।

কিন্তু যাত্রার গানের চেয়ে আমাদের সং দেখতে বেশী আমোদ হত। রামায়ণের পালাতে সঙের আসল ঘটা—এদিকে রাবণ কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি রাক্ষসের দল, ওদিকে আবার রামের বানর সৈন্য,—সবই সঙ্গীন ব্যাপার। আমরা সারারাত কিছু সভায় থাকতুম না, রাত্রিশেষে আমাদের ঘুম থেকে উঠিয়ে আনা হত। কোন ভাল অদ্ভুত রকম সং আসছে তাই দেখবার জন্যে আমরা তাড়াতাড়ি উঠে আসতুম। দেখতে দেখতে তিন দিন চলে গেল—বিজয়া এল, প্রতিমা ভাসান দিতে নিয়ে যাবে—কি আপশোষ! দুর্গা অশ্রুপূর্ণ নয়নে বিদায় নিয়ে চল্লেন, মনে হত সত্যিই দেবীর চক্ষে জল এসেছে। বিজয়ার দিন প্রত্যূষে আমাদের গৃহগায়ক বিষ্ণু আগমনী ও বিদায়ের গান করতে আসতেন। যাত্রার গান যেমন প্রাকৃত বিষ্ণুর তেমনি Classical—সে কি চমৎকার ঠেকত, শুনে শ্রোতৃমণ্ডলী মোহিত হয়ে যেত। বিষ্ণুর একটি আগমনী গান আমার এখনো মনে আছে—

আজু পরমানন্দ আনন্দ মম গৃহে আলো!
যাও যাও সহচরী,
আন ডেকে পুরনারী
বরদারে বরণ করি বিলম্বে কি ফল।
এস উমা করি কোলে,
মাকে মা কি ভুলে ছিলে,
এতদিন পরে এলে বুঝি মনে ছিল।
মা হয়ে মমতা মার,
জাননা গো উমা আমার
পাষাণ স্বভাব তোমার কিছু থাকা ভাল।

তখনকার পূজার আমোদ প্রমোদ যাত্রা উৎসবের মধ্যে সাত্ত্বিক ভাব, আধ্যাত্মিকতা কি ছিল এক একবার ভাবি। দালানে গিয়ে সন্ধ্যার আরতি দেখতে যেতুম তাতে ধূপধূনা বাদ্যধ্বনির মধ্যে আমরা ঠাকুরকে প্রণাম করে আসতুম। এত বাহ্য আড়ম্বরের মধ্যে এই যা ভিতরকার আধ্যাত্মিক জিনিস। আমাদের বৈষ্ণব পরিবারে কি ভাগ্যি পশুবলির বীভৎস কাণ্ড ছিল না সেই রক্ষা—পশুর বদলে কুমড়া বলি হয় এই শুনতুম। আধ্যাত্মিক ভাবের আর যা কিছু দেখা যেত সে বিজয়া দশমীর বিসর্জ্জন উপলক্ষে। বিজয়ার রাত্রে শান্তিজল সিঞ্চন, ও ছোট বড় সকলের মধ্যে সদ্ভাবে কোলাকুলি, এই অনুষ্ঠানটি বাস্তবিক হৃদয়গ্রাহী মনে হত, 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' এই বাক্য যেন ঠিক ফলেছে।

এই পৌত্তলিক উপাসনার মধ্য হতে আস্তে আস্তে অলক্ষিতভাবে আমাদের পরিবারে অমূর্ত্তের উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হল। অল্প বয়স থেকেই মূর্ত্তিপূজার উপর আমার কেমন বিতৃষ্ণা ছিল—যাকে ইংরাজিতে বলে 'Iconoclast' আমি তাই ছিলুম—তার কারণ পৈতৃক সংস্কারই বল—আর যাই বল। এক সময়ে আমাদের বাড়ী সরস্বতী পূজা হত। মনে আছে একবার সরস্বতীর প্রতিমা অর্চ্চনায় গিয়েছি—শেষে ফিরে আসবার সময় আমার হাতে যে দক্ষিণার টাকা ছিল তাই দেবীর উপরে সজোরে নিক্ষেপ করে দে ছুট! তাতে দেবীর মুকুট ভেঙ্গে পড়ল। এই অপরাধে তখন কোন শাস্তি পেয়েছিলুম কি না মনে নাই, কিন্তু হাতে হাতে সাজা না পেয়ে থাকি তার ফলভোগ এখন বুঝতে পারছি। বংশীতে ছিদ্র দেখা দিয়েছে। আমার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ক্ষয়ে যাচ্ছে—স্মৃতিভ্রংশ হতে আরম্ভ হয়েছে। আমি যে আমার সর্ব্বিসের সর্ব্বোচ্চ শিখরে উঠতে পারি নি সেও ঐ কারণে। সরস্বতী প্রসন্ন থাকলে হাইকোর্টের আসন অধিকার করে পদত্যাগ করতে পারতুম—আমার ভাগ্যে আর তা হল না!

ব্যায়াম

ছেলেবেলায় আমাদের ব্যায়াম চর্চ্চার অভাব ছিল না। ভোরে উঠে যোড়াসাঁকো থেকে গড়ের মাঠ বরাহনগর প্রভৃতি দূর দূর পাল্লা পদব্রজে বেড়িয়ে আসতুম। সেই আমাদের Morning Walk—তাছাড়া ঘোড়ায় চড়া, Cricket, সাঁতার দেওয়া এ সব ছিল। আমাদের বাড়ীতে একটা পুকুর ছিল, তাতে আমরা অনেক সময় সাঁতার দিতে যেতুম। বাজী রেখে সাঁতার দেওয়া আমাদের এক রকম খেলা ছিল। আমরা তিন ভায়ে মিলে যেতুম—কলার কাঁদি আমাদের ভেলা। সেই ভেলায় চড়ে মাঝখান পর্য্যন্ত গিয়ে দেখা যেত কে কাকে সিংহাসন চ্যুত করতে পারে। সেই কলার বাহন কেড়ে নেওয়া চাই—আরোহী সাধ্যমত চেষ্টা করছে আততায়ীকে হটিয়ে দিতে—চোখে জল ছিটিয়ে হোক আর যে কোন উপায়েই হোক তার আক্রমণ হতে আপনাকে রক্ষা করতে হবে।—বলপূর্ব্বক সেই কলা বাহন যে দখল করতে পারবে তারই জিৎ। এই রকমে সাঁতারে আমরা খুব পরিপক্ক হয়ে উঠেছিলুম। বাবামহাশয়ের সঙ্গে যখন গঙ্গায় বেড়াতে যেতুম তখন সাঁতার

দিয়ে স্নানে আমার বিশেষ আমোদ হত। আমি সাঁতার দিতে দিতে অনেক দূর পর্য্যন্ত চলে যেতুম বাবামশায় তাতে কোন আপত্তি করতেন না, যদিও বোধ করি এক একবার তাঁর মনটা অস্থির হয়ে উঠত।

বড়দাদা সাঁতারে সর্ব্বাপেক্ষা মজবুৎ ছিলেন। তাঁর রেখাক্ষরের মত সাঁতারেও যে তিনি যে কত রকম কারদানী করতেন তার ঠিক নেই। যখন গঙ্গার ধারের বাগানে থাকতেন তখন মাঝে মাঝে সাঁতার দিয়ে গঙ্গাই পার হতেন। আর সকলে ভয়ে অস্থির হয়ে পড়ত।

হীরাসিং বলে এক পালওয়ানের কাছে আমরা কুস্তী শিখতুম, তাতে আমার খুব উৎসাহ ছিল। ডনের পর ডন, বড় বড় মুগুর ভাঁজা—আর কত রকম কুস্তীর দাঁও, মার পেঁচ শিক্ষা। আমি কুস্তীতে একজন ওস্তাদ হয়ে উঠেছিলুম। কেউ আমার সঙ্গে সহজে পেরে উঠত না। হীরাসিংহের চ্যালাদের মধ্যে অনেকে আমার সমবয়স্ক ছিল, তাদের সঙ্গে আমার কুস্তী হত—তাদের যারা বড় তাদেরও আমার কাছে হার মানতে হত; সহজে কেউ আমাকে ধরাশায়ী করতে পারত না। অথচ আমার বল যে বেশী তা নয়—এই কুস্তীতে শুধু বলীর জয় তা নয়, ছলে বলে কৌশলে যে কোন প্রকারে প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করতে পারলেই জিৎ। একদিন কুস্তী করতে করতে বেকায়দায় পড়ে আমার হাত মুচকে গিয়েছিল। কাউকে কিছু না বলে সেটা ঢেকে রাখবার চেষ্টা করা গেল। আমার ওস্তাদের টোটকা ওষুধে সেরে যাবে এই ভেবে ছোলা ভিজিয়ে হাত বেঁধে রাখলুম কিন্তু তাতে কোন ফল হল না। শেষে ডাক্তার সাহেবের রীতিমত চিকিৎসায় তবে আরাম হল। তখন থেকে সেবারকার মত আমার কুস্তী বন্ধ। এই সব বিষয়ে আমি অল্পেতে সন্তুষ্ট থাকতুম না, সবাই বলত "যা করবে সব তাতেই বাড়াবাড়ি—এ তোমার কেমন স্বভাব।" তার ফল ভোগও

বিলাতে তোলা ছবি

করতে হত—হাত পা ভাঙ্গা, মাথা ভাঙ্গা, কত বিপত্তি যে আমার উপর দিয়ে গিয়েছে তার অন্ত নেই। অথচ এখনো পর্য্যন্ত ত বেঁচে আছি। এত প্রকার বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যে শিশুজীবন যে কি করে রক্ষা পায়, বিধাতার এ এক আশ্চর্য্য বিধান। সে যাহা হোক্, একথা বলা যেতে পারে 'কোন বিষয়েরই বাড়াবাড়ি ভাল নয়' এটা বড় ঠিক কথা। অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রমে অনেক সময় উল্টা উৎপত্তিই হয়। তার

সাক্ষী আমাদের ওস্তাদ হীরাসিং,। তার কুস্তীর বিরাম নেই, যখনই দেখি কোন না কোন কঠোর ব্যায়ামে নিযুক্ত-কিন্তু তার শরীর বেশী দিন টিঁকল না, শীঘ্রই ভেঙ্গে পড়ল। শুনেছি এই সব পালওয়ানেরা দীর্ঘজীবী হয় না। শরীর রক্ষা করতে হলে আহার বিহার ব্যায়াম এ সকল বিষয়ে মিতাচারী হওয়া আবশ্যক। গীতানির্দ্দিষ্ট মধ্যপথই প্রশস্ত—

যুক্তাহার বিহারস্য যুক্ত চেষ্টস্য কর্ম্মসু
যুক্ত স্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা।

নিয়মিত আহার বিহার, নিয়মিত কর্ম্ম চেষ্টা, নিয়মিত নিদ্রা ও জাগরণ—ইহাতেই দুঃখহারী যোগ সাধন হয়।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বন্ধু

লণ্ডনে আসিয়া একটা হোটেলে আশ্রয় লইলাম, মনে হইল এখানকার লোকালয়ের দেউড়িতে আনাগোনার পথে আসিয়া বসিলাম। ভিতরে কি হইতেছে খবর পাই না—লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ও হয় না—কেবল দেখি মানুষ যাইতেছে আর আসিতেছে। এইটুকুই চোখে পড়ে মানুষের ব্যস্ততার সীমা পরিসীমা নাই। এত অত্যন্ত বেশি দরকার কিসের তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। এই প্রচণ্ড ব্যস্ততার ধাক্কাটা কোন্‌খানে গিয়া লাগিতেছে তাহাতে ক্ষতি করিতেছে, কি বৃদ্ধি করিতেছে তাহার কোনো হিসাব কেহ রাখিতেছে কি না কিছুই জানি না। ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজে। আহারের স্থানে গিয়া দেখি, এক একটা ছোট টেবিল ঘেরিয়া দুই তিনটি করিয়া স্ত্রীপুরুষ নিঃশব্দে আহার করিতেছে; পাত্র হাতে দীর্ঘকায় পরিবেষক গম্ভীর মুখে দ্রুতপদে ক্ষিপ্রহস্তে পরিবেষণ করিয়া চলিয়াছে। কেহ কেহবা খাইতে খাইতেই খবরের কাগজ পড়া সারিয়া লইতেছে; তাহার পরে ঘড়িটা খুলিয়া একবার তাকাইয়া টুপিটা মাথায় চাপিয়া দিয়া হন্ হন্ করিয়া চলিয়া যাইতেছে—ঘর শূন্য হইতেছে। কেবল আহারের সময় বারকয়েক কয়েকজন মানুষ একত্র হয়, তাহার পরে কে কোথায় যায় কেহ তাহার ঠিকানা রাখে না। আমার কোনো প্রয়োজন নাই; সকলের দেখাদেখি মিথ্যা একএকবার ঘড়ি খুলিয়া দেখি-আবার ঘড়ি বন্ধ করিয়া পকেটে রাখি। যখন আহারেরও সময় নয়, নিদ্রারও সময় নহে তখন হোটেলে যেন ডাঙায় বাঁধা নৌকার মত—তখন যদি সেখানে থাকিতে হয় তবে কেন যে আছি তাহার কোনো কৈফিয়ৎ ভাবিয়া পাওয়া যায় না। যাহাদের বাসস্থান নাই কেবল কর্ম্মস্থানই আছে তাহাদেরই পক্ষে হোটেল মানায়। যাহারা আমার মত নিতান্ত অনাবশ্যক লোক তাহাদের পক্ষে বাসের আয়োজনটা এমনতর পাইকারী রকমের হইলে পোষায় না।

জানলা খুলিয়া দেখি জনস্রোত নানাদিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। মনে মনে ভাবি, ইহারা যেন কোন্ এক অদৃশ্য কারিগরের হাতুড়ি। যে জিনিষটা গড়িয়া উঠিতেছে সেটাও মোটের উপর অদৃশ্য ; মস্ত একটা ইতিহাসের কারখানা ; লক্ষ লক্ষ হাতুড়ি দ্রুত প্রবলবেগে লক্ষ লক্ষ জায়গায় আসিয়া পড়িতেছে। আমি সেই এঞ্জিনের বাহিরে দাঁড়াইয়া চাহিয়া থাকি—ক্ষুধার ষ্টীমে চালিত সজীব হাতুড়িগুলা দুর্নিবার বেগে ছুটিতেছে ইহাই দেখিতে পাই।

যাহারা বিদেশী, প্রথম এখানে আসিয়া এখানকার ইতিহাসবিধাতার এই অতি বিপুল মানুষকলের চেহারাটাই তাহাদের চোখে পড়ে। কি দাহ, কি শব্দ, কি চাকার ঘূর্ণি! এই লণ্ডন সহরের সমস্ত গতি সমস্ত কর্ম্মকে একবার চোখ বুজিয়া ভাবিয়া দেখিতে চেষ্টা করি কি ভয়ঙ্কর অধ্যবসায়! এই অবিশ্রাম বেগ কোন্ লক্ষ্যের অভিমুখে আঘাত করিতেছে এবং কোন্ অব্যক্তকে প্রকাশের অভিমুখে জাগাইয়া তুলিতেছে?

কিন্তু মানুষকে কেবল এই যন্ত্রের দিক হইতে দেখিয়া ত দিন কাটে না। যেখানে সে মানুষ সেখানে তাহার পরিচয় না পাইলে কি করিতে আসিলাম! কিন্তু মানুষ যেখানে কল সেখানে দৃষ্টিপড়া যত সহজ মানুষ যেখানে মানুষ সেখানে তত সহজ নহে। ভিতরকার মানুষ আপনি আসিয়া সেখানে ডাকিয়া না লইয়া গেলে প্রবেশ পাওয়া যায় না। কিন্তু সেত থিয়েটারের টিকিট কেনার মত নহে—সে দাম দিয়া মেলে না, সে বিনামূল্যের জিনিষ।

আমার সৌভাগ্যক্রমে একটি সুযোগ ঘটিয়া গেল—আমি একজন বন্ধুর দেখা পাইলাম। বাগানের মধ্যে গোলাপ যেমন একটি বিশেষ জাতের ফুল, বন্ধু তেমনি একটি বিশেষ জাতের মানুষ। একএকটি লোক আছেন পৃথিবীতে তাঁহারা বন্ধু হইয়াই জন্মগ্রহণ করেন। মানুষকে সঙ্গদান করিবার শক্তি তাঁহাদের অসামান্য এবং স্বাভাবিক। আমরা সকলেই পৃথিবীতে কাহাকেও না কাহাকেও ভালবাসি—কিন্তু ভাল বাসিলেও বন্ধু হইবার শক্তি আমাদের সকলের নাই। বন্ধু হইতে গেলে সঙ্গদান করিতে হয়। অন্যান্য সকল দানের মত এ দানেরও একটা তহবিল দরকার, কেবলমাত্র ইচ্ছাই যথেষ্ট নহে। রত্ন হইতে জ্যোতি যেমন সহজেই ঠিকরিয়া পড়ে তেমনি বিশেষ ক্ষমতাশালী মানুষের জীবন হইতে সঙ্গ আপনি বিচ্ছুরিত হইতে থাকে। প্রীতিতে প্রসন্নতাতে সেবাতে শুভইচ্ছাতে এবং করুণাপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টিতে জড়িত এই যে সহজ সঙ্গ ইহার মত দুর্লভ সামগ্রী পৃথিবীতে অতি অল্পই আছে। কবি যেমন আপনার আনন্দকে ভাষায় প্রকাশ করেন তেমনি যাঁহারা স্বভাববন্ধু, তাঁহারা, মানুষের মধ্যে আপন আনন্দকে প্রতিদিনের জীবনে প্রকাশ করিয়া থাকেন।

আমি এখানে যে বন্ধুটিকে পাইলাম তাঁহার মধ্যে এই আনন্দ পাওয়া এবং আনন্দ দেওয়ার অবারিত ক্ষমতা আছে। এইরূপ বন্ধুত্বধনে ধনী লোককে লাভ করার সুবিধা এই যে একজনকে পাইলেই অনেককে পাওয়া যায়। কেননা ইহাদের জীবনের সকলের

ইনি একজন সুবিখ্যাত চিত্রকর; ইনি অল্পকালপূর্ব্বে অল্পদিনের জন্য ভারতবর্ষে গিয়াছিলেন। সেই অল্পকালের মধ্যে ইনি ভারতবর্ষের মর্ম্মস্থানটি দেখিয়া লইয়াছেন। হৃদয় দিয়া দেখা চোখে দেখারই মত—ইহা বিশ্লেষণের ব্যাপার নহে সুতরাং ইহাতে বেশি সময় লাগে না। হৃদয়দৃষ্টিসম্বন্ধে কত জন্মান্ধ ভারতবর্ষে জীবন কাটাইয়া দিতেছে তাহারা আমাদের দেশের সেই আলোকটিকেই দেখিল না যাহাকে দেখিলে আর সমস্তকেই অনায়াসে দেখা যায়। যাহাদের দেখিবার চোখ আছে তাহাদের অল্পকালের পরিচয় অন্ধের চিরজীবনের পরিচয়ের চেয়ে বেশি।

ভারতবর্ষে ইহার সঙ্গে আমার ক্ষণকালের জন্য আলাপ হইয়াছিল। ইহার সহৃদয়তা সর্ব্বদাই এমন অবাধে প্রকাশ পায় যে তখনি আমার চিত্ত ইহার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল। ইহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইতে পারিব এই লোভটি য়ুরোপে যাত্রার সময় আমাকে সকলের চেয়ে টানিয়াছিল।

ইহার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটিবামাত্র একমুহূর্ত্তে হোটেলের দেউড়ি পার হইয়া গেলাম—কেহ আর বাধা দিবার রহিল না। ভিড়ের ঠেলাঠেলিতে যেখানে তামাসা ভাল করিয়া দেখা যায় না সেখানে বাপ যেমন ছোট ছেলেকে নিজের কাঁধের উপর চড়িয়া বসিবার জায়গা করিয়া দেন তেমনি লণ্ডনসহর দুইএক জায়গায় আপনার উচ্চ কাঁধের উপর ফাঁকা জায়গা রাখিয়া দিয়াছে;—তাহার যে সব ছেলেরা ভিড়ের লোকের মাথা ছাড়াইয়া আরো দূরের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিতে চায় তাহাদের পক্ষে এই জায়গাগুলির বিশেষ প্রয়োজন আছে। লণ্ডনের হ্যাম্প্‌ষ্টেড হীথ্‌ সেই জাতের একটি উচ্চ পাহাড়ে প্রান্তর;—লণ্ডন এইখানে আপনার হইতে আপনাকে যেন তুলিয়া ধরিয়াছে। এখানে সহরের পাষাণহৃদয়ের একটি প্রান্ত এখনো নবীন ও শ্যামল আছে, এবং তাহার ভয়ঙ্কর আপিসের ভিড়ের মধ্যে এই জায়গাটিতে এখনো তাহার খোলা আকাশের জানলার ধারে একলা বসিবার আসন পাতা আছে।

আমার বন্ধুর বাড়িটির পিছন দিকে ঢালু পাহাড়ের গায়ে ছোট একটুক্‌রা বাগান আছে। ঐটুকু বাগান আনন্দিত ছোট ছেলের আঁচলটির মত ফুলের সৌন্দর্য্যে ভরিয়া উঠিয়াছে। সেই বাগানের দিকে মুখ করিয়া তাঁহাদের বৈঠকখানা ঘরের সংলগ্ন একটি লম্বা বারান্দা অপর্য্যাপ্ত ফুলের স্তবকে আমোদিত গোলাপের লতায় অর্দ্ধ প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। এই বারান্দায় আমি যখন খুসি একখানা বই হাতে করিয়া বসি, তাহার পরে আর বই পড়িবার কোনো প্রয়োজন বোধ করি না। ইহার দুটি ছোট ছেলে ও ছোট মেয়ের মধ্যে বাল্যবয়সের চিরানন্দময় নবীনতার উচ্ছ্বাস দেখিতে আমার ভারি ভাল লাগে। আমাদের দেশের ছেলেদের সঙ্গে ইহাদের আমি একটা গভীর প্রভেদ দেখিতে পাই। আমার মনে হয় যেন আমরা অত্যন্ত পুরাতন যুগের মানুষ;—আমাদের দেশের শিশুরাও যেন কোথা হইতে সেই পুরাতনত্বের বোঝা পিঠে করিয়া এই পৃথিবীতে আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহারা ভালমানুষ তাহাদের গতিবিধি

সংযত, তাহাদের বড় বড় কালো চোখ দুটি করুণ—তাহারা বেশি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে না, আপনার মনেই যেন তাহার মীমাংসা করিতে থাকে। আর এই সব ছেলেরা পৃথিবীর নবীনযুগের মহলে জন্মিয়াছে; তাহারা জীবনের নবীনতার আস্বাদে মাতিয়া উঠিয়াছে; তাহাদের সমস্তই ভাবিয়াচিন্তিয়া করিয়া কর্ম্মিয়া লইতে হইবে, এইজন্য সব জায়গাতেই তাহাদের চঞ্চল পা ছুটিতে চায় এবং সকল জিনিষেই তাহাদের চঞ্চল হাত গিয়া পড়ে। আমাদের দেশের ছেলেদেরও একটা স্বাভাবিক চঞ্চলতা আছে সন্দেহ নাই কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গেই একটা অচঞ্চলতার ভারাকর্ষণ তাহাকে সর্ব্বদাই যেন অনেকটা পরিমাণে স্থির করিয়া রাখিয়াছে। ইহাদের মধ্যে সেই অদৃশ্য ভারটা নাই বলিয়া ইহাদের জীবন তরুণ ঝরণার মত কলশব্দে নৃত্য করিতে করিতে কেবলি যেন ঝিক্‌মিক্‌ করিয়া উঠিতেছে।

আমাদের বন্ধুর গৃহিণীও বন্ধুবৎসলা। তাঁহার স্বামীর বিস্তৃত বন্ধুমণ্ডলী সম্বন্ধে তাঁহাকে স্ত্রীর কর্ত্তব্য পালন করিতে হয়। তাহাদের সেবা যত্ন করা, তাহাদের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্বন্ধকে সর্ব্বাংশে সুন্দররূপে হৃদ্য করিয়া তোলা, রোগে শোকে তাহাদের সংবাদ লওয়া ও সান্ত্বনা করা ইহা তাঁহার সাংসারিক কর্ত্তব্যের একটা প্রধান অঙ্গ। ইহা ত কেবল স্বজন সমাজের আত্মীয়তা নহে ইহা বন্ধুসমাজের আত্মীয়তা—এই বৃহৎ আত্মীয়তার মর্ম্মস্থলে সাধ্বী স্ত্রীর যে আসন তাহা এ দেশে শূন্য নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমার বন্ধুটি স্বভাববন্ধু—তাঁহার বন্ধুত্বের প্রতিভা অসামান্য। ইঁহার পক্ষে বন্ধুত্ব জিনিষটি সত্য বলিয়াই ইঁহাকে বিশেষ যত্নে বন্ধু বাছিয়া লইতে হয়। যে লোক খাঁটি আর্টিষ্ট নয় সে যেমন কেবলমাত্র দস্তুর রক্ষার জন্য ঘর সাজাইবার উপলক্ষ্যে যেমন-তেমন ছবি বাঁধাইয়া দেয়ালে টাঙাইয়া কোনোমতে শূন্য স্থান পূর্ণ করিতে পারে, কিন্তু যে লোক খাঁটি আর্টিষ্ট—ছবি যাহার পক্ষে সত্যবস্তু, সে স্বভাবতই বাজে ছবি দিয়া ঘর ভরিতে পারে না, সে আপনার স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধির দ্বারা ছবি বাছিয়া লয়। ইনিও তেমনি কেবলমাত্র বাজে পরিচিতবর্গের সামাজিক ভাবের দ্বারা আপনাকে আক্রান্ত করেন নাই। ইঁহার সঙ্গে যাঁহাদের সম্বন্ধ আছে সকলেই ইঁহার বন্ধু এবং সকলেই গুণী এবং বিশেষভাবে সমাদরের যোগ্য।

এমনতর বরেণ্য বন্ধুমণ্ডলীকে যিনি আপনার চারদিকে ধরিয়া রাখিতে পারেন তাঁহার যে বিশেষ গুণের দরকার সে কথা বলাই বাহুল্য। ইনি রসজ্ঞ। মৌমাছি যেমন ফুলের মধুকোষের গোপন রাস্তাটি অনায়াসে বাহির করিতে পারে ইনিও তেমনি রসের পথে অনায়াসে প্রবেশ করেন; ভাল জিনিষকে একেবারেই দ্বিধাবিহীন জোরের সঙ্গে ধরিতে পারেন। ভাললাগা এবং ভাল বলার সম্বন্ধে অনেক লোকেরই একটা ভীরুতা আছে পাছে ভুল করিয়া অপদস্থ হই এ ভয় তাহারা ছাড়িতে পারে না। এইজন্য ভালকে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার বেলায় তাহারা বরাবর অন্যলোকের পিছনে পড়িয়া যায়। ইঁহার বোধশক্তির মধ্যে একটি যথার্থ প্রবলতা আছে বলিয়াই ইঁহার সেই ভয় নাই। এমনি

করিয়া তিনি যে মৌমাছির মত কেবলমাত্র মধু-রসটিকেই আহরণ করিতে জানেন তাহা নহে সেই সঙ্গে ফুলটিকেও ভালবাসিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে। তিনি ভোগী নহেন তিনি প্রেমিক। এই জন্য তিনি গ্রহণও করেন তিনি দানও করেন।

অপরিচয় হইতে পরিচয়ের পথ অতি দীর্ঘ। সেই দুঃসাধ্য পথ অতিক্রম করিবার মত সময় আমার ছিল না। আমার শক্তিও অল্প। বরাবর কোণে থাকা অভ্যাস বলিয়া নিজের জোরে ভিড় ঠেলিয়া ঠুলিয়া ইচ্ছিত জায়গাটিতে পৌছানর চেষ্টা করিতেও আমি পারি না। তা ছাড়া ইংরেজি ভাষার সদর দরজার চাবিটা আমার হাতে নাই; আমাকে কেবলি বেড়া ডিঙাইয়া চলিতে হয়—তেমন করিয়া পথ চলা একটা ব্যায়াম—তেমনভাবে আপনার স্বভাবকে রক্ষা করিয়া চলা যায় না। নিজেকে অবাধে পরিচিত করিবার শক্তি না থাকিলে অন্যের সহজ পরিচয় পাওয়া সম্ভবপর হয় না। সুতরাং কিছুকাল এখানকার মোটর গাড়ির দানবরথের চাকা বাঁচাইবার চেষ্টায় শ্রান্ত হইয়া অবশেষে এখানকার পথ হইতেই ফিরিতাম আমার সেই নদীবাহুপাশে ঘেরা বাংলাদেশের শরৎরৌদ্রালোকিত আমন ধানের ক্ষেতের ধারে। এমন সময় প্রবেশ করিলেন বন্ধু পর্দ্দা তুলিয়া দিলেন; দেখিলাম আসন পাতা, দেখিলাম আলো জ্বলিতেছে; বিদেশীর অপরিচয়ের মস্ত বোঝাটা বাহিরে রাখিয়া পথিকের ধূলিলিপ্ত বেশ ছাড়িয়া ফেলিয়া একমুহূর্ত্তেই ভিড়ের মধ্য হইতে নিভৃতে আসিয়া প্রবেশ করিলাম।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জয়শ্রী

রাজা নয় দ্বিতীয় যমরাজ। যমের দ্বার দেখাইতে লোকে তখন দক্ষিণ দেখাইত না, দেখাইত উত্তর—যেদিকে রাজমিহিরের রাজ-পাট কাশ্মীর।

সে বৎসর ফাল্গুনের দোল-পূর্ণিমায় এই নরপাল নয়—নরক-পাল বিলাসভবনে পিচ-কারির পরিবর্ত্তে ছুরির ব্যবস্থা করিয়া হতাহত শত শত অন্তঃপুরচারিকার ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত দেহ লইয়া বেতালের মত বিকট তাণ্ডব লীলায় মগ্ন আছেন। নর-শোণিতের রক্তিমা কুঙ্কুমের

উত্তরীয়ে, রাজপ্রাসাদের গৃহে গৃহে ধবলমণি ভিত্তিতে, শ্যামল পুষ্পকাননে, নির্ম্মল কেলি সরোবরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। খণ্ডবিখণ্ড অভ্রমালায় রক্ত আভা! দূরে দিগন্তে রক্ত ধূলিজাল!

যখন এই মরণোৎসবের মাঝখানে বুদ্ধো-পাসিকা রাজরাণী জয়শ্রীর ডাক পড়িল তখন বীণাবাদিনীর জীবনশোণিতসিঞ্চিত বীণার ঝঙ্কার মন্দ হইয়া আসিয়াছে, মরণোন্মুখ নর্ত্তকীর নূপুর নিক্কণ স্খলিত হইতেছে আর

বধূর উহু উহু আজিকার মরণ রাগিণীতে মূর্চ্ছনা দিতেছে।

সিংহলবাসিনী জয়শ্রী তন্তুবায় কন্যা। রূপসী যে ছিলেন তাহা নয়; খেলাচ্ছলে রাজা তাঁহাকে কোন সময়ে রাজ-অন্তঃপুরে বরণ করিয়া আনিয়াছিলেন এবং খেলা শেষে রাজপুরের এক প্রান্তে তাঁহাকে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন।

প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদের জনপূর্ণ নিঃসঙ্গতার মাঝে বিরাট মন্দিরের এককোণে সামান্য চৈত্যটির মত জয়শ্রী নয়নান্তরালে গোপনে নিজের পবিত্র জীবনের সফলতাটুকু লইয়া বিনা আড়ম্বরে দিন কাটাইতেছিলেন; হঠাৎ আজ ডাক পড়িয়াছে শুনিয়া প্রথমে তিনি কেমন একটু সঙ্কুচিতা হইয়া পড়িলেন, পরে কঞ্চুকীর মুখে যখন শুনিলেন রাজা আজ মৃত্যুরূপে রাজমহলে ক্রীড়া করিতেছেন তখন জয়শ্রী হাসিমুখে কঞ্চুকীকে বিদায় দিয়া বেশ-গৃহে প্রবেশ করিলেন।

* * * *

রাত্রির অন্ধকার সন্ধ্যার সমস্ত রক্তরাগ মুছিয়া দিক্‌দিগন্তে একটা কালিমার প্রলেপ দিয়াছে। শতসহস্র প্রদীপের রশ্মিতে বোধ হইতেছে যেন সমস্ত রাজপ্রাসাদটায় কে আগুন ধরাইয়া দিয়াছে। রাজা রাজমিহির নববস্ত্রে, নবরত্ন অলঙ্কারে দীপ্যমান দ্বিতীয় সূর্য্যের মত প্রমোদভবনে বিরাজ করিতেছেন। কোথাও আর সারা দিবসের বীভৎস লীলার চিহ্নমাত্র নাই;—সুমার্জ্জিত গৃহভিত্তিতে বারিসিঞ্চিত পুষ্পকাননে কোথাও কোনখানে নয়। দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ রাজার আজ্ঞায় অঙ্গন প্রাঙ্গণ শোণিতকর্দ্দমে পিচ্ছিল হইয়া গেল, আবার তাঁহারই আজ্ঞায় এক নিমেষে প্রাসাদ হইতে যৎসামান্য রক্তের রেখাটুকু পর্য্যন্ত দূরীভূত হইল।

এই সদ্য প্রক্ষালিত রাজ-গৃহাঙ্গনে পদার্পণ করিতেই জয়শ্রী মৃত্যুর একটা সুতীব্র শীতলতা নিজের সমস্ত দেহে অনুভব করিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন; পরে লূতাতন্তুর উপরে নিহিত শিশির কণার মত নিজের অতিসূক্ষ্ম বক্ষোবাসে চিত্রিত শুভ্র দুইখানি বুদ্ধচরণে দৃষ্টি রাখিয়া ধীরে ধীরে রাজসদনে প্রবেশ করিলেন।

এই বুদ্ধচরণাঙ্কিত শুভ্র বক্ষোবাস জয়শ্রীর বিবাহের যৌতুকস্বরূপ পিতৃগৃহ সিংহল হইতে আসিয়াছিল। হিন্দুরাজকুলসূর্য্য মিহিরের মহিষী বক্ষে বুদ্ধের চরণাঙ্ক ধারণ করিবেন এটা রাজার অসহ্য ছিল; সুতরাং ওই বস্ত্রখণ্ড পরিধান সম্বন্ধে জয়শ্রীর উপর তিনি কঠোর নিষেধ প্রচার করিয়াছিলেন। আজ সহসা উৎপলবর্ণা পাণ্ডুবসনা জয়শ্রী যখন রাজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন তখন রাণীর নিরাভরণ বক্ষে একমাত্র আভরণ সেই পদাঙ্ক দুইখানির উপরেই রাজার প্রথম দৃষ্টি পড়িল।

ক্রূরকর্ম্মা রাজা মিহির আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া পরিহাসের স্বরে জয়শ্রীকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন—মহারাণি উপযুক্ত উৎসবের বেশই ধারণ করিয়াছ! শ্বেতবসনে কুঙ্কুমরাগ মানাইবে ভাল!

* * * *

পূর্ব্ব দিগন্তসীমায় নবোদয়ের কনকলেখা দেখা দিয়াছে; ভারতখণ্ড জুড়িয়া অস্তোন্মুখ জ্যোৎস্নার ম্লান পাণ্ডুতা একখানি শোণিতহীন মুখচ্ছবির মত বিবর্ণ, বিষণ্ণ!

শ্মশান হইতে দুই রাজপরিচারিকা মৃৎপাত্রে মহারাণী জয়শ্রীর শেষ অস্থি এবং রক্তাক্ত

পদাঙ্কবাস বহন করিয়া সিংহলের অভিমুখে প্রস্থান করিল।

বোধিধর্ম্মের সঙ্গে জয়শ্রীর রক্ত-পতাকা পূর্ব্বসমুদ্র পারে নির্ব্বাসিত হইয়া গেল।

তাহার স্থানে রহিল নামাবলী, তিলক মালা ইত্যাদি এবং রাজসিংহাসনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে হিন্দু মিহির !!

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কিস্তিমাত্

শ্রাবণ মাস। সমস্ত দিন অবিশ্রাম বর্ষণের পর সন্ধ্যার পূর্ব্বে আকাশ একেবারে মেঘ-হীন হইয়া গিয়াছে। বর্ষা-মলিন সিক্ত ধরণী অব্যাহত সূর্য্য কিরণের দ্বারা উদ্ভাসিত হইয়া এক বিচিত্র সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছে।

সতীশচন্দ্র তাহার ঘরে একাকী বসিয়া পুলকিত চিত্তে সন্নিকট ভবিষ্যতের বিষয়ে নানা প্রকার চিন্তা করিতেছিল। আজ রাত্রে তাহার বিবাহ। আজীবন ধরিয়া প্রেম ও পত্নীর সম্বন্ধে যে সকল মধুর এবং অস্পষ্ট ধারণা নানাদিক হইতে হৃদয়ের মধ্যে সঞ্চিত হইয়াছে, আজ তাহাদের সহিত সম্মুখ পরিচয় হইবে! কল্পনার সহিত বাস্তবের আজ মিলন ঘটিবে। একখানি ঢলঢলে নোলকপরা লজ্জারক্তিম মুখ, একখানি সঞ্চারিণী পল্লবিনী দেহলতা, আর একটি নির্ম্মল বিকচোন্মুখ প্রেমকম্পিত হৃদয়! আজ হইতে এই অমূল্য সম্পত্তির সে একমাত্র অধিকারী হইবে। লাভের কেহ অংশীদার নাই, লোকসানেরও কোন আশঙ্কা নাই।

তাহার পর 'বাসর'!—সেই চির-আকাঙ্খিত চির-অপেক্ষিত চির-রহস্যময় বাসর! তন্দ্রালস নয়নে শ্যালিশ্যালাজগণের সহজ সপ্রতিভ শ্রী এবং নিদ্রাহত শ্রবণে তাঁহাদের সুমিষ্ট পরিহাসবাণী স্বপ্নের ন্যায় অস্পষ্ট অথচ মধুর হইয়া উঠিবে! পার্শ্বে লাজ-সঙ্কুচিতা বধূ, সম্মুখে রহস্যরসিকা শ্যালিশালাজগণ, কণ্ঠে সুগন্ধ মাল্য এবং অদূরে সুমিষ্ট বংশীধ্বনি——

সহসা সতীশ চমকিত হইয়া উঠিল। দুই দিন হইল তাহার বাল্যবন্ধু নৃপেন্দ্রনাথ প্রবাস হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে; তাহাকে ত নিমন্ত্রণ করিতে একেবারে ভুল হইয়া গিয়াছে! কিছুতেই তাহা হইতে পারে না—তাহা হইলে সে অত্যন্ত দুঃখিত হইবে।

সতীশ ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল—৬৷৷০ টা। নয়টার সময় লগ্ন, গৃহ হইতে আটটার সময় যাত্রা করিবার কথা। যথেষ্ট সময় আছে। কাঁধে একটা চাদর ফেলিয়া সতীশ বহির্গত হইল।

২

নৃপেন্দ্রর গৃহে নৃপেন্দ্র তখন দাবা খেলিতে-ছিল। বাজি তখন অত্যন্ত সঙ্গীন অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। নৃপেন্দ্র বলিতেছে, ঘোড়া উঠিয়া কিস্তি দিলে তিন চালে মাত্ অবশ্যম্ভাবী। তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী মাত্ রক্ষা করিবার জন্য অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইয়া পড়িয়াছেন।

সতীশ কক্ষে প্রবেশ করিল।

সতীশকে দেখিয়া নৃপেন্দ্র বলিল, "এস

সতীশ, খবর সব ভাল ত ?" পরক্ষণেই তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে বলিল, "ফিরে বসুন মশায়, মাত্ আর বাঁচে না।"

সতীশ ধীরে ধীরে আসিয়া বিপন্ন ভদ্রলোকটীর পার্শ্বে উপবেশন করিল। দর্শনশাস্ত্রে এম এ পাশ করিয়া সতীশ যে পরিমাণ খ্যাতি অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিল—উৎকৃষ্ট দাবা খেলওয়াড় বলিয়া তাহা অপেক্ষা তাহার অল্প প্রসিদ্ধি ছিল না। মায়াবাদের মহিমাবলে হয় ত সে সংসারের সকল দ্রব্য হইতে আত্মসম্বরণ করিতে পারিত, শুধু দাবা খেলার মোহের নিকট সে পরাস্ত। দাবা খেলা পাইলে সংসারের অবশিষ্টটুকু ভুলিয়া যাইতে তাহার অধিক বিলম্ব হইত না। বিশেষত বিপন্নের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাহাকে রক্ষা করা সতীশের মতে, শুধু রণক্ষেত্রে নহে, দাবা খেলাতেও বীরোচিত কর্ত্তব্য।

সতীশ ভাবিল কথাটা এখন বলিয়া যুদ্ধের এমন গুরুতর অবস্থায় বীরগণকে বাধা দেওয়া নিতান্ত অশিষ্টাচার হইবে। খেলা শেষ হইলে বলিলেই চলিবে, ততক্ষণ খেলাটা একটু দেখা যাক্।

পাঁচ মিনিট গভীরভাবে চিন্তা করিয়া সতীশ বলিল, "মাত্ হয় না। গজের মুখে দাবা ফেলে দিন।"

ভদ্রলোকটি বলিলেন—"দাবা গেলে আর কতক্ষণ রাখতে পারব, মশায় ?"

সতীশ বলিল, "দাবা রাখতে গেলে যে আর তিন চালও রাখতে পারবেন না। দাবা দিন না—দাবা ভিন্ন কি আর মাত্ করা যায় না ?"

দাবা উৎসর্গের পুণ্যে খেলাটা বাস্তবিকই একটু উন্নতিলাভ করিল। আসন্ন মাতের আশঙ্কা আর রহিল না। খেলা চলিতে লাগিল।

সতীশ প্রথমে মুখে 'চাল' বলিয়া দিতেছিল তাহার পর স্বহস্তে দুএকটা 'চাল' দিতে আরম্ভ করিল, অবশেষে অজ্ঞাতসারে ভদ্রলোকটিকে ঠেলিয়া ঠেলিয়া ক্রমশ অগ্রসর হইতে লাগিল। পনের মিনিটের মধ্যে দেখা গেল, ভদ্রলোকটি নির্ব্বিরোধী দর্শক হইয়া সতীশের পার্শ্বে বসিয়া খেলা দেখিতেছেন এবং সতীশ নৃপেন্দ্রের সম্মুখীন হইয়া বসিয়া গভীরভাবে খেলা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে।

তাহার পর খেলা চলিতে লাগিল—সে কি সুন্দর এবং সুকঠিন খেলা! সতীশ বোধ হয় জীবনে কখন সে প্রকার বাজি খেলে নাই। নৃপেন্দ্র দাবা লইয়া বিব্রত হইয়া উঠিয়াছে—এখন মাত্ না হইলে হয়!

নৃপেন্দ্রনাথ বলিল, "যতই কর সতীশ, মাত্ হচ্ছে না।"

সতীশ উৎফুল্ল হইয়া বলিল, "আলবাৎ হবে।"

অবশেষে হইলও তাই; বিজয়-দৃপ্ত রবে সতীশ বলিল, "কিস্তিমাত্!"

ভদ্রলোকটি পূর্ব্বে কখন্ চলিয়া গিয়াছেন। সতীশ মহা ব্যস্ত হইয়া বলিল, "ক'টা বেজেছে শীঘ্র একবার দেখ ত' ভাই।" বিবাহের কথা সে এতক্ষণ একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল—এখন চৈতন্য হইল।

পার্শ্বের ঘর হইতে ঘড়ি দেখিয়া আসিয়া নৃপেন্দ্র বলিল, "নটা বেজে পঁচিশ মিনিট।"

"অ্যাঁ! কটা বেজেছে ?" সতীশের চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া বহির্গত হইয়া আসিবার উপক্রম করিল।

নৃপেন্দ্র হাসিয়া বলিল, "নটা বেজে পঁচিশ মিনিট—কেন, তোমার এমন কি ট্রেন ধরতে হবে যে, এতটা ব্যস্ত হয়ে উঠলে ?"

সতীশ সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিল, "তোমার ঘড়ি নিশ্চয়ই ভুল আছে !"

নৃপেন্দ্র বলিল, "এক মিনিটও নয়—আজ একটার তোপের সঙ্গে ঠিক ছিল।"

সতীশ বলিল, "সর্ব্বনাশ হয়েছে ! উঃ কি করলাম—হায়, হায় !" —অধীর ভাবে সতীশ নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল; পর মুহূর্ত্তেই ঘরে প্রবেশ করিয়া অস্থিরভাবে চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

নৃপেন্দ্র সতীশকে ধরিয়া ফেলিল, কহিল, "হঠাৎ তুমি এ রকম বিচলিত হয়ে উঠলে কেন, —সব খুলে বল দেখি ?"

সতীশ বলিল, "ভাই আমি সর্ব্বনাশ করেছি—আজ রাত্রে ৯টার সময় আমার বিয়ে, তোমাকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছিলাম—দাবা খেলায় মত্ত হয়ে কি ঘোর বিপদেই পড়লাম !

বিস্মিত নৃপেন্দ্রনাথ বলিল, "সত্যি নাকি হে ?"

"এই দেখ" মণিবন্ধে বদ্ধ পীতবর্ণের সূতা দেখাইয়া অশ্রু-সজল নেত্রে সতীশ চাহিয়া রহিল।

কষ্টে হাস্য দমন করিয়া নৃপেন্দ্র কহিল, "ছি ছি এত ছেলেমানুষিও করে ! এখন উপায় ?"

সতীশ বলিল, "উপায় আর ছাই আছে ! এত রাত্রে আমি বাড়ী ফিরলে আমার অবস্থা কি হবে, বুঝতেই পারছ। লগ্ন অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। হায়, হায়—কি সর্ব্বনাশ

নৃপেন্দ্র বলিল, "আর বিলম্ব না করে, এখনই যা হয়, একটা ব্যবস্থা করা উচিত।"

সতীশ বলিল, "আমি ত বাড়ী যেতে পারব না। এখন বাড়ী গেলে বাবা আমাকে আর আস্ত রাখবেন না।"

নৃপেন্দ্র কহিল, "কোথায় তোমার বিবাহ হচ্ছে, বল দেখি ?"

"১৫ নং বিহারী দত্তের ষ্ট্রীট প্রমথ মুখুজ্যের বাড়ী।"

"ওঃ, প্রমথ বাবুর বাড়ী ? নির্ম্মল তোমার কে হবে ?"

"শালা।"

নৃপেন্দ্র কহিল, "নির্ম্মলের সঙ্গে আমার যথেষ্ট আলাপ আছে। দেখি, কোন উপায় হতে পারে কিনা। তুমি এখানেই অপেক্ষা কর—আমি বিশ মিনিটের মধ্যে তোমাদের বাড়ী আর তোমার শ্বশুরবাড়ীর অবস্থাটা দেখে আসি। তারপর যা হয় পরামর্শ করা যাবে।"

মোটরে করিয়া নৃপেন্দ্র বহির্গত হইয়া গেল।

সতীশ অধীর হৃদয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মত নৃপেন্দ্রনাথের ড্রয়িংরুমে পায়চারি করিতে লাগিল।

কোথায় সে এমন সময় বধূর সহিত বাসরঘরে প্রবেশ করিবে, তাহা না হইয়া ভাগ্যচক্রে বন্ধুর গৃহে পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর মত নিরুদ্ধ হইয়া সে ছট্‌ফট্ করিতেছে ! এত বড় শোচনীয় ব্যাপার আর কি ঘটিতে পারে !

তাহার অদর্শনে বরপক্ষ এবং কন্যাপক্ষের লোকেরা যখন ব্যগ্র হইতে ব্যাকুল হইয়া

লুপ্ত হইয়া আসিতেছিল---তখন সে মূঢ়ের মত সমস্ত বিস্মৃত হইয়া নিশ্চিন্ত মনে তুচ্ছ দাবা খেলায় মগ্ন ছিল! শঙ্কিতা বধূর সূক্ষ্ম নৈরাশ্য এবং রুষ্ট পিতার তপ্ত ক্রোধ যখন অধীরভাবে তাহার পথ চাহিয়াছিল, তখন তাহাকে অবলীলাক্রমে ভুলাইয়া রাখিয়াছিল, কয়েকটা চক্ষুহীন রাজা এবং মস্তকহীন মন্ত্রী—শুণ্ডহীন গজ এবং পুচ্ছবিহীন অশ্ব!

ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দাবার বলগুলা দেখিয়া সতীশের সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল সেই কাষ্ঠখণ্ডগুলাকে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া সেই ভস্ম দেহে লেপন করিয়া সংসার ত্যাগ করিতে পারিলে তাহার পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হয়!

৩

সতীশদের গৃহের সম্মুখে আসিয়া নৃপেন্দ্র দেখিল, ভয়ানক অবস্থা! পথে এত লোক জমিয়া গিয়াছে যে, অতি সন্তর্পণেও মোটর লইয়া যাওয়া কঠিন। ব্যাণ্ডওয়ালারা দলে দলে বাদ্যযন্ত্র পার্শ্বে রাখিয়া নীরবে বসিয়া রহিয়াছে। অ্যাসেটিলিন্ আলোগুলি জ্বলিতেছে ---সেগুলাকে পূর্ব্ব হইতেই জল দিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছিল—দুর্গন্ধের আশঙ্কায় নিভাইয়া দেওয়া হয় নাই। অভুক্ত বরযাত্রীগণ অপেক্ষা করিবে, কি গৃহে ফিরিবে, স্থির করিতে না পারিয়া দলবদ্ধ হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সতীশের পিতা উদ্বিগ্ন ভাবে গৃহদ্বারে দণ্ডায়মান এবং এক ব্যক্তি --কন্যাপক্ষীয় নিশ্চয়ই - উচ্চস্বরে বলিতেছেন—"আমাদের জাত গেল, ইজ্জৎ গেল! এ কি ভয়ঙ্কর কথা—যে প্রকারেই হউক আপনারা পাত্র সন্ধান করে বার করুন!

সতীশের বাটীর কেহও যাহাতে দেখিতে না পায়, সেইজন্য নৃপেন্দ্র মোটরের হুড্ তুলিয়া দেখিয়াছিল।

সতীশের পিতা বলিলেন, "আমার অপরাধ কি, বলুন? বিপদ আপনাদের অপেক্ষা আমার অল্প নয়। কোথায় ছেলেটা গেল, গাড়ি চাপা পড়ল, না কি হল—কিছুই ত বুঝতে পাচ্ছি না। থানায় খবর দিয়েছি --চতুর্দ্দিকে লোক পাঠিয়েছি। বিয়ে ত পরের কথা - এখন ছেলে এলে আমি বাঁচি!"

কোন প্রকারে জনতা হইতে বহির্গত হইয়া নৃপেন্দ্র কন্যার গৃহে উপস্থিত হইল। সেখানেও প্রায় একই প্রকার দৃশ্য। দীপ-শ্রেণী ম্লান, শানাই নীরব—সকলের মুখ বিমর্ষ। কন্যাযাত্রীগণ কন্যার আত্মীয়বর্গকে সম্ভব এবং অসম্ভব নানাপ্রকার পরামর্শ দিতেছে। মোটর হইতে অবতরণ করিয়া নৃপেন্দ্রনাথ গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। নির্ম্মল সম্মুখেই আসিয়াছিল - নৃপেন্দ্রকে দেখিয়া বলিল, "আসুন নৃপেনবাবু, আমাদের ত মশায়, আজ ভয়ানক বিপদ!"

নৃপেন্দ্র বলিল, "সব জানি—আপনার পিতা কোথায়?"

নির্ম্মল বলিল, "তিনি বাড়ীর ভিতর শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছেন।"

নৃপেন্দ্র নির্ম্মলের কর্ণের নিকট মুখ লইয়া গিয়া বলিল, "এই বিষয়েই আপনার সহিত আমার বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা আছে—একটু নির্জ্জনে চলুন।"

নির্ম্মল তখনই নৃপেন্দ্রকে পার্শ্বের ঘরে লইয়া গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

আগ্রহসহকারে নির্ম্মল বলিল, "কি বলুন দেখি ?"

নৃপেন্দ্র কহিল, "আপনাদের পাত্র সতীশ আমার বিশেষ বন্ধু। সে এখন আমার বাড়ীতে রয়েছে।"

নির্ম্মল বিস্মিতস্বরে কহিল, "কি রকম ?

নৃপেন্দ্র সংক্ষেপে সমস্ত ব্যাপার প্রকাশ করিয়া বলিল।

ক্রুদ্ধস্বরে নির্ম্মল কহিল, "দেখুন দেখি—কি অন্যায় কথা !"

নৃপেন্দ্র বলিল, "অন্যায় ত খুবই হয়ে গিয়েছে—এখন উপায় কি, বলুন দেখি ?"

নির্ম্মল বলিল, "উপায় আর কি—শেষরাত্রে একটা লগ্ন আছে, সেই লগ্নেই বিবাহ হবে।"

নৃপেন্দ্র উৎসুক হইয়া বলিল, "আরও একটা লগ্ন আছে ? তবে আর কি ! আঃ বাঁচা গেল, ভগবানকে ধন্যবাদ।"

নির্ম্মল বলিল—"লগ্নটা তেমন ভাল নয়—কিন্তু তা ছাড়া এখন ত আর উপায়ও নেই। যা হোক নৃপেনবাবু ! আপনি যে সংবাদ এনেছেন, তার জন্য আপনাকে সহস্র ধন্যবাদ—"

নৃপেন্দ্র হাসিয়া বলিল, "ধন্যবাদের পরিবর্ত্তে আমার একটি প্রার্থনা রক্ষা করবেন দাবা খেলার কথাটা প্রকাশ করবেন না—সে বেচারা তাহলে অত্যন্ত লজ্জিত হবে।"

নির্ম্মল হাসিয়া বলিল, "বাহিরের লোকে জানতে পাবে না—কিন্তু তাকে একটু লজ্জা দেওয়াও আবশ্যক। এমন দাবা-পাগলার কথা আমি ত আর কখন শুনি নি। যে বলেছিল, 'কাদের সাপ' এ তাকেও হারিয়েছে। যা হোক নৃপেনবাবু আর বিলম্ব নয়—আপনি শীঘ্র বর নিয়ে আসুন। অনেকে অভুক্ত চলে যাচ্ছে।"

"আধ ঘণ্টার মধ্যে আমরা পৌঁছাব" বলিয়া নৃপেন্দ্র সত্বর বাহির হইয়া গেল।

৪

নৃপেন্দ্রের মোটরের শব্দ শুনিয়া সতীশ তাড়াতাড়ি ফটকের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই কয়েক মিনিট সময় একাকী থাকিয়া সে প্রায় পাগলের মত হইয়া উঠিয়াছে। সতীশকে দেখিয়া নৃপেন বলিল, "শীঘ্র উঠে পড়, আর এক মিনিটও সময় নষ্ট করা হবে না।"

মোটরে উঠিয়া বসিয়া সতীশ ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কি রকম অবস্থা দেখলে ?"

নৃপেন হাসিয়া বলিল, "অবস্থা যতদূর মন্দ হতে পারে। কিন্তু ভারি বেঁচে গিয়েছ ম্যান্—আর একটা লগ্ন আছে।"

"কখন ?"

"তা বেশ ! প্রায় ভোর বেলা।"

হউক ভোর বেলা, বিবাহ ত হইতে পারিবে ! সতীশের মন কতকটা উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। এতক্ষণ বেচারা ভাল করিয়া দুঃখিত হইতে পারে নাই—এতই তাহার ভয় হইয়াছিল। রোগের সময় রোগী ভাবে, অর্থব্যয় হউক, এখন সারিয়া উঠিলে বাঁচি—কিন্তু যখন বেশ সারিয়া উঠে, তখন ভিজিটের টাকা ও ঔষধের মূল্য পরিশোধ করিবার সময় মনটা হায় হায় করিতে থাকে। সতীশেরও মনে হইল বিবাহ ত' হইবে—কিন্তু বাসরঘরের প্রায় সমস্ত রাত্রির আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইয়া তাহার কর্ম্মফলের দণ্ডশোধ করিতে হইল।

নৃপেন্দ্র বলিল—"তোমাদের বাড়ি গিয়ে

কি বলবে, বল দেখি? দাবা খেলার কথা বল্‌লে সকলে তোমাকে প্রহার দেবে।"

সতীশ ব্যস্ত হইয়া বলিল "সর্ব্বনাশ! সে কথা কখনও বলে!"

কিন্তু কি বলিতে হইবে তাহা কোনও মতেই স্থির হইল না। অথচ দেখিতে দেখিতে মোটার সতীশদের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া স্থির হইল।

মোটারের মধ্যে সতীশকে দেখিয়া মহা কোলাহল পড়িয়া গেল। "কি ব্যাপার? কোথায় ছিলে, এতক্ষণ? কোন আক্কেল নাই!" ইত্যাদি ইত্যাদি—।

সতীশের পিতা রোষদীপ্ত নয়নে সতীশের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া বলিলেন, "আজ বেশ করে আমার মুখোজ্জ্বল করেছ! এতক্ষণ কোথায় থাকা হয়েছিল?"

মোটার হইতে অবতরণ করিয়া নৃপেন্দ্র বলিল "আপনারা রাগ করবেন না—সতীশের কোনও দোষ নেই, সন্ধ্যা সাতটার সময় ও আমাকে নিমন্ত্রণ করতে যায়। আমাদের বাড়ি পৌঁছে আমাকে কোনও কথা বলবার পূর্ব্বেই হঠাৎ ওর শরীরটা কেমন অসুস্থ বোধ হওয়ায় ও শুয়ে পড়ে। তারপর একটা ফিটের মত হয় আমি ওকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম বলে, আপনাদের সংবাদ দিতে পারি নি। আধঘণ্টা মাত্র হল, ও সুস্থ হয়েছে। তারপর ওর মুখে বিবাহর কথা শুনে আমি তাড়াতাড়ি ওকে নিয়ে এসেছি।"

সতীশের পিতা চিন্তান্বিত হইয়া বলিলেন, "তা হলে আজ রাত্রে বিবাহ কেমন করে হয়?"

নৃপেন বলিল "তা অনায়াসে হবে—এখন সতীশের আর কোনও দুর্ব্বলতা নেই।"

সতীশের পিতা কহিলেন, "পারবে?"

"তা পারবে" বলিয়া নৃপেন সতীশের দিকে চাহিয়া সহাস্য মুখে জিজ্ঞাসা করিল "পারবে ত' হে?"

সতীশ কৃতজ্ঞ নেত্রে নৃপেনের দিকে চাহিল। সেই আজ তাহাকে রক্ষা করিয়াছে!

কন্যাপক্ষ হইতে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, সতীশের পিতা তাঁহাদিগকে অগ্রসর হইয়া সংবাদ দিতে বলিলেন—এবং বলিয়া দিলেন যে, অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে বর এবং বরযাত্রীসহ তিনি কন্যাগৃহে উপস্থিত হইবেন।

কিন্তু ব্যাণ্ড বাজাইয়া এবং আলো জ্বালাইয়া বর যখন কন্যাগৃহে উপনীত হইল, তখন পুনরায় এক নূতন বিভ্রাট উপস্থিত হইল। প্রমথবাবু আসিয়া সতীশের পিতাকে কহিলেন, "পাত্রের এরূপ মূর্চ্ছারোগ আছে, তা আমরা জানতাম না। এ রকম অবস্থায় কোন্ পিতা কন্যার সহিত বিবাহ দিতে সাহস করে বলুন—বিশেষতঃ আজই সন্ধ্যাবেলা যখন মূর্চ্ছা হয়েছে—তখন অন্তত আজ রাত্রে ত' বিবাহ হতেই পারে না!"

সতীশের পিতা কহিলেন, "আপনাদের পক্ষে উদ্বিগ্ন হবার কথা বটে—কিন্তু আমার পুত্রের মূর্চ্ছারোগ নাই। সমস্ত দিন উপবাস করে হঠাৎ একটা কেমন দুর্ব্বলতা বোধ হওয়ায় ফিটের মত হয়েছিল। ও কিছুই নয়।"

প্রমথবাবু বলিলেন, "তা হতে পারে—কিন্তু—"

সতীশের পিতা অধীর ভাবে বলিলেন, "এর মধ্যে আর কিন্তু নেই। ত' হলে বলুন, আমরা ফিরে যাই।"

নৃপেন দেখিল, মহা বিপদ উপস্থিত! পুনরায় নির্ম্মলের সহায়তা-গ্রহণ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। তখন সে নির্ম্মলের উদ্দেশ্যে ছুটিল। কিন্তু নির্ম্মল তখন গৃহে নাই—বরফ আনিতে চিৎপুরে গিয়াছে।

উৎপীড়িত বর এবং ক্ষুৎপীড়িত বরযাত্রী বিরক্ত এবং অপমানিত বোধ করিয়া প্রত্যা-বর্ত্তনের উপক্রম করিতেছে, এমন সময় একখানা থার্ডক্লাস গাড়ীর মাথায় বরফ লইয়া নির্ম্মল উপস্থিত হইল।

নৃপেন তাড়াতাড়ি নির্ম্মলের নিকট গিয়া বলিল, "মশায়, আবার ত' নূতন বিপদ উপস্থিত।"

ললাট হইতে ঘাম মুছিয়া ফেলিয়া উদ্বিগ্ন-ভাবে নির্ম্মল কহিল, "আবার কি হ'ল?"

"আপনার বাবার ধারণা হয়েছে, সতীশের মূর্চ্ছারোগ আছে, তাই বিবাহ দিতে তিনি অনিচ্ছুক। বর ফিরে যাচ্ছে।"

নির্ম্মল বলিল, "মনে করেছিলাম, দাবা খেলার কথা বাবাকে বলব না—কিন্তু এখন না বললে আর চলে না। নৃপেনবাবু আপনি পাঁচমিনিট বর আটকে রাখুন, আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।" বলিয়া নির্ম্মল উর্দ্ধশ্বাসে তাহার পিতার নিকট ছুটিল।

প্রমথবাবুকে একটু অন্তরালে লইয়া গিয়া নির্ম্মল সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া বলিল।

প্রমথবাবু বিস্মিত হইয়া বলিল, "এত অন্য-মনস্ক! সেও ত একটা মস্ত রোগ! যা হোক এ কথা আমাকে আগে না বলে ভাল করনি। এখন ভদ্রলোকদের পায়ে ধরে ফিরিয়ে আনা যাক্।"

প্রমথবাবু সতীশের পিতাকে দুই হস্তে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া বলিলেন, "আপনার কথাতে আমার মন নিরুদ্বেগ হয়েছে আর কোন দ্বিধা নেই। আপনি দয়া করে বর ও বরযাত্রী নিয়ে দরিদ্রের কুটিরে পদার্পণ করুন।"

৫

সতীশ বেচারা বাসরঘরে নিতান্ত হতাশ হয় নাই। পার্শ্বে লাজনম্র বধূ বিনোদিনীর যত্নাচ্ছাদিত সৌন্দর্য্যের যতটুকু আভাষ পাওয়া যাইতেছিল, তাহাতেই তাহার চিত্ত ভরিয়া উঠিয়াছিল। এবং হাস্যময়ী রহস্যরসিকা শ্যালিশালাজগণের সহিত সুমিষ্ট পরিহাস ও আলাপে সময়টা ফাল্গুনমাসের ফুরফুরে হাওয়ার মত অবলীলাক্রমে বহিয়া যাইতেছিল। তবে দুঃখের বিষয়, সময় অতি অল্প—হঠাৎ কখন পূর্ব্বগগন আরক্তনেত্রে জাগিয়া উঠিয়া সুখের অত্যল্প সময়টুকু নিঃশেষ করিয়া ফেলে।

বিনোদিনীর বড় ভগিনী মণিমালিনী বলিল "তুমি যাহোক, আজ আমাদের খুব ভাবিয়ে-ছিলে! হঠাৎ মূর্চ্ছা কেন হয়েছিল বল দেখি?"

সতীশ মূর্চ্ছার প্রসঙ্গে বিব্রত হইয়া উঠিতে-ছিল। মিথ্যা কথা না বলিলেও নয়—অথচ বিবাহবাসরে বসিয়া অনবরত মিথ্যা কথা বলিতেও তাহার বিরক্তি বোধ হইতেছিল! সে কহিল, "বোধহয় বিয়ের আনন্দেই মূর্চ্ছা হয়েছিল!"

সুবাসিনী হাসিয়া বলিল, "তাই হবে! সে জন্য আমাদের ভয় হচ্ছিল! শুভদৃষ্টির সময় বিনুর মুখ দেখে আবার মূর্চ্ছা না যাও!"

সতীশ হাসিয়া বলিল, "আমারও সেই ভয় হয়েছিল, কিন্তু মুখ দেখে দেখলাম তত ভয়ঙ্কর নয়।"

উষালতা কহিল, "তা হলে পছন্দ হয়েছে দেখ্‌চি !"

সত্যশীলা বলিল, পছন্দ হয়েছে তা আর বুঝতে পাচ্ছনা ? সব কথাতেই দেখছ না কত অন্যমনস্ক, অথচ একজনের দিকে খুব মন আছে। সে একটু নড়ছে কি না, তার মাথার চেলিটি একটু সরে যাচ্ছে কিনা, তার চুড়ির কি রকম শব্দ হচ্ছে সে সব দিকে সম্পূর্ণ লক্ষ্য আছে।"

সতীশ হাসিয়া কহিল, "অথচ তিনি আমার প্রতি কিছুমাত্র মনস্ক নন্। কি দুরন্ত অকৃতজ্ঞতা ! যাই হ'ক, আমি যদি আপনাদের প্রতি অন্যমনস্ক হয়ে থাকি, তা হলে নিশ্চয়ই আমার গুরুতর অপরাধ হয়েছে, ক্ষমা করবেন।"

রমণীগণের চক্ষে চক্ষে একটা ইঙ্গিত বিদ্যুতের মত খেলিয়া গেল। অন্যমনস্কতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করা তাঁহাদের শুধু একটা চক্রান্ত মাত্র।

মণিমালিনী বলিল, "তুমি আর এমন কি অন্যমনস্ক হয়েছ ?" সত্যশীলার দিকে চাহিয়া বলিল, "হ্যাঁ নতুন বৌ, সে সাহেবটা কি ভয়ানক অন্যমনস্ক ভাই ! চুরুট খেতে খেতে ঘরে ঢুকে, চুরুটটা ফেলে দিতে গিয়ে ভুলে মাথা থেকে টুপিটা খুলে জানলা দিয়ে রাস্তায় ফেলে দিয়ে, চুরুটটা টুপীর র‍্যাকে রেখে দিয়েছিল !"

সকলে উচ্চস্বরে হাস্য করিয়া উঠিল। সতীশও হাসিতে লাগিল।

সত্যশীলা কহিল, "আর সেই লোকটা ? যে ছড়ি ঘুরোতে ঘুরোতে ঘরে ঢুকে, অন্যমনস্ক হয়ে নিজের বিছানায় ছড়িটাকে শুইয়ে দিয়ে, নিজে ছড়ি হয়ে, ঘরের কোণে সমস্ত রাত্রি রক্তবর্ণ চোখ করে, জেগে দাঁড়িয়েছিল !"

রমণীগণ অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন। সতীশ হাসিতে হাসিতে কহিল, "চমৎকার !"

সুবাসিনী কহিল, "আর সেই লোকটাই বা কি কম অন্যমনস্ক, যে দাবা খেলায় উন্মত্ত হয়ে, তার স্ত্রীকে সাপে কামড়েছে শুনে বলেছিল 'কাদের সাপ' ?"

সকলে হাসিতে লাগিল। কিন্তু এবার সতীশ আর হাসিতে পারিল না। লজ্জায় তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে বুঝিতে পারিল, হাসিতে হাসিতে যাহার মধ্যে সে অলক্ষ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা তাহাকে ধরিবার জন্য জাল ভিন্ন কিছুই নহে! এখন তাহার মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসাই কঠিন!

কৌতুকপরায়ণা, সুচতুরা এই রমণী কয়েকটি সতীশের দাবা খেলার কথা যে জানিতে পারিয়াছে, এবং সেই জন্যই যে এই সকল গল্পের অবতারণা করিয়াছে, তদ্বিষয়ে সতীশের কোন সন্দেহ রহিল না।

মণিমালিনী কহিল, "সতীশ, তুমি এমন কোন অন্যমনস্কতার গল্প আমাদের শোনাতে পার, যা আরও অসম্ভব, আরও মজার ? যা শুনলে আরও হাসি পায় ?"

সতীশ শুষ্ক হইয়া উঠিতেছিল। কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। স্পষ্ট করিয়া কোনও কথা হইবার পূর্ব্বে কেমন করিয়া সে তাহার দাবা খেলার বিষয়ে কোনও কৈফিয়ৎ দেয়; আর কৈফিয়ৎ দিবেই বা কি ?

গ্রহণ কালের রৌদ্রের মত ফিকা হাসি হাসিয়া সতীশ বলিল, "এর চেয়ে কম অসম্ভব গল্পও আমি জানিনে।"

সুরমা এতক্ষণ কোন কথা কহে নাই, বলিয়া উঠিল, "আমি জানি। একজন তার বিয়ের দিন সন্ধ্যাবেলায়, দাবা খেলায় এমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল যে, যখন তার খেলা শেষ হল তখন রাত্রি সাড়ে নয়টা বেজে গিয়েছে। বাজি মাত্ হোল বটে, কিন্তু এদিকে ততক্ষণে লগ্নও মাত্! অবশেষে সে বেচারা লজ্জা ঢাকবার জন্যে যে কথা বলেছিল, তাতে সে আরও বিপদে পড়বার যোগাড় করেছিল——"

হাসিয়া সকলের নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হইতেছিল। এমন সময়ে তথায় সতীশের শ্বশ্রূঠাকুরাণী উপস্থিত হইলেন। তিনি কহিলেন, "তোমরা সতীশকে একটুও ঘুমতে দিলে না দেখছি, সন্ধ্যাবেলায় অমন অসুখ করেছিল—একটু ঘুমতে দাও, আর গোল ক'রো না।"

অসুখের কথায় কিন্তু গোল দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। রমণীগণ হাসিয়া আরক্ত হইয়া উঠিলেন। সতীশও রক্তবর্ণ হইয়া মনে করিতে লাগিল—কতক্ষণে ভোর হইবে যে বাহিরে পলাইয়া একটু পরিত্রাণ পায়!

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

চিত্রকর যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়

যে কয়জন আধুনিক ভারতবর্ষীয় চিত্রকর স্বদেশে বিদেশে খ্যাতি এবং প্রতিপত্তি লাভ করিয়া জন্মভূমিকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীমান যামিনীপ্রকাশ একজন প্রধান। যোড়াশাঁকোর ঠাকুর পরিবারের দৌহিত্র বংশে তাঁহার জন্ম। বাল্যকালে তিনি সেণ্টজিভিয়ার্স স্কুলের ছাত্র ছিলেন, সেখানকার শিক্ষকগণ তাঁহার রেখাঙ্কণের নিপুণতা এবং চিত্রকার্য্যে বিশেষ প্রীতি দেখিয়া তাঁহাকে চিত্রবিদ্যাশিক্ষায় উৎসাহিত করেন। যখন তাঁহার বয়স দ্বাদশ বৎসর মাত্র তখন স্কুলের পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষ্যে তৎকালীন বড় লাট বাহাদুর লর্ড ল্যাণ্ডসডাউনকে যে অভিনন্দন পত্র উপহার দেওয়া হয়, তাহা তিনি মনোহর বর্ণসুষমায় উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন। চিত্রের সৌন্দর্য্যে লাট মহোদয় এমনি মুগ্ধ হয়েন যে যামিনী

শ্রীযুক্ত যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়

প্রকাশকে নিকটে ডাকিয়া স্নেহবাক্যে উৎসাহিত করেন। এই ঘটনায় বালকের মনে ভবিষ্যতে চিত্রশিল্প সাধনার জন্য একাগ্রতা বাড়িয়া যায়—এবং তখন হইতেই এই ব্রতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া নিশ্চল নিষ্ঠার সহিত সাধনার পথে অগ্রসর হয়েন। রীতিমত শিক্ষার তপস্যা না করিলে, ক্ষমতা যতই থাকুক না কেন, সিদ্ধিলাভ

কাঞ্চন জঙ্ঘায় সূর্য্যোদয়

সম্ভব নয় দেখিয়া পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে যামিনী প্রকাশ C L. Palmer নামক কোনও প্রসিদ্ধ বিদেশীয় চিত্রকরের শিষ্য হইয়া, তাঁহারি অধীনে শিক্ষা সমাপ্ত করেন। যদিও বিদেশী গুরুর শিষ্য তবু তিনি একাল পর্য্যন্ত কেবল মাত্র দেশীয় বিষয় এবং দেশীয় দৃশ্য সকল চিত্রিত করিয়াছেন। তাঁহার চিত্রগুলি প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের সম্মিলন ভূমি, প্রতীচ্য প্রথায় তিনি প্রাচ্য বিষয় সকল অঙ্কন করিয়াছেন, স্বদেশের সৌন্দর্য্য তাঁহার নয়ন ও

মন অধিকার করিয়া ভাবসম্পদে ঐশ্বর্য্যশালী করিয়াছে—বিষয় নির্ব্বাচনের জন্য কখনই তাঁহাকে পরের দ্বারস্থ হইতে হয় নাই। কানন-কুন্তলা, নদীমেখলা, সূর্য্যচন্দ্রালোকে হাস্যময়ী ভারত ভূমির মত সুন্দরী দেশ আছে কিনা জানি না। এখানে প্রকৃতি কেবলই ত সুন্দরী নহেন

রাজকুমার সিদ্ধার্থ ও তাঁহার সারথি

তিনি যে স্নেহময়ী জননী, তাঁহার প্রান্তর-প্রাঙ্গণে অন্নপূর্ণার সদাব্রত। জ্যোৎস্নার একি স্নেহ-মধুর দৃষ্টি, সূর্য্যালোকের একি অনন্ত প্রসার উদারতা। ঋতুপর্য্যায়ের কত বৈচিত্র্য, কত সৌন্দর্য্য, কত মাধুর্য্য! অরুণোদয় এবং গোধূলি শুভলগ্নের কি সুগম্ভীর ধ্যানমৌন

নিস্তব্ধতা। শীতের জ্যোৎস্নাঅনুপ্রাণিত কুজ্ঝটিকা কি অপূর্ব্ব রহস্যময়, বর্ষার ঘননীল মেঘস্তরে কি অপরিমেয় আনন্দ সঞ্চয়, বসন্তের হোরিখেলায় অশোক কিংশুকে কি আন্দোলিত, উচ্ছ্বসিত, অপর্য্যাপ্ত প্রমোদলীলা, আর শরতের প্রকৃতি, শুভ্র ফুল্ল মেঘমালায় উর্ম্মি-

দিনান্ত
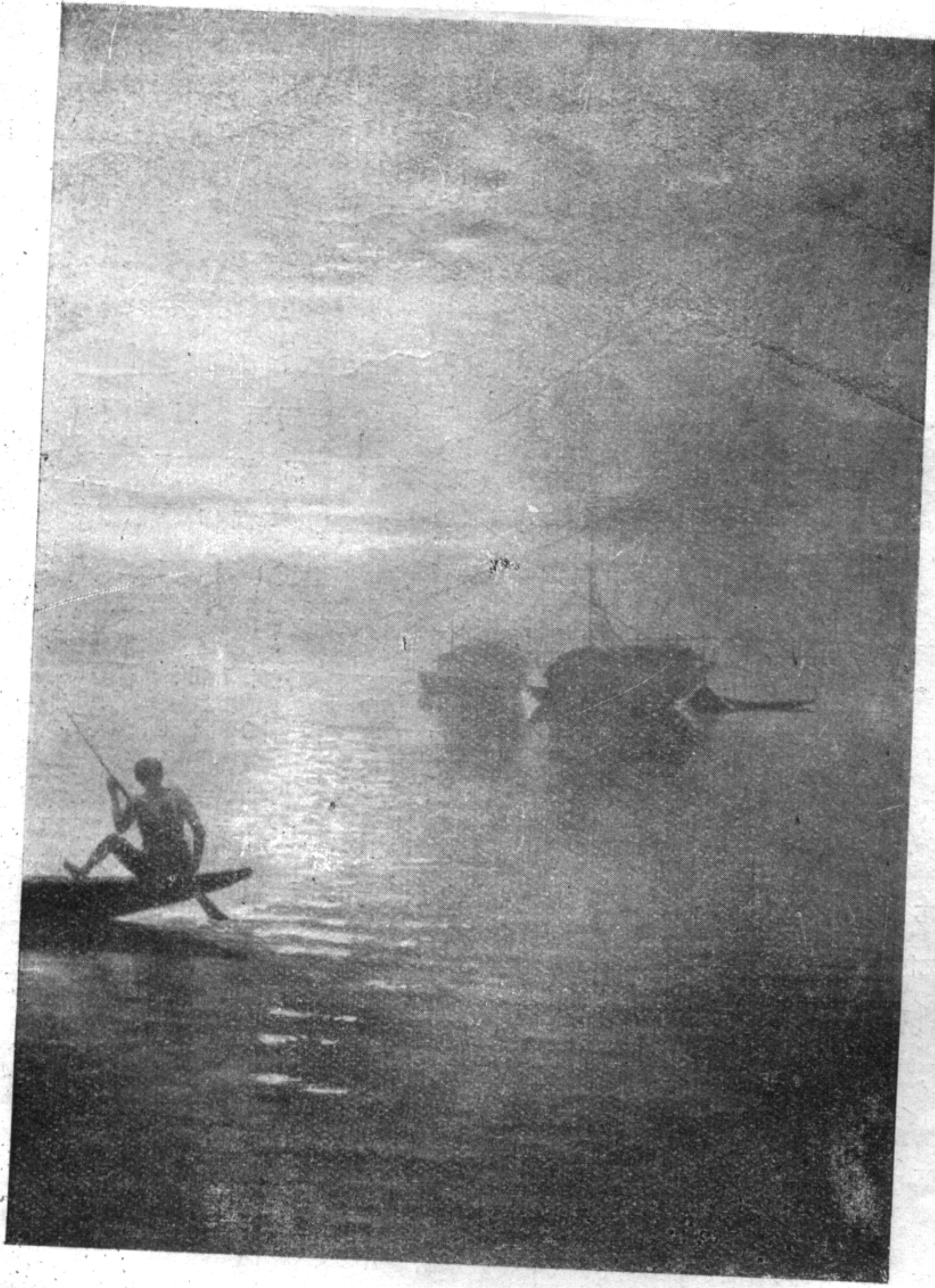
লীলায়িত স্বচ্ছ সুনীল তাহার আকাশে গলিত স্বর্ণ কিরণ, তাহার সুকুমার হরিৎ আলোক-ছায়ায় বেপমান হিল্লোলিত ধান্য ক্ষেত্র, তাহার তুলনা কোথায়? এদেশের নদী সমুদ্র পর্ব্বত বিরাটের অপূর্ব্ব প্রকাশ, আমাদের কাব্য নাটক, পুরাণকথা অগাধ সৌন্দর্য্যসাগর,

এদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া, এই অপার সৌন্দর্য্য রাজ্যের অধিকারী হইয়া কাব্য উপন্যাস কিম্বা চিত্রের প্রকাশ জন্য দেশান্তরের আদর্শ খুঁজিতে যাওয়া যে নিতান্ত হীনতার পরিচয়! যামিনী-প্রকাশ সে দৈন্যের কোনই সাক্ষ্য দেন নাই। তাঁহার দৃশ্যচিত্রগুলি, কাঞ্চন-শৃঙ্গের দিব্য আলোক-উজ্জ্বল উষাকাল, নদী-বক্ষে সন্ধ্যার বিদায়কাতর ম্লানমাধুরী, শ্রীক্ষেত্রের সমুদ্রতটে, আকাশসম্রাট তপন-দেবের অস্তযাত্রার বিরাট সমারোহ, ওয়াল-টেয়ারের সিন্ধু-সৈকতে চন্দ্রোদয়ের জ্যোৎস্না-প্লাবন হইতেই গৃহীত। বিরহবিহ্বল, বাহ্যজ্ঞান-শূন্য, আত্মবিস্মৃত যক্ষের মেঘকে দূতরূপে বরণের কাতরতা, চিতা দর্শনে চির সুখ-লালিত, রাজতনয় গৌতমের ব্যাকুল চেতনা, বৈরাগ্যের প্রেরণা এবং বিশ্বপ্রেমের আহ্বান, তিনি জীবন্তভাবে, উজ্জ্বল বর্ণে, প্রত্যক্ষ-সৌন্দর্য্যে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছেন। যক্ষের কি ব্যগ্রতা, কনকবলয় ভ্রংশ রিক্ত-প্রকোষ্ঠ ক্ষীণ দেহযষ্টির কি সুকুমার সুষমা, ভূলুণ্ঠিত উত্তরীয়াঞ্চলের কতই না অসহায় কাতরতা!

ঊর্দ্ধমুখী লেলিহানশিখা চিতাবহ্নির নিষ্ঠুর আগ্রহ, ক্ষৌমবস্ত্রপরিহিত, অলঙ্কারভূষিত, চন্দনচর্চ্চিত, গৌরাঙ্গ, নবীন কোমল গাত্র, বিলাসললিত, প্রমোদ দৃশ্যে অভ্যস্ত রাজ-তনয়ের একি ভয়ানক জাগরণ, একি অসহ্য আঘাত, তিনি জানিতেন জীবন কেবলি সুখের, মানবজীবন আনন্দমেলা, হায়! তাহার একি শোচনীয় পরিণাম! হস্ত পদের ভঙ্গী, দেবতার অভিমুখে ব্যাকুল প্রার্থনায় ঊর্দ্ধদৃষ্টি এই অকস্মাৎ বেদনা-প্রবুদ্ধ হৃদয়ের অধীর বিস্ময় অতি সুন্দর ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রভুর আক্ষেপ নিবারণ চেষ্টায় সারথি চন্নের সাভিনিবেশ সসম্মান, বিশ্বের এই নিত্য দুঃখবার্ত্তা নিবেদনের ভাব অতি সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে।

যামিনীপ্রকাশের প্রত্যেক চিত্রই ভারত বর্ষীয় জীবনের অংশ—তিনি দিবাবসানে মুসল-মান কৃষকের নমাজের ছবিও আঁকিয়াছেন। মুসলমানদিগের সকল কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া নিয়মিত সময়ে এই উপাসনা সকলকেই মুগ্ধ করে। অস্তোন্মুখ সূর্য্যের স্বর্ণ কিরণ ভক্তের মুদ্রিতনেত্রে স্তব্ধমুখে দিব্য আলোক বিস্তার করিয়াছে। মনে হয় যেন শুধু বাহিরের আলোক নয়, অন্তরের আলোক সেখানে ভাসিয়া উঠিয়াছে। বিস্তৃত প্রান্তরের আর কোথাও জনপ্রাণীর চিহ্নমাত্র নাই; কেবল মাত্র অদূরে লাঙল কাঁধে কৃষকের পালিত গরু দুটি, তাহারাও নিস্পন্দ স্থির, নিয়মিত দৈনিক কর্ত্তব্যের নিরীহ বাধ্যতা যেন মূর্ত্তিমান হইয়া দাঁড়াইয়া আছে! দূরে প্রান্তর সীমায় দুএকটি নিঃসঙ্গ তালবৃক্ষের শীর্ষদেশ গোধূলির দ্রুত তিরোধানোন্মুখ স্বর্ণরশ্মিরেখায় সমুজ্জ্বল! মনে হয় যেন যে জ্যোতিঃপুঞ্জের দর্শন কামনায়, ভক্ত ধ্যানে নিস্পন্দ তাহারি আলোকপাতে জড় জগৎ সুন্দর হইয়া, মুগ্ধ হইয়া স্তব্ধ হইয়া আছে! ভক্তের সাধনার ধন অন্তরে বাহিরে বিশ্বরূপে, জলস্থল আকাশে অপূর্ব্ব মহিমায় পরিব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছেন।

যাহা বর্ণ সুষমায় মনোহর, তাহা ভাষায় ফুটাইয়া তোলা কঠিন—যাঁহারা যামিনী প্রকাশের চিত্র সকল প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন এগুলি ভাব, এবং ভাব

প্রকাশের সৌন্দর্য্যে, বর্ণ এবং গঠন লালিত্যে কত রমণীয়!

যামিনীপ্রকাশ এখনও তরুণ যুবক, ঈশ্বর কৃপায় দীর্ঘায়ু হইয়া, দেশের শ্রীসম্পদ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিতে থাকুন ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।*
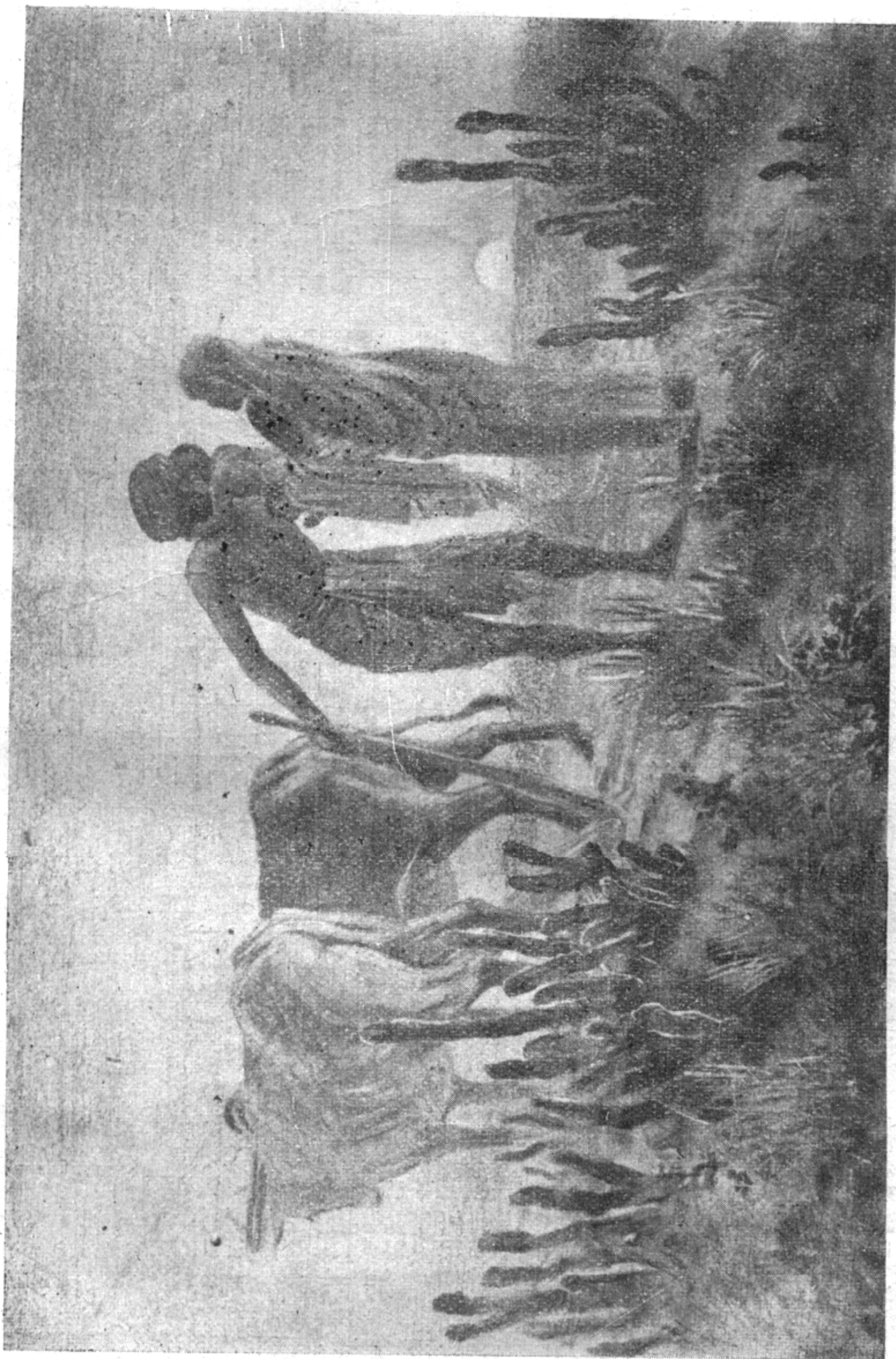
দিন মজুরের মজুরী

* পিক্টোরিয়াল ইণ্ডিয়া নামক নবপ্রকাশিত একখানি ইংরাজি ম্যাগাজিনের নিকট আমরা এই প্রবন্ধের ছবি-গুলির জন্য ঋণী।

নিদিধ্যাসন

(একখানি জাপানী নাটিকা অবলম্বনে)

পাত্র ও পাত্রী।

কর্ত্তা।

গৃহিণী।

ভৃত্য।

প্রথম দৃশ্য।

কক্ষ।

কর্ত্তা। ওহানা সান্ চিঠি লিখেছে, সে আমার আসার আশায় পথ চেয়ে থাক্‌বে; আজ সন্ধ্যাবেলায় যেমন ক'রে হোক দেখা করতে হ'বে। সেই ন'গাঁয়ে চায়ের দোকানে আলাপ, বেচারী দেখ্‌ছি আমায় ভুল্‌তে পারেনি। সন্ধান নিয়ে নিয়ে এতদূর পর্য্যন্ত এসেছে; এসে এখন সহরতলীতে বাসা নিয়ে আছে। কিন্তু যাইই বা কি ক'রে? আমার খ্যাকশেয়ালিরূপিণী অর্দ্ধাঙ্গিনীটির ভারি কড়া পাহারা; ঘাঁটি এড়িয়ে যাওয়া যায় কেমন ক'রে? কী বলা যায় ওকে? কিছু একটা মৎলব আঁটতে হ'ল দেখ্‌ছি! হুঁ, আচ্ছা; একবার ডাকি এই দিকে। ওগো! ওগো! শুন্‌ছ? ওগো!

গৃহিণী। (নেপথ্যে) কি ভাগ্যি! হঠাৎ আমায় যে বড় ডাকা হচ্ছে?

কর্ত্তা। হুঁ, একবার এই দিকে এস।

গৃহিণী। (প্রবেশ করিয়া) হুজুরের যে হুকুম!

কর্ত্তা। দেখ, তোমায় ডাক্‌ছিলুম; কেন তা' জান? এই—ক'দিন থেকে আমি ক্রমাগত দুঃস্বপ্ন দেখ্‌ছি,—তাই—

গৃহিণী। দুঃস্বপ্ন? হজমের গোলমাল হলেই অমন হয়; তা' ও সব তুমি রাত্তির দিন অত ভেব না!

কর্ত্তা। যা' বল্লে। বেশীর ভাগ স্বপ্ন হজমের গোল থেকেই জন্মায়; কিন্তু আমি যে রকম স্বপ্ন দেখি সে হজ্‌মী গুলিতে সারবার নয়; আমার ক্রমেই যেন মন টন সব দমে যাচ্ছে। দিন কতক কোনো তীর্থে গিয়ে থাক্‌ব মনে করছি, দেবতাদের পূজো টুজো দিয়ে দেখা যাক!

গৃ। তা' কোথায় যাবে?

ক। প্রথমে ভেবেছি, সহরে যত দেবতার স্থান, আস্তানা আছে সব জায়গায় পূজো দিয়ে তারপর দেশে যত মঠ মন্দির আছে সব পায়ে হেঁটে প্রদক্ষিণ ক'রে আস্‌ব।

গৃ। না, না, না,—সে হ'বে না; বাড়ী ছেড়ে তোমার কোথাও থাকা টাকা হ'বে না। পূজো আচ্চা, শান্তি, স্বস্ত্যয়ন—যা' কর্ত্তে হয় তা' এই বাড়ীতে বসেই করা ভাল।

ক। বাড়ীতে? হুঃ; বাড়ীতে আবার হাঙ্গামা—

গৃ। হাঙ্গামা কিসের? আমি সব ঠিক ক'রে গুছিয়ে গাছিয়ে দেব এখন; তুমি হাত্তে মাথায় ধুনো জ্বালাও!

ক। কী বল আর কী কও! ও সব কি পুরুষ মানুষের কর্ম্ম? বিশেষ তো আমি!

গৃ। বাড়ী ছেড়ে পূজো ফুজোর কথা আমি কিছুতেই শুন্‌ব না। ও সব হবে টবে না।

ক। বেশ গো বেশ। আমারই কি ইচ্ছে—যে বাড়ী ঘর দোর ছেড়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াই, তুমিও হয়েছ তেম্‌নি অবুঝ, কি যে বল তার ঠিক নেই, একটা মৎলব তো দিতে পারলে না। চুলোয় যাক্‌।...বাড়ীতে? ঘরে ব'সে (চিন্তিতভাবে পরিক্রমণ) এই! হয়েছে—পাওয়া গেছে! মনে পড়েছে,—শ্রবণ—মনন—নিদিধ্যাসন!

গৃ। নিদিধ্যাসন? সে আবার কি?

ক। জান না? তা' না জান্‌বারই কথা, তুমি জান্‌বে কি ক'রে? একি এ কালের কথা? সেই যে যুগে বোধিধর্ম্ম ভারতবর্ষ থেকে ধর্ম্মপ্রচার কর্ত্তে জাপানে আসেন এ সেই যুগের কথা। বোধিধর্ম্ম নিদিধ্যাসন কর্ত্তেন। এ কি ক'রে করে তা জান? ধ্যানকম্বলে আগাগোড়া মুড়ি দিয়ে মন্ত্র জপ কর্ত্তে হয়। কর্ত্তে কর্ত্তে কর্ত্তে যখন ভূত ভবিষ্যৎ সমস্ত চিন্তা মন থেকে মুছে যায়—তখনি মুক্তি, সমস্ত পাপ ক্ষয় হয়ে যায় আর কি! ভারি কঠিন ক্রিয়া।

গৃ। তা—ও কর্ত্তে কতক্ষণ লাগে?

ক। তা' বল্‌তে কি,—তা' কারো কারো দু'তিন হপ্তা লাগে, কারো আবার বেশীও লাগ্‌তে পারে।

গৃ। উহুঁহুঁ, সে হ'বে না, অত দিন কি—

ক। আচ্ছা, না হয়, তুমিই ব্যবস্থা দাও—।

গৃ। ঘণ্টাখানেক—আমি বলি ঘণ্টাখানেক হ'লেই ঢের হ'ল, আচ্ছা সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত না হয় চেষ্টা কোরো—কম্বল মুড়ি দিয়ে থাকতে।

ক। আরে ছিঃ! নেহাৎ ছেলে মানুষের মত কথা বল্‌ছ তুমি! মন স্থির কর্ত্তেই তো সূর্য্যাস্ত! বরং সূর্য্যাস্ত থেকে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত প্রকৃত নিদিধ্যাসনের সময়।

গৃ। সমস্ত দিন—সমস্ত রাত?

ক। হুঁ—উঁ।

গৃ। উহুঁ, ও আমার মনের মতন ব্যবস্থা হ'ল না; আচ্ছা,—তাই সই, যখন তোমার নেহাৎ ইচ্ছে হয়েছে, তাই হোক, একদিন একরাত।

ক। সত্যি বল্‌ছ?

গৃ। সত্যি।

ক। ওঃ সে হলে তো ভালই, সে হ'লে তো ভালই হয়। কিন্তু, দেখ, আমি যেখানে নিদিধ্যাসনে বস্‌ব সে ঘরে স্ত্রীলোকের প্রবেশ নিষেধ। শাস্ত্রে লিখ্‌ছে তা হ'লে সব নষ্ট হবে। উঁকি ঝুঁকিও দিয়ো না, যদি দাও, পাপের ঝুঁকি তোমার উপর। আগে থাকতে সাবধান করে দিচ্ছি, বুঝলে?

গৃ। বেশ, আমি আস্‌ব না গো আস্‌ব না; হল তো?

ক। রাগ ক'রনা, ভালোয় ভালোয় আমার মনস্কাম পূর্ণ হয়ে গেলে, তখন আর আসতে কোনো বাধা নেই।

গৃ। তাই হবে। (গমনোদ্যত)

গৃ। দেখ!—

গৃ আবার কি?

ক। যা' বল্লুম, মনে থাকে যেন, এ ঘরে যেন এসে পড় না। শাস্ত্রে বলে—'হাউ চাউ যার রান্না ঘরে, ধ্যান কর্ব্বে সে কেমন করে'? আর যাই কর—এদিকে কিন্তু এস টেস না।

গৃ। ভয় নেই গো ভয় নেই, আমি এ ঘরের ছাওয়াও মাড়াব না।

ক। তবে শেষ হওয়া পর্য্যন্ত—

গৃ। শেষ হ'য়ে গেলে—কিন্তু ডেকো আমায়।

ক। হাঁ, হাঁ, নিশ্চয়। (স্ত্রীর প্রস্থান) হা—হা—হা, মেয়েগুলো নেহাৎ খাজা, সত্যি ভাব্‌লে নিদিধ্যাসন—হা—হা—হা কম্বল মুড়ি দিয়ে নিদিধ্যাসন হা হা—হা! ওরে ছোকরা—ওই!

ভৃত্য। (নেপথ্যে) আজ্ঞে!

ক। আছিস্ ওখানে।

ভৃত্য। আছি আজ্ঞে। (প্রবেশ)

ক। এই যে হাজির 'আজ্ঞে'।

ভৃত্য। হুজুরের মেজাজটা আজ ফুরতি ফুরতি মালুম হচ্ছে—

কর্ত্তা। আজ্ঞে; ফুরতির কারণ আছে, আজ্ঞে, আজ ওহানা সানের সঙ্গে দেখা করতে যাব, তা তো তুই জানিস্; কিন্তু তোর মা ঠাকরুণ বোধ হয় ব্যাপারটার আঁচ পেয়েছে। তাকে ভোলাবার এক ফিকিরও করিছি। তাকে বলিছি যে আজ সমস্ত দিন রাত কম্বল মুড়ি দিয়ে ধ্যান করব।

ভৃত্য। জবর ফিকির—

ক। আজ্ঞে; এখন তোকে একটা কাজ করতে হ'বে। পারবি কি না, বল্।

ভৃত্য। বলুন্ এগিয়ে—

ক। বলি, শোন্; কথাটা হচ্ছে এই, যে তোকে আমার বদলে কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে থাক্‌তে হ'বে,—আমি ফিরে আসা পর্য্যন্ত,—বুঝিচিস্ তো? যদিও তোর মাঠাকুরুণকে এ ঘরে ঢুক্‌তে বারণ করিছি, তবু, কি জানি? যদিই ঢোকে,—সাবধানের মার নেই—কি বলিস্?

ভৃত্য। আজ্ঞে, তার আর কি? কম্বল মুড়ি দেওয়াটা আর বেশী কথা কি? তবে, যদি ঠাক্‌রুণের কাছে ধরা পড়ি, তো পরাণটা যাবে, তাই বল্‌ছিলাম কি—

ক। বল্‌ছিলুম টল্‌ছিলুম নয়। এ তোকে কর্ত্তেই হবে; প্রাণ যাবে কি? আমি থাক্‌তে প্রাণ যাবে কি রকম? আমি যখন রইছি তখন তোর ভয় কি?

ভৃত্য। তা' আপুনি যখন বল্‌ছ তখন ভয় নেই;—তা' এবারটা আমায় মাপ কর।

কর্ত্তা। না, না, সে হবে না; এ তোকে কর্ত্তেই হ'বে, আমি যখন বল্‌ছি তখন তোর মাথার একগাছ চুল ছোঁয় কার সাধ্য।

ভৃত্য। মাফ করুন, কর্ত্তা মাফ করুন।

কর্ত্তা। আরে গেল যা! গিন্নির ভয়ই ভয়, কর্ত্তাটা কেউ নয়—না? এত বড় আস্পর্দ্ধা তোর তুই আমার হুকুম অমান্য করিস্!

ভৃত্য। (জিভ্ কাটিয়া) বাপ্ রে!

কর্ত্তা। আমার উপর টেক্কা!

ভৃত্য। না হুজুর না, আপুনি যা বল, সব শুন্‌ব।

কর্ত্তা। সত্যি বল্‌ছিস্ তো—ঠিক?—অ্যাঁ?

ভৃত্য। আজ্ঞে।

কর্ত্তা। হীঃ—হীঃ, আমি তোকে ভয় দেখাচ্ছিলুম; তবে থাকিস্, বুঝ্‌লি!

ভৃত্য। হুজুরের যে হুকুম হয়।

কর্ত্তা। বস্ এইখানে, আমি নিজেই তোর

নিদিধ্যাসনের ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি। নড়িস্ নে।

ভৃত্য। যে আজ্ঞে।

কর্ত্তা। এম্নি ক'রে বস্—এই।

ভৃত্য। আজ্ঞে পায়ে হাত দিয়ো নি।

কর্ত্তা। দেখ্, এই কম্বলটা এইবার বেশ ক'রে মুড়ি দিয়ে নে। একটু কষ্ট হ'বে—তা' আর কি করবি বল্।

ভৃত্য। যে আজ্ঞে।

কর্ত্তা। এই—এই। কিন্তু খবরদার! তোর মাঠাকরুণ যদি কম্বল খুলতে বলে—খবরদার খুলিস্ নে—বুঝিচিস্ তো?

ভৃত্য। সে আমাকে শিখুতে হবে নেই। আপুনি ভয় করবেন নাই।

কর্ত্তা। আমি শীগ্গিরই ফিরব, বেশী দেরী হবে না।

ভৃত্য। দয়া ক'রে একটুকু শীগ্গিরি এস যেন হুজুর।

কর্ত্তা। যাক্, বাঁচা গেল, এইবার বেরিয়ে পড়া যাক্; ওহানা হয় তো আমার বিলম্ব দেখে এতক্ষণ অস্থির হ'য়ে উঠেছে।

[প্রস্থান

(জানালায় গৃহিণীর প্রবেশ)

গৃহিণী। উঁহুঁ, আমার কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে, আমায় অতবার ক'রে এ ঘরে আস্তে মানা করলে কেন? ধ্যান ভঙ্গ হ'বে?...তা একবার বারণ করলেই তো হ'ত;...উঁকি ঝুঁকি দিয়ে দেখতেও মানা করলে,.. আমার ভারি সন্দেহ হচ্ছে (দরজার কাছে আসিয়া উঁকি দিয়া) এ কি? নাঃ, ভারি কষ্টের ব্রত, একেবারে আগাগোড়া মুড়ি! আমি হ'লে হাঁফিয়ে মরতুম। (অগ্রসর হইয়া) ওগো দেখ, দেখ, তুমি আমায় আস্তে বারণ ক'রেছিলে,—কিন্তু আমি থাক্তে পারলুম না; কম্বলের ভিতর কষ্ট হ'চ্ছে? অ্যাঁ? কষ্ট হচ্ছে? একবার একটু চা খেয়ে নিলে হ'ত না?...হ্যাঁ গা! একটু চা? নিয়ে আস্ব? (কম্বলের ভিতর হইতে অসম্মতি সূচক শিরশ্চালন) বুঝিচি, বুঝিচি, তুমি রাগ ক'রেছ,—রাগ করবারই কথা; তুমি অত ক'রে বারণ করলে তবু এসিচি, আমার ঘাট হয়েছে, তুমি আমায় এবারের মতন মাফ্ কর; আমার কথা রাখ, ওই কম্বলটা একটু ফাঁক করে দাও, মুখে মাথায় হাওয়া লাগুক্—তোমার কষ্ট হ'চ্ছে (পুনর্ব্বার কম্বলের ভিতর হইতে অসম্মতি সূচক শিরশ্চালন) না, না! "না" বল্লে হ'বে না; তোমার মুড়ি দেওয়া দেখে আমার হাঁফ্ ধরছে; ও তোমায় খুল্তেই হ'বে; শুন্ছ? ওগো! হাঁফ ধরবে খুলে ফেল; খোলো খোলো (কম্বল ধরিয়া টানাটানি করিতে করিতে ভৃত্য বাহির হইয়া পড়িল) এ কি! তুই! তুই হতভাগা! তোর বাবু কোথায় গেল? বল্! বল্! বল্বি নে? বল্বি নে?

ভৃত্য। তা তো আমি বল্তে পার্লাম্ নেই।

গৃহিণী। রাগে আমার সর্ব্বশরীর জ্বলে যাচ্ছে,—সর্ব্বশরীর জ্বলে যাচ্ছে; নিশ্চয় সেই পোড়ারমুখীর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া হয়েছে। (ভৃত্যের প্রতি) তুই জানিস্ নে? আমার সঙ্গে চালাকি? বল্বি নে? বল্বি নে? বল্ শিগ্গীর, নইলে তোকে আস্ত রাখ্ব না, এই ব'লে দিলুম।

ভৃত্য। আজ্ঞে, আমি—আমার কি

অপরাধ? তা আপুনি যখন সুধুচ্চেন—তখন আর ঢাক্ ঢাক্ গুড় গুড় ক'রে কি করব? বাবু মশায় ও হানা ঠাকরুণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেই গেছেন।

গৃহিণী। কি বল্লি? ও হানা ঠাকরুণ? ও হানা কুকুর—বল্—ওহানা কুকুর। দেখা করতে গেছে?—গেছে? আঁা?

ভৃত্য। আজ্ঞে।

গৃহিণী। রাগে আমার চোখ্ দিয়ে—জল আস্‌ছে, আমার কান্না পাচ্ছে (ক্রন্দন)।

ভৃত্য। তা তো' হ'তেই পারে; কান্না তো পেতেই পারে।

গৃহিণী। (চোখ মুছিয়া) থাম্ তুই, তোকেও ঘা কতক দিতুম, যদি সব কথা খুলে না বল্‌তিস্। এবারের মতন মাফ করলুম্। এখন ওঠ্!

ভৃত্য। আজ্ঞে, আপুনি হলেন মুনিব আপনার কাছে তঞ্চক?

গৃহিণী। আচ্ছা, আচ্ছা, এখন বল্—ঠিক করে বল্, এ কম্বলের ভিতর তুই কেন বসেছিলি?

ভৃত্য। আজ্ঞে বাবুর হুকুম, আমায় বাবু বল্লে "তুই এমনি ক'রে আসন পীঁড়ি হ'য়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে থাক্" আমি গোড়ায় রাজী হই নেই, শেষে বাবু ভয় দেখাতে নিম্‌রাজী গোছ হ'য়ে—থাক্‌তে হ'ল।

গৃহিণী। তা' তোর আর দোষ কি? দেখ্, এখন তোকে আমার একটি কাজ করতে হবে; কেমন পারবি তো?

ভৃত্য। তা আর পারব নেই?

গৃহিণী। তবে নে, এই কম্বলটা নিয়ে আমার আপাদমস্তক ঢেকে দে; তোর বাবু যেমন ক'রে তোকে ঢেকে দিয়েছিল ঠিক্ তেম্‌নি; বুঝ্‌লি তো?

ভৃত্য। আজ্ঞে আপুনি মাবাপ, তোমার কথা কি আমি ঠেল্‌তে পারি? তবে, বাবু মশায় যদি জানতে পারে, তবে আমাকেও টেরটা পাইয়া দেবে।

গৃহিণী। না, না; কিছু বল্‌বে না, আচ্ছা, বলে তো আমি তার দায়ী, এখন নে।

ভৃত্য। আজ্ঞে এবারটা আমায় ছাড়ান্ দিলে গরীব বেঁচে যাই।

গৃহিণী। বল্‌ছি তোর কোনো ভয় নেই তবু ভ্যান্ ভ্যান্ করবি? বাবু যদি তোর গায়ে হাত দেয় তো আমি তাকে দেখে নেব।

ভৃত্য। আজ্ঞে, তা হ'লেই হল, আপুনি যখন মধ্যস্থ হচ্ছ তখন আর ভয়টা কিসের?

গৃহিণী। তা' আর বল্‌তে, এখন নে দিকিন্।

ভৃত্য। এগিয়ে—বস আপুনি।

গৃহিণী। (তথাকরণ) বসিছি।

ভৃত্য। আপনার কষ্ট হ'বে কিন্তুন্—

গৃহিণী। তা হোক্। কিন্তু দেখ এমন ক'রে ঢাকা দিয়ে দিবি যেন বুঝ্‌তে না পারে।

ভৃত্য। ইস্! সাধ্যি! আমি মড়া ঢাকার মতন ক'রে ঢেকে দেব; দেখ, না, আপুনি।

গৃহিণী। হ'য়েছে; এখন যা' তুই—জিরু গে।

ভৃত্য। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থানোদ্যত

গৃহিণী। ওরে দাঁড়া, দাঁড়া, সব ফাঁশ ক'রে দিস্‌নি যেন, বুঝিচিস্ তো?

ভৃত্য। তা' আর বল্‌তে।

গৃহিণী। আমি শুনছিলুম যে তোর নাকি একখানা রেশমী চাদরের সখ্ হ'য়েছে? সত্যি? তা' তার আর ভাবনা কি? আমি তোকে দেব, বুঝিচিস? আমার নিজের তৈরী একটা পয়সা রাখ্‌বার রেশমী গেঁজেও সেই সঙ্গে দেব এখন।

ভৃত্য। আজ্ঞে আপুনি মা বাপ—

গৃহিণী। এখন যা' পালা।

ভৃত্য। যে আজ্ঞে।

কর্ত্তা। (নেপথ্যে গান)

ভোরের পাখী ডাক্‌বে ভোরে,—
তোমার বা' কি? আমার বা কি?
চোখে দেখেই ফিরব, ওরে!
ভোরের আমি খোঁজ কি রাখি?
ঝাউয়ের বনে উঠ্‌ছে হাওয়া,
পড়ছে মনে তার সে আঁখি।
জড়িয়ে গেছে মলিন ছায়া
আলোর লেখা নাইক বাকী।

(প্রবেশ করিয়া) দুনিয়ার গতিক্‌ই এই; গোপন প্রেমের ধারাই এম্‌নি; কিন্তু তা' বলে কি ভুল্‌তে পারা যায়; তাকে যতই দেখ ছি মনটা ততই যেন তার উপর বসে যাচ্ছে।

আহা, ভুল্‌তে নারি ভুল্‌তে নারি
ফাগুন ফুলের ফুল্‌কি,
কপালে তার নতুন বাহার
ফুলের মতন উল্‌কি!

আরে ছ্যা ছ্যা, এ করছি কি? পাগলের মতন নিজের মনেই বক্‌ছি যে! বাঃ! আর ওদিকে চাকর ছোঁড়াটা কম্বলের ভিতর হাঁপিয়ে মারা যাচ্ছে। ওরে! ওরে! ও ছোকরা! আমি এসেছি! আমি এসেছি!

তোর ভারি কষ্ট হ'য়েছে...তা' কি করব বল্...আঃ বসা যাক্ (উপবেশন) ওরে কম্বলটা এইবার খুলে ফেল না, আর নিদিধ্যাসনের দরকার কি?...লজ্জা হচ্ছে বুঝি আমার সাম্‌নে ধ্যান ভাঙ্‌তে লজ্জা হচ্ছে...হা! হা! হা! ...তা' থাক্ একটু জিরিয়ে নিই ততক্ষণ। ততক্ষণ ওহানাসানের সব কথাবার্ত্তা তোকে বলি শোন্; শুন্‌তে ইচ্ছে হয় তো বল্, অ্যাঁ? (কম্বলের ভিতর সম্মতি সূচক শিরশ্চালন) বেশ! বেশ! তবে বলি শোন্। এখান থেকে বেরিয়ে তো একরকম উর্দ্ধশ্বাসে ছুট্‌তে সুরু করা গেল, তা সত্ত্বেও পৌঁছুতে প্রায় সন্ধ্যা হ'য়ে গেল। মনে মনে ভাব্‌ছি ওহানা সান্ আমার বিলম্ব দেখে না জানি কতই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। চীনেদের কবি লি-শং-য়িনের মতন সে হয় তো বল্‌ছে—

"কথা দিয়েছিল, তবুও এল না,
তৃতীয় প্রহর কাটিল জাগি;
দেবদারু বনে পল্লব নড়ে
আমি ভাবি—মোর বন্ধু না কি?"

এই কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে চলিছি এমন সময় শুন্‌তে পেলুম কে গুণ গুণ স্বরে গাইছে—

বাতির আলো মলিন হ'ল
বাইরে কাঁদে হাওয়ার বীণা;
পথ চেয়ে মন—ক্লান্ত—নয়ন,
বল্‌গো সে আজ আস্‌বে কিনা!

এ ওহানার গলা না হ'য়ে যায় না; আমি আস্তে আস্তে শিকলটি নাড়লুম। অম্‌নি ভিতর থেকে ওহানা বলে উঠ্‌ল 'কে গো? কে?' তখন বৃষ্টি পড়ছে, আমি

হয় ?' অম্‌নি পায়ের শব্দ, আর সঙ্গে সঙ্গে রিনিঝিন্ ক'রে খিড়কীর শিকলী খুলে ওহানা সান্ একেবারে আমার সাম্‌নে হাজির। সে আমাকে হাত ধ'রে খাতির ক'রে বাড়ীর ভিতর নিয়ে গেল; আর বারে বারে বল্‌তে লাগ্‌ল "আমরা পাড়াগেঁয়ে লোক, সহুরে লোকের আদব-কায়দা জানিনে, মাপ্ করবেন।" তার পর সে তোর কথা জিগ্‌গেস্ করলে, বল্লে 'তোমার সেই চাকর ছোকরাটিকে নিয়ে এলে না কেন ?" আমি তখন নিদিধ্যাসনের কথা খুলে বল্লুম,—তোকে যে বকল্‌মা দিয়ে এসেছি তাও বল্লুম, শুনে খুব হাস্‌তে লাগল। তার পর আবার ওহানা তোর জন্যে দুঃখ করতে লাগল, বল্‌লে, "আহা! বেচারা আমাদের জন্যে কম্বল মুড়ি দিয়ে এতক্ষণ না জানি কত কষ্টই ভোগ করছে; ছোক্‌রা তোমার ভারি বাধ্য; তার যাতে ভাল হয় সে দিকে কিন্তু তুমি দৃষ্টি রেখ। ওর এই সব কথাবার্ত্তা শুনে আমি তো একেবারে মুগ্ধ হ'য়ে গেলুম, ভাব্‌তে লাগ্‌লুম, ও হানাসনের হৃদয়, কী মধুর! সামান্য একজন চাকরের দুঃখে সে দুঃখিত; আর আমার খ্যাঁকশেয়ালি রূপিনী গৃহিণী?—কেবল খ্যাঁক্ খ্যাঁক্ করতেই আছেন! (কম্বলের ভিতর বিষম চঞ্চলতা) তার পর বুঝ্‌লি, দু'জনে মিলে দস্তুর মত জল যোগ ক'রে একটু বিশ্রাম করা গেল, কত গল্প গুজব চ'ল, কত হাসি, কত আমোদ। হঠাৎ মঠে মন্দিরে মধ্য রাত্রির ঘণ্টা বেজে উঠ্‌ল, আমিও বিদায় নেবার জন্যে প্রস্তুত হলুম। ওহানা কি আমায় ছাড়তে চায়? শেষে অনেক মিনতি ক'রে বলায়, সে কবিতায় বলে উঠ্‌ল—

ভেবেছিনু হায় কত কি তোমায়
বলিব আমি,
স্বপনে জানিনি এত অল্পেতে
ফুরাবে যামী;
বিদায়ের ক্ষণ সহসা এসেছে,—
ভেসেছে আঁখি,
যত বলিবার ছিল আধা তার
রয়েছে বাকী!

আমারও চলে আস্‌তে মন সরছিল না; কিন্তু মঠে মন্দিরে ঘণ্টা বেজে উঠেছে, সুতরাং আর বিলম্ব করলে সময়ে ফিরতে পারব না ভেবে, কাজে কাজেই আমায় উঠ্‌তে হ'ল; তখন ওহানা বল্‌লে "মঠ মন্দিরের নিঃসংসারী নির্দ্দয় মোহন্তগুলো ঘণ্টা বাজিয়ে আমার হৃদয়ের সুখ-শান্তির আজ হন্তারক হ'ল।" তখন তার চোখ্ ছল্ ছল্ করছে। কিন্তু কি করব? তবু ও চলে আস্‌তে হ'ল।

চ'লে এলাম শিথিল ক'রে বাহুর
বাঁধন খানি,
বাহুলতার কোমল বাঁধন তার;
চ'লে এলাম, চলে এলাম কপালে কর হানি'
সজল দু'চোখ মুছে বারম্বার!
সজল চোখে আমার পানে রইল চেয়ে রাণী
দেখ্‌তে আমায় পেলে যতক্ষণ,
পথের বাঁকে হারিয়ে শেষে গেল ছবিখানি
বাঁকা চাঁদের আলোয় অদর্শন।

(নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন) এম্‌নি ক'রে নিষ্ঠুরের মতন চলে এলাম, আস্‌তে হ'ল—(পুনর্ব্বার অশ্রু মোচন) আ-আ! ওরে তুই এখনো কম্বল মুড়ি দিয়ে রইছিস্—দেখ্ আমি তা' ভুলে গিইছলুম—কথায় কথায় ভুলে গিইছিলুম, খুলে ফেল—খুলে ফেল,—আহা

তোর কষ্ট হ'চ্ছে, কম্বল খানা খুলে ফেল,—ও কি? তুই বসে বসে ঘুমুচ্ছিস্ নাকি? আচ্ছা, আমিই খুলে দিচ্ছি; আরে! ছাড় কম্বল! আরে—এ আবার তোর কি খেয়াল? খোল্ কম্বল!

(টানাটানি করিতে কম্বল খুলিয়া পড়িল এবং চণ্ডীমূর্ত্তি গৃহিণী লাফ দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন।)

গৃহিণী। আমার খুন চেপেছে! আমার খুন চেপেছে! এই তোমার নিদিধ্যাসন! এই তোমার ধর্ম্ম কর্ম্ম! আমার চোখে ধুলো দিয়ে ওহানার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া!

কর্ত্তা। আরে না, আরে না, আমি ধ্যান করছিলুম—সত্যি বল্‌ছি—সত্যি।

গৃহিণী। কী! আবার মিছে কথা! আমাকে বোকা বানাতে চাও! আমি কিছু জানি নে? এই তোমার নিদিধ্যাসন? আমায় আবার খ্যাঁকশেয়ালি বলা? আমি খ্যাঁক খ্যাঁক ক'রে কামড়াই? আমায় ফাঁকি দিয়ে—ও কি? যাও কোথায়—যাও কোথায়? (পশ্চাদ্ধাবন)।

কর্ত্তা। আরে না—আরে না তোমায় আমি কিছু বলি নি, আমি মাফ্ চাইছি, মাফ্ চাইছি।

গৃহিণী। ফের মিছে কথা? বল কি খ্যাঁক্‌শেয়ালি? ফের মিছে কথা?—চালাকী? যাওয়া হয়েছিল কোথায়?—যাওয়া হয়েছিল কোথায়?

কর্ত্তা। তোমার কাছে আমি কি মিছে কথা কইছি? তোমার কাছে কি লুকুচ্ছি? সহরের যত মঠেমন্দিরে, পূজো—পূজো—পূজো—

গৃহিণী। হুঁ, পূজো—পূজো—এই যে পূজো দেখাচ্ছি।

কর্ত্তা। মাফ কর,—আমি মাফচাইছি—আমি মাফ চাইছি—

গৃহিণী। (ঝাঁটা লইয়া) এই যে মাপকাঠি—মাফ্ চাওয়াচ্ছি—

(কর্ত্তার পলায়ন)

পালিয়ে গেল—হাড়জ্বালানে পালিয়ে গেল!—ওগো ধর! ধর! ধর! পালাবে কি? পালাবে কোথায়? আমার রাগটা মাঠে মারা যাবে? ধর! ধর!

যবনিকা।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

দর্পণকুমারী

(১)

আসিকাগা শোগুনের রাজত্বকালে মিনামি-ইসের ওগাওয়াচি মাওজিন দেবের সুবিখ্যাত মন্দিরের প্রায় ধ্বংসাবস্থা। সে দেশের শাসনকর্ত্তা লর্ড কিতাআতাকে তখন যুদ্ধ প্রভৃতি নানারকম ব্যাপারে এরূপ বিপন্ন যে মন্দির সংস্কারের ব্যয় সঙ্কুলানের ক্ষমতা তাঁহার একেবারেই ছিল না। মন্দিরের শিন্তো পুরোহিত মাৎসুমুরা হায়োগো অনন্যোপায় হইয়া লর্ড হোসোকাওয়ার শরণাপন্ন হইলেন;—কারণ তিনি জানিতেন শোগুনের উপর তাঁহার যথেষ্ট প্রভাব—

তিনি ইচ্ছা করিলেই তাঁহাকে বলিয়া মন্দির নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিতে পারেন।

লর্ড হেসোকাওয়াও তাঁহার প্রার্থনার কথা শোগুনকে জানাইবার জন্য প্রতিশ্রুত হইয়া বলিলেন যে শোগুন মন্দির-সংস্কারের জন্য অর্থ সাহায্য করিতে সম্মত হইলেও তৎপূর্ব্বে রীতিমত সন্ধান লইবেন—সেজন্য যথেষ্ট বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা আছে;—এরূপ ক্ষেত্রে, যতদিন না সে সকল বন্দোবস্ত শেষ হয় ততদিন তাঁহার মতে মাৎসুমুরা হায়োগোর রাজধানীতে থাকাই কর্ত্তব্য। অনন্যোপায় হইয়া মাৎসুমুরা তাঁহার পরিবারবর্গকে কিয়াতো নগরে লইয়া আসিলেন এবং বাসের জন্য পুরাতন কিয়োজোকু পল্লীতে একটি বাটীভাড়া করিলেন।

বাড়ীটি বেশ বড় এবং দেখিতে সুন্দর হইলেও অনেক দিন হইতে খালি পড়িয়াছিল। লোকে এটাকে হানাবাড়ী বলিত। বাড়ীটির উত্তরপূর্ব্বদিকে একটা কূপ ছিল; ইতিপূর্ব্বে পর পর এই বাটীর কয়েকজন ভাড়াটিয়া এই কূপের মধ্যে লাফাইয়া প্রাণত্যাগ করে; তাহাদের এইরূপ আকস্মিক মৃত্যুর কোনও বিশ্বাসযোগ্য কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। মাৎসুমুরা শিন্তো-পুরোহিত, অপদেবতা প্রভৃতিকে তাঁহার ভয় করিবার কোন কারণ ছিল না; তিনি তাঁহার নূতন বাসায় নিরুদ্বেগে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

সে বৎসর গ্রীষ্মকালে দেশের চারিদিকে জলকষ্ট। কয়েকমাস ধরিয়া এক ফোঁটাও বৃষ্টি পড়ে নাই; নদীর জল শুষ্ক, কূপ পুষ্করিণী শুখাইয়া পাঁক দেখা দিয়াছে; রাজধানী কিয়াতোও এ জলকষ্ট হইতে পরিত্রাণ পায় নাই; কিন্তু মাৎসুমুরার বাগানের সেই কূপটির প্রায় কানায় কানায় জল! সে জল কাকচক্ষুর মত নীল, স্বচ্ছ, বরফের মত শীতল; দেখিয়া মনে হইত কূপের তলদেশে কোথাও একটি গুপ্ত উৎস আছে! এই জলকষ্টের দিনে সহরের এবং তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ জনপদের বহু নরনারী এই কূপ হইতে জল লইতে আসিত—যাহার যত ইচ্ছা জল তুলিয়া লইয়া যাইত—মাৎসুমুরার তাহাতে কোনও আপত্তি ছিল না—কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, জলের এত ব্যবহার সত্ত্বেও কূপের জল একেবারেই কমিত না।

একদিন প্রভাতে উঠিয়া সকলে দেখিল কূপের ভিতর কাহার প্রাণহীন দেহ ভাসিতেছে! অনুসন্ধানে জানা গেল বেচারা নিকটবর্ত্তী কোনও গৃহস্থের ভৃত্য, মনীবগৃহের জন্য লইতে আসিয়াছিল। তাহার এরূপে আত্মহত্যা করিবার কোনও প্রকৃষ্ট কারণ খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। মাৎসুমুরার তখন সহসা মনে হইল, বাড়ীভাড়া করিবার সময় তিনি যে জনরব শুনিয়াছিলেন, তাহা হয়ত সত্য, হয়ত এই সকল ঘটনার সহিত বাস্তবিকই অপদেবতার কোনও সম্পর্ক আছে।

তিনি স্থির করিলেন কূপটার চারিদিকে একটা প্রাচীর দিয়া ভবিষ্যতে এরূপ অকারণ প্রাণীহত্যা নিবারণ করিবেন। একবার স্থানটা ভাল করিয়া দেখিবার জন্য তিনি কূপের নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন। তখন স্থানটি সম্পূর্ণ নির্জ্জন, তাহার সঙ্গেও অন্য কোন লোক ছিল না।

সহসা তাহার মনে হইল যেন কূপের
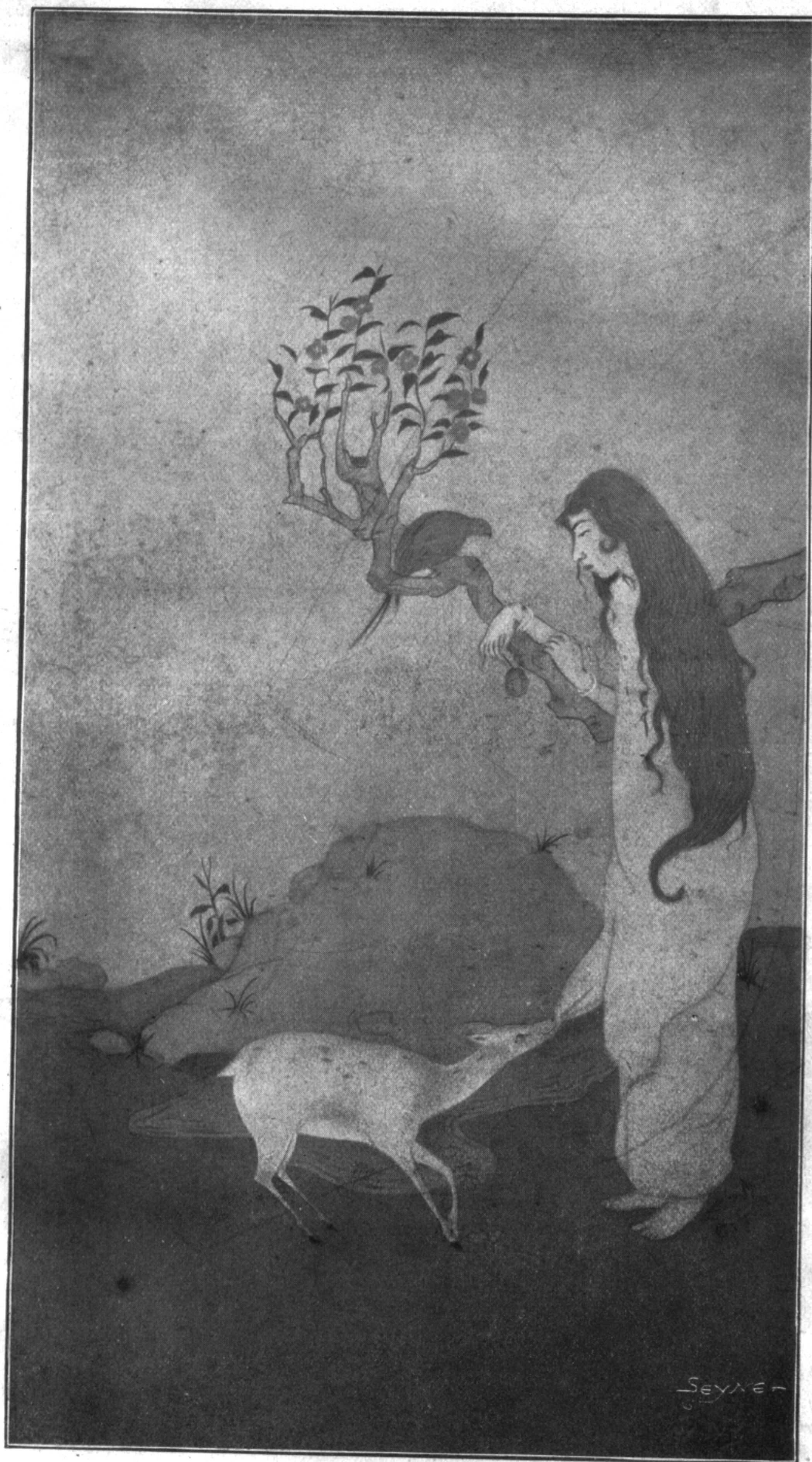
শকুন্তলা

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার অঙ্কিত চিত্র হইতে

জল কোনও জীবিত বস্তুর সঞ্চালনে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল; মুহূর্ত্ত পরেই জলের চঞ্চলতা থামিয়া গেল; মাৎসুমুরা একটু অগ্রসর হইয়া দেখিলেন সেই স্থির জলরাশির উপর প্রতিবিম্বিত একটি ১৯।২০ বৎসর বয়স্কা, পূর্ণযৌবনা, অনিন্দ্য সুন্দরী রমণীমূর্ত্তি! রমণী তখন প্রসাধনে নিযুক্তা। মাৎসুমুরার বেশ স্মরণ আছে রমণী তখন ওষ্ঠে রং লাগাইতেছিল। প্রথমে রমণীর মুখ মণ্ডলের পার্শ্বদেশমাত্র দেখা যাইতেছিল, কিন্তু ক্ষণপরে মূর্ত্তিটি তাঁহার দিকে সম্পূর্ণ ফিরিল; সঙ্গে সঙ্গে রমণীর ওষ্ঠে মৃদু হাসি দেখা দিল!

সহসা কে যেন তাঁহার বক্ষে আঘাত করিল; মদের নেশার মত তাঁহার মাথার ভিতর একটা নেশা চাপিয়া বসিল, চারিদিক অন্ধকার হইয়া আসিল—আর সেই অন্ধকারের মধ্যে তাঁহার চক্ষের সম্মুখে জ্যোতির্ম্ময়ী হইয়া ফুটিয়া উঠিল—সেই চাঁদের আলোর চেয়ে সুন্দর, ফুটফুটে হাসিমাখা মুখখানি! তাঁহার মনে হইল কে যেন তাঁহাকে সেই অন্ধকারের ভিতর দিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে। যথাসম্ভব চেষ্টা করিয়া, হৃদয়ের সমস্ত বল প্রয়োগ করিয়া তিনি নিজেকে সামলাইয়া লইলেন এবং সজোরে চক্ষুদ্বয় মুদ্রিত করিলেন। তাহার পর তিনি চক্ষু খুলিয়া দেখেন চারিদিকে আলো, সে রমণীর ছায়ামূর্ত্তি অদৃশ্য, তিনি একেবারে কূপের পাড়ের উপর দাঁড়াইয়া আছেন; আর এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার সে নেশার ঘোর থাকিলে—তাঁহাকে সেই কূপে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতে হইত!

গৃহে ফিরিয়া তিনি বাড়ীর সকলকে কূপের সন্নিকটে যাইতে বারণ করিয়া, যাহাতে বাহিরের অপর কেহ উহার কাছে যাইতে না পায়, সে বিষয় সকলকে সতর্ক থাকিতে বলিলেন। পরদিন প্রাতে মিস্ত্রি ডাকাইয়া তিনি কূপের চতুর্দ্দিকে এক সুদৃঢ় প্রাচীর গাঁথাইয়া দিলেন।

সাতদিন পরে, একদিন সহসা মুষলধারায় বৃষ্টি দেখা দিল—সঙ্গে সঙ্গে দারুণ ঝড়, বিদ্যুৎ ও অশনিসম্পাত! মেঘের মুহুর্মুহু গর্জ্জনে কর্ণ বধির হইয়া উঠিল; মনে হইতে লাগিল যেন ভূমিকম্পে সারা দেশটা ঘন ঘন কাঁপিয়া উঠিতেছে। অনবরত তিন দিন ও তিন রাত্রি এইরূপ বৃষ্টি বিদ্যুৎ ও মেঘের গর্জ্জন চলিতে লাগিল, তিলেকের তরেও বিরাম নাই। সঙ্গে সঙ্গে কামোগাওয়া নদীতে বান দেখা দিল; এমন বান নাকি ইতিপূর্ব্বে কেহ কখনো দেখে নাই—দুই কূলের গ্রাম সকল প্লাবিত করিয়া, সেতু ও বাঁধ সকল ভাঙ্গিয়া নদী প্রবলবেগে সমুদ্রপানে ছুটিয়া চলিল!

ঝড়বৃষ্টির তৃতীয় দিনে মধ্যরাত্রে মাৎসুমুরার বহির্দ্বারে কাহার করাঘাত শুনিতে পাওয়া গেল; মনে হইল যেন কোন স্ত্রীলোক বাটীর ভিতর প্রবেশলাভ করিবার জন্য অনুনয় করিতেছে। কিন্তু মাৎসুমুরার মনে সেদিনের কূপের ঘটনা তখনও জাগিতেছিল, সেইজন্য তিনি চাকরদিগকে কোনও উত্তর দিতে বারণ করিয়া দিলেন; স্বয়ং প্রবেশপথে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"দরজায় কে ডাকে?"

বাহির হইতে বামাকণ্ঠে শুনা গেল—"মাফ্ করবেন, আমি—য়ায়োই! মাৎসুমুরার

সহিত আমি একবার নিভৃতে সাক্ষাৎ করিতে চাই, বিশেষ প্রয়োজন আছে! অনুগ্রহ পূর্ব্বক দরজা খুলিয়া দিন!"

মাৎসুমুরা অতি সাবধানে দরজা অর্দ্ধোন্মুক্ত করিয়া বাহিরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; কিন্তু এ কি! সেদিন কূপের ভিতর হইতে যে মুখ তাঁহার দিকে তাকাইয়া হাসিয়াছিল—এ যে সেই মুখ! কিন্তু আজ আর সে মুখে হাসি নাই; হাসির পরিবর্ত্তে সমস্ত মুখখানিতে বিষাদের কালিমা।

মাৎসুমুরা বলিলেন—"আমার গৃহে তোমার প্রবেশ নিষেধ, কারণ তুমি মানুষ নও, তুমি অশরীরী অপদেবতা। কেন তুমি এরূপে নিরীহ লোকদিগকে মোহমুগ্ধ করিয়া তাহাদের প্রাণ নষ্ট কর?"

রমণী ব্যস্ত হইয়া উত্তর করিল—"ঠিক্ সেই কথা বলিতেই আমি আজ আসিয়াছি। ইচ্ছা করিয়া আমি কখনো প্রাণীহত্যা করি নাই। ঐ কূপে বহুদিন হইতে এক দৈত্য বাস করিতেছে। সেই ঐ কূপের অধিকারী, তাহারই মায়াপ্রভাবে কূপটি সকল সময়েই জলে পূর্ণ থাকে। সে আজ অনেক দিনের কথা, দৈবক্রমে আমি উহার ভিতর পড়িয়া যাই এবং সেই হইতে ঐ দৈত্যের সম্পূর্ণ অধীন হইয়া পড়ি; দৈত্যের কতকগুলি অসাধারণ ক্ষমতা ছিল, সেই ক্ষমতা-বলে সে আমাকে মোহমুগ্ধ করিয়া যে সকল লোক কূপে জল লইতে আসিত আমার দ্বারা তাহাদের কূপের মধ্যে আকর্ষণ করিয়া আনিয়া তাহাদের রক্ত পান করিত। কিন্তু স্বর্গরাজ্যের অধিপতি আদেশ করিয়াছেন যে এখন হইতে তাহাকে শিনজু দেশে তোরি-নো-ইকে থাকিতে হইবে;—এ নগরে সে আর কখনও প্রবেশ করিতে পাইবে না। সেই জন্য আজ সে চলিয়া যাইবার পরই আমি ছাড়া পাইয়াই আপনার কাছে সাহায্য ভিক্ষার জন্য আসিয়াছি। দৈত্যের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে আপনার কূপের প্রায় সব জলই শুখাইয়া গিয়াছে। এখন আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া কাহাকেও কূপের তলদেশ ভাল করিয়া খুঁজিয়া দেখিতে আদেশ দেন তাহা হইলে তাহার ভিতর আমার দেহ পড়িয়া আছে—দেখিতে পাইবে। এখন আমার সানুনয় প্রার্থনা, আপনি কালবিলম্ব না করিয়া কূপ হইতে আমার দেহটি উদ্ধার করুন; আপনার উপকার কখনও ভুলিব না, আপনার যাহাতে ভাল হয় তাহা আমি করিবই করিব।"

পরক্ষণেই রমণীমূর্ত্তি রাত্রির অন্ধকারে সহসা মিলাইয়া গেল।

২

সেই দিনই রাত্রি-শেষে ঝড়বৃষ্টি থামিয়া গেল; প্রভাতে যখন সূর্য্যোদয় হইল তখন সুনীল আকাশমণ্ডলে কোথাও মেঘের লেশ মাত্র চিহ্ন নাই—অনবরত তিন দিন তিন রাত্রি অন্ধকারের পর আলোক স্পর্শে পৃথিবী যেন হাসিয়া উঠিল।

প্রভাতে উঠিয়াই মাৎসুমুরা কূপের তলদেশ ভাল করিয়া খুঁজিয়া দেখিবার জন্য কয়েকজন ডুবারীর সন্ধানে লোক পাঠাইলেন। তাহারা আসিলে সকলে কূপের নিকট গিয়া দেখিল কূপটি বাস্তবিকই প্রায় শুষ্ক! ডুবারীরা নামিয়া কূপের তলদেশ পাঁতি পাঁতি করিয়া খুঁজিল। খুঁজিতে খুঁজিতে কয়েকখানা বহু-

কালের পুরানো গহনা ও একখানা অদ্ভুতাকৃতি ধাতুনির্ম্মিত দর্পন পাওয়া গেল—অনেক অনুসন্ধান সত্বেও কি জন্তু কি মানুষ কাহারও দেহ পাওয়া গেল না।

মাৎসুমুরা ভাবিলেন হয়ত এই দর্পণখানা কিছু রহস্য ভেদ করিতে পারে; কারণ তিনি জানিতেন এই ধরণের দর্পণগুলির একটু বিশেষত্ব থাকে—তাহারা সাধারণ দর্পণের মতো নির্জীব পদার্থ নহে—মানুষের মতো তাহাদের জীবন, তাহাদের আত্মা থাকে। দর্পণখানি অতি পুরাতন; তাহার উপর জলের দাগ ধরিয়া তাহা একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ঘষিয়া মাজিয়া পরিষ্কার করা হইলে সকলেই তাহার বহুমূল্য কারুকার্য্য এবং বিচিত্র গঠনপ্রণালী দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল। ইহার পৃষ্ঠদেশে কতকগুলি খোদিত লিপি দৃষ্ট হইল, তাহার সম্পুর্ণ পাঠোদ্ধার না হইলেও, "তৃতীয় মাস, তৃতীয় দিন" এইটুক বেশ পরিষ্কার পড়া গেল। এই তৃতীয় মাসের নাম "খারোই" এবং তৃতীয় মাসের তৃতীয় দিন একটা বিখ্যাত পর্ব্বদিন- এ পর্ব্ব আজও জাপানে প্রচলিত আছে,—তাহার নাম "য়ায়োইনো-সেক্কু।" ইহা হইতে মাৎসুমুরা বুঝিতে পারিলেন গতরাত্রে যে রমণীমূর্ত্তি 'য়ায়োই' নামে নিজের পরিচয় দিয়াছিল সে এই দর্পণেরই ছায়া মূর্ত্তি!

মাৎসুমুরা দর্পণখানিকে নিজগৃহে রক্ষা করিতে সংকল্প করিলেন। তিনি দর্পণখানিকে এক বহুমূল্য সুগন্ধি কাষ্ঠের আবরণে বাঁধিয়া বাটীর মধ্যে একটি স্বতন্ত্র ঘরে তাহার স্থাপনা করিলেন। যেদিন দর্পণখানিকে তাহার নির্দ্দিষ্ট ঘরটিতে প্রতিষ্ঠা করা হইল সেইদিন সন্ধ্যার সময়, মাৎসুমুরা একা আপনার পাঠাগারে বসিয়াছিলেন; সহসা দেখিলেন সম্মুখে 'য়ায়োই'! আজ তাহাকে অন্যদিনের চেয়ে আরও সুন্দর দেখাইতেছিল। শরৎকালের লঘু স্বচ্ছ জলহীন মেঘে ঢাকা চন্দ্রমার ন্যায় তাহার রূপ আজ যেন উথলিয়া উঠিতেছিল। মাৎসুমুরাকে অভিবাদন করিয়া 'য়ায়োই' তাহার বীণানিন্দিত স্বরে বলিল—

"আপনি আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন সে জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিতে আসিয়াছি। সে আজ অনেক দিনের কথা, সম্রাট সইমের রাজত্বকালে আমি সর্ব্বপ্রথম কুদারা হইতে এখানে নীত হই; তাহার পর সম্রাট সাগার সময় পর্য্যন্ত আমি রাজপ্রাসাদেই বাস করি। এই সময় সম্রাট রাজদরবারের প্রধান নারী কামোকে আমায় দান করেন। সেই হইতে তিনশত বর্ষ ধরিয়া আমি বংশপরম্পরায় ফুজিয়ারা বংশের সম্পত্তি হইয়া থাকি। তারপর একদিন কে আমাকে এই কূপে ফেলিয়া দেয় তাহা আমার ঠিক স্মরণ নাই; অনতিকাল পরেই দেশে ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়া উঠে সেই গোলমালে সকলে আমার কথা ভুলিয়া যায়।

এই কূপের অধিকারী ছিল এক ভীষণ দৈত্য। সে পূর্ব্বে এইস্থানেই একটা প্রকাণ্ড হ্রদে বাস করিত। সরকারের আদেশে গৃহাদি নির্ম্মাণের জন্য যখন সেই হ্রদটি বুজাইয়া ফেলা হইল তখন অনন্যোপায় হইয়া দৈত্য এই কূপে বাস করিতে লাগিল। তাহার পর আমি যখন কূপের ভিতর পড়িয়া তাহার

অধীন হইয়া পড়িলাম, তখন সে আমাকে দিয়া অনেক লোককে মৃত্যুর পথে আকর্ষণ করিতে লাগিল।

"দেখুন আপনার নিকট আমার আর একটি প্রার্থনা আছে। দয়া করিয়া আপনি শোগুন যোশীমাসার হস্তে আমাকে অর্পণ করুন; বংশানুক্রমে আমার পূর্ব্ব অধিকারী-গণের সহিত তাঁহার সম্পর্ক আছে। আপনি আমার এইটুকু উপকার করুন, ইহাতে আপনার মঙ্গল হইবে।

"হ্যাঁ, আর একটা কথা আপনাকে বলি, কাল কর পর আপনি কোনমতেই আর এবাড়ীতে থাকিবেন না, কারণ বাড়ীখানি ভূমিসাৎ হইবে।"

মুহূর্ত্ত পরেই 'য়ায়োই' অদৃশ্য হইল।

মাৎসুমুরা পূর্ব্ব হইতে সংবাদ পাইয়া সাবধান হইলেন। পরদিনই তিনি তাহার পরিবারবর্গ ও সমস্ত দ্রব্যাদি অপর এক পল্লীতে এক নূতন গৃহে লইয়া গেলেন; তাহার যাইবার অনতিকাল পরেই আবার একটা প্রবল ঝড় দেখা দিল। পূর্ব্বকার অপেক্ষা এবারের ঝড় আরও ভীষণ, সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বন্যা। মাৎসুমারার গৃহ সেই ঝড়ে ভূমিসাৎ হইয়া বন্যায় ভাসিয়া গেল।

কিছুদিন পরে লর্ড হোসোকাওয়ার চেষ্টায় মাৎসুমুরা একদিন শোগুন যোশী-মাসার দরবারে যাইবার অনুমতি পাইলেন। এই সুযোগে তিনি সেই দর্পণ খানি তাহার অলৌকিক ইতিহাসের একটি লিখিত বিবরণ-সহ রাজকরে অর্পণ করিলেন। "য়ায়োই"এর ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক হইল; শোগুন এই অলৌকিক দর্পণখানি পাইয়া এত আহ্লাদিত হইলেন যে রাজকোষ হইতে বহুমূল্য রত্নরাজি মাৎসুমারাকে উপহার দিতে আদেশ করিলেন এবং তাঁহার প্রার্থনা অবজ্ঞাত হইয়া ওগাওয়াচি মাওজিন দেবের মন্দির পুনর্নির্ম্মাণের জন্য প্রচুর অর্থ প্রদান করিলেন।*

শ্রীঅঘোরনাথ ঘোষ।

* লাফ্‌কাডিও হার্ণের জাপানী গল্প হইতে।

ডিমের খোলা

ভগবানের সৃষ্টির মধ্যে "অকেযো" জিনিস কিছুই নাই। "কৃপণের ধন" নামক প্রহসনরচয়িতা তরকারির খোসা হইতে যে উপাদেয় "মেওয়া" ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইতে পারে, তাহা তাঁহার নায়কের মুখ দিয়া প্রস্তাব করিয়া বাঙ্গালী জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন, কারণ এখন অনেক সংসারে বুদ্ধিমতী গৃহিণীগণের সুব্যবস্থায় আলুর খোসার চড়চড়ি উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জনের পদমর্য্যাদা লাভ করিয়াছে। সত্য কথা বলিতে গেলে আলুর খোসা যে একেবারে অশ্রদ্ধার সামগ্রী, তাহা নহে। আজ কাল পণ্ডিতদিগের মত এই যে খোসা ছাড়াইয়া আলু রন্ধন করিলে উহার কতক সারাংশ নষ্ট হইয়া যায়, এজন্য খোসাশুদ্ধ আলু সিদ্ধ করিবার ব্যবস্থা এখন অনেক পরিবারেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বিশেষতঃ আমাদের নূতন গৃহিণীদের মধ্যে অনেকেই প্রাচীনাদিগের ন্যায় "কুট্‌না" কুটিতে দক্ষ নহেন; তাঁহাদের সংকৃত "কুটনার" খোসার মধ্যে অনেক সময়েই তরকারির সারাংশ যথেষ্ট পরিমাণে থাকিয়া যায়, সুতরাং "কৃপণের ধনের" "কর্ত্তার" আবিষ্কার কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কারের ন্যায় জগতের ভাগ্য পরিবর্ত্তন সংসাধন না করিলেও "ছাপোষা" বাঙ্গালী গৃহস্থের সংসারে নিতান্ত অবহেলার সামগ্রী নহে।

সম্প্রতি আমেরিকা হইতে আমরা এইরূপ আর একটি অদ্ভুত আবিষ্কারের সম্বাদ পাইয়াছি। অনেকেই অবগত আছেন যে রসায়ণতত্ত্ববিদ্‌গণ সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে অমরত্ব লাভ করিবার একটা ঔষধ (Elixir of Life) আবিষ্কারের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। জ্ঞানালোকদীপ্ত বর্ত্তমান যুগেও সেই চেষ্টার এককালীন বিরাম লক্ষিত হয় না। কিছুদিন পূর্ব্বে অধ্যাপক ব্রাউন্ সীকার্ড্ বহু পরীক্ষার পর নবযৌবন-প্রদায়ক একটি ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং সেই সময়ে কিছু দিন জনসমাজে উহা বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল; এখন আর সেই ঔষধের অদ্ভুত গুণের কথা কাহারো মুখে শুনিতে পাওয়া যায় না। সেদিন স্বনামপ্রসিদ্ধ ইয়ুরোপীয় পণ্ডিত মেচ্‌নিকফ্ পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে দধির মধ্যে যে সকল বীজাণু থাকে, তদ্দ্বারা মনুষ্যের দীর্ঘজীবন লাভ ও জরা নিবারিত হয়। তদবধি সকল দেশেই দধির ব্যবহার সমধিক প্রসার লাভ করিয়াছে। সম্প্রতি ডিমের খোলার ব্যবহারে আংশিক অমরত্ব লাভের আশা কতিপয় আমেরিকাবাসী পণ্ডিতগণের হৃদয়ে জাগরূক হইয়াছে। মিউনিচের দুইজন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে ডিমের খোলা যথাপরিমাণে ও যথানিয়মে ভক্ষিত হইলে আমাদের জীবনীশক্তির সম্বর্দ্ধন হয়, কালধর্ম্মবশতঃ শরীরের মধ্যে যে সকল জরালক্ষণ প্রকাশিত হয় তাহা স্থগিত থাকে, দেহ-ভারের বৃদ্ধি সাধিত হয়, মস্তিষ্কের তেজস্বিতা ও হৃৎপিণ্ডের সবলতা সম্পাদিত হয়, দেহস্থিত স্বাস্থ্যনাশী বীজাণুদিগের ধ্বংস সাধিত হইয়া রোগপ্রবণতা নিবারিত হয় এবং দীর্ঘজীবন লাভ ও সঙ্গে সঙ্গে মনের বল, উৎসাহ ও সাহস বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এক কথায় বহু-বিজ্ঞাপনমুখরিত "পেটেণ্ট্" ঔষধের ন্যায় শুদ্ধ ডিমের খোলা খাইয়া নবজীবন ও স্থিরযৌবনের অধিকারী হইতে পারা যায়, ইহাই কতিপয় আমেরিকাবাসী পণ্ডিত প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

অতঃপর অনেকেই আশঙ্কা করিতেছেন যে যখন মুরগীর ডিমের খোলার এত গুণ, তখন এখন হইতে "সোনার দরে" মুরগী বিক্রীত হইবে, সুতরাং মুরগীর সুললিত মাংসভক্ষণ অতি অল্প লোকের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিবে।

এক্ষণে দেখা যাউক যে ডিমের খোলার মধ্যে এমন কি পদার্থ আছে, যাহা দ্বারা ঐরূপ উপকারের আশা করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ উহার মধ্যে ক্যাল্‌সিয়ম্ কার্ব্বনেট্ (Calcium Carbonate) নামক চা-খড়ি জাতীয় পদার্থ শতকরা ৯৭ ভাগ আছে—বাকী তিন অংশ অত্যল্প পরিমাণ ক্যাল্‌সিয়ম্ ফস্ফেট্ (Calcium Phosphate), একটু জল ও চর্ম্মজাতীয় একপ্রকার পদার্থ দ্বারা সংগঠিত। ইহাদের মধ্যে ক্যাল্‌সিয়ম্ ধাতুর লবণ ব্যতীত অপর কোনটাই শরীর গঠনের উপযোগী নহে। ক্যাল্‌সিয়ম্ ধাতুর লবণ অস্থিগঠনের জন্য আবশ্যক হইয়া থাকে, কিন্তু ক্যাল্‌সিয়ম্ ফস্ফেট্ এই কার্য্যের জন্য যেরূপ উপযোগী, কার্ব্বনেট্ প্রভৃতি ঐ ধাতুর অন্য কোন লবণ সেরূপ নহে। ডিমের "কুসুমের" মধ্যে ক্যাল্‌সিয়ম্ ফস্ফেট্ যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান থাকে, খোলার মধ্যে উহা নাম মাত্র থাকে; এই জন্য ডিম ফুটিবার পূর্ব্বে শাবকের দেহ-পরিণতির জন্য খোলা হইতে ক্যাল্‌সিয়ম্ ধাতুর লবণ সংগ্রহ করিবার আবশ্যক হয় না। অবশ্য একথা স্বীকার্য্য যে ধাতুঘটিত পদার্থ প্রাণিজ পদার্থের সহিত মিলিত অবস্থায় (Organic salts of metals) ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হইলে উহা দ্বারা শীঘ্র অধিক উপকার পাওয়া যায়; এই কারণে যে সকল শিশুর অস্থি সহজে দৃঢ় হয় না (Ricketty), তাহাদিগকে ডিমের খোলা খাইতে দিলে হয়ত উহা তাহাদিগের অস্থি দৃঢ় করিবার পক্ষে কিয়ৎপরিমাণ সহায়তা করিতে পারে। কিন্তু ডিমের খোলার মধ্যে ক্যাল্‌সিয়ম্ ফস্ফেট্ যৎসামান্য পরিমাণে থাকে ক্যাল্‌সিয়ম্ কার্ব্বনেটই উহার প্রধান উপাদান; সুতরাং উহার ব্যবহারে যে বিশেষ উপকার হইবে, তাহা মনে হয় না। অতএব কি খাদ্য-গুণ, কি ঔষধ-গুণ, প্রকৃত পক্ষে দুইয়ের মধ্যে একটীও ডিমের খোলার মধ্যে অবস্থিতি করিতে দেখা যায় না।

গলদা চিংড়ি, কাঁকড়া, শামুক, শাঁক, ঝিনুক, মুক্তা, প্রবাল প্রভৃতি জলজন্তু সমূহের বাহিরের কঠিন আবরণ ডিমের খোলার ন্যায় ক্যাল্‌সিয়ম্ কার্ব্বনেট্ নামক চা-খড়ি জাতীয় পদার্থ দ্বারা

নির্ম্মিত। চা-খড়িও এককালে একপ্রকার অতি সূক্ষ্ম সামুদ্রিক প্রাণীর দেহের কঠিন আবরণ ছিল। এই কঠিন আবরণ দ্বারা জীবিতাবস্থায় ঐ সকল প্রাণী শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়া থাকে। বঙ্গদেশে অনেকে মৎস্য-ভোজী হইলেও ডিম্ব ব্যবহার করিতে আপত্তি করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের চিরযৌবন লাভ সম্বন্ধে নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। তাঁহারা এখন হইতে গল্‌দা চিংড়ি ও কাঁকড়ার শাস ও "যি" পরিত্যাগ করিয়া উহাদের খোলা চিবাইতে আরম্ভ করুন, তাহা হইলেই তাঁহারা ডিমের খোলা ভক্ষণের ফল লাভ হইতে বঞ্চিত হইবেন না।

মিউনিচের পণ্ডিতদ্বয় ৮ জোড়া বিলাতী ইঁদুরের উপর পরীক্ষা করিয়া ডিমের খোলার ঐ অদ্ভুত গুণ আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহারা ৪ জোড়া ইঁদুরকে কিছুকাল ডিমের খোলা খাইতে দিয়াছিলেন এবং অপর ৪ জোড়াকে ঐ খাদ্য হইতে একেবারে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। পরীক্ষার নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইলে দেখা গেল যে, যে ৪ জোড়া ইঁদুর ডিমের খোলা খাইয়াছিল, ঐ সময়ের মধ্যে তাহাদের ৫৪টী সন্তানসন্ততি জন্মিয়াছে, কিন্তু যাহারা ডিমের খোলা মোটেই খাইতে পায় নাই, তাহাদের ৯ টির অধিক সন্তান জন্মে নাই। ইহাতে তাঁহারা সিদ্ধান্ত করেন যে ডিমের খোলার অদ্ভুত জননোত্তেজক শক্তি আছে, সুতরাং মনুষ্য সমাজে ইহা যথারীতি ব্যবহৃত হইলে বংশবৃদ্ধি হইয়া প্রজাক্ষয় নিবারিত হইবে। সকল দেশেই সামান্য অবস্থার ব্যক্তি-দিগের উপর লক্ষ্মী অপেক্ষা ষষ্ঠীদেবীর কৃপা অধিক দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং তাহাদের মধ্যে ডিমের খোলার ব্যবহার প্রচলিত হইলে সমাজে একটা গুরুতর বিপ্লব উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। তবে বড়লোকের ঘর অনেক সময়ে সন্তানবিহনে হতশ্রী হইয়া থাকিতে দেখা যায়; পরের পুত্রকে অনেক স্থলে পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে সন্তানের সাধ মিটাইতে হয়। তাঁহাদের আমেরিকার আবিষ্কৃত এই নূতন ঔষধ ব্যবহার করিয়া দেখিতে ক্ষতি নাই। একজন ইংরাজ ডাক্তার এই পরীক্ষা সম্বন্ধে রহস্য করিয়া বলিয়াছেন যে ইহাদ্বারা মেঝের উপর ডিমের খোলা কখনই ফেলিয়া রাখা উচিত নহে, কেন না তাহা হইলে "রক্তবীজের ঝাড়ের" ন্যায় ইঁদুরের বংশ বৃদ্ধি হইয়া গৃহস্থের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে।

তামাসা ছাড়িয়া দিয়া তর্কের খাতিরে মানিয়া লইলাম যে ডিমের খোলা খাইয়া ইঁদুরের বংশ বৃদ্ধি হইতে পারে, কিন্তু কোন বস্তু ইঁদুরের পক্ষে অসাধারণ গুণ-সম্পন্ন খাদ্য হইলেও উহা যে মনুষ্যের শরীরে তুল্য গুণ প্রকাশ করিবে, তাহা এখনো বহুপ্রমাণসাপেক্ষ। কোন চিকিৎসকই এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া ডিমের খোলা খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইবার ব্যবস্থা দান যুক্তিযুক্ত মনে করিবেন না।

ডিমের খোলার খাদ্যগুণ কিছুমাত্র নাই এবং উহার মধ্যে এমন কোন পদার্থই নাই, যাহার দেহ-মধ্যস্থিত অনিষ্টকারী বীজাণু ধ্বংস করিবার শক্তি আছে। যে সকল পদার্থ দ্বারা ডিমের খোলা নির্ম্মিত, তাহাদিগের কোনটীর যে বিশেষ কোন অলৌকিক ঔষধগুণ আছে, তাহারও কিছুমাত্র প্রমাণ নাই। সুতরাং কয়েকটি ইঁদুরের উপর পরীক্ষা দ্বারা মানুষ সম্বন্ধে কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায় না।

সাধারণ লোকের ন্যায় রাসায়নিক পণ্ডিতদিগের মধ্যেও খেয়ালের অসম্ভাব নাই। এই অদ্ভুত আবিষ্কার বর্ত্তমান অবস্থায় একটি খেয়াল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। তবে এ কথা স্বীকার্য্য যে অনেক প্রকাণ্ড আবি-ষ্কারের প্রথম উৎপত্তি খেয়াল হইতেই। সেই জন্য আমরা এই পরীক্ষার বিকাশ ও ভবিষ্যৎ জানিবার জন্য উৎসুক রহিলাম।

এ স্থলে বলা উচিত যে মেচ্‌নিকফের দধিভোজন ও আমেরিকার পণ্ডিতদিগের ডিমের খোলা ভক্ষণ এক দরের জিনিষ নহে। দধিভোজনে নবযৌবন লাভ হউক আর না হউক, দধি যে একটী উৎকৃষ্ট সারবান্ খাদ্য সে বিষয়ে মতভেদ নাই। শর্করা ব্যতীত দুগ্ধের অপর সমস্ত সারপদার্থ দধির মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান থাকে। দুগ্ধ ও দধির ব্যবহারে যে জীবনী-শক্তির বৃদ্ধি হয়, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই, সুতরাং মেচ্‌নিকফের মত কেবল একটা খেয়াল বলিয়া পরিগণিত হইতে

ফনোগ্রাফ

প্রথম পরিচ্ছেদ

আমি জানিতাম আমার সেক্রেটারি মহাশয় ভয়ঙ্কর অর্থলোলুপ দিবারাত্রি কেবল তাঁহার অর্থেরই চিন্তা! আমি তাই বলিলাম—

"আপনি ফনোগ্রাফের যেরূপ উন্নতি সাধন করিয়াছেন আশা করি তাহাতেই আপনি যথেষ্ট ধনবান হইতে পারিবেন।"

তিনি বলিলেন "ধন্যবাদ মহাশয়! আমার বিশ্বাস যদি আমার আবিষ্কার সফল হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি কিছু উপার্জ্জন করিতে পারিব। আমার আবিষ্কৃত যন্ত্রে কোনরূপ গোলমাল হয় না। তাহা যে কোন বাক্সে বা ক্যাবিনেটে গোপনে রক্ষিত হইতে পারে। এবং একবার ঠিক করিয়া রাখিলে ঘরের মধ্যে এক সপ্তাহ ধরিয়া যে সকল কথাবার্ত্তা হইবে তাহা সেই ফনোগ্রাফে রেকর্ড হইয়া যাইবে। আমি বাক্সের আকারে গোটা কয়েক যন্ত্র এই সহরের নানাস্থানে রাখিয়াছি; মাঝে মাঝে তাহা বাড়ীতে লইয়া আসিয়া কতরূপ গালগল্প, প্রেমকাহিনী হুজুক প্রভৃতি শুনিয়া বিশেষ আরাম বোধ করি।"

এই সকল কথাবার্ত্তার পর সেক্রেটারি মহাশয় প্রাতঃকালের চিঠিপত্র আমার সম্মুখে উপস্থিত করিলেন এবং আমি দৈনিক কার্য্যে মনোনিবেশ করিলাম। অন্যান্য সব পত্রে কাজ কর্ম্মের কথা ভিন্ন বিশেষ কিছু ছিল না কিন্তু সকলের শেষের পত্রখানা পড়িয়া আমি প্রথমে বিস্মিত ও পরে বিরক্ত হইয়া উঠিলাম।

পত্রে এইরূপ লেখা ছিল:—

৩রা অক্টোবর ১৮৯৭

"মহাশয়,

আপনাকে জানান যাইতেছে যে অতি সত্বর ২০,০০০ টাকা আপনাকে দিতে হইবে। কি প্রকারে দিতে হইবে তাহা আপনাকে পরে জানান হইবে। যদি নির্ব্বুদ্ধিতাহেতু উক্ত টাকা দিতে অস্বীকার করেন তবে মহাশয়কে হত্যা করা হইবে। ইতি

কস্যচিৎ ন্যায়পরায়ণস্য।"

আমি সেক্রেটারীর নিকট পত্রখানা ছুড়িয়া দিয়া বলিলাম, "এ পত্রখানার কোন উত্তর নাই। সংসারের লোকগুলা মনে করে কি—যে আমার টাকা আছে বলিয়া আমি একজন কাপুরুষ?"

সেক্রেটারী পত্রখানা ২।৩ বার ভাল করিয়া পড়িয়া কিছুক্ষণ পরে কাতরস্বরে বলিলেন, "এ পত্রখানা একটু ভয়ানক বলিয়া বোধ হইতেছে—এটাকে এত তাচ্ছিল্য করা উচিত নয়।"

আমি বলিলাম "কেহ আসিয়া যে আমাকে খুন করুক তাহা অবশ্যই আমার ইচ্ছা নয়। তবে এই বদমায়েসকে যে আমি এত টাকা, শুধু শুধু ঢালিয়া দিব তাহাও হইতে পারে না। আপনি এখানা ডিটেক্‌টিভ আফিসে পাঠাইয়া দিন এবং পত্রপ্রেরকের সন্ধানের জন্য ১০০০৲ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করুন।"

ঘটনাটা একরূপ ভুলিয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু হঠাৎ একদিন নীচের পত্রখানা পাইয়া বিশেষ বিব্রত হইয়া পড়িলাম।

"মহাশয়,

আমার প্রথম পত্র মত ২০,০০০ টাকা দিবার সম্বন্ধে আপনি যদি এখনও কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিয়া থাকেন তবে শীঘ্র তাহা করিতে চেষ্টা করিবেন। সম্ভবতঃ আপনি টাকা দিতে সম্মত আছেন এবং টাকা দিবার প্রণালী জানিবার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছেন এই ভাবিয়া এই পত্র লিখিতেছি। আমার লোকজন সর্ব্বদাই মহাশয়ের উপর নজর রাখিতেছে। আপনি পিক্কাদেলীতে ভ্রমণের সময় জামার বোতামে হরিদ্রাবর্ণের গোলাপফুল পরিধান করিবেন। তাহা হইলে এ কার্য্যে আপনার সম্মতি আছে বুঝিতে পারিব। তাহার পর কিরূপে টাকা দিতে হইবে তাহা জানাইব। ইতি

কস্যচিৎ ন্যায়পরায়ণস্য।"

এরূপ উদ্ধত পত্রের কোনরূপ জবাবও দিতে পারিতেছি না এই ভাবিয়া আমি আরও অধিক বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হইলাম। লোকটার কোন সন্ধান না পাইলে ভবিষ্যতে হয় ত আরও এইরূপ পত্র আসিতে থাকিবে ইহা ভাবিয়া আমি এ পত্রখানাও পুলিশে পাঠাইয়া দিলাম ও পুরস্কারের হার একটু বাড়াইয়া দিলাম।

সাতদিন পরে তৃতীয় পত্র পাইলাম। চিঠিখানার ধরণ দেখিয়া একেবারে হতভম্ব হইয়া পড়িলাম :—

"মহাশয়,

আমার অনুরোধ সম্বন্ধে মহাশয়কে সম্পূর্ণ উদাসীন বোধ হইতেছে, সেজন্য আপনাকে বিশেষভাবে জ্ঞাপন করা যাইতেছে, যে আমি মহাশয়ের সহিত কোনরূপ ছেলেখেলা করিতেছি না। উল্লিখিত টাকা না দিলে মহাশয়ের মৃত্যু নিশ্চিত। এ কথা আমি কোনরূপ রহস্যচ্ছলে বলিতেছি না। যদি আগামী কল্যও আপনি গোলাপ-ফুল পরিধান না করেন তবে আপনার নিকট আমার কথার সত্যতা প্রমাণের জন্য আমি ১লা নবেম্বর একটী হত্যাকাণ্ড সাধিত করিব; সেদিনকার সান্ধ্য সংবাদ পত্রে সে সংবাদ জানিতে পারিবেন। মনে রাখিবেন যে এই নির্ব্বোধ কার্পণ্য পরিহার না করিলে আপনারও সময় শীঘ্র উপস্থিত হইবে। ইতি

কস্যচিৎ ন্যায়পরায়ণস্য।"

এ চিঠিখানা আমি নিজে ইনস্পেক্টর জনসনের নিকট লইয়া গেলাম। তাঁহার সহিত আমার পরিচয় ছিল। সমস্ত বিবরণ বলিয়া তাঁহার হাতে পত্রখানা দিলাম।

তিনি বলিলেন—

"আমার বিশ্বাস সেদিন কোন খুন হ'বে না। যদিই হয়, তবে তাহা অন্য কেহ করিবে। আর যদি সত্য সত্যই এই লোকটা আপনাকে ভয় দেখাবার জন্য কি অন্য কোন কারণে ঐ তারিখে একটা খুন করে—তবে তাহার নিকট হইতে আর একখানা পত্র আসা পর্য্যন্ত আপনি সম্পূর্ণ নিরাপদ; কারণ সে লোকটা তো প্রথমে টাকা দিবার প্রণালী আপনাকে জানাইবে।"

১লা নবেম্বর বৈকালে আমি ক্লাবে বেড়াইতে যাইবার মানসে বাড়ী হইতে বাহির হইলাম। রাস্তায় কাগজওয়ালাদের চীৎকারের প্রতি বিশেষরূপে কর্ণসংযোগ করিয়া চলিতে লাগিলাম। এমন সময় একজন বালক কতকগুলি সংবাদপত্র হাতে করিয়া আমার পার্শ্ব দিয়া ছুটিয়া গেল এবং চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—

"হ্যামষ্টেড মাঠে লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড"

কথাটা শুনিয়াই আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল।

আমি একখণ্ড কাগজ কিনিয়া হত্যাকাণ্ডের বিবরণ পাঠ করিলাম। ঘটনাটা এই :—

"অদ্য প্রাতঃকালে মিঃ জেম্‌স্ সিম্‌কি নামক

একজন বৃদ্ধ তাঁহার বাড়ী হইতে হ্যামষ্টেডে যাইতে-ছিলেন। সেখানে তাঁহার কয়েক খানা ভাড়াটিয়া বাড়ী আছে। তিনি প্রতিমাসের প্রথম দিনে ভাড়া আদায় করিবার জন্য সেখানে আসিয়া থাকেন। বেলা একটার সময় তাঁহার মৃতদেহ রাস্তার ধারে দেখিতে পাওয়া যায়। পরীক্ষায় জানা গিয়াছে যে কোন ভোঁতা অস্ত্রের আঘাতে মাথা ফাটিয়া তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছে। বৃদ্ধের পকেটে কোন অর্থ এমন কি তাঁহার ঘড়ি চেনও পাওয়া যায় নাই। ইহাতে অনুমান হয় যে হত্যাকাণ্ডের উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ চুরি। আসামীদের কোনরূপ সন্ধান পাওয়া যায় নাই। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।"

সেণ্ট জেম্‌স্‌ ষ্ট্রীটের এক কোণে দাঁড়াইয়া আমি উহা পাঠ করিতেছিলাম। কাগজখানা মুড়িয়া পকেটে পুরিলাম। উত্তেজনায়, ও যাতনায় নিতান্ত অধীর হইয়া অন্ধভাবে সম্মুখের দিকে বরাবর চলিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণের জন্য আমার চিন্তাবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে ওলটপালট হইয়া গিয়াছিল। মস্তিষ্ক কিছু ঠাণ্ডা হইলে বুঝিতে পারিলাম যে পার্কে আসিয়া পড়িয়াছি। সেখানে একটা বেঞ্চের উপর বসিয়া পড়িলাম।

ঐ বেনামী পত্র প্রেরকই যে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করিয়াছে তাহাতে আমার কোন সন্দেহ ছিল না। এই খুন করিয়া সে আমাকে সাবধান করিয়া দিয়াছে। তাহার আদেশ পালনে পরাঙ্মুখ হইলে আমার নিজেরও যে কিরূপ পরিণাম হইবে তাহাও আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম।

ইন্‌স্পেক্টরের নিকট যাইতে একবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু তিনি এসম্বন্ধে আমার অপেক্ষা অধিক কিছু জানেন না ভাবিয়া নিরস্ত হইলাম। একবার ভাবিলাম যে তাহার নির্দ্দেশমত গোলাপফুল পরিধান করিয়া দেখি যে কি উপায়ে সে টাকা আদায় করিতে চায়। ইহাতে অন্ততঃ কিছুদিন তাহার ক্রোধ হইতে রক্ষা পাইতে পারিব। কিন্তু এরূপ সংকল্পের বিরুদ্ধে আমার আত্মগৌরব বিদ্রোহী হইয়া উঠিল; তাহার চক্ষে আপনাকে হীন কাপুরুষ বলিয়া প্রতিপাদন করার দুর্ব্বল ইচ্ছাকে আমি মন হইতে সগর্ব্বে পরিহার করিলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে আমি আর একখান পত্র পাইলাম। তাহা এই :—

মহাশয়,

এখন আপনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে আমি আমার কথা রক্ষা করিয়াছি। আশাকরি এখন আর টাকা দিতে আপনি কোনরূপ অমত করিবেন না। টাকা নিম্নলিখিত উপায়ে দিতে হইবে। প্রথমতঃ কাল একটি হরিদ্রাবর্ণের গোলাপফুল পরিবেন তাহা হইলে আমি সমস্ত বন্দোবস্ত করিব। দ্বিতীয়তঃ কাল রাত্রিতে নৌকাযোগে টেম্‌সে বেড়াইতে যাইবেন। সঙ্গে একজন সহচর, ইচ্ছা হইলে একজন গোয়েন্দাকেও লইতে পারেন। সঙ্গে অবশ্যই টাকা লইয়া আসিবেন। ওক্সহল ব্রিজের পশ্চিমদিক দিয়া নৌকা বাহিয়া চলিবেন। কিছুক্ষণ পরে জলের উপর একটী ভাসমান চুপড়ি দেখিতে পাইবেন। তাহা তুলিবেন এবং চুপড়িতে যে চাবি সংলগ্ন থাকিবে তাহার সাহায্যে তাহা খুলিয়া তন্মধ্যে নোটগুলি রাখিবেন। পরে চাবি বন্ধ করিয়া পুনরায় চুপড়িটী জলে ভাসাইয়া দিবেন। চুপড়ির সহিত যে তার সংলগ্ন থাকিবে তাহার অনুসরণ করিতে কদাচ চেষ্টা করিবেন না। সেই অনুসরণের চেষ্টা করিলে তৎক্ষণাৎ আপনার মৃত্যু অনিবার্য্য তাহা বলিয়া দিতেছি।

আপনি যদি আমার অনুরোধ পালনে এখনও অসম্মত হন তবে আপনার সতর্কতার জন্য আমি আর একটা খুন করিব। তাহা ৩রা নবেম্বর সন্ধ্যাকালে

সংঘটিত হইবে। যদি তাহার পরও অসম্মত থাকেন তবে আপনার সম্বন্ধে আমি শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হইব। মনে রাখিবেন যে আগামী কল্য টাকা দিতে সম্মত হইলে আপনি একজন ব্যক্তির জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন; অসম্মত হইলে এই দ্বিতীয় খুনের পাপও আপনার উপর পড়িবে।

কস্যচিৎ ন্যায়পরায়ণস্য।

পত্রখানা পড়া শেষ হইবামাত্র আমার সেক্রেটারি মিঃ গ্রানহাম গৃহে প্রবেশ করিলেন। তিনি পূর্ব্বের পত্রগুলা দেখিয়াছিলেন—আমি এখানাও তাঁহার হাতে দিলাম। পত্রখানা পড়িতে পড়িতে তাঁহার মুখ ঈষৎ বিবর্ণ হইল।

জিজ্ঞাসা করিলাম "এখন কি বলেন?"

"মহাশয়, আমি হইলে টাকা দিতে স্বীকার করিতাম। টাকাটা খুব বেশী সন্দেহ নাই, কিন্তু তথাপি জীবনের মূল্য অপেক্ষা কদাচ বেশী নহে।"

"প্রাণ থাকিতে আমি এরূপ বশ্যতা স্বীকার করিব না। আমি এক পয়সাও দিব না।"

আমি একরূপ 'মরিয়ার' মত হইয়া গিয়াছিলাম। ঐ পত্রখানার কথা আর কিছু না ভাবিয়া অন্য কাজে মনঃসংযোগ করিলাম। রাত্রির ডাকে আর একখানা চিঠি আসিল।

"মহাশয়,

আপনি আজও গোলাপফুল ধারণ করেন নাই, ইহাতে বুঝিতেছি আপনি এখনও আমার প্রস্তাবে অসম্মত। অনুগ্রহ পূর্ব্বক মনে রাখিবেন যে আমি গতপত্রে যে হত্যাকাণ্ডের কথা লিখিয়াছিলাম তাহা আগামী কল্য ৩রা নবেম্বর সম্পাদিত হইবে। ... লৌহযন্ত্রের আঘাতে মাথা ফাটিয়া স্ত্রীলোকটি মরিয়া পড়িয়া থাকিবে।

আপনাকে আর একবার বলিতেছি, আপনি যথা-সময়ে সঙ্কেত চিহ্ন ধারণ করিতে চেষ্টা করিবেন এবং রাত্রিযোগে নৌকাগমনে বহির্গত হইবেন। যদি আপনি ইহা না করেন, তবে ৫ই নবেম্বর তারিখে অথবা তার পর যে কোন দিন সুবিধা পাইব আপনাকে হত্যা করিব। এ সব বিষয়ে আমি অনাবশ্যক দেরী করিতে অভ্যস্থ নহি। ইহাই আমার শেষ কথা। ইতি

কস্যচিৎ ন্যায়পরায়ণস্য।"

পত্রখানা পড়িয়া আমি অতিশয় ভীত হইলাম। আমার অসম্মতিই যে অন্য একজন নির্দ্দোষব্যক্তির মৃত্যুর কারণ হইল তাহা বুঝিলাম কিন্তু তাহা নিবারণ করিতে আমি এখন অসমর্থ।

৩রা নবেম্বর আমার জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর দিন। সন্ধ্যার সময় অত্যন্ত মর্ম্মান্তিক বেদনা অনুভব করিতে লাগিলাম। টাকা দিতে অস্বীকৃত হওয়ার জন্য মাঝে মাঝে আমার একটু অনুতাপ হইতে লাগিল। টাকা দিতে আমি নিশ্চয়ই কোনরূপ ইতস্ততঃ করিতাম না; কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস হইয়াছিল যে টাকা দিতে স্বীকৃত হইলেও ঐ হত্যাকাণ্ড সেদিন না হোক পরে আর কোন দিন ঘটিবেই ঘটিবে। কেবল যে একজনকে সতর্ক করিয়া দিবার জন্য কেহ বৃথা খুন করিতে পারে ইহা আমি বিশ্বাস করিতে পারি নাই।

সেদিনের রাত্রির কথা আর বলিব না। সেকথা স্মরণ হইলে এখনও আমার প্রাণ কাঁপিয়া উঠে। নানাবিধ দুশ্চিন্তায় রাত্রিতে একটুও ঘুমাইতে পারি নাই। ...

গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকালের সংবাদপত্রের অপেক্ষা করিয়া থাকিলাম। কাগজ আসিলে দেখিলাম যে যাহা ভয় করিয়াছিলাম তাহাই হইয়াছে। পুটনিতে একজন ধনবতী বিধবার মৃতদেহ তাঁহার স্বীয় উদ্যানে রাত্রি ১০॥টার সময় পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার মাথা চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। নিকটে একখান রক্তাক্ত লৌহমুদ্গর পড়িয়াছিল। ইত্যাদি।'—

* * * *

সর্ব্বদাই সাবধানে থাকিব ঠিক করিলাম। নৃশংসের হাতে যে মৃত্যু অনিবার্য্য তাহা মনে হইল না; ভাবিলাম যে হয়ত আমার উদ্ধত প্রকৃতি দেখিয়া সে একটু ভয় পাইতে পারে এবং অবশেষে হয়ত তাহার দুরভিসন্ধিও ত্যাগ করিতে পারে। কিন্তু তথাপি আমার অবস্থা যে নিতান্ত নিরাপদ নহে এবং প্রতি মুহূর্ত্তেই যে বিপদের সম্ভাবনা আছে তাহা মনে হইল। হয়ত পরদিন আমার ইহজীবনের লীলাখেলা সব শেষ হইতে পারে। ইহা ভাবিয়া আমি আমার বিষয়কর্ম্মের যথারূপ বন্দোবস্ত করিয়া রাখিতে ইচ্ছা করিলাম। প্রত্যহ প্রাতঃকালে আমি আমার সেক্রেটারির দ্বারা পত্রাদি লিখাইয়া থাকি কিন্তু আজ তিনি ছুটি লইয়া অনুপস্থিত ছিলেন। তাই তাঁহাকে ডাকিয়া আনিবার জন্য একজন লোক পাঠাইতে যাইতেছিলাম এমন সময় মনে হইল যে একা নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকা কষ্টকর তাহার অপেক্ষা বরং আমি নিজেই সেখানে একটু বেড়াইয়া আসি। তাই প্রাতরাশ সমাপ্ত করিয়া আমি সেক্রেটারির ভবনাভিমুখে বাহির হইলাম

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যে দাসী আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল তাহার নিকট শুনিলাম যে গ্রান্হাম এইমাত্র বাহির হইয়া গিয়াছেন—শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন। আমি তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে মনস্থ করিয়া তাঁহার ড্রয়িংরুমে যাইয়া উপবেশন করিলাম। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসিয়া থাকিবার পর দেখিতে পাইলাম যে গৃহকোণে একটা টেবিলের উপর পাঁচখানা বাক্স ও ক্যাবিনেট রহিয়াছে। সেগুলি সেক্রেটারির আবিষ্কৃত ফনোগ্রাফ বলিয়া বোধ হইল। সোৎসুক হইয়া আমি একটি বাক্স খুলিলাম। বাক্সের ঢাকনিতে একটা ছোট ছিদ্র ছিল—বোধ হয় তদ্দারা বাহিরের শব্দ যন্ত্রের ভিতরে প্রবেশ করিয়া রেকর্ড হয়। কিছুক্ষণ নাড়া-চাড়া করিবার পর বাক্সের সম্মুখের দিকটা খুলিয়া গেল। দেখিলাম কতকগুলি চাবি রহিয়াছে। একটা চাবি টিপিতেই একটু শব্দ উঠিলে আমি তাহা ভাল করিয়া টিপিয়া ধরিয়া কান পাতিয়া শুনিতে আরম্ভ করিলাম। একটা রাস্তার ধারের দোকানে সাধারণতঃ যে সকল কথাবার্ত্তা হয় তাহা অবিকল উচ্চারিত হইতে লাগিত। যন্ত্রোত্থিত শব্দে কৃত্রিমতার লেশমাত্র ছিল না। প্রথম যন্ত্র শোনা হইলে পর আর একখানি বাহির করিলাম। তাহার চাবিতে পুরামাত্রায় দম দিয়া টেবিলের নিকট চেয়ার টানিয়া আনিয়া মনোযোগ সহকারে শুনিতে আরম্ভ করিলাম। প্রথম কথা শুনিয়াই আমি চমকিয়া উঠিলাম।

"খুনখারাপি নিন্দা করা খুব সোজা কিন্তু খুন করলে না খেয়ে মরতে হয় না।"

"জিমি, ঠিক বলেছিস ভাই। আর লোকে তো বলে সংসারে সবাই দুঃখী; তাই কতকগুলো লোককে সংসারের দুঃখ থেকে উদ্ধার ক'রে আমরা বরং জগতের মঙ্গলই করছি। বুড়া সিমকিনের কাছে, যা পাব তাতে দুজনার কিছুদিন বেশ কেটে যাবে। রৌদ্র নাই, জল নাই মাসের প্রথম দিন বুড়া ভাড়া আদায় করতে আসবেই আসবে। আর ভাই হ্যামষ্টেডের মাঠের মত শিকারের এমন সুবিধা আর কোথাও নাই। বেড়ে মিলেছে।"

শুনিয়া আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। যে ভীষণ কুহেলিকা আমাকে এতদিন যাবৎ তাড়না করিতেছিল আজ হঠাৎ তাহার নিগূঢ় রহস্য জানিতে পারিলাম। ফনোগ্রাফটা আর কি কি বলে তাহা অতিশয় উৎকণ্ঠার সহিত শুনিতে লাগিলাম। আর এসব কথা সেক্রেটারির যন্ত্র হইতে কিরূপে নির্গত হইতেছে তাহাতে অতিশয় বিস্মিত হইলাম।

"মাইরি ভাই—ঐ বুড়া আর পুটনির সেই বুড়ী—এই দুটো নিয়েই আমাদের এ মাসটা বেশ কেটে যাবে। কিন্তু বুড়ীটাকে এত শীঘ্র নিকেশ করবার তোর এত ইচ্ছা কেন রে?"

"সে যে ৪ঠা পালাচ্ছে। দূরদেশে বেড়াতে যাবে। এখন তার কাছে বেশ দুপয়সা আছে বলেই বোধ হয়।"

"সে সন্ধ্যাবেলা নিজের বাগানে বেড়ায়—না?"

"হাঁ তাই শুনেছি। বুড়ী বাগানে বেড়াতে বড় ভালবাসে। রোজ সন্ধ্যার পর ঘণ্টাদুই সেখানে থাকে।"

"আর একটা কথা। ঐ লোহার হাতলটা দিয়ে তো?"

"হাঁ এটাই সব চেয়ে ভাল। বয়ে নিয়ে যেতেও সুবিধে—ফেলে এলেও কেউ কিছু সন্দেহ করতে পারবে না।"

শব্দ থামিল। তারপর আবার অন্য গলা শুনিতে পাওয়া গেল, কিন্তু তাহাতে আমার বিষয় কিছু ছিল না। কিছুক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া থাকিবার পর ইনস্পেকটরকে একখান চিঠি লিখিলাম। দাসীকে কিছু বকশিস দিয়া একজন পত্রবাহককে ডাকিয়া আনিতে বলিলাম। দশমিনিটের মধ্যে একজন লোক আসিল। তাহাকে অতিদ্রুত যাইয়া ইনস্পেকটর জনসনকে পত্র দিতে আদেশ করিলাম।

সে চলিয়া গেল। সেই নির্জ্জন গৃহে আমি আবার ফনোগ্রাফগুলি পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিলাম। অন্যান্য যন্ত্র হইতে নানাবিধ বাজে গল্প, বাজে হুজুক প্রভৃতি বাহির হইতে লাগিল। অবশেষে পঞ্চম যন্ত্রখানি খুলিবামাত্র সেক্রেটারি গ্রান্‌হামের স্বর শুনিতে পাইলাম। বুঝিতে পারিলাম যে সেক্রেটারি একা থাকিয়া নিজের মনে কথা কহিতেছিলেন। স্বর অবশ্যই খুব নিম্ন কিন্তু স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছিল ঃ—

"কুড়ি হাজার টাকা! হায়, সে কি তা দেবে? কিন্তু বলা যায় না। যদি দেয়! আমাকে কিন্তু কেউ সন্দেহও করতে পারবে না। খুনে দুটো ধরা পড়লেও আমি সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ। ফনোগ্রাফগুলো মদের দোকানে রেখে এসেছিলুম তাই ঐ খুনের কথা জানতে পেরেছি, নইলে কেই বা জানতো। সে টাকা যদি না দেয়, তাকে অবশ্যই আমি খুন করবো না—একটা ইঁদুরকেও মারতে আমার ইচ্ছা

নাই। আর ঐ খুনেরা তো তার কথা জানেই না। কিন্তু বেচারা তো তা জানে না। তাই ভয়ে অস্থির। আহা! একটু দুঃখ হচ্চে – কিন্তু কি করি উপায় নাই। যখন সুবিধা পাওয়া যাচ্চে তখন যাতে দুপয়সা আসে তার চেষ্টা তো দেখতেই হ'বে। ঐ ফনোগ্রাফে লোকদুটার কথা শুনলেই আমার ইচ্ছাটা আরও বেড়ে উঠে।"

সিঁড়িতে পদশব্দ শুনিতে পাইলাম। ইনস্পেকটর জনসন গৃহে প্রবেশ করিলেন। তিনি আসিয়াই প্রশ্ন করিলেন "ব্যাপারখানা কি ?"

আমি হাসিয়া বলিলাম "সব পরিষ্কার।"

ফনোগ্রাফের কথা ভাল করিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলাম। জিমি ও তাহার বন্ধুর কথোপকথন এবং আমার "ন্যায়পরায়ণ" সেক্রেটারির নিভৃত চিন্তা তাঁহাকে শুনাইলাম। সব বুঝিতে পারিয়া তিনি বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। বলিলেন—"আপনার সেক্রেটারি দেখছি ভারি চালাক বদমায়েস। খুনেদুটোর কথা শুনে তা' নিজের কাছে চালিয়েছে। ধূর্ত্ত পিশাচ! টাকার জন্য বৃথা দুটো খুন হ'তে দিলে!—কিন্তু এ কল বিক্রী করেও তো সে বেশ রোজগার করতে পারত ?"

আমি বলিলাম "হাঁ পারত বটে কিন্তু তাহা সময়সাপেক্ষ। সেক্রেটারি আর মোটেই দেরী সইতে পারলে না।"

ইন। হাঁ, কয়েক বৎসর শ্রীঘরে বাস করলে তখন বিলক্ষণ ধৈর্য্য শিক্ষা হবে।

*　　*　　*

শ্রীঅম্বুজাক্ষ সরকার।

মাতৃঋণ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বেলিসার।

তখনও সন্ধ্যা নামিতে ঈষৎ বিলম্ব আছে। পারির এক প্রান্তে এসিনডেকের প্রকাণ্ড লোহার কারখানা। কারখানার লোকজন কোলাহল তুলিয়া পথে চলিয়াছে। কেহ সঙ্গীর পিঠে হাত রাখিয়া গান ধরিয়া চলিয়াছে—কেহ বা জনতার পাশ কাটাইয়া সঙ্গিনীকে একান্তে টানিয়া হৃদয়ের গুপ্ত বেদনার আভাষ দিতে-দিতে চলিয়াছে! কাজের মধ্য হইতে ছাড়া পাইয়া সকলেরই মন লঘু, উল্লসিত—তাহাদের হর্ষ-কোলাহলে সারা পথ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে।

এই সকল লক্ষ্য করিতে করিতে জ্যাকও পথে চলিয়াছিল। আজ তাহার মনে আর এতটুকু বিষাদ নাই! ভবিষ্যতের আশায় প্রদীপ্ত চিত্ত লইয়া সে চলিয়াছিল—দৃষ্টি পথের দুইপার্শ্বের বাটির দিকে,—যদি ভাড়ার জন্য কোনটায় ঘর খালি পাওয়া যায়!

কারখানার কিশোরী কারিগরগুলা মুগ্ধ দৃষ্টিতে জ্যাকের সুন্দর মুখের পানে চাহিতে ভুলে নাই। 'দেখ ভাই

লোকটি—কেমন আপনা-ভোলা—বেশ, না?' পরস্পরের মধ্যে এমনই মৃদু আলাপ চলিতেছিল। জ্যাকের কিন্তু সে দিকে কান দিবার অবসর ছিল না।

সহসা একটা জুতার দোকানের সম্মুখে প্রকাণ্ড এক ঝুড়ির প্রতি জ্যাকের দৃষ্টি পড়িল—ঝুড়িটার মধ্যে অসংখ্য ছোট-বড় টুপি! বেলিসারের নয় ত? টুপির সহিত বেলিসারের সম্পর্কের স্মৃতি জ্যাকের মনে এমন সুদৃঢ় রেখাপাত করিয়াছিল যে, দোকানের মধ্যে তাহার কৌতুহল দৃষ্টি পড়িতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না। বেলিসারই ত! খুব তন্ময় ভাবে সে জুতাওয়ালার সহিত একজোড়া ছোট জুতার দর স্থির করিতেছিল—তাহার পার্শ্বে একটি ছোট ছেলে দাঁড়াইয়াছিল—ছেলেটির বয়স পাঁচ বৎসরের অধিক হইবে না।

বেলিসার বলিতেছিল, "পায়ে লাগছে না ত? দেখ, বেশ করে দেখ।" বেলিসারের কথায় জ্যাকের হাসি আসিল। সে দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল, "কি, বেলিসার যে?"

"আরে, মাষ্টার জ্যাক! তুমি এখানে!"

"ভাল আছ, বেলিসার? এট তোমার ছেলে নাকি?"

অপ্রতিভ ভাবে বেলিসার কহিল, "না, না, আমার ছেলে কেন? মাদাম ওয়েবারের ছেলে, এটি।" তাহার পর দোকানদারের দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমি একবার দেখ দেখি, বেশ করে—পায়ে কোথাও কশা হচ্ছে কি না! জুতা বরং একটু বড় হওয়া ভাল লাগবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। কশা জুতার চেয়ে দুঃখ আর কিছু নেই—বুঝেছ! আমি একজন ভুক্তভোগী কিনা-তাই বলছি।"

কথাটা বলিয়া বেলিসার আপনার পায়ের পানে একবার চাহিল। কবে ঠিক পায়ের মাপে একজোড়া জুতা ফরমাস দিয়া তৈয়ার করাইবার সামর্থ্য, তাহার হইবে?

পরে ছেলেটিকে প্রায় বিশবার ধরিয়া প্রশ্ন করিয়া যখন সে জানিল, জুতা তাহার পায় আঁট হয় নাই, ঠিক খাপ খাইয়াছে, তখন আশ্বস্ত চিত্তে পকেট হইতে একটি লাল রঙের ছোট থলি বাহির করিয়া সে জুতাওয়ালার হাতে কয়েকটি রৌপ্যমুদ্রা গণিয়া দিয়া বাহিরে আসিল।

বাহিরে আসিয়া বেলিসার জ্যাককে কহিল, "তুমি কোন্ দিকে যাবে, জ্যাক?"

"কেন, বেলিসার?"

"কেন! তুমি যেদিকে যাবে, আমি ঠিক তার উল্টা পথে চলি তাহলে! তোমার পথে আর পা দিচ্ছি না!"

জ্যাকের মনে একটা আঘাত লাগিল। মনের ভাব মনে চাপিয়া জ্যাক বলিল, "আমি এসিনডেকের কারখানায় যাব—সেখানে আমি কাজ করব।"

"এসিনডেকের কারখানায় ঢোকা বড় সহজ নয়! ভাল সার্টিফিকেট চাই—না হলে ওরা ভর্ত্তি করে না।" কথাটা বলিবার সময় বেলিসার জ্যাকের পানে একটা বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। রিভালের মত বেলিসারও ইন্দ্রের সেই চুরির ব্যাপার সম্বন্ধে জ্যাকের প্রতি একটা ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিতেছিল। জেনেদার টাকা, জ্যাকই চুরি করিয়াছিল বলিয়া বেলিসারের বিশ্বাস। কিন্তু জ্যাক

যখন তাহাকে সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিল এবং আরও বলিল যে, সে এসিনডেকের কারখানায় কাজ করিবে এবং নিকটেই একটা ঘর ভাড়া লইয়া তথায় বাস করিবে, তখন বেলিসারের সন্দিগ্ধ মুখ প্রসন্ন ভাব ধারণ করিল। সে তাড়াতাড়ি উৎসাহপূর্ণ স্বরে বলিল, "সন্ধ্যার সময় আর কোথায় বাড়ী খুঁজে পাবে, জ্যাক? তার চেয়ে আমার সঙ্গে এস। আমার বাসায় প্রকাণ্ড ঘর—তাতে তোমার ঠাঁই খুব হবে'খন! তারপর আমার মাথায় একটা মতলব আছে। খাবার সময় বলব--এস, আমার বাসায় এস, জ্যাক!"

পথে বেলিসার জ্যাককে মাদাম ওয়েবারের পরিচয় দিল! মাদাম ওয়েবার বিধবা নারী —রুটি বেচিয়া দিন গুজরান করে। এই একটি ছেলে শুধু তাহার সমস্ত দুঃখ ভুলাইয়া রাখিয়াছে। ছেলেটিকে সে ঘরের বাহির হইতে দেয় না। বেলিসারের সঙ্গে বলিয়াই বেচারা ছেলেটি পথে বাহির হইতে পাইয়াছে। মাদাম ওয়েবার ভোর পাঁচটায় রুটি বেচিতে যায়, বেলা এগার-বারটার সময় আসে, তাহার পর আহারাদির পর 'বেকারি'তে যায়, রুটী তৈয়ার করিতে—সন্ধ্যার পর কাজ-কর্ম্ম সারিয়া গৃহে ফিরে—বেলিসার বাটিতে থাকিলে ছেলেটি তাহার নিকটেই থাকে, না হয়ত পাড়ার কোন স্ত্রীলোক দয়া করিয়া ছেলেটিকে দেখে। যখন দেখিবার কেহ না থাকে, তখন চেয়ারের সঙ্গে তাহাকে বাঁধিয়া মাদাম ওয়েবার বাহিরে যায়—কি জানি, একেলা থাকিলে যদি ছেলেমানুষ দিয়াশলাই লইয়া খেলা করিতে করিতে গায় আগুন লাগিয়া পুড়িয়া মরে।"

খানিকটা পথ চলিয়া আসিয়া বেলিসার বলিল, "এই আমাদের বাড়ী!" জ্যাক চাহিয়া দেখে, সম্মুখে এক উচ্চ সুদীর্ঘ বাটি—দেওয়ালের গায় অসংখ্য ছোট জানালা—বাহির হইতে দেখিলে কতকটা পায়রার খোপের মত বোধ হয়! জ্যাক্ বেলিসারের গৃহে প্রবেশ করিল। মাদাম ওয়েবার তখনও কিন্তু ফিরে নাই।

তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া ছেলেটিকে একটা উচ্চ চেয়ারের সহিত বাঁধিয়া বেলিসার জ্যাককে লইয়া পার্শ্বস্থ আপন কক্ষে আসিল। বাতি জ্বালিতে জ্বালিতে বেলিসার বলিল, "ভারি মজা হবে, জ্যাক! ছেলের পায় নূতন জুতা দেখে মাদাম ওয়েবার অবাক হয়ে যাবে—কে কিনে দিলে, বুঝতে পারবে না —ভারী মজা হবে—হাঃ হাঃ হাঃ—"

জ্যাক কহিল, "তুমি একলা এখানে থাক, বেলিসার? তোমার বোন?"

বেলিসার কহিল, "না—বোনটি বিধবা হয়েছে। অত বড় পরিবার পোষা কি আমার কাজ! তা ছাড়া দিনরাত ঝগড়া কিচিমিচি—খেটে-খুটে সে সব বরদাস্ত করতে পারি না আমি মোটে। কাজেই এখানে বাসা নিয়েছি। মাদাম ওয়েবার আমার খুব সাহায্য করে—ঘরকন্না দেখা-শুনা, সবই সে করে। বড় ভাল লোক মাদাম ওয়েবার—কোন ঝঞ্ঝাট নাই, বালাই নাই—পরের উপকার নিয়েই আছে! বাসার সকলেই মাদামের ভারী বাধ্য, ভারী যশ!"

বলিতে বলিতে টেবিলের উপর সে একখানা খবরের কাগজ বিছাইয়া দিল—তাহার উপর কাঁচের থালা-বাটি আনিয়া

রাখিল—এবং অতিথি জ্যাকের জন্য আহার্য্য ঢালিল। বেলিসার বলিল, "তোমাদের বাড়ী সেই যে হ্যাম খেয়েছিলাম, জ্যাক, আঃ তার স্বাদ জীবনে ভুলব না। বলব কি, অমন জিনিস আর কখনও খাইনি। চমৎকার! এ আর কি খাবার, জ্যাক!" বেলিসার যাহাই বলুক, জ্যাকের মুখে আহার্য্য মন্দ রুচিল না। আলু সিদ্ধ অনেকগুলা ছিল, সবগুলাই সে খাইয়া ফেলিল—রন্ধনটুকুও নিপুণ! সে রন্ধনের সুখ্যাতি করিলে, বেলিসার কহিল, "এ সব মাদাম ওয়েবার বেঁধে রেখে গেছে! তার গুণ কখনও ভুলব না। বললুম ত, তার জন্য আমার ঘরকন্না, আমায় নিজেকে আর দেখতে হয় না। সব সে ঠিক করে রাখে। এই জিনিসপত্র —এর কতক ত মাদাম ওয়েবারেরই— আমায় ধার দেছে ব্যবহার করব বলে! কটা দিনের জন্যেই বা এ ধার! এর পর সবই ত দুজনের হবে।"

কৌতূহল চিত্তে জ্যাক প্রশ্ন করিল, "তার মানে?"

"মাদাম ওয়েবারের সঙ্গে আমার বিয়ে হবে যে—হাঃ হাঃ হাঃ—আনন্দের আতিশয্যে কথাটা বলিয়া ফেলিলেও ঈষৎ লজ্জায় বেলিসারের গাল দুইটা ছম ছম করিয়া উঠিল! "বিয়ের সবই প্রায় ঠিক—আমি ত বলছি, দেরী করে কাজ কি? তা মাদাম ওয়েবার বলে, না, এ আয়ে কুলোবে না—মাদাম ওয়েবার ভারী হিসাবী—ও বলে, একজন সঙ্গী পাও যদি, ত দেখ,—একসঙ্গে থাকবে—বাড়ীর ভাড়া আর খোরাকির জন্য কিছু ধরে দেবে,—এমন একজন! তাহলে খরচের অনেকটা সাশ্রয় হবে! কথাটা খাঁটি বটে। কিন্তু এমন লোক পাচ্ছি না—বিয়ে হয়নি, কিম্বা স্ত্রী মারা গেছে, এমন একটি নিঃঝঞ্ঝাট মানুষ পাই, ভাল বিশ্বাসী লোক হয়, তবেই না! মাদাম ওয়েবার ভারী কষ্ট পেয়েছে। তার প্রথম স্বামীটা ভারী মাতাল ছিল—ভারী বদমায়েস! মদ খেয়ে এসে মাদাম ওয়েবারকে ভারী বক্‌ত, বেদম মারত! হাত তুলত জ্যাক, সত্যই ওর গায় হাত তুলত! আস্পর্দ্ধাটা ভাব, একবার! অমন ভাল লোক, মাদাম ওয়েবার, তার গায় হাত তোলে পাজী, বদমায়েস কোথাকার! আমি যথার্থ বলছি, জ্যাক, বিয়ে হয়ে গেলে কখনও ওর গায় আমি হাত তুলব না—কখনও না! বরং ও যদি তুলতে চায় ত আমি পিঠ বাড়িয়ে দোব। এখন আসল বিপদ হচ্ছে, এই লোক পাওয়া নিয়ে—বুঝেছ জ্যাক!"

"লোক খুঁজছ তুমি? তা আমায় রাখতে কোন আপত্তি আছে, তোমার?"

"তুমি? তুমি থাকবে, জ্যাক?"

"হাঁ, আমি! আমিই থাকব। আশ্চর্য্য হচ্ছ কেন, বেলিসার?"

"আমরা গরীব—তার উপর টানাটানি করে সংসার চালাই—খাওয়া-দাওয়া তেমন নয় ত! তোমার ভাল খাওয়া অভ্যাস—তুমি—"

"না বেলিসার—আমি বেশ থাকব, এখানে! তোমাদের যদি আপত্তি না থাকে—"

"আপত্তি! এ'ত পরম সৌভাগ্যের কথা!"

"আমিও খরচপত্র টেনেটুনে করতে চাই—আমিও বিয়ে করব কি না, বেলিসার—"

"তুমিও বিয়ে করবে? বাঃ—কবে বিয়ে কর্ব্বে, তুমি?"

"সে এখন অনেক দেরী আছে, বেলিসার, —চার বৎসর দেরী। আমি দিনের বেলায় এসিনডেকের কারখানায় কাজ করব, আর রাত্রে পড়াশুনা করব! ডাক্তারী শিখব।"

এমন সময় বাহিরে কাহার পদশব্দ শুনা গেল। বেলিসার কহিল, "মাদাম ওয়েবার আসছে!" পরমুহূর্ত্তে দ্বার খুলিয়া সহাস্য মুখে মাদাম ওয়েবার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। কোনদিকে না চাহিয়াই সে বলিল, "এ নিশ্চয় তোমার কাজ, বেলিসার, এই ছেলেটাকে জুতা কিনে দেওয়া—"সহসা তাহার দৃষ্টি নবাগত তরুণ লোকটির প্রতি পড়িতেই মাদাম ওয়েবার চমকিয়া থামিয়া গেল। বেলিসার তখন জ্যাকের পরিচয় প্রদান করিল—জ্যাক যে অর্থ দিয়া তাহাদের বাসায় থাকিতে ইচ্ছুক, সে কথাও সে এক নিশ্বাসে বলিয়া গেল। মাদাম ওয়েবার তাহা শুনিয়া জ্যাককে কৃতজ্ঞ অন্তরের ধন্যবাদ প্রদান করিতে ত্রুটি করিল না।

পরদিন সঙ্গীর বাসের সুবিধার জন্য মাদাম ওয়েবার ও বেলিসার উঠিয়া-পড়িয়া লাগিল। বড় ঘরের একপার্শ্বে একটি শয্যা বিছানো হইল—তাহারই পার্শ্বে একটা পুরাতন টেবিলের উপর মাদাম ওয়েবার রিভাল-প্রদত্ত জ্যাকের গ্রন্থগুলি স্তূপাকারে সাজাইয়া রাখিল। স্থির হইল, বিবাহ হইয়া গেলে নূতন বাসা তাহারা ভাড়া করিবে—কারখানার নিকটেই বাসা লইবে, তাহা হইলে জ্যাকের পথের ক্লেশও অনেকটা লাঘব হইবে!

রাত্রে মাদাম ওয়েবার ঘুমন্ত শিশুটিকে শয্যায় শয়ন করাইয়া জ্যাকের গৃহে আসিয়া জ্যাকের বাসন-পাত্র সে ঠিক করিয়া রাখিত, তাহার পরিচ্ছদাদি সাবানে ধৌত করিয়া সাফ্ করিয়া দিত, জ্যাকের বাতির সাহায্যে বেলিসার জ্যাকের পার্শ্বে বসিয়া টুপি তৈয়ার করিত, আর জ্যাক বহি খুলিয়া তাহারই মধ্যে সমগ্র চিত্ত একাগ্রভাবে নিক্ষেপ করিয়া দিত! এই অনলস পরিশ্রমী সচ্চরিত্র লোক দুইটির সঙ্গ তাহার নিকট মুহূর্ত্তের জন্যও দুঃসহ বোধ হইত না! বরং তাহাদিগকে দেখিয়া বিপুল শান্তিতে তাহার অবসন্ন মন ভরিয়া উঠিত!

কিছুদিন পূর্ব্বে যখন সে এতিয়োঁতে ছিল, তখন সে স্বপ্নেও ভাবে নাই যে, তুচ্ছ লজ্জা ও অভিমান বর্জ্জন করিয়া সে এমন পরিপূর্ণ আগ্রহে আবার একদিন কারখানার কাজে হাত দিতে পারিবে! আজ নূতন করিয়া আবার যখন সে কারখানায় প্রবেশ করিল, তখন তাহার চিত্তে এতটুকু ক্লেশ নাই, এতটুকু অবসাদ নাই—এই নীচ সঙ্গ—সত্যই নীচ—কিন্তু এ নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে তাহার আজ আর কোন আপত্তি ছিল না—কারণ এ নরকের পথটা অতিক্রম করিলে ঐ যে দূরে স্বর্গের সুগভীর আনন্দ-মাধুরীর আভাব পাওয়া যাইতেছে, আশ্বাস মিলিতেছে—সেই কাম্য স্বর্গে দেবী সিসিল জ্যাকের গলে বিজয়মাল্যটি দিবার জন্য অধীর প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে!

কারখানার কাজ কঠিন ছিল। সেই বায়ুহীন অগ্নি-গহ্বর! নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসে—তথাপি সিসিলের চিন্তা মুহূর্ত্তে শত

বেদনা ভুলাইয়া দেয়! প্রাণে নব শক্তি সঞ্চারিত করে!

কারখানায় কাহারও সহিত সে মিশিত না। পুরুষগুলা কুৎসিত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপেও জ্যাকের গাম্ভীর্য্য টলাইতে না পারিয়া তাহার বশ মানিয়াছিল—আর নারীগুলা—কৈশোরের সমগ্র প্রলোভনেও জ্যাককে ভুলাইতে পারিল না—তাহাদিগের চটুল চাহনি, মৃদু হাস্য, সমস্তই এই কর্ত্তব্যকঠোর তরুণ যুবকের বুকে লাগিয়া প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিত—সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইত! কারখানার সকলে জ্যাককে 'হুজুর' বলিয়া সম্বোধন করিত—জ্যাক তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইত না। ঘরে-বাহিরে ঐকান্তিক নিষ্ঠায় সে আপন কর্ত্তব্য করিয়া যাইত।

কার্য্য-শেষে জ্যাক কোথাও মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া বাসায় ফিরিত। পথ দীর্ঘ ছিল—তাহার মনে হইত, সে উড়িয়া যায়! কতক্ষণে এই সব কালি-ঝুলিমাখা পরিচ্ছদ খুলিয়া দূরে ফেলিয়া স্নানান্তে পরিচ্ছন্ন হইয়া ভদ্র বেশ ধরিয়া আপন অস্তিত্ব সে ফিরিয়া পাইবে! পাঠে আগ্রহ বাড়িয়াই উঠিত। কত রাত্রি একেবারে বিনিদ্র অবস্থায় কাটিয়া গিয়াছে—সহসা চোখে প্রভাতের আলো লাগায় তাহার চমক ভাঙ্গিয়াছে! মাদাম ওয়েবার কত ভৎসনা করিয়াছে, "মাষ্টার জ্যাক, সারাদিন কাজ, আর সারারাত্রি পড়া—একদণ্ড বিরাম নাই—চোখে এতটুকু ঘুম নেই—এমন করলে বাঁচবে, কেন?" জ্যাক শুধু তাহার পানে সহাস্য দৃষ্টিতে চাহিত—কি বলিবে, এমন কথা সে খুঁজিয়া পাইত না। এক একবার মনে হইত, সত্যই ত! এমন করিলে শরীর থাকিবে কেন! আবার পর মুহূর্ত্তে মনে হইত, সাধনা—কঠোর সাধনা চাই—নহিলে সিদ্ধি মিলিবে কেন?

সপ্তাহে একদিন শুধু সে পৃথিবীর পানে ফিরিয়া চাহিবার অবকাশ পাইত—একদিন সে সুখী হইত! সেদিন, রবিবার। ভোর পাঁচটা বাজিলে সহস্র কাজ ফেলিয়া, স্নান করিয়া তাহাকে সজ্জিত হইতে হইবেই! দেহের কালি ভাল করিয়া ধুইয়া-মুছিয়া, মনের কলঙ্ক দূর করিয়া মাদাম ওয়েবারের স্বহস্ত-পরিষ্কৃত ধোপ-দেওয়া পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া জ্যাক যখন এতিয়োঁর পথে বাহির হইত, তখনকার তাহার সেই বেশ, সেই প্রসন্ন মুখশ্রী যদি কারখানার কারিগরেরা কেহ দেখিত ত, সে নিশ্চয় বলিত, এ জ্যাক নহে, এ যেন কোন রাজপুত্র! কোন্ পরী-কাহিনীর সুশ্রী সুরূপ রাজপুত্র—পরীর দেশে ঘুমন্ত রাজকন্যার ঘুম ভাঙ্গাইয়া তাহার চিত্ত হরণ করিবে বলিয়া এমন বেশে সাজিয়া চলিয়াছে!

তাহার জন্য এতিয়োঁতে সে কি স্বর্গ-সুখ সঞ্চিত আছে! রবিবারটি যেন অন্য দিনগুলার মত দণ্ড-প্রহরে বিভক্ত নহে—সে যেন এক অবিভক্ত, অখণ্ড শুভ মুহূর্ত্ত!

মলিন মর্ত্ত্যে স্বর্গের একটি কোণ যেন ভাঙ্গিয়া খসিয়া পড়িয়াছে! রিভালের গৃহ কি এক বিচিত্র শোভায় সাজিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইতে দুই বাহু বাড়াইয়া আকুল আগ্রহে দাঁড়াইয়া আছে! ডাক্তারের প্রসন্নতা সিসিলের সরম-জড়িত সুগভীর আবেগ—এমন উপভোগ্য পদার্থ পৃথিবীতে আর কি আছে! সপ্তাহে জ্যাকের কতখানি পাঠ শেষ হইল, রিভাল তাহার হিসাব

লইতেন, পাঠ বলিয়া দিতেন, বুঝাইয়া দিতেন। অপরাহ্নে সকলে ভ্রমণে বাহির হইতেন। কোনদিন নদীর ধারে, কোনদিন বা বনের দিকে! ডাক্তার আপনার গতির বেগ কমাইয়া দিতেন—জ্যাক ও সিসিল অনেকটা অগ্রে চলিয়া যাইত। যাইতে যাইতে তাহাদিগের কত কথা হইত—কি করিয়া দিন কাটিতেছে, কেমন লোকজন! কিন্তু তাই বলিয়া, হৃদয়ের গোপন কোন কথা বাহির হইত না—সে বিষয়ে উভয়েই সতর্ক থাকিত—কিন্তু কথা বলিতে বলিতে উভয়েই সহসা স্তব্ধ হইয়া যাইত! যে কথা চাপিয়া রাখিবার জন্য এত চেষ্টা এই নীরবতার মধ্যে তাহাই যেন মুখরিত হইয়া হৃদয়ের দ্বারে মুহুর্মুহু আঘাত দিতে থাকে! ব্যক্ত ভাষা যাহা ফুটাইতে পারে না, অনেক সময় অব্যক্ত নীরবতায় তাহা ফুটিয়া উঠে, ইহা প্রকৃতির এক অপূর্ব্ব কৌশল, সন্দেহ নাই!

সেদিন বনের পথে যাইতে যাইতে একটা উগ্র কটু গন্ধ সকলের নাসিকায় প্রবেশ করিল। ডাক্তার রিভাল কহিলেন, "নিশ্চয় ডাক্তার হার্‌জ্ এসেছে—সমস্ত বন পুড়িয়ে বিষের সৃষ্টি করছে—নিশ্চয়, ডাক্তার হার্‌জ্।"

সিসিল দ্রুত আসিয়া ডাক্তারের মুখ চাপিয়া ধরিল, "আঃ দাদা, আস্তে—না হলে, শুনতে পাবে!"

সিসিলের হাত সরাইয়া ডাক্তার বলিলেন, "শুনুক না! ওকে ভয় করি কি আমি, সিসিল? জ্যাককে যেদিন ওর হাত থেকে উদ্ধার করে আনি, সেইদিনই ও আমার পরিচয় দিয়েছে—এ বুড়া হাড়ে কতখানি বল, তা ও সেদিন খুব বুঝেছে!"

তথাপি 'আরাম-কুঞ্জে'র সম্মুখ দিয়া চলিবার সময় জ্যাক ও সিসিল উভয়েই নীরব হইত। তাহাদের মনে হইত, ঐ বুঝি ডাক্তার হার্‌জ্ জানালার অন্তরাল দিয়া তাহাদিগকে দেখিতেছে! অথচ, কেন এ ভয়? জ্যাক ত আর্জেন্তঁর সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া আসিয়াছে! আজ তিন মাস কেহ কাহারও মুখ দেখে নাই! আর্জেন্তঁর প্রতি জ্যাকের ঘৃণা প্রতিদিন বাড়িয়াই উঠিতেছে! কিন্তু মাকে সে ভালবাসিত! তথাপি যেদিন হইতে সে সিসিলকে ভালবাসিতে শিখিলেন, সেদিন হইতে সে বুঝিয়াছে, কি অমূল্য সম্পদ্ এই ভালবাসা! কি শ্রদ্ধা ও গৌরবের সামগ্রী, এই প্রেম! এই প্রেমের মর্য্যাদা বুঝিয়াই আর্জেন্তঁর প্রতি ইদার এই নির্লজ্জ আনুগত্য, এই হেয় দাস্যের কথা স্মরণ করিয়া তাহার সমগ্র চিত্ত দারুণ লজ্জায় হাহাকার করিয়া উঠিত! হায়, অভাগিনী নারী—কি এ অন্ধ মোহ!

কি বিরাট ভ্রমের মধ্যে পড়িয়াছ, তুমি! উঃ, এই ইদা তাহার মা! তাই ইদার প্রতি ঘৃণার উদয় হইলেও করুণা ও সহানুভূতির মাত্রাটাই জ্যাকের চিত্তে অধিকতর প্রবল হইত।

এই তিন মাসে ইদার সহিত জ্যাকের সাক্ষাতও কয়েকবার হইয়াছিল। ইদাকে জ্যাক পত্র লিখিত, তাই ইদা তাহার সংবাদ পাইত। দুই একবার গাড়ী করিয়া কারখানার দ্বারে আসিয়া ইদা জ্যাকের সহিত সাক্ষাতও করিয়া গিয়াছে—সাক্ষাতে অপর কথা যত হউক না হউক, আর্জেন্তঁর কবি-যশের দীপ্ত বর্ণনায় ইদার মুখে যেন নির্ঝর বহিত!

কারখানার দ্বারে এত বড় গাড়ী দাঁড়াইতে ও হুজুর জ্যাককে সেই গাড়ীর আরোহিণী এক সুবেশা সুরূপা নারীর সহিত আলাপ করিতে দেখিয়া কারখানার কারিগরগণের মনে জ্যাকের প্রতি একটা সম্ভ্রম জাগিয়া উঠিয়াছিল। ক্রমে যখন দুই-চারিটা কাণাঘুষা জ্যাকের কানে পৌঁছিল, তখন সে মাতাকে নিষেধ করিয়া দিল—কারখানায় কাজের সময় বাহিরে আসিয়া সে আর ইদার সহিত দেখা করিতে পারিবে না—কারখানার কর্ত্তৃপক্ষেরও তাহা মনঃপূত নহে, তখন কখনও সাধারণ উদ্যানে, কখনও বা গির্জ্জাঘরে সন্ধ্যার সময় মাতা-পুত্রে সাক্ষাত হইত। একদিন কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া চলিয়া যাইবার সময় ইদা জ্যাককে বলিল, "জ্যাক, আমি এক বিপদে পড়েছি—তুমি কি—" কথাটা ইদার মুখে বাধিয়া গেল।

জ্যাক কহিল, "আমি কি ? বল, মা।"

"না, এই বলছিলাম কি—এ মাসটায় আমার এত বেশী খরচ হয়ে গেছে যে, হাত একেবারে খালি—কিছু নেই, জ্যাক! তাই বলছি, কি—ওঁকে টাকার জন্য কিছু বলতে পারি না আমি, ওঁর সময়টাও এখন ভাল যাচ্ছে না—কাজেই মেজাজটা একটু খিটখিটে হয়ে পড়েছে! তাই বলছিলুন, তুমি যদি দিনকতকের জন্য আমায় কিছু ধার দিতে পারত, এ টাকা আমি শীঘ্রই শোধ করে দেব, অবশ্য।"

জ্যাক বলিল, "শোধ দেবার কোন দরকার নাই, মা,—আমার কাছ থেকে টাকা নেবে তুমি; সে ত আমার ভাগ্য। আর কারো কাছ থেকে তুমি টাকা নিও, মা,—যখন দরকার হবে, আমায় বলো—আমি যেমন করে পারি, দেব।" বলিয়া পকেটে যে কয়টি মুদ্রা ছিল, তাহার সমস্তই জ্যাক ইদার হাতে দিল। সেদিন সে কারখানায় বেতন পাইয়াছিল।

ইদা কম্পিত হস্তে মুদ্রা কয়টি গ্রহণ করিল।

জ্যাক কহিল, "মা, তোমার ওখানে অসুবিধা হচ্ছে, না ? বল—আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি, তোমার কষ্ট হচ্ছে—তা যদি হয় ত, আমি আছি, মা,—আমার ঘর আছে! এস, আমার সঙ্গে আমার ঘরে থাকবে, এস! তা হলে আমার যে কি সুখ হয়, মা—"

"না, জ্যাক—ওঁর এখন এই খারাপ সময় যাচ্ছে, এ সময় ওঁকে এমনভাবে ফেলে চলে আসাটা ঠিক হবে না—বড় অন্যায় হবে!" বলিয়া ইদা কোচম্যানকে গাড়ী চালাইতে আদেশ দিল। গাড়ী চলিয়া গেল। জ্যাক অভিভূত ভাবে ফুটপাথের উপর দাঁড়াইয়া রহিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

তুমি কে ?

(Jnles Sandeau-র ফরাসী হইতে)

১

সেই দেবী যখন সর্ব্বপ্রথমে আমার সমক্ষে আবির্ভূত হন তখন আমার ষোল বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আমার মনে পড়ে, সেই মধুমাসের মধুযামিনী। আমি সহর হইতে একাকী বাহির হইয়াছি। বিনা উদ্দেশ্যে মাঠময়দানের উপর দিয়া আপনমনে কি ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছি, চিত্তের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য রহিয়াছে; এই চিত্ত চাঞ্চল্যের কারণ কি তাহা জানি না। কিয়ৎক্ষণের জন্য এই ভাবেই চলিয়াছি। আমি বিজনতা ভালবাসি।

আমি দেখিলাম, কনক-রঞ্জিত নীলসমুদ্রের মধ্যে সূর্য্য ডুবিয়া গেল; ক্ষুদ্রপর্ব্বতগাত্র হইতে ছায়াপুঞ্জ ধরাতলে নামিয়া আসিল; আকাশের নীলিমার মধ্যে, একে একে তারাগুলি ফুটিয়া উঠিল। পুষ্করিণীর ধারে ভেকেরা তান ধরিল। মধ্যে মধ্যে পাপিয়ার ঝঙ্কার শুনা যাইতে লাগিল। মন্দানিলস্পর্শে তরুপল্লব ঈষৎকম্পিত ও তৃণপুঞ্জ ঈষৎ অবনত হইয়া বিষাদময় মধুর মর্ম্মরধ্বনি করিতে লাগিল। যে চন্দ্রমা রক্তরাগে রঞ্জিত হইয়া দিগন্তে উদিত হইয়াছিল, এক্ষণে সেই চন্দ্রমা শুভ্র জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া ঝিনুক-শুভ্র মেঘের কোলে নিদ্রা যাইতেছে ও তথা হইতে রজত কিরণধারা রজনীর উপর বর্ষণ করিতেছে। কবোষ্ণ বায়ু প্রাণোন্মাদী সুগন্ধে ভরপুর। কুসুমিত গুল্মরাজির মধ্যে, নীড়স্থ বিহঙ্গদলের অস্ফুট কাকলী শুনা যাইতেছে।

এই সমস্ত সুস্বর ও সুগন্ধের নিকট প্রাণ খুলিয়া দিয়া আমি স্বচ্ছন্দে চলিয়াছি, এমন সময়ে দেখিলাম,—একদল তরুণী হাত ধরাধরি করিয়া গায়িতে গায়িতে সহরে ফিরিয়া যাইতেছে। উহারা সমস্বরে বসন্তঋতু ও প্রেমের গান গায়িতেছে। সুপ্ত মাঠময়দানের নিস্তব্ধতার মধ্যে উহাদের তরুণ কণ্ঠস্বর, দূরবর্ত্তী জলপ্রপাতের কলশব্দের ন্যায় স্পন্দিত হইতেছিল। আমি একটা গুল্মতরুর অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া, উহাদিগকে দেখিতেছিলাম। যে শুভ্র বাষ্পপুঞ্জ রাত্রিকালে, হ্রদের চতুর্দ্দিকে সঞ্চিত হইয়া লঘু নৃত্যলীলা প্রদর্শন করে এবং অরুণের প্রথম রশ্মিপাতেই অন্তর্হিত হইয়া যায়, উহারা ঠিক্ যেন সেই শুভ্র বাষ্পপুঞ্জ। নক্ষত্রের আলোকে আমি উহাদের মুখকান্তি দেখিতে পাইলাম, উহাদের পরিচ্ছদের মৃদু ঘর্ষণশব্দ শুনিতে পাইলাম। যাইতে যাইতে উহারা যাত্রাপথে কি-এক অপূর্ব্ব সৌরভ রাখিয়া গেল, উহা আমি দীর্ঘনিশ্বাস টানিয়া আঘ্রাণ করিতে লাগিলাম। যামিনীর সমস্ত সৌরভ অপেক্ষা ইহা চিত্তোন্মাদক। ঐ তরুণীবৃন্দ যখন চলিয়া গেল, অননুভূতপূর্ব্ব একপ্রকার উদ্বেগে আমরা চিত্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। আমি একটা মাটির ঢিবির উপর বসিয়াছিলাম। আমার পদতলে

হরিৎসমুদ্রের ন্যায় বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র প্রসারিত। আমার ললাটদেশ দুইহাতে ঢাকিয়া, আমি একপ্রকার স্বপ্নবৎ ভাবনায় নিমগ্ন হইলাম। আমার অন্তরে যে তুমুল শব্দ ও চকিতস্পন্দন চলিতেছিল, তাহা আমি কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিলাম।

আমি যে কষ্ট অনুভব করিতেছিলাম, তাহা কথায় প্রকাশ করা অসম্ভব। আমার বুক যেন ফাটিয়া যাইবে,—এমনি একটা অসহ্য বেদনা। আমার অন্তরে যেন একটা উৎস প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে—সেই উৎসের তরঙ্গক্ষুব্ধ রুদ্ধ জল উৎস হইতে নির্গত হইয়া বাহিরে প্রসারিত হইতে চাহিতেছে—অথচ বাহির হইবার কোন পথ পাইতেছে না। আমি নীরবে কাঁদিতে লাগিলাম—আমার নেত্র হইতে অশ্রুবর্ষণ হইতে লাগিল; এই অশ্রুপাতে কি জানি কি-এক অপূর্ব্ব বিলাস-সুখ আমি অনুভব করিতে লাগিল ম।

না জানি কতক্ষণ আমি এইভাবে ছিলাম। গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলাম, কিয়ৎপদ দূরে, আমার সম্মুখে, যেন কোন স্বর্গের দেবতা আমার দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। পদ্ম হইতেও শুভ্রবর্ণ একটা দীর্ঘ পরিচ্ছদ, সুন্দর ভাঁজে ভাঁজে পা পর্য্যন্ত লুটাইয়া পড়িয়াছে। "ছোঁয় কি না ছোঁয় মাটি"—এইরূপ দুটি মর্ম্মর-শুভ্র নগ্নপদ পরিচ্ছদের মধ্য হইতে দেখা যাইতেছে। তাঁহাব স্কন্ধের চারিপাশে কনক-কুন্তল মুক্তভাবে লুটাইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার শিরস্থিত কুসুম-কিরীটেরই ন্যায় তাঁহার কপোলদেশ সরস ও উজ্জ্বল; তাঁহার বাহুদ্বয় নগ্ন; তাঁহার একটি হস্ত স্বকীয় বক্ষের উপর ন্যস্ত; অপর হস্তটির দ্বারা ইঙ্গিত করিয়া আমাকে তিনি প্রসন্নভাবে নিকটে আহ্বান করিলেন।

আমি কিয়ৎক্ষণ নির্ব্বাক্ ও নিশ্চল হইয়া তাঁহার মূর্ত্তি অনুধ্যান করিতে লাগিলাম। নিশ্চয়ই তিনি স্বর্গ হইতে আসিয়াছেন; কেননা, ঐ সৌন্দর্য্যের মধ্যে পার্থিব নারীসৌন্দর্য্যের লক্ষণমাত্র নাই। আরও দেখিলাম, ভাস্বর পরিচ্ছদের ন্যায় একটা কিরণ-মণ্ডল তাঁহাকে আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছে। আমার কম্পমান বাহুদ্বয় তাঁহার দিকে প্রসারিত করিয়া, আমি বলিয়া উঠিলাম :—

—"দেবি তুমি কে ?"

নৈশ সমীরণ অপেক্ষা মধুরস্বরে তিনি উত্তর করিলেন :—

সখা, তোমার যখন জন্ম হয়,—বিধাতা-পুরুষ আমাকে তোমার বক্ষের মধ্যে নিদ্রাভিভূত করিয়া রাখিয়াছিলেন। আজ প্রভাতেও আমি নিদ্রিত ছিলাম; কিন্তু তোমার প্রথম উদ্বেগেই আমি জাগিয়া উঠিয়াছি। আমার প্রাণ তোমার প্রাণ দিয়াই গঠিত। আমি তোমার সঙ্গিনী; তাহার পর,—শুষ্ক বৃন্ত হইতে ফুল যেমন বিযুক্ত হয়, আমি সেইরূপ মধ্যপথে তোমাকে ত্যাগ করিয়া যাইব। সখা, সেদিনের আর বেশী বিলম্ব নাই। যে গোলাপ এক-প্রভাতমাত্র জীবিত থাকে, সেই গোলাপই আমার অদৃষ্টের প্রতিবিম্ব। আমাকে যদি ভালবাসিতে চাও, এই বুঝিয়াই আমাকে ভালবাসিও যে, একদিন নিশ্চয়ই তুমি আমাকে হারাইবে। তখন হাজার বিলাপ-ক্রন্দন করিলেও আমাকে পুনর্জীবিত

করিতে পারিবে না। শীঘ্র এস! আমার না আছে মায়া-দণ্ড, না আছে সম্মোহন-অঙ্গুরী; আমার কুন্তলের কুসুম-দাম ছাড়া আমার আর কোন বেশভূষা নাই।

কিন্তু তোমাকে আমি এত ধন ঐশ্বর্য্য প্রদান করিব, যে বিধাতা পুরুষ সুপ্রসন্ন হইয়া কোন রাজপুত্রকেও সেরূপ ঐশ্বর্য্য দান করেন নাই। তোমার ললাটে এমন একটি কিরীট পরাইয়া দিব যে, সসাগরা ধরণীর অধিপতিও সমস্ত রাজ্যের বিনিময়ে তাহা ক্রয় করিতে পারিলে আপনাকে ধন্য মনে করেন। তোমার জন্য যে অনুচরবর্গ নিযুক্ত করিব তাহা রাজ-প্রাসাদে ও রাজদরবারেও দুর্ল্ভ। আমি অদৃশ্য হইয়া তোমার সঙ্গে সঙ্গেই থাকিব। সর্ব্বত্রই তুমি আমার শুভকর প্রভাব অনুভব করিবে। তুমি যে স্থান দিয়া চলিবে, আমি সেই স্থান বিভূষিত করিব; রাত্রি তোমার শয্যাকে সুরভিত করিবে। তুমি জাগৃত হইলে, প্রতিদিন প্রভাতে প্রকৃতি যাহাতে তোমাকে হাসিমুখে অভিবাদন করে এইজন্য আমার সমস্ত অন্তঃকরণটা আমি বিশ্বপ্রকৃতিকে প্রদান করিব। আমরা দুজনে কত উৎসব আনন্দ সম্ভোগ করিব। কেবল সখা আমি তোমার নিকট যে ঐশ্বর্য্য আনয়ন করিব, তাহা তুমি ভাল করিয়া চিনিতে শিখিবে; তোমার হস্তচ্যুত হইবার পূর্ব্বেই তাহাদিগকে আঁকড়াইয়া ধরিবে; ম্লান না করিয়া কিরূপে উহাদিগকে স্পর্শ করিতে হয়, নিঃশেষিত না করিয়া কিরূপে উহাদিগকে সম্ভোগ করিতে হয় তাহা জানিতে চেষ্টা করিবে। আমাকে ছাড়িয়া যে অর্দ্ধপথ তোমাকে চলিতে হইবে তাহার জন্য পূর্ব্ব হইতেই কিছু সঞ্চিত করিয়া রাখা আবশ্যক।

সখা আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমরা জীবনের আর অল্পদিনই অবশিষ্ট আছে, কিন্তু আমার এই ক্ষণভঙ্গুর ও বহু-মূল্য জীবনকে আরও কিছুকাল বাঁচাইয়া রাখা না রাখা তোমারই উপর নির্ভর করি-তেছে। আমি সেই সব দুর্ল্ভ চারা-গাছের ন্যায় যাহাদিগকে সূর্য্যকিরণ ও বৃষ্টির দ্বারা অতি সন্তর্পণে বর্দ্ধিত করিতে হয়! আমার চরণযুগল অত্যন্ত সুকুমার, তোমার অনুসরণে উহাদিগকে ক্লান্ত হইতে দিও না। আমার কপোলকান্তি মানস-সরোবরের শতদল অপেক্ষাও কোমল। একদিনের মধ্যেই উহা ম্লান হইয়া গিয়াছে ইহা যদি তুমি দেখিতে ইচ্ছা না কর, তবে অতি প্রখর উত্তাপের মধ্যে আমাকে রাখিও না, আমাকে কোন নিবিড় ছায়ার মধ্যে লইয়া যাইও। আমার বিয়োগে এমনিই ত তোমার দারুণ কষ্ট হইবে, কিন্তু দেখিও যেন তোমার পরিতাপ কোনপ্রকার অনুতাপের দ্বারা বিষাক্ত না হয়। যেন আমার স্মৃতি তোমার পক্ষে শুভজনক হয়, আমি যখন তোমার নিকট হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিব তাহার বহুকাল পরেও আমার মধুর প্রতি-বিম্ব যেন তোমার অন্তঃকরণে প্রফুল্লতা আনয়ন করে।

এই কথাগুলি বলিয়া, ভাগ্য-দেবতা যেরূপ সদ্যোজাত শিশুর শয্যার উপর ঝুঁকিয়া থাকেন সেইরূপ তিনি আমার দিকে স্বকীয় শুভ্র মস্তক নত করিলেন। তাঁহার ওষ্ঠাধরের সুকোমল স্পর্শ আমার ললাটদেশে আমি অনুভব করি-

ও সুরভিত। আমি তাঁহাকে ধরিবার জন্য আমার বাহু প্রসারিত করিলাম, কিন্তু দেখিলাম, তাহার পূর্ব্বেই ঐ শুভ্র ছায়ামূর্ত্তি স্বপ্নবৎ অন্তর্হিত হইয়াছে।

তবে কি ইহা বস্তুতই স্বপ্ন? আমি আবার মাঠের উপর দিয়া চলিতে লাগিলাম। কখনও হতবুদ্ধির ন্যায় দৌড়িতেছি; কখনও বা তৃণভূমির উপর পড়িয়া তৃণভূমিকে তপ্ত অশ্রুজলে সিক্ত করিতেছি; কখনও বা ভুর্জ্জ-বৃক্ষ হইতে যে পত্রবৃন্ত সোজা বাহির হইয়াছে তাহা আমার বক্ষের উপর চাপিয়া ধরিয়া ভাবিতেছি ঐ বৃন্তও আমার বাতুল হৃদয়ের পেষণে যেন অনুস্পন্দিত ও অনুকম্পিত হইতেছে। কখনও বা নক্ষত্রগণের অভিমুখে আমার বাহু প্রসারণ করিয়া তাহাদের সহিত প্রেমালাপ করিতেছি; কখনও বা ফুলদিগের সহিত, গাছপালার সহিত, গুল্মলতার সহিত কথা কহিতেছি। আমি যেন অনুভব করিতেছি, আমার মধ্য দিয়া একটা রসের প্রবাহ উদ্বেলিত হইয়া সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইতেছে। বাঁধ ভাঙ্গিয়াছে। উৎস যেন পাষাণ ভেদ করিয়াছে। আমি একবার হাসিতেছি, একবার কাঁদিতেছি। আমি অবর্ণনীয় আনন্দের সহিত এক অসীম সমুদ্রে যেন সাঁতার দিতেছি।

যখন পূর্ব্বদিক শুভ্র হইয়া উঠিল,—আমার মনে হইল, যেন এই সর্ব্বপ্রথম আমি সৃষ্টির জাগরণ প্রত্যক্ষ করিলাম। আমার হৃদয় স্ফীত হইয়া উঠিল, আমি সগর্ব্বে নিঃশ্বাস গ্রহণ করিতে লাগিলাম, মুহূর্ত্তের জন্য আমার মনে হইল যেন অনন্ত আকাশে উঠিবার জন্য আমার লঘুভারাপন্ন মুক্ত আত্মা দেহ হইতে বিমুক্ত হইতে উদ্যত হইয়াছে। আমি যেন এক উচ্চ পর্ব্বতে উপনীত হইয়াছি, এবং তাহার শিখরদেশ হইতে জয়োল্লাসের দৃষ্টিতে সমস্ত দিক্‌চক্রবালের পরিমাপ করিতেছি! যেন ধরণী আমার জন্যই এই মাত্র সৃষ্ট হইয়াছে, এবং যেন আমিই জগতের প্রভু।

২

আমার বয়স তখন ত্রিশ বৎসর হয় নাই,—সেই দেবী দ্বিতীয়বার আমার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। আমার বেশ মনে পড়ে—সে কার্ত্তিকমাসের সায়াহ্ন। আমি সহর হইতে একাকীই বাহির হইয়াছিলাম। মাঠের উপর দিয়া বিনা উদ্দেশ্যে চলিয়াছি। চিত্ত বিষাদে ভারাক্রান্ত—কেন, তাহা জানি না। এইরূপ ভাবে আমি অনেকক্ষণ চলিয়াছি। বিজনতার অনুরাগী না হইলেও বিজনস্থানের অন্বেষণ করিতেছি।

বাষ্পজালে অবগুণ্ঠিত হইয়া আকাশ যেন নীচে নামিয়া আসিয়াছে। কন্‌কনে উত্তরে বাতাস অশুভসূচক শব্দসহকারে, বৃক্ষের শেষপত্রগুলিকে প্রবল আঘাতে বৃন্তচ্যুত করিতেছে। কাঁটাগাছের ঝোঁপে তাহার ক্ষুদ্র ফলগুলি ছাড়া তাহার আর কোন সাজসজ্জা নাই। পত্রাদি সমস্তই ঝরিয়া গিয়াছে। দূরস্থ কোন জোদ্দারের ক্ষেতবাড়ী হইতে কুকুরের বিষাদময় বুক্কন শুনা যাইতেছে। নীলাভ ধূমজাল বৃক্ষের শাখাপল্লবের ভিতর দিয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতেছে। উহা ব্যতীত এই উজাড় মরুপ্রান্তরে জীবনের আর কোন নিদর্শন লক্ষিত হয় না। তথাপি, কতকগুলি ভয়-চকিত পক্ষী শাখা হইতে শাখান্তরে ইতস্তত উড়িয়া

বেড়াইতেছে। মসীর দাগের-মত কতকগুলা কালো দাঁড়কাক মাটির উপর বসিয়া আছে। বলাকাশ্রেণী সায়াহ্নের ধূসর আকাশ দিয়া ধীরে ধীরে গমন করিতেছে।

প্রকৃতির বিষণ্ণতার সহিত আমার অন্তঃকরণকে মিশাইয়া আমি চলিয়াছি। সুদিনের অবসানে বাহ্যপ্রকৃতি যেরূপ ঘোর বিষাদের ভাব ধারণ করে, অনেক দিন হইতে আমার চিত্তে সেইরূপ একটা বিষাদের ভাব আসিয়াছে। এক পত্রহীন গুল্মতরুর তলদেশে উপবেশন করিয়া আমি দেখিতে পাইলাম, আমার নিকট দিয়া দুইজন বৃদ্ধা, ধীরপদক্ষেপে চলিয়া যাইতেছে। কাঁটাগাছের বোঝা কাঁধে করিয়া উহারা নুইয়া পড়িয়াছে। শীতকালের পূর্ব্বায়োজনস্বরূপ তারা এই সকল কাঁটা গাছ স্বকীয় কুটীরে লইয়া যাইতেছে।

অপূর্ব্ব স্মৃতি। উদ্ভট ঘটনা-সাদৃশ্য। আমি এখন যেখানে বসিয়া আছি—এই একই স্থান হইতে বহুদিন পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম,—মধুমাসের কোন মধুর সায়াহ্নে, একদল তরুণী হাত-ধরাধরি করিয়া গান গায়িতে গায়িতে গৃহে ফিরিয়া যাইতেছিল।

তখন আমার বয়স ষোল বৎসর, আর তখন এই গুল্মতরুতে ফুল ধরিয়াছিল।

দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া,—সেই বসন্তসায়াহ্ন আর আজিকার এই শারদসায়াহ্ন—এই অন্তরালের মধ্যে যে দিনগুলা অতিবাহিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমার মনের মধ্যে পুনরালোচনা করিতে লাগিলাম; একটু পরেই গভীর বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন হইলাম।

তারপর গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলাম আমার সম্মুখে, কিয়ৎপদ অন্তরে, একটি পাণ্ডুবর্ণ মূর্ত্তি বিষণ্ণভাবে আমার দিকে চাহিয়া আছে। এত পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে মূর্ত্তিটি চিনিতে আমার একটু বিলম্ব হইল। তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে আর সেই ভাস্বর কিরণ-মণ্ডল নাই, যাহা তাঁহার প্রথম আবির্ভাবকালে আমি পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম। তাঁহার সেই পরিচ্ছদটি ছিন্নভিন্ন হইয়া যাওয়ায় তাহার মধ্য হইতে তাঁহার ক্ষতবিক্ষত বক্ষদেশ বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার চরণদ্বয় রক্তাপ্লুত; তাঁহার বাহুদ্বয় তাঁহার শীর্ণ পার্শ্বদেশে নির্জীবভাবে ঝুলিয়া পড়িয়াছে! তাঁহার নেত্রের নীলিমা কৃষ্ণবর্ণে পরিণত হইয়াছে; তাঁহার সীসকবর্ণ কপোলদেশে অশ্রুধারা যেন হলরেখা খনন করিয়া দিয়াছে; হতভাগিনী অতি কষ্টে দাঁড়াইয়া আছে। ভগ্নবৃন্ত শুষ্ক কমলের ন্যায় মাটির দিকে তাঁহার দেহ যেন ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম;—

"তুমি কি চাও?"

—শীত-বায়ু অপেক্ষাও বিষাদময় করুণস্বরে তিনি উত্তর করিলেন;—সখা, আমাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিবে, তাহার সময় আসিয়াছে। জন্মের মত ছাড়াছাড়ি হইবার পূর্ব্বে, তোমার নিকট আমি চিরবিদায় গ্রহণ করিতে আসিয়াছি।

আমি বলিয়া উঠিলাম ঃ—

"দূর হ' মিথ্যাবাদিনি, আমার জন্য তুই কি করিয়াছিস? আমাকে যে ঐশ্বর্য্য দান করিবি বলিয়াছিলি সে ঐশ্বর্য্য কোথায়? যাত্রা পথে আমি কত অন্বেষণ করিলাম, কৈ, ঐ ঐশ্বর্য্যের কণামাত্রও ত কোথাও দেখিতে পাইলাম না। আমার পদতলে যে রত্নভাণ্ডার অর্পণ করিবি বলিয়াছিলি তাহা কোথায়? রত্নভাণ্ডার

দূরে থাকুক, আমি পাইয়াছি কেবল দারিদ্র্য। আমার ললাটে যে রাজমুকুট পরাইয়া দিবি বলিয়াছিলি, সে রাজমুকুটের কি হইল? রাজমুকুটের বদলে আমার মস্তক এক্ষণে কণ্টকের মুকুট ধারণ করিয়াছে। যে উজ্জ্বল-বেশধারী অনুচরবর্গ আমাকে দিবি বলিয়াছিলি তাহারা কোথায়? এক্ষণে নৈরাশ্য ও বিজনতাই ত আমার একমাত্র অনুচর। তুই যদি দুঃখের অপদেবতা হোস, তাহলে বিচ্ছেদের কথা কেন বলিতেছিস্?—আমাদের উভয়ের মধ্যে সাধারণ ধর্ম্ম কি আছে? তোতে আমাতে কিসের সম্বন্ধ? এ কথা যদি সত্য হয়, তুই সর্ব্বত্রই আমার অনুসরণ করিয়াছিস এবং সর্ব্বত্রই তোর প্রভাব আমার উপর বিস্তার করিয়াছিস তাহা হইলে দূর হ' হতভাগিনী, কেননা তুই হচ্ছিস অমঙ্গলের অপদেবতা।

দেবী বিষণ্ণভাবে উত্তর করিলেন—"আমি দুঃখেরও অপদেবতা নই, অমঙ্গলেরও অপদেবতা নই, কিন্তু মানুষের অদৃষ্টই এইরূপ যে আমাকে হারাইবার পর তবে মানুষ আমাকে চিনিতে পারে; আমার প্রদত্ত ঐশ্বর্য্য যখন তাহার ভোগে আসিবে না, তখনই সে তাহার মূল্য বুঝিতে পারে। সখা তোমার অন্য ভ্রাতৃগণের ন্যায় তুমিও দেখিতেছি অকৃতজ্ঞ। কিন্তু মুহূর্ত্তের মধ্যেই তুমি আমাকে চিনিতে পারিবে, এবং তখন—তোমার অবশিষ্ট জীবনের বিনিময়েও তুমি সেই প্রথম দিনের মত আবার আমাকে দেখিতে ইচ্ছা করিবে। তুমি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ, আমি তোমাকে যে ঐশ্বর্য্য দিব বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলাম সে ঐশ্বর্য্য কোথায়? কিন্তু আমি মুক্তহস্তে তোমাকে যাহা দান করিয়াছিলাম তুমি যে তাহা অবজ্ঞা করিয়াছিলে। আমি যে মুকুটে তোমার ললাট ভূষিত করিয়াছিলাম, তাহা বসন্তপ্রভাতের নবীনতা, উজ্জ্বলতা ও প্রশান্তি। আমি যে অনুচরবর্গ তোমাকে দিয়াছিলাম তাহা প্রেম, বিশ্বাস, আশা ও মোহ-বিভ্রম। তোমার দারিদ্র্যকেও আমি এরূপ হাস্যময় ও সুন্দর করিয়া তুলিয়াছিলাম যে, প্রবল পরাক্রান্ত ধনশালী ব্যক্তিরাও তাহার সহিত তাহাদের প্রাসাদ ও ধনরত্ন অনায়াসে বিনিময় করিতে পারে। তোমার বিজনতাকে আমি মোহিনী স্বপ্নকল্পনায় পূর্ণ করিয়া দিয়াছিলাম। তোমার নৈরাশ্যের সহিত তোমার এমন একটা ভালবাসা জন্মাইয়া দিয়াছিলাম, তোমার অশ্রুতে তোমার এমন একটা মত্ততা উৎপাদন করিয়াছিলাম যে, অতিবড় দুর্দ্দশাও তোমাকে কাতর করিতে পারিত না। তুমি যখন চলিতে, তোমার চতুর্দ্দিকে মমতা ও দয়াকে সজাগ রাখিয়াছিলাম। তুমি যেখানেই যাইতে সুহৃদের দৃষ্টি ও ভ্রাতার হস্তই দেখিতে পাইতে। আকাশ হাসিমুখে তোমার পানে চাহিত, স্বয়ং ধরণী তোমার প্রতিপদক্ষেপে পুষ্পিত হইয়া উঠিত।

এখন বলদেখি, তুমি আমার এই উদার দানের কি সদ্ব্যবহার করিয়াছ? আমি যে ঐশ্বর্য্য তোমাকে দান করিয়াছিলাম তাহা কি তুমি রক্ষা করিতে পারিয়াছ? আমি যে তোমার পথে এত সুখের বীজ ছড়াইয়াছিলাম তাহার একটিও কি অবশিষ্ট আছে? তুমি যদি তাহা রক্ষা করিতে না পারিয়া থাক, তজ্জন্য

কি আমি দায়ী? তুমি যদি সে সমস্ত উপভোগ করিতে না পারিয়া থাক তজ্জন্য কি আমাকে দোষী করিবে?

এই কথাগুলিতে আমার সমস্ত অন্তরাত্মা একপ্রকার আলোকে উদ্ভাষিত হইয়া উঠিল। মনে হইল যেন আমার নেত্র হইতে একটা অবগুণ্ঠন খসিয়া পড়িল; এবং অন্তঃকরণের এই আলোক দর্শন করিয়া আমি ভয়ে অভিভূত হইলাম।

আমি অনুনয়ের স্বরে বলিয়া উঠিলাম; "থাকো, থাকো, ওগো তুমি যেওনা। আমি পূর্ব্বে যাহা অবজ্ঞা করিয়াছিলাম সেই ঐশ্বর্য্য আমাকে ফিরাইয়া দেও; এখন আমার চোখ খুলিয়াছে, আমি প্রকৃত আলোক দেখিতে পাইয়াছি। সেই প্রেম, সেই মোহ আমাকে ফিরাইয়া দেও; সেই বিশ্বাস, সেই আশা আমাকে ফিরাইয়া দেও। এক দিনের জন্যও যাতে ভালবাসিতে পারি, একদণ্ডের জন্যও যাহাতে বিশ্বাস করিতে পারি, তুমি সেই সামর্থ্য আমাকে দেও। তাহা হইলে, তুমি যেই হওনা কেন, আমি মরিতে মরিতেও তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিব।"

—"হায়! এখন আমারই মৃত্যুকাল আসন্ন। তুমি কি তাহা দেখিতে পাইতেছ না? আমার দিকে একবার তাকাইয়া দেখ। আমি বড় কষ্ট পাইয়াছি; এখন আমি আমার পূর্ব্বকায়ার ছায়ামাত্রসার। দেখ, বহুদিন হইতে একটা অপরিজ্ঞান দুঃখানলে আমি দগ্ধ হইতেছি; একটা তপ্ত নিঃশ্বাস-বায়ু আমার অস্থিরাশিকে শুকাইয়া ফেলিয়াছে, আমার বক্ষের মধ্যে যে প্রাণের উৎস ছিল তাহা শুকাইয়া গিয়াছে। আমার হৃদয়ে আর রক্ত আইসে না; আমার হাত স্পর্শ করিয়া দেখ,—উহাতে মৃত্যুর শীতল আর্দ্রতা অনুভব করিবে। তবু তুমি যদি ইচ্ছা করিতে, আমি আরও দীর্ঘকাল বাঁচিতে পারিতাম! নিষ্ঠুর, তুমিই আমার অকাল-মৃত্যু আনিয়াছ! তোমাকে অনুসরণ করিয়াই আমার বলক্ষয় করিয়াছি, আমার চরণদ্বয়কে ক্ষতবিক্ষত করিয়াছি। আমি কতবার তোমার নিকট একটু বিশ্রামের জন্য প্রার্থনা করিয়াছি, কিন্তু তুমি তাহাতে কর্ণপাত কর নাই; তুমি আমাকে কেবলই বলিয়াছ,—"চল চল", আমিও তোমার কথা অনুসারে চলিয়াছি। আমি চলিতে চলিতে অবসন্ন হইয়াছি, রুদ্ধশ্বাস হইয়াছি; পথের কণ্টকগুল্মে আমার পরিচ্ছদ ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে; মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের উত্তাপে আমার ললাট দগ্ধ হইয়াছে। আমার শিথিল কটিবন্ধ একটু যে আঁটিয়া বাঁধিব, কিংবা আমার কিরীটের ম্লান কুসুমগুলি একটু জলে ভিজাইয়া তাজা করিয়া লইব, তুমি তাহারও অবকাশ দেও নাই। আমি যদি কোন শান্তিময় আশ্রম অথবা কোন অপূর্ব্ব মরুকানন দেখিতে পাইয়া তোমাকে বলিতাম;—"এইখানেই সুখ মিলিবে, এস সখা এখানেই আমরা অবস্থিতি করি!" তুমি আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া ক্রমাগত চলিতে, এবং তপ্ত বালুরাশির উপর দিয়া আমাকেও নির্দ্দয়ভাবে টানিয়া লইয়া যাইতে। তুমি আমার উপর কত অত্যাচারই করিয়াছ, আমার মাথার উপর দিয়া কত ঝটিকাই বহিয়া গিয়াছে? সে সময় তুমি আমাকে কি রক্ষা করিয়াছিলে? কতবার আমি শ্রান্তক্লান্ত

হইয়া, হতাশ হইয়া ভূমিতে বসিয়া পড়িয়াছি, তোমাকে ত্যাগ করিবার সংকল্প করিয়াছি! কিন্তু ত্যাগ করিতে পারি নাই। অকৃতজ্ঞ, আমি তোমাকে যে ভালবাসিয়াছিলাম। তুমি যখন আমাকে তোমার কাছে দেখিতে না পাইয়া, ইঙ্গিত করিয়া কিংবা সম্বোধন করিয়া আমাকে আবার ডাকিতে, আমি তথনই উঠিয়া তোমার কাছে ছুটিয়া আসিতাম। আজ সব শেষ হইয়াছে, সখা আমার আর শক্তি নাই! আমার রক্ত স্তম্ভিত হইয়াছে, আমার দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়াছে, আমার পদদ্বয় অসাড় হইয়া পড়িয়াছে। তোমার বাহু বাড়াইয়া দেও, তোমার বক্ষে আমাকে চাপিয়া ধর। তোমার বক্ষের মধ্যেই আমি প্রাণ লাভ করিয়াছি, তোমার বক্ষের উপরেই আমি প্রাণত্যাগ করিব!"

আমার বাহু প্রসারিত করিয়া তাহাকে ধরিতে গেলাম আর বলিয়া উঠিলাম;—"না, না, তুমি প্রাণত্যাগ করিও না।"

"কিন্তু মায়াবিনি বল দেখি তুমি কে?"

সে বলিল;—"আমি ছিলাম তোমার যৌবনশ্রী—এখন আর নই।"

এই কথা শুনিয়া, আবার তাহাকে আমি ধরিতে গেলাম, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই সে অন্তর্হিত হইয়াছিল; কেবল দেখিলাম, তাহার কুন্তল হইতে কতকগুলি শুষ্ক ফুল মাটিতে পড়িয়া আছে; আমি সেইগুলি সযত্নে তুলিয়া লইলাম, কিন্তু একটিতেও আর সুগন্ধ নাই।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর।

বর্ষার আনন্দ

১

কড়্ কড়্ কড়্ কড়্! রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ রিম্!
ওই ওই সরসা বরষা,
হের দেখ নামিল সহসা!
ওই দেখা যায় ওর ভৃঙ্গ সম কালো কালো চুল;
বিদ্যুৎ-কটাক্ষ ওই, স্বর্ণ বর্ণ, অতুল, অতুল;
ওই দেখ ক্রোড়ে ওর গন্ধরাজ জাতি যূথী ফুল,—
মেঘমন্দ্রে এ কি মন্ত্র উচ্চারিছে, আনন্দ-আকুল।
এ চিত্ত-গোলাপ বাগে হের দেখ নাচে শিখীকুল,—
বুল্‌বুল্ নাচিল সহসা!
হের দেখ নামিল বরষা!

২

কড়্ কড়্ কড়্ কড়্ রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ রিম্
সুশীতল চন্দন পরশা,
হের দেখ নামিল বরষা!
মেঘমন্দ্রে পরাজিত পলাইল সারথি অরুণ,
উষ্ণশ্বাস নিশ্বসিয়া নিশ্বসিয়া, কি কষ্ট দারুণ
পেয়েছিল এ বসুধা।—এতদিনে নিভিল আগুন।
মিলন-আনন্দ আজি বিরহিণী হিয়ায় দ্বিগুণ,
প্রাণনাথ-দরশে সহসা!
হের দেখ নামিল বরষা!

৩

কড়্ কড়্ কড়্ কড়্ রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ রিম্
নামিয়াছে সরসা ভরসা,
নামিয়াছে সরসা বরষা,
আমার এ কবি চিত্তভূমে! হের পেয়ে অবলম্ব',
শিহরিয়া শিহরিয়া ফুটিয়েছে সোণালী কদম্ব!
এসেছে অপরাজিতা! আর তার সহে না বিলম্ব!
অকস্মাৎ পুষ্প ফোটে, ফল দোলে, পিয়ে জলবিম্ব!
নারিঙ্গী হইল লাল! ফাটি পড়ে রসাল দাড়িম্ব!
চিত্তভূমি হইল সরসা!
কি আনন্দ! কি আনন্দ! এতদিনে নামিল বরষা।

বর্ষাশেষে

হরি হরে হল প্রেমের মিলন
কাটিল বাদল বাধা,
নীল অম্বরে নীরদ শুভ্র,—
আধায় মিলেছে আধা!

কেশবের বুকে মণি কৌস্তভ
দীপ্ত তপন একা,
কিরণে যাহার শম্ভু ললাটে
মিলাল বহ্নি-লেখা!

সে বুকের আলো পরশ হরষে
জটিল জটার মাঝে,
মূক তুষারের পরাণ গলান
মুক্তি ঘোষণা বাজে!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

পোড়ারমুখী

যামিনীনাথের স্ত্রী দামিনীলতার অষ্টম গর্ভের সন্তান স্নেহলতা, ওরফে পোড়ারমুখী।

পোড়ারমুখী বড় অসময়ে আসিয়াছিল। যামিনীনাথ পাঁচটি কন্যার বিবাহে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া ঋণদায়ে জর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। দুইটি পুত্র; তাহাদের শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহে তাঁহাকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইত। মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে কোন্ দিক রক্ষা করিবেন যামিনীনাথ ভাবিয়া কূল পাইতেন না।

অষ্টম গর্ভে পুত্র না হইয়া কন্যা হইল। যামিনীনাথ মনের কষ্ট মনে চাপিয়া কন্যার নাম রাখিলেন স্নেহলতা, মা নাম রাখিল, পোড়ারমুখী।

২

পোড়ারমুখীর বয়স যত বাড়িতে লাগিল তাহার রূপ বয়সকে দ্বিগুণ ছাপাইয়া উঠিতে লাগিল;—বারো বৎসর বয়সে পরিপূর্ণ যৌবন-শ্রী বালিকার সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া উঠিল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া, তাহার বিবাহের কথা ভাবিয়া ভাবিয়া বাপমা'র চোখের জল আর শুকাইতে পাইত না।

ফেলিল। মেয়ে তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া আঙ্গুলে জলপটি বাঁধিয়া দিল; শেষে দুই হাতে মা'র গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, মা রাতদিন এত কি ভাবিস্? মা বলিল, যা' তুই খেলা করগে যা। মেয়ে ছাড়িল না, বলিল, বল্ না মা বল্ না। মা হাত উঠাইয়া মেয়েকে চড় মারিতে গেল, হাতখানা কিন্তু গালে না পড়িয়া গলায় জড়াইয়া পড়িল। মা মেয়েকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া বলিল, পোড়ারমুখী মেয়ে! আর জায়গা পেলিনে, মরতে আমার পেটে এলি—পোড়ার মুখ একেবারে পুড়িয়ে এলি! মেয়ে হাসিতে হাসিতে বলিল, আমার টিয়ে পাখীটা কি বল্ছে শোন্ মা। টিয়ে পাখী তখন বলিতেছিল, লক্ষ্মী মা আয়, লক্ষ্মী মা। মায়ের চোখে জল আসিল, বলিল, যা টিয়ে পাখীকে খাবার দিয়ে আয়, আমি রান্না চড়াব।

মেয়ে টিয়ে পাখীর কাছে না গিয়া আস্তে আস্তে বাবার কাছে গেল। বাবা তখন পঞ্চাশটি টাকা লইয়া হিসাবে ব্যস্ত ছিলেন। নূতন মাস পড়িয়াছে, পাওনাদারেরা একে একে আসিয়া জুটিবে;—বাড়িওয়ালা ভাড়া

মুদী ময়রা স্যাকরা সকলকেই কিছু কিছু দিতে হইবে। কোন্ দিক সামলাইবেন যামিনীনাথ ভাবিয়া কূল পাইতেছিলেন না। এমন সময় পোড়ারমুখী ডাকিল, বাবা! সে ডাক যামিনীনাথের কানে পৌঁছিল না। আর একটু বড় গলায় মেয়ে আবার ডাকিল, বাবা! যামিনীনাথ এইবার শুনিতে পাইলেন, উত্তর করিলেন, মা লক্ষ্মী! পোড়ারমুখী মনে করিয়াছিল, বাবাকে জিজ্ঞাসা করিবে, মা রাতদিন কেন এত ভাবে; কিন্তু বাবার মুখ দেখিয়া তাহার আর কোন কথা বাহির হইল না। যামিনীনাথ বলিলেন, পয়সা নেবে মা লক্ষ্মী, এই নাও, একটা পয়সা নাও। পোড়ারমুখী পয়সাটি আঁচলে বাঁধিয়া উঠিয়া আসিল এবং রাস্তার ধারে জানালার কাছে বসিয়া ভাবিতে লাগিল, বাবা মা কেন এত ভাবে।

৩

গোয়ালার অনেক পাওনা, সে শাসাইয়া গেল আর দুধ দিবে না; মুদী বলিয়া গেল, ধারে আর চাল ডাল দিবে না; স্যাকরা বলিয়া গেল, তিন দিনের ভিতর টাকা না পাইলে সে নালিশ করিবে। যে আসে সেই টাকা চায়, —কেউ আসিয়া ডাকিলে যামিনীনাথের মুখখানা শুকাইয়া যায়।

পোড়ারমুখী সবই বুঝিল। সে সারাক্ষণ বাবার আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়ায়,দরজার পাশে, জানালার নীচে, আনাচে কানাচে যেখানে বসিলে তার বাবাকে দেখিতে পাওয়া যায়, বাবার মুখের দিকে ডাগর ডাগর চোখ দুটি মেলিয়া সেখানে গিয়া সে চুপটি করিয়া বসিয়া থাকে। আজ বাবার মুখখানা বড় শুকনো, দিন দিন বড় রোগা হয়ে যাচ্ছেন,—পোড়ারমুখী দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে থাকিত।

সেদিন সন্ধ্যাকালে যামিনীনাথ আফিস হইতে বাড়ি ফিরেন নাই। দুইটা দরোয়ান লাঠি-হাতে দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল,— উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল,—যামিনীবাবু, যামিনীবাবু বাড়ি আছেন? পোড়ারমুখী দরজার ফাঁক দিয়া যমদূতের ন্যায় দুই মূর্ত্তি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল; ভাবিল, বাবাকে এরা মারবে নাকি! সে আস্তে আস্তে তাহাদের কাছে গিয়া বলিল, তোমরা বাবাকে কিছু বোলো না—তোমাদের পায়ে পড়ি, তোমাদের অনেক ফুল দেব। তাহারা ভাল বুঝিতে না পারিয়া বলিল, কি বল্‌ছ মায়ি? পোড়ারমুখী বলিল, তোমরা বাবাকে কিছু বোলো না, আমি আস্‌ছি। সে অপরাহ্নে মালা গাঁথিবার জন্য অনেক ফুল তুলিয়া রাখিয়াছিল—কোঁচোড়ে করিয়া সবগুলি দরোয়ানদের কাপড়ে ঢালিয়া দিল, কাতরকণ্ঠে বলিল, যাও লক্ষ্মীটি তোমরা যাও। দরোয়ানরা পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া আর এক সময় আসিবে ঠিক করিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেল। পোড়ারমুখী হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

৪

সন্ধ্যাকালে ছাদের উপর শুইয়া পোড়ারমুখী ভাবিতে লাগিল, আহা, যদি শিউলি ফুলগুলো টাকা হ'ত, ভোর বেলায় কুড়িয়ে এনে মা'র হাতে দিতাম! মা বল্‌ত, পোড়ারমুখী সোনামুখী; বাবা বল্‌ত, স্নেহলক্ষ্মী বড় লক্ষ্মী। গোয়ালার টাকা সব শোধ হয়ে যেত, স্যাকরা আর বাবাকে শাসাত না, মা রাজরাণীর

সেবা করত, বাবা গাড়ি করে' বেড়াতে যেতেন,—ভাবিতে ভাবিতে পোড়ারমুখী ঘুমাইয়া পড়িল।

হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া পোড়ারমুখী শুনিল, ওপাড়ার মোক্ষদা মাসী মা'র সঙ্গে গল্প করিতেছে; মাসী বলিল, শোনোনি বোন্, মা কালী জমিদার-বউকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেছেন, আমি তোদের নতুন পুকুরে আছি, শীগ্গির একটি অষ্টম গর্ভের সন্তান এনে আমার কাছে উচ্ছুগ্গো কর—তবে তোদের পুকুর উথ্লে উঠ্বে, গোলা ধানে ভরে' যাবে, নাতির নাতির মুখ দেখতে পাবি; নইলে তোর ভিটেমাটি সব উচ্ছন্ন যাবে। তা' জমিদার-বৌ একলক্ষ টাকা দেবে বলেছে—একটি অষ্টম গর্ভের সন্তান কেউ যদি দেয়। পোড়ারমুখী কানখাড়া করিয়া শুনিতে লাগিল। মা বলিল, থাক্ দিদি, ওসব কথায় আর কাজ নেই, ওকথা শুন্লেও পাপ হয়। মাসী বলিল, না বোন্, তাই কি বল্‌চি, আমি তোমাকেই কি দিতে বলছি! মানুষে কি তাই পারে!

প্রতিবেশিনী চলিয়া গেলে মা মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া অনেকক্ষণ চোখের জল ফেলিল; তাহার পর মেয়েকে তুলিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া চোখের জল মুছিতে মুছিতে নীচে নামিয়া আসিল।

৫

সপ্তাহ কাটিয়া গেল। পোড়ারমুখী একদিন বাবার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবা, একলক্ষ কত টাকা? বাবা বলিল, অনেক টাকা। পোড়ারমুখী বলিল, গোয়ালার টাকা শোধ যায়? বাবা বলিল, যায়। পোড়ারমুখী বলিল, স্যাকরার টাকা শোধ যায়? বাবা বলিল, যায়। পোড়ারমুখী বলিল সব টাকা শোধ যায়? বাবা হাসিতে হাসিতে বলিল, কেনরে, তুই কি একলক্ষ টাকা দিবি? পোড়ারমুখী আর কোন কথা না বলিয়া আস্তে আস্তে সেখান হইতে চলিয়া আসিল।

৬

দেওয়ালীর দিন সকলে বাড়িতে প্রদীপ সাজাইতে লাগিল। পোড়ারমুখী বলিল, মা, আমি ঘাটে প্রদীপ দিয়ে আস্‌ব। মা বলিল, শীগ্‌গির ফিরে আসিস্ কিন্তু, নতুন পুকুরে যাস্‌নে যেন।

একখানি ছোট্ট ডুরে সাড়ী পরিয়া, ছোট একখানি থালায় মাটির প্রদীপগুলি সাজাইয়া পোড়ারমুখী ঘাটের দিকে চলিল। সে নতুন পুকুরের দিকেই চলিল। পুকুরে তখনও সিঁড়ি কাটা হয় নাই, মাটির উপর মাটি জমিয়া পুকুরের পাড় পাহাড়ের মত উঁচু হইয়া রহিয়াছে; তাহার চারিধারে পোড়ারমুখী প্রদীপগুলি সাজাইয়া দিল। পাড়ের উপর দাঁড়াইয়া সে সম্মুখে চাহিয়া দেখিল, পুকুরের জল থই থই করিতেছে—কালো জল, রাত্রে আরও কালো দেখাইতেছে। পোড়ারমুখী একদৃষ্টে অনেকক্ষণ জলের দিকে চাহিয়া রহিল, পরে আঁচলখানি গলায় দিয়া ধীরে ধীরে জলের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল—যোড়করে 'মা কালী!' বলিয়া চীৎকার করিয়া একেবারে জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। সেই শব্দে বনের পাখীরা পাখা-ঝাড়া দিয়া উঠিল, ত্রস্ত পশুর পদক্ষেপে শুক্‌নো পাতা মর্মর্ করিয়া উঠিল,—তাহার পর সমস্ত নীরব। ক্রমে প্রদীপগুলি একে একে সব নিবিয়া গেল; চারিদিকে কেবল অন্ধকার—কালীর মত কালো অন্ধকার।

মোহ

বিনোদচন্দ্র এফ এ পাশ করিয়া কলিকাতায় বি এ পড়িতে আসিল। কলিকাতায় তাহার এক নূতন উপসর্গ জুটিল,—থিয়েটার!

থিয়েটারে নূতন নাটক খুলিলেই মেসের সঙ্গীগণের সহিত তাহার অভিনয় দেখিতে যাওয়া তাহারও বাদ পড়িত না। সঙ্গীর দল অভিনয় দেখিয়া খানিকটা হাসিয়া, খানিকটা-বা বাহবা দিয়া অভিনয়ের জের শেষ করিয়া ফেলিত, কিন্তু এই মায়া-বিভ্রমের মধ্য দিয়া বিনোদচন্দ্রের অন্তরে ধীরে ধীরে এক নূতন ভাব জাগিয়া উঠিতেছিল।

এই নিতান্ত একঘেয়ে জীবনের উপর তাহার কেমন ঘৃণা জন্মিতেছিল! নিত্য সকালে উঠিয়া বই লইয়া বসা, তাহার পর মাথায় একটু জল ঢালিয়াই নাকে-মুখে দুই-চারিটা ভাত গুঁজিয়া কলেজ গমন! তথায় হাই তুলিয়া অধ্যাপকগণের গণ্ডি-ঘেরা নীরস বক্তৃতা শুনিয়া অপরাহ্নে মেসে প্রত্যাগমন—ও পরে অর্থহীন হাসি গল্প-গানে সময় কাটাইয়া আহার ও নিদ্রা। একদিনের জন্য এ নিয়মের ব্যতিক্রম নাই। এতটুকু বৈচিত্র্য নাই! কলের মত ঘড়্ ঘড়্ করিয়া দিনগুলা বহিয়া চলিয়াছে—এই কি জীবন?

কিন্তু ঐ মায়াময় ইন্দ্রজালময় আলোকোজ্জ্বল রঙ্গমঞ্চের লোকগুলির জীবন-স্রোত কি বিচিত্র ধারায় বহিয়া চলিয়াছে! সুখ, দুঃখ, মিলন বিরহ, প্রেম, নৈরাশ্য, তাহারই চকিত স্পর্শে কখনও হর্ষ, কখনও বেদনার আভাষ—কি সুন্দর লোভনীয় জীবন! দারুণ দুঃখে জীবন [illegible] কোনদিকে একটুক আশার আলোক দেখা যায় না!—সহসা কোথা হইতে স্বর্গের বীণা বাজিয়া উঠিল! দুঃখী জাগিয়া চাহিয়া দেখে, অনন্ত সুখ, ও ঐশ্বর্য্যের ডালি লইয়া কোন্ দেবী আসিয়া তাহার দ্বারে দাঁড়াইয়াছে! কোন সুদৃঢ় নিয়মের বন্ধন নাই! অপূর্ব্ব রাজ্য! এই অপূর্ব্ব রাজ্যে শুধু আলো, হাসি, গান ও আনন্দ! সেখানে না আছে, চাকর বামুনের দ্বন্দ্ব-ফর্দ্দ, না আছে, সহযোগীগণের তর্ক-কোলাহল, না আছে ট্রামের ঘর্ঘর ও অধ্যাপকের প্রলাপ!

২

লিলি থিয়েটারে সেদিন মহাসমারোহে "মনিয়া" গীতি-নাট্য, প্রথম অভিনীত হইবে! চিত্র-বিচিত্র করা বিজ্ঞাপনের রঙ্গিল কাগজে থিয়েটার-ওয়ালারা সহরের বক্ষ ছাইয়া ফেলিয়াছে! বিনোদচন্দ্রের মেসের সঙ্গীর দল সন্ধ্যার পূর্ব্বে হইতেই থিয়েটার-গমনের উদ্যোগ-আয়োজনে লাগিয়া গিয়াছে।

রাত্রি নয়টায় থিয়েটার-বসিবে। আটটার সময় হইতেই থিয়েটার গৃহের সম্মুখস্থ পথে বিষম লোকারণ্য! টিকিট কিনিবার সুযোগ সম্ভাবনা নাই দেখিয়া বহু দর্শক টিকিট ঘরের দিকে ম্লান দৃষ্টিতে চাহিয়া নিরাশ হৃদয়ে পথে ফিরিতেছে। বিনোদচন্দ্রের দল অর্থের মায়া ত্যাগ করিয়া সম্মুখস্থ আসনে বসিয়া গিয়াছে। ভবানী পান বিলাইতেছে—হেমেন্দ্র সিগারেট টানিতেছে, দয়াল প্রোগ্রাম পড়িতেছে, আর বিনোদচন্দ্র মঞ্চস্থ পটের পানে চাহিয়া ভাবিতেছে—এই পট! এই মোটা পর্দ্দার পশ্চাতে কি বিরাট কাব্য এখনই উন্মুক্ত

উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে! সুখ দুঃখের সেই তড়িৎ খেলা। কাব্য-লোকের যে সকল নরনারীর হর্ষে প্রাণ মাতিয়া উঠিবে, বেদনার চিত্ত কাতর হইয়া পড়িবে, তাহার হাসি বা অশ্রুর কণাটুকুও লক্ষ্য করিবে না, তাহার আন্তরিক সহানুভূতির মর্ম্ম বুঝিবে না! কোন্ দেশের সুখ-দুঃখ-ভোলা প্রাণী ইহারা, —সুখ-দুঃখে অনুরাগ বিরাগে এমন অবিচলিত অচঞ্চল চিত্ত!

ঘণ্টা বাজিল। পট উঠিল। প্রথমেই রাজার প্রমোদ-উদ্যান—রাজবধূ মনিয়া মৃগয়া-গত স্বামীর সংবাদ না পাইয়া কাতর উদ্বিগ্ন চিত্তে বসিয়া আছেন। গান গাহিয়া, গল্প করিয়াও সখীগণ মনিয়ার সে উদ্বেগ দূর করিতে পারিতেছে না! বধূর মুখে প্রেমের আলোটুকু ম্লানিমার ছায়া-পাতে দিব্য কমনীয় ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। শ্রাবণের আকাশে মেঘের কোলে চাঁদের পাণ্ডু ছবির মতই তাহা করুণ, মর্ম্মস্পর্শী! বিনোদচন্দ্র ভাবিল, আহা অভাগিনী রাজবধূ!

দৃশ্যের পর দৃশ্য পরিবর্ত্তন হইতেছিল! নাটিকার ঘটনা ত্বরিত গতিতে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছিল। বিনোদের মনে হইতেছিল, এ যেন সে জাগিয়া চোখে কিছু দেখিতেছে না—ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতেছে!

প্রথম অঙ্কের শেষে দেখা গেল, রাজপুত্র মোহনসিংহ এক ছদ্মবেশিনী দৈত্য-কন্যার রূপের মোহে পড়িয়া, পত্নী, রাজ্য, গৃহ সব ভুলিয়া বসিয়াছে! নানা উৎপীড়নে মোহনের প্রেম, বাধা পাইলেও বন্ধ মানিতেছিল না। দৈত্যকন্যা যত যন্ত্রণা দেয়, তাহার প্রেম তত তীব্র, অনুরাগ তত প্রবল হইয়া উঠে! গৃহে এখানে মনিয়া কাঁদিয়া সারা হইয়া যাইতেছে, তথাপি মোহনের মোহ ভাঙ্গে না! বিনোদের চক্ষে জল আসিল।

তৃতীয় অঙ্কে নাটিকার সমাপ্তি। ক্রমে সেই তৃতীয় অঙ্ক দেখা দিল। মনিয়া স্থির থাকিতে না পারিয়া স্বামীর সন্ধানে নিজেই বাহির হইয়াছে! কত নদী-পর্ব্বত লঙ্ঘন করিয়া, ক্ষেত্র-প্রান্তর পার হইয়া বিপদে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, হাঁটিয়া চলিয়া দূর শৈলতলে রাজকন্যা এক সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পাইল। সন্ন্যাসীর মুখে সে শুনিল, তাহার স্বামী এক দৈত্যকন্যার প্রেমে মজিয়া সব বিসর্জ্জন দিয়াছে! দৈত্য-কন্যা নানা প্রলোভনে কত সুশ্রী তরুণ যুবককে ভুলাইয়া আনিয়া নৃশংসভাবে তাহাদিগকে হত্যা করে! সন্ন্যাসী খড়ি পাতিয়া গণিয়া বলিলেন, মোহন যদি তাহার প্রিয়জন মনিয়াকে দেখিতে পায়, তবেই শুধু তাহার মুক্তির আশা আছে,—এ মোহ কাটিবার সম্ভাবনা আছে! নহিলে আজ রাত্রিশেষে তাহার মৃত্যু নিশ্চয়।

তবে ত আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব নহে! সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে! পথ জানিয়া লইয়া মনিয়া উন্মাদিনীর মত ছুটিল। সে এক তুষার-মণ্ডিত অত্যুচ্চ শৈলশিখরে দৈত্যকন্যার কনকপ্রাসাদ—মোহন সেই স্থানে আছে!—সে শৈলের পথও দুর্গম! সন্ন্যাসীর বাস শৈলের অপর পার্শ্বে যে গভীর প্রপাত, তাহারই পরপারে দৈত্যের শৈলপুরী!

একটি উপায়, শুধু! মনিয়া তাহাই অবলম্বন করিল। সন্ন্যাসীর বাসশৈলের শৃঙ্গে সে উঠিতে লাগিল। পা আর চলে না—ভারিয়া যায়! কি কঠিন বন্ধুর পথ!

ক্রমে আকাশ মেঘে ভরিয়া আসিল। মুষলধারে বৃষ্টি নামিল। সঙ্গে সঙ্গে ঝড়—ভীষণ প্রলয় ঝড়! কিন্তু মনিয়ার তাহাতে ভ্রূক্ষেপও নাই! ক্ষণে ক্ষণে বিজলী হানিতেছে! সেই ক্ষণিক আলোকের সাহায্যে পথ খুঁজিয়া মনিয়া ক্রমে শৈলশৃঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইল! আবার বাজ হাঁকিল, কক্কড়! কড়! বিদ্যুৎ চমকিল! বিদ্যুতের আলোকে মনিয়া দেখে, ঐ যে দৈত্যকন্যার কনকপ্রাসাদ! কালো মেঘের কোলে ঝিক ঝিক করিয়া জ্বলিতেছে। যেন কালো বস্ত্রখণ্ডে কে ছোট একটি সোণার চুমকি বসাইয়া দিয়াছে! চকিত আলোকে কি করিয়া মোহন তাহাকে চিনিবে? কি করিয়া তাহার মোহ ভাঙ্গিবে? প্রাণ বাঁচিবে?

পর্ব্বতশৃঙ্গে দাঁড়াইয়া মনিয়া তখন গান ধরিল সে এক আকুল কাতর কণ্ঠস্বর! মর্ম্মভেদী বিলাপ! কোথায় প্রিয়তম, কোথায় তুমি—আলেয়ার আলোকে পথ ভুলিয়া দিক্‌-ভ্রান্ত তুমি কোন্ বিপথে গিয়াছ? তোমারই পথ চাহিয়া এখানে তোমার দুঃখিনী দাসী যে বসিয়া আছে, প্রভু! ওগো দয়িত, ওগো প্রেমাধার, ওগো জীবনসর্ব্বস্ব—এস, এস! তোমার মনিয়ার বুকে ফিরিয়া এস!

মিষ্ট কণ্ঠের করুণ সঙ্গীতে সারা রঙ্গমঞ্চে শোকের একটা প্লাবন বহিয়া গেল। দর্শকমাত্রেই তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিল। বিনোদচন্দ্রের চক্ষু দিয়া ঝরঝর করিয়া জল ঝরিতেছিল। এমন সুন্দরী বধূ,—রূপে মাণিক ঠিকরিয়া পড়িয়াছে—তন্বী দেহলতাখানি কবিবর্ণিতা পল্লবিনী লতার মতই সুশ্রী; কোমল! হৃদয়ে তাহার এত প্রেম, তবু—সে দুঃখ পাইবে! অবোধ রাজপুত্র! যে রূপের পদতলে সমগ্র বিশ্ব বিপুল শ্রদ্ধায় শির লুণ্ঠিত করিয়া দিতে চাহে, দিয়া ধন্য হয়,—সে রূপের আদর জান না,—মূঢ় তুমি, দুর্ভাগা তুমি!

৩

মনিয়ার অভিনয় বেশ জমিয়া উঠিল! প্রতি শনিবার থিয়েটারে মনিয়ার অভিনয় চলিল এবং প্রতি অভিনয় রাত্রেই বিনোদচন্দ্র মন্ত্রমুগ্ধের মত আসিয়া দর্শকের স্থান অধিকার করিয়া বসিতে লাগিল! মনিয়ার রূপ, মনিয়ার ভাগ্য তাহাকে একান্ত বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল! বিনোদ ভুলিয়া গেল, সে থিয়েটার দেখিতেছে! ভুলিয়া গেল, মনিয়ার অস্তিত্ব শুধু কবিকল্পনাতেই! ভুলিয়া গেল, মনিয়ার ভূমিকা যে লইয়াছে, সে একজন অভিনেত্রী,—অভাগিনী, সমাজ-পরিত্যক্তা, পতিতা নারীমাত্র!

ক্রমে এই মনিয়া তাহাকে রীতিমত আবিষ্ট করিয়া তুলিল।

থিয়েটারের এক গার্ড বিনোদচন্দ্রের এই বিচলিত ভাব লক্ষ্য করিল। সে আসিয়া গায় পড়িয়া একদিন তাহার সহিত আলাপ করিল, "কেমন দেখছেন?"

তখন মুহূর্ত্তের জন্য বিনোদের চমক ভাঙ্গিল! সে অভিনয় দেখিতেছে বটে! সে বলিল, "চমৎকার!"

তখন গার্ড বলিল, এই অভিনেত্রী মুরলাকে অনেক টাকা বেতন দিয়া থিয়েটারে নিযুক্ত করা হইয়াছে—এত বেতন থিয়েটারে আর কাহাকেও দেওয়া হয় না—যেমন তাহার মধুর কণ্ঠ, অভিনয়কলায় দক্ষতাও তেমনই!

বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে ইহার তুল্য শক্তি কোন অভিনেতা বা অভিনেত্রীর নাই! থিয়েটার-বাটির সম্মুখে সে থাকে! অভিনয় শিখিতে আগ্রহও তাহার অদ্ভুত!

* * *

বিনোদচন্দ্র ভাবিল, এই মনিয়া—ইহার সহিত দুইটা কথা কহিতে দোষ কি! আহা, হতভাগিনী রাজবধূ! বিনোদচন্দ্রের মনে একটা আকুলতা জাগিয়া উঠিয়াছিল! একটা মোহ! সে এই মনিয়ার রূপের! দুঃখিনী রাজবধূ মনিয়া—একবার সে তাহাকে দেখিবে —সে যে মনিয়ার ব্যথার ব্যথা অনুভব করিয়াছে, ইহা সে একবার তাহাকে বুঝাইয়া বলিবে! বিনোদের মনে হইতেছিল, রূপের কথা! রূপের পূজার কথা। সেলি কীট্‌স্‌ বায়রণ রূপের সাধনায় জীবন কাটাইয়াছেন, সে রূপ কি? অর্থহীন! উপেক্ষার সামগ্রী? রূপ, বিধাতার শ্রেষ্ঠ দান—তাঁহার প্রতিবিম্ব! এই রূপের প্রতি সে যদি শ্রদ্ধা প্রকাশ করে ত কিসের আপত্তি! নারায়ণ যেদিন মোহিনীমূর্ত্তিতে জগতে দেখা দিয়াছিলেন, সেদিন সর্ব্বত্যাগী শঙ্করও যে সে রূপ দেখিয়া উন্মাদ হইয়াছিলেন! রূপের উপাসক কে নহে? রূপের উপাসনা করিব, তাহাতে কিসের দ্বিধা, সঙ্কোচ কিসের?

দুর্ব্বল চিত্ত! ক্ষণিক ভ্রান্তি!

বিনোদচন্দ্র গার্ডের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিল,—পরদিন সন্ধ্যার সময় সে মনিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। গার্ড হাসিয়া বলিল, "এ ত অনুগ্রহ!"

পরদিন সন্ধ্যার সময় কথামত বিনোদ আসিয়া থিয়েটার-গৃহের সম্মুখে দাঁড়াইল। গার্ড তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল, বিনোদকে দেখিয়া বলিল, "আসুন।"

বিনোদচন্দ্রের বুকটা ধ্বড়াস করিয়া উঠিল! সহসা পা যেন বাধিয়া গেল! মাথায় রক্তটা চিন চিন করিয়া উঠিল! কিন্তু কেন, এ সঙ্কোচ! কে জানে, কেন? তবু পা যেন কে চাপিয়া ধরিতেছে—ছাড়িবে না!

বিনোদচন্দ্রকে লইয়া গার্ড একটা বাটীতে প্রবেশ করিল। উপরের একটা ঘর হইতে তখন তবলার ধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছিল, তাহার সহিত তারিফের একটা জড়িত স্বর, 'হা হাঃ—হাঃ!'

সিঁড়ি বাহিয়া বিনোদ গার্ডের সহিত দ্বিতলের দালানে উঠিল। দালানের প্রান্তে বসিয়া এক নারী ছোট হুঁকায় তামাকু টানিতেছিল। নারী প্রৌঢ়া—দেহ কৃশ, মুখে-চোখে গভীর কালির রেখা, সমস্ত অবয়বে যেন একটা কদর্য্যতার ছাপ লাগিয়া রহিয়াছে! গার্ড ডাকিল, "মুরলা—"

প্রৌঢ়া নারী উঠিয়া দাঁড়াইল—হাতের হুঁকা নামাইয়া রাখিয়া বলিল, "আসুন।"

বিনোদ সসঙ্কোচে কহিল, "এ কে? কোথায় নিয়ে এলে?"

গার্ড হাসিয়া কহিল, "আরে, এই ত মশায়, আপনার প্রাণের মনিয়া—আমাদের মুরলাসুন্দরী—"

এই মনিয়া! এই কুশ্রী বীভৎস নারী! পাপের মূর্ত্তিমতী ছায়া—এই মনিয়া! সেই রূপের নির্ঝর, প্রেমের আদর্শ, ললামভূতা মনিয়া—সে এই! দারুণ মর্ম্মতাপে বিনোদের অন্তর দগ্ধ হইয়া গেল! মনিয়া তাহার ক্ষুব্ধ অন্তরের শান্তি—এই সে!

কাগজ-শৃঙ্খলে বন্দী বীরেন্দ্রকেশরী সরোষ গর্জ্জনে
রঙ্গস্থল প্রকম্পিত করিতেছেন !

[শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত চিত্র হইতে]

কল্পনার স্বর্গ একটা নির্ম্মম আঘাতে ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল—সেই খণ্ড ভগ্নস্তূপে কি আবর্জ্জনা প্রকাশ হইয়া পড়িল—এ যে নরক! ধিক্ তাহাকে! সে এই নীচ ঘৃণ্য প্রাণীটাকে দেখিতে আসিয়াছে! যেখানে নরকের দারুণ বহ্নি জ্বলিতেছে, সেখানে সে সঞ্জীবনী সুধার অন্বেষণে আসিয়াছে! পিতার শ্রেষ্ঠ দান রূপ, তাহাও ইহার নিজস্ব নহে? ভাড়া-করা বেশ ও বর্ণের সাহায্যে শুধু কুহকের জাল বিস্তার করিয়া বেড়ায়! বিনোদের সমস্ত প্রাণ ঘৃণায় লজ্জায় কাঁপিয়া শিহরিয়া উঠিল! সে একেবারে সিঁড়ি বাহিয়া নীচে আসিল। গার্ডটা পশ্চাতে ছুটিল—বিনোদের হাত ধরিয়া সে কহিল, "পালাচ্ছেন কেন? আসুন, গানটান শুনুন!"

পৈশাচিক ক্রোধে বিনোদ জ্বলিয়া উঠিল। তীব্র স্বরে চীৎকার করিয়া সে বলিল, "ছেড়ে দে, পাষণ্ড—"এই নরকে আমাকে টেনে এনেছিস্, তুই? ছেড়ে দে!"

সজোরে গার্ডের হাত ছিনাইয়া বিনোদ বাহির পথে আসিয়া পড়িল। তাহার ললাটে স্বেদবিন্দু ফুটিয়া উঠিয়াছিল—রুমালে তাহা মুছিয়া দ্রুত একখানা চলন্ত ট্রামে সে উঠিয়া পড়িল।

স্তম্ভিত গার্ড উপরে আসিলে মুরলা কহিল, "ব্যাপার কি? অমন করে চলে গেল যে—?"

"পাগল! পাগল!" বলিয়া সম্ভাবিত অর্থলাভে নিরাশ হইয়া ব্যথিত চিত্তে গার্ড মেঝের উপর বসিয়া পড়িল।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

প্রকৃত প্রতিশোধ

এতদিন তাহাকে খুলিয়া বলি নাই, যে আগুনে নিজে দগ্ধ হইতেছি, যেকথা মনে করিলে—এখনও প্রতিশোধ-আলোড়িত হৃদয়ের অভিসম্পাতরাশি সর্পগর্জ্জনে গরল উদ্গীরণ করে,—সেকথা তাহাকে বলিয়া কেন আর তাহার বালকহৃদয়ের শান্তি অপহরণ করি? যাহা হারাইয়াছি তাহা আর ফিরিয়া পাইব না;—যিনি আমাদের এ দুর্দ্দশার মূলীভূত কারণ তিনিও আজ আমাদের প্রতিশোধের বাহিরে, তবে কেন আর সে সব কথা বলিয়া বংশগত একটা বিদ্বেষভাবে আমার ন্যায় তাহার হৃদয়কেও বিষাক্ত করিয়া তুলি। ইহাতে জগতে কাহারও মঙ্গল নাই। এই ভাবিয়া এতদিন পর্য্যন্ত তাহাকে কোন কথা খুলিয়া বলি নাই, কিন্তু আর না বলিয়া কিছুতেই চলিল না।

আমাদের দেশ আঁধুল, কিন্তু থাকি আমরা দুই ভাইয়ে কলিকাতায়। আমি চাকরী করি,—সুবোধ স্কুলে পড়ে। যতদিন পর্য্যন্ত সুবোধ এণ্ট্রেন্সক্লাশে উঠে নাই—ততদিন তাহার পড়াশুনায় বেশ মন ছিল, কিন্তু এণ্ট্রেন্স ক্লাশে উঠিয়া অবধি তাহার ঘাড়ে ভূত চাপিয়াছে। ভূতটি কোন মৃত লোকের অজানিত অশরীরি আত্মা নহে, আমাদেরই জ্ঞাতিসম্পর্কীয়, জীবন্ত, মূর্ত্তিমন্ত সশরীরী ভ্রাতা কৃষ্ণনাথ তাহাকে পাইয়া

বসিয়াছেন। যেদিন হইতে কৃষ্ণনাথ ওরফে কালু পড়িবার ছুতায় দেশ হইতে কলিকাতায় আসিয়া মেসের আশ্রয় লইয়াছে, সেইদিন হইতে সুবোধ আর সে সুবোধ নাই,—তাহার বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারে লোপ পাইতে বসিয়াছে। আগে আফিস হইতে আসিয়াই প্রায় সুবোধকে গৃহে দেখিতাম,—সন্ধ্যাদীপ জ্বালিবামাত্র টেবিলের নিকট বসিয়া সে পাঠ্যাভ্যাস করিত, শুনিয়া সমস্ত দিনের শ্রান্তি ক্লান্তি ভুলিয়া একটা নবীন আশা-উৎসাহে আমার প্রাণ ভরিয়া উঠিত। কিন্তু প্রায় বৎসরকাল হইতে আটটা না বাজিলে আর সে গৃহে ফিরে না, কোন কোন দিন আরও বেশী দেরী করে। এত বকি, এত বোঝাই তাহাতে কোন স্থায়ী ফল হয় না। বেশী রকম উত্যক্ত করিলে বলে,—"পাঁচজনে মিলে পড়ি—তাতে আরও ত পড়া ভাল হয়,—এতে আপনি রাগ করেন কেন? যখন ফেল হব—তখন বরঞ্চ বক্‌বেন।"

নিজের ভাইকে আঁটিয়া উঠিতে পারি না, রাগ করি—ফেলে ভূতটার উপর, তাহার নামে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া ওঠে। বাগে পাইলে ভূত ভাগাইতাম সন্দেহ নাই,—কিন্তু সুখের বিষয় বা দুঃখের বিষয় জানিনা—সে কিছুতে আমাকে ধরা দেয় না। যখনি 'মেসে' তাহার সন্ধানে যাই শুনি কেলেঙ্গারটা সেখানে নাই। এই ত আমার অন্তর-বাহিরের অবস্থা,—ইহার পর সত্যই যেদিন শুনিলাম সুবোধ ফেল হইয়াছে—সেদিন আমার পক্ষে ধৈর্য্যরক্ষা—আত্মসংযম অসম্ভব হইয়া উঠিল—আমি তাহাকে সমস্ত কথা খুলিয়া না বলিয়া কিছুতেই থাকিতে পারিলাম না। হায়! হায়! কে জানিত—ইহার কি পরিণাম! বলিলাম—"আমাদের জ্ঞাতি পিতৃব্য রমানাথ—দেশে যাঁহার কোটা বাড়ী, রূপার বাসন, দেবদেবীর মন্দির, বার মাসে যাঁহার ঘরে তেরো পার্ব্বণ, যাঁহার টাকার জোরে প্রজা জব্দ, রাজা বশ, সেই রমানাথ খুড়া আমাদের রক্ত খাইয়াই মানুষ, আর এই যে তোমার প্রাণের বন্ধু কৃষ্ণনাথ ইনি সেই নরপিশাচ পাষণ্ডেরই পুত্র। পিতার নখদন্তাঘাতেও আমাদের যেটুক শোণিত অবশিষ্ট আছে, ইনি তোমার স্কন্ধে চাপিয়া সেই রসটুক পর্য্যন্ত নিঃশেষ করিতে উদ্যত। সাবধান হও সাবধান হও।"

উন্মত্তের ন্যায় উত্তেজিত হইয়া এই সকল কথা বলিয়া গেলাম,—আমার কথায় সুবোধের যে মনের ভাব কিরূপ হইতেছে তাহা লক্ষ্য করিবার অবসর তখন ছিল না। নিজের কথা নিজেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না, রুদ্ধ উৎস মুক্ত হইয়া এমনি প্রবলবেগে উথলিয়া উঠিতেছিল।

একটানে কথাগুলা বলিয়া গিয়া নিশ্বাস লইতে যখন থামিলাম—তখন সুবোধ বলিল—"কিন্তু তার কি দোষ—তার কি দোষ!" আমি বিস্ফারিতনেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম,—কথাটার অর্থ বুঝিতে একটু সময় লাগিল,—তাহার পর পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত ঝন ঝন করিয়া উঠিল,—ক্রোধান্ধ হইয়া বলিলাম—"নাঃ তার কিছু দোষ নেই,—তার বাপ খুনডাকাতী করে ধন এনেছে—সে শুধু আরামে বসে ভোগ করছে বই ত নয়! নরাধম পাষণ্ড, ব্ল্যাগার্ড—"

সে মুখনত করিয়া নীরব হইয়া রহিল,

আমি আপন মনেই বলিয়া চলিলাম,—"রাস্কেল—!

কেবল তাহলেও ত রক্ষা ছিল। আমাদের ধন ভোগ করেই তোমার প্রাণের বন্ধু ক্ষান্ত নন—আমরা যাতে চিরকাল ওদের পায়ের তলায় পড়ে থাকি এই চেষ্টাতে সে তোমার ইহকাল পরকাল খেতে বসেছে। এই সব জেনেশুনে বুঝেসুঝেও যদি তুই তার সঙ্গে মিশতে চাস্—বেশ—কিন্তু আমার সঙ্গে তাহলে এই পর্য্যন্ত! আর যদি মানুষ হতে চাস্—ত এর প্রতিশোধ কিসে নিবি সেই চেষ্টা কর। তার মনভুলানে কথায়—"

আমার কথা এইখানে থামিয়া পড়িল,—দেখিলাম তাহার দুই চক্ষু বাহিয়া টস্‌টস্ করিয়া জল পড়িতেছে সেই অশ্রুজলে কি তীব্রবেদনা প্রকাশিত!

মা যখন আমাকে এই সকল কথা বলিতেন, তখন আমার কিরূপ যন্ত্রণা হইত মনে পড়িল—বুঝিলাম সুবোধের হৃদয় আজ সেইরূপ যন্ত্রণায় আলোড়িত—সেইরূপই প্রতিশোধ স্পৃহায় প্রজ্জ্বলিত আর এই মানসিক সংগ্রামে বন্ধু কৃষ্ণনাথকে সে নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন করিতে চাহে, তাহাতেই তাহার কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা!

মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার মনের অবস্থা আমার মনে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—তাহার যন্ত্রণা নিজের মত করিয়াই হৃদয়ে অনুভব করিলাম, মনটা ব্যথিত ব্যাকুল হইয়া পড়িল;—কিন্তু না—এ যন্ত্রণা হইতে তবুও তাহাকে মুক্তি দেওয়া হইবে না,—এ কষ্টই তাহার পক্ষে মঙ্গল;—সুদৃঢ়ভাবে বলিলাম—"পিতার যে কর্ম্মফলে পুত্র আজ তাহার ধনসম্পদের অধিকারী—সেই কর্ম্মফলে আমাদেরও সে ঘৃণার ভাজন। যদি তুমি মানুষ হও—ত, তাকে পিশাচবোধে তার সঙ্গ ত্যাগ কর।"

দেখিলাম তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছে,—বুঝিলাম কথার ফল ধরিয়াছে—হৃদয়ে পরমানন্দ অনুভব করিলাম।

২

আহা এই চালটা যদি আগে চালিতাম—তাহা হইলে আর সুবোধ এণ্ট্রেন্সে ফেল হইত না। বড়ই আপশোষ রহিয়া গেল। সেই কথা বলার পর হইতে সুবোধ এখন একেবারেই সুবোধ বালক,—বাড়ী ফিরিতে প্রায়ই বেশী দেরী করে না, পড়াশুনাতেও অসম্ভব রকম মন দিয়াছে। যখনই তাহার ঘরে যাই দেখি বই হাতে লইয়া সে বসিয়া আছে। এতটা বাড়াবাড়ি বরঞ্চ আমার ভাল লাগে না একটু Recreation—আমোদ প্রমোদ খেলাগল্পও ত দরকার,—কিন্তু মুখ ফুটিয়া সেকথা বলিতে সাহস হয় না—কি জানি তাহাতে পাছে উল্টা উৎপত্তি হয়—আবার দলে ভিড়িয়া পড়ে। ঘরে ব্যায়াম করিতে উৎসাহদানের জন্য একসেট স্যাণ্ডো কিনিয়া দিয়াছি,—বারান্দায় বার টাঙ্গাইয়া দিলাম,—কিন্তু তাহাতে বড় একটা ফল হইল না কেবল বৃথা অর্থ নষ্ট। আর এক উপায় অবলম্বন করিলাম, দুই চারিখানা বাঙ্গলা মাসিক পত্রের গ্রাহক হইলাম—পাঠ্যপুস্তক পাঠের অবসরে সময় সময় এসকল পড়িলে মাথার একটু বিশ্রাম হইবে। আফিসের ফেরতা একদিন কয়েকখানা উপন্যাসও কিনিয়া আনিলাম।

সেদিন সুবোধ তথনও গৃহে ফিরে নাই। সন্ধ্যায় যখন সে বাটী আসিল, তখন আমি আফিসের যে এক রাশ কাজ সঙ্গে আনিয়াছিলাম—তাহা লইয়াই ব্যতিব্যস্ত ;—তাই তৎক্ষণাৎ আর তাহাকে উপন্যাস কথানি দেওয়া হইল না। কার্য্য শেষে তাহাকে বই কথানি দিতে গিয়া দেখিলাম—প্রতিদিনের ন্যায় টেবিলের নিকট চৌকিতে বসিয়া সে পাঠ্য পুস্তকে নিমগ্ন রহিয়াছে—বড়ই মনটা আর্দ্র হইয়া উঠিল, বেচারার আমোদ আহ্লাদ—গল্প-গুজব—সবই আমি বন্ধ করিয়া দিয়াছি!—ডাকিলাম 'সুবোধ!' সে আমাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি বইখানা বন্ধ করিয়া ফেলিল। নিকটে আসিয়া বইখানা তুলিয়া দেখিলাম—সেখানি কোন পাঠ্য পুস্তক নহে, একখানা বাঙ্গলা নাটক—নাম প্রকৃত প্রতিশোধ। মনটা কেমন খারাপ হইয়া গেল,—চাহিয়া দেখিলাম টেবিলটা বাঙ্গলা বহিতে ভরা—আশ্চর্য্য! এতদিন এগুলা নজরে পড়ে নাই!

উপন্যাস কথানা টেবিলে রাখিয়া বলিলাম, "তোমার ত বাঙ্গলা বই অনেক আছে দেখছি"?—সুবোধ বলিল—"হ্যাঁ—যখন পাঠ্য পুস্তক গুলো পড়তে পড়তে মাথাটা বিগড়ে ওঠে—তখন মাঝে মাঝে এগুলো পড়ি।"

সে ত বেশ কথা! আমি ত তাই চাই! মনটা তখন হালকা হইল। এই সময় আমাদের আফিসের বড় বাবু—মিষ্টার মজুমদার—হঠাৎ পিঠে হাত রাখিয়া বলিয়া উঠিলেন—"হ্যাল্লো—এখানে কি হচ্ছে? সুবোধের পড়ার তদারক হচ্ছে বুঝি? একি—টেবিল যে রাবিশে ভরা!" বলিতে বলিতে বাঙ্গলা বই—দুএকখানা হাতে তুলিয়া আবার দুমদাম শব্দে সেগুলি টেবিলে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—"Very bad—very bad—এই সব রাবিসে মাথা ভরাট করলে এবারও তুমি নিশ্চয় ফেল হবে—দেখছি। কান্তি বাবু যদি ভাল চান একে এসব জিনিষ ছুঁতে দেবেন না—বুঝলেন ত?" মজুমদার মহাশয় একজন প্রসিদ্ধ অ্যান্টি স্বদেশী—তাঁর উপদেশ গ্রহণ করিবার পাত্র আমি নই। আমাদের মনে যতটুকু তেজ যতটুকু ঔদ্ধত্য সবই স্বদেশীর ফল, বাঙ্গালী যে এমন খুনাখুনী করিতে পারে—কিছুদিন পূর্ব্বে কে তাহা বিশ্বাস করিত! আমি তাঁহার মুখ বন্ধ করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে লইয়া অন্য ঘরে চলিয়া আসিলাম।—তিনি বলিতে আসিয়াছিলেন,—কাল আফিসে বড় সাহেব আসিবেন—যেন একটু সকাল সকাল সেখানে যাই।

৩

আমার ভাবিবার বিষয় অন্য বড় কিছু নাই; কাজকর্ম্মের অবসরে সুবোধই আমার মনের সব স্থানটা জুড়িয়া বসে। সেদিন রাত্রিকালে যখন শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম, তখন একে একে তাহার সম্বন্ধে সেদিনকার সমস্ত কথাই মনে হইতে লাগিল। আমি দেখিয়াছি রাত্রির নিস্তব্ধতায়—খুব ছোট জিনিষও বেশ বড় অক্ষরে মনের মধ্যে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে।

সেই বইখানির নাম প্রকৃত প্রতিশোধ! কি রকম আগ্রহের সহিতই সে বইখানি পড়িতেছিল। আমি যখন গৃহে প্রবেশ করি—সে জানিতেও পারে নাই; যখন ডাকিলাম কিরূপ চমকিত ভাবে বইখানি সে

মুড়িয়া রাখিল! কেন এরূপ ভীত ভাব? এত গোপনতা কিসের? সত্যই কি তার মনে এতই প্রতিশোধ স্পৃহা জ্বলিয়াছে যে এইরূপ বই পড়িতে পড়িতে সে একেবারে তন্ময় হইয়া উঠে! মনটা বড়ই খারাপ হইয়া গেল; এইরূপ দুশ্চিন্তার মধ্যে কখন যে নিদ্রাদেবী আশ্রয় দান করিলেন—বুঝিতে পারিলাম না।

পরদিন বড় সাহেব আফিসে আসিবেন—তাড়াতাড়ি কাজ কর্ম্ম গুছাইয়া লইয়া আফিসে চলিয়া গেলাম। সাহেব চলিয়া যাইবার পর সেদিন বেশ সকাল সকাল ছুটিও পাইলাম। পরদিন হইতে পূজার ছুটি আরম্ভ,—মনে বেশ একটা স্ফূর্ত্তি অনুভব করিলাম।

সুবোধের তখনও বাড়ী ফিরিবার কথা নহে, কিন্তু বাড়ী আসিয়া দেখিলাম—সুবোধের ঘরের দ্বার বন্ধ আর ভিতরে যেন কি একটা কলহ বিবাদ হইতেছে। দ্বারদেশে কর্ণপাত করিয়া শুনিলাম সুবোধ বলিতেছে—"দুরাচার—দুর্ব্বৃত্ত—প্রতিশোধ—প্রতিশোধ!" সঙ্গে সঙ্গে একখানা তরবারী ঝন্ ঝন্ শব্দে ভূমিতে আহত হইল।—আমার মাথা ঘুরিয়া গেল—বুঝিলাম সত্যই সে রক্তপিপাসু—প্রতিশোধ লইতে উন্মত্ত—আর আমিই তাহাকে এইরূপ পাগল করিয়া তুলিয়াছি! আশঙ্কায় অনুতাপে আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল;—ডাকিলাম, "সুবোধ সুবোধ";—মুহূর্ত্তে সমস্ত নিস্তব্ধ হইয়া পড়িল কিন্তু দ্বার যেমন বন্ধ তেমনিই রহিল। আমি দ্বারে করাঘাত করিলাম—তথাপি দ্বার খুলিল না—কেবল ত্বরিতগমন পদশব্দ শুনিয়া বুঝিলাম—অন্য দ্বার দিয়া সুবোধ বাহিরে চলিয়া গেল। আমি ঘুরিয়া সেই দ্বার পথে গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম গৃহে কেহই নাই। এইমাত্র যে একখানা তরবারীর ঝন্ ঝন্ শুনিলাম সেখানাই বা কোথায়? তবে সেখানাও দেখিতেছি সে হাতে করিয়া লইয়া গিয়াছে। ইহার অর্থ কি! মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও অস্বস্তিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তখনি কৃষ্ণনাথের বাসার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলাম,—তাহাকে সাবধান করা একান্তই প্রয়োজন হইয়াছে—একথা আমার অন্তরাত্মা বার বার করিয়া বলিতে লাগিল। তাহার বাসায় গিয়া শুনিলাম সে দেশে গিয়াছে—শুনিয়া মনটা একটু আশ্বস্ত হইল। বাড়ী ফিরিয়া সুবোধের অপেক্ষায় রহিলাম। সন্ধ্যার সময় সে বাড়ী ফিরিবেই জানিতাম—কিন্তু সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল—সুবোধ আসিল না; আহারের সময় উপস্থিত হইল সুবোধ আসিল না—রাঁধুনীকে, চাকরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—সুবোধ কিছু বলিয়া গিয়াছে কি না? তাহারা বলিল—'না!' আবার কৃষ্ণনাথের মেসে গিয়া, পাড়ার অন্য দুএক জায়গায় গিয়া খোঁজ করিলাম, কোথাও সুবোধের সন্ধান মিলিল না। ইহার পর চাকরদের অব্যাহতি দিবার জন্য আহারে বসিলাম। কিন্তু বলা বাহুল্য সে রাত্রে আহার নিদ্রা কিছুই হইল না। প্রাতঃকালেও সুবোধ বাড়ী ফিরিল না—১০টা বাজিয়া গেল সুবোধের দেখা নাই—মন অস্থির হইয়া উঠিল, হঠাৎ মনে হইল নিশ্চয়ই সুবোধ কৃষ্ণনাথের উদ্দেশে দেশে গিয়াছে—হয়ত—হয়ত সেই তরবারী এতক্ষণে তাহারি রক্তে প্লাবিত! আমি বাধা দিব বলিয়া আমাকে লুকাইয়া পালাইয়াছে, কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! আমিও পাগলের মত হইয়া উঠিলাম। একটা ছোট মনিব্যাগ মাত্র সঙ্গে লইয়া তৎক্ষণাৎ

ট্রেন ধরিতে ছুটিলাম। কি ভাগ্য এখন ছুটির দিন।

ষ্টেসনে গাড়ী থামিল ঠিক ৫টায়। নামিয়াই কাকার বাড়ীর দিকে ছুটিলাম। উন্মত্তের মত ছুটিলাম, আশে পাশে কে আছে বা না আছে কে আমাকে দেখিতেছে বা কি জিজ্ঞাসা করিতেছে— সে সবদিকে একেবারেই লক্ষ্য নাই—আমি কেবল হন হন করিয়া ছুটিয়াছি আমাদের গ্রামের দিকে। আমাদের বাড়ী যাইতে ডান হাতি একটা ছোট জঙ্গল, জঙ্গলের মধ্য দিয়া গেলে একটু শীঘ্র যাওয়া যায়। আমি দ্রুতপদে জঙ্গলে ঢুকিয়া পড়িলাম; কিন্তু এ কি! সুবোধের কণ্ঠ না? সেই ভীষণ চীৎকার—"দুর্ব্বৃত্ত পাষণ্ড"! উৎকর্ণ, স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলাম। যাহা ভাবিয়াছিলাম ঠিক তাই! আর সন্দেহ নাই, সত্যই সুবোধ এক হাতে কৃষ্ণনাথকে ধরিয়া অন্য হাতে তরবারী ঘুরাইয়া চীৎকার করিতেছে "দুর্ব্বৃত্ত পাষণ্ড, এই নে প্রতিশোধ—প্রতিশোধ!"

এখনও সময় আছে, এখনও তরবারী বক্ষে বিদ্ধ হয় নাই আমি ব্যাকুলভাবে চীৎকার করিয়া উঠিলাম—"থাম থাম, রক্ষা কর—মেরোনা মেরোনা!" বলিতে বলিতে তীরবেগে সেইদিকে অগ্রসর হইলাম। কিন্তু হায়! নিয়তি কে খণ্ডন করে! সেস্থলে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তরবারী আমূল কৃষ্ণনাথের বক্ষে বিদ্ধ হইয়া গেল—কৃষ্ণনাথ আর্ত্তনাদ করিয়া মাটিতে পড়িল—আমিও সেইখানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম।

মূর্চ্ছাভঙ্গে বিস্ময় দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলাম—সুবোধ ও কৃষ্ণনাথ আমারই পার্শ্বে বসিয়া। শুনিলাম রমানাথ খুড়ার বাড়ী পূজা উপলক্ষে 'প্রকৃত প্রতিশোধ' অভিনয় হইবে, তাহারা দুইজনে এখানে গোপনে তাহারই অভিনয় করিতেছিল।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

বিনাটিকিটের যাত্রী

সে বৎসর কলিকাতা সহরে প্রথম প্লেগ দেখা দিয়াছে। কোয়ারেন্‌টাইনের ভয়ে পিপীলিকার সারির মতো দলে দলে লোক সহর ছাড়িয়া পালাইতেছে। দেখিতে দেখিতে দুই দিনের মধ্যে এত বড় জনারণ্য একেবারে শূন্য হইয়া গেল;—এক একটা রাজ-পথের এধার হইতে ওধার পর্য্যন্ত চাহিয়া দেখ, একটি মাত্র লোক চলে না—দোকান পাটও সব বন্ধ;—সহরটা যেন রূপকথার ঘুমন্ত রাজপুরী!

যাঁহাদের সুবিধা ছিল তাঁহারা সকলেই পালাইয়াছিলেন; পালাইতে পারেন নাই কেবল তাঁহারা যাঁহারা চাকরির শৃঙ্খলে আবদ্ধ;—প্লেগের ভয়ের চেয়েও চাকরির ভয় যাঁহাদের বেশি।

সহরে গাড়ি ঘোড়া চলা প্রায় একরকম বন্ধ ছিল;—কেবল চাকুরে বাবুদের বহন করিবার জন্য মাঝে মাঝে দু একখানা ট্রাম এই গভীর নিস্তব্ধতার বুকের উপর দিয়া বজ্রের মতো গড়াইয়া চলিয়া যাইত। পৃথিবী

হইতে রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ এই পঞ্চগুণের শেষ গুণটা যে একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় নাই তাহাই উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিবার জন্যই যেন এই ট্রামগুলা চলিত।

মনোহর ট্রামের কণ্ডাক্টার। কলিকাতার মধ্যে তাহার বন্ধুবান্ধব, পরিচিত যে যেখানে ছিল সকলেই পালাইয়াছিল, কেবল সে এবং তাহারই মতো হতভাগ্য তাহার এক আত্মীয় পালাইতে পারে নাই।

মনোহরের যে পালাইবার জায়গা ছিল না তাহা নহে। তাহার দেশ ছিল। কিন্তু দেশে থাকিবার মধ্যে ছিল তাহার মা এবং মহাজনের দেনা। প্রথম জিনিসটার আকর্ষণ তাহাকে দেশের দিকে প্রবলভাবে টানিত, কিন্তু শেষটার জন্য সে শেষ-রক্ষা করিতে পারিত না। সেই জন্য মনোহরের অনেক দিন বাড়ি যাওয়া হয় নাই। প্লেগের জন্য যখন সকলেই পালাইতে আরম্ভ করিল তখন মনোহর কী করিবে ভাবিয়া অস্থির হইয়া উঠিল। সে দেখিত কলিকাতার মতো এমন মুখর সহর এমনি স্তব্ধভাব ধারণ করিয়াছে যে পথ চলিতে গা ছম্‌ছম্‌ করে; যাহার দিকে চায় সেই যেন ভয়ে জড়সড়; —কাহারো মুখে কথা নাই—কোনো রকমে লুকাইয়া থাকিতে পারিলেই যেন সবাই বাঁচে! একটু হাসি নাই, আমোদ নাই;— চতুর্দ্দিকে কেবল বিষাদ, শোক, ভয় আর মৃত্যুর বীভৎস লীলা! দেখিয়া তাহার বুকের সমস্ত রক্ত যেন শুকাইয়া আসিত—ভয়ে এমনি মুহ্যমান হইয়া পড়িত যে পথ চলিতে

করিবে! গ্রামে গিয়া অর্থাভাবে অনাহারে মৃত্যু কিম্বা মহাজনের দেনা শোধ করিবার জন্য জেলে পচিয়া মরা প্লেগে মরার চেয়ে যে সুখের তাহা তো নহে। কাজেই তাহাকে কলিকাতায় পড়িয়া থাকিতে হইল।

মনোহর মনে মনে একরকম ঠিক করিয়াই রাখিয়াছিল যে এ যাত্রা আর তাহার রক্ষা নাই। যে রাক্ষসী সমস্ত বিশ্ব গ্রাস করিতে আসিয়াছে সে কি তাহাকে ছাড়িবে! কিন্তু তাই বলিয়া তো একেবারে রাক্ষসীর কবলে গিয়া আত্মসমর্পণ করা চলে না;—সেই জন্য সে খুব সাবধানে থাকিতে লাগিল—যদি ফাঁকি দিয়া বাঁচিয়া যাওয়া যায়! তাহার বাসার পাশে যখনই শুনিল প্লেগ হইয়াছে অমনি সে সেখান হইতে পালাইয়া অন্যত্র গেল। প্লেগ না হইলেও যাহার গলা স্বভাবত ফোলা এমন লোক দেখিলে সে তাহার ত্রিসীমানায় যাইত না। পাছে পাড়ার লোকের ছোঁয়া লাগিয়া তাহার প্লেগ হয় এই ভয়ে সে অনেক রাত্রি ঘরে না কাটাইয়া গড়ের-মাঠে বেঞ্চের উপর শুইয়া কাটাইয়া দিত।

এমনি করিয়া সে আত্মরক্ষা করিয়া চলিতে লাগিল। কিন্তু যতই সে প্লেগ হইতে নিজেকে দূরে রাখিবার চেষ্টা করিত প্লেগের ভয় তাহাকে ততই পাইয়া বসিত। [illegible] প্রতিদিন সকালে উঠিয়া নিজের গলা টিপিয়া দেখিত কোথাও একটু ফুলা কিম্বা ব্যথা হইয়াছে কি না। এমনি করিয়া অত্যধিক টেপাটেপিতে একদিন গলাটা সত্যই একটু ফুলিয়া উঠিল এবং একটু ব্যথাও বোধ হইতে লাগিল। মনোহর সে দিন আর কাজে গেল

মুঠি ধরিয়াছে;—সে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় সমস্ত দিন ও সমস্ত রাত্রি বিছানায় পড়িয়া রহিল। শুইয়া শুইয়া সে মায়ের কথা ভাবিতে লাগিল, এবং কাহার একখানি মুখ থাকিয়া থাকিয়া তাহার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। কেবলই তাহার মনে হইতে লাগিল তাহার এই সাঙ্ঘাতিক অসুখের খবরও বোধ হয় তাহারা পাইবে না। কে খবর দিবে? ভোর রাত্রে একটু তন্দ্রা আসিল;—সেই তন্দ্রার ঘোরে মনোহরের বোধ হইল যেন তাহার প্রাণপাখী দেহপিঞ্জর ছাড়িয়া উড়িয়া চলিয়াছে। হঠাৎ চমক ভাঙিয়া জাগিয়া উঠিয়া দেখিল—কই কিছুই তো হয় নাই! সে দিব্য বাঁচিয়া আছে! গলার ব্যথাটাও সারিয়া গেছে। এমনি করিয়া মৃত্যুর অপেক্ষায় পড়িয়া থাকিলে প্লেগের মৃত্যু না আসুক অনাহারের মৃত্যু যে আসিবে তাহার ভুল নাই; কাজেই মনোহর মৃত্যুশয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া বসিল—এবং যথাসময়ে আহারাদি করিয়া কাজে বাহির হইয়া গেল।

মনোহর ট্রামের পিছনটিতে শিথিলভাবে ঝাঁকিয়া দাঁড়াইয়া যখন চীৎপুর রোডের ভিতর দিয়া দিনের মধ্যে কেবলই যাতায়াত করিত তখন তাহার মনের অবস্থাটা যে কী হইত তাহা বর্ণনা করা যায় না। ক্রমাগতই দেখিত শবের পর শব চলিয়াছে—'রাম নাম সত্য হ্যায়!' 'বল হরি হরি বোল!'—চারি দিক হইতে এই মৃত্যু-যাত্রার ভীষণ সঙ্গীতে আকাশ প্রকম্পিত! এক একটা গলির ভিতর হইতে কান্নার রোল থাকিয়া থাকিয়া ফুকারিয়া উঠিতেছে। মনোহর দেখিত যেন তাহার চোখের সামনে মৃত্যু মূর্ত্তিমান হইয়া তাণ্ডব নৃত্যে মাতিয়া উঠিয়াছে;—আকাশে তাহার মাথা ঠেকিয়াছে, পায়ের তলায় পড়িয়া মেদিনী থরহরি কম্পমান!

এমনি করিয়া মৃত্যুর মুখোমুখি বসিয়া মনোহর মৃত্যুর ভয়ে প্রতিমুহূর্ত্তেই মৃত্যু লাভ করিতেছিল। পালাইবার জন্য তাহার সমস্ত চিত্ত চীৎকার করিয়া উঠিত,—কিন্তু কি করিবে? নিরুপায়ের শৃঙ্খলে যে তাহার হাত পা বাঁধা। পথে ঘাটে ঘরে কোথাও তাহার শান্তি ছিলনা। জাগরণে, নিদ্রায় কিছুতেই সে নির্ভয় হইতে পারিত না। সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া, ভয়ে ভয়ে কাটাইয়া, রাত্রে যে একটু নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইবে তাহারো যো ছিল না। একটু তন্দ্রা আসিলেই ভীষণ চীৎকারে তাহার ঘুম ভাঙিয়া যাইত। এ চীৎকার আর কিছুর নয়—মৃত্যুর!—"রাম নাম সত্য হ্যায়!" রাত্রের নিস্তব্ধতার ভিতর হইতে এই মরণের ডাক মনোহর যখন একলাটি অন্ধকার কোণের মধ্যে বিছানায় শুইয়া শুইয়া শুনিত তখন তাহার সমস্ত দেহ সঙ্কুচিত হইয়া আসিত, বুক দুর দুর করিয়া উঠিত!

যেখানে বাঘের ভয় সেইখানেই সন্ধ্যা হয়। মনোহরের এতদিন শুধু বাঘের ভয়ই ছিল, তখনও সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিবার উপক্রম করে নাই। কিন্তু এইবার তাহাকে বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িতে হইল। বিপদের উপর বিপদ! সে হঠাৎ একদিন খবর পাইল, তাহার আত্মীয় কালীচরণ পীড়িত। পীড়িত শুনিয়াই সে বুঝিয়া লইল—প্লেগ! কারণ এই

একচ্ছত্রাধিপতি মারী-সম্রাট প্লেগের রাজত্বে এমন কোন্ আধিব্যাধির দুইটা মাথা আছে যে প্লেগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে! কাজেই এখন অসুখ মানেই প্লেগ! মনোহর প্লেগের নামেই আঁৎকাইয়া উঠে ;— এখন কর্ত্তব্যের অনুরোধে কালীচরণকে শুশ্রূষা করিতে গেলে সেই প্লেগের মুখোমুখি দাঁড়াইতে হইবে—এই কথা মনে করিয়া তাহার মূর্চ্ছা আসিবার উপক্রম হইল।

কালীচরণ যখন কলিকাতায় প্রথম চাকরি করিতে আসে তখন তাহার বিধবা মা মনোহরের হাতে একমাত্র পুত্রটিকে সমর্পণ করিয়া বলিয়াছিল—"দেখিস্ বাবা! আমার অন্ধের নড়ি তোর হাতে তুলে দিলুম—বাছাকে তুই চোখে চোখে রাখিস!" মনোহর তখন সগর্ব্বে বলিয়াছিল—"ভয় কি! আমি আছি। কালীর কোনো কষ্ট হবে না।"

কালীচরণের মাতা অভয় পাইয়াছিল বটে কিন্তু কালীচরণ স্বয়ং, কলিকাতায় আসিয়া, অগাধ সমুদ্রে পড়িয়া যে ভয় পাইয়াছিল তাহাতে মনোহর বিশেষ কোনো সাহায্য করে নাই। সে কেবল তাহার কলিকাতা সহর সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লইয়া কালীচরণকে উঠিতে বসিতে তাহার এই গর্ব্বটুকুই প্রয়োগ করিত যে সে সহুরে এবং কালীচরণ পাড়া-গেঁয়ে! ইহাতে বিশেষ কোনো ক্ষতি হয় নাই; —কারণ কালীচরণ চালাক ছেলে; সে দুই দিনেই সব ঠিক করিয়া লইয়াছিল। মনোহরের মুখ চাহিয়া সে ভ্যাবাগঙ্গারামের মতো বসিয়া থাকে নাই।

মনোহর যখন শুনিল, কালীচরণের অসুখ এবং সে অসুখ হইতে তাহার পরিত্রাণ আছে কিনা সন্দেহ তখন কালীচরণের মায়ের কথাটাই তাহার মনে বিশেষ করিয়া জাগিতে লাগিল ;—বিদায়ের সময় তাহার সেই ভয় ও বেদনা পীড়িত ছল ছল আঁখি, তাহার সেই সমস্ত হৃদয়ের কাতরতা মনে পড়িয়া তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। মা যে ছেলেটিকে তাহার হাতে দিয়াই নিশ্চিন্ত আছে। এই গচ্ছিত ধন যে তাহাকে ফিরাইয়া দিতেই হইবে! সে যে দায় স্বীকার করিয়াছে—সে যে দায়ী! তাহা ছাড়া তাহার নিজের সেই সঙ্কটাপন্ন পীড়ার সময় কালীচরণ তাহার কী সেবাই না করিয়াছিল—খুব আপনার জনেও তেমন পারে না; দিনকে দিন, রাত্রিকে রাত্রি জ্ঞান করে নাই—বুক দিয়া তাহার শুশ্রূষা করিয়াছে; তারপর একমাস কাল শয্যাশায়ী থাকায় রোজগার অভাবে সে যখন একেবারে কপর্দ্দকহীন তখন কালীচরণ নিজে অর্দ্ধাশনে থাকিয়া তাহার মুখের গ্রাস দিয়া তাহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছে। এখন তাহার অসুখের সময় মনোহর নিশ্চিন্ত থাকিলে ধর্ম্মে সহিবে কেন!

মনোহর কালীচরণের উদ্দেশে তখনই বাড়ির বাহির হইয়া পড়িল; কিন্তু পথে যাইতে যাইতে তাহার মনের গতি অন্য দিকে ফিরিয়া গেল। সে ভাবিল, কালীচরণ তো গিয়াছে—স্বয়ং শিব আসিলেও সে রক্ষা পাইবে না! তবে তাহার সঙ্গে সে নিজেও যায় কেন! হাঁ, এমন বুঝিতাম যে সে গেলে কালীচরণ রক্ষা পাইবে, তাহা হইলে সে নিজের প্রাণ তুচ্ছ করিয়া নিশ্চয় যাইত; কিন্তু এখন যাওয়া মানে কালীচরণের সঙ্গে যমের বাড়ি যাওয়া! শুধু শুধু সে নিজের প্রাণটা বিসর্জ্জন দিবে! এই ভাবিয়া সে

পথ হইতে বাড়ি ফিরিয়া আসিল। কালী-চরণের পরিণাম চিন্তা করিয়া তাহার দুঃখ হইতে লাগিল—আহা বেচারা চাকরী করিতে আসিয়া প্রাণটা দিল! সে বাড়ি পালাইল না কেন!

কালীচরণের পরিণাম চিন্তা করিতে গিয়া মনোহরের নিজের পরিণামের চিন্তা আপনিই আসিয়া পড়িল। প্লেগ যখন কালীচরণকে ধরিয়াছে তখন তাহাকেই কি ছাড়িবে? তাহার এমন কী পুণ্যের জোর আছে! ভাবিতে ভাবিতে তাহার শরীর শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। পথে চলিতে চলিতে আবার ঐ হৃদয়বিদারক শব্দ—"বল হরি হরি বোল!" ঐ শোকের ক্রন্দনধ্বনি! আশে পাশে চারিদিকে মহামারীর বীভৎস লীলা—মৃত্যুর করাল ছায়া! মনোহরের ভয় শতগুণ বাড়িয়া উঠিল;—ভয়ে সে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িল। পাছে আবার কালীচরণের নিকট হইতে লোক ডাকাডাকি করিতে আসে এই ভয়ে সে বাসা বদলাইয়া একস্থানে গোপনে রহিল।

* * * *

মনোহর দুপুরবেলা ট্রামের পিছনটিতে দাঁড়াইয়া চলিয়াছে। ট্রাম শূন্য—লোকজন কেহ নাই;—রাস্তাও পরিষ্কার—গাড়ি অবাধ গতিতে চলিয়াছে; কাজেই মনোহরের কোনো কাজ নাই;—সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আকাশ পাতাল ভাবিতেছে। হঠাৎ ট্রাম চীৎপুর রাস্তার এক মোড়ে আসিয়া থামিল। সেখান হইতে এক যাত্রী গাড়িতে উঠিল। মনোহর দেখিল যাত্রিটী রমণী। ট্রাম গাড়িতে রমণী-যাত্রী বড় দেখা যায় না—মনোহর একটু বিস্ময় বোধ করিল। এই দুপুর বেলা একা রমণী ট্রামে করিয়া চলিয়াছে! এতদিন সে ট্রামে কাজ করিতেছে, কখনো এমন দৃশ্য সে দেখে নাই। অন্য যাত্রী হইলে সে ভালো করিয়া নজরই করিত না; কিন্তু বিস্ময় যেখানে কৌতূহলের আবির্ভাবও সেইখানে। সেইজন্য মনোহর মেয়েটিকে ভালো করিয়া না দেখিয়া থাকিতে পারিল না। টিকিট দেওয়া শেষ হইলে সে নিজের দাঁড়াইবার জায়গাটিতে দাঁড়াইয়া কেবলই মেয়েটির দিকে চাহিতে লাগিল। গাড়িতে অন্য লোক নাই—পথও জনশূন্য;—এই অসীম শূন্যতার ব্যাপ্তি ভঙ্গ করিয়া এই যে নারীমূর্ত্তিটি ভাসিয়া উঠিয়াছে তাহাতে মনোহরের কৌতূহল ও বিস্ময়মুগ্ধ দৃষ্টি যেন একটা আশ্রয় লাভ করিল। একমাত্র দর্শনীয় সামগ্রীকে তাহার দৃষ্টি সমস্ত শক্তি দিয়া দর্শন করিতে লাগিল।

বড়বাজারের কাছাকাছি আসিয়া মেয়েটি ট্রাম থামাইয়া নামিয়া পড়িল—তারপর একটা গলির মধ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল। মনোহরের দৃষ্টি মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাহার গতি অনুসরণ করিতে লাগিল। সে ট্রাম ছাড়িবার ঘণ্টা দিতে ভুলিয়া গেল;—ট্রাম অনেকক্ষণ সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল; তারপর ড্রাইভারের চেঁচামেচিতে চমকিত হইয়া উঠিয়া মনোহর তাড়াতাড়ি ট্রাম চালাইয়া দিল।

জনশূন্য ট্রাম নিস্তব্ধ রাজপথের মধ্য দিয়া চলিতেছে—মনোহরের মনে হইতে লাগিল, মেয়েটির আসা-যাওয়া যেন স্বপ্নের মতো;—শূন্যতার মধ্য হইতে জাগিয়া উঠিয়া যেন শূন্যে মিলাইয়া গেল। সে সমস্ত পথটা কেবল

তাহার কথাই ভাবিতে লাগিল। ভাবনাটা কোনো বিশেষ মূর্ত্তি ধরিয়া উঠিতে পারিল না—একটা আবছায়ার মতো মনের মধ্যে উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। তারপর ফিরিবার মুখে আবার যখন ট্রামটা সেই গলির কাছে আসিল—তখন মনোহর ঝুঁকিয়া পড়িয়া অনেকক্ষণ অন্যমনস্কভাবে সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

পরদিন মেয়েটির কথা মনোহর একরকম ভুলিয়াই গিয়াছিল। সেদিন সে অন্যমনস্কভাবে গাড়ির উপর চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল; মাঝে মাঝে তাহার ঘুম আসিতেছিল। রাস্তার দুধারের বাড়িগুলা তাহার নিদ্রা-জড়িত চক্ষে ছায়ার বাড়ির মতো দেখাইতেছিল; এক একবার তাহার মনে হইতেছিল সে যেন মেঘের রাজ্য দিয়া উড়িয়া চলিয়াছে। এমনি অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে ঘুমন্ত চোখের অস্পষ্টতার আবরণটাকে হঠাৎ কে যেন টানিয়া লইল;—চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিল সেই নারীমূর্ত্তি! মনোহর চমক ভাঙিয়া সজাগ হইয়া দাঁড়াইল। দেখিল, মেয়েটি কালকের মতো ট্রামের এক কোণে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। সে স্তম্ভিত হইয়া দেখিতে লাগিল।

কালও সে এমনি করিয়া দেখিয়াছিল বটে কিন্তু আজকের দেখাতে কেমন একটা নেশা লাগিতেছিল;—নেশা করিলে মানুষের মধ্যে যেমন স্ফূর্ত্তিটা টলমল করিতে থাকে তেমনি আজ মেয়েটিকে দেখিতে দেখিতে মনোহরের অবসাদপীড়িত চিত্তের মধ্যে নেশার মতো একটা টলটলানি নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল। কোথাকার টিকিট দিতে হইবে তাহা জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া মনোহর এমনি তন্ময় হইয়া গেল যে মেয়েটি কি বলিল তাহা সে শুনিতেই পাইল না;—খানিকক্ষণ হতভম্বের মতো চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবার পর হঠাৎ অপ্রস্তুত হইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল। টিকিট কাটিতে গিয়া যে টিকিট দরকার তাহা সে বাণ্ডিলের মধ্যে অনেকক্ষণ খুঁজিয়া পাইল না; এবং টিকিট যখন কাটিল তখন ভুল টিকিটই কাটিয়া ফেলিল।

উপরি উপরি দুইদিন যখন মেয়েটি তাহার গাড়িতেই উঠিল তখন তৃতীয় দিনও যে উঠিবে সে বিষয়ে মনোহরের আর কোনো সন্দেহ রহিল না। কাল তাহার মধ্যে প্রতীক্ষা করিয়া থাকার কোনো ভাব ছিল না, কিন্তু আজ তাহার সমস্ত হৃদয় অধৈর্য্য প্রতীক্ষায় চঞ্চল হইয়া উঠিল। সকাল হইতেই সে দুপুরের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। অন্য দিন সে গা ঢালিয়া ট্রামের উপর দাঁড়াইয়া থাকে; আজ আর সে তেমন করিয়া নিশ্চিন্তভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না—একটা উদ্বেগে সে অস্থির হইয়া রহিল। তারপর মেয়েটি যখন গাড়িতে উঠিয়া বসিল তখন তাহার যাত্রার পথ প্রতিমুহূর্ত্তে সংক্ষেপ হইয়া আসিতেছে দেখিয়া মনোহরের অত্যন্ত ক্ষোভ হইতে লাগিল;—তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল—এই যাত্রাপথ অনন্ত হোক—এমনি করিয়া দিনের পর দিন সে তাহার মুখের পানে চাহিয়া উড়িয়া উড়িয়া চলুক! কিন্তু হায়! চক্ষের নিমেষে পথ ফুরাইয়া গেল!

সে দিন টিকিট দিতে গিয়া মনোহরের হাত মেয়েটির হাতে কেমন করিয়া একবার ঠেকিয়া গিয়াছিল ;—তখন সে যে বৈদ্যুতিক স্পন্দনের মতো একটা স্পন্দন সমস্ত শরীরের মধ্যে অনুভব করিয়াছিল, হাত ঠেকিবার কথা যখনই মনে হয় সেই স্পন্দনটা সমস্ত বুকটাকে আলোড়ন করিয়া তখনই আবার জাগিয়া উঠে ;—স্মৃতির মধ্যেও যেন সেই ক্ষণিক স্পর্শের সুখ জীবন্ত হইয়া জাগিয়াছিল। মনোহর কিছুতেই সে স্পর্শ ভুলিতে পারিতেছিল না—সমস্ত দেহের উপর সে স্পর্শটা প্রলেপের মতো লেপিয়া ছিল।

মনোহর যখন ট্রামে দাঁড়াইয়া থাকে ঘুরিয়া ফিরিয়া মেয়েটির কথাই কেবল মনে জাগে। সমস্ত দিনের পর সন্ধ্যাবেলা যখন বাসার অন্ধকার ছোট্ট ঘরটিতে মলিন বিছানার উপর অবসন্নভাবে পড়িয়া থাকে তখনও সেই ভাবনা। কি যে মাথামুণ্ড ভাবিত তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিত না,—অসম্বদ্ধ চিন্তাগুলা শরতের খণ্ড খণ্ড মেঘের টুকরার মতো লঘু গতিতে তাহার মনের উপর দিয়া ভাসিয়া যাইত। মেয়েটির সমস্ত পরিচয় তাহার কাছে অজ্ঞাত—শুধু তাহার ক্ষণিকের একটু স্পর্শ ও কয়েক দিনের কয়েক মুহূর্ত্তের দর্শন—এই দুটি সামান্য অবলম্বন লইয়া মনোহর নিজের চিত্তটাকে ভরাইয়া রাখিয়াছিল—সে ঐ দুই-টিকে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দুই সহস্র করিয়া তুলিয়াছিল।

দ্বিতীয় দিন দর্শনে যে নেশা লাগিয়াছিল সেই নেশা মনোহরের ক্রমেই জমিয়া উঠিতেছিল। মাতাল মদ না পাইলে যেমন অস্থির হইয়া উঠে মেয়েটিকে দেখিতে না পাইলে সেও তেমনি অস্থির হইয়া উঠিত। উপরি উপরি কয়েক দিন দেখিতে পাইয়া, মেয়েটিকে প্রত্যহ দেখিবার জন্য তাহার চিত্ত একটা দাবী করিয়া বসিয়াছিল। সে দাবী মনোহর মিটাইতে না পারিলে তাহার চিত্ত তাহাকে উৎপীড়িত করিয়া তুলিত।

এমন যোগাযোগ প্রত্যহ ঘটা শক্ত যে যে-সময়টি মেয়েটির গাড়ি প্রয়োজন ঠিক সেই সময়টিতে মনোহরের ট্রাম হাজির হইবে। কাজেই মধ্যে মধ্যে এমন ঘটিতে লাগিল যে মেয়েটি মনোহরের ট্রামে উঠিবার সুযোগ পাইত না। কাহার ট্রামে যে উঠিত মনোহর তাহা জানিতে পারিত না বটে; কিন্তু সেই অজ্ঞাত লোকটির উপরে তাহার ভারি হিংসা হইত—এবং ইচ্ছা হইত ট্রাম হইতে নামিয়া সে একবার ছুটিয়া দেখিয়া আসে কাহার ট্রাম আলো করিয়া মেয়েটি বসিয়া আছে।

এমনি করিয়া মেয়েটির কথা অনবরত তোলাপাড়া করিতে করিতে মেয়েটির সহিত আলাপ করিবার জন্য মনোহরের ভারি ইচ্ছা হইতে লাগিল। কিন্তু ট্রামে যখন তাহার সহিত দেখা হয় তখন কোনো কথা কহিতে তাহার সাহস হয় না ;—কারণ মেয়েটি এমনি উদাসভাবে চাহিয়া থাকে যে আগ্রহের সহিত কোনো প্রশ্ন করা চলে না। 'কোথাকার টিকিট চান' শুধু এই প্রশ্নটুকু করিয়া যখন তাহার মুখের দিকে মনোহর চায় তখন এমন কোনো উৎসাহ পায় না যাহাতে এই প্রশ্নের জের সে আরো একটু দূর টানিয়া লইয়া যাইতে পারে। তাহার ভারি ইচ্ছা করে

মেয়েটির সহিত কথা কহিতে। এখন শুধু দেখিয়া আর তাহার তৃপ্তি হয় না;—দেখাটা পুরানো হইয়া গেছে—এখন একটু নতুন—একটু বেশি কিছু চাই।

স্ত্রী-চরিত্রসম্বন্ধে মনোহরের যতটুকু অভিজ্ঞতা ছিল তাহাতে সে বেশ বুঝিয়াছিল মেয়েটি কী ধরণের; এবং তাহার এই প্রতিদিনের যাত্রা কোথায় গিয়া সমাপ্ত হয় তাহাও সে মনে মনে একটা কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু মেয়েটির এই অপরূপ ব্যবহার দেখিয়া সে অবাক হইয়া যাইত। যে মেয়ে একা ট্রামে চড়িয়া সহর মাৎ করিয়া বেড়ায় সে এমন লাজুক কেন! মনোহর তাহার কাছে কাছে এত ঘুরঘুর্ করিয়া বেড়ায় তবুও সে একবার ফিরিয়াও তাকায় না! আশ্চর্য্য বটে!

মনোহর হতাশ হইল না। তাহার চোখে যে নেশা লাগিয়াছিল সেই নেশাই তাহাকে উৎসাহিত করিয়া তুলিতেছিল। যাহা থাকে কপালে একবার শেষ পর্য্যন্ত সে দেখিবে! সে ভাবিল, এই সহর-বেড়ানী মেয়েটির গতি-বিধি যদি সে অনুসরণ করে তাহা হইলে সেটা যে একটা খুব অসমসাহসিক কাজ হইবে তাহা নহে;—স্বচ্ছন্দে সে তাহা করিতে পারে—এই ভাবিয়া সে একদিন কামাই করিল।

ঠিক্ দুপুর বেলা। চারিদিক নিস্তব্ধ। গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নের রৌদ্র ও ছায়া যুদ্ধ-শেষে দুইটা আহত দৈত্যের মতো রাজপথের উপর পড়িয়া ছিল। মনোহর চীৎপুর রোডের সেই মোড়টার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল; চারিদিকে চাহিয়া তাহার কেমন ভয়-ভয় করিতে লাগিল। সামনে একটি ছোট্ট সরু গলি—ভিতরটা তাহার অন্ধকার, স্যাঁৎ-সেঁতে—সেখান হইতে মৃত্যুর শীতলতা যেন গায়ে আসিয়া লাগিতেছিল। মনোহরের মনে হইতে লাগিল, এই সরু গলিটা যেন বরাবর মৃত্যুর দুয়ার পর্য্যন্ত গিয়াছে। সে দিক পানে চাহিতে সে শিহরিয়া উঠিতেছিল।

হঠাৎ মেয়েটি একখানি ট্রাম হইতে নামিয়া সেই সরু গলির ভিতর প্রবেশ করিল। তাহাকে অনুসরণ করিতে মনোহরের বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু সে পশ্চাৎপদ হইল না। গলির মধ্যকার সব বাড়িগুলিই প্রায় পরিত্যক্ত;—চারিদিক খাঁ খাঁ করিতেছে। অন্ধকারাচ্ছন্ন শূন্যতা এক একটা দানবের মতো বাড়িগুলার দরজা জানালার ভিতর হইতে যেন বাহিরের দিকে ভ্রুকুটি করিয়া মুখ বাড়াইয়া আছে;—একটু চামচিকের ডাক কিম্বা বাতাসের আন্দোলনে তাহারা অট্টহাস্য করিয়া উঠিতেছে! মনোহর ভয়ে জড়সড় হইয়া পড়িল।

মেয়েটি কোনো দিকে লক্ষ্য না করিয়া একটি ছোট্ট ভাঙা বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিল। মনোহরও পিছন পিছন গেল। বাড়ির মধ্যে যে লোক আছে এমন কোনো পরিচয় পাওয়া গেল না;—উঠান জঞ্জালে পূর্ণ;—দরজা জানালা ভাঙা—দালানের ভিতর চামচিকা, বাদুড় বাসা বানাইয়াছে; এমনি স্যাঁৎসেঁতে যে মনোহরের বোধ হইল যেন তাহার হাড়ের ভিতর পর্য্যন্ত ঠাণ্ডা বিঁধিতেছে।

মেয়েটি একটি কুটুরীর মধ্যে প্রবেশ করিল। মনোহর দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল—আর সে অগ্রসর হইবে কি, না। সেইখানে

একলাটি দাঁড়াইয়া তাহার ভারি ভয় করিতে লাগিল—সামনে ঐ ঘরের দরজা; কিন্তু তাহার প্রবেশ করিতে সাহস হইতেছে না—মনে হইতেছে ওটা তো দরজা নহে—যেন একটা দৈত্য হাঁ করিয়া আছে।

মনোহর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল। দেখিল, এক জায়গায় একটা সরাতে একটু আগুনের ছাই এবং তাহার পাশে নিমপাতা ইত্যাদি কি কতকগুলা পড়িয়া আছে। এই তো মৃত্যুর চিহ্ন! মনোহরের মনে হইল সে যেন একেবারে যমদূতের মুখের সামনে পড়িয়া গেছে! ভয়ে তাহার চক্ষু দুইটা বাহির হইয়া আসিবার উপক্রম করিল। সে দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইল—প্লেগ রাক্ষসীটা আজ এই গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নে ক্লান্ত দেহে এই বাড়িটার মধ্যে তাহার জটা এলাইয়া শুইয়া পড়িয়াছে। কখন জাগিয়া উঠে। মনোহর আর থাকিতে পারিল না;—সে পালাইবার চেষ্টা করিল। এমন সময় মেয়েটি কি-কাজে ঘর হইতে বাহির হইয়া একেবার উঠানের দিকে গেল। মনোহরের তখনই সব উলটপালট হইয়া গেল;—সে আর পালাইতে পারিল না!

মনোহর ভাবিতেছিল, মেয়েটি প্রতিদিন এখানে কি করিতে আসে। এই মৃত্যুর ঘরে সে যে অবলীলাক্রমে যাতায়াত করিতেছে—ভয় নাই, ভাবনা নেই—সে কিসের জন্য—কী প্রয়োজনে! এমন কী দুর্লভ সামগ্রী আছে যাহার লোভে সে মৃত্যুকে পর্য্যন্ত তুচ্ছ করিয়াছে!

মনোহর ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। ঘরের দরজার কাছে গিয়া একবার উঁকি মারিল। দেখিল, মাটির উপর জীর্ণ, মলিন শয্যায় শবের মতো একটি দেহ পড়িয়া আছে;—মেয়েটি তাহার বুকের কাছে হুমড়ি খাইয়া তাহাকে কি পান করাইতেছে! মনোহর স্তম্ভিত হইয়া গেল—মেয়েটির মনে এতটুকু প্রাণের মায়া নাই!—সে একেবারে রোগীর গা ঘেঁসিয়া বসিয়াছে!

মনোহর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। তাহার বুকের ভিতরে চারিদিকটা কেমন ওলট পালট করিতে লাগিল। খানিক-ক্ষণ সে কিছুই বুঝিতে পারিল না। তারপর যখন সামলাইয়া লইল, তখন দেখিল সে মেয়েটির মুখের দিকে আর চাহিতে পারিতেছে না—চক্ষু আপনিই নত হইয়া পড়িতেছে।

মনোহর মন্ত্রচালিতের মতো ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। মেয়েটি তাহাকে দেখিয়া চমকিত হইয়া উঠিল;—রোগী একবার চোখ তুলিয়া চাহিল; তারপর ভালো করিয়া মনোহরের মুখের দিকে চাহিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিল—"কে? মনোহরদা এসেচ?"

মনোহর বলিল—"হাঁ ভাই কালী, এসেচি।"

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

সমালোচনা

চীনের ধূপ। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত। ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। মূল্য চার আনা। এই পুস্তিকায় চীন মহাদেশের কয়েকটি মহাপুরুষের সংক্ষিপ্ত জীবনী, তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত মতের আলোচনা ও উক্তি সংগৃহীত হইয়াছে। তাহা হইতে কং বা কংফুশিয়োর সহজজ্ঞান-প্রণোদিত "সমূহবাদ" (Communism) এবং লৌৎস্থ ঋষির প্রবর্ত্তিত তত্ত্ববাদ (Taoism) বা ব্রহ্মবাদ সম্বন্ধে মোটামুটি একটা জ্ঞান লাভ হয়। এই গ্রন্থে এমন অনেক মহাবাণী আছে, যাহা পাঠ করিলে অনেক বিষয়ে আমাদের চোখ খুলিবে, জীবনযাত্রার অনেক জটিল প্রশ্ন-সমাধানের সহায়তা ঘটিবে। কঠিন ভাবগুলিকে সহজ, সরল ও সুমধুর ভাষায় প্রকাশ করিবার কৃতিত্ব সত্যেন্দ্রবাবুর অসামান্য। এই গ্রন্থখানি পড়িতে পড়িতে সেই কথাটাই বিশেষ করিয়া আমাদের মনে হইয়াছে। তত্ত্বকথামাত্রেই যে নীরস ও ভীতিপ্রদ নহে—লেখার গুণে যে তাহা সুখপাঠ্য হইয়া উঠিতে পারে, সত্যেন্দ্রবাবু তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। চীনের ধূপের সৌরভে গ্রন্থকার আমাদের হৃদয় উল্লসিত করিয়া তুলিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদের পাত্র।

সাঁঝের বাতি। শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি, এল্ প্রণীত। ১২।১ রামকৃষ্ণ দাসের লেন, নিউ আর্টিষ্টিক প্রেসে মুদ্রিত, প্রকাশক শ্রীবিপিন বিহারী চক্রবর্ত্তী। মূল্য আট আনা মাত্র। এই নয়নরঞ্জক সচিত্র বহিখানিতে বালকবালিকাগণের উপযোগী ছয়টি গল্প এবং তিনটি কৌতুকাবহ কবিতা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এতদিন সৌরীন্দ্রবাবুর লেখনী শুধু বয়স্কদিগকেই পরিতৃপ্ত করিয়া আসিয়াছে, এবার পূজায় তিনি অল্পবয়স্কগণের জন্য এই সুন্দর উপহারটি লইয়া সাহিত্যের দরবারে উপস্থিত হইয়াছেন। 'সাঁঝের বাতি'র একটি স্বতন্ত্র বিশেষত্ব এই যে, ইহা কেবলমাত্র শিশুদিগকে আমোদ দিয়াই ক্ষান্ত হইবে না—তাহাদের হৃদয়ের চারিদিকে নানা সূক্ষ্ম অনুভূতির চেতনা জাগাইয়া তুলিবে। 'সাঁঝের বাতির' গল্পগুলি আর্ট-হিসাবেও সর্ব্বজনের উপভোগ্য হইয়াছে। 'ইলা' গল্পের মিষ্ট রোমান্সটুকু বালকহৃদয়ের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী, অথচ গল্পের শেষে দুর্ভাগ্য সাপ এবং অভাগিনী ইলার জন্য, শুধু বালকদের হৃদয়েই নহে, অভিভাবকগণের অন্তরেও একটা গাঢ় সমবেদনা উদ্রিক্ত হয়! 'চোরের বুদ্ধি' এবং 'চাষার ভাগ্য' গল্প দুইটিতে শিশুগণের জন্য কৌতুক-রস প্রচুর সঞ্চিত আছে! 'হীরার জুতা'য় গোবিন্দের অতৃপ্ত বাসনার পরিণাম দেখিয়া মনের মধ্যে সুগভীর করুণার সঞ্চার হয়! 'চম্পা রাজকন্যা' ও 'বেলবতী' বিচিত্র ঘটনা-পরম্পরায় চমৎকার জমিয়াছে! হাসির কবিতাগুলিও উজ্জ্বল, সুন্দর! খোকার কুকুরের দুর্দ্দশায় ছোট ছেলেমেয়েরা হাসিয়া সারা হইবে, সন্দেহ নাই।

গ্রন্থে সর্ব্বসমেত কুড়িখানি চিত্র আছে;—তন্মধ্যে কভারের পরিকল্পনাটি সুনিপুণ শিল্পী শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদারের ও আর দুইখানি বহুবর্ণের চিত্র সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকর শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ লাহার অঙ্কিত। চিত্রগুলি সুন্দর।

সমালোচক।

নবীন সন্ন্যাসী। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা মেসার্স চাটার্জ্জি এণ্ড কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নিউ আর্টিষ্টিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য সাত সিকা, বাঁধাই নয় সিকা। এখানি উপন্যাস;—'প্রবাসী' পত্রিকায় দুই বৎসর ধরিয়া ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। উপাখ্যানটি সরল বাঙ্গালী জীবনের একটি মিষ্ট রোমান্সে মণ্ডিত—হাস্য রুদ্র প্রভৃতি বিচিত্র রসের রেখাপাতে সুন্দর জমি তৈয়ার হইয়াছে—তাহারই উপর এই রোমান্সটুকু দিব্য ফুটিয়াছে! অনাড়ম্বর আয়োজনে সহজ ভাষায় চির-পরিচিত নরনারীর চরিত্রচিত্র অঙ্কনে অসাধারণ শক্তির প্রয়োজন—গ্রন্থকার যে সে অসাধারণ শক্তির অধিকারী, এ গ্রন্থ-পাঠে তাহাতে সন্দেহ থাকে না। 'গদাই' ও 'হরিদাসী' যেন জীবন্ত প্রাণী। বাঙ্গালার পথে-ঘাটে নিত্য

দেখা যায়। চতুর গদাইয়ের প্রলোভনে বেচারী হরিদাসী যেভাবে আপনাকে জড়াইয়া ফেলিতেছিল, তাহা শুধু হাস্যের উদ্রেক করে না—করুণাও সম্যক্ জাগাইয়া তুলে। 'চিনি' ও 'গুরুদাস বাবু' অপূর্ব্ব সৃষ্টি —যেমন অভিনব তেমনই মর্ম্মস্পর্শী। 'মোহিত' ও 'গোপীনাথ' যেন আমাদের কত পরিচিত। বাঙ্গালা উপন্যাসের রাজ্যে 'নবীন সন্ন্যাসী' বেশ একটি বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়াছে। প্লটে ও চরিত্রে প্রাণ আছে। উপন্যাসখানি সুদীর্ঘ, ৪৪৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ—পড়িতে কোথাও বাধে না—তর্ তর্ করিয়া গ্রন্থকারের ভাষা নদীর স্রোতের মত ধীর শান্ত গতিতে বহিয়া চলিয়াছে।

আহ্লাদে আটখানা। শ্রীযুক্ত ললিত-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ প্রণীত। ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য পাঁচ আনা। অধ্যাপক মহাশয় শিশুগণের চিত্ত-বিনোদনে দিব্য মনঃসংযোগ করিয়াছেন। তাঁহারই রচিত 'ছড়া ও গল্পের' ন্যায় পঞ্চতন্ত্র-হিতোপদেশের আর কয়েকটি গল্প লইয়া তিনি 'আহ্লাদে আটখানা' লিখিয়াছেন। ইহাতেও কয়েকটি গল্প ও ছড়ার সন্নিবেশ করিয়াছেন। গল্পগুলি সরস বর্ণনা-ভঙ্গীতে মধুর উপভোগ্য হইয়াছে। বকধার্ম্মিকের পাপের প্রতিফল, সিংহের দুর্দ্দশা, শৃগালের শাস্তির কাহিনীগুলি পড়িয়া শিশুর দল সত্যই আহ্লাদে আটখানা হইবে, ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিবে; তাহাদিগের ক্রীড়াকুঞ্জ হাস্যমুখর হইয়া উঠিবে। ছবিগুলিও শিশুচিত্তে কৌতূহলের সৃষ্টি করিবে। ছড়াগুলিতে কিন্তু বেচারা শিশুর দলকে ফাঁকি দেওয়া হইয়াছে—তাহাতে না আছে ছন্দ, না আছে সুর। অথচ এ কাহিনীগুলি ছন্দে না গাঁথিয়া গদ্যের ছাঁচে ঢালিলে রস ফুটিত, নষ্ট হইত না।

হিন্দুস্থানী উপকথা। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। মূল্য দেড় টাকা। এখানি Folk-tales of Hindusthan নামক গ্রন্থের অনুবাদ। গল্পগুলি আরব্যোপন্যাসের গল্পের ন্যায়ই বিচিত্র মনোহর। গল্পগুলি সরস, কৌতূহলোদ্দীপক, হাস্য করুণ প্রভৃতি বিবিধ রসে, মণ্ডিত। গ্রন্থে অনেকগুলি চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, চিত্রগুলি সুপ্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক অঙ্কিত। সে গুলির পরিকল্পনা ও ছাপা ভাল।

নির্ম্মাল্য। শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীকুমারদেব মুখোপাধ্যায়,ভূদেব-ভবন, চুঁচুড়া। নিউ আর্টিষ্টিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দশ আনা। এখানি গল্পের বহি। লেখিকা সাহিত্য সংসারে সুপরিচিতা। গল্প-রচনায় তাঁহার হাত আছে। ভাষা মিষ্ট, সরল ও মার্জ্জিত। উপন্যাসগুলিতেও বেশ একটু বৈচিত্র্য আছে। 'খাতা' 'ছুটি' 'সার্থক' 'ঋণ পরিশোধ' প্রভৃতি গল্পগুলি বেশ উপভোগ্য। সেগুলি পাঠকের চিত্তে বেশ একটি নির্ম্মল আনন্দের ছাপ রাখিয়া যায়। কিন্তু ফাঁসী ও প্রেমের জয় গল্পে বিলাতীগন্ধটুকু একেবারে ঢাকা পড়ে নাই।

অর্থশাস্ত্র। প্রথম কল্প। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র-নাথ সমাদ্দার বি, এ প্রণীত। প্রকাশক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, 'পৃথিবীর ইতিহাস' কার্য্যালয়, হাওড়া। মূল্য পাঁচসিকা মাত্র। এখানি চাণক্য প্রণীত অর্থ শাস্ত্রের বঙ্গানুবাদ। চাণক্যের অর্থ-শাস্ত্র সংস্কৃত ভাষায় রচিত অতি প্রাচীন গ্রন্থ। ইহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া যোগীন্দ্রবাবু সাধারণের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। পুরাকালে ভারতে অর্থশাস্ত্রের অনুশীলন শুধু যে প্রচুর পরিমাণে ছিল, তাহা নহে, তাহার গৌরবও সমধিক ছিল। এ গ্রন্থ-পাঠে তাহা সম্যক উপলব্ধি হয়। প্রাচীন ভারতের ধারাবাহিক ইতিহাস নাই। তথাপি এই সকল বিভিন্ন গ্রন্থের বিক্ষিপ্ত অনুশাসনাদি হইতে আমরা প্রভূত ঐতিহাসিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে পারি। এ গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা যথেষ্ট তৃপ্তিলাভ করিয়াছি।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৪৪, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

বিরহিণী সীতা

[শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে]

ভারতী

৩৬শ বর্ষ] অগ্রহায়ণ, ১৩১৯ [৮ম সংখ্যা

সূত্রপাত

সামান্য চামার যে মানুষের মধ্যেই গণ্য হয় না; তাহার মনে মানুষের ন্যায্য অধিকার সম্বন্ধে স্বাধীন ধারণা এবং সেই অধিকার বজায় রাখিবার জন্য এতটুকু দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যে থাকিতে পারে এটা স্বপ্নের অগোচর। সুতরাং কাশ্মীররাজকুলচূড়ামণি চন্দ্রাপীড়ের আদেশে রাজমন্ত্রী, ত্রিভুবনেশ্বরের মন্দির নির্ম্মাণের জন্য, রাজধানীর উত্তর-পশ্চিমাংশে ঐ চামারের ভিটা ও তৎসন্নিহিত ক্রোশেক পরিমাণ জমী মনোনীত করিয়া দিতে কিছুমাত্র ইতস্তত করিলেন না। রাজমন্ত্রীর আজ্ঞায় স্থপতিগণ সিংহদ্বার হইতে সূত্রপাত করিয়া পূর্ব্বপশ্চিম মুখে ক্রমশ অগ্রসর হইতেছে; সূত্রের মুখে যাহাদের বাড়ি ঘর পড়িতেছে তাহারা যথা বা অযথা মূল্যে নিজের নিজের ভিটা রাজসরকারে ছাড়িয়া দিয়া অন্যত্র উঠিয়া যাইতেছে; এবং সেই সকল বহু সুখ দুঃখ স্নেহ মমতার আশ্রয় বহুকালের প্রাচীন ভিটা পাষাণভারে চূর্ণীকৃত করিয়া দিনে দিনে প্রকাণ্ড দেবায়তন—বিচিত্র বিমান কুম্ভ, কলস, চূড়া ইত্যাদি লইয়া সতেজে গজাইয়া উঠিতেছে। চত্বরের চারি দ্বার এবং চারিদিকে পার্শ্ব-দেবতাগণের মন্দিরাদি শেষ করিয়া স্থপতিগণ, চত্বরের উত্তরাংশে ত্রিভুবনেশ্বরের বড় দেউলের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া, চর্ম্মকারের জমীর উপরে সূত্রপাত করিয়া গেল।

যখন রাজমন্ত্রীর চিহ্নিত ভূমির ত্রিসীমানার তাবৎ লোকই ইচ্ছায় অনিচ্ছায় যাচিত বা অযাচিত নিজের নিজের ভিটা ও কারকারবার উঠাইয়া লইয়া দেবায়তন হইতে যতটা সম্ভব নিজেদের দূরে লইতে বাধ্য হইতেছিল, তখন কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া এই চর্ম্মকার নিয়মিত ভাবে নিজের দাওয়ায় বসিয়া পাদুকা, ঘোড়ার সাজ ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া চলিয়াছিল। এমন কি অধিকারী যেদিন তাহার কুটীর ঘেরাও করিয়া সূত্রপাত করিতেছিল সেদিনও সে নিমেষমাত্র নিজের কাজ বন্ধ করিল না;—হাত তাহার যেমন চলিতেছিল তেমনি চলিল। দিন শেষে কারুশিল্পীরা যখন কায বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল তখন সে অতি শান্ত এবং গম্ভীর ভাবে বড় দেউলের সূত্রপাতের খোঁটা মায় সূত্র, সজোরে উপড়াইয়া, একদিকে টানিয়া ফেলিল এবং পরম নিশ্চিন্ত মনে কুটীরের ঝাঁপ বন্ধ করিয়া নিদ্রা গেল।

কাণ্ডটা রাজমন্ত্রীর অগোচর রহিল না। এবং এটাও তিনি বেশ বুঝিলেন যে ভয় প্রদর্শনে, অর্থদানে, এমন কি বল-প্রয়োগে এই নগণ্য চর্ম্মকার বশীভূত হইবার নহে। রাজমন্ত্রী স্বয়ং গিয়া সাধ্যসাধনা করিলেন, কিন্তু চর্ম্মকার অটল! সে প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছে যে এমন অবিচার সে কিছুতেই ঘটিতে দিবে না। সে স্পষ্টই বলিয়া দিল—"তোমরা রাজাকে বল গিয়া আমি ঘর ছাড়িতেছিনা।"

রাজমন্ত্রী রাজার ভাবগতিক বেশ বুঝিতেন; সুতরাং ব্যাপারটা রাজগোচরে নিবেদন করিতে তিনি বড় ব্যস্ত ছিলেন না। কিন্তু কুটীল রাজনীতির সমস্ত মার প্যাঁচ প্রয়োগ করিয়াও যখন দেখিলেন সেই চর্ম্মকারের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা তাহারই হাতের জুতা-পাটির সূচ্যগ্রভাগের মত উদ্ধতভাবে খাড়াই রহিল, তখন রাজমন্ত্রী নালিশটা রাজগোচরে আনিতে বাধ্য হইলেন। এবং এটাও তিনি রাজাকে জানাইয়া দিলেন যে রাজনীতির সমস্ত প্রয়োগগুলা এই অপবিত্র জুতার পাটিটাকে দমন করিতে সমর্থ হয় নাই; সুতরাং এবার দণ্ডনীতির সাহায্য লওয়া প্রয়োজন।

ঠিক চর্ম্মকারের বাস্তভিটার উপরেই ত্রিভুবনেশ্বরের রত্নপীঠের স্থাপনা হইবে এবং সেই পুণ্য-বলে তাহার সাতপুরুষের স্বর্গলাভের সুনিশ্চিত সম্ভাবনা সত্ত্বেও চর্ম্মকার কেন যে নিজের ও নিজ বংশপরম্পরার ভাবী মঙ্গল সম্বন্ধে একেবারে অন্ধ হইয়া আছে এটা রাজা ছাড়া রাজসভার আর কেহ বুঝিল কিনা সন্দেহ। সুতরাং অপরের ভূমি অপহরণ করিয়া সুকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে ইতস্তত করিয়া রাজা যখন মন্দির নির্ম্মাণ স্থগিত রাখিতে আদেশ দিলেন, তখন রাজমন্ত্রীগণের—বিশেষত পণ্ডিতমহলে বিস্ময়ের সীমা রহিল না। দীনের কুটীর ত্রিভুবনেশ্বরের দেউল হটাইয়া দিয়াছে একথা দেখিতে দেখিতে যখন রাজ্য মধ্যে প্রচার হইয়া গেল, তখন চর্ম্মকারও সেটা শুনিল নিশ্চয়। সে "এমনি রাজাই তো চাই" বলিয়া সজোরে চামড়ার উপরে গুণ ছুঁচের মুখটা বসাইয়া দিল। পরে গম্ভীরভাবে নিজের কাজকর্ম্ম গুছাইয়া সারিয়া সরাসর রাজদ্বারে উপস্থিত হইল।

মন্ত্রীবর চর্ম্মকারের নাম শুনিয়া বড়ই জ্বলিয়া গেলেন। তাঁর নিজের সম্বন্ধে 'অপটু' 'অপরিণামদর্শী' প্রভৃতি যে বিশেষণ-গুলা রাজা এইমাত্র প্রয়োগ করিয়াছেন সেগুলা তখনও তিনি পরিপাক করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সুতরাং 'চর্ম্মকার রাজসম্ভাষণ-প্রার্থী। তাহার প্রবেশ আজ্ঞা হউক!' একথাটা তিনি একটু বিদ্রুপের স্বরেই রাজগোচরে নিবেদন করিলেন। রাজাও যে সেটুকু বুঝিলেন না তাহা নয়, তিনি সভাপণ্ডিতগণের প্রতি একটু উপহাস কটাক্ষ করিয়া বলিলেন—"মন্ত্রীবর! ভুল করিতেছেন। শাস্ত্র মতে চর্ম্মকারকে রাজপ্রাসাদে আসিতে নাই। সুতরাং রাজা এবং রাজপুরুষগণকেই তাহার নিকট যাইতেই হইবে।"

রাজা সিংহাসন ছাড়িয়া উঠিলেন। অনন্যোপায় রাজপুরুষগণকেও সঙ্গে সঙ্গে রাজদ্বার পর্য্যন্ত উজান বাহিয়া চর্ম্মকারের হুজুরে হাজির হইতে হইল।

চর্ম্মকারকে ঘিরিয়া রাজপ্রাসাদের সিংহ-দ্বারে শতসহস্র লোকের জনতা; রাজাকে

আসিতে দেখিয়া তাহারা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া দুই হাতে রাজদ্বারের ধূলা গায়ে মাখিয়া আনন্দ গদগদ কণ্ঠে বলিতে লাগিল—"আহা একেই ত বলে রাজা! তুমি বিনি মূলে আমাদের সকলকে কিনে নিলে!" চর্ম্মকার নিজের জমীর পাটাখানা রাজার চরণে ধরিয়া দিয়া বলিল—"রাজা! এরা জোরই করে। এরা বোঝেনা যে আমরা দীন দুঃখী পথের কুকুরের চেয়ে ছোট নয় আর তুমিও কাকুস্থ রাজার চেয়ে বড় নও! এরা তো বোঝে না রাজার কাছে রাজবাড়ী যেমন আদরের, দুঃখীর কাছে তার কুটীর খানিও তেমনি আদরের; রাজ্য গেলে রাজার যেমন লাগে, কুটীর গেলে আমারও তেমনি লাগে। তুই মনের কথা বুঝিস রাজা, আয় আমার কুটীরে পায়ের ধূলো দিয়ে যা।"

চর্ম্মকারের অনুসরণ করিয়া রাজা "ত্রিভুবনেশ্বরের মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইলেন। অথণ্ড মান-সূত্র নির্ব্বিচারে দেবতা চর্ম্মকার এবং রাজার পথ সরলভাবে নির্দ্দেশ করিয়া গেল।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রবাদবাক্য-প্রবচনে অনুপ্রাস

(অনুপ্রাসের নিজের জবানী)

প্রবাদবাক্য-প্রবচনে আমার প্রভাব প্রকৃষ্টরূপে প্রকাশিত। অভাবে স্বভাব নষ্ট করিতে, অরণ্যে রোদন করিতে, অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে, অষ্ট অঙ্গে অভরণ (আভরণ) পরিতে, আঙ্গুল আবডাল দিতে, আঙুল ফুলিয়া কলাগাছ হইতে, আধা ডিক্রী আধা ডিসমিস করিতে, উদোর বোঝা বুদোর ঘাড়ে চাপাইতে, উড়ে এসে যুড়ে বসিতে, ওলে ঝোলে খাইতে, কামারবাড়ী ছুঁচ বেচিতে, গলায় গামছা দিতে, গোলে হরিবোল দিতে, ঘোমটার ভিতর খেমটা নাচিতে, ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাইতে, ঘোড়া দেখিয়া খোঁড়া হইতে, চালনি করে' ঘোল বিলাইতে, ছাতুর হাঁড়ীতে বাড়ী মারিতে, বিড়ালের ভাগ্যে ছিকে ছিঁড়িতে, ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধরিতে, ঝোপ বুঝে কোপ মারিতে, তানতোবড়া তুলিতে, তিলকে তাল করিতে, তিল কুড়িয়ে বেল করিতে, তোধা মোধা লাগাইতে, থোঁতামুখ ভোঁতা করিতে, দড়া ছেঁড়াছিঁড়ি করিতে, দাঁতে দড়ি দিতে, দুটা দুখান হইতে, ধরাকে সরা জ্ঞান করিতে, ধান ভানিতে শিবের গীত গাইতে, নামের মত কাম করিতে, পরের ধনে পোদ্দারি করিতে, পরের পেয়ে চা'ল চিবাইতে, পাণে থেকে চূণ খসিতে, পিঁড়ের বসে পেঁড়োর খবর দিতে, পেটে খেলে পিঠে সহিতে, প্রাণটা তুলরাম খেলারাম করিতে, মশা মারিতে কামান পাতিতে, মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিতে, মিছে কাযে কাটনা কামাই করিতে, মেগের কাছে পেগের বড়াই করিতে, মেড়ার লড়াই লাগাইতে, পগারপার হইতে, পিটটান দিতে, পাকা কলা পাইতে, পটোল তুলিতে, ভেরাণ্ডা ভাজিতে, বোঝার ঘাড়ে বোঝা চাপাইতে, বাপের বিয়ে দেখাইতে,

দাড়ি উপড়াইতে, বুকে বাঁশ দিতে, সাপের পাঁচ পা দেখিতে, হদা ভেঙ্গে গদা গড়িতে, হয় এস্পার নয় ওস্পার করিতে, হরে দরে হাঁটুজল করিতে, হাটে হাঁড়ী ভাঙ্গিতে, 'ঘরে' হাঁড়ী চড়াইয়া চাকরীর চেষ্টায় ছুটিতে, হাতে নাতে ধরা পড়িতে, হিমসিম খাওয়াইতে, —আমি বড় দড়।

ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্টঃ, যত্র আয় তত্র ব্যয়, যত্র জীব তত্র শিব, লক্ষ্মীর্বসতি বাণিজ্যে, বিবাহে চ ব্যতিক্রমঃ, বিনাশকালে বিপরীত-বুদ্ধিঃ, শাপাদপি শরাদপি, শুভস্য শীঘ্রং, শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি, ষণ্ণাং রসানাং লবণং প্রধানং, সর্ব্বসিদ্ধেস্ত্রয়োদশী,—এ সব বচন-প্রমাণে আমি জাজ্বল্যমান। দুর্জ্জনকে দূরে হ'তে করি পরিহার, সঙ্গদোষে শতগুণ নাশে, সৎসঙ্গে কাশীবাস অসৎসঙ্গে সর্ব্বনাশ—এ সব নীতিবাক্য আমিই শিখাই। আমারই প্রসাদে —কপালগুণে গোপাল মিলে, ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়, বিধি হ'তে ব্যাধ ভাল, সুখ চেয়ে স্বস্তি ভাল। আমারই ভ্রূভঙ্গে—কাঙ্গালের কর্কটরাশ, গরিবের পুতের ঘোড়া-রোগ, গালফুলো গোবিন্দর মা, ভবী ভুলবার নয়, ভাঁড়ে মা ভবানী, রাজার পাপে প্রজা নষ্ট, বড়র পীরিতি বালির বাঁধ, শুক ম'লো মুখদোষে, সুন্দরবনে বান্দর রাজা। আমারই দৌলতে—পাথরে পাঁচকীল, ভাতপাতরটা বুকের বল, যো পেলে জোলায় বোনে, রোখা কড়ি চোখা মাল, সোণার উপর মীনার কায। আমারই কারসাজিতে—আশায় মরিল চাষা, ইট মারলে পাটকেল খায়, একা নদী বিশক্রোশ, দশচক্রে ভগবান্ ভূত, মড়ার উপর দশা, শিরে সর্পাঘাত সর্ব্বনেশে। আমারই মহিমায়—কষ্ট না করলে কেষ্ট (কৃষ্ণ) মেলে না, ভেক না নিলে ভিখ মেলে না, লেগে থাকলে মেগে খায় না, খুচরো কাযের মজরো নেই, পরভাতী ভাল তবু পরঘরী ভাল নয়। দায়ে পড়ে দারগ্রহ, বয়োগতে বনিতাবিলাসঃ, বিয়েপাগলা বুড়ো, বিয়ে ফুরিয়ে বাজনা, বুড়াবয়সে চূড়াকরণ, বুড়োবয়সে ধেড়ে রোগ, বুড়োবয়সে বাহাত্তুরে ধরা, মূলে মাগ নেই ফুলের সজ্জা (শয্যা?)—এ সব লোকলজ্জা আমিই দিই।

আমারই কৌশলে তেল-তামাকে পিত্তনাশ, গুড়ুকে গম্ভীরবুদ্ধি, নেশার রাজা গাঁজা, সিদ্ধি খেলে বুদ্ধি বাড়ে, পিঠে খায় মিঠের লোভে, বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা, বাঘে-ছাগে, বাঘে-বকরীতে বা বাঘে-বলদে এক ঘাটে জল খায়, বামুনবাড়ীর বেড়াল আড়াই অক্ষর পড়ে, কলুর বলদ ঘানি টানে ও ঘণ্টা নাড়ে, বাঁশবনে ডোম কাণা, মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্য্যন্ত, শালগ্রামের শোয়াবসা সমান, হিকমতে চীন হুজ্জুতে বাঙ্গালী। আমারই ফেরে—হাকিম ফেরে তো হুকুম ফেরে না, বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না, মরি তো মর্য্যাদা হারি না। রাম ভজি কি রহিম ভজি, রামে মারলেও মারবে রাবণে মারলেও মারবে, বেঁচে থাকলে বাপের নাম, বেকারের বেগারও ভাল, ভয়ও নাই ভরসাও নাই, লাগে তীর না লাগে তুক্কো,—ইত্যাদি বিচারবিতর্ক দ্বিধাবোধ আমারই অনুরোধ। আমারই যোগাযোগে—অতিবুদ্ধির গলায় দড়ি, আবর তাঁতী গোবর খায়, কাণার পা খানায় পড়ে,

ঝড়ে ভাঙ্গে। আমারই কর্ত্তৃক—এক গাঁয়ে পাড় পড়ে আর গাঁয়ে মাথাব্যথা, আদর বিবির চাদর গায়, কুড়ুনীর বেটার উড়ুনী গায়, কাকের মুখে কমলা, কাকের মুখে কোকিলের রা, কাকের বাসায় কোকিলের ছা, খুদ খেতে পয়সা নেই মদ খেতে চায়, খালি কলসীর বাজনা বড়, খাঁচার ভেতর প্যাঁচার ছা, গল্পের গরু গাছে চড়ে, ঘোড়া-ভেড়ার বা মুড়িমিছরির একদর, দিন যায় না ক্ষণ যায়, পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায়, পিঁয়াজ পয়জার দুইই হয়, পোয়ের নামে পোয়াতী বর্ত্তায়, ভেড়া দিয়ে যব মাড়ান, মাকড় মারলে ধোকড় হয়, শামুক দিয়ে সমুদ্র ছেঁচা—এই সব বিপরীত ব্যবস্থা। কোথায় রাণী ভবানী আর কোথায় ফুলী জেলেনী, কোথায় রাজা রামকৃষ্ণ আর কোথায় ভজা জেলে, পাতাচাপা কপাল আর পাথরচাপা কপাল—এ সব বিসদৃশ বৈপরীত্য আমারই কৃতিত্ব।

আমিই শিশুকে ঘুম পাড়াইতে ঘুমপাড়ানি 'মাসিপিসির' শরণ লওয়াইয়াছি, 'ধনধোকড়া টাকার তোড়া' বলিয়া শিশুর আদর বাড়াইয়াছি, 'তাই তাই', 'আগডুম বাগডুম' এঙ্গোলা বেঙ্গোলা; প্রভৃতি নানান্ ছেলেভুলান আমোদ-প্রমোদের সৃষ্টি করিয়াছি, অবতবু অবতু বো) পড় পুতা, বলিয়া লেখাপড়ায় উৎসাহ দিয়াছি। আমিই শিশুকে 'কচুর পাতা করমচা' বলিয়া মেঘ তাড়াইতে শিখাইয়াছি, আমিই কুলকামিনীকে 'কড়ি দিয়ে কিনলাম, দড়ি দিয়ে বাঁধলাম' বলিয়া বর-বরণ করিতে শিখাইয়াছি, আমিই মেয়েলি ছড়ায় উড়কি ধানের মুড়কি মাখাইয়াছি, আমিই রূপকথায় সুয়োরাণী দুয়োরাণী ছাঁদনদড়ী গোদানড়ী মরণকাঠী জীয়নকাঠী আমদানী করাইয়াছি, আমিই শ্বশুরবাড়ী মথুরাপুরী গড়িয়াছি, আমিই যমজামাই একসূত্রে গাঁথিয়াছি। আমিই ঠিকের কড়ি নিকের মাগ একবাক্যে বলিয়াছি, আমিই চাকুরী ও কুকুরী, দাস্যবৃত্তি ও শ্ববৃত্তি, একপর্য্যায়ে ফেলিয়াছি। কয়লার ময়লা ছোটে আমার আগুনে; তেলে জলে মিশ খায়না—সেও আমার গুণে। আমারই বিজ্ঞান-বলে—ভিজে কম্বল ভারী অথচ শিলা জলে ভাসে! আমার প্রভাব-স্পৃষ্ট ঘোলকুলকলায় গলা নষ্ট। 'টক টেসো আঁঠিসারা শস্যশূন্য আঁশে ভরা, এই আম বিল্লোবার ধারা' আমিই বাঁধিয়া দিয়াছি।

ছন্দে শেষের অক্ষরে অক্ষরে মিল (Rhyme) আমারই ছোট ভাই। সত্ব চিনেছেন কত্ব, চাচা আপনা বাঁচা, মঘা এড়াবি ক ঘা, চ্যাং খায় ব্যাং যায়, যে রক্ষক সেই ভক্ষক, লাঠি যার মাটি তার, গোরু যার গোবর তার, যা রটে তা বটে, যেমন কুকুর তেমনি মুগুর, যেমন মজা তেমনি সাজা, যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল, কাযের মধ্যে দুই খাই আর শুই, কাযে কুড়ে ভোজনে দেড়ে বচনে মারে পুড়িয়ে পুড়িয়ে, গাছে কাঁটাল গোঁফে তেল, ধোবীকা কুত্তা না ঘরকা না ঘাটকা, ফকীর বি থোঁড়া নয় দুনিয়া বি থোড়া নয়, রাজারও রায়ত নই মহাজনেরও খাতক নই, পাগলে কি না কয় ছাগলে কি না খায়—এ সকল স্থলে আমার অবাধ অধিকার না থাকিলেও আমরা দুই ভাই বখরা বন্দোবস্তে বাস করিতেছি।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাজা রামচন্দ্র খাঁ

জেলা যশোহরের অন্তর্গত বনগ্রাম মহকুমার অধীন বেনাপোল নামক ষ্টেশনের নিকট রাজবাড়ী বলিয়া একটি সুপ্রসিদ্ধ স্থান আছে। স্থানটী সুপ্রসিদ্ধ হইলেও, ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে ইহার কোন বর্ণনাই পাওয়া যায় না বা ইহার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ইষ্টকগুলি বা বিশুষ্ক গড় দৃষ্টে ইহার হৃত-সৌন্দর্য্যেরও অনুমান করা যায় না। তবে, পুঞ্জীকৃত ইষ্টকখণ্ড দেখিলে মনে হয়, হয়ত এককালে কেহ এইস্থানে বাস করিয়া ইহার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন এবং প্রকাণ্ড গড়দৃষ্টে সহজেই অনুমিত হয় যে শত্রু নিবারণার্থ অথবা আত্মরক্ষার্থ এই গড় নির্ম্মিত হইয়াছিল।

প্রবাদ এই যে ইষ্টকস্তূপে প্রচুর পরিমাণে টাকা আছে কিন্তু এই অভিশপ্ত মুদ্রা যে স্পর্শ করিবে সেই প্রাণত্যাগ করিবে। এইরূপ কিংবদন্তী প্রচলিত থাকায়—গ্রহণ করা দূরে থাকুক কেহ ইহা স্পর্শেরও আকাঙ্ক্ষা করে না। চতুষ্পার্শে জনরব এই যে এক অসম সাহসিক ইংরাজ এই কার্য্যে অগ্রসর হইয়া অশেষ বিপদরাশি ভোগ করেন এবং পরিশেষে ব্যর্থমনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তনে বাধ্য হন।

প্রবাদ এই, প্রায় চারিশত কি ততোধিক সময়ের পূর্ব্বে এই স্থানে রামচন্দ্র খাঁ নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত বীর রাজা ছিলেন। রাজা রামচন্দ্র খাঁ কাহারও কাহারও মতে ব্রাহ্মণবংশসম্ভূত—কেহ কেহ তাঁহাকে কায়স্থও বলিয়াছেন। সে যাহা হউক, রামচন্দ্র প্রথম জীবনে একজন সাধারণ গৃহস্থ ছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার গৃহে এক মুসলমান বালক রাখালের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল। একদিন দ্বিপ্রহরে রাখাল ক্লান্ত হইয়া এক বৃক্ষতলে বসিয়া বিশ্রাম করিতে করিতে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ে। আহারকাল উত্তীর্ণ হইলেও যখন বালক গৃহে প্রত্যাগমন করিল না, তখন রামচন্দ্র অনুসন্ধান করিতে করিতে বৃক্ষতলে উপনীত হইয়া দেখিলেন যে এক বৃহৎ বিষধর সর্প বালককে সূর্য্যের প্রখর কিরণরাশি হইতে রক্ষা করিতেছে। তাঁহাকে দেখিয়া সর্প নিজ বিবরে প্রবেশ করিল এবং বিস্মিত রামচন্দ্র বালকের নিদ্রাভঙ্গ করাইয়া সমস্ত ঘটনা তাহার নিকট বর্ণনা করিলেন। বালক যে ভবিষ্যতে রাজা হইবেন, রামচন্দ্রের ইহাতে সংশয় রহিল না। বালক প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল যে সে রাজা হইলে প্রতিপালকের কথা বিস্মৃত হইবে না। রামচন্দ্র যথোপযুক্ত পাথেয় সহ বালককে বিদায় দিলে বালক রাজধানী অভিমুখে গমন করিল। যাত্রার পূর্ব্বে অভিজ্ঞানস্বরূপ সে আপনার পাঁচুনি রামচন্দ্রের হস্তে ন্যস্ত করিল।

প্রতিভাবলে এই বালক সত্যই একদিন গৌড়ের বাদসাহ হইয়া উঠিলেন।(১) আর বাদ-

(১) এই বাদসাহ যে কে সে সম্বন্ধে নিশ্চয়তঃ কিছুই নির্দ্দেশ করা যায় না। তবে ইনি "সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন সাহ শেরিফ মক্কা" (যিনি সচরাচর হুসেন সাহ নামে আখ্যাত) হইতে পারেন। হুশেন সাহকে কেহ কেহ 'রাখাল বাদসাহ' বলিয়া থাকেন। ঐতিহাসিক ষ্টুয়ার্ট বলিয়াছেন ঃ—

সাহ হইয়াও বালক প্রতিপালকের কথা বিস্মৃত হইলেন না এবং তাঁহার সাহায্যার্থ স্ুবর্ণের ইষ্টক-পূর্ণ নৌকা রামচন্দ্রের নিকট প্রেরণ করিলেন। দুঃখের বিষয় নৌকাগুলি ইছামতী গ্রাস করিলেন এবং তাহার ইষ্টকও রামচন্দ্রের হস্তগত হইল না।

এদিকে ভগবত কৃপায় রামচন্দ্রও নিজ অবস্থার উন্নতিকরণে সক্ষম হইয়াছিলেন। যখন তিনি জানিতে পারিলেন যে তাঁহারই ভূতপূর্ব্ব রাখাল গৌড়ের বাদসাহী তক্ত অলঙ্কৃত করিতেছেন, তখন তাহার পরিত্যক্ত অভিজ্ঞানসহ তিনি গৌড়যাত্রা করিলেন। গৌড়ের বাদসাহ রামচন্দ্রকে যথোপযুক্ত সম্মানের সহিত গ্রহণ করিলেন। কিয়দ্দিবস গৌড়ে বাস করিয়া রামচন্দ্র খাঁ ইষ্টকপূর্ণ নৌকার কথা অবগত হইয়া, এবং বাদসাহকর্ত্তৃক রাজোপাধিভূষিত ও নিকটবর্ত্তী পরগণাগুলির সনন্দ প্রাপ্ত হইয়া স্বগ্রামে প্রত্যাগমন করিলেন।

গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া রাজা রামচন্দ্র খাঁর প্রধান কর্ত্তব্য হইল সুবর্ণ ইষ্টকের অনুসন্ধান। সুদিনে সবই সম্ভব হয়। বাদসাহ-দত্ত রাজোপাধিভূষিত রামচন্দ্র খাঁর বাদসাহের উপহার প্রদত্ত সুবর্ণের ইষ্টকগুলির অনুসন্ধান ও প্রাপ্তিতেও অধিক বিলম্ব হইল না। এই সুবর্ণ ইষ্টকগুলির সাহায্যে তিনি প্রাসাদ, দুর্গ ও গড় নির্ম্মাণে তৎপর হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বাদসাহ যে পরগণাদি তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন, তাহারও বিলিবন্দোবস্ত করিতে সক্ষম হইলেন। স্বত্যল্পকাল মধ্যেই রাজা রামচন্দ্রের খ্যাতি চতুর্দ্দিকে ব্যাপৃত হইল। হিন্দুর প্রধানকীর্ত্তি পুষ্করিণী খনন ও জলদান। রাজা রামচন্দ্র ইহাতেও বিমুখ ছিলেন না। বাদসাহের সনন্দে বলীয়ান হইয়া তিনি উত্তর দক্ষিণ ও পূর্ব্বপশ্চিম উভয়দিকে পুষ্করিণী খনন করিয়া হিন্দুমুসলমান উভয়ের জলকষ্ট নিবারণ করিলেন এবং উভয়কেই অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতে

---

another foreigner, but of a more noble race. This person was a descendant of the Prophet Mohamed and had quitted the Sandy desert of Arabia to improve his fortune in the fertile region of Bengal. His illustrious descent first introduced him into the Court of Gour, while his superior abilities soon raised him to the high dignity of first subject of the Empire. The oppression and brutal temper of Muzuffir made him a rebel and fortune made him a King." ষ্টুয়ার্ট অন্যত্র বলিয়াছেন যে "It is however certain that on his first arrival in Bengal, he was for some time in a very humble situation; but the Gazy of Chandpore, having been informed of his illustrious descent, gave him his daughter in marriage and introduced him into the service of Muzuffir Shah." বৈষ্ণবগ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে রাজা রামচন্দ্র খাঁ চৈতন্যদেবের সমসাময়িক। চৈতন্যদেব হোসেন সার সময়েই আভির্ভূত হইয়াছিলেন। অবশ্য এসকল বিষয় সঠিক নির্দ্ধারণের কোন উপায় আছে বলিয়া মনে হয় না। কিংবদন্তীর উপরও সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করা যায় না। তবে প্রসঙ্গক্রমে একথা বলা যাইতে পারে যে বর্ত্তমানক্ষেত্রে কিংবদন্তীই আমাদের একমাত্র ভিত্তি।

লাগিলেন। দেশে তখন দস্যু-ভীতি ছিল। রাজা রামচন্দ্রের বীরত্বে দেশে শান্তি স্থাপিত হইল। গঙ্গার ‘ব’দ্বীপ পর্য্যন্ত তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিল।

রাজা রামচন্দ্র খাঁ যখন প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিতেছিলেন, তখন হরিদাস তাঁহার রাজধানীর সন্নিকটে আগমন করিলেন। হরিদাস যবন হইয়া বৈষ্ণবের আচার অবলম্বন করিয়াছেন শুনিতে পাইয়া রামচন্দ্র খাঁ অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া আদেশ দিলেন যে—

“যবন হইয়া করে হিন্দুর আচার।
ভাল মতে তারে আনি করহ বিচার।”(২)

হরিদাস স্বীয় কুটীরের নিকট একটী তুলসীমঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়া, প্রত্যহ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া তিনলক্ষবার হরিনাম কীর্ত্তন করিতেন। সন্ধ্যার ক্ষণিক পূর্ব্বে তিনি কুটীর ত্যাগ করিয়া নিকটবর্ত্তী যে কোন গৃহস্থের নিকট যাইয়া একমুষ্টি অন্ন ভিক্ষা করিয়া তদ্দ্বারা দিনপাত করিতেন। রামচন্দ্রের ইহা ভাল লাগিত না। বৈষ্ণবের প্রতি বিদ্বেষ বশতঃই হোক কিংবা মুসলমানের হিন্দুর আচার গ্রহণ সমীচীন নহে বিবেচনা করিয়াই হোক (৩) নানারূপ অমানুষিক উপায়ে হরিদাসকে স্বীয় কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচলিত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কোন উপায়ে কৃতকার্য্য না হইয়া তিনি, অবশেষে এক বেশ্যাকে হরিদাসের নিকট প্রেরণ করিলেন।

বেশ্যা কুটীরে উপস্থিত হইয়া হাব ভাব সহকারে সাধুকে মুগ্ধ করিতে চেষ্টা করিল। হরিদাস তাহাকে বলিলেন যে তিনি প্রত্যহ রাত্রিতে নাম জপ করেন। নিরূপিত নাম জপ হইলে তিনি তাহার সহিত বাক্যালাপ করিবেন। (৪) রাত্রি গভীর হইতে গভীরতর হইতে লাগিল—হরিদাসের ধ্যান আর ভঙ্গ হয় না—নাম জপ আর শেষ হয় না। প্রভাতে বেশ্যা পুনরায় আসিব বলিয়া প্রস্থান করিল এবং ক্রমে তিন রাত্রি হরিদাসের কুটীর দ্বারে অতিবাহিত করিল। প্রতিরাত্রেই হরিদাসের নাম জপ ও ধ্যানের শেষ হয় না। চতুর্থ প্রভাতে বারবনিতা শোকাকুল নয়নে তাঁহার

---

(২) হরিদাস ঠাকুর যে যবনকুলে জন্মগ্রহণ করেন, তাহার দুইটী বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রথম চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থে ও দ্বিতীয় ভক্তমাল গ্রন্থে। ভক্তমালগ্রন্থকার বলিতেছেন,

“ঋচীক মুনির পুত্র ব্রহ্মনাম যেহ।
প্রহ্লাদ তাহার সম মিশ্র এক দেহ।
হরিদাস রূপ যেহ নামের মহিমা।
বাহু তুলি কহিলেন করিয়া গরিমা।
তাঁহার মহিমা কিছু আশ্চর্য্য কথন।
প্রভু নিত্য কৈলা যারে করি আলিঙ্গন।
যবনের কুলে জন্ম হইল যে কারণ।
পিতা অভিশাপ শুন তার বিবরণ।
পিতা শ্রীঋচীক মুনি, তাঁহার সজ্ঞাতে।
তুলসী আনিয়া দেন নিতি নিতি প্রাতে।
একদিন অদ্বৈত তুলসী আনি দিলা।
বালুকা আছিল দেখি শাপান্ত করিলা।

(৩) সেই দেশাধ্যক্ষ নাম রামচন্দ্র খান।
বৈষ্ণব দ্বেষী সেই পাষণ্ড প্রধান॥
হরিদাসে লোকে পূজে সহিতে না পারে।

(৪) ‘সংখ্যা নাম সংকীর্ত্তন মহাযজ্ঞ মনে,
তাহাতে দীক্ষিত আমি হই রাত্রি দিনে।
দ্বারে বসি শুন তুমি নাম সংকীর্ত্তন,
[illegible] আচরণ।”

নিকট "কি মোর কর্ত্তব্য যাতে যায় ভব-ক্লেশ" সম্বন্ধে উপদেশ চাহিল। হরিদাসের আদেশে সে মুণ্ডিত মস্তকে এক বস্ত্র পরিহিতা হইয়া রাত্রিদিন তিনলক্ষ হরিনাম গ্রহণ করিতে লাগিল। রাজা রামচন্দ্রের চেষ্টা ব্যর্থ হইল। হরিদাসও বেনাপোল পরিত্যাগ করিলেন।

এদিকে গৌড়ের বাদসাহ সেই রাখাল-বালক যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন রামচন্দ্রের 'সাতখুন মাপ্' ছিল। কিন্তু তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার পুত্র আর রামচন্দ্র খাঁকে সেরূপ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তিনি যথারীতি রাজকর দাবী করিতে লাগিলেন। রাজা রামচন্দ্র খাঁও বলদৃপ্ত হইয়া রাজাদেশ প্রত্যাখ্যান করিতে লাগিলেন। বাদশাহ তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিলেন।

তখন রামচন্দ্রের জ্ঞানোদয় হইল। সামান্য জমিদার—যতই কেন প্রবল হউন না কেন, গৌড়ের বাদসাহের সহিত যুদ্ধে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। অথচ বিনাযুদ্ধে বন্দী হওয়াও সমীচীন মনে করিলেননা। তিনি কৌশলে বাদসাহী সৈন্য পরাজয়ের সংকল্প করিলেন। তিনি নিজ সৈন্য সামন্ত দূরে প্রেরণ করিয়া প্রাসাদের ভূগর্ভস্থ 'পাতরাজ' বা পাতালস্থ গৃহে সপরিবারে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কালু নামক এক বিশ্বাসী ভৃত্যকে পাতরাজের চাবি দিয়া আদেশ দিলেন যে মুসলমান সৈন্য দূরে গমন করিলে সে যেন বংশীধ্বনি সহকারে সংবাদ জ্ঞাপন করে ও পরে পাতরাজের দ্বার খুলিয়া দেয়।(৫)

মুসলমান সেনাপতি সৈন্যসহ রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইয়া জনমানব শূন্য দেখিলেন। রাজা প্রাণভয়ে ভীত হইয়া সপরিবারে পলায়ন করিয়াছেন মনে করিয়া সৈন্যগণ প্রাসাদ ও রাজধানী লুণ্ঠন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে মুসলমান সৈন্য অদৃশ্য হইল। হৃষ্টচিত্তে প্রভুকে সংবাদ দিবার জন্য কালু বংশীবাদন করিতে লাগিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ সে ধ্বনি মুসলমান সৈনিকের কর্ণগোচর হইল। সৈন্যেরা প্রত্যাগমন করিয়া তীর নিক্ষেপে কালুর প্রাণ হরণ করিল। কালুর মৃত দেহ নিকটবর্ত্তী 'কালুর দীঘি'তে পতিত হইল। রামচন্দ্র খাঁর সপরিবারে জীবন্ত সমাধি হইল। কালু কালু রবে পাতরাজ মুখরিত হইয়াছিল কি না কে জানে? তবে গ্রামবাসীদের মধ্যে প্রবাদ এই, এখনও সেই পাতরাজ ভেদ করিয়া দারুণ 'কালু' 'কালু' রব গভীর নিশীথে শ্রুত হয়।

পাতরাজের এখনও চিহ্ন আছে। প্রাসাদ, গড়, প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান আছে। আর কি আছে? আছে স্মৃতি।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

(৫) কেহ কেহ বলেন মুসলমান আক্রমণ নহে—মারহাট্টা আক্রমণ। সুপ্রভাত ৩য় বর্ষ, ফাল্গুন দ্রষ্টব্য।

বৈজ্ঞানিক জীবনী

গেলিলিও

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

গেলিলিও তাঁহার দিকদর্শন যন্ত্র এখন নভোমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে ফিরাইতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকেই নূতন নূতন তারকা আবিষ্কৃত হইতে লাগিল। সুনীল নভোমণ্ডলের মেখলার স্বরূপ—"ছায়াপথ"—যাহা কবি-কল্পনায় দেবতাদিগের স্বর্গের রাজবর্ত্ম বলিয়া কল্পিত হইয়া আসিয়াছে—গেলিলিওর যন্ত্রের সাহায্যে তাহা অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারকার সমষ্টি বলিয়া ধরা পড়িল। কোন কোনও তারকা চর্ম্মচক্ষে একটি বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকে, গেলিলিও দিকদর্শন যন্ত্রের সাহায্যে উহাতে দুইটি তারকা দেখিতে পাইলেন।

বৃহস্পতির উপগ্রহ

১৬১০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তিনি বৃহস্পতি গ্রহ (Jupiter) খুব মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ৭ই জানুয়ারী তিনি উহার নিকটে তিনটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারকা দেখিতে পাইলেন। উহার মধ্যে দুইটি তারকা বৃহস্পতির বামে ও অপরটি দক্ষিণে ছিল। পর রাত্রে দেখিতে পাইলেন যে তিনটি তারকাই উহার দক্ষিণে আসিয়াছে। ৯ই তারিখে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকাতে সে রাত্রে আর কিছুই দেখা গেল না। ১০ই তারিখে গেলিলিও দেখিলেন যে সে রাত্রে দুইটি তারকা ফুটিয়াছে, দুইটিই গ্রহের বাম দিকে। ১১ই তারিখেও সেই দুইটি তারকা বৃহস্পতির বামেই আছে, তবে একটি একটু বড় দেখাইতেছিল। ১২ই তারিখে তিনটিই আবার ফিরিয়া আসিয়াছে এবং ৭ই জানুয়ারীর মত দুইটি বামে ও একটি ডাইনে আসিয়াছে। তাহার পর দিবস গেলিলিও ঐরূপ চারিটি তারকা দেখিতে পাইলেন। ঐরূপ চারিটির বেশী তারকা আর দেখা গেল না। গেলিলিও এখন প্রচার করিলেন যে যেমন পৃথিবীর চারিদিকে চন্দ্র ঘুরিতেছে, তেমনি বৃহস্পতি গ্রহের চারিদিকে চারিটি উপগ্রহ বা চন্দ্র ঘুরিতেছে। পৃথিবী যেমন একটি গ্রহ এবং উহারও উপগ্রহ আছে সেইরূপ বৃহস্পতিও একটি গ্রহ এবং উহার উপগ্রহ আছে। এই পরীক্ষা মুলক তথ্যের সংবাদ রাষ্ট্র হইলে তাৎকালিক বিজ্ঞপুরুষগণের মধ্যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। তাও কি কখন হয়?—অনেকেই অবিশ্বাস করিলেন। এ সংবাদ বিশ্বাস করিতে হইলে বাইবেলকে অমান্য করিতে হয়, প্রচলিত প্রাচীন মতকে দূরে নিক্ষেপ করিতে হইবে। পৃথিবীই যে জগতের মূলাধার,—কেমন করিয়া তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে পৃথিবীর ন্যায় অন্ততঃ আর একটি গ্রহ বর্ত্তমান আছে।

গেলিলিও সকলকে তাঁহার দুরবীক্ষণ যন্ত্রের ভিতর দিয়া তাঁহার আবিষ্কৃত উপগ্রহ-গণের ভ্রমণ পরীক্ষা করিতে আহ্বান করিলেন। কেহ কেহ স্বচক্ষে দেখিয়াও বলিলেন যে দূরবীক্ষণ যন্ত্রে পৃথিবীর দ্রব্যসমূহ সঠিকরূপে দৃষ্ট হইলেও উহা আকাশমার্গের

রহস্য ভেদ করিতে সমর্থ নহে। অপর কেহ কেহ অবিশ্বাসী হইবার ভয়ে যন্ত্রের ভিতর দিয়া দেখিতে স্বীকৃত হইলেন না। এইরূপ এক ব্যক্তির শীঘ্র মৃত্যু হয়। গেলিলিও রহস্যচ্ছলে বলিয়াছিলেন "আমি আশা করি তিনি স্বর্গে যাইবার পথে ঐগুলি দেখিয়া গিয়াছেন।"
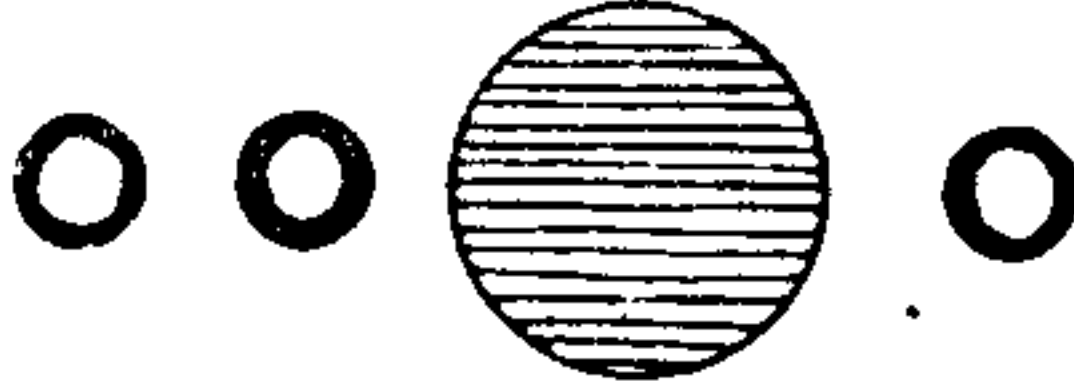
৭ই জানুয়ারী ১৬১০

৮ই জানুয়ারী „
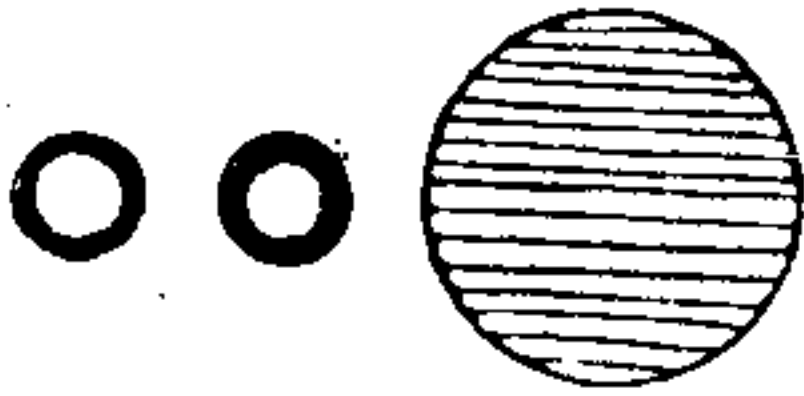
১০ই জানুয়ারী „
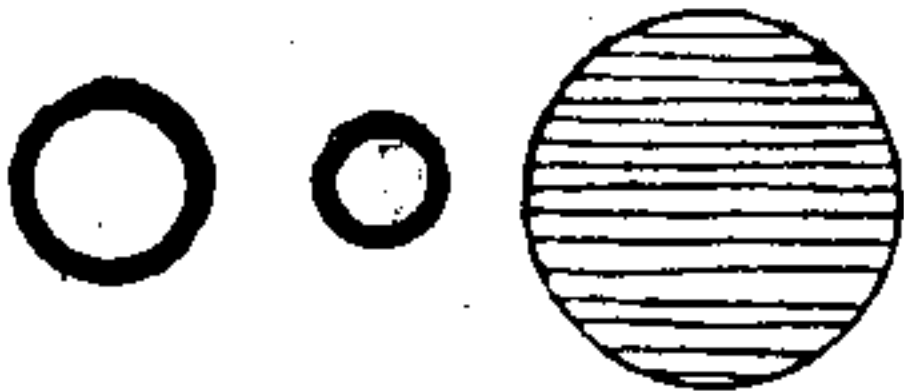
১১ই জানুয়ারী „

১২ই জানুয়ারী „

১৩ই জানুয়ারী „

বৃহস্পতি গ্রহের উপগ্রহ আবিষ্কার

শুক্রগ্রহের ক্ষয়বৃদ্ধি

এই সকল অশ্রুতপূর্ব্ব আবিষ্কারের পর গেলিলিওর মনে এই সুন্দর অনন্ত জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর স্থিতি ও গতির রহস্য উৎঘাটন করিবার বাসনা ক্রমেই বলবতী হইতে লাগিল। চতুর্দ্দিকের অবিশ্বাস তাঁহাকে নিরুৎসাহ করিতে সমর্থ হইল না। পরন্তু তাঁহার উৎসাহ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল; তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা ও মানসিক বল তাঁহাকে তাঁহার আরব্ধ কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য সমধিক প্রোৎসাহিত করিতে লাগিল। তিনি শীঘ্রই আর একটি পরীক্ষা-মূলক আবিষ্কারের দ্বারা তাঁহার শত্রুবর্গের আশা ভরসা চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিলেন। তিনি শুক্রগ্রহ (Venus) পূর্ব্বে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে উহা গোলাকার। একরাত্রে তিনি সবিস্ময়ে দেখিতে পাইলেন যে উহা তৃতীয়া বা চতুর্থীর চাঁদের মত সরু ফলার ন্যায় দেখা যাইতেছে। তাহার পর তিনি রাত্রির পর রাত্রি শুক্রগ্রহের পরিবর্ত্তন পরীক্ষা করিতে লাগিলেন—ক্রমে ক্রমে উহা ফলকের আকৃতি হইতে সুগোল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় পূরিয়া উঠিল। তখন তাঁহার আর আনন্দ ধরে না। ইহা হইতে অবিসম্বাদীরূপে সপ্রমাণিত হইতেছে যে শুক্রগ্রহও পৃথিবীর সহিত সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে।

কোপার্ণিকাস পূর্ব্বেই ভবিষ্যৎবাণী করিয়া গিয়াছিলেন যে মানবের দৃষ্টিশক্তি যদি সম্যক বর্দ্ধিত হয় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে শুক্র ও মঙ্গল গ্রহ চন্দ্রের ন্যায় ক্ষয় ও বৃদ্ধি পাইতেছে। গেলিলিও এই ভবিষ্যৎবাণী পরীক্ষার দ্বারা সপ্রমাণ করিলেন বিরুদ্ধবাদীরা এই নূতন প্রমাণের উপরে বিশ্বাস স্থাপন ত করিলেনই না, উপরন্তু গেলিলিওর উপর তাঁহাদের আক্রোশ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাঁহারা দেখিলেন যে যদি গেলিলিওর মত গ্রহণ করিতে হয় তাহা হইলে পৃথিবীকে অনন্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে একটা অতি ক্ষুদ্র পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু বহু পূর্ব্বকাল হইতে তাঁহারা শিখিয়া আসিতেছেন যে পৃথিবীই জগতের কেন্দ্রস্থল, এই অগণ্য তারকামণ্ডলী রাত্রিতে পৃথিবীকে আলোক প্রদান করিবার জন্যই সৃজিত হইয়াছে। এত বড় মতের পরিবর্ত্তন কি সহজে হয়?

শনি বলয় (Saturn's ring)

তাহার পর গেলিলিও শনিগ্রহের দিকে তাঁহার যন্ত্র ফিরাইলেন। তিনি শীঘ্র আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন যে এই গ্রহ একটি মাত্র তারকা নহে, উহার দুই পাশে আরও দুইটি ছোট ছোট তারকা আছে। পরে জানা গিয়াছে যে এই দুইটি পদার্থ তারকা নহে, উহারা এই গ্রহের চারিদিকে যে গোলাকার বলয় (ring) আছে, তাহারই দুই প্রান্তভাগ মাত্র। গেলিলিওর দূরবীণ যন্ত্র সমধিক উৎকৃষ্ট না হওয়াতে সমগ্র শনিবলয় গেলিলিওর দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। ১৬৫৯ সালে প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী হিউজেন্স বৃহত্তর দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সম্পূর্ণ শনিবলয় আবিষ্কার করেন।

এই সমস্ত অশ্রুতপূর্ব্ব অচিন্তনীয় আবিষ্কার গেলিলিও প্রায় এক বৎসরের মধ্যে

করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এই এক বৎসরের মধ্যে পরীক্ষামূলক জ্যোতিষের কিরূপ দ্রুত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল তাহা উপরিউক্ত আবিষ্কার কাহিনী হইতে সম্যক উপলব্ধি হইবে। তাঁহার বিরুদ্ধবাদীদের অবিশ্বাস সত্ত্বেও বহু ছাত্র তাঁহার শিষ্য হইলেন। ইউরোপে সর্ব্বত্র তাঁহার আবিষ্কৃত দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্ম্মিত হইতে লাগিল এবং বিভিন্ন দেশের জ্যোতিষীবর্গ গেলিলিওর তাবৎ আবিষ্কার নিজ নিজ পরীক্ষার দ্বারা সপ্রমাণিত করিতে লাগিলেন। প্রবল বন্যার স্রোত কি বালির বাঁধে রোধ করা যায় ?

সূর্য্য কলঙ্ক (Sun-spots)।

তাহার পরবৎসর ১৬১১ খৃষ্টাব্দে গেলিলিও সূর্য্যের দিকে তাঁহার দূরবীক্ষণ যন্ত্র ফিরাইলেন। হায়! হায়! গেলিলিও করিলে কি ? যে সূর্য্য কবিকল্পনায় দেবতার আসনে উপবিষ্ট, যিনি সপ্তাশ্বসংযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া প্রভাতকালে পূর্ব্বদিকে
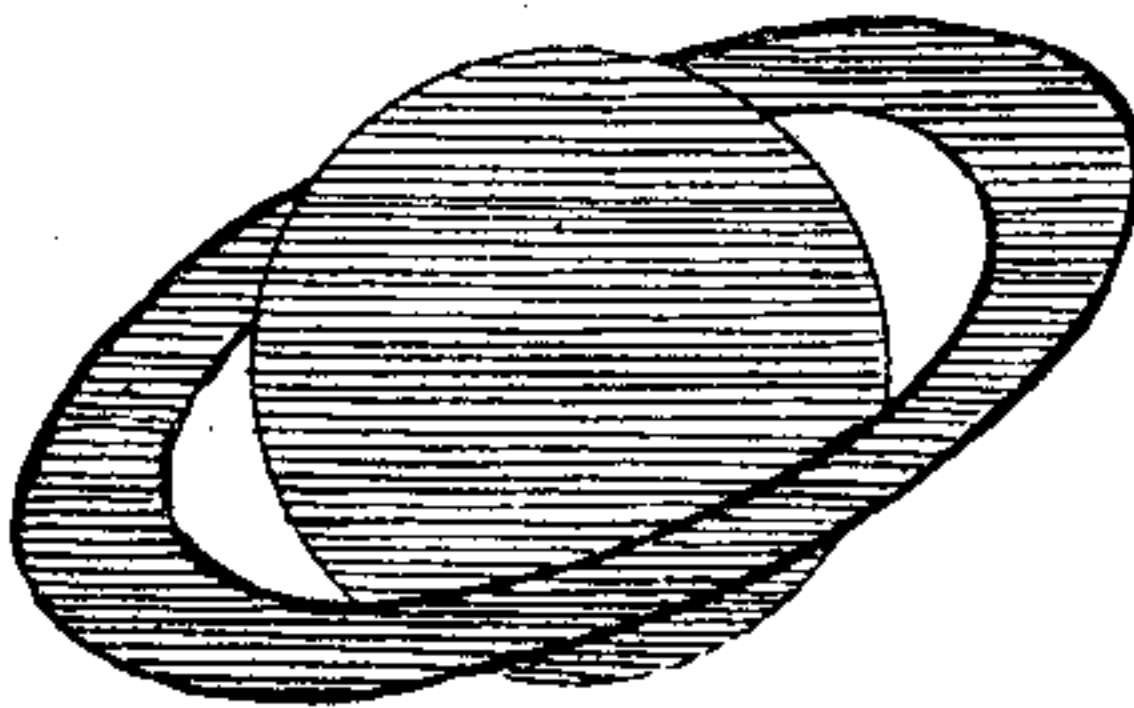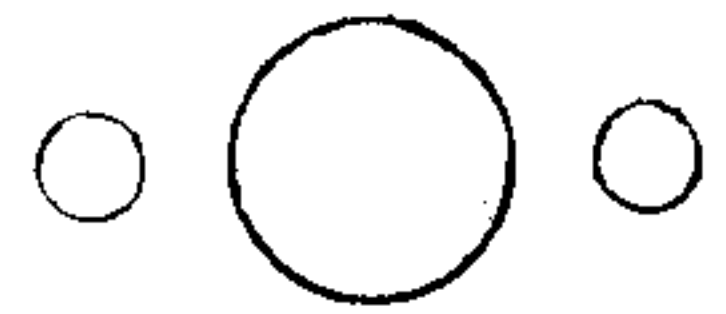
শনিবলয়।

গেলিলিও কর্ত্তৃক দৃষ্ট শনিবলয়।

উদিত হইয়া প্রবল প্রতাপে রথনেমির গম্ভীর নির্ঘোষে নভোমণ্ডলকে প্রতিধ্বনিত করিয়া বিচরণ করিতে করিতে সন্ধ্যাকালে স্বীয় আলয়ে প্রবেশ করিয়া থাকেন, যাঁহার পূজা, হোম, তপ অতিপ্রাচীন যুগ হইতে এখনও পৃথিবীর নানাস্থানে প্রচলিত, তাঁহারই প্রতি তুমি ক্ষুদ্র মানব হইয়া তোমার যন্ত্র ফিরাইতে সাহসী হইলে। তোমার বিরুদ্ধবাদীরা তোমায় যদি একেবারে হত্যা করিয়া না থাকে, তাহা হইলে তাঁহাদের নিতান্ত দয়ার শরীর বলিয়া আমরা তাঁহাদের প্রশংসাই করিব। গেলিলিও পরীক্ষা করিতে করিতে সূর্য্যের মধ্যে কতগুলি দাগ বা কলঙ্ক (Sun-spots) দেখিতে পাইলেন। এই দাগগুলি সকল সময়ে একরূপ থাকে না, কখনও কখনও কতকগুলি মিলিয়া এক হইয়া যায়, কখনও কখনও একটাই ভাঙ্গিয়া অনেকগুলিতে পরিণত হয়। গেলিলিও কেবল এই দাগগুলি আবিষ্কার করিয়া ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি দেখিতে পাইলেন যে, এই দাগগুলি ক্রমে ক্রমে মিলাইয়া গিয়া পুনরায় আটাইশ দিবস পরে আবার দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা

তিনি সহজেই সপ্রমাণ করিলেন যে আটাইশ দিনে সূর্য্য নিজের মেরুদণ্ডের উপর একবার ঘুরিয়া আসে।

গেলিলিওর বিচার

এতক্ষণ আমরা গেলিলিওর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কাহিনী বিবৃত করিয়া আনন্দ লাভ করিতেছিলাম। এখন হইতে তাঁহার দুঃখপূর্ণ জীবন কাহিনীর পরিচয় দিয়া অশ্রু-জলের সহিত তাঁহার পুণ্যময় স্মৃতির নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে '

১৬১০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আঠার বৎসর কাল তিনি পতুয়াতে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। ঐ খানেই তিনি দূরবীক্ষণ যন্ত্র, চন্দ্রমণ্ডলে পর্ব্বতের অবস্থিতি ও বৃহস্পতিগ্রহের উপগ্রহ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, ক্রমে এই সকল গবেষণায় তাঁহার মস্তিষ্ক ও মন অহোরাত্র এত ব্যস্ত থাকিত যে বিশ্ববিদ্যালয়ে অনবরত ছাত্রদিগকে বক্তৃতা দেওয়া তাঁহার নিকট বিরক্তিজনক হইয়া উঠিল। এখন তিনি বিজ্ঞানের সেবায় সমস্ত সময় কিরূপে অতিবাহিত করিতে পারিবেন তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমন সময় তাঁহারই শিষ্য ও বন্ধু টস্‌কানীর গ্র্যাণ্ডডিউক দ্বিতীয় কসমো (cosino II) তাঁহাকে স্বীয় রাজধানী ফ্লরেন্সে যাইবার জন্য আহ্বান করিলেন। গেলিলিওর জন্মস্থান পিসানগরী ফ্লরেন্সের অতি সন্নিকট এবং টস্‌কানীর অন্তর্গত; সুতরাং এই নিমন্ত্রণ তিনি সাদরে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ফ্লরেন্সে প্রত্যাগমন তাঁহার পক্ষে যতই সুবিধাজনক হউক না কেন, পতুয়া নগরী পরিত্যাগ তাঁহার জীবনের প্রধান ভ্রমের কার্য্য হইয়াছিল। কারণ টস্‌কানী রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মের একচ্ছত্র রাজা পোপের অধীন ছিল; অপরদিকে ভেনিস রাজ্য প্রজাতন্ত্রের দ্বারা শাসিত এবং পোপের ক্ষমতার বিরোধী ছিল। পতুয়া নগরী এই ভেনিস রাজ্যের অন্তর্গত থাকায় তিনি মাতৃক্রোড়ে শিশুর মত পোপের রোষাগ্নি হইতে নিরাপদ ছিলেন। পতুয়া পরিত্যাগের পর হইতেই তিনি পোপের ক্ষমতার অধীন হইয়া পড়িলেন। তাঁহার বন্ধুবান্ধব কতই উপরোধ অনুরোধ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই তিনি পতুয়াতে থাকিতে স্বীকৃত হইলেন না, অথবা "নিয়তি কেন বাধ্যতে" ?

প্রথম প্রথম ফ্ল্যরেন্সে গিয়া গেলিলিও বেশ শান্তিতেই ছিলেন। তাঁহার খ্যাতি ইউরোপে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, রাজদ্বারে তাঁহার সম্মানের সীমা ছিল না; আর্থিক সচ্ছলতাও বেশ ছিল। এখানে ছাত্রদিগের জন্য আর বক্তৃতা করিতে হইত না—তিনি যাহা চাহিয়াছিলেন তাহাই পাইলেন।

কিন্তু এই শান্তি প্রলয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বেকার প্রকৃতির শান্তভাবের মতই হইল। ক্রমশঃ তাঁহার বিরোধীগণ তাঁহার মতের প্রতি পোপের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এখন গেলিলিও ত আর পাতুয়াতে নাই, সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে প্রশ্নাদি রোম হইতে ফ্লোরেন্সে অনায়াসে আসিতে আরম্ভ করিল। তিনি যে স্বীয় মতের পোষকতা করিয়া খৃষ্টধর্ম্মের প্রতিকূলাচরণ করিতেছেন, এ কথা তাঁহাকে স্পষ্ট করিয়াই বলা হইল। অবশেষে ১৬১৫ সালে পোপ পঞ্চম পল তাঁহাকে রোমনগরীতে গিয়া স্বয়ং তাঁহার মতাবলী পোপের গোচর করিবার

জন্য আদেশ করিলেন। তিনি রোমে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন, দূরবীক্ষণ যন্ত্র প্রভৃতি যন্ত্রাদিও সঙ্গে করিয়া লইলেন। রোমে উপস্থিত হইয়া তাঁহার যন্ত্রাদি সাহায্যে সকলকে স্বকীয় আবিষ্কৃত গ্রহ উপগ্রহাদি প্রদর্শন করাইতে লাগিলেন। একদিবস স্বয়ং পোপের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রায় একঘণ্টা যাবৎ কথাবার্ত্তা কহিয়া তাঁহাকে তাঁহার আবিষ্কারগুলি বুঝাইয়া দিলেন। পোপ তাঁহার উপর কোনও প্রকার অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন না। গেলিলিও মনে করিলেন যে তাঁহার সৌভাগ্য রবি এইবার মেঘমুক্ত হইয়া গিয়াছে। তিনি আরও কিছুকাল রোমে থাকিয়া সকলকে নিজের মত বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহার বিপক্ষপক্ষীয় অনেক উচ্চপদস্থ ধর্ম্মযাজক ক্রমশঃ তাঁহার উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলেন। এখন তাঁহারা কোপার্ণিকাসের মত বাইবেল-বিরোধী কিনা এই মূল প্রশ্নের মীমাংসার জন্য পোপকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। গেলিলিও এই প্রশ্নের মীমাংসার অপেক্ষায় রোমে বিলম্ব করিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন না যে তাঁহার অবস্থিতি ইহাদের কাছে অতি তিক্ত বলিয়া বোধ হইতেছিল। তিনি স্বকীয় নূতন মতের দ্বারা এরূপ অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে কোন পথ তাঁহার পক্ষে শ্রেয় তাহা তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। অবশেষে স্থিরীকৃত হইল যে কোপার্ণিকাসের মত বাইবেলবিরোধী। কোপার্ণিকাসের এবং কেপলারের গ্রন্থের প্রচার বন্ধ করিবার জন্য অনুজ্ঞা প্রচারিত হইল। গেলিলিওর প্রতি আদেশ হইল যে তিনি আর কখনও পৃথিবীর সচলতা সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে পারিবেন না। গেলিলিও ভগ্নহৃদয়ে ফ্লোরেন্সে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি আদৌ ধর্ম্মদ্বেষী ছিলেন না, এবং তাঁহার মত বাইবেলের কোনও এক অংশের বিপরীত বলিয়া নিজে দুঃখিতও ছিলেন; কিন্তু তাই বলিয়া তিনি যাহা সত্য বলিয়া জানিতেছেন তাহা পরিত্যাগ করেন কি করিয়া?

সে যাহা হউক গেলিলিও রোম হইতে ফিরিয়া আসিয়া অনেকটা নিরুপদ্রবে কাল কাটাইতেছিলেন। ১৬২৩ সালে পুরাতন পোপ স্বর্গারোহণ করেন এবং কার্ডিনাল বারবেরিনো নামক তাঁহারই একজন বন্ধু সপ্তম আর্ব্বান নামে পোপপদে অভিষিক্ত হন। তাঁহার বন্ধু বারবেরিনোকে পোপ পদে অভিষিক্ত দেখিয়া গেলিলিও অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন এবং তিনি এমনও আশা করিয়াছিলেন যে তাঁহার বিরুদ্ধে পুরাতন পোপের আদেশ প্রত্যাহৃত হইবে। তিনি স্বীয় বন্ধুর পদোন্নতিতে আনন্দ প্রকাশ করিবার জন্য স্বয়ং রোমনগরীতে উপস্থিত হইলেন। সেখানে নূতন পোপের সহিত কথাবার্ত্তায় বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

১৬৩২ সালে নূতন পোপের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া তিনি "টলেমী ও কোপার্ণিকাসের জ্যোতিষসম্বন্ধে কথাবার্ত্তা" নামক তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থখানি রচনা করিলেন। এই পুস্তকে তিনি তিনজনের কথাবার্ত্তাচ্ছলে তাঁহার মতগুলি বেশ বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এক ব্যক্তি কোপার্ণিকাসের মতাবলম্বী, দ্বিতীয় ব্যক্তি একজন বিদূষক এবং তৃতীয় ব্যক্তি

তাঁহার একজন বিরুদ্ধবাদী। এই গ্রন্থে বিরুদ্ধবাদীদের সমস্ত আপত্তিই তিনি খণ্ডন করিয়া দিয়াছিলেন। এই পুস্তক তাঁহার বিরুদ্ধবাদীদিগের গুপ্ত রোষাগ্নি একেবারে প্রজ্বলিত করিয়া দিল। তাঁহার বিরুদ্ধে যে আদেশ প্রচারিত হইয়াছিল তাহা এখনও প্রত্যাহৃত হয় নাই, অথচ তিনি স্বকীয় মত পুনরায় নূতন ভাবে প্রচার করিতে সাহসী হইয়াছেন। এবার তাঁহার আর নিস্তার রহিল না। তাঁহাকে রোমে যাইয়া বিচার গ্রহণ করিবার জন্য আদেশ প্রেরিত হইল। তাঁহার বয়স এখন সত্তর হইয়াছিল। এই সপ্ততিপর বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিককে অব্যাহতি দিবার জন্য তাঁহার বন্ধুবর্গ অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু ফলে কিছুই হইল না। ১৬৩৩ সালে ১৪ই ফেব্রুয়ারী তিনি রোমে পঁহুছিলেন। সেখানে পঁহুছিয়াই তিনি বাটীর বাহির হইতে নিষিদ্ধ হইলেন। জুনমাসে ইনকুইজিশন নামক বিচারালয়ে তাঁহার রীতিমত বিচার আরম্ভ হইল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে মধ্যযুগে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্মদ্বেষীগণের জন্য যে বিচার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল তাহাই ইনকুইজিশন নামে অভিহিত হইত।

এখানকার বিচার পদ্ধতি স্থূলতঃ সাত ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

প্রথম। অপরাধীকে বিচারালয়ে তাহার অপরাধ জ্ঞাত করান ও সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে স্বীকৃত না হইলে তাহাকে নির্য্যাতনের (torture) ভয় প্রদর্শন করা।

দ্বিতীয়। নির্য্যাতন করিবার ঘরের দ্বার পর্য্যন্ত অপরাধীকে লইয়া গিয়া পুনরায় নির্য্যাতনের ভয় প্রদর্শন করা।

তৃতীয়। ঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া নির্য্যাতনোপযোগী যন্ত্রাদি প্রদর্শন করা।

চতুর্থ। বস্ত্রাদি খুলিয়া ফেলিয়া অপরাধীকে নির্য্যাতন যন্ত্রে বদ্ধ করা।

পঞ্চম। নির্য্যাতন ক্রিয়া।

এইরূপ নির্য্যাতন ক্রিয়ার পরেও যদি অপরাধী স্বীয় অপরাধ স্বীকার না করে ও অনুতপ্ত না হয় তাহা হইলে নিম্নলিখিত চরম দণ্ড তাহার জন্য বিধিবদ্ধ ছিল।

ষষ্ঠ। কয়েক বৎসর কারারুদ্ধ করা।

সপ্তম। অগ্নিতে জীবন্ত অবস্থায় পুড়াইয়া মারা।

২১এ জুন গেলিলিও এই ভয়াবহ বিচারালয়ের সম্মুখে উপস্থিত হন এবং ২৪এ ঐ স্থান হইতে বাহির হইয়া আইসেন। এই বিচারের সময় জনসাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকিত এবং অপরাধীও সমস্ত বিষয় গোপন রাখিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইত। বিচারালয়ের খাতাপত্রও লোকচক্ষুর অগোচর। সেইজন্য এই তিন দিবস গেলিলিওকে প্রকৃত নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল কি না তাহা জানিবার কোনও উপায় নাই! আশা করি বিচারকগণ এই পুণ্যশ্লোক বৈজ্ঞানিকশ্রেষ্ঠ বৃদ্ধকে নির্য্যাতনের অনুজ্ঞা দিয়া নিজেদের রসনা কলঙ্কিত করেন নাই। এই সময় দারুণ দুশ্চিন্তায় তাঁহার শরীর ও মন একেবারে ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল, উপরন্তু তাঁহার স্নেহময়ী কন্যা ক্রমাগতঃ তাঁহাকে বশ্যতা স্বীকার করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইতে ছিলেন। নানাকারণে গেলিলিও আর

যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া বিচারকগণকে বলিলেন "আপনারা আমায় যাহা বলিতে আজ্ঞা করিবেন আমি তাহাই বলিতে প্রস্তুত আছি।" তখন বিচারপতিগণ তাঁহার প্রতি নিম্নলিখিত আদেশ প্রদান করিলেন।

প্রথম। গেলিলিও পৃথিবীর সচলতা সম্বন্ধে যে মত ও বিশ্বাস প্রচার করিয়া আসিয়াছেন তাহা প্রত্যাহার করিতে হইবে।

দ্বিতীয়। যাবজ্জীবন কার্য্যতঃ না হউক অন্ততঃ নামতঃ কারারুদ্ধ থাকিতে হইবে।

তৃতীয়। সাতটি অনুতাপসূচক প্রার্থনা-সঙ্গীত প্রতিসপ্তাহ আবৃত্তি করিতে হইবে।

দশ জন কার্ডিনাল নামক উচ্চ উপাধিধারী ধর্ম্মযাজক বিচারপতি ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে তিন জন বিচারালয়ের রায়েতে স্বাক্ষর করিতে স্বীকৃত হন নাই। অবশিষ্ট সাত জনের কলঙ্কিত লেখনীর স্বাক্ষর এখনও এই দলিলের উপর দৃষ্ট হয়। গেলিলিও এইরূপে নিগৃহীত হইয়া বাইবেল স্পর্শ করিয়া শপথ করিতে বাধ্য হইলেন "ইহা আদৌ সত্য নহে যে সূর্য্য জগতের কেন্দ্র স্থল, এবং পৃথিবী সচলা। আমি এত দিবস এ বিষয়ে যাহা বিশ্বাস ও ধারণা করিয়া আসিয়াছি তাহা সম্পূর্ণ অসত্য ও ধর্ম্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে ভবিষ্যতে মৌখিক বা লিখিত ভাষায় কখনও এই অসত্য প্রচার করিব না।" অনেকেই বলিবেন যে গেলিলিওর এইরূপ মিথ্যা প্রতিজ্ঞায় স্বীয় রসনাকে কলঙ্কিত করা আদৌ উচিত ছিল না, বরং ব্রুনোর মত জলন্ত অগ্নিতে আত্মসমর্পণ করিয়া উৎপীড়িতের জয়মাল্য বরণ করিয়া লইলেই ভাল হইত। তাঁহাদিগের প্রতি অনুরোধ এই যে, তাঁহারা এই হতভাগ্য বৃদ্ধের বয়স এবং তাৎকালিক শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য বিবেচনা করিয়া একটু করুণার নেত্রে তাঁহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, আর যাঁহারা ধর্ম্মের নামে মৃত্যুর ভীষণ মূর্ত্তির ভয় দেখাইয়া সত্যকে বলপ্রয়োগে রুদ্ধ করিয়া রাখিতে চেষ্টিত ছিলেন তাঁহাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে যেন অভিসম্পাত প্রদান করেন।

কথিত আছে যে এই প্রতিজ্ঞাপত্র পাঠ করার অব্যবহিত পরেই গেলিলিও সেইখানেই একজন বন্ধুকে চুপে চুপে বলিয়াছিলেন "তবুও উহা (পৃথিবী) সচলা"। কিন্তু এই কিম্বদন্তী সত্য বলিয়া বোধ হয় না, কারণ ঐ বিচারালয়ে অপর কোনও ব্যক্তির প্রবেশের অধিকার ছিল না।

গেলিলিওর এই প্রতিজ্ঞাপত্র প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদিগের নিকট পঠিত হইবার জন্য প্রেরিত হইল। গেলিলিওর তাৎকালিক ভীষণ মানসিক অবস্থার চিত্র চিত্রকরের তুলিকায় অঙ্কিত হইবার নহে। তাঁহার হৃদয় লজ্জায়, রোষে, ক্ষোভে, অপমানে একেবারে ভরিয়া গিয়াছিল। তিনি রোমে কিছুকাল অবরুদ্ধ থাকিয়া সীনা নামক স্থানে প্রেরিত হন। সেখান হইতে তাঁহার পল্লীভবন আরসেত্রী নামক স্থানে যাইতে অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হন। এখানে তাঁহার স্নেহময়ী কন্যা তাঁহার শুশ্রূষা করিতে থাকেন। কিন্তু বিধাতা গেলিলিওকে বৃদ্ধবয়সে কন্যাশোকও দিলেন। ছয় দিবস যাইতে না যাইতে স্নেহময়ী কন্যা বৃদ্ধ পিতার বক্ষে মস্তক রাখিয়া অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

অপমানিত, ভগ্নহৃদয়, জরাগ্রস্ত গেলিলিওর তত্রাচ কর্ম্মে অনাসক্তি ছিল না। অবরুদ্ধ অবস্থাতেই তিনি গতিশীল দ্রব্যের গতিসম্বন্ধীয় নিয়মত্রয় (Laws of motion) সুস্পষ্ট ও সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এক হিসাবে এই গ্রন্থখানিই তাঁহার শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ। যৌবনে তিনি পেণ্ডুলামের সমগতিত্ব ও পতনশীল দ্রব্যের গতিসম্বন্ধীয় নিয়ম (Laws of falling bodies) আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং অধুনা গতিশীল দ্রব্যের গতির নিয়মগুলি আবিষ্কার করিয়া তিনি গতিবিজ্ঞানের (dynamics) জন্মদান করিয়া গেলেন। যদিও এই শেষোক্ত নিয়মগুলি ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক, মাধ্যাকর্ষণের আবিষ্কর্ত্তা নিউটনের দ্বারা সম্যকরূপে আলোচিত হওয়াতে তাঁহার নামেই প্রচলিত, কিন্তু ঐগুলি গেলিলিওর এই গ্রন্থ হইতে যে গৃহীত তাহাতে সন্দেহ নাই। এই অমূল্য গ্রন্থখানি গেলিলিও নিজে প্রকাশ করিতে সাহসী হন নাই। তাঁহারই কোনও ছাত্র উহা হলাণ্ডদেশে লইয়া গিয়া লুক্কায়িতভাবে প্রকাশিত করেন। গেলিলিও কেবল পরীক্ষামূলক জ্যোতিষের জন্মদাতা নহেন, তিনি গতিবিজ্ঞানেরও যে একজন প্রতিষ্ঠাতা তাহা এই গ্রন্থ হইতে সম্যক উপলব্ধি হয়।

বিধাতা মহাপুরুষের পরীক্ষা বিপদের ভিতর দিয়াই গ্রহণ করেন। তাই দেখিতে পাই ভক্ত বালক ধ্রুবকে বিমাতার নির্য্যাতনের ভিতর দিয়া তিনি পরীক্ষা করিলেন, প্রহ্লাদের ভক্তি বিষপান, অগ্নিদহন, সমুদ্রে নিক্ষেপ প্রভৃতি যাবতীয় বিপদের মধ্যে অটুট থাকে কি না তাহাই তিনি বারবার দেখিয়া লইলেন। গেলিলিওর পরীক্ষা বুঝি এখনও সমাপ্ত হয় নাই, তাই তিনি গেলিলিওর দৃষ্টিশক্তিও কাড়িয়া লইলেন। প্রথম একটি চক্ষু ফুলিয়া উঠিল ও ক্রমে উহা হইতে দৃষ্টিশক্তি অন্তর্হিত হইয়া গেল। শেষে দুইটি চক্ষুই অন্ধ হইয়া গেল। এই সময় তিনি নিশ্চয়ই স্বর্গগত কবি রজনীকান্তের মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন "আমায় সকল রকমে খর্ব্ব করেছো, গর্ব্ব করিতে দূর"।

তিনি এই সময়ে তাঁহার একবন্ধুকে লিখিয়াছিলেন "তোমার প্রিয়বন্ধু এখন সম্পূর্ণরূপে অন্ধ। এখন হইতে এই চরাচর বিশ্ব, ঐ অনন্ত নভোমণ্ডল— যাহার সম্বন্ধে জ্ঞান আমি আমার অশ্রুতপূর্ব্ব আবিষ্কারের দ্বারা শতসহস্রগুণ বর্দ্ধিত করিতে সমর্থ হইয়াছি—আমার কাছে একেবারে রুদ্ধ! ইহাই যখন ভগবানের ইচ্ছা, তখন আমিও ইহাতে সন্তুষ্ট।" এই অন্ধ অবস্থায় তাঁহার শিষ্যবর্গ তাঁহার শুশ্রূষা করিত। ইংলণ্ডের মহাকবি মিল্টন এই সময়ে ইটালী ভ্রমণ করিতে আসিয়া গেলিলিওর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যান। তখন তাঁহার বয়স মাত্র উনত্রিশ বৎসর ছিল; বৃদ্ধ বয়সে যখন তিনিও অন্ধ হইয়া তাঁহার অমর কবিতাবলী স্বীয় কন্যাগণকে লিখিতে বলিতেন তখন নিশ্চয়ই ইটালীর এই ঋষিকল্প অন্ধবৈজ্ঞানিকের চিত্র তাঁহার স্মৃতিপটে উদিত হইত।

অবশেষে তাঁহার মুক্তির দিন আসিয়া দেখা দিল! আটাত্তর বৎসর বয়ঃক্রমকালে ১৪৪২ সালের ৮ই জানুয়ারী তাঁহার অমর আত্মা নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গগত

হইল। গেলিলিও মৃত্যুর শীতল অঙ্কে বিশ্রামলাভ করিয়া জীবনের সকল জ্বালা যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইলেন। মৃত্যুর পরেও তাঁহার বৈরীগণ তাঁহার উপর কৃপাদৃষ্টি করেন নাই। প্রথমে তাঁহারা তাঁহার যথারীতি সৎকার করিতে না দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে কোন স্মারকস্তম্ভ নির্ম্মাণের ঘোরতর বিরোধী হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এই অদূরদর্শী মূর্খেরা বুঝিতে পারে নাই যে তিনি স্বহস্তেই তাঁহার অশ্রুতপূর্ব্ব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দ্বারা এমন অতুলনীয় অনিন্দ্যসুন্দর স্মারকস্তম্ভ রচিয়া গিয়াছেন যে তাহাব জ্যোতিতে চিরদিনই দিক্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত হইয়া থাকিবে।

শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী।

সন্ধ্যা

সন্ধ্যা যবে নয়নপথে প্রথম দিল ধরা,
মুগ্ধ ব'সে নদীর তীরে
দেখিনু, সবে চলিছে ফিরে
যে যার নিজ আবাস পানে শান্তি আশে ত্বরা,
সন্ধ্যা যবে নয়ন পথে প্রথম দিল ধরা।

ওপারে ঐ কনকথালা তলিয়ে গেল জলে,
তখনো ক্ষীণ-দীপ্তিরাশি
মাখিয়া ঢেউ পুলকে হাসি
খেলিতেছিল 'ঝগড়া ঝাঁটী' জুটিয়া দলে দলে;
ওপারে ঐ কনকথালা তলিয়ে গেল জলে।

পিছন ফিরে চাহিয়া দেখি কেউতো কোথা নাই!
নদীর জল সুমুখে শুধু,
ওপারে মরু করিছে ধূধূ,
কেবলি মনে আসিতেছিল কি যেন কারে চাই,
পিছন ফিরে চাহিয়া দেখি কেউতো কোথা নাই!

এমনি কালে সন্ধ্যা চোখে প্রথম দিল ধরা,
পেছনে ছুটে দানবী নিশি,
এলান কাল অলক রাশি;
অভয় তাই খুঁজিতেছিল ধরণীতলভরা,
সন্ধ্যা যবে নয়নপথে প্রথম দিল ধরা।

পেছন হতে দানবী নিশি গ্রাসিল বুঝি হায়,
শিথিল সাড়ি দুহাতে ধরি,
সজল চোখে পৃথিবী ভরি,
সহায়হীনা সন্ধ্যা মেয়ে অভয় শুধু চায়,
পেছন হতে দানবী নিশি গ্রাসিল বুঝি হায়!

কেউতো কোথা নাই—সবে ফিরিয়া গেছে ঘরে,
স্বজনহারা সন্ধ্যাসতী
শ্রান্ত পদ রুদ্ধ গতি,
আঁচল ঠেকি পড়িয়া গেল শূন্য ধরা পরে,
কেউতো কোথা নাই—সবে ফিরিয়া গেছে ঘরে।

ঝুঁকিয়া পড়ে পিশাচী নিশি লুণ্ঠিতারি গায়, -
ক্ষিপ্রকরে একটী করি
ভূষণরাশি লইল হরি
কণ্ঠ হতে তারকা হার কাড়িয়া নিল হায়!
শূন্য মনে, ভূষণহীনা,
মলিন মুখ ঢাকিয়া দীনা
সন্ধ্যাসতী অন্ধকারে অন্তরালে যায়,
ভূষণে তারি পিশাচী নিশি সাজিয়া শোভা পায়।

শ্রীসুরেশানন্দ ভট্টাচার্য্য।

বাগ্দত্তা

(১৪)

শচীকান্তের পরিবর্ত্তন অন্য সকলের চক্ষে নিতান্ত বিস্ময়কর ঠেকিবে ইহা এমন কিছুই আশ্চর্য্য নয় কিন্তু তাহার সর্ব্বদোষক্ষম মাতৃ-হৃদয়েও তাহার সেই নূতন ধরণধারণগুলা একটা বেদনার সৃষ্টি করিয়া তুলিল। সে যদিও দিনের মধ্যে অনেকবারই তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া বসে, অনভ্যস্ত সেবার চেষ্টায় বিশৃঙ্খলতারও সৃষ্টি করিতে ছাড়ে না, তথাপি এই সকলের মধ্যে কি যেন একটা অভাব থাকিয়া যায়—যাহা তাহার রোগপীড়িতা জননীকে ব্যথিত করিয়া তোলে।

গঙ্গামণির নিতান্ত সরল স্বভাব, তা ভিন্ন তিনি স্নেহে অন্ধ, ইহা সত্ত্বেও তাঁহার মনে হইতেছিল শচীকান্তের মনে তাঁহাদের প্রতি সন্তানোচিত যথেষ্ট প্রীতিভক্তি নাই। একদিন অন্যের অনুপস্থিতি কালে পুত্রকে নিকটে পাইয়া তাহাকে কাছে সরাইয়া আনিয়া সর্ব্বাঙ্গে স্নেহ হস্তাকর্ষণ করিতে করিতে কহিলেন "বাবা এটা কি ঠিক হচ্চে ?"

শচীকান্ত মায়ের মুখে কখনও তাহার কোন কার্য্যের প্রতিবাদ শুনিতে প্রায় নাই, সে একটু বিস্মিত হইয়া কহিল, "কি মা ?"

মাতা একটু কুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন, "এই কাপড় চোপড় সব সাহেবদের মতন পরো, সে একটু সরিয়া বসিয়া পরুষ ভাবে হঠাৎ কহিয়া উঠিল, "কাকে কি অভক্তি করেচি ? অহিন্দুতাই বা কে কি দেখলে ?"

গঙ্গামণি তাহার উদ্ধত ব্যবহারে ঈষৎ আঘাত পাইলেন, একবার মনে হইল, যাউক কিছু বলিব না, কিন্তু এই বলাই শেষ বলা তাহা তাঁহার বুঝিতে বাকি ছিল না তাই আবার নিজের শীর্ণ হাত তাহার সবল বাহুর উপর স্থাপন করিয়া স্নেহব্যাকুল যুগল নেত্র দুইটি মঙ্গলতারকার মত তাহার বিরক্ত মুখের উপর স্থাপন করিয়া ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন, "তোমায় বকচি মনে করোনা বাবা, দেখতেই পাচ্চো আমার তো সব শেষ হয়েই এসেছে। ইনি যেটা ভালবাসেননা সেটা নাইবা তুমি করলে, বলো বাবা ওগুলো সব ছেড়ে দেবে ?" শচীকান্তের মনের ভিতরে একটা তীব্র বিরক্তি জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে কঠিন করিয়া তুলিল। সে ভাবিল,—কী এমন দোষ আমি করেছি যে শুধু শুধু মার এই শক্ত অসুখের সময় তাঁর কাছে বাবা আমার নিন্দে করে তাঁর মন আমার প্রতি প্রতিকূল করে দিচ্চেন! এ ভারী অন্যায়! প্রকাশ্যে সে সাভিমানে মুখ ফিরাইয়া অবরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "আমার কোন্ কাজটাই বা তোমরা কবে ভাল চোখে দেখে থাকো ? ছোট বেলা

দোষ গুণ যদি উনি বা আমি না শেখাব তবে তোমাদের কে শেখাবে?"

শচীকান্ত প্রচ্ছন্ন কোপের সহিত মৃদু হাসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল "আমার ভাল আমি নিজে অপরের চেয়ে বুঝি, তার জন্যে কাউকে মাথা ঘামাবার দরকার হবে না। তুমি এখন ঘুমোও, বেশি কথা কইলে অসুখ বাড়বে।"

পুত্র চলিয়া গেল, মুমূর্ষু দুই ব্যাকুল নেত্র দ্বারা দ্বারের বাহির পর্য্যন্ত তাহার অনুসরণ করিয়া অবশেষে একটি সুগভীর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

দুচারিদিন কাটিয়া গেল। রোগীর অবস্থা কিছুমাত্র ভাল হইল না। বাড়ীর লোকে বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া রহিল। মনীশ ও ভক্তিনাথ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিশ্রমসহকারে রোগীর সেবা করিতে লাগিল। শচীকান্ত যেটুকু পারে তাহাতে পরাঙ্মুখ হইল না। এক দিন রোগীর বদ্ধ গৃহের ভারাক্রান্ত বাতাসে ক্লান্তিবোধ করিয়া শচীকান্ত অন্ধকার সিঁড়ি বাহিয়া ত্রিতলের খোলা ছাদে উঠিয়া আসিল। চারিদিকে সমুচ্চ মন্দির চূড়াসকল অস্তমান সূর্য্যের স্বর্ণ আভায় জ্বলিতেছে। পার্শ্বে মন্দিরোদ্যানে বিবিধ বর্ণের গোলাপ ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। মাধবী ও একটি বিলাতি ধরণের লতায় জড়িত একটি কুঞ্জের মধ্যে একজন গেরুয়াবসনধারী দণ্ডী পদ্মাসনে বসিয়া জপ করিতেছেন। শচীকান্ত দেখিল মনীশ একখানি বই খুলিয়া ছাদের একটি কোণে বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিতেছে। সে হাসিয়া উঠিল। মনীশ প্রথমটা একটু চমকিয়া উঠিয়াছিল পরক্ষণে পুস্তক হইতে চক্ষু তুলিয়া ধীর ভাবে কহিল "কি?" "ভাল ছেলের মত এক মনে খুব পড়ে যাচ্চো যে? ওহে অত করে পড়োনা মাথা খারাপ হয়ে যাবে। আমি দেখ কোন রকম গুরুতর ভাবনা চাবনা করিনে, শরীরটাও বেশ সেরে গ্যাছে।"

"তুমি তাতে খুব সুখে আছ ত?"

"তা—নেই বা কেন? অবশ্য গুরুতর বিষয় নিয়ে বিশ্লেষণ করায় একটা বেশ আনন্দও পাওয়া না যায় তাও নয়, কিন্তু আমার মতে ভবিষ্যতে তার থেকে কার কি উপকার হবে সেজন্য জীবনটা উৎসর্গ না করে বর্ত্তমানটাকে ভাল করে উপভোগ করাই বোধ হয় ভাল। তুমিও যেমন কে কার জন্যে কি করতে পারে।

এই ত কত বড় বড় জাতির অভ্যুদয় হলো, কত জাঁক কত জমক, আজ আর তাদের নাম গন্ধও নাই। যে কদিন আছি সুখে থাকব, ব্যস্ মরে যাবো সব শেষ।"

মনীশ হাসিল "প্রজাপতির মত?"

"হ্যাঁ,—প্রজাপতির মত। কিন্তু তাও ঠিক নয়, তারাও সুখী হচ্চে ঠিক জানে না, উমেদারী করতেই তাদের দিন কেটে যায়। তবে ওই রকম দর্শনের বই কোলে করে নির্জ্জন ছাদের উপরে তাদের জীবনের সুখের দিনগুলা তারা অপব্যয় করে না—এটা ঠিক! তোমার মত মানুষের চেয়ে তারা ঢের সেয়ানা।"

মনীশ বই মুড়িয়া দাঁড়াইল, সলজ্জভাবে সে কহিল "আমার কথা ছেড়ে দাও আমি দর্শনের কি জানি, একটু উল্টে পাল্টে দেখি মাত্র, আর তাঁদের সেই সুদূর অতীতের মহাজ্ঞানীগণের অগাধ জ্ঞান অনুভব করে হতবুদ্ধি হয়ে যাই। নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক

তত্ত্বকে কত বিশদ করে কত বড় করে সেই অতীত যুগে তাঁরা ঘোষণা করে গেছেন, এখনও জগতের আর কেউ তাঁদের কাছেও ঘেঁষতে পারেনি, শুধু সবে নীচের সিঁড়িটা পেরিয়ে উঠ্‌চে মাত্র। আর এই সব থেকে যখন মনকে সংসারে ফিরিয়ে আনি তখন সেখানকার কাণ্ড দেখে বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হয়ে থাকি। কি সুচারু বন্দোবস্ত! গোড়া থেকে আইনের দ্বারা বিধিবদ্ধ নিয়মের উপরে এই এতবড় প্রকাণ্ড কাণ্ডটা চলচে, কোন রকম বে-বন্দোবস্ত নেই, আটক নেই। এমন কি এর একটি ধূলিকণার স্থান পরিবর্ত্তনেও যেন একটা নির্দ্দিষ্ট কারণ বর্ত্তমান আছে দেখা যায়। এই বিরাট কাণ্ড যাঁর নেত্রেঙ্গিতে সম্পন্ন হচ্চে, তাঁর কথা কি না ভেবে থাকা যায়? তাঁর পায়ের ধূলায় মাথা যে আপনি নত হয়ে আসে।" এই বলিয়া মনীশ ভূমিতে মাথা নামাইয়া প্রণাম করিল।

শচীকান্ত মুখ টিপিয়া হাসিল, করুণার সহিত কহিল "থাক্ ও সব বাজে কথা, আমি কুন্দমালাকে একদিন দেখে এসেছি।" এই বলিয়া সে সকৌতুকে নিস্তব্ধ মনীশের মুখের দিকে মুখ ফিরাইয়া চাহিয়া দেখিল, "কি, একটা কথাও জিজ্ঞেস করলেনা-যে?"

মনীশ আলিসার ধারে ঝুঁকিয়া নীচে বাগানের দিকে দৃষ্টি স্থির করিয়া অনাগ্রহ ভাবে উত্তর করিল "না!"

"কেন বৈরাগ্য না লজ্জা?"

"একটাও না আমি বিয়ে কর্ব্বোনা।"

"বিলক্ষণ! এ আবার কি সখ্? এর অর্থ কি?"

"অর্থ? অর্থ কই কিছুই ত নেই!"

"বিনা কারণে এত বড় একটা কার্য্য হতে পারে?"

"বিনা কারণে এতবড় বিশ্ব যদি আকস্মিক আবির্ভূত হতে পারে তবে এটা এমনি কি ব্যাপার যে হতে পার্ব্বে না?

শচী ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিয়া বন্ধুর পৃষ্ঠে একটা চপেটাঘাত করিল "আঃ থাম্, না সত্যি বল্‌না—কেন?"

"বল্লাম তো এর মধ্যে রহস্য কিছুই নেই, এতে আর 'কেন?' কি থাকবে?"

শচীকান্ত কহিল "আছে বই কি। সৃষ্টি শুদ্ধ লোকে যা করবে তুমি তা না করবে কেন? তুমি কি সৃষ্টিছাড়া?

মনীশ হাসিয়া ফেলিল "তবে বোধ হয় আমি সৃষ্টি ছাড়াই। তুমি আজ কাল আর পদ্য টদ্য লেখোনা নাকি?

"হ্যাঁ ভাই খুব লিখি, ওইটেই 'আমার জীবনের খোরাক। 'বাসন্তী' ও 'ক্ষণিকের দেখা' নামে দুটো বই শীঘ্রই বেরোবে।"

মনীশ হাসিল না, বা উৎসাহ প্রকাশ করিল না। সে বাতাসে ভাসিয়া আসা সদ্য ফোটা ফুলের গন্ধটুকু নিশ্বাসে গ্রহণ করিয়া জপপরায়ণ দণ্ডীটির প্রতি সভক্তি নেত্র স্থির করিয়া মৃদুভাবে কহিল "ক্ষণিকের সে দেখা এখনও তুমি ভোল নি?"

শচী হাসিয়া কহিল—"শুনবে তবে?"

ভয় নাই, ভুলিব না, তুই কিরে ভুলিবার!
ও মূরতি সাবধানে রাখিয়াছি মনে প্রাণে
তুইরে এ মরুবক্ষে সুশীতল জলধার;
এ জন্মে বা জন্মান্তরে তুই কিরে ভুলিবার?"

(১৫)

চতুর্দ্দশীর দিন অনেক যত্নে মনীশ ও ভক্তি-

নাথ পাল্কি করিয়া গঙ্গামণিকে বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা দর্শন করাইলেন ও পাল্কির মধ্যে শয়ন করিয়া যুক্তহস্তে প্রণাম করিতেই সুখের অশ্রুজলে সৌভাগ্যবতী অভিষিক্ত হইয়া উঠিলেন। মৃদুস্বরে কহিলেন, "কোন আক্ষোভ মনে রইল না, মা, শুধু একটী গোপন দুঃখের কথা তোমায় বলে যাই, আমার শচীর মতি-গতি ভালো রেখ, বাছার মঙ্গল করো।"

যত বিদায়ের দিন নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল গঙ্গামণি ততই নিশ্চিন্ত হইয়া উঠিতে লাগিলেন, পুত্রের সম্বন্ধে যে একটা অনির্দ্দিষ্ট অজ্ঞাত আতঙ্ক তাঁহার চিত্তে সর্ব্বদা জাগিয়া উঠিত তাহাও সেদিন মার কাছে নিবেদন করিয়া দিবার পর হইতে কমিয়া গিয়াছে। মুখের উপরে ইতিমধ্যেই যেন আগতপ্রায় নব জীবনের শান্তিপূর্ণ ছায়া ব্যাপ্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল।

অবশেষে একদিন প্রতীক্ষিতকাল অগ্রসর হইয়া আসিল। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে গঙ্গাতীরে পুণ্যবতী পত্নী স্বামীর পায়ে মাথা রাখিয়া নয়ন মুদ্রিত করিলেন। পূর্ব্বক্ষণে ঋষিতুল্য বিশোকচিত্ত স্বামীর পদধূলি মস্তকে লইয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিয়াছিলেন "দেবতা জানিনা, ধর্ম্ম জানি না শুধু তোমাকে জানি, ও পদসেবার অধিকার যেন আমায় হারাতে না হয় এইটি শুধু তুমি দেখো, সেই আমার স্বর্গ।' তারপর নিশ্বাস লইয়া কষ্টে কহিলেন 'কত দোষ অপরাধ করেচি সব ভুলে যেও, আশীর্ব্বাদ করো, চল্লুম।" অবিচলিতহৃদয় সাধক করুণাবাষ্পরুদ্ধ গাঢ়স্বরে ধীরকণ্ঠে কহিলেন—"সতীলোক প্রাপ্ত হও।"

আলতা সিন্দূরে সমুজ্জ্বল, রাঙ্গাপেড়ে সাড়ীপরা দেবীপ্রতিমার মত দেহ সেদিন শশ্মানবাসীকে বিস্মিত করিয়া জলিয়া শেষ হইল। সকলেই ঈর্ষাপূর্ণ নেত্রবদ্ধ রাখিয়া কহিতে লাগিল 'আহা কোন্ পুণ্যবতী রে পাকামাথায় সিন্দুর পরে গেলো।"

শ্রাদ্ধশান্তি শেষ করিয়া ভক্তিনাথ সপরিবারে গৃহে ফিরিয়া গেলেন এবং শিবনারায়ণ সপরিবারে কিছুদিন কাশীবাসের ইচ্ছায় ভাল একটি বাসা খুঁজিয়া তাহাতেই উঠিয়া গেলেন। সার্ব্বভৌম মহাশয় তাঁহাদের সহিত বাস করিতে প্রথমে কিছু আপত্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে বাড়ী শুদ্ধ সকলকার বিশেষতঃ করুণাময়ীর সানুনয় অনুরোধ কাটাইতে না পারিয়া ইহাতে সম্মত হইলেন। সকলেই বুঝিয়াছিল তিনি আর দেশে ফিরিবেন না। গৃহীর গার্হস্থ্য ধর্ম্ম সমাপ্ত হইয়াছে, এইবার বানপ্রস্থের সুযোগ উপস্থিত। কেহ কথাটাকে পাড়িয়া ইহাকে পাকা করিয়া ফেলিতে ইচ্ছুক হইল না, কিন্তু মনে মনে সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়া রহিল। তিনি না থাকিলে যেন সেখানে কিছুই থাকিবে না।

করুণাময়ী একদিন স্বামীকে কহিলেন "সার্ব্বভৌম মশাই যদি দেশে না ফেরেন তা হলে আমরাই বা ফিরবো কেন? এইখানেই সবাই থেকে যাব। শিবনারায়ণ কিছু না বলিয়া ঈষৎ হাসিলেন। ইহার অর্থ থাকিব বলিলেই কি থাকা হয়। করুণাময়ীর এখানে বড় সুবিধা হইল, তিনি যখন তখন একখানা চাদর গায়ে দিয়া কাহাকেও সঙ্গে লইয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়েন। সেদিন শেষ শীতের সায়াহ্ন অতি শীঘ্রই রজনীর অন্ধকারে মিলাইয়া আসিল। ঈষৎ কুয়াশাচ্ছন্ন আকাশে জ্যোৎস্নার

বিকাশ রুগ্ন মুখের মৃদুহাসির মত ম্লান দেখাইতে ছিল। বাড়ীর ছাদের আলিসা ও চিলের ছাদের ছায়াগুলা দীর্ঘ হইয়া অন্ধকার রাজপথে ছড়াইয়া পড়িল। এমন সময় রামনগরের কেল্লা দেখিয়া মনীশ সত্য ও করুণাময়ী তিনজনে অসিঘাটে নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া উপরে উঠিতে আরম্ভ করিলেন।

পুরাতন স্থানের অন্য কি মাহাত্ম্য আছে তাহা ঠিক বলিতে পারা যায় না! কিন্তু তাহা যে মনটাকে কেমন একটা ক্লান্ত অবসাদের মধ্যে নিক্ষেপ করে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। দ্রষ্টা কয়জনের মনেই এই ভাবটা কমবেশ জাগিয়া উঠিয়াছিল। মনীশের খুড়িমা ব্যাসদেবের কলহের কথা ভাবিতেছিলেন, মনীশ ভাবিতেছিল, মহারাজ চেৎসিংহের কথা। শিবালয় ঘাটের উপরকার যে বুরুজ হইতে তিনি গঙ্গার গর্ভে লাফাইয়া পড়িয়াছিলেন অদূরে তাহাও দেখা যাইতেছে পরপারে নিবিড় অন্ধকার বনানীর মধ্যে রাজপ্রাসাদের অস্পষ্ট দীপমালা।

সম্মুখে ক্ষীণকণ্ঠে কে বলিয়া উঠিল "মানুষ কি? পথ ছাড় তো বাপ,—চোকে কিছু দেখতে পাচ্চিনে। এ মেয়ে গেলো কোথায়?"

সন্ত্রস্ত হইয়া তিনজনেই একধারে সরিয়া সম্মুখের পথ ছাড়িয়া দিলেন। করুণাময়ী দেখিলেন বৃদ্ধা দৃষ্টিহীনা, দুইহাত সম্মুখে বাড়াইয়া অতিকষ্টে হাতড়াইতে হাতড়াইতে পথ চলিতেছেন, অসহায় মুখচ্ছবি যদি সে তরল অন্ধকার ঢাকিয়া রাখিতে পারিত তো ভালই হইত। ব্যথিতচিত্তে নিকটে গিয়া কহিলেন এই অন্ধকারে একা কেন বেরিয়েছ মা, কোথা যাবে তুমি।"

বৃদ্ধা কহিলেন "আর মা যম যাকে ভুলে বসে থাকে তার আর যাবার স্থান কোথায়! এই ঘাটের দিকেই এগিয়ে দেখি মেয়েটা কেন এত দেরি করচে। হা মা গঙ্গা! তোর গর্ভেও কি একটু জায়গা নেই গা!" মানুষের মনে গভীর একটা যন্ত্রণা না থাকিলে এতবড় আত্মধিক্কার শুধু বয়সের অসহিষ্ণুতায় আনিতে পারে না। করুণাময়ীর মনে এই অসহায়া রমণীর প্রতি করুণার উৎস উথলিয়া উঠিল। তিনি তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দাঁড়াও বাছা আমরা তোমার মেয়েকে ডেকে দিচ্ছি। কি বলে ডাকব?"

বৃদ্ধা একটুখানি খুসী হইলেন, আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন "ভাল হবে মা, তোমার মন ভাল। আর মা আমার এ দুঃখের শরীরে সব সহ্য হয় তবে ভয় করে রাতভিত যদি পড়ে মরি, নিজেও অপঘাতে যাবো আর মেয়েটা—মরুকগে কপালে যার যা আছে কেউ খণ্ডাতে পারে না, হ্যাঁ আমার নাতনীকে ডেকে দেবে বলচো? তার নাম কমলা।"

"এই যে আমি এসেচি, আঃ তুমি আবার এই অন্ধকার রাত্রে কেন বেরিয়েছ ঠাকুমা?" পিছন হইতে পূর্ণকুম্ভ ছলছল করিতে করিতে একটি সুমিষ্ট কণ্ঠ এই কথাগুলি বলিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। করুণাময়ী চাহিয়া দেখিলেন ভিজা কাপড়পরা একটি মেয়ে প্রকাণ্ড একটা কলসী কাঁখে করিয়া তাঁহাদের দিকে আসিতেছে। মেঘসরা চাঁদের ক্ষণ জ্যোতিতে তাহার মুখের পানে চাহিয়া তিনি আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। চাঁদের আলো যেন তাহার গায়ের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল।

মত ভার হইয়া চাপিয়া ধরিয়াছিল। একটু-খানি সহানুভূতি পাইতেই তাই পাথর সরাইয়া নিজেকে প্রকাশ করিতে তাঁহার এতটুকু দ্বিধা হইল না। সামান্য পথটুকু পাশাপাশি চলিবার সময়েই তিনি তাঁহার সমস্ত ইতিবৃত্তটুকু অপরিচিতা সহানুভূতিকারিণীর নিকটে নিবেদন করিয়া দিলেন।

প্রবীণা কহিলেন "মা এ পোড়ার মুখে কি আর সে সব কথা আসে, সে যেন আমার আগের জন্মের কথা সব, সবই স্বপন হয়ে গেছে! রাক্ষসী একে একে সবাইকে পেটে পূরে বসে আছি—মরণও ত বিধাতা লেখেনি, এখন আরও যে কি বাকি আছে তাই সর্ব্বদা ভয়।

ভয়ের আর আমার আছেই বা কি? শুধু ঐ একটা মেয়ে! তা দেখ বাছা আমি আর যমকে বড় ভয় করিনে, সে আমার এক রকম ঘরের লোক হয়ে উঠেচে—ভয় করে এখনও মানুষকে। মানুষকেই বেশি ভয় মা, মানুষের ভয়েই আমি আরও মারা গেলুম। সাপকে ভয় করিনে, দেখ না এই আঁধার রাতে ছেড়ে দিয়েচি, তবু দিনের আলোয় ঘাটে পথে বেরুতে দিইনে। ঠাকুর ছাইপোরা কপাল গড়েচে ছাইমাখা রূপ কেন গড়েননি বল দেখি মা? এ কোন্ বিচার?"

তখন অনেকখানি পথ অগ্রসর হইয়াছেন, গৃহস্থগৃহ হইতে দীপালোক রাস্তার উপরে বিস্তৃত হইয়াছিল, করুণাময়ী বালিকার বিষণ্ণ মুখের দিকে চাহিয়া সহসা আর চোখ ফিরাইতে পারিলেন না। বিস্ময়ে প্রশংসায় তাঁহার দৃষ্টি বিস্ফারিত ও সেই ক্ষুদ্র মুখখানির উপরে নিবদ্ধ হইয়া রহিল। এমন রূপের ডালি মেয়ে ইহাকে লইয়া সংসারের কোথাও কোন অশান্তি সৃষ্টি হইতে পারে!

বৃদ্ধার গৃহ অসিঘাট হইতে অধিক দূর নয়। সামান্য একখানি খোলার চালের মেটে বাড়ী, সম্মুখের কুলুঙ্গিতে একটী কেরোসিনের ডিব্বা মিটমিট করিয়া জ্বলিতে ছিল কিন্তু আলোক প্রদান অপেক্ষা সে জ্বলনের দ্বারা ধূমোদ্গার করিতেছিল বেশি। সম্মুখের জেওল গাছের মধ্যে তখনও মধ্যে মধ্যে বিনিদ্র কপিশাবকগণের বিবাদ কোলাহল অকস্মাৎ জাগিয়া উঠিতেছে।

দাওয়ায় কলসী নামাইয়া মেয়েটি ক্ষিপ্র হস্তে পিতামহীর হাত ধরিয়া তাঁহাকে অনতি উচ্চ দাওয়ার উপর টানিয়া তুলিল। করুণাময়ী রাস্তায় দাঁড়াইয়া চারিদিক চাহিয়া স্থান নির্দ্দেশ করিয়া রাখিতে রাখিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাড়ীতে আর কেউ নেই?"

বৃদ্ধা কহিলেন 'কে থাকবে মা, ঠাকুর পুত্তর ছিলেন, তিনিই বড় অসময়ে দুঃখীদের আশ্রয় হয়েছিলেন কিনা তাই সর্ব্বগ্রাসী তাঁকেও আজ সাত আট মাস হল গ্রাস করে বসে আছি। দেখ মা আর কিছুর ভয় করিনে, এ কাশী জায়গা ঘরে মলেও এখানে কোন ক্ষতি নেই, পাড়ার লোককে অনেক করে পায়ে ধরে বলে রেখেছি দুজন বামুন ডেকে হাড় ক'খানা গঙ্গায় দেবে। কিন্তু আমার এই যে মহাকাল দেখছ মা এই আমার সর্ব্ব শরীরের রক্ত যেন হিম করে দিচ্চে! এস মা তুমি বড় ভাল লোকের মেয়ে, আজ অনেক দিন পরে অনেক দুঃখের কথা তোমার কাছে বলেও যেন মনটা হাল্কা বোধ হচ্চে। আমার দুঃখ অফুরন্ত বাছা এর আর শেষ নেই, হিমশীত যাও মা তুমি নিজের ঘরে যাও।"

করুণাময়ী যতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিলেন সমস্ত ক্ষণই সেই স্তিমিতালোকে বৃদ্ধার পার্শ্ববর্ত্তিনী স্তব্ধ মূর্ত্তিখানির দিকেই তাহার দুই চক্ষের দৃষ্টি বদ্ধ হইয়া প্রশংসামিশ্রিত বিস্ময়ের একটা সকরুণ বেদনা তাঁহাকে ভিতরে ভিতরে কেবলি পীড়ন করিতে লাগিল। এমন মেয়ের এই দশা, এ বিধাতার কি বিধান কে জানে? আহা রাজার ঘরেও যে এমন রূপ দেখা যায় না! কিন্তু মেয়েটি তাহার অত্যন্ত করুণায় যেন ঈষৎ ক্লান্তি অনুভব করিতে লাগিল। সে প্রথমে একটু বিরক্তভাবে মুখ ফিরাইয়া লইল এবং তার পর বৃদ্ধার হস্ত আকর্ষণ করিয়া দ্রুতকণ্ঠে কহিয়া উঠিল "এসো ঠাকুমা ঘরে এসো ঠাণ্ডা লাগছে।"

এই বলিয়াই সে মুখে চোখে উড়িয়াপড়া রুক্ষ চুলের রাশি বাম হস্তে পশ্চাতে সরাইয়া দিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল।

করুণাময়ী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন। মনীশ সত্য অদূরে দাঁড়াইয়া ছিল, তিনি নিকটে আসিতে তাহারা চলিতে আরম্ভ করিল, সত্য কহিল "মা ওরা বাঙ্গালী না?"

"হাঁ" বলিয়া করুণাময়ী মনীশের দিকে ফিরিয়া কহিলেন "আহা দেখলে বুক ফেটে যায়, এমন রূপের ডালি মেয়ে পয়সার অভাবে বর জুটচে না। তোদের বন্ধু টন্দু কেউ নেই রে মনীশ যে দয়া করে বিনিপনে এই মেয়েটিকে বিয়ে করে?"

খুড়িমার আকস্মিক করুণা দেখিয়া মনীশ ঈষৎ হাসিল। পৃথিবীময় যে দুঃখ-দারিদ্র্য ছড়ান রহিয়াছে তাহার একটি ক্ষুদ্র অংশ দেখিয়াই সহসা ভাবাবেগে ব্যাকুল হইলে চলিবে কেন? যে অভাব সমাজগত তাহাকে ব্যক্তিগতভাবে সহায়তা করিলে কতটুকুই বা সাহায্য করা ঘটে? সে উত্তর করিল "বন্ধু থাকবে না কেন, বিনাপনে বিয়ে কর্ব্বার মত বন্ধু তো বড় একটা চোখে পড়ে না। তাছাড়া খুড়িমা যার বিয়ে দিচ্চো সে ব্রাহ্মণ কি কায়স্থ তার কি কিছু খবর নিয়েছ?"

করুণাময়ী ঘোর অপ্রতিভ হইয়া জিব্ কাটিয়া কহিলেন "ওরে তাতো জিজ্ঞেস করিনি!"

(১৬)

খাঁচার পাখীতে ও আকাশের পাখীতে যতটুকু প্রভেদ গৃহবাসিনী ও তীর্থচারিণী বঙ্গনারীতে ঠিক তেমনিতর একটা ভেদ আছে। গৃহে তাঁহার চিন্তা ও কার্য্য গৃহধর্ম্মের ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া জীবন যাত্রার উপযোগী করিয়াই কেবল মাত্র তাহা গঠিত হইতে থাকে; কিন্তু আজ গৃহের বাহিরে সেই চিরজীবনের অভিজ্ঞতাটুকু লইয়া নিজেকে সন্তুষ্ট রাখা কোন মতেই চলে না।

যে সন্ধ্যায় কমলার পিতামহীর সহিত করুণাময়ীর সাক্ষাৎ হইয়াছিল তাহার পরদিন অতি প্রত্যূষে শয্যা ছাড়িয়া তিনি যখন কাপড় গামছা লইয়া দাসীর সঙ্গে ঘাটের দিকে চলিলেন, তখন অস্পষ্ট অন্ধকারের জাল ছাড়াইয়া সূর্য্যের প্রথম রশ্মিচ্ছটা পৃথিবীর বক্ষে নামিয়া আসিবার জন্য পথ খুঁজিয়া ফিরিতেছে, পাখীগুলা তখনও জাগিয়া উঠে নাই কিন্তু চঞ্চলগতি বানরের দল জাগিয়া উঠিয়া পথে ও প্রাচীরে বাহির হইয়া কাহার কোন ক্ষতি করিয়া প্রাভাতিক কার্য্যারম্ভ

করিবে তাহাই ভাবিতেছে। দেবমন্দিরে ভোরের নহবতে ভৈরবীর আলাপ আরম্ভ হওয়ায় সত্তজাগ্রত চিত্ত আনন্দ রস পানে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছিল। গঙ্গাতীরে যতি ব্রহ্মচারীগণের স্নানার্চ্চনা শেষ হইয়া আসিয়াছে। মধ্যে মধ্যে কোন অন্ধকারে অস্পষ্ট প্রায় মূর্ত্তির উচ্চারিত গম্ভীর "ব্যোম—ব্যোম্! ধ্বনি সভক্তি বিস্ময়ে সহসা শ্রোতাকে চমকিত করিয়া তুলিতেছিল।

করুণাময়ী ঘাটে আসিয়া জলের ধারে দাঁড়াইয়া একবার প্রত্যাশিত নেত্রে চারিধারে চাহিয়া দেখিলেন ও হতাশ দৃষ্টি ফিরাইয়া লইলেন। বৃদ্ধার কাহিনী হইতে প্রতি প্রত্যূষে তাঁহাদের গঙ্গাতীরে দেখিতে পাইবার আশাকে তিনি মনে স্থান দিয়াছিলেন, কিন্তু দেখিতে পাইলেন না। জলের উপরে তখন দিবসের প্রথম প্রাণস্পন্দনের মত তরুণ সূর্য্যের জ্যোতির্ব্বিম্ব ঈষৎ কম্পিত হইয়া উঠিয়াছে, ঘাটের অদূরে তুলসীর মন্দিরে ঠং ঠং করিয়া ঘণ্টা কাঁসর সঘনে বাজিয়া উঠিয়া অনেক নিদ্রামগ্নের নিদ্রাভঙ্গ করিয়া দিল। তীরের ঢেউগুলি সেইমাত্র ঘুমভাঙ্গিয়া জাগিয়া উঠিয়া মৃদুকাকলীতে বিশ্বেশ্বরের বন্দনা গীত গাহিতে আরম্ভ করিল, আকাশের বিরাট স্তব্ধতাকে আঘাত করিয়া ক্ষণে ক্ষণে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছিল, "ব্যোম্—ব্যোম্!"

স্নানপূজা সারা হইলে সিক্ত বস্ত্র দাসীর হস্তে দিয়া করুণাময়ী উপরে উঠিয়া জগন্নাথ দর্শনে গিয়া রুদ্ধদ্বারের নিকট হইতে ফিরিবার সময় হঠাৎ শুনিতে পাইলেন একটুখানি পাশের দিক হইতে কে বলিতেছে "হাঁ জগন্নাথ কাঙ্গাল দেখে কি তোমারও দোর বন্ধ হলো!"

তিনি চমকিয়া উঠিলেন,—এ আক্ষেপ পিতামহীর না! বড় কষ্ট বোধ হইল। কষ্টে দুঃখে মানুষটা একেবারে জগৎ ও জগদতীত সবারি উপর বিশ্বাসহীন হইয়া গিয়াছে।

অগ্রসর হইয়া কহিলেন "আসুন না আমরা এইখানে একটু বসি এখনি দরজা খোলা হবে।" তিনি দেখিলেন রাত্রের সেই বৃদ্ধা ও তাঁহার নাতিনী একটি ঘটিতে জল লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। মেয়েটি ঠাকুরমার হাত ধরিয়াছিল, বৃদ্ধা প্রায় দৃষ্টিহীন।

তাঁহার কথার সাড়া পাইয়া বৃদ্ধাও তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন, শব্দানুসারে মুখ ফিরাইয়া ব্যগ্রকণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন "হ্যাঁগা তুমি আমার কালকের সেই মা বুঝি? ওমা তুমি এ হতভাগীকে এখনও ভোলনি?"

কৃতজ্ঞতায় আনন্দে স্বর জড়াইয়া আসিতেছিল। করুণাময়ী নিকটে আসিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনারা?"

"ব্রাহ্মণ—মা"। করুণাময়ী তাঁহাকে প্রণাম করিলেন দেখিয়া মেয়েটিও নত হইয়া তাঁহার পদধূলি লইয়া মস্তকে দিল। করুণাময়ী বিমুগ্ধ নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিলেন, মনের সহিত আশীর্ব্বাদ করিলেন "রাজরাণী হও।"

বৃদ্ধা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন 'এই বলো মা যেন আমার পোয়া সিন্দুর পরে মনের সুখে থাকতে পায়, আর আমার কিছু আশা নাই।

করুণাময়ী কমলার সদ্যোস্নানসিক্ত কেশের উপর করুণাপূর্ণভাবে হাতখানি রাখিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিলেন "আহা মা আমার সাক্ষাৎ

লক্ষ্মী প্রতিমা, আমি বলচি তোমার ভাল হবে মা।"

"মাগো, তুই তাই বল্ মা তাই বল্!" বৃদ্ধা কম্পিতহস্তে করুণাময়ীর হাত ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। কমলাও ঠাকুরমার ক্রন্দনে ঈষৎ আর্দ্রপ্রায় চক্ষু নত করিল। করুণাময়ী যে অতখানি জোরের সঙ্গে ওই কথা কয়টি উচ্চারণ করিয়াছিলেন তাহা যেন তাঁহার কেবল মাত্র নারীহৃদয়ের স্বাভাবিক করুণামথিত সান্ত্বনাবাক্য নহে, তাহা যেন তাঁহার সমস্ত অন্তঃকরণ হইতে নিঃসৃত মানবাত্মার গভীর শক্তিপূত একটি কল্যাণমন্ত্রস্বরূপ উচ্চারিত হইয়াছিল, তাই শ্রোতাকে এতখানি বিচলিত করিয়া তুলিল। একই বীণা, একই বাঁশি হাতের গুণে যেমন লোকের চিত্তে আনন্দ ও বিরক্তি আনয়ন করিতে সক্ষম হয়, তেমনি একটি অতি ক্ষুদ্র কার্য্য বা বাক্য সময়ের প্রভেদে সুরের বিভিন্নতায় সহসা কোন এক সময়ে যেন জগতের মধ্যে সব চেয়ে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া বসে, এবং তাহার যাদুমন্ত্র প্রভাব দ্বারা একেবারে মনকে আবদ্ধ করিয়া ফেলে।

নরসিংহ দেবতার দ্বারের নিকট বসিয়া বৃদ্ধা তাঁহার নিজের কাহিনী সেদিন সেই প্রাণখোলা সহানুভূতিটুকুর বিনিময়ে সহানুভূতি-কারিণীর নিকট নিবেদন করিয়া দিলেন। তিনি কহিলেন "দেখ মা, আমাকে এখন তুমি যে রকম দেখছ আমার অবস্থা, চিরদিন ধরে এ রকম ছিল না। এখন আমার সংসার যেমনি শ্মশান হয়ে গ্যাছে, প্রাণের ভিতরও ঠিক এম্‌নি জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়েছে। কিন্তু এই সর্ব্বনাশী আমিই আবার একদিন স্বামী পুত্র নিয়ে সর্ব্বসুখী ছিলাম। সংসারের সুখ যে পদ্মপাতার জলের মতন টল টল করচে আমার কপালই তার দৃষ্টান্ত!

"স্বরূপপুর কোথায় তুমি জানো? সেই স্বরূপপুরে আমার শ্বশুর বাড়ী। শ্বশুরের পূজোর দালানে মায়ের প্রতিমা কোন বছর বাদ পড়তো না, কালী পূজোর খুব ঘটা বছর বছর হয়েছে, সে সব এক দিনই গ্যাছে মা, সে সব এখন আমার স্বপন! দেখ বাছা দুঃখ সহ্য হয় কিন্তু দুঃখের মধ্যে সেই সব মহাসুখের কথাগুলোই যেন আরও অসহ্য। ভগবান দুঃখ দিলেন, দিলেন—চিরকালই কেন এম্‌নি দুঃখী করে জন্ম দিলেন না। এই ত চারি ধারে দেখি কত কত অনাথ আতুর হাসচে কাঁদচে, আমি ও না হয় ওদেরি সঙ্গে ওই রকম করে মিশে যেতাম! বুকে এমন শেল বিঁধে থাকত না, লজ্জা ঘেন্নায় এত মাটি করত না, তা হলে ত 'রাধে কৃষ্ণ!' বলে দরকার হলে দু'দোরে দু'মুঠো 'মেগে পেতে'ও এনে দিন গুজরান করতে পারতুম! হ্যাঁ বলছিলাম এখন—আমার শ্বশুর বাড়ীর কথা, শ্বশুর দেশের মধ্যে একজন প্রধান লোক ছিলেন, গাঁয়ের মাথা বল্লেই হয়। এখন যেমন লোকে এক কথায় আদালতে ছোটে আমার ঠাকুরের আমলে তা ছিল না, যার যা নালিশ 'ফরেদ' সব তাঁর কাছে; তিনি পাঁচজন ভদ্র লোক ডেকে যা বিচার করে দিতেন, জজের হুকুমের মতন সেই হুকুম দু পক্ষ শিরোধার্য্য করে নিত, এতে কারু একটি 'ট্যাঁ ফোঁ' করবার যো ছিল না, এমনি তাঁর মান।

"এদিকে আবার সত্তর বিঘে জমী নিয়ে

বাগান বাগ্‌চে, হেন বস্তু নেই যা সেখানে জন্মায় না। মর্ত্তমান কলা থেকে আম কাঁঠাল ইস্তক যত রকম তরি তরকারি আছে কথনও একটা পয়সা খরচ করে কিনে পাড়াপড়সীতে খায়নি। বড় বড় ধানের মরাই বাঁধা, আখের সময় সমবচ্ছরের গুড় মটকি ভরে ভরে মুখে ওলোপ দিয়ে রাখা হত। কতই আর বলব মা, তেঁতুল কাটা, হলুদ সিদ্ধ, নারকেল বাছা, ডাল পাছড়ানো—বউ ঝির আর কারুর এক নিমেষ বিশ্রাম ছিল না। এক এক সময় এমন গেছে যে এক পিঠ 'রুয়ে এক পিঠ ভুঁয়ে' সারারাত কোথা দিয়ে কেটে গ্যাছে, কাজে কর্ম্মে পাঁচটা সমবয়সীতে মিলে হাসতে খেলতে তা টেরও পাইনি। হায় রে, কোথায়ই বা যায়!"

বৃদ্ধা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, বোধ হয় তাঁহার চিত্ত তথনও বাহ্ জগৎ ত্যাগ করিয়া যেথানে চিত্তগুদামের অভ্যন্তরে তাঁহার পুরাতন স্মৃতিগুলি ধ্বংসাবশেষ স্তূপাকারে জমা করা পড়িয়া আছে সেইথানেই প্রবেশ করিয়াছিল। করুণাময়ী একবার কমলার দিকে চাহিলেন – চক্ষু দুইটি আনত করিয়া সে একটা ঢিল কুড়াইয়া মন্দির চত্বরে আনমনে কি চিত্র করিতেছে। তিনি সহসা চোথ ফিরাইয়া লইতে পারিলেন না। ওই যে চম্পককলিকাতুলা অঙ্গুলিগুলি প্রস্তর খণ্ডে রেখা টানিতেছে উহার উল্টা পিঠে বিধাতাও কি অমনি অর্থহীন রেখা টানিয়া দিয়াছেন? চন্দ্রার্দ্ধবৎ ললাটপটটুকু অত সুন্দর, অত নির্ম্মল, ভিতরে না জানি কি লিখনই বিধাতা পুরুষের অবিচল হস্তে লিখিত হইয়াছে! আহা হাত কি একটু কাঁপে নাই? কমলার মুখে একটা প্রচ্ছন্ন অপ্রসন্নতার ছায়া পড়িয়াছিল, যাহার তাহার নিকট নিজেদের কথা প্রকাশ করিয়া গোটাকয়েক 'আহা!' শব্দ শুনিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলিয়া তাহার মনে হয় না, ঠাকুরমার এই ব্যবহার তাহার নিকট নিতান্ত বিসদৃশ ঠেকে।

এই সময় সহসা মন্দিরের সেবকগণের দ্বারা কৃত একটা শব্দে বৃদ্ধা সহসা সচকিত হইয়া কহিয়া উঠিলেন 'এই দেখ, সেই সব কথা বলতে বলতে সব ভুলে গেছলাম! তারপর, হ্যাঁ, স্বামীও আমার খুব ভাল ছিলেন, কিন্তু বিষয়বুদ্ধি তাঁর মোটে ছিল না। তাঁর আমলেই আমার কপাল ভাঙ্গার সুরু হলো। তিনি যথন মারা গেলেন ছেলের মাথায় রাজ্যের দেনা চাপিয়ে রেখে গেছেন বলে প্রথম আমরা জানতে পারলাম! বিষয় সব পাঁচ সরিকে ঠকিয়ে থাচ্ছিল, আদায় উসুল হয় না, বরাবর ধারের উপরেই এতবড় সংসার চলে এসেছে। তারপর বাছাও আমাকে বজ্রের শোক দিয়ে চলে গেল। ...স্বামীহারা পুত্রহীনা হয়েও শুধু এই গুঁড়ো দুটি নিয়ে জগতে ছিলুম, মনে করে-ছিলুম আমার নিখিলের বউ বেটা নিয়ে কমলার বর এনে সকল কষ্ট বিস্মরণ হব। বড় আশা করে দুটিকে নিয়ে যেথানে যা ছিল বেচে কিনে কলকাতায় চলে এসেছিলাম, বাছা আমার একটা পাশ করে ডাক্তারি পড়তে গেলেন, দুবছর ডাক্তারিও করে অভাগিনীকে আশার সপ্তম স্বর্গে তুলে একেবারে অন্ধকার অন্ধকূপের মধ্যে আছড়ে ফেলে দিয়ে পাঁচ দিনের রোগে সোণার

গোপাল আমার চলে গেলেন, আমার সব ফুরিয়ে গেল।"

এবার শোকসন্তপ্তা বৃদ্ধা ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন "ওরে এত দুঃখেও এ বুক ফাটেনা রে! এমন কঠিন প্রাণ নিয়েও জন্মে ছিলাম!"

দুঃখের কাহিনী শুনিতে শুনিতে করুণ-হৃদয়া করুণাময়ীর চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল। তিনি বৃদ্ধাকে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিয়া একটু কৃতকার্য্য হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন "কমলার মামার বাড়ীতে কেউ নাই?" বৃদ্ধা কহিলেন "মেয়ের বরাত সকল দিকেই টন্‌টনে। এক মামা আছে কিন্তু কোথায় আছে তা জানিনে, কখনও খোঁজ খবর করে না। যদি তাঁহাকে সন্ধান করিয়া বাহির করা যায় এই আশায় করুণাময়ী জিজ্ঞাসা করিলেন "মামার নাম কি?" "কালী চাটুয্যে, ত্রিবেণীতে বাড়ী ছিল—"

"কমলার মার নাম?—" "নারায়ণী"। করুণাময়ীর সমস্ত শরীরে আনন্দের তাড়িৎ খেলিয়া গেল। বিস্মিতা কমলাকে কোলের কাছে টানিয়া বলিয়া উঠিলেন "সইএর মেয়ে! নারায়ণী আমার সই ছিলেন, আমারও বাপের বাড়ী ত্রিবেণীতে।"

অভাবনীয় সাক্ষাতের হর্ষবিষাদের উচ্ছ্বাস থামিয়া আসিলে করুণাময়ী কমলার হাত ধরিয়া কহিলেন "আর ত তোমাকে ছেড়ে দেবোনা। মা তোমাকেও এইবার মেয়ের বাড়ী যেতে হচ্চে"। বৃদ্ধা অজস্র আশীর্ব্বাদ করিতেছিলেন, শেষে কহিলেন "কমলা ত তোমারি,—মা তুমি ওকে নিয়ে যাও আমি—"

"ওমা সে কি হয়?" বলিয়া করুণাময়ী বৃদ্ধার হাত ধরিলেন। "কাশী স্থান বলে আপনি মনে দ্বিধা করচেন? আপনার লোকের কাছে কাশীতে দোষ হয় না। কেন মা কমল, তুমি অত কুণ্ঠিত হচ্চো কেন? আমি যে আজ থেকে তোমার মা হলুম, আমার কাছে যাবেনা মা?" এই বলিয়া তিনি অনিচ্ছুকভাবে দণ্ডায়মান কমলাকে বাহু দ্বারা বেষ্টন করিলেন। হায় মা! কি মধুর এই মা নাম! অভাগিনী কমলা ত কখনও মা দেখে নাই সে এই মাতৃহৃদয়ের উত্তপ্ত স্নেহধারা হইতে কেমন করিয়া তাহার স্নেহ বুভুক্ষিত শুষ্ক চিত্তকে বঞ্চিত করিবে? এই আদর মাখা হাতখানির মঙ্গল স্পর্শ হইতে কি আপনাকে দূরে সরাইয়া লওয়া যায়? মরুভূমির বিশাল রুদ্র প্রান্তরে যে শীতল নির্ঝর বারি তাহার পিপাসিত কণ্ঠ আর্দ্র করিতে সাগ্রহে আহ্বান করিতেছিল তাহাকে সে আর প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না। তাহার দারিদ্র্য ক্লেশোত্থিত গরলরূপী গর্ব্ব দূরে সরাইয়া স্নেহার্থী বালিকার হৃদয়খানি নীরবে বাহির হইয়া আসিয়া যেন সেই স্নেহময়ীর মাতৃঅঙ্কে ঝাঁপাইয়া পড়িতে গেল। সে মৃদুস্বরে কোন মতে উত্তর করিল "মা আমি আপনার কাছেই যাবো।" বলিতে বলিতে সহসা তাহার নত নেত্র হইতে ঝর ঝর করিয়া বিন্দুর পর বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টির পর আজ বড় অনুকূল মেঘ উঠিয়াছিল।

করুণাময়ী নিজের আঁচলে সখিপুত্রীর নেত্র মুছাইয়া দিয়া স্বয়ং অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন "কেঁদো না মা, আমি তোমায় বুকে করে রাখবো।" কমলা চকিত নেত্রে একবার তাঁহার মুখের দিকে চাহিল, একটা অননুভূত-

পূর্ব্ব আনন্দের স্রোত তাহার শিরা উপশিরা গুলার মধ্য দিয়া চলন্ত শোণিত স্রোতের সহিত সহসা তড়িৎ বেগে বহিয়া গেল। কে বলে দরিদ্রের প্রতি ভগবানের দয়া নাই! এই ত করুণামণ্ডিতা মাতৃরূপে তিনি তাহাদের ভীষণ দারিদ্র্য হইতে রক্ষা করিতে আসিলেন। একটা নির্ভরতাভরা শীতল আশ্বাসে তাহার প্রাণ জুড়াইয়া আসিল।

(ক্রমশঃ)

ব্রতমন্ত্র

(৩)

যম-পুকুর-ব্রত

এই ব্রত বাংলার প্রায় অনেক স্থানে প্রচলিত আছে। এই ব্রত আশ্বিন মাসের সংক্রান্তির দিন হইতে আরম্ভ করিয়া কার্ত্তিক মাসের সংক্রান্তির দিন পর্য্যন্ত করিতে হয়। এই ব্রত চারি বৎসর করা নিয়ম। আশ্বিন মাসের সংক্রান্তির দিন সকাল বেলা ব্রতকারিণী একটী চারকোণা গর্ত্ত করিয়া তাহার চারদিকে পাঁচ রকম কলাই (মুগ, মাসকলাই, ছোলা, প্রভৃতি) ছড়াইয়া দেয়। গর্ত্তের মধ্যে কলা গাছ, কালকচু ও সাদাকচুর গাছ, ধানগাছ, কল্মীশাক, শুশ্‌নিশাক এবং মাটির নির্ম্মিত হাঙ্গর, কুম্ভীর, কুঁচে, কচ্ছপ রাখিয়া দেয়। পুকুরের (গর্ত্তের) চারিকোণে চারটী সুপারি, চারখানি হলুদ এবং চারটী ঘেঁচিকড়ি রাখিয়া দেয়। চারিধারে চারিটা করিয়া ষোলটা মাটীর পুতুল বসাইয়া দেয়, কাটি পুঁতিয়া উহার উপরে চিলে, টিলে, কাগা, বগা বসাইয়া দেয়। এককোণে একটা প্রদীপ জালিয়া রাখে। তৎপরে পূজা করিতে বসে।

"ধান, মান, কলা, কচু, হলুদায় নমঃ"

এই বলিয়া একটী ফুল ঐ গর্ত্তের মধ্যে ফেলিয়া দেয়। এই রকম তিনবার করে।

তারপর গত ভাদ্র সংখ্যা "ভারতীতে" প্রকাশিত "যমপুকুর ব্রতের" ছড়াটী বলিয়া আবার একটী ফুল ঐ গর্ত্তের মধ্যে ফেলিয়া দেয়। ইহাও তিনবার করে।

তাহার পরে নিম্নলিখিত ছড়াগুলি বলে :—

যমরাজ, সাক্ষী থেকো যমপুকুরটী করি।
যমা গোদার মা, সাক্ষী থেকো যমপুকুরটী করি॥
মেচো, মেচুনী, সাক্ষী থেকো যমপুকুরটী করি।
ধোপা, ধোপানী, সাক্ষী থেকো যমপুকুরটী করি॥
হাঙ্গর, কুমীর, সাক্ষী থেকো যমপুকুরটী করি।
চিলে, টিলে, সাক্ষী থেকো যমপুকুরটী করি॥
কাগা, বগা, সাক্ষী থেকো যমপুকুরটী করি।
কুঁচে, কচ্ছপ, সাক্ষী থেকো যমপুকুরটী করি॥

তৎপরে নীচের ছড়াটী বলিয়া একঘটী জল ঐ গর্ত্তের মধ্যে ঢালিয়া দেয়।

এ ঘাটটি কার? বাপ মার।
এ ঘাটটি কার? শ্বশুর শাশুড়ীর॥
এ ঘাটটি কার? পাড়া প্রতিবাসীর।
এ ঘাটটী কার? স্বামীর আর আমার॥
এ পুকুরটি কি—
ভাগ্যবতী পূজে জল ঘটীটি দি!

তৎপরে নিম্নলিখিত ছড়াটী বলিয়া নমস্কার করে।

যমরাজ ধর্ম্মরাজ এই বর চাই।
তোমার তাড়না হ'তে যেন মুক্তি পাই॥

তুঁষ্ তুষুলি ব্রত

এই ব্রত ব্রাহ্মণ বালিকাদিগের মধ্যেই বেশী প্রচলিত। এই ব্রত অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তির দিন হইতে আরম্ভ করিয়া পৌষ মাসের সংক্রান্তির দিন পর্য্যন্ত করিতে হয়। এই ব্রতও চারি বৎসর করিতে হয়।

দুর্ব্বা, নূতন আতপ চাউলের তুঁষ, এবং কাল গাই গরুর গোবর, এই তিনটী এক সঙ্গে মাখিয়া ছয় বুড়ি ছয়গণ্ডা (১৪৪টা) গোলা করে। প্রতিদিন চারিটা করিয়া ঐ গোলা মাটিতে রাখিয়া তাহার উপরে সরিষার ফুল দেয়। তৎপরে ঐ গোলাগুলি হাত দিয়া ধরিয়া নিম্নলিখিত ছড়াটী বলে। (১)

"তুঁষ্ তুষুলি তুমি কে ?
তোমার পূজা করে যে,
ধনে ধানে বাড় বাড়ন্ত,
সুখে থাকে আদি অন্ত।
গাইএর গোবর সরিষার ফুল,
আসন পিঁড়ি হ'য়ে ব'সে এলো ক'রে চুল;
পূজা করি মনের সুখে,
স্বর্গ থেকে গৌরী দেখে।
তুঁষুলি গো রাই, তুঁষুলি গো ভাই,
তোমার দৌলতে আমি ছ'বুড়ি ছ'গণ্ডা খাই;
মনের সুখেতে যেন সারা জীবনটা কাটাই।
ঘর করবো নগরে, মরব গিয়ে সাগরে,
জন্মাব উত্তম ব্রাহ্মণের কুলে।"

পূজা অন্তে নীচের ছড়াটী বলিয়া নমস্কার করে।

গৌরী গো মা তোমার কাছে মাগি এইবর।
স্বামী পুত্র নিয়ে যেন সুখে করি ঘর॥

পৌষ মাসের সংক্রান্তির পূজা শেষ করিয়া ঐ ছয়বুড়ি ছয়গণ্ডা গোলা একটা মালসায় রাখিয়া তাহাতে আগুন দিয়া রাখে। পরে ছয় বুড়ি ছয় গণ্ডা পিটে প্রস্তুত করিয়া খাইবার সময় ঐ মালসা আপনার পশ্চাতে রাখিয়া দেয়। (পূর্ব্বেকার কথা বলিতে পারি না—কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ব্রতকারিণী নিজেই ঐ ছয় বুড়ি ছয় গণ্ডা পিটে খায় না—সকলেই খায়!) খাওয়া শেষ হইলে পর নিম্নলিখিত ছড়াটী বলিয়া ঐ মালসাটী নদী কিম্বা পুষ্করিণীতে ভাসাইয়া দেয়।

তুঁষ তুষলি গেল ভেসে
বাপ মার ধন এলো হেসে।
তুঁষ তুষুলি গেল ভেসে,
শ্বশুর শাশুড়ীর ধন এলো হেসে।
তুঁষ তুবুলি গেল ভেসে,
আমার স্বামীর—ধন এলো হেসে।

অশ্বত্থ পাতার ব্রত

এই ব্রত সর্ব্বশ্রেণীর বালিকাদিগের মধ্যেই চলিত আছে। এইব্রত চৈত্র মাসের সংক্রান্তির দিন হইতে আরম্ভ করিয়া বৈশাখ মাসের সংক্রান্তি পর্য্যন্ত করিতে হয়। এই ব্রত চারি বৎসর করা নিয়ম। ব্রতকারিণীরা প্রত্যহ ১টী কাঁচা, ১টী পাকা, ১টী কচি, ১টী শুক্‌নো, আর একটী ঝুরঝুরে ছেঁড়া এই পাঁচটী অশ্বত্থ পাতা লইয়া নদীতে—অভাবে পুষ্করিণীতে স্নান করে।

স্নানের পূর্ব্বে নিম্নলিখিত ছড়াটী বলে :—

অশ্বত্থ পাতা কুঞ্জলতা,
শ্যামা পণ্ডিতের ঝি।
সাত বেটা যায় সাত ঘোড়ায়
সাত বৌ যায় সাত দোলায়,

(১) কেবল শনি মঙ্গলবারে ছয়টা করিয়া গোলা দেয়।

কর্ত্তা যান দেব হস্তিতে,
গিন্নি যান রত্ন সিংহাসনে.
ঠাকুর ঠাক্‌রুণ যান দোলনে।

কেহ কেহ আবার এইরূপ ভাবে উক্ত ছড়াটী আরম্ভ করে ঃ—

"চাকুন্দে সুন্দরীর কন্যা,
শ্যামা পণ্ডিতের ঝি।" প্রভৃতি।

স্বর্গ হ'তে মহাদেব বলেন, গৌরীগো নরলোক কি ব্রত করে? অশ্বত্থ নারায়ণ ব্রত করে। এ ব্রত ক'ল্লে কি হয়?

পাকা পাতাটি মাথায় দিয়ে নাইলে
পাকা চুলে সিন্দূর পরে।
কাঁচা পাতাটি মাথায় দিয়ে নাইলে
কাঁচা সোনার বর্ণ হয়।
শুক্‌নো পাতাটি মাথায় দিয়ে নাইলে
সুখ সম্পত্তি বৃদ্ধি হয়।
ঝুরঝুরে পাতাটি মাথায় দিয়ে নাইলে
মণিমুক্তার ঝুড়ি পায়,
কচি পাতাটি মাথায় দিয়ে নাইলে
কমল পুত্র কোলে পায়।
উড়াইতে পারিলে ইন্দ্রের শচী হয়;
না পারিলে কৃষ্ণের দাসী হয়।

এক একটী করিয়া পাতা মাথায় দিয়া ডুব দিবার সময় সেই সেই পাতার ছড়াটী বলে।

শ্রীমতী রেণুকাবালা দাসী।

চীনে প্রজাতন্ত্র

১

ষোল বৎসরের পূর্ব্বের কথা হইলেও একটা জাতির উন্নতি অবনতির সহিত সম্বন্ধ এই সময়কে মোটেই দীর্ঘকাল বলা চলে না। এই অনতিদীর্ঘকাল পূর্ব্বে চীনবাসী কুসংস্কার ও নিশ্চেষ্টতার কুয়াসা আঁধারে জগৎ সমক্ষে আপনার অস্তিত্ব হারাইয়া বসিয়াছিল। এতবড় একটা সাম্রাজ্য এত অসংখ্য অধিবাসী বৈচিত্র্যময় কালের কবলে একেবারে নিদ্রিত—জাগরণের এতটুকু সম্ভাবনা সেখানে ছিল না।

যে সময়ের কথা বলিতেছিলাম তখন চীনের সহিত জাপানের তুমুল যুদ্ধ বাধিয়াছে। এই মহাসমর চীনবাসীদের ভিতর এমন একটা জাগরণ আনিয়া দিল—যাহার শুভ ফল এই অত্যল্পকাল মধ্যেই ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। দীর্ঘকালের কুসংস্কার ও নিশ্চেষ্টতা ধৌত করিয়া আজ শরতের আকাশ প্রীতিমধুর মনোরম সৌন্দর্য্য লইয়া উপস্থিত হইয়াছে—কুসংস্কারের সংস্কার হইতেছে এবং নিশ্চেষ্টতার স্থলে কর্ম্মপ্রবণতা দেখা দিয়াছে। বিগত রুষ জাপান যুদ্ধে জাপানীদের আলৌকিক বীরত্ব দেখিয়া দেশবাসী মুগ্ধ হইয়াছেন প্রত্যেকের হৃদয় কার্য্যকারিতার বন্যায় প্লাবিত হইয়াছে। চীনের সহিত জাপানের যুদ্ধ হইয়া যাওয়ার পরই চীনাগণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন—এত বড় সাম্রাজ্য ও কোটী কোটী জনসংখ্যার অনুপাতে তাঁহাদের শক্তি কত অল্প। এবার রুষ জাপান যুদ্ধ তাহাদিগকে একটা বড় রকমের শিক্ষা দিয়া গেল; তাহারা বুঝিতে পারিলেন অতি ক্ষুদ্র রাজ্যও শক্তি সাধনার বলে বড় বড় সাম্রাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে এবং সুশিক্ষিত মুষ্টিমেয় সৈন্যও রাশি রাশি অশিক্ষিত সৈন্যকে অবলীলাক্রমে পরাজিত করিতে পারে। তাহারা বুঝিতে পারিলেন—শক্তিলাভ সাধনাসাপেক্ষ এবং নিশ্চেষ্টতার ফলে এত বড় চীন সাম্রাজ্যও একদিন ধ্বংসের মুখে পতিত হইতে পারে। সেই সময় হইতে কয়েকজন দেশহিতৈষী অক্লান্ত পরিশ্রমে দেশের দৈন্য মোচনে প্রবৃত্ত হন। তাহারই ফলে আজ এই অত্যল্পকাল মধ্যে চীনে এত বড় একটা পরিবর্ত্তনের ঢেউ বহিয়া যাইতেছে। প্রত্যেক চীনবাসী আজ গর্ব্ব ভরে বলিয়া থাকেন "চীনদেশ—চীনবাসীদেরই।" এই এতটুকু বাক্য কত বড় আত্মনির্ভরতা ও চেতনার পরিচায়ক—আজ আমরা সে পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়াছি। রাষ্ট্রবিপ্লব-

কারীগণ চীনের বর্ত্তমান রাজবংশ নিলোপ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে প্রজাতন্ত্রশাসনপদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করিতে সংকল্প করিয়াছেন। তাহাদের কার্য্যক্ষমতা দেখিয়া সকলেই বিস্মিত।

এই বিপ্লবের নেতাদের প্রচেষ্টা কতদূর কার্য্যকারী হইবে তাহা বলা কঠিন। অবশ্য সকলেরই বিশ্বাস বিপ্লব-কারীগণের স্বদেশহিতৈষিতা, একপ্রাণতা ও অধ্যবসায় কখনও ব্যর্থ হইবার নয়। যদি তাহাদের অধ্যবসায় সমান থাকে—যদি তাহাদের সৈন্যবল যথেষ্ট শক্তি সম্পন্ন হয় এবং যদি তাহাদের উৎসাহ ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে থাকে তবে তাহাদের প্রতিরোধ অসম্ভব। যাহা হউক এখন পর্য্যন্ত চীনের ভবিষ্যৎ আমাদের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায় এক একটা জাতির সামাজিক ব্যবস্থার সহিত শাসন সংক্রান্ত ব্যবস্থার বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে। সুতরাং দীর্ঘকাল ধরিয়া একরূপ সমাজের অধীনে বাস করায় তাহাদের স্বভাব যেরূপ ভাবে গঠিত হইয়াছে তাহাতে প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী তাহাদিগের সহ্য হইবে কি না—স্বভাবের সহিত মিশিবে কিনা তাহাও ভাবিবার বিষয়। বিশেষতঃ এ পর্য্যন্ত রাজকীয় সৈন্যের সহিত বিপ্লবকারী-দের যুদ্ধের কোনও মীমাংসা হয় নাই। এখনও কোনও কোনও প্রদেশের সৈন্যদের মেজাজ অবগত হওয়া যায় নাই। তাহারা রাজতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্রের পক্ষপাতী তাহাও অজ্ঞাত।

এই রাষ্ট্রবিপ্লবের কতকগুলি কারণ নির্ণীত হইয়াছে। প্রথমতঃ সাম্রাজ্যরক্ষায় বর্ত্তমান মাঞ্চুবংশীয় সম্রাটের অপারগতা। সম্রাট মোটেই রাজ্যরক্ষা করিতে পারিতেছিলেন না, ক্রমে ক্রমে এক একটি প্রদেশ সম্রাজচ্যুত হইয়া বিদেশীগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইতেছিল। গ্রেট ব্রিটেন্, ফ্রান্স, জাপান ও জার্ম্মাণী ক্রমে ক্রমে চীন সাম্রাজ্য হইতে অনেকগুলি প্রদেশ অধিকার করিয়া নেন। এরূপ অঙ্গচ্ছেদ চীনবাসীরা সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না। পুনঃ পুনঃ আক্রমণ ও পরাজয়ে তাহাদের মনে দারুণ বেদনা লাগিতেছিল। যিনি সম্রাট যাহাকে তাহারা দেবতা বলিয়া পূজা করিবে যাহার শক্তির উপর তাহাদের সুখ শান্তি নির্ভর করিবে তিনি শক্তিহীন! যাহার প্রতাপে শত্রুগণ সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকিবে তিনি নিজেই বারবার শত্রুভয়ে পলায়ন করিতেছেন। প্রজাগণ দেখিয়া শুনিয়া শ্রদ্ধা হারাই-তেছিল। লোকের অবিশ্বাস ও সন্দেহ ক্রমে এই সব কারণে ঘনীভূত হইল। সকলে কানাঘুষা করিতে লাগিল—মাঞ্চুবংশ চীনে রাজত্ব করিবার সম্পূর্ণ অযোগ্য। চীনের হিতৈষীগন দেশের দুরবস্থা বুঝিতে পারিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। ভবিষ্যতে চীনে বৈদেশিক প্রভাব বিস্তৃত হইতে পারে ভাবিয়া তাঁহারা সন্ত্রস্ত হইলেন। এখনও তাহারা চেষ্টা করিতে পারেন, বৈদেশিক আক্রমণ হইতে চীনকে রক্ষা করিবার এখনও সময় আছে। কিন্তু একবার যদি চীন বৈদেশিকের করায়ত্ব হয় তবে বহুদিবসের চেষ্টাতেও আর চীনের মুক্তিলাভের আশা নাই। অধীনতা শৃঙ্খলে একবার বাঁধা পড়িলে সে শৃঙ্খল কাটিয়া ফেলা বড় কঠিন! চীনাগণ এ সমস্তই অনুমান করিতে পারিলেন।

এক একটী প্রদেশ জয় করিবার পর বিজেতাগণ যে পরিমাণ অর্থ চীন গবর্ণমেণ্টের নিকট দাবী করিতেন সে অর্থ সমস্তই প্রজাদিগের নিকট হইতে শোষণ করিয়া লওয়া হইত। প্রজাগণ ক্রমাগত প্রপীড়িত হওয়ায়—মাঞ্চুদের অক্ষমতায় মনে মনে অসন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন। অবশ্য প্রজাগণের অর্থ দেশহিতকর নানা কার্য্যেও ব্যয়িত না হইয়াছে এরূপ নহে। দেশে শিল্পবিজ্ঞান চর্চ্চার সুবিধা কল্পেও বহু অর্থ ব্যয় করা হইয়াছে। কিন্তু প্রজাগণের অবস্থার অনুপাতে ব্যয় ভার নিতান্ত দুর্ব্বিসহ হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা সকল দোষ অনুপযুক্ত রাজার উপর ফেলিয়া মনে মনে বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছিল।

বর্ত্তমান সময়ের সংবাদ পত্রসমূহ এবং বিদেশ প্রত্যাগত হাজার হাজার সুশিক্ষিত যুবকবৃন্দের বেকার অবস্থায় বসিয়া থাকাও বিপ্লবের একটী কারণ। সংবাদপত্র সমূহ দেশের জনসাধারণ সমীপে অহরহ বিদেশীয় শাসন প্রথা ও তাহার সুখসুবিধা বিজ্ঞাপিত করিতেছে, তাহারা জানাইতেছে পাশ্চাত্য দেশে প্রজাগণ স্ব স্ব অর্থের সম্পূর্ণ মালিক, গবর্ণমেণ্ট সে অর্থে হস্তক্ষেপ করেন না। সেখানকার প্রত্যেক প্রজা নিজ মনোমত প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া শাসন কার্য্যে নিযুক্ত করিতে

পারে। এই সকল কারণে প্রজাগণের অন্তরে অন্তরে বিদ্রোহ ভাব জ্বলিতে লাগিল এবং আমেরিকা ফ্রান্স, জর্ম্মানি, ইংলণ্ড ও জাপান প্রভৃতি বিদেশ-প্রত্যাগত যুবকগণ এক নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া নূতন উদ্যমে চীনের গৌরবময় ভবিষ্যৎ গঠনের জন্য প্রচেষ্ট হইলেন। কিন্তু তাঁহারা দেশহিতকর ও লোকহিতকর কার্য্যেও গবর্ণমেণ্টের নিকট বাধা প্রাপ্ত হইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন।

মাঞ্চুগণ উত্তর প্রদেশ হইতে আসিয়া চীনে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন—তাঁহারা চীনের অধিবাসী নহেন—এইকথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়ায় জনসাধারণ মাঞ্চুদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন।

এইরূপ নানা কারণে উত্তেজিত হইয়া চীনের অধিবাসীগণ রাষ্ট্র বিপ্লবে যোগদান করেন।

২

১৮৯৪-৯৫ খৃঃ অব্দে অর্থাৎ চীন জাপান যুদ্ধের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই ইউরোপীয় রীতিনীতি ও শাসনকার্য্য সমাজে প্রচলিত করিবার জন্য চীনদের বিশেষ আগ্রহ হইয়াছিল। তাঁহারা অন্তরে অনুভব করিয়াছিলেন—তৎকালীন শাসনপ্রণালী ও সামাজিক কুসংস্কারাদির আমূল পরিবর্ত্তন বিনা চীনে উন্নতির আশা সুদূরপরাহত। তাই চীনের শিক্ষিতসম্প্রদায় উল্লিখিত সংস্কার ও পরিবর্ত্তনের জন্য তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। তারপর রুষ জাপান যুদ্ধ চীনে এক নবজাগরণ আনিয়া দেয়—এই সময় হইতে একটা পরিবর্ত্তনের স্রোত যাবতীয় কুসংস্কার, অন্যায় ও অত্যাচার, অভাব ও অভিযোগের বিরুদ্ধে চীনের অভ্যন্তর দিয়া প্রবাহিত হইল। প্রাচ্য জাতি পাশ্চাত্য শিক্ষালাভ করিলে তাহাদের রীতিনীতি কার্য্যপদ্ধতি আয়ত্ত করিলে, যে কিরূপ শক্তিলাভ করিতে পারে, এ শিক্ষা তাহারা রুষ জাপান যুদ্ধ হইতে লাভ করিল।

১৯০৫-১৯০৮ সনে প্রিন্স চিংএর সভাপতিত্বে রাজধানী পিকিনে একটী কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হয়; কয়েকজন প্রতিভাশালী স্বদেশহিতৈষী এই কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। তাঁহারা চীনের সম্ভ্রান্ত ও রাজন্যবর্গের নিকট এইরূপ অনুরোধপত্র প্রেরণ করিতে লাগিলেন যে, "আপনারা নিজ নিজ পুত্রকে পাশ্চাত্য যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী করুন।" ইহার শুভ ফলে যে যুদ্ধ ব্যবসায়কে লোকে ঘৃণার চক্ষে দেখিত তাহাই বিশেষ সম্মানজনক কাজ বলিয়া পরিগণিত হইল। সম্ভ্রান্ত রাজন্যবর্গ সৈনিক বিভাগে উচ্চ উচ্চ পদ গ্রহণ করিলেন এবং সৈন্যদের বেতন দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করিয়া দেওয়া হইল। নৌবিভাগের দিকেও বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হইল। ১৯০৯ সালে সম্রাট কোয়াংসুর (Kwangsu) ভ্রাতা তাইসুনের (TsaiHsun) অধীনে একদল সৈন্য সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর নৌবাহিনী গঠন শিক্ষা করিবার জন্য ইউরোপে প্রেরিত হইল।

পরিবর্ত্তনের সব চেয়ে বড় সাক্ষী ১৯০৫ সালে একটী রাজকীয় কমিশন স্থাপন। ইহার অধ্যক্ষ ছিলেন তাইসি। ইহাদের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন দেশের শাসন প্রণালী অধ্যয়ন করিয়া চীনে একটী প্রতিনিধিতন্ত্র শাসন প্রথা (Representative Gort.) প্রবর্ত্তিত করা। কিন্তু রক্ষণশীলগণ এই প্রচেষ্টার উৎপাটন কল্পে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিল। কমিশনারগণ পিকিন ত্যাগের বন্দোবস্ত করিতেছিল—ইত্যবসরে তাহাদের উপর বোমা নিক্ষিপ্ত হইল। এই বোমায় তাইসি ও অন্যান্য কমিশনারগণ আহত হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের পিকিন ত্যাগে কিছুকাল বিলম্ব ঘটিয়াছিল। যাহা হউক অবশেষে তাঁহারা ইউরোপ আমেরিকা ও জাপান পরিদর্শন করিয়া ১৯০৬ সালের জুলাই মাসে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। ইহাদের রিপোর্ট অধ্যয়ন করিবার জন্য এক কমিটী বসে। তাহার সভাপতি ছিলেন প্রিন্স চিং (Prince ching). ইহার পর কয়েক বৎসর ধরিয়া সংবাদ পত্র ও বিজ্ঞাপনীর সাহায্যে নূতন শাসন প্রথার অনুকূলে জনসাধারণকে উত্তেজিত করা হইতে লাগিল। দেশে পার্লিয়ামেণ্ট শাসনপ্রথা ও বহু আইন কানুনের পরিবর্ত্তন ও সংশোধনের আবশ্যকতা বিজ্ঞাপিত হইল।

৩

ওদিকে বিপ্লববাদীগণের প্রচেষ্টারও বিরাম নাই। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে হইতেই তাঁহারা মাঞ্চুরাজবংশকে পরাজিত করিয়া প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় যত্নবান হইয়া-

ছিলেন। কিন্তু যথেষ্ট অস্ত্রাদি ও উপযুক্ত শৃঙ্খলার অভাবে এতদিন কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

২৮৮৬ খৃষ্টাব্দে সনইয়েটসেনের নেতৃত্বে কেণ্টন অধিকার করিবার জন্য চেষ্টা করা হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা বিফল হয়। কতকগুলি বিলাতী মাটীর পিপা কেণ্টন বন্দরে আনিয়া নামান হইয়াছিল। সেগুলি যাহার তত্ত্বাবধানে ছিল তাহার সাহসের অভাবে সমস্ত কার্য্য পণ্ড হইল। পিপাগুলি ফেলিয়াই তিনি পলায়ন করিলেন, সেগুলি কিছুকালের জন্য কাষ্টমহাউসে আবদ্ধ হইয়া রহিল। ইতিমধ্যে সে ব্যক্তির বিশ্বাস-ঘাতকায় সমস্ত ষড়যন্ত্র প্রকাশ পাইল। পিপাগুলি খুলিয়া দেখা গেল সেগুলি টোটা ও রিভলবারে পরিপূর্ণ। এই ষড়যন্ত্র প্রকাশ পাওয়ায় মাঞ্চুদের চক্ষু খুলিয়া গেল। কেসার গোলযোগের সম্পূর্ণ নির্ব্বাণের পর মধ্যপ্রদেশে পুনরায় বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। বিপ্লবের কেন্দ্র হুনান (Hunan) প্রদেশ এবং দলপতি (TongTosi Sheung) টঙ্গ সয় সিউন। প্রকাশ্যে ইনি জনসাধারণের নিকট মাঞ্চুরাজবংশের ক্রটী সমুহের সংস্কার করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কিন্তু ভিতরে ভিতরে রাষ্ট্রবিপ্লবের চেষ্টাপরায়ণ ছিলেন। চ্যাং চিটাং (Chan chiting) তাহার মনের ভাব বেশ বুঝিতে পারিলেন এবং তাহাকে গ্রেপ্তার পূর্ব্বক কোনও বিচারাধীন না করিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। বিপ্লবের সমস্ত ষড়যন্ত্র ও গোলযোগ এই ব্যাপারে কিছুদিনের জন্য শান্ত হইয়া গেল।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে বসন্তকালে ইয়েমচোতে (Yam chau) ভয়ানক বিদ্রোহের ভাব প্রকাশ পাইল। রাজকীয় সৈন্যের সহিত বিদ্রোহীদের একটী বড় রকম যুদ্ধ ঘটিয়া গেল। বিদ্রোহীগণ এবার অনেকটা সফল মনোরথ হইয়াছিল। তাহারা (Ho Han) হোহান অধিকার করিয়া একে একে মান হো (Man Ho) সেমমৌঙ্গ (Sam Maung) অধিকার করিল। রাজকীয় সৈন্য হইতেও কতকজন বিদ্রোহীদের সহিত মিলিত হইয়াছিল। এবার তাহারা রাজকীয় সৈন্যরক্ষিত রেলপথ অধিকার জন্য কৃতসংকল্প হইল এবং তাহাদের আক্রমণে রাজকীয় সৈন্য পৃষ্ঠ প্রদর্শন পূর্ব্বক পলায়ন করিল। কিন্তু কার্য্য-শৃঙ্খলার অভাবে এ আন্দোলন অধিক দিন টিকিতে পারিল না।

১৯১০ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে বিদ্রোহানল ভীষণরূপে জ্বলিয়া উঠিল। বিদ্রোহীগণ ভাবিলেন—এইবার মাঞ্চুদিগকে আক্রমণ করিবার সময় হইয়াছে। এই সময় কেণ্টনে পাশ্চাত্য প্রথায় সুশিক্ষিত একদল সৈন্য ছিল। কেণ্টন বিদ্রোহীগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়ার পর বিদ্রোহীগণ এই সৈন্যদিগকে তাহাদের সহিত যোগদান করিবার জন্য উত্তেজিত করিল। কিন্তু অবশেষে এ যুদ্ধে বিদ্রোহীগণ পরাজিত এবং তাহাদের বহুলোক হত ও আহত হইল। বিদ্রোহী সৈন্যের দলপতি নাগাই (Nagai) একজন প্রসিদ্ধ ও নিপুণ যোদ্ধা ছিলেন। তিনি এই যুদ্ধে আহত হইবার পর তাঁহাকে ধৃত করিয়া—তৎক্ষণাৎ গুলি দ্বারা হত্যা করা হইয়াছিল।

আবার তিন মাস পরে বিদ্রোহীগণ কেণ্টনের রাজ-প্রতিনিধিকে ধৃত করিয়া মাঞ্চুবংশের রাজত্বের লোপ-সাধন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন—কিন্তু তাহাদের এ প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়।

এইরূপ কয়েক বৎসর ধরিয়া অবিশ্রান্ত চেষ্টার পর এখন চারিদিকে বিদ্রোহবহ্নি দাউ দাউ করিয়া প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে—নানা স্থানে বিদ্রোহীগণ জয় লাভ করিয়াছে, চীনের তিনটী সহর উচাং হানিয়াং ও হংকো বিদ্রোহীদের করায়ত্ত, আর চীনের প্রতিনগরে বিপ্লবকারীদের জয়পতাকা উড্ডীন হইয়াছে।

লি ওয়েন হাং রাষ্ট্রবিপ্লবের একজন নেতা। তাঁহার বয়স ৪৫ বৎসর। ইনি পিয়াং নেভেল কলেজে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া বেন উয়েন নামক রণতরীর সৈনিক বিভাগে কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন। জাপানের সহিত চীনের একটী প্রসিদ্ধ সংগ্রামে ইনি যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই সংগ্রামে চীনের রণতরী সমুহ বিনষ্ট হয়। কিন্তু লি মৃত্যুর কবল হইতে জয় লাভ করেন। অতঃপর তিনি হুপে প্রদেশে চেং চি টাং এর সহিত মিলিত হন। চেং তাঁহাকে খুব ভাল বাসিতেন। কেননা তিনি সর্ব্বপ্রকার প্রলোভন জয় করিতে পারিতেন। তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ও রণচাতুর্য্য সত্ত্বেও তিনি

সমর বিভাগের উচ্চতম পদ লাভ করিতে পারিতেন না; ইহার একমাত্র কারণ তাহার ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী চেং পেইওর বিদ্বেষ। কিন্তু চেং পেইও সমরবিদ্যা কিম্বা সদ্‌গুণের কোনও অংশে লির সমকক্ষ ছিলেন না। লি ওয়েন হাং কেসার গোলযোগের পূর্ব্বেই ভিন্ন দেশের রাজনীতি অধ্যয়নের আবশ্যকতা বুঝিতে পারিয়া জাপানে গমন করেন। জাপান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি চেং চি টাংকে—জাপানে চীন সৈনিক যুবক প্রেরণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। জাপান হইতে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া ফিরিয়া আসার পরও তিনি সমর বিভাগে উচ্চপদ লাভ করিতে পারিলেন না, ইহার একমাত্র কারণ পূর্ব্বোল্লিখিত চেং পেইওর বিদ্বেষ। কিন্তু সৈনিক বিভাগে লির বিশেষ প্রভুত্ব ছিল। তিনি সকলের প্রতি সাধারণত সদয় ব্যবহার করিতেন। তাঁহার হৃদয় সহানুভূতিতে পূর্ণ আর চেং পেইওর ব্যবহার ইহার ঠিক বিপরীত—তিনি অতিশয় স্বেচ্ছাচারী ও কঠোর প্রকৃতির লোক ছিলেন। চেং পেইও কাহারও উন্নতি সহ্য করিতে পারিতেন না। সুতরাং হুপে প্রদেশে অনেকেই লির বন্ধু হইয়াছিলেন কিন্তু চেং পেইওকে কেহই দেখিতে পারিতেন না। লি খুব সুন্দর ইংরেজী বলিতে পারিতেন।

চীনে লি ওয়েন হাংএর ন্যায় বহুদর্শী উপযুক্ত নেতা আর কেহই ছিলেন না। তিনি চীনের ও অন্যান্য দেশের ইতিহাস উত্তম রূপে অধ্যয়ন করিয়াছেন। স্থল যুদ্ধ ও জল যুদ্ধে তিনি সমান পারদর্শী। লি অস্ত্রের সুবিধা অসুবিধার প্রতি বিশেষ দৃষ্টিপাত করিয়া সুবিচার করিয়া থাকেন। বিপদে তিনি সহজে অভিভূত হইয়া পড়েন না। ইহার অপেক্ষা ভাল পরিচালক বিপ্লবকারীগণ আশা করিতে পারেন না।

মাঞ্চুদের বিপদের সীমা নাই। তাঁহারা সর্ব্বসাধারণের চক্ষুশূল। দেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত চীনের যাবতীয় অধিবাসীবৃন্দ বর্ত্তমান রাজবংশের নিলোপের জন্য উৎসুক। রাজকীয় সৈন্যগণও অন্তরে অন্তরে মাঞ্চুদিগকে ঘৃণা করে। ইতি মধ্যেই বহু সৈন্য বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগদান করিয়াছে। বৈজ্ঞানিক যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী সৈন্যগণ মাঞ্চুদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে সততই প্রস্তুত। সকলেই প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালীর পক্ষপাতী। ইহার উপর দারুণ অর্থাভাব। রাজকোষ একেবারে শূন্য। বিদ্রোহীগণ যে পরিমাণ অর্থই সংগ্রহ করুক না ইহা নিশ্চিত মাঞ্চুগণ তাহাদের বিরুদ্ধে অধিক দিন দাঁড়াইতে সমর্থ হইবেন না। তাঁহারা অর্থ ধার করিবার চেষ্টা করিতে পারেন সত্য কিন্তু ইহাতে প্রজাগণ আরও অসন্তুষ্ট হইবে এবং সেরূপ অবস্থায় তাহাদের রাজত্ব লোপের অধিক বিলম্ব হইবে না। গবর্ণমেণ্ট ও প্রাদেশিক ব্যাঙ্কগুলি কিছুদিন পূর্ব্বে অর্থের বিনিময়ে নোট চালাইতেছিলেন সে সময়ে সকলেই তাহা গ্রহণ করিত এখন তাহারা নোটের পরিবর্ত্তে টাকা চালাইতেছে, সুতরাং ইতি মধ্যেই অনেকগুলি ব্যাঙ্ককে বাধ্য হইয়া কারবার বন্ধ করিতে হইয়াছে।

চীনে সর্ব্ববিষয়ে একটা পরিবর্ত্তন যে হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বিপ্লবকারীদের জয় হইলে দেশে প্রজাতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইবে। আর যদিও বা নিঃসহায় মাঞ্চুদেরই জয় হয় তাহা হইলেও শাসন সংক্রান্ত একটা বড় রকম পরিবর্ত্তন না করিলে তাহাদের রাজ্য টিঁকিবে না। একটা বিপুল পরিবর্ত্তন হইবেই এবং সেই পরিবর্ত্তনের মুখে চীন বিশেষ উন্নতি লাভ করিবে।

সুখ দুঃখ, উন্নতি অবনতি কালের অপার মহিমায় চক্রবৎ পরিবর্ত্তন করিতেছে। উন্নতির অত্যুচ্চ শিখর হইতে এক একটা জাতি ধীরে ধীরে অন্ধকার রসাতল-গুহায় পতিত—আর অসভ্যাবস্থা হইতেও কত জাতি সভ্যতার চরমশিখরে উঠিয়া পড়িয়াছে। আসিয়ার পুরাতন শক্তিগুলি আজ একেবারে ধ্বংসোন্মুখ, তুরস্কের সে বীর্য্য আর থাকে না, পারস্যের দুর্দ্দশার এক শেষ, শীঘ্রই যে আফগানিস্থান শক্তিহারা না হইবে তাহাতেই বা বিশ্বাস কি?

পশ্চিমপ্রান্ত যেমনি আঁধার হইয়া আসিতেছে পূর্ব্বদিক তেমনই প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতেছে। পূর্ব্ব প্রান্তে একমাত্র জাপান যে সৌভাগ্য রশ্মি বিতরণ করিতেছে—তাহারই আলোকে আজ চীন আলোকিত

হইয়া উঠিতেছে তাহার বহুদিনের ঘুম ঘোর ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। এত বড় একটা সাম্রাজ্য জুড়িয়া এত অগণিত লোকসংখ্যা আলোড়িত করিয়া আজ যে সংস্কারের প্রচেষ্টা হইতেছে শক্তিহীনের বিরুদ্ধে শক্তি লাভের জন্য যে মহা সংগ্রাম চলিয়াছে তাহার পরিণাম যে শুভ হইবে তাহাতে আর সন্দেহ করা চলে না।

শ্রীসুধাংশুকুমার চৌধুরী।

বালিকা ও সন্ধ্যাতারা

ওগো কিরণময়ী!
দেখ্‌তে দেখ্‌তে এক নিমিষে
ফুটে উঠ্‌লি ওই!
কোন কোণেতে নিরিবিলি চুপটি ক'রে লুকিয়ে ছিলি
ওই যে হঠাৎ চক্ষু মেলি
দেখা দিলি সই!
ওগো কিরণময়ী!

এ তোর কেমন ধারা!
আপন সুখে আপনি আপনি
হেসে আপন-হারা।
কিসের এত হাসির ছটা— কিসের এত সুখের ঘটা?—
কোন আমোদে বিভোর হ'য়ে
এমন মাতোয়ারা?
বলনা দেখি তারা!

ওলো জ্যোতির কণা!
তোর সুখের কথা একটীবার
আমায় বলে যা'না।
দূর-দূরন্তে নীলাকাশে কে তোরে বোন ভালবাসে?
মায়ের, দিদি-মায়ের আদর
আছে কি তোর জানা?
ওলো জ্যোতির কণা!

শোনা আমায় শোনা!
কোন সোনার জলে নাইতে গিয়ে
হয়ে গেছিস্ সোনা?
কি কি খেলা খেলিস সখি! কেমন ক'রে? বলনা দেখি!
বাদল-ধারে ভিজিস যখন
কেউ কি করে মানা?
শোনা আমায় শোনা!

একটী কথা তোর,
শুনব ব'লে পরাণ ভরা
কত না সাধ মোর!
নিতি নিতি এমন ক'রে কত লো আর সাধব তোরে!
চেয়ে দেখিস্—শুনিস্ কথা,—
হেসেই শুধু ভোর!
একটী কথা তোর!

তোর অই নীরব হাসি,
তোর জ্বলজ্বলে রং—চটুল নয়ন
ফুটফুটে রূপরাশি!
কিরণ-ধারে পরাণ ভরি দেখায় আমায় আকুল করি
জাগায় কত স্বপন-কথা
বুকের মাঝে পশি।
তোর অই নীরব হাসি!

সারাটী দিন ভরি,
দূর আকাশের কোণে কোণে
তোরে খুঁজে মরি!
কোথায় গো কোন পরীর দেশে, সোনার খাটে মায়ার বশে
ঘুমিয়ে থাকিস ধীর সমীরে
ফুলের শয্যা'পরি,—
সারাটী দিন ভরি।

মা বলেছে সখি!
মোর তরে তুই সারা নিশি
জাগিস চেয়ে থাকি;
আমি যখন মায়ের বুকে স্বপ্ন দেখি ঘুমিয়ে সুখে
দেখ্‌তে আসিস্ আমায় তখন
জান্‌লা দিয়ে নাকি?
মা বলেছে সখি!

নিতুই প্রভাতকালে,
জেগে জেগে সারা হ'য়ে
রাগ্ ক'রে যাস চলে।
আজকে দিদি! তোমার সনে গন্ধে ভরা ফুলের বনে
জেগে র'ব সারা রাতি
মাতি কুতূহলে,
রাগ করেছিস্ বলে।

আলসভরে যবে,
খোকা খুকী, দিদিরা মোর
ঘুমিয়ে পড়বে সবে;
সেই সময়ে গভীর রাতে বলিস্ কথা আমার সাথে
কেউ তখন তার একটু কিছু
শুন্‌তে নাহি পাবে!
ঘুমিয়ে থাক্‌বে সবে!

মনুষ্যত্বের সাধনা

এমন একদিন ছিল যখন মানুষ মনে করিত যে সাধনাকে গোপন করিয়া রাখাই মানুষের শ্রেষ্ঠচেষ্টা। বাষ্পকে অনাবৃত করিলে তাহা যেমন উড়িয়া যায়, তেমনি প্রকাশের পথে চেষ্টা হতবীর্য্য হইয়া যায়। এ কথা সত্য নহে, এরূপ বলিবার অধিকার অবশ্য কাহারও নাই। কিন্তু গোল হইতেছে এই যে, একটিমাত্র পন্থা অবলম্বন করিয়া সকল বিষয়ের সমস্যা ভঞ্জন করা যায় না। ভারমোচন-প্রয়াসী গর্দ্দভের পিঠের লবণের বস্তা জলে গলিয়াছিল বলিয়া তুলার বস্তা তাহাতে গলে নাই, বরঞ্চ তাহা দ্বিগুণ ভার সঞ্চয় করিয়াছিল। মানুষ যখন এমন কোনও একটা বিষয়ের সাধনা করে, যে কেবলমাত্র তাহারই সহিত তাহার সম্বন্ধের নিগূঢ়তা থাকে, তখন তাহাকে বাহিরের কৌতূহলের ভিতর প্রকাশ করায় তাহা হানিগ্রস্ত হয় সন্দেহ নাই; কিন্তু সমগ্র মানবসমাজের কল্যাণের সহিত যাহা জড়িত, তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া বিযুক্ত করিয়া গোপন স্বাতন্ত্র্যের ভিতর রক্ষা করিতে তাহা বিশীর্ণ বিবর্ণ হইয়া শুখাইয়া ওঠে। যে তরু ভূমির গভীর তলে মূল বিস্তার করে, তাপগৃহে পাত্রের ভিতর তাহাকে বদ্ধ করিতে গেলে বাঁচাইয়া রাখা যায় না।

মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধির একটা অসম্পূর্ণ দিক্ আছে। সুতরাং এক জনের উদ্যোগ সমগ্রভাবে একটা জিনিসকে গড়িয়া তুলিতে পারে না।—পৃথক্ পৃথক্ শক্তিপুঞ্জ যখন পৃথক্ পৃথক্ দিকে সেই বিশেষ পরিণতিটিকে ঘটাইয়া তুলিতে থাকে তখন তাহার সমবায়ে যে দেহান্বয় হয়, বিশ্বমানবের চিত্তের সহযোগে তাহাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা ঘটিয়া থাকে। এবং তখনই তাহার নিজের একটা স্বতন্ত্র আত্মগত শক্তি আবির্ভূত হয়, তাহাকে প্রতিনিয়ত তখন ঠেলিয়া চালাইয়া লইতে হয় না, আপনার বলে সে তখন চলিতে ও চালাইতে থাকে।

প্রত্যেক মনুষ্যের ভিতরেই একটা স্বতন্ত্র বিশিষ্টতা আছে, প্রত্যেকের বিভিন্নরূপ রুচি বিচার ও বোধশক্তির ভিতর দিয়া যন্ত্রশোধিত জলের মত তাহা নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এবং বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্নরূপ বিশেষত্বের দ্বারা তাহার বিভিন্ন দিকের পুষ্টিসাধন হইতে থাকে।

সুতরাং বর্ত্তমান যুগের সাধনা "শুধ

আপনার মনে নয়, আপন ঘরের কোণে নয়, শুধু আপনার রচনার মাঝে নহে।”

অন্তরাল করিয়া সত্যকে চাপা দিয়া রাখিবার দিন আজ আর নাই, সকলের কাছে আজ তাহা স্বীকারের দিন আসিয়াছে, সকলের কাছে আজ তাহার পরীক্ষার প্রভাত উদিত হইয়াছে! জীবনের কারবারে যে ধন লইয়া দোকান খুলিতে হইবে, তাহা কতখানি খাঁটি, আজ তাহা প্রকাশ্যে পরখ করিয়া দেখিতে হইবে, নহিলে ফাঁকির ধন কখনও ফাঁকি দিতে ছাড়িবে না, এবং অবশেষে সে দৈন্য ঢাকিতে কাহারও কাছে ঋণ মিলিবে না!

এক জনের হইয়া আরেক জন যখন কাজ করিয়া দেয়, তখন যে ব্যক্তির কাজটা করিতে হয় না, তাহার যথেষ্ট আরাম লাভ হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু গোল হইতেছে এই যে, চিত্রগুপ্তের পাকা হিসাবে সে শূন্যগুলা কিছুতেই বাদ যায় না, উল্টিয়া সে সেগুলি তাহার জমার ঘরে বসাইয়া দেয়। মনুষ্যরূপে যাহারা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে, তাহারা নিতান্তই একটা বৃহৎ অধিকার লইয়া জন্মগ্রহণ করে। সুতরাং সেই জন্ম সত্ত্বটাকে অস্বীকার করিয়া একদিকে সরাইয়া রাখিলে তাহা লোপ পায় না, এবং সে কাজটা অন্যের উপর বরাৎ দিয়াও চালান যায় না।

বুদ্ধি ও ক্ষমতার বলে মানুষ প্রাণী জগতের উপর প্রভুত্ব লাভ করিয়াছে। ইতর জন্তুগণের মত যদি তাহাকে কেবলমাত্র হস্তপদাদির প্রয়োগ দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে হইত তাহা হইলে তাহার যাহা ঘটিত, তাহাকে মনোরম বলা যাইতে পারে না। মানুষের এই স্বাধীন বোধশক্তিকে ও বুদ্ধিবৃত্তিকে বর্জ্জন করিয়া মানুষ যখন কলের মত চলিতে থাকে, তখন সে ব্যাপারে আর কিছু না হোক, মনুষ্যত্বের পথ যে মারা যায় তদ্বিষয়ে ভুল নাই।

পৃথিবীতে একটা ভয়ানক ব্যাপার এই দেখা যায় যে আসলের চেয়ে নকল প্রবল হইয়া ওঠে এবং খাঁটির চেয়ে ফাঁকা জিনিসের জোর প্রভূত হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং অপসিদ্ধান্ত লোকসমাজের ভিতর যখনই প্রবেশ করে, তখনই তাহাকে বাহির করা দুষ্কর হইয়া উঠে, এবং সত্যকে কপাটের পর কপাট ভাঙ্গিয়া মানুষের অন্তরে প্রবেশের পথ লাভ করিতে হয়।

কিন্তু মিথ্যার ভিতর একটা ভঙ্গুরতা আছে, তাহা তাহাকে নিত্যকালের ভিতর টিঁকিয়া থাকিতে দেয় না। গম্ভীরমুখ এই অটল প্রতিযোদ্ধার নিকট তাহার গর্ব্বের অলীক ঔজ্জ্বল্য বিবর্ণ বিকৃত হইয়া লোপ পায় এবং লাঞ্ছনা ও অবহেলায় যে সহিষ্ণু নীরব তাপস এতদিন লোকের দ্বারপ্রান্ত হইতে বিতাড়িত হইয়া ফিরিতেছিল, অকস্মাৎ তখন তাহার ডাক পড়ে, অনুশোচনায় ক্ষমাভিক্ষু হইয়া সকলে তাহাকে অর্চ্চনা করিয়া গৃহ লইয়া আসে, এবং মানুষের চিত্তমন্দিরে তখন দেবতা জাগ্রত হন।

মানুষ যে মানুষ, এবং মনুষ্যলীলা সাঙ্গের সময় জগতের কাছে যে তাহার সেই পরীক্ষাটা দিয়া যাইতে হইবে, একথা আমাদের দেশ বহুদিন হইল বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে, এবং এ বিশ্বের যিনি দেবতা তিনি যে মানুষের দেবতা, মানুষের ভিতরেই যে তিনি জাগিয়া

আছেন, মানুষের নিকট হইতে মানুষকে বঞ্চিত করিয়া যে তাঁহাকে পাওয়া যায় না,—প্রাচীন যুগাবশেষের জীর্ণ স্তূপের ভিতর এ তথ্য প্রোথিত হইয়া গিয়াছে, আজ তাহার উদ্ধারসাধন প্রয়োজন হইয়াছে।

সমগ্রতায় শক্তি ভূয়িষ্ঠ হয়, খণ্ডতা তাহাকে ক্ষীণ করে। পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া, জ্ঞান ও শক্তিতে পরস্পরকে সাহায্য দান করিয়া, নির্ভরের যোগে পরস্পরের সহিত বদ্ধ হইয়া মানুষ শ্রীলাভ করিয়াছে, অরণ্যকে সমৃদ্ধ জনপদ করিয়াছে, গ্রহতারকার তথ্য উদ্ঘাটন করিয়াছে, আপনার অখণ্ড শ্রেষ্ঠতার জয়ধ্বজা নিত্যকালের অঙ্গনে প্রোথিত করিয়াছে। মানুষের এই দুর্দ্ধর্ষ তেজ,—যাহা সিন্ধুনীর, ভূধর, শিখর, গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন করিয়া জগৎ হইতে জগদন্তরে ধাবিত হইতেছে, আমাদের দেশের মর্ম্মের ভিতর তাহা জড়তায় মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের মত নির্বীর্য্য হইয়া আছে। যুগযুগান্তর পূর্ব্বে তাহার উদ্ধত ফণার উপরে কে এক কুহকের মন্ত্র পাঠ করিয়াছিল, তাহাতে নিশ্চল হইয়া সে শক্তিহীন পড়িয়া আছে, আর সে নাগপাশ তাহাকে শোষণ করিয়া নিত্য পুষ্ট হইয়া উঠিতেছে, এবং তাহার দারুণ নিষ্পেষণে তাহার অস্থিসন্ধি ভাঙ্গিয়া বিকল হইয়া পড়িতেছে। মনুষ্যত্বের এই সুপ্ত বীর্য্যবহ্নিকে অতীত যুগের আবর্জ্জনার পাংশুতল হইতে মোচন করা আজ আমাদের একান্তই চাই, অর্থহীন সংস্কার ও অপধর্ম্মের মন্ত্রতন্ত্র দান করিয়া মানুষের মনকে মানুষের চেতনাকেই আজ জাগ্রত করা চাই, জটিল জল্পনা ও ব্যর্থ কল্পনার দ্বারে জাতিকে ও সমাজকে বলিদান দিয়া আমাদের এই ভয়াবহ বামাচার আর টিঁকিতে পারে না!

ক্ষেত্র কর্ষিত হইলে শস্য দান করে, পতিত থাকিলে কণ্টকগুল্মের আবাসভূমি হয়। সুতরাং ভারতবর্ষের নৈতিক ক্ষেত্রও অকর্ষণে যে কণ্টকগুল্মে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিবে, ইহা কোনও স্বভাববিরুদ্ধ ব্যাপার নহে। বনস্পতি এ কাননে পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল বটে, কিন্তু এখন তাহা বল্মীক ও লতাস্তূপে এমন করিয়া ঢাকিয়া পড়িয়াছে যে, তাহাকে আর চিনিয়া বাহির করিবার বুঝি কোন উপায় নাই।

কিছুমাত্র না বুঝিয়া শুক ও তোতার মত কণ্ঠস্থ করা যে বিদ্যাধ্যয়ন নহে, তাহা বলা নিশ্চয়ই বাহুল্যোক্তি, অধুনা শিশুশিক্ষাতেও এরূপ মূঢ় নীতি প্রযুক্ত হয় না। কিন্তু আমাদের এই শ্রদ্ধেয়, পূজ্যপাদ, জ্ঞানগরিষ্ঠ ভারতবর্ষ এখনও তাহার ত্রিশ কোটি নরনারীকে সেই প্রাথমিক যুগের প্রথম পাঠ পড়াইতেছে, গম্ভীর মুখে মাথা নাড়িয়া সে বলিতেছে, "জিজ্ঞাসা করিবার তোমাদের কোন অধিকার নাই, আজ্ঞাবহের মত তোমরা কেবল আজ্ঞাপালন করিবে, ইহাই তোমাদের মুক্তির মূল্য।" কিন্তু স্তোক বাক্যে শিশুই ভোলে প্রাপ্তবয়ঃ ব্যক্তি ভোলে না। অচেতনের মধ্যেও তাই আজ দেশের চেতনার নাড়ী চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, অযথা কল্পনা ও জল্পনাজটিল বিভীষিকার ছায়ায় শঙ্কিতভাবে যাহারা পদক্ষেপ করিতেছিল, তাহারা সহসা আজ থামিয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং তন্দ্রাস্তিমিত জাড্যের ভিতর হইতে জাগ্রত হইয়া উদ্বেগ পীড়িত

স্বরে নরনারী আজ প্রশ্ন করিতেছে "কোথায় সে সত্য,—অমৃতের পুত্র তোমরা শোন বলিয়া একদিন ভারতবর্ষ তাহার পুত্রকন্যাদের যাহা শুনিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিল! কোথায় সেই সুখদ সুভগ সলিলস্রোত মানুষের আত্মার দাহময় তৃষ্ণা যাহাতে নিবারিত হইবে বলিয়া প্রচারিত হইয়াছিল, কোথায় সে বিশ্রাম তরুর ক্লান্তিহর ছায়া, জীবন পথে ক্লান্ত পথিক যাহার তলে গ্লানি দূর করিবে বলিয়া কথিত হইয়াছিল?" ভারতবর্ষ অকস্মাৎ আজ স্বপ্ন হইতে জাগিয়া দেখিতেছে যে জনপদের পথ ধরিয়া সে চলিতেছিল, তাহা প্রকৃত নয়, মায়াসৃষ্টি মাত্র, অকস্মাৎ আজ তাহা দিগন্তবিলীন বাণীর ভিতর কোথায় মিলিয়া গিয়াছে!

পারম্পর্য্য প্রকৃতির একটা বৃহৎ নিয়ম। জড়ই হোক আর অজড়ই হোক, প্রত্যেক পদার্থকে ও বিষয়কে তাহার ভিতর দিয়া যাইতে হয়। ব্যাপ্তি একের ভিতর হইতে বহুত সম্প্রসারিত হয়, সরল হইতে জটিলতায় অগ্রসারী হয়, নিম্ন হইতে উচ্চাভিমুখ হয়, নির্ব্বিশেষ হইতে বিশেষত্বে সঞ্চারিত হয়। প্রত্যেক পদার্থকেই বিকাশের এই অনুক্রম ধরিয়া অগ্রসর হইতে হয়। কিন্তু ভারতবর্ষীয় সমাজশক্তির তদ্বিষয়ে এমন একটা অত্যদ্ভুত প্রয়াস দেখা যায়, যে তাহার উত্তর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। গৃহের ছাদ যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চস্থান তদ্বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই কিন্তু তাহা যে উল্লম্ফনে অধিগত করিবার জিনিস নহে তাহা যদি আমরা স্মরণ না করি, তবে পড়িয়া যাওয়াই একমাত্র পরিণাম। ধর্ম্মনিষ্ঠার তুঙ্গ শিখরে আরোহণ করিতে গেলে সাধারণ কর্ত্তব্যের সোপানগুলি আগে পার হওয়া চাই, কোনও ফাঁকিতে তাহাকে উড়াইয়া দেওয়ার কল্পনা বাতুলতা মাত্র। প্রবৃত্তি-মার্গের শাসন পালন করিয়া তাহা খণ্ডনপূর্ব্বক যাঁহারা নিবৃত্তিমার্গে আরোহণ করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান ভারত তাহার লুপ্ত পদাঙ্ক পুনরুদ্ধার আর করিতে না পারিয়া অন্তভাগশায়ী অবশিষ্ট চিহ্নগুলিকে একান্তভাবে গ্রহণ করিয়াছে ও তাহাকে কৃপণের ধনের মত আঁকড়িয়া ধরিয়া রহিয়াছে। তাহার পিছনে যে বিস্তৃতমুখ গহ্বর অন্ধকার মুখ ব্যাদিত করিয়া আছে, তাহাকে সে শুধু অসম্ভব প্রয়াসের দ্বারা আড়াল করিয়া রাখিতে চাহিতেছে, কিন্তু তাহার পায়ের নীচের মাটি তাহার ভারে যে খসিয়া পড়িতেছে, তাহার প্রতি তাহার দৃক্‌পাত নাই।

জীবনের অবস্থান ভেদে কর্ত্তব্য ও ধর্ম্মের প্রভেদ ঘটিয়া থাকে। পুরুষের যাহা ধর্ম্ম নারীর ধর্ম্ম তাহা হইতে পারে না। অপরন্তু,—সন্ন্যাসী যদি গৃহীর ধর্ম্ম অবলম্বন করে, তবে সন্ন্যাসী ধর্ম্মভ্রষ্ট হয়, এবং গৃহী যদি সন্ন্যাসীর পন্থানুসরণ করে তবে গৃহীও ধর্ম্ম হইতে স্খলিত হয়। দেশ কাল পাত্রানুভেদে যে ধর্ম্ম বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে, অবশ্য ভারতের শাস্ত্রকারগণ তাহা লিখিতে ভুল করেন নাই, কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, লোকসমাজে যখন একটা অনুভূতির স্পন্দনোচ্ছ্বাস ঘটিতে থাকে, বিধানের চাপ দিয়া তাহাকে বিমর্দ্দিত করা যায় না, গর্জ্জিতস্রোত তরঙ্গিণীর মত তাহা পথশায়ী প্রতিবন্ধক বিধ্বস্ত করিয়া পথ উন্মুক্ত করিয়া লইয়া অবতরণ করে। সুতরাং গৃহীদের সন্ন্যাসানুপন্থী হইবার সম্বন্ধে প্রবল

শাস্ত্র প্রতিষেধ থাকা সত্ত্বেও সমাজে তাহার প্রভাব অণুমাত্রও হ্রাস হয় নাই।

শ্রেষ্ঠতার দিকে মানবাত্মার একটা সহজ ও স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। বৈরাগ্য মন্ত্রে অনুপ্রাণিত একদা যে ব্রাহ্মণ্যশক্তি তপশ্চর্য্যায় মুমুক্ষুত্ব লাভ করিয়া জগৎকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছিল, দীপাকৃষ্ট মক্ষিকার মত ভারতবর্ষ তাহার দিকে একটা গোপন আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল, এবং জ্ঞানে ও অজ্ঞানে সেই বৈরাগ্যভাব তাহার সমস্ত চেতনায় প্রতিভাসিত হইয়াছিল।

কিন্তু ভুল করিয়া কেহ কোনও দিন অব্যাহতি পায় নাই; সুতরাং ভারতবর্ষও বিসদৃশ আচরণের ফল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই। নিম্নবর্ত্তী সোপান-শ্রেণীকে অস্বীকার করিয়া গৃহের ছাদে পঁহুছিবার অত্যদ্ভুত প্রয়াসের উন্মত্ততার প্রায়শ্চিত্ত আজ ভারতবর্ষকে করিতেই হইবে, নহিলে তাহার শ্রেয়ঃ লাভ ঘটিবে না।

মানুষ বিচারনিষ্ঠ জীব, এবং এই বিচার নিষ্ঠতার বলেই জীবজগতের উপর তাহার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মানুষ যাহা কিছু করে তাহাই বিচারমূলক ও বিচারবুদ্ধি প্রবর্ত্তিত। সুতরাং বিচারপূর্ব্বক যখন বহুর ভিতর হইতে কয়েকটিকে বাছিয়া লইতে হয়, এবং কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত বিষয়কে একটি পর্য্যায়ের ক্রমদ্বারা বদ্ধ করিতে হয়, তখন আপেক্ষিক গুরুত্ব ছাড়া তাহার সমস্যা ভঞ্জন হয় না কিন্তু প্রাচীন ভারত এই আপেক্ষিকতাকে একেবারেই আমল দেয় নাই, নেশার ঝোঁকে অসাধ্য সাধনের পরম উল্লাসকে সে এমন বড় করিয়া দেখিয়াছিল যে জীবনের ছোটখাট কর্ত্তব্যগুলি একান্তভাবে সে অবজ্ঞা করিয়াছে।

মানুষের চরম অভিব্যক্তি সম্বন্ধে ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম সম্প্রদায় ভেদে মতভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু মানুষের যে একটা লোক লোকান্তরানুগ বৃহৎ বিপুল আদর্শ আছে, কাল যাহা ক্ষয় করিতে পারে না, ক্ষত যাহাতে হস্তার্পণ করিতে পারে না, মানুষের জীবনের ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ আকাঙ্ক্ষা ও বেদনা যেখানে পঁহুছিতে পারে না,—এমন উন্নত বিশাল একটা আদর্শ জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে মনুষ্য-জাতির ভিতর আবহমানকাল অনুভূত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু পাইতে হইবে বলিয়া প্রাপ্তব্য জিনিস কোনও দিন সহজ হয় নাই। ত্বরাগ্রস্ত হইয়া বৈধ বিধি উল্লঙ্ঘন শুধু ক্লেশের পরিমাণ ও কঠোরতা বৃদ্ধি করে লাঘব করে না। আদর্শের পরিণতি সাধনের ইচ্ছা লোক সমাজকে উন্নতির পথে পরিচালিত করে সন্দেহ নাই, কিন্তু মানুষ যখন নিজের আকাঙ্ক্ষাকে সাধনার উপরে দেখিতে আরম্ভ করে, তখন খাঁটি ন্যায়বুদ্ধি তাহার নিকট হইতে দুর্ল্লভ হইতে দুর্ল্লভতর হইতে থাকে, এবং নিজের অবৈধ চেষ্টাটাকে বৈধ অপেক্ষাও গুরু করিয়া তুলিবার একটা উগ্র প্রচেষ্টা তাহাকে পাইয়া বসে।

গিরিশিখরকে যাহারা দূর হইতে অব-লোকন করে, তাহারা শুধু তাহার মেঘচ্ছায়া-লীন অপরূপ শোভাই দেখিয়া থাকে। কিন্তু তাহার পাদমূল যে গুরুদর্শন ভয়াবহ, বিপুল-কায়, শিলাস্তূপে গঠিত তাহা শুধু তাহার সমীপবর্ত্তিতায় প্রকাশিত হইয়া থাকে। আদর্শের যে উত্তুঙ্গ শিখর অপরূপত্বে মণ্ডিত

হইয়া লোকের মানসদৃষ্টির কাছে উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে,—তাহা যে শুধু সৌন্দর্য্যসমষ্টি নহে,—দুঃসাধ্য কঠোরতা, ক্লান্তিহীন ধৈর্য্য, অবিচলিত সহিষ্ণুতা, বহু ক্লেশ বহু পীড়ন বহু ত্যাগ ও বহু দুঃখভোগের ফল—তাহা ভুলিলে চলিবে না। বহ্নির দীপ্তি দাহের ভিতরই জন্ম গ্রহণ করে, স্বর্ণের জ্যোতি লৌহের আঘাতে ও বিদারণেই স্ফুরিত হয়—ইহা আমাদের মনে রাখা উচিত।

এমন এক দিন ছিল যখন ভারত আপনাকেই সকল অপেক্ষা একান্ত ভাবে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিত। কিন্তু আজিকার দিন এমন এক যুগ আসিয়াছে যে, নিজের মনের বিচারের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াটাই চরম ফল বলিয়া কল্পিত হয় না, নিজের শ্রেষ্ঠতার বুদ্ধিই শ্রেষ্ঠতার পরম পরিমাপক বলিয়া গৃহীত হয় না। প্রণষ্ট গৌরবকে আবর্জ্জনায় চাপা দিয়া ভারতবর্ষ যে জল্পনার ঊর্ণা বয়ন করিয়া চলিতেছিল, তাহাতে যে সে আপনাকে বন্ধন জালে জড়িত করিয়াছে, ইহা সে নিজের কাছে স্বীকার না করিলেও অপরের কাছে অস্বীকার করিবার তাহার যো নাই। তাহার নিজের ভুল তাহার নিজের কাছে ধরা না পড়িলেও জগতের কাছে তাহা বাদ যায় নাই, আজ তাই তাহার জবাবদিহির ডাক পড়িয়া গিয়াছে।

যাহার চক্ষু আছে অথচ দেখিতে পায় না, কর্ণ আছে অথচ শুনিতে পায় না, চরণ আছে অথচ চলিতে পারে না, তাহাকে আমরা পুত্তলিকা বলিয়া থাকি। সুতরাং লক্ষণ মিলাইয়া অভিবাদন করিতে গেলে আমাদের ব্রহ্মণ্য শক্তি পরিচালিত সমাজকেও উক্তরূপে অভিহিত করা যাইতে পারে। কবে কোন্ যুগে ঘড়ির দোলার মত এই বৃহৎ সমাজ পিণ্ডটাকে ব্রাহ্মণ একটা দোলা দিয়া দিয়াছিল, গতি হ্রাস হইতে হইতে আজ ইহা একেবারে থামিয়া পড়িয়াছে, আজ ইহাকে চালাইবার শক্তি কাহারও বাহুতে নাই। সমাজের শৈশব যুগে ধী শক্তিতে বলিষ্ঠ এই ব্রাহ্মণ সমাজের গায়ে যে জামা আঁটিয়া দিয়াছিল, পরবর্ত্তী যুগের তপস্তেজশূন্য নির্ব্বীর্য্য ব্রাহ্মণ টানিয়া টানিয়া তাহার জীর্ণতাকে কেবল বাড়াইয়া তুলিয়াছে, ও ছিঁড়িয়া তাহাকে শত খান করিয়া ফেলিয়াছে। কাপড় যখন শক্ত থাকে, তখন তাহাতে তালি লাগান চলে, কিন্তু জীর্ণ কাপড় তালিতে খসিয়া পড়ে। সুতরাং আমাদের এই জীর্ণ পরিচ্ছদের উপর পরবর্ত্তী যুগের সমাজবিধাতৃগণ যে তালির উপর তালি আঁটিয়াছেন, তাহা আগেকার অখণ্ড বয়ন সূত্রের সঙ্গে মিলিতে না পারিয়া কেবলই খসিয়া পড়িয়াছে, এবং ছিন্ন অংশ প্রতিদিনই বৃহৎ হইতে বৃহত্তর হইয়া উঠিয়াছে।

মানুষ যখন মনে করে যে আমি যাহা পাইয়াছি অথবা যাহা করিতেছি তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তখন তাহার বিচার বুদ্ধির ডাক আদৌ পড়ে না, এবং তাহার স্বাভাবিক পর্য্যবেক্ষণশীলতার সজাগত্ব তখন মিথ্যা বিভ্রমের দ্বারা প্রতারিত হয়। যে সভ্যতা ও উন্নতির পরিশিষ্টাংশ সহস্রাব্দের ভিতরও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তাহার সহিত জীবনের যোগের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া আপনাদের বিভবশালী উত্তরাধিকারীত্বের প্রচারপত্র ঘোষণা শুধু মূঢ় গর্ব্বের পরিচয় দান মাত্র।

শাস্ত্রবর্ণিত যে সব বিধি অসমর্থিত ও অশ্রযুক্ত হইয়া কীটদংশনে বিলুপ্ত হইয়া যায়, হিসাবের সময় তাহাকে ছাড়িয়া গেলে শাস্ত্রকারগণের প্রতি যে খুব অবিচার করা হয়, এরূপ বলা যায় না। পক্ষান্তরে শাস্ত্রবিরুদ্ধ যে সব বিধি সমাজের অন্তক্ষেত্র হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া লোকচিত্তের অভিসঞ্চিত শক্তিরসে পুষ্ট হইয়া উঠিয়া সমগ্র সমাজক্ষেত্রের তলে মূল বিস্তার করে, শাস্ত্রে তাহা সমর্থিত হয় নাই বলিয়া তাহা গৌণ বিষয়ের ভিতর গণ্য করা সমীচীন বোধ হয় না।

অসম্ভব প্রয়াসের পশ্চাতে ধাবমান হইতে গিয়া ভারতবর্ষ যে আপনাকে খাটো করিয়াছে, এবং খাটো হইয়াছে, এ কথা আজ ভারতবর্ষকে সকলের আগে নিজের কাছেই স্বীকার করিতে হইবে। ব্যাধি কুদর্শন বলিয়া তাহা আবরণাচ্ছাদিত করিয়া গোপন করিয়া রাখা সুবুদ্ধির পরিচায়ক নয়. দূষিত রক্তকে অস্ত্র সাহায্যে নিষ্ক্রমণ করাই তাহার বিহিত পথ। সুতরাং ভারতবর্ষ যে বড় ছিল, এ কথা কহিবার আগে ভারতবর্ষ যে ছোট হইয়াছে, এ কথা বলা অগ্রে প্রয়োজন।

ধর্ম্ম ও নীতি লোকসমাজের আভ্যন্তরীণ অভিব্যক্তি হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। সুতরাং প্রভাতে নব-যুগের সঙ্গে তাহার পরিবর্ত্তন স্বতঃই সৃষ্ট হইয়া চলে। তীরবদ্ধ বাপীর মতন মনুষ্য সমাজ আবহমান কাল একই বিধির ভিতর বদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে না, থাকিলে পঙ্কবদ্ধ বাপীর মতই আবর্জ্জনায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। গতি এ বিশ্ব জগতের প্রাণ, তাহা আজ আমাদের সর্ব্বাঙ্গীণ ভাবে স্মরণ করিতে হইবে, সচলতার সংঘর্ষণ ও দ্বন্দ্ববেগ অর্জ্জন ও বর্জ্জনের স্রোত-সংঘাতের প্রচণ্ডতাকে ভয় করিয়া আমরা যে স্থিতির বিরাম আকাঙ্ক্ষা করিতেছি, বিশ্ব গ্রন্থের কোনও পত্রে তাহার কোনও সূত্র লিখিত নাই, সুতরাং তাহাকে স্থান দানের প্রয়াস সর্ব্বৈব মিথ্যা। উড়িয়া আসিয়া যাহা জুড়িয়া বসে, পরগাছার মত তাহা মহাবৃক্ষের স্কন্ধের উপর চড়িয়া আপনার আয়তনে তাহাকে অন্তরাল করে বটে, কিন্তু তাহা চিরদিনের স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না, তাহার স্বল্প আয়ু স্বল্প কালের ভিতরেই নিঃশেষিত হইয়া যায়, তখন তাহার শীর্ণ কঙ্কাল আবৃত করিয়া মহাবৃক্ষের তরুণ শাখা ছাপাইয়া ওঠে।

সুতরাং যেখানে আমরা ছিলাম, সেখান হইতে আর নড়িব না, এরূপ সঙ্কল্প কিছুতেই সমাজের কল্যাণের অনুকূল হইতে পারে না। প্রাচীনবিধি ও বিধানের কাছে নির্ব্বিচার আত্মসমর্পণ ও ভারতীয় সমাজকে শিশুর মত বোধশক্তিবর্জ্জিত ও আত্মনির্ভরক্ষমতা-রহিত করিয়া রাখিয়াছে। যুগান্তরের জীর্ণতার বিগলিত স্তূপের ভিতর হইতে যে কীটদষ্ট পাতা কয়েকটি বর্ত্তমান ভারতের হাতে পঁহুছিয়াছে, তাহা তাহাকে কি পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে, তাহা ভাবিয়া দেখিবার শক্তি তাহার নাই, এবং যে স্খলিত-বন্ধন পাতাগুলি নব যুগের বাত্যায় ভ্রংশ হইয়া গিয়াছে তাহা পুনঃ সংরচনা করিবার ক্ষমতাও তাহার নাই। কিন্তু সেই শূন্যতার পরিপূরণ আজ তাহার চাই-ই, কারণ সেই প্রথমদিককার পাতাগুলির ভিতরেই তাহার শেষের পাতার সমাধান জড়িত রহিয়াছে, এবং অর্থান্বয় তাহার উপরেই নির্ভর করিতেছে।

গাছে যখন জীবনীশক্তি প্রচুর থাকে তখন তাহার শাখা ছেদন করিলে তাহাতে নব প্রশাখাপুঞ্জ উদ্গত হয়, কিন্তু জীর্ণ তরুতে হয় না। লোক সমাজের যে আভ্যন্তরীণ অভিব্যক্তির ফলে বিধান, শাসন, শিক্ষা প্রণষ্ট ও উদ্গত হইতে থাকে, ভারতবর্ষে তাহা বহুদিন হইল স্থগিত হইয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষের চিত্তনদী বহুদিন হইল তাহার বক্ষের উপর পুঞ্জীভূত আবর্জ্জনা ও পঙ্কের ভিতর ধারাবদ্ধ পল্বলের মত শুখাইয়া উঠিয়াছে, স্রোতোবেগে লুপ্ত পথের উদ্ধার সাধনের ক্ষমতা তাহার বহুদিন হইল লুপ্ত হইয়াছে। সুতরাং মানুষ তখন যেমন করিয়া 'মানুষ' হইত, সেই নবগার্হস্থ্য বিধি, সামাজিক বিধি, পরিবার গঠন বিধির সূক্ষ্ম অন্তর্লীন পর্য্যায়ন্তর—শতাব্দীর পর শতাব্দীর তরঙ্গা-বক্ষেপে যাহা লোপ পাইয়া আসিয়াছে কিন্তু পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই,—যাহার এই ভ্রষ্ট সংযোগ অংশকে কোনখানে আমরা খুঁজিয়া পাইতেছিনা—আমাদের বর্ত্তমানের প্রয়োজনের দাবী তাহা কিছুতেই মিটাইতে পারে না। আজ আমরা দেবতা চাহি না, প্রাচীন জীর্ণ-তার আরণ্যান্ধকারে বিপন্ন সমাজ আজ মানুষকে ও মানুষের মনুষ্যত্বকেই একান্ত ভাবে চাহিতেছে, তাহাকে জল্পনা দিয়া ভুলাইবার দিন আজ আর নাই! ভারতবর্ষের অন্তরের ভিতর আজ মনুষ্যত্বের সাধনা জাগিতেছে, সে সাধনা যাঁহা দ্বারা পূর্ণ হইবে, ভারতবর্ষের গৌরবমণি তাঁহার ললাট-ই ভূষিত করিবে।

শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষজায়া।

শরতে

কনকে শ্যামলে মিলন মধুর
নবীন শরত প্রাতে,
প্রবাসী রাঘব এলে কি ফিরিয়া
প্রেয়সী জানকী সাথে?
সোণার কিরণ ধরে না আকাশে
ছড়ায় ধরণী তলে,
শ্যামলের শেষ দেখা নাহি যায়
আঁখি যতদূর চলে!

হরিত ধান্যশীর্ষ আজিকে
হিরণে ভরিয়া ওঠে,
সরিষা ফুলের সোণার আঁচল
দূরে দিগন্তে লোটে!
ঘরে ঘরে শুনি শঙ্খের ধ্বনি
বাঁশী আগমনী গায়,
ধূপের স্নিগ্ধ পুণ্য সুবাসে
ভুবন ভরিয়া যায়!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

সমুদ্রতীর

শ্রীযুক্ত যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় অঙ্কিত চিত্র হইতে

সুলতানা মরিয়ম ও সম্রাট আক্‌বরের খৃষ্টানত্ব

মরিয়ম অর্থাৎ Mary একজন পর্ত্তুগীজ রমণী। ইনি বাল্যকালে মাতৃহীনা হইয়া পিতার সহিত ভারতে আগমন করেন। মরিয়মের পিতা ভারতে আসিয়া এক মুসলমানীকে বিবাহ করিলেন ও স্বীয় কন্যাকে গোয়ার খৃষ্টান্ সম্প্রদায়ের নিকট বিক্রয় করিলেন। এই সময় খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারার্থ খৃষ্ট যাজকবর্গ (Fathers) ইউরোপের যুবতী রমণী সংগ্রহ করিয়া ও সেই সমস্ত রমণীর লোভ দেখাইয়া নিরীহ দেশবাসীদিগকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেন। মরিয়ম সেই ভাবেই গৃহীত হইলেন এবং তাঁহার দ্বারাই পর্ত্তুগীজ যাজকবর্গ সম্রাট আকবরকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে চেষ্টা করেন।

তখন গোয়ার সৌন্দর্য্য ছিল সুবৃহৎ পোতরাজি, পর্ত্তুগীজের কামান, ও গোয়ার পর্ত্তুগীজ দুর্গ। সম্রাট গোয়ার উন্নতিবার্ত্তা শ্রবণে একবার সেইস্থান পরিদর্শন করিতে আসেন ও তথাকার কতিপয় শিল্পীকে স্বীয় কার্য্যে নিয়োজিত করেন। সেই সময় সুচতুর ধর্ম্মযাজকবর্গ মরিয়মকে সম্রাটের নেত্রগোচর করিলেন; গুণগ্রাহী সম্রাটও গুণবতী মরিয়মকে বিবাহ করিয়া স্বপুরে লইয়া চলিলেন। এদিকে মরিয়মের নির্ম্মম পিতা কন্যার দ্বারা আকবর রাজসভায় কর্ম্ম লাভ করিলেন। পর্ত্তুগীজ যাজকবর্গও আশায় বক্ষঃ স্ফীত করিয়া বসিয়া রহিলেন।

তখন আকবরের রাজধানী ছিল ফতেপুর সিকরীতে। তিনি মরিয়মকে বিবাহ করিয়া ফতেপুরে এক সুরম্য প্রস্তরহর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় পত্নীর বাসস্থান নির্দ্ধারিত করিলেন। এই প্রাসাদকে ঐতিহাসিকবর্গ "মরিয়মকুঠী" বা "সোনাহ্লা মাথান" বলেন। ইহা এখনও ফতেপুরে বিদ্যমান রহিয়াছে। মরিয়ম পূর্ব্বেই গোয়ার Catholic father দিগের দ্বারা মনমুগ্ধ করিতে শিক্ষা করেন, তাই তিনি ফতেপুরে উপস্থিত হইতে না হইতেই সম্রাটের মন অধিকার করিলেন। কিন্তু প্রাচ্য অধিবাসীদিগের উপর তাঁহার বিতৃষ্ণা পরিলক্ষিত হইত।

মরিয়ম সম্রাটকে উপদেশ দিলেন যে খৃষ্ট ধর্ম্মই পৃথিবীর একমাত্র শ্রেষ্ঠধর্ম্ম, ইহা ভিন্ন "জীবের অন্য গতি নাই।" তিনি আকবরকে খৃষ্টের ত্যাগকাহিনী শ্রবণ করাইতেন, তাঁহার মৃত্যুর কথা বলিতেন, আর বলিতেন,—"গোয়া হইতে কতিপয় যাজক আনয়ন করিয়া তাহাদিগের নিকট খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হউন।"

বাদসাহ গোয়ার রাজপ্রতিনিধিকে লিখিয়া পাঠাইলেন,—"অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনাদের খৃষ্ট ধর্ম্মের অভিজ্ঞ কতিপয় যাজককে খৃষ্টধর্ম্মের মূলতথ্য ও সত্য শিক্ষা দিবার জন্য অবিলম্বে ফতেপুরের দরবারে পাঠাইবেন।"

অনেকে বলেন যে, এইপত্র সুলতানা মরিয়মের কৌশললিপি।

গোয়ার ধর্ম্মযাজকদিগের মধ্যে রীতিমত পরীক্ষা আরম্ভ হইল ও অবশেষে পরীক্ষোত্তীর্ণ তিনজন প্রবীণ ধর্ম্মযাজক ত্রাণকর্ত্তা বিশু খৃষ্টের অভয় পাদপদ্ম স্মরণান্তর সম্রাট সদনে চলিলেন। তাঁহারা ভাবিতেছিলেন,—"একবার

আকবরকে দীক্ষিত করিতে পারিলেই সমগ্র ভারতই খৃষ্টান্ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবে।”

মহামতি আকবর খৃষ্টানযাজকদিগের অভ্যর্থনার্থ অপেক্ষা করিতেছিলেন। অবশেষে সেই উচ্চ আশান্বিত বৃদ্ধ যাজকত্রয় সুদীর্ঘ পথশ্রম সহ্য করিয়া ফতেপুরে পৌছিলেন ও কম্পিতকলেবর, ভীতমনে রাজপ্রতিনিধিদত্ত উপহার আনিয়া সম্রাট গোচরে রক্ষা করিলেন। কারণ তাঁহারা জানিতেন না যে, খৃষ্টানের চক্ষে যাহা পবিত্র পদার্থ তাহা মুসলমান সম্রাট গ্রহণ করিবেন কি না।

তাঁহারা আকবরকে বহুভাষায় অনুবাদিত একখানি বাইবেল প্রদান করিলেন। মহামান্য আকবরও তাহা অতি সমাদরে, অতি যত্নে মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক ভক্তি জানাইলেন। তৎপরে খৃষ্ট ও মেরীর Virgin Mary) কতিপয় প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইলে, তাহাও মহাত্মা আকবর সযত্নে চুম্বন করতঃ ভক্তিভরে তৎপ্রতি প্রণত হইলেন।

অনেক ঐতিহাসিক বলেন, মরিয়মের উপদেশানুসারেই আকবর এই সমস্ত কার্য্য করেন।

সেই দিবস রাত্রে যাজকদিগের সহিত সম্রাটের বহু আলাপ হইল, যাজকগণও তাঁহাকে খৃষ্টধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝাইতে প্রয়াস পাইলেন।

পরদিবস আকবর যাজকদিগের জন্যএকটী গির্জ্জা নিরূপণ করিলেন। তথায় সম্রাট প্রত্যহ খৃষ্টের প্রতিমূর্ত্তির প্রতি সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিতেন। তৎপরে তিনি রাজকবি ও মন্ত্রী আবুল ফজলকে খৃষ্টধর্ম্মের সুসমচারগুলির (Gospels) বিশদ পারস্য অনুবাদ করিতে আজ্ঞা দিলেন।

এই সকল ক্রিয়াকলাপে আকবর সত্য সত্যই খৃষ্টধর্ম্মে অনুরক্ত হইয়াছিলেন কিনা তাহা সন্দেহের বিষয়। কোন মুসলমান ঐতিহাসিক আকবরের জীবনী প্রণয়ন কালে এই সকল খৃষ্টীয় যাজকদিগের মন্দ উদ্দেশ্যে ক্রোধ প্রকাশ করিয়া তাহাদিগের পুরুষান্ত করিতে ত্রুটি করেন নাই।

আকবর কিন্তু আশ্চর্য্য বুদ্ধিমান, তিনি খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত হন নাই এবং যদিও তিনি সুলতানা মরিয়মের উত্তেজনায় সময় সময় খৃষ্টধর্ম্মে অনুরক্তি প্রকাশ করিতেন কিন্তু হিন্দু ও মুসলমান মহিষীবর্গের ভর্ৎসনায় আবার সে ভাব পরিত্যাগ করিতেন। আকবর স্বীয় পুত্রের মধ্যে একজনকে খৃষ্টধর্ম্ম শিক্ষার্থ যাজকদিগের নিকট প্রেরণ করেন। আকবরের মন্ত্রী আবুলফজল খৃষ্ট ধর্ম্মের অনুরাগী হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার সে অনুরাগ বিভিন্ন প্রকারের। তিনি বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদী ছিলেন; “তাঁহার নিকট হিন্দুর মন্দির মুসলমানের মস্‌জিদ ও খৃষ্টানের গির্জ্জা এক ছিল।”

কিছুদিন পরে আকবরের খৃষ্টান সুলতান মরিয়ম ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সম্রাটের খৃষ্টের প্রতি অনুরাগও অন্তর্হিত হইল; আর খৃষ্টীয় যাজকদিগের আশা ভরসাও সমূলে নির্ম্মূল হইল, তাঁহারা নিরাশহৃদয়ে সন্তপ্ত পরাণে অপমানের ডালি মাথায় করিয়া গোয়ায় ফিরিলেন।

ইহার কিয়ৎ দিবস পরে সম্রাটেরও মৃত্যু হইল। তাঁহার মৃতদেহ শেকন্দরের উদ্যানে কবরস্থ করা হয়। তথায় এখনও সেই খৃষ্টীয় মহিষীর স্মৃতির নিদর্শন স্বরূপ তৎপার্শ্বে

ক্রশ (Cross) স্থাপিত দেখিতে পাওয়া যায়।

মহামান্ত Wheeler সাহেব বলেন,—... "He (আকবর) married a Christian wife known as Miriam or Mary; and he built a palace for her at Futtehpore which is to be seen to this day, and was characterised by refinements which in those days were only known to Europeans. He entertained Christian Fathers from the Portuguese settlement at Goa. He permitted them to build a Catholic chapel and set upon altar within the precincts of his palace at Futtehpore; to carry cross in procession through the streets, and to preach Christinity whereever they pleased."

আকবরের সময় হইতেই মোগল সম্রাটগণ খৃষ্টান্ রমণীর পাণিগ্রহণ করিতে চেষ্টা পান। জাহাঙ্গীর প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক Roeএর নিকট তাঁহার মৃতা পত্নীর প্রতিকৃতি দেখিয়া তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হন। কিন্তু যখন তিনি জানিতে পারিলেন যে তাঁহার জীবনতোষিণী খৃষ্টরমণী মৃতা, তিনি স্বীয় শয়নাগারে সেই রমণীর প্রতিকৃতি রক্ষা করিলেন।

জাহাঙ্গীরের জ্যেষ্টপুত্র খুস্রু খৃষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত হন ও জনৈক খৃষ্টরমণীর পাণিগ্রহণ করিতে সংকল্প করেন।

এ সম্বন্ধে Wheeler সাহেব বলেন,— "Khusru was supposed to be a Christian and he so far carried his Christianity that he would only marry one wife."

মহামতি W. W. Hunter বলেন,— "Figures of Christ and the Virgin Mary adorned his (জাহাঙ্গীরের) rosaries; and two of his nephews embraced Christianity with his full approval."

সম্রাট ঔরঙ্গজেবও একটী সার্কাসিয়ান রমনীকে বিবাহ করেন। এই রমণী প্রথমতঃ তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারার নিকট দাসীরূপে বিক্রীত হয়, তৎপর তাঁহার হন্তা ঔরঙ্গজেব সেই দাসীকে আপন অন্তঃপুরে রাখিয়াছিলেন। এই সুলতানার গর্ভে ঔরঙ্গজেবের একটী পুত্র জন্মে তাঁহার নাম "কাম্‌বকস্"। ইঁহাকে গ্রীকগণ Cambyses বলেন। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর এই মহিষী তাঁহার পুত্রকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে বহু প্রয়াস পান, কিন্তু তাঁহার অশ্রু ও অনুরোধ সমস্তই উপেক্ষা করিয়া সাহ্ আলম বাহাদুরসাহ নামধারণ পূর্ব্বক সিংহাসন অধিকার করেন। কামবকস্ অবশেষে পরাজিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং ঐ খৃষ্টান্ সুলতানা পতিপুত্রের শোক সংবরণ করিতে না পারিয়া ইহধাম হইতে অবসর গ্রহণ করেন।*

শ্রীতারানাথ রায়।

* See Wheeler's Tales from Indian history (Jahangir & Aurangzeb)

সনেট

খ্যাতনামা ইতালীয় কবি পেত্রার্কা সনেটের স্রষ্টা। তাঁহার রচিত সনেটে একটি বেশ স্পষ্ট আকার এবং গঠন আছে। অদ্যাবধি ল্যাটিনজাতীয়, অর্থাৎ ইতালীয় ফরাসী প্রভৃতি কবিরা পেত্রার্কার নিয়ম রক্ষা করিয়াই সনেট লেখেন। সে নিয়ম এই ঃ—একটি সনেট চতুর্দ্দশ পদে আবদ্ধ এবং দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম আট পদে তার পূর্ব্বভাগ এবং শেষ চার পদে উত্তর ভাগ। পূর্ব্বভাগে কোন একটি বিষয়ের অবতারণা করিয়া উত্তর ভাগে সনেট-লেখকের নিজের বক্তব্য বলিতে হইবে। নবম এবং দশম পদের উদ্দেশ্য পূর্ব্ব এবং উত্তর ভাগের মধ্যে যোগ রক্ষা করা,—যাহাতে উক্ত দুই ভাগ খাপছাড়া না হয়। সুতরাং লেখক নিজের ইচ্ছানুসারে নবম দশম পদকে হয় পূর্ব্ব ভাগের শেষ কিম্বা উত্তর ভাগের আরম্ভ হিসাবে ব্যবহার করিতে পারেন। এই ত গেল সনেটের আভ্যন্তরিক গঠন। তাহার বাহ্য আকারের নিয়ম এইরূপ ঃ—প্রথম, চতুর্থ, পঞ্চম, এবং অষ্টম চরণ পরস্পর মিলিবে। দ্বিতীয়, তৃতীয়, ষষ্ঠ এবং সপ্তম চরণের মিলের নিয়মও ঐরূপ। নবম এবং দশম এই দুই চরণ পরস্পর মিলিবে। তারপর হয় একাদশ চরণের সহিত ত্রয়োদশের এবং দ্বাদশের সহিত চতুর্দ্দশের মিল হওয়া চাই, নয়ত একাদশের সহিত চতুর্দ্দশের এবং দ্বাদশের সহিত ত্রয়োদশ চরণের মিল করিতে হইবে। নিম্নলিখিত সনেট কয়টি পেত্রার্কার নিয়ম রক্ষা করিয়া রচিত হইয়াছে।

সনেট

পেত্রার্কা চরণে ধরি করি ছন্দোবন্ধ,
যাঁহার প্রতিভা মর্ত্ত্যে সনেটে সাকার—
একমাত্র তাঁরে গুরু করেছি স্বীকার,
গুরু শিষ্যে নাহি কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধ !

নীরব কবিও ভাল, মন্দ শুধু অন্ধ,—
—বাণী যার মনশ্চক্ষে না ধরে আকার
তাহার কবিত্ব শুধু মনের বিকার,
এ কথা পণ্ডিতে বোঝে, মূর্খে লাগে ধন্ধ !

ভালবাসি সনেটের কঠিন বন্ধন,
শিল্পী যাহে মুক্তি লভে, অপরে ক্রন্দন !

ইতালীর ছাঁচে ঢেলে বাঙ্গালীর ছন্দ,
গড়িয়া তুলিতে চাই স্বরূপ সনেট,
কিঞ্চিৎ থাকিবে তাহে বিজাতীয় গন্ধ—
সরস্বতী দেখা দিবে পরিয়া বনেট !

ভর্ত্তৃহরি

যোগী তুমি, ভোগী তুমি, তুমি রাজ-কবি,
দেখেছ কখনো বিশ্ব শুধু নারীময়,
আবার দেখেছ বিশ্ব শুধু ব্রহ্মময়,
সুবর্ণে গৈরিকে আঁকো সেই দুই ছবি !

ক্ষণিকের জ্যোতিকণা জানো শশী রবি,
বিশ্বরূপে মুগ্ধ তবু, সৌন্দর্য্যে তন্ময় !
অসীম আঁধারমগ্ন অনন্ত সময়
আত্মজ্যোতি-দীপালোকে শূন্য দেখ সবি !

নাস্তিকের শিরোমণি, আস্তিকের রাজা,
তব ধর্ম্ম মনোরাজ্যে বহুরূপী সাজা !

নাহি জানো কারে বলে ভয় কিম্বা আশা,
ভুক্তি মুক্তি তোমা কাছে সমান অসার,
সত্য শুধু মানবের অনন্ত পিপাসা,
রত্ন দিয়ে তাই গাঁথো বৈরাগ্যের হার !

ব্যর্থ বৈরাগ্য

এসেছে নূতন দিন ধরি যোগীবেশ,
কালকের ফুল যত গিয়েছে শুকিয়ে,
কালকের ভুল যত গিয়েছে চুকিয়ে,
আগেকার জীবনের পালা হ'ল শেষ!

ঝরা ফুলে ভরা বিশ্ব, গন্ধ নাহি লেশ—
জীবনের বেশীভাগ দিয়েছি ফুঁকিয়ে,
বাকীটুকু মৃত্যু পানে পড়েছে ঝুঁকিয়ে,
যে সুর বাজিত কাণে, নাহি তার রেশ!

জীবনের স্রোত চলে দক্ষিণ-বাহিনী,
উত্তরে পড়িয়া থাকে পূর্ব্বের কাহিনী!

উপরে উঠিছে ভাসি নব ভগ্ন আশা,
বিরাম মানে না স্রোত, বহে খরধার,
আবার ফেলিতে হবে জীবনের পাশা,
খেলা নিয়ে কথা শুধু, মিছে জিত হার!

পত্রলেখা

অষ্টাদশ বর্ষদেশে আছ, পত্রলেখা!
শুক-মুখে শুনিয়াছি তোমার সন্দেশ,
তাম্বুল-করঙ্ক করে, রক্ত পট্টবেশ,
প্রগল্‌ভ বচন, রাজ-অন্তঃপুরে শেখা!

কাব্য-রাজ্যে, তোমা সনে নিমেষের দেখা,
সুবর্ণ-মেখলাস্পর্শী মুক্ত তব কেশ,
অশ্বপৃষ্ঠে রাজপুত্র যায় দূর দেশ,
অঙ্কে তার আঁকা তুমি বিদ্যুতের রেখা!

চন্দ্রাপীড় মুগ্ধনেত্রে হেরে কাদম্বরী,—
রক্তাম্বরে তুমি রাখো হৃদয় সম্বরি!

গিরি পুরী লঙ্ঘি, সিন্ধু কান্তার বিজন,
মনোরথে নীলাম্বরে ভ্রমি যবে একা,
মম অঙ্কে এসে বস', কবির সৃজন,
তাম্বুল-করঙ্ক করে তুমি পত্রলেখা!

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

আধুনিক য়ুরোপীয় সঙ্গীত

আজকাল আমাদের সঙ্গীতের উপর য়ুরোপীয়দিগের দৃষ্টি পড়িয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আমাদের সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়াছেন। ইহা একটা শুভলক্ষণ বলিতে হইবে। তাঁহারা যেমন আমাদের সঙ্গীত অনুশীলন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, আমাদের সঙ্গীতের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন, আমরাও যেন সরল অন্তঃকরণে য়ুরোপীয় সঙ্গীত বুঝিবার জন্য চেষ্টা করি। তাহা হইলে আমাদের সঙ্গীতেরও আমরা উন্নতি সাধন করিতে পারিব। আমরা বুঝিতে পারিব, সঙ্গীতের কোন্ অংশে আমরা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছি, এবং কোন্ অংশে য়ুরোপীয়েরা উন্নতি সাধন করিয়াছে! এবং তাহা হইলে, আমাদের সঙ্গীতে যে ত্রুটি ও অভাব আছে তাহা পূরণ করিতে আমরা সমর্থ হইব। সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে, আমাদের গানের সুর (melody) য়ুরোপীয়

গানের সুর অপেক্ষা সমধিক পরিপুষ্ট, সমধিক বিচিত্র, সমধিক রসগর্ভ। আমাদের রাগ রাগিনীতে এক একটি বিশেষ ভাব যেরূপ মূর্ত্তিগ্রহ করে তাহা য়ুরোপীয় কোন "মেলডি"তে দেখিতে পাওয়া যায় না। য়ুরোপীয়েরা এই অভাবটি তাঁহাদের সুর-সঙ্গৎ (accompaniment) বা বহুমিল ঐকতানের (harmony) দ্বারা কতকটা পূরণ করেন। আমাদের ঐকতান সমস্বরের ঐকতান। আমাদের ঐকতান-বাদ্যে, যে সুর বেহালায় বাজিতেছে সেই একই সুর এস্‌রাজেও বাজিতেছে, হারমোনিয়মেতেও বাজিতেছে। কিন্তু য়ুরোপীয়দিগের ঐকতান বিচিত্র স্বরের মিল হইতে অর্থাৎ বাদীসম্বাদী প্রভৃতি বিভিন্ন সুরের মিল হইতে উৎপন্ন। আমাদের সঙ্গীতে বাদীসম্বাদীস্বরমূলক ঐকতানের কতকটা চর্চ্চা যে না হইয়াছিল এরূপ নহে। কতকটা সূত্রপাত মাত্র হইয়াছিল, কিন্তু য়ুরোপীয়েরা সঙ্গীতের এই বিভাগটিকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। আমরা যেরূপ বাঁয়া তবলা প্রভৃতি তাল-বাদ্য যন্ত্রের দ্বারা সঙ্গৎ করি, সেইরূপ উহারা পিয়ানো প্রভৃতি সুর-বাদ্যযন্ত্রে মূল-সুরের সহিত বাঁ হাতে কতকগুলি বাদী-সম্বাদামূলক সুর এক সঙ্গে বাজাইয়া সুরের বৈচিত্র্য সম্পাদন করে, তালের মাত্রা গুলিকেও ফুটাইয়া তুলে। বিবিধ বাদ্যযন্ত্রের ঐকতান সঙ্গীতেও উহারা বিবিধ যন্ত্রে বিচিত্র মিলের সুর বাজাইয়া একটা ঐকতান উৎপাদন করে। ইহাই য়ুরোপীয় সঙ্গীতের বিশেষত্ব।

ওয়াগ্‌নেয়ার (Wagner) আধুনিক য়ুরোপীয় সঙ্গীতের একজন বড় ওস্তাদ। ... করিয়াছেন। তাঁহাকে সঙ্গীত-নাট্যের ঠিক্ স্রষ্টা বলা যায় না; কারণ, তাঁহার পূর্ব্বে ওএবের্ (Weber) তাহার কতকটা সূচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ওয়াগ্‌নেয়ার (Music-drama) সঙ্গীত-নাট্যের যে একটা সুস্পষ্ট আকার দিয়াছিলেন ও প্রভূত উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। এখানে "সঙ্গীত" অর্থে যন্ত্রসঙ্গীত বুঝিতে হইবে। এই প্রকার সঙ্গীত-নাট্যে, শুধু কাব্যাংশের দ্বারা নাটকের ভাবটি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায় না, উহাকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য বিবিধ যন্ত্রোত্থিত সমবেত সঙ্গীতের অপেক্ষা করে। পূর্ব্ব-পূর্ব্ব ওস্তাদদিগের গীতি-নাট্যে বিচ্ছিন্ন ভাবে বিভিন্ন সুরের সংযোগ থাকিত। কিন্তু ওয়াগ্‌নেয়ার-গীতি-নাট্যে, গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত, প্রত্যেক শব্দার্থের অনুরূপ ভাব, যন্ত্র-সঙ্গীতের দ্বারা ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিবার চেষ্টা আরম্ভ হইল। ওয়াগ্‌নেয়ারের "সাঙ্গীতিক নাটক"কে কবিতা ও যন্ত্রসঙ্গীতের সম্মিলন বলা যাইতে পারে। কখন কখন তিনি যন্ত্রসঙ্গীতের দ্বারা বাস্তব দৃশ্যের অনুকরণ করিতেন।

তিনি একবার সমুদ্রভ্রমণে বাহির হইয়া তিন-তিনবার ঝড়ে পড়িয়াছিলেন। এবং তাঁহার জাহাজ সেই প্রচণ্ড বাত্যাতাড়িত উত্তালতরঙ্গে এরূপ আন্দোলিত হইয়াছিল যে নর্‌ওয়ের এক বন্দরে গিয়া তবে সেই জাহাজ রক্ষা পায়। সেই সময়ে তিনি নাবিকদিগের নিকট "Flying duchman" নামে একটা কাহিনী শুনিয়াছিলেন। পরে এই বাত্যাতাড়িত জাহাজের কাহিনী অবলম্বন করিয়া তিনি একটি গীতি-নাট্য রচনা করেন।

তাহাতে ঝড়ের বর্ণনা আছে; সেই ঝড়ের ভীষণ গর্জ্জনের অনুকরণে তিনি যন্ত্রসঙ্গীতের যোজনা করিয়াছিলেন।

"অপেরা" ছাড়া য়ুরোপীয় সঙ্গীতের অন্যান্য শাখাও উনবিংশ-শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে উন্নতি লাভ করে। এই কালকেও আধুনিক বলা যাইতে পারে। এই যুগের প্রধান ওস্তাদ—বীথোবেন Beethoven) শূবের্ট্ (Schubert) ও শোপ্যাঁ (chopin)। ঊনবিংশতি শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্দ্ধের ওস্তাদ—লিজট্ (Liszt)। বিবিধ যন্ত্রের উপযোগী ঐক্যতানবাদ্যের জন্য যে এক প্রকার স্বরবিন্যাস রচিত হয় তাহাকে য়ুরোপীয় সঙ্গীতের ভাষায় "সিম্ফনি" (Symphony) বলে। হেড্‌ন (Haydn) ও মোজার (Mozart) এইরূপ সাঙ্গীতিক রচনার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু বীথোভেনের রচনার সহিত তুলনা করিলে, তাঁহাদের রচনা পুতুলের ঘর ও বীথোভেনের রচনা প্রকাণ্ড অট্টালিকা বলিয়া মনে হয়। বীথোভেন শুধু যে সাঙ্গীতিক আকারের পুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন তাহা নহে, তিনি ছন্দেরও বৈচিত্র্য বিধান করিয়াছিলেন, মূলসুরের বিস্তারসাধন করিয়াছিলেন ও যন্ত্রসঙ্গীতকে আরও গভীররূপে ভাবব্যঞ্জক করিয়া তুলিয়াছিলেন। এবং মেন্‌ডেল্‌সন (Mendelssohn) ও শুমান্ (Schumann) এই দুই ওস্তাদের রচনায় যে ঔপন্যাসিকতার (Romanticism) পরিপুষ্টি দেখা যায়, বীথোভেনের রচনায় তাহার অঙ্কুর পরিদৃষ্ট হয়। মেন্‌ডেল্‌সনের দিনকাল গত হইয়াছে, কিন্তু য়ুরোপীয় আধুনিক সঙ্গীতে Schumannএর প্রভাব এখনও বলবৎ।

আর একজন প্রসিদ্ধ ওস্তাদ ব্রাম্‌স্ (Brahms); ইঁহাকে সঙ্গীতের Browning বলিলেও হয়। সঙ্গীতের হিসাবে, ইনি Schumannএর পুত্র ও Beethovenএর পৌত্র। Brahms কোন opera লেখেন নাই। Brahmsএর প্রতিযোগী Lisz‘. লিজ্ কেবল কনসার্ট-হলের জন্য কাব্যরসাত্মক বা বর্ণনাত্মক (programme music) সঙ্গীত রচনা করিতেন, কিন্তু Brahms বিশুদ্ধ সঙ্গীতের গৎ রচনা করিতেন; তাহার সহিত কবিতার কোন যোগ ছিল না। প্রোগ্রামে লিখিত কোন কবিতা-পদের ভাবানুরূপ যে সঙ্গীত হয় তাহাকেই "প্রোগ্রাম সঙ্গীত" বলে।

আর এক ওস্তাদ Schubert; তিনি সুর ও ভাব সম্বন্ধে সঙ্গীতের এক নূতন জগৎ উদ্‌ঘাটিত করিলেন। বীথোভেনের রচনা সমধিক বিচিত্র, সুমধুর ও চিত্তবিমোহন। সঙ্গীতের ধাতব যন্ত্রগুলি মৃদুভাবে বাজাইয়া তিনি ঐক্যতানবাদ্যে এমন একটি রং ফলাইতেন যে, পরবর্ত্তী ওস্তাদেরা এই অভিনব পন্থার অনুসরণ করিতে লাগিল। তা ছাড়া সর্ব্বপ্রথমে Schubertই দেখান, খরজ হইতে খরজান্তরে অবাধে বিচরণ করিয়া করিয়া কিরূপে সঙ্গীতের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ও ভাবরস ফুটাইয়া তুলা যায়। তিনি পিয়ানো যন্ত্রে উপস্থিত-মত যে সকল গৎ মনের খেয়ালে বাজাইতেন, তাহাই mendelsohnএর "বাক্যহীন গীতের" আদর্শ হইয়াছিল। তাঁহার রচিত যে-নৃত্যসঙ্গীতের জন্য ভিয়েনা-নগর বিখ্যাত, শূবের্ট্-রচিত valse-নৃত্যের সুললিত গৎগুলি তাহারই অগ্রদূত বলিলেও হয়। পরে কনিষ্ঠ Johann Strauss এই

Waltz-নৃত্যের চরম উৎকর্ষ সাধন করেন। তিনি "Waltz নৃত্যের রাজা" বলিয়া য়ুরোপে প্রসিদ্ধ। এই সকল বিষয়ে শূবের্টকে য়ুরোপীয় সঙ্গীতের যুগান্তরকারী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তা ছাড়া তিনি "Art-Song" অর্থাৎ "কলা-গীতের" স্রষ্টা। যে গান যন্ত্রসঙ্গীত বা সুর-সঙ্গৎ ব্যতীত সম্পূর্ণ রূপে বিকাশ পায় না,—গানের সুর ও সঙ্গতের সুর এই উভয়ের নিপুণ সম্মিলনে যে গীত রচিত হয় তাহাকেই art-song বলে। শূমান, ফ্রান্জ্ প্রভৃতি গানের সুর-রচয়িতারা একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। শূবের্টের সর্ব্বোৎকৃষ্ট গীতগুলি য়ুরোপীয় গীত-জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। Wagnerএর "সাঙ্গীতিক নাট্যে"র ন্যায় এবং Lisztএর "ঐক্যতানিক কবিতা"র (Symphonic poem) ন্যায় শূবের্টের গানগুলিও য়ুরোপীয় আধুনিক সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত।

য়ুরোপীয় আধুনিক সঙ্গীতের আর এক ওস্তাদ শোপ্যাঁ (chopin). প্রসিদ্ধ ওস্তাদ Rubenstein বলেন, তিনি "পিয়ানো যন্ত্রের অন্তরাত্মা" (soul) ছিলেন। তাঁহার পিয়ানোকে তিনি যেন কথা কহাইতেন; ইতিপূর্ব্বে এরূপভাবে কোন ওস্তাদ পিয়ানো বাজাইতে পারে নাই। তিনি "পেড্যাল" চাপিয়া, "কর্ডের" (বাদীসম্বাদীমূলক স্বরপুঞ্জ) স্বরগুলিকে সমস্ত সপ্তকে এমনভাবে ছড়াইয়া দিতেন যে মনে হইত যেন চার হাতে পিয়ানো বাজিতেছে। Liszt, Rubenstein, Paderewsko প্রভৃতি ওস্তাদ-গণ এই প্রণালীর উন্নতি সাধন করিলেও, শোপ্যাঁকে ইহার প্রবর্ত্তক বলিতে হইবে। শোপ্যাঁর পিতা ফরাসী ও মাতা পোল্যাণ্ড-দেশীয়। হঙ্গেরীয় দেশীয় Liszt পিয়ানো বাদকদিগের মধ্যে সর্ব্বোত্তম বলিয়া প্রখ্যাত। নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্রে বাদিত ঐক্যতানসঙ্গীতে শ্রোতৃবর্গের মনে যে ভাবের উদয় হয়, এক পিয়ানো যন্ত্র হইতেই তিনি সেই ভাবটি প্রকাশ করিতে পারিতেন; কিন্তু শেষে তিনি দেখিলেন বাদ্যযন্ত্রোত্থিত বিভিন্ন ঐক্যতানের স্থান পিয়ানো কখনই অধিকার করিতে পারে না। তাই তিনি বিবিধ যন্ত্রের ঐক্যতান-সঙ্গীতের উন্নতি সাধনে বিশেষরূপে মনোনিবেশ করিলেন। অতএব দেখা যায়, এক একজন নিপুণ ওস্তাদ আবির্ভূত হইয়া ধারাবাহিকক্রমে য়ুরোপীয় সঙ্গীতের কিরূপ উন্নতি সাধন করিয়াছেন। আমাদের সঙ্গীত গতানুগতিকভাবেই চলিয়া আসিতেছে; ক্রমোন্নতি হওয়া দূরে থাক্, যেটুকু উন্নতি হইয়াছিল তাহাও লোপ পাইতে বসিয়াছে। শুধু সঙ্গীতে নহে, আমাদের সকল বিষয়েই এইরূপ। হায়! আমাদের কি দুর্গতি!

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সঙ্গীত

আমরা গ্রীষ্মঋতুর অবসানের দিকে এ দেশে আসিয়া পৌঁছিয়াছি; এখন এখানে সঙ্গীতের আসর ভাঙিবার মুখে। কোনো বড় ওস্তাদের গান বা বাজনার বৈঠক এখন আর নাই। এখানকার নিকুঞ্জে গ্রীষ্মকালে পাখীরা নানা সমুদ্র পার হইয়া আসে, আবার তাহারা সভা ভঙ্গ করিয়া চলিয়া যায়। মানুষের সঙ্গীতও এখানে সকল ঋতুতে বাজে না; তাহার বিশেষ কাল আছে; সেই সময়ে পৃথিবীর নানা ওস্তাদ নানা দিক হইতে আসিয়া এখানে সঙ্গীত সরস্বতীর পূজা করিয়া থাকে।

আমাদের দেশেও একদিন এইরূপ গীত-বাদ্যের পরব ছিল। পূজাপার্ব্বনের সময় বড় বড় ধনীদের বাড়িতে নানা দেশের গুণীরা আসিয়া জুটিত। সেই সকল সঙ্গীতসভায় দেশের সাধারণ লোকের প্রবেশ অবারিত ছিল। তখন লক্ষ্মী সরস্বতী একত্র মিলিতেন এবং সঙ্গীতের বসন্ত সমীরণ সমস্ত দেশের হৃদয়ের উপর দিয়া প্রবাহিত হইত। সকল দেশেই একদিন বুনিয়াদী ধনীরাই দেশের শিল্প সাহিত্য সঙ্গীতকে আশ্রয় দিয়া রক্ষা করিয়াছে। য়ুরোপে এখন গণসাধারণ সেই বুনিয়াদিবংশের স্থান অধিকার করিয়াছে; আমাদের দেশে বারোয়ারি দ্বারা যেটা ঘটিয়া থাকে সেইটে য়ুরোপে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। বারোয়ারিই এখানে ওস্তাদ আনাইয়া গান শোনে; বারোয়ারির কৃপাতেই নিরন্ন কবির দৈন্য মোচন হয়, এবং চিত্রকর ছবি আঁকিয়া লক্ষ্মীর প্রসাদ লাভ করে। কিন্তু আমাদের দেশে বর্ত্তমানকালে ধনীদের ধনের কোনো দায়িত্ব নাই; সে ধনের দ্বারা কেবল ল্যাজারাস, অস্লার, হ্যামিল্টন, হার্ম্মান এবং ম্যাকিণ্টশ বার্ণ কোম্পানিরই মুনফা বৃদ্ধি হইয়া থাকে; এদিকে গণসাধারণেরও না আছে শক্তি, না আছে রুচি। আমাদের দেশে কলা-বধূকে লক্ষ্মীও ত্যাগ করিয়াছেন, গণেশের ঘরেও এখনও তাঁহার স্থান হয় নাই।

আমার ভাগ্যক্রমে এবারে আমি লণ্ডনে আসার কয়েক সপ্তাহ পরেই ক্রিষ্টলপ্যালাসের গীতশালায় হ্যাণ্ডেল উৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ সঙ্গীতরচয়িতা হ্যাণ্ডেল জর্ম্মান ছিলেন কিন্তু ইংলণ্ডেই তিনি অধিকাংশ জীবন যাপন করিয়াছিলেন। বাইবেলের কোনো কোনো অংশ ইনি সুরে বসাইয়াছিলেন, সেগুলি এদেশে বিশেষ আদর পাইয়াছে। এই গীতগুলিই বহুশত যন্ত্রযোগে বহুশত কণ্ঠে মিলিয়া হ্যাণ্ডেল উৎসবে গাওয়া হইয়া থাকে। চারি হাজার যন্ত্রী ও গায়কে মিলিয়া এবারকার উৎসব সম্পন্ন হইয়াছিল।

এই উৎসবে আমি উপস্থিত ছিলাম। বিরাট সভাগৃহের গ্যালারিতে স্তরে স্তরে গায়ক ও বাদক বসিয়া গিয়াছে। এত বৃহৎ ব্যাপার যে দুর্ব্বিনের সাহায্য ব্যতীত স্পষ্ট করিয়া কাহাকে দেখা যায় না; মনে হয় যেন পুঞ্জ পুঞ্জ মানুষের মেঘ করিয়াছে। স্ত্রী ও পুরুষ গায়কেরা উদারা মুদারা ও তারা সুরের কণ্ঠ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বসিয়াছে। একই রঙের একই রকমের কাপড়; সবসুদ্ধ মনে হয় প্রকাণ্ড একটা পটের উপর কে যেন লাইনে লাইনে পশমের বুনানি করিয়া গিয়াছে।

চার হাজার কণ্ঠে ও যন্ত্রে সঙ্গীত জাগিয়া উঠিল। ইহার মধ্যে একটি সুর পথ ভুলিল না। চার হাজার সুরের ধারা নৃত্য করিতে করিতে একসঙ্গে বাহির হইল, তাহারা কেহ কাহাকেও আঘাত করিল না। অথচ সমতান নহে, বিচিত্র তানের বিপুল সম্মিলন। এই বহু বিচিত্রকে এমনতর অনিন্দনীয় সুসম্পূর্ণতায় এক করিয়া তুলিবার মধ্যে যে একটা বৃহৎ শক্তি আছে আমি তাহাই অনুভব করিয়া বিস্মিত হইয়া গেলাম। এত বড় বৃহৎক্ষেত্রে অন্তরে বাহিরে এই জাগ্রত শক্তির কোথাও কিছুমাত্র ঔদাস্য নাই, জড়ত্ব নাই। আসন বসন হইতে আরম্ভ করিয়া গীতকলার পারিপাট্য পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র তাহার অমোঘ বিধান প্রত্যেক অংশটিকে সমগ্রের সঙ্গে মিলাইয়া নিয়ন্ত্রিত করিতেছে।

মাঝে মাঝে ছাপানো প্রোগ্রাম খুলিয়া গানের কথার সঙ্গে সুরকে মিলাইয়া দেখিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু মিল যে দেখিতে পাইয়াছিলাম তাহা বলিতে পারি না। এত বড় একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার গড়িয়া তুলিলে সেটা যে একটা যন্ত্রের জিনিষ হইয়া উঠিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। বাহিরের আয়তন বৃহৎ, বিচিত্র ও নির্দ্দোষ হইয়া উঠিয়াছে কিন্তু ভাবের রসটি চাপা পড়িয়াছে। আমার মনে হইল বৃহৎ ব্যূহবদ্ধ সৈন্যদল যেমন করিয়া চলে এই সঙ্গীতের গতি সেইরূপ; ইহাতে শক্তি আছে কিন্তু লীলা নাই।

কিন্তু তাই বলিয়া সমস্ত য়ুরোপীয় সঙ্গীত পদার্থটাই যে এই শ্রেণীর, তাহা বলিলে সত্য বলা হইবে না। অর্থাৎ য়ুরোপীয় সঙ্গীতে আকারের নৈপুণ্যই প্রধান, ভাবের রস প্রধান নহে একথা বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। কারণ, ইহা প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে সঙ্গীতের রসসুধায় য়ুরোপকে কিরূপ মাতাইয়া তোলে। ফুলের প্রতি মৌমাছির আগ্রহ দেখিলেই বুঝা যাইবে ফুলে মধু আছে, সে মধু আমার গোচর না হইতেও পারে।

য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের দেশের সঙ্গীতের একজায়গায় মূলতঃ প্রভেদ আছে সে কথা সত্য। হার্ম্মনি বা স্বরসঙ্গতি য়ুরোপীয় সঙ্গীতের প্রধান বস্তু, আর রাগরাগিণীই আমাদের সঙ্গীতের মুখ্য অবলম্বন। য়ুরোপ বিচিত্রের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছে, আমরা একের দিকে। বিশ্বসঙ্গীতে আমরা দেখিতেছি বিচিত্রের তান সহস্রধারায় উচ্ছ্বসিত হইতেছে; একটি আর একটির প্রতিধ্বনি নহে; প্রত্যেকেরই নিজের বিশেষত্ব আছে; অথচ সমস্তই এক হইয়া আকাশকে পূর্ণ করিয়া তুলিতেছে। হার্ম্মনি, জগতের সেই বহুরূপের বিরাট নৃত্যলীলাকে সুর দিয়া দেখাইতেছে। কিন্তু নিশ্চয়ই মাঝখানে একটি এক-রাগিণীর গান চলিতেছে; সেই গানের তানলয়টিকেই ঘিরিয়া ঘিরিয়া নৃত্য আপনার বিচিত্র গতিকে সার্থক করিয়া তুলিতেছে। আমাদের দেশের সঙ্গীত সেই মাঝখানের গানটিকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। সেই গভীর, গোপন, সেই এক—যাহাকে ধ্যানে পাওয়া যায়; যাহা আকাশে স্তব্ধ হইয়া আছে। চিরধাবমান বিচিত্রের সঙ্গে যোগ দিয়া তাল রাখিয়া চলা ইহাই য়ুরোপীয় প্রকৃতি, আর, চির নিস্তব্ধ একের দিকে কোন পাতিয়া মন রাখিয়া আপনাকে শান্ত করা ইহাই আমাদের স্বভাব।

আমাদের দেশের সঙ্গীতে কি ইহাই

আমরা অনুভব করি না? য়ুরোপের সঙ্গীতে দেখিতে পাই মানুষের সমস্ত ঢেউ খেলার সঙ্গে তাহার তালমানের যোগ আছে, মানুষের হাসি কান্নার সঙ্গে তাহার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ। আমাদের সঙ্গীত মানুষের জীবনলীলার ভিতর হইতে উঠে না, তাহার বাহির হইতে বহিয়া আসে। য়ুরোপের সঙ্গীতে মানুষ আপনার ঘরের আলো উৎসবের আলো নানা রঙের ঝাড়ে লণ্ঠনে বিচিত্র করিয়া জ্বালাইয়াছে, আমাদের সঙ্গীতে দিগন্ত হইতে চাঁদের আলো আসিয়া পড়িয়াছে। সেইজন্য বারবার ইহা অনুভব করিয়াছি আমাদের সঙ্গীত আমাদের সুখ দুঃখকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়। আমাদের বিবাহের রাত্রে রসনচৌকিতে সাহানা বাজে। কিন্তু সেই সাহানার তানের মধ্যে প্রমোদের ঢেউ খেলে কোথায়? তাহার মধ্যে যৌবনের চাঞ্চল্য কিছুমাত্র নাই; তাহা গম্ভীর; তাহার মিড়ের ভাঁজে ভাঁজে করুণা। আমাদের দেশে আধুনিক বিবাহে শানাইয়ের সঙ্গে বিলাতী ব্যাণ্ড বাজানো বড়মানুষী বর্ব্বরতার একটা অঙ্গ। উভয়ের প্রভেদ একেবারে সুস্পষ্ট। বিলাতী ব্যাণ্ডের সুরে মানুষের আমোদ আহ্লাদের সমারোহ ধরণী কাঁপাইয়া তুলিতেছে; যেমন লোকজনের ভিড়, যেমন হাস্যালাপ, যেমন সাজ সজ্জা, যেমন ফুলপাতা আলোকের ঘটা, ব্যাণ্ডের সুরের উচ্ছ্বাসও ঠিক তেমনি। কিন্তু বিবাহের প্রমোদ সভাকে চারিদিকে বেষ্টন করিয়া যে অন্ধকার রাত্রি নিস্তব্ধ হইয়া আছে; যেখানে লোকলোকান্তরের অনন্ত উৎসব নীরব নক্ষত্রসভায় প্রশান্ত আলোকে দীপ্যমান, সাহানার সুর সেইখানকার বাণী বহন করিয়া প্রবেশ করে। আমাদের সঙ্গীত মানুষের প্রমোদশালার সিংহদ্বারটা ধীরে ধীরে খুলিয়া দেয় এবং জনতার মাঝখানে অসীমকে আহ্বান করিয়া আনে। আমাদের সঙ্গীত একের গান—একলার গান; কিন্তু তাহা কোণের এক নহে, তাহা বিশ্বব্যাপী এক।

হার্ম্মনি অতিমাত্র প্রবল হইলে গীতটিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে এবং গীত যেখানে অত্যন্ত স্বতন্ত্র হইয়া উঠিতে চায় সেখানে হার্ম্মনিকে কাছে আসিতে দেয় না। উভয়ের মধ্যে এই বিচ্ছেদটা কিছুদিন পর্য্যন্ত ভাল। প্রত্যেকের পূর্ণপরিণত রূপটিকে পাইবার জন্য কিছুকাল প্রত্যেকটিকে স্বাতন্ত্র্যের অবকাশ দেওয়াই উচিত। কিন্তু তাই বলিয়া চিরকালই তাহাদের আইবুড় থাকাটাকে শ্রেয় বলিতে পারিনা। বর ও কন্যা যতদিন যৌবনের পূর্ণতা না পায় ততদিন তাহাদের পৃথক হইয়া বাড়িতে দেওয়াই ভাল—কিন্তু তার পরেও যদি তাহারা মিলিতে না পারে তবে তাহারা অসম্পূর্ণ হইয়া থাকে। গীত ও হার্ম্মনির যে মিলিবার দিন আসিয়াছে তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। সেই মিলনের আয়োজনও সুরু হইয়াছে।

গ্রামে হপ্তায় বিশেষ একদিন হাট বসে, বৎসরে বিশেষ একদিন মেলা হয়। সেইদিন পরস্পরের পণ্য বিনিময় করিয়া মানুষের যাহার যাহা অভাব আছে তাহা মিটাইয়া লয়। মানুষের ইতিহাসেও তেমনি একএকটা যুগে হাটের দিন আসে; সেদিন যে যার আপন আপন সামগ্রী ঝুড়িতে করিয়া আনিয়া পরের সামগ্রী সংগ্রহ করিতে আসে। সেদিন মানুষ বুঝিতে পারে একমাত্র নিজের

উৎপন্ন জিনিষে মানুষের দৈন্য দূর হয় না; বুঝিতে পারে নিজের ঐশ্বর্য্যের একমাত্র সার্থকতা এই যে তাহাতে পরের জিনিষ পাইবার অধিকার জন্মে। এইরূপ যুগকে য়ুরোপের ইতিহাসে রেনেসাঁসের যুগ বলিয়া থাকে। পৃথিবীতে বর্ত্তমান যুগে যে রেনেসাঁসের হাট বসিয়া গেছে এতবড় হাট ইহার আগে আর কোনোদিন বসে নাই। তাহার প্রধান কারণ, আজ পৃথিবীতে চারিদিকের রাস্তা যেমন খোলসা হইয়াছে এমন আর কোনোদিন ছিল না।

কিছুদিন পূর্ব্বে একজন মনীষী আমাকে বলিয়াছিলেন, য়ুরোপে ভারতবর্ষীয় রেনেসাঁসের একটা কাল আসন্ন হইয়াছে। ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক ভাণ্ডারে যে সম্পদ সঞ্চিত আছে হঠাৎ তাহা য়ুরোপের নজরে পড়িতেছে এবং য়ুরোপ অনুভব করিতেছে সেগুলিতে তাহার প্রয়োজন আছে। এতদিন ভারতবর্ষের চিত্র-শিল্প ও স্থাপত্য য়ুরোপের অবজ্ঞাভাজন হইয়াছিল এখন তাহার বিশেষ একটি মহিমা য়ুরোপ দেখিতে পাইয়াছে।

অতি অল্পকাল হইল ভারতবর্ষীয় সঙ্গীতের উপরও য়ুরোপের দৃষ্টি পড়িয়াছে। আমি ভারতবর্ষে থাকিতেই দেখিয়াছি য়ুরোপীয় শ্রোতা তন্ময় হইয়া সুরবাহারে বাগেশ্রী রাগিণীর আলাপ শুনিতেছেন। একদিন দেখিলাম একজন ইংরেজ শ্রোতা একটি সভায় বসিয়া দুইজন বাঙালী যুবকের নিকট সামবেদের গান শুনিতেছেন। গায়ক দুইজন বেদমন্ত্রে ইমন-কল্যাণ ভৈরবী প্রভৃতি বৈঠকি সুরযোগ করিয়া তাঁহাকে সামগান বলিয়া শুনাইতেছেন। তাঁহাকে আমার বলিতে হইল এ জিনিষটাকে সামগান বলিয়া গ্রহণ করা চলিবে না। দেখিলাম তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দেওয়া আমার পক্ষে নিতান্ত বাহুল্য, কারণ তিনি আমার চেয়ে অনেক বেশি জানেন। আমাকে তিনি বেদমন্ত্র আবৃত্তি করিতে বলিলে আমি অল্প যেটুকু জানি সেই অনুসারে আবৃত্তি করিলাম। তখনি তিনি বলিলেন, এ ত যজুর্ব্বেদের আবৃত্তির প্রণালী। বস্তুত আমি যজুর্ব্বেদের মন্ত্রই আবৃত্তি করিয়াছিলাম। বেদগান হইতে আরম্ভ করিয়া ধ্রুপদখেয়ালের রাগমান লয় তিনি তন্ন তন্ন করিয়া সন্ধান করিয়াছেন—তাঁহাকে সহজে ফাঁকি দিবার জো নাই। ইনি ভারতবর্ষীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে বই লিখিতেছেন।

শ্রীমতী মড্ মেকার্থির লেখা মডার্ণ্ রিভিয়ু পত্রিকায় মাঝে মাঝে বাহির হইয়াছে। শিশুকাল হইতেই সঙ্গীতে ইঁহার অসামান্য প্রতিভা। নয় বৎসর বয়স হইতেই ইনি প্রকাশ্য সভায় বেহালা বাজাইয়া শ্রোতাদিগকে বিস্মিত করিয়াছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ইঁহার হাতে স্নায়ুঘটিত পীড়া হওয়াতে ইঁহার বাজনা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ইনি ভারত-বর্ষে থাকিয়া কিছুকাল বিশেষভাবে দক্ষিণ ভারতের সঙ্গীত আলোচনা করিয়াছেন; ইনিও সে সম্বন্ধে বই লিখিতে প্রবৃত্ত আছেন।

একদিন ডাক্তার কুমারস্বামীর এক নিমন্ত্রণপত্রে পড়িলাম তিনি আমাকে রতন-দেবীর গান শুনাইবেন। রতন দেবী কে বুঝিতে পারিলাম না; ভাবিলাম কোনো ভারতবর্ষীয় মহিলা হইবেন। দেখিলাম তিনি

ইংরেজ মেয়ে, যেখানে নিমন্ত্রিত হইয়াছি সেইখানকার তিনি গৃহস্বামিনী।

মেজের উপর বসিয়া কোলে তম্বুরা লইয়া তিনি গান ধরিলেন, আমি আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। এ ত "ঝিলিমিলি পনিয়া" নহে; রীতিমত আলাপ করিয়া তিনি কানাড়া মালকোষ বেহাগ গান করিলেন। তাহাতে সমস্ত দুরূহ মীড় এবং তান লাগাইলেন, হাতের ইঙ্গিতে তাল দিতে লাগিলেন; বিলাতী সম্মার্জ্জনী বুলাইয়া আমাদের সঙ্গীত হইতে তাহার ভারতবর্ষীয়ত্ব বারো আনা পরিমাণ ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিলেন না। আমাদের ওস্তাদের সঙ্গে প্রভেদ এই যে ইহার কণ্ঠস্বরে কোথাও যেন কোনো বাধা নাই; শরীরের মুদ্রায় বা গলার স্বরে কোনো কষ্টকর প্রয়াসের লক্ষণ দেখা গেল না। গানের মূর্ত্তি একেবারে অক্ষুণ্ণ অক্লান্ত হইয়া দেখা দিতে লাগিল।

এদেশে এই যাঁহারা ভারতবর্ষীয় সঙ্গীতের আলোচনায় প্রবৃত্ত আছেন ইঁহারা যে কেবলমাত্র কৌতূহল চরিতার্থ করিতেছেন তাহা নহে; ইঁহারা ইহার মধ্যে একটা অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইয়াছেন; সেই রসটিকে তাঁহারা গ্রহণ করিবার জন্য, এমন কি, সম্ভবমত আপনাদের সঙ্গীতের অঙ্গীভূত করিয়া লইবার জন্য ইঁহারা উৎসুক হইয়াছেন। ইঁহাদের সংখ্যা এখনো নিতান্তই অল্প সন্দেহ নাই কিন্তু আগুন একটা কোণেও যদি লাগে তবে আপনার তেজে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে।

এখানকার লণ্ডন একাডেমি অফ ম্যুজিক-এর অধ্যক্ষ ডাক্তার ইয়র্ক-ট্রটারের সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছে। তিনি ভারতবর্ষীয় সঙ্গীতের কিছু কিছু পরিচয় পাইয়াছেন। যাহাতে লণ্ডনে এই সঙ্গীত আলোচনার একটা উপায় ঘটে সেজন্য আমার নিকট তিনি বারম্বার ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়াছেন। যদি কোনো ভারতবর্ষীয় ধনী রাজা কোনো বড় ওস্তাদ বীণাবাদককে এখানে কিছুকাল রাখিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহার মতে বিস্তর উপকার হইতে পারে।

উপকার আমাদেরই সব চেয়ে বেশি। কেননা, আমাদের শিল্প সঙ্গীতের প্রতি শ্রদ্ধা আমরা হারাইয়াছি। আমাদের জীবনের সঙ্গে তাহার যোগ নিতান্তই ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। নদীতে যখন ভাঁটা পড়ে তখন কেবল পাঁক বাহির হইয়া পড়িতে থাকে; আমাদের সঙ্গীতের স্রোতস্বিনীতে জোয়ার উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে বলিয়া আমরা আজকাল তাহার তলদেশের পঙ্কিলতার মধ্যে লুটাইতেছি; তাহাতে স্নানের উল্টা কাজ হয়। আমাদের ঘরে ঘরে গ্রামোফোনে যে সকল সুর বাজিতেছে, থিয়েটার হইতে যে সকল গান শিখিতেছি তাহা শুনিলেই বুঝিতে পারিব আমাদের চিত্তের দারিদ্র্যে কদর্য্যতা যে কেবল প্রকাশমান হইয়া পড়িয়াছে তাহা নহে, সেই কদর্য্যতাকেই আমরা অঙ্গের ভূষণ বলিয়া ধারণ করিতেছি। সস্তা খেলো জিনিষকে কেহ একেবারে পৃথিবী হইতে বিদায় করিতে পারে না; একদল লোক সকল সমাজেই আছে তাহাদের সঙ্গতি তাহার ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে না। কিন্তু যখন সেই সকল লোকেই দেশ ছাইয়া ফেলে তখনি সরস্বতী সস্তা দামের কলের পুতুল হইয়া পড়েন; তখনি আমাদের

সাধনা হীনবল হয় এবং সিদ্ধিও তদনুরূপ হইয়া থাকে। সুতরাং এখন গ্রামোফোন ও কন্সর্ট পার্টির আগাছার দেশ দেখিতে দেখিতে ছাইয়া যাইবে; যে সোনার ফসলের চাষ দরকার সে ফসল মারা যাইতেছে।

একদিন আমাকে ডাক্তার কুমারস্বামী বলিয়াছিলেন, হয়ত এমন সময় আসিবে যখন তোমাদের সঙ্গীতের পরিচয় লইতে তোমাদিগকে য়ুরোপে যাইতে হইবে। আমাদের দেশের অনেক জিনিষকেই য়ুরোপের হাত হইতে পাইবার জন্য আমরা হাত পাতিয়া বসিয়াছি। আমাদের সঙ্গীতকেও একবার সমুদ্রপার করিয়া তাহার পরে যখন তাহাকে ফিরিয়া পাইব তখনই হয়ত ভাল করিয়া পাইব। আমরা বহুকাল ঘরের কোণে কাটাইয়াছি, এইজন্য কোনো জিনিষের বাজার দর জানি না;—নিজের জিনিষকে যাচাই করিয়া লইব, কোন্‌খানে আমাদের গৌরব তাহা নিশ্চিত করিয়া বুঝিব সে শক্তি আমাদের নাই।

যেখানে মানুষের সকল চেষ্টাই প্রচুর প্রাণশক্তি হইতে নিয়ত নানা আকারে উৎসারিত হইতেছে; যেখানে মানুষের সমস্ত সম্পদ জীবনের বৃহৎ কারবারে খাটিতেছে এবং মুনফায় বাড়িয়া চলিয়াছে সেইখানে আপনাদের সামগ্রীকে না আনিলে সেই চল্‌তি কারবারের সঙ্গে যোগ দিতে না পারিলে আমরা আপনার পরিচয় পাইতে পারিব না, সুতরাং আমাদের অনেক শক্তি কেবল নষ্ট হইতে থাকিবে। পাছে য়ুরোপের সংসর্গে আমরা আপনাকে বিস্মৃত হই এই ভয়ের কথাই আমরা শুনিয়া আসিতেছি কিন্তু তাহা সত্য নহে, তাহার উল্‌টা কথাই সত্য। এই প্রবল সজীব শক্তির প্রথম সংঘাতে কিছুকালের জন্য আমরা দিশা হারাইয়া থাকি কিন্তু শেষকালে আমরা নিজের প্রকৃতিকেই জাগ্রততর করিয়া পাই। য়ুরোপের প্রাণবান সাহিত্য আমাদের সাহিত্যের প্রয়াসকে জাগাইয়াছে; তাহা যতই বলবান হইয়া উঠিতেছে ততই অনুকরণের হাত এড়াইয়া আমাদিগকে আত্মপ্রকাশের পথে অগ্রসর করিয়া দিতেছে। আমাদের শিল্পকলায় সম্প্রতি যে উদ্বোধন দেখা যাইতেছে তাহার মূলেও য়ুরোপের প্রাণশক্তির আঘাত রহিয়াছে। আমার বিশ্বাস সঙ্গীতেও আমাদের সেই বাহিরের সংস্রব প্রয়োজন হইয়াছে। তাহাকে প্রাচীন দস্তরের লোহার সিন্ধুক হইতে মুক্ত করিয়া বিশ্বের হাটে ভাঙাইতে হইবে। য়ুরোপীয় সঙ্গীতের সঙ্গে ভাল করিয়া পরিচয় হইলে তবেই আমাদের সঙ্গীতকে আমরা সত্য করিয়া বড় করিয়া ব্যবহার করিতে শিখিব। দুঃখের বিষয় সঙ্গীত আমাদের শিক্ষিত লোকের শিক্ষার অঙ্গ নহে;—আমাদের কলেজ নামক কেরানীগিরির কারখানা ঘরে শিল্প সঙ্গীতের কোনো স্থান নাই; এবং আশ্চর্য্যের কথা এই যে, যে সকল বিদ্যালয়কে আমরা ন্যাশন্যাল নাম দিয়া স্থাপন করিয়াছি, সেখানেও কলাবিদ্যার কোনো আসন পাতা হইল না। মানুষের সামাজিক জীবনে ইহার প্রয়োজন যে কত বড়, নোট মুখস্থ করিতে করিতে, ডিগ্রি নিতে নিতে সেই বোধটুকু পর্য্যন্ত আমরা সম্পূর্ণ হারাইয়া বসিয়াছি। এই জন্য সঙ্গীত আজ পর্য্যন্ত সেই সকল অশিক্ষিত লোকের মধ্যেই বদ্ধ যাহাদের সম্মুখে বিশ্বের প্রকাশ নাই; যাহারা অক্ষম

স্ত্রীলোকের মত নিজের সমস্ত ধনকে গহনা গড়াইয়া রাখিয়াছে, তাহাকে কেবল বহন করিতেই পারে, সর্ব্বতোভাবে ব্যবহার করিতে পারে না; এমন কি, ব্যবহারের কথার আভাস দিলেই তাহারা আতঙ্কিত হইয়া উঠে, মনে করে ইহা তাহাদের সর্ব্বস্ব খোয়াইবার পন্থা।

অতএব আমাদের ধন যখন আমরা ভাল করিয়া ব্যবহার করিতে পারিলাম না, তখন, যাহারা পারে তাহারা একদিন ইহাকে নিজের ব্যবসায়ে খাটাইবে, ইহাকে বিশ্বের কাজে লাগাইবার পথে আনিবে। আমাদিগকে সেই দিনের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে; তাহার পরে গর্ব্ব করিব আমাদের যাহা আছে জগতে এমন আর কাহারও নাই; সেই গর্ব্ব করিবার উপকরণও অন্য লোককে জোগাইয়া দিতে হইবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চয়ন

মাতৃঋণ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পুত্র-গৃহে।

জুন মাস। উষার প্রাক্কাল। বাতি জ্বালাইয়া জ্যাক বহি পড়িতেছিল। বেলিসারেরও নিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে। উঠিয়া সে কালি মাখাইয়া আপনার জুতা সাফ করিতেছিল। জুতা সাফ করিতে সে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিল, পাছে তাহার শব্দে জ্যাকের গ্রন্থমগ্ন চিত্তে কোন ব্যাঘাত লাগে!

জানালা খোলা ছিল। তাহার মধ্য দিয়া বাহিরের আকাশ দেখা যাইতেছিল। নীল আকাশের তলে আলোর মৃদু তরঙ্গ ধীরে ধীরে নাচিয়া নীচে নামিতেছিল।

অদূরে দুই-চারিটা মোরগ ডাকিয়া উঠিল। রাত্রির নিস্তব্ধতা ক্রমেই খসিয়া পড়িতেছিল। সহসা পথে শুনা গেল, "রুটি নাও গো, রুটি!" এ স্বর মাদাম ওয়েবারের। মাদাম ওয়েবার আপনার রুটির বাক্স লইয়া পথে বাহির হইয়াছে।

দরিদ্র পল্লীতে মাদাম ওয়েবারের প্রথম আহ্বানটি ঘড়ির কাজ করিত। তাহার স্বর শুনিলেই সকলে ধড়মড়িয়া শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িত। ঐ ডাক পড়িয়াছে! বিশ্রামের অবসর ফুরাইয়াছে। এখনই আবার উদরের তৃপ্তি-সাধনের উদ্দেশ্যে জীবন-যজ্ঞে ছুটিতে হইবে, কাজের সন্ধানে ঘুরিতে হইবে। আর আলস্য নয়! ঔদাস্য নয়! ছুটিয়া চল, ছুটিয়া চল।

এ শুধু মাদাম ওয়েবারের ডাক নয়—ক্ষুধার ডাক! উদরের ডাক! ঘুমাইয়া থাকিলে উদর ছাড়িবে, কেন? তাহার পাওনা সে কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইবে যতক্ষণ তাহার দাবী না চুকাইবে, ততক্ষণ মুক্তি

নাই। বিশ্রাম নাই। প্রভাতের আহ্বানে শিশুর দল জাগিয়া উঠিতেছে। আহার চাই! নহিলে তাহারা অশান্তির রোল তুলিবে! ভাগ্যলক্ষ্মীর উপেক্ষিত দুর্ভাগার দল তাই প্রভাতের সাড়া পাইলে শিহরিয়া উঠে। অভাবের বিকট মূর্ত্তি দ্বারে দাঁড়াইয়া আছে—নির্ম্মম অনশন লোল জিহ্বা মেলিয়া অকরুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে!

বাত্তি নিভাইয়া বহি বন্ধ করিয়া জ্যাক উঠিয়া জানালার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। পথ-পারে প্রকাণ্ড বাসাবাটির জানালাগুলা একে একে মুক্ত হইতেছিল। ভিতরকার দারিদ্র্যও অমনই আপনার দারুণ জীর্ণতা লইয়া প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছিল। কোন কক্ষে এক বৃদ্ধা নারী সেলাইয়ের কল লইয়া বসিয়া গিয়াছে, পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছোট নাতিনীটি বস্ত্রখণ্ড অগ্রসর করিয়া দিতেছে! কোথাও কর্ম্ম-স্থলে যাইবার জন্য কোন কিশোরী চট্‌পট্‌ পোষাক পরিয়া লইতেছে—আবার কোন-খানে বা সেবা-রতা নারী দারুণ উদ্বেগে দীর্ঘ রাত্রি যাপনান্তে রোগীর শয্যাপার্শ্ব ত্যাগ করিয়া জানালার পাশে আসিয়া প্রভাতের স্নিগ্ধ সমীরে তপ্ত ললাট জুড়াইয়া লইতেছে!

গৃহ-বাতায়নে দাঁড়াইয়া জ্যাক চারিধার লক্ষ্য করিতেছিল। ব্যথিত পল্লীর কাতর দীর্ঘশ্বাস প্রভাতের বায়ু-তরঙ্গে নিঃশব্দে মিশিয়া যাইতেছিল। কি শান্ত, কমনীয়, করুণ দৃশ্য!

রবিবার আসিতে এখনও তিন-চারিদিন বিলম্ব আছে। জ্যাকের মনে পড়িল, লতা-পাতা-ঘেরা এঁতিয়োর সেই স্নিগ্ধ গৃহখানির কথা! ফটকের জীর্ণ প্রাচীর জড়াইয়া আইভির ডালিম ও ন্যাশপাতি গাছের অন্তরালে বন্য গোলাপ ও হুনিসকুলের ঝাড়! তাহা পার হইয়া গাড়ীবারান্দার সম্মুখে, দেওয়ালে ডাক্তারের ছোট ঘণ্টাটি ঝুলানো! আরাম যদি কোথাও থাকে, তবে তাহা সেই এঁতিয়োর শান্ত রম্য গৃহকোণটিতে! ভাবিতে ভাবিতে জ্যাকের চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিল—পাঠ ও জাগরণের ক্লান্তি ঘুচিয়া গেল! তাহার নেত্রসমক্ষে ডাক্তার রিভালের গৃহ আপনার পরিপূর্ণ মাধুরীতে প্রতিভাত হইয়া উঠিল এবং একটি পুষ্পিত দেহলতার স্নিগ্ধ সুরভি ও রেশমী কাপড়ের মৃদু শব্দ তাহাকে সম্পূর্ণ আবিষ্ট করিয়া ফেলিল!

"ডান দিকে—ডান দিকে ঘুরাও।"

সহসা বেলিসারের স্বরে জ্যাকের চমক ভাঙ্গিল। কফি তৈয়ার করিতে করিতে মাথা তুলিয়া বেলিসার কহিল, "ডান দিকে—ডান দিকে ঘুরাও।"

বাহিরে দ্বারে কে চাবি ঘুরাইতেছিল। আবার শব্দ হইল, খট্‌! খট্‌! খট্‌!

বেলিসার হাঁকিল, "ডান দিকে—আঃ, ডান দিকে!" তবু চাবি বাম দিকেই ঘুরিল। কফি-দানটা হাতে লইয়াই অধীরভাবে উঠিয়া বেলিসার দ্বার খুলিয়া দিল। দ্বারসম্মুখে এক নারী দাঁড়াইয়াছিল।

বেলিসারকে দেখিয়া নারী কহিল, "মাপ করবেন! আমি ভুল ঘরে এসেছি।"

সে স্বরে জ্যাক চমকিয়া উঠিল। দ্বারের দিকে চাহিয়াই সে অগ্রসর হইল, কহিল, "না মা, ভুল নয়। এ ঘর আমারই—"

সে নারী, ইদা।

জ্যাককে দেখিয়া ইদা ঝড়ের মত বেগে

কক্ষে প্রবেশ করিল। অত্যন্ত অধীর আবেগে সে জ্যাককে বুকের মধ্যে চাপিয়া কম্পিত স্খলিত স্বরে কহিল, "জ্যাক, জ্যাক, আমায় রক্ষা কর—বাঁচাও আমাকে! এত বড় তার আস্পর্দ্ধা, এত দূর সাহস যে, আমায় সে অপমান করে! যার জন্য আমি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করেছি—আমার গর্ব্ব, আমার ধর্ম্ম, আমার একমাত্র পুত্র—কারো পানে, কিছুর পানে চেয়ে দেখিনি, সে—সেই পাষণ্ড আমার গায় হাত তোলে! হাঁ জ্যাক, সত্য, সত্যই সে আমায় মেরেছে! দুদিন দুরাত্রি বাহিরে কোথা কাটিয়ে, কাল শেষ-রাত্রে সে বাড়ী আসে, আমি বিরক্ত হয়ে সেই কথাই বলেছিলুম, তাই, তাই সে আমায় মেরেছে—মেরেছে, জ্যাক! এই দেখ, আমার হাতে রক্ত জমে রয়েছে—"

অভাগিনী নারীর চোখে অশ্রুর সাগর বহিল। ইদা ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। অবস্থা বুঝিয়া বেলিসার কখন্ সরিয়া পড়িয়াছিল। পারিবারিক ব্যাপারে অনধিকার প্রবেশের এতটুকু সম্ভাবনা না রাখিয়াই সে চলিয়া গিয়াছিল।

মার মুখের পানে জ্যাক করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। ক্ষোভে রোষে তাহার সমগ্র অন্তরখানা গর্জ্জিয়া উঠিতেছিল! এতদূর স্পর্দ্ধা! পাষণ্ড, কাপুরুষ! দুর্ব্বলা নারীর দেহে আঘাত কর! তাহার হৃদয়টাকে ত দলিত, ছিন্ন, মর্দ্দিত করিয়াছ, তাহাতেও তৃপ্তি পাও নাই, অবশেষে দেহেও আঘাত করিয়াছ! দুর্ব্বৃত্ত! নরাধম!

চোখের জল মুছিয়া ইদা কহিল, "এ দশ বৎসর আমি কত যন্ত্রণা ভোগ করেছি! পদে পদে অবহেলা, লাঞ্ছনা, কি না সহ্য করেছি! রাক্ষস, রাক্ষস সে। প্রাণে তার এতটুকু মনুষ্যত্ব নাই, জ্যাক। হোটেলে সরাইয়ে যত নীচ সঙ্গী আর লক্ষ্মীছাড়া মাগীর সংসর্গই তার মনের মত হ'ল! সেখানেই এখন তাদের কাগজের আড্ডা হয়েছে। তার ফল হাতে হাতেই ফলেছে! গেল মাসের কাগজখানা যদি দেখতে, কি জঘন্য হয়েছে! যাক্, বেশ হয়েছে! শোন জ্যাক, এই শয়তানের সব কথা আজ তোমায় খুলে বলি। তুমি জান, সে ইদ্রে গেছল, সেই কলঙ্কের সময়! আমিও সঙ্গে গেছলাম। আমায় সে তোমার সঙ্গে দেখা করতে দেয়নি, ছল করে নদীর ধারে ফেলে গেছল। তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়, এ তার সহ্য হত না! কি পিশাচ সে, ভাব একবার। তারপর এই যে টাকা নিয়ে কাগজ বের করেছে, এ সব তোমার টাকা। বন্ধু তোমার জন্য দিয়েছিলেন। সেই সব টাকা সে কাগজ বার করে উড়িয়ে দেছে, তোমায় বলে নি, আমাকেও বলতে দেয়নি। আমায় কি ভরসা দিয়েছিল, জান? কাগজের কারবারে ভারী লাভ। ঐ টাকা চারগুণ তুলে দেবে বলে সে লোভ দেখিয়েছিল। আমারও বুদ্ধি লোপ হয়েছিল, তাই সে শয়তানের কথায় বিশ্বাস করেছিলুম। আমায় যাদু করেছিল, জ্যাক, সে আমায় যাদু করে রেখেছিল। তার অবহেলা কাল রাত্রে আমার অসহ্য বোধ হয়েছিল—তোমার টাকা চেয়েছিলাম কাল রাত্রে, তা সে কি বললে জান, জ্যাক?"

ইদা মুহূর্ত্তের জন্য স্তব্ধ হইল। পরে উত্তেজিত দেহভার সম্মুখস্থ চেয়ারে রক্ষা করিয়া আবার সে বলিতে আরম্ভ করিল, "সে এক

ফর্দ্দ আবার সামনে ফেলে দিলে, লম্বা ফর্দ্দ! দিয়ে বললে, তোমার পিছনে সেই টাকার দেড়গুণ তার খরচ হয়েছে। এঁতিয়োতে আর রুডিকদের ওখানে তোমার ঠাঁই আর খোরাক-পোষাকের জন্য এই টাকা খরচ হয়েছে। তোমার টাকাতে তার সব শোধ না হলেও বাকীটা আমার খাতিরে মাফ করতে তার একটুও আপত্তি নাই! এই সব অন্যায় কথায় আমার রাগ বেড়ে উঠল। বেশ কড়া চুচারটে কথা তাকে আমি শুনিয়ে দিলাম—কথায় তার জবাব দিতে পারলে না, সে—আমায়, তাই আমায় মেরেছে, মেরেছে সে!"

জ্যাক ডাকিল, "মা—"

ইদা কহিল, "তাই আমি তোমার কাছে এসেছি, জ্যাক! আমায় আশ্রয় দাও। আর আমার কে আছে, কার কাছে যাব, আমি? কে ঠাঁই দেবে?"

ইদার বুকে মুখ রাখিয়া জ্যাক একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। পরে মাথা তুলিয়া সে কহিল, "বেশ করেছ, মা, তুমি আমার কাছে এসেছ। আমার জীবনে এই এক দুঃখ ছিল, এক অভাব,—সে এই তোমার! আজ আমার সে অভাব পূর্ণ হয়েছে—সে দুঃখ ঘুচেছে! তুমি এসেছ—এখানেই থাক —আর কখনও আমায় ছেড়ে যেও না! যতদিন আমি আছি মা, তোমার জ্যাক বেঁচে আছে, ততদিন তোমার ঠাঁইয়ের অভাব হবে না, এ তুমি ঠিক জেনো। কিন্তু আর তুমি সেখানে যেওনা যেন, কখনও!"

"আবার! আমি! সেখানে! তার কাছে! না, জ্যাক! এখন শুধু তুমি আর আমি! এই আমাদের জগৎ, আর কেউ নাই—তৃতীয় প্রাণীটি না! তোমায় বলেছিলুম, জ্যাক, মনে আছে, একদিন এমন দিন আসবে, যেদিন তোমার কাছে আসব! আজ সেই দিন এসেছে!"

পুত্রের অভয় স্নেহের মধ্যে নীড় পাইয়া ইদার চঞ্চল প্রাণ শান্ত হইল। ইদা কহিল, "তুমি দেখো, জ্যাক—তোমায় কত ভালবাসি! আমার এত স্নেহ, এবার সব তৃপ্ত করব। আমি তোমার কাছে ঋণী আছি, জ্যাক, এবার সে ঋণ শোধ করব!"

জ্যাক কহিল, "না মা—এ কথা বলো না! তুমি আমার কাছে ঋণী নও। ঋণী আমি,—ছেলে। মার সুখের জন্য ছেলে যদি কখনও আপনার সুখ, আপনার প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে পারে, তবেই তার মাতৃঋণ শোধ হয়। ছেলের কাছে মার আবার ঋণ কি! ছেলের জন্য কষ্টকে কষ্ট বলে মানে না, ছেলেকে মানুষ করে তোলে, কে? মা! সেই মা, ঋণী—? তা কি কখনও সম্ভব হতে পারে, মা?"

জ্যাকের কথা ইদার কাণে গেল না। চাহিয়া, সে একবার চারিধার ইতিমধ্যে দেখিয়া লইল। ইদা কহিল, "চমৎকার থাকব, এখানে। দুই মায়-পোয় চমৎকার থাকব। তবে ঘরটা বড় বিশ্রী, জ্যাক, যেন আঁস্তাকুড়! ছোট, আলো নেই, হাওয়া নেই, কি এ! এখানে থাকলে বাঁচবে, কেন? আমি যখন এসেছি, তখন কোনখানে কিন্তু খুঁত রাখছি না।"

ঘরটি ছোট হইলে কি হয়, বেলিসার ও মাদাম ওয়েবারের কতখানি যত্নে এ ঘর রচিত! মার মুখে সেই ঘরের নিন্দা শুনিয়া

জ্যাকের প্রাণে ঈষৎ বেদনা বোধ হইল। এই ঘরখানির উপর বেচারা বেলিসারের সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে!

কারখানায় যাইতে জ্যাকের আর আধঘণ্টাও বিলম্ব ছিল না—ইহার মধ্যে মাতার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বন্দোবস্ত কি করিয়া হইয়া উঠিবে, তাহা ভাবিয়া জ্যাক কাতর হইয়া পড়িতেছিল। ইদাকে ঘরে বসাইয়া রাখিয়া সে বেলিসারের কাছে গেল—বেলিসারকে সব কথা জ্যাক খুলিয়া বলিল। জ্যাক বলিল, "মা ত এখানে থাকতে চান, বেলিসার। কি রকম বন্দোবস্ত এখন করা যায়, বল দেখি।"

কথাটা শুনিয়া বেলিসার চিন্তিত হইয়া পড়িল। সে ভাবিল, তবেই ত জ্যাক আর তাহাদের সহিত এক খরচে থাকিবে না, স্বতন্ত্র খরচ করিবে। তাহার বিবাহের দিনও বুঝি আবার কোন্ সুদূর ভবিষ্যতের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িল! কিন্তু আপনার নৈরাশ্যের বেদনা গোপন করিয়া সে জ্যাককে সাহায্য করিতে তৎপর হইল। তাহাদের ঘরটি বড় ছিল—সেইটাই জ্যাক ও তাহার মাতার জন্য ছাড়িয়া দিয়া জ্যাকের ছোট ঘরে তাহারা আশ্রয় লইবে, ইহাই স্থির করিয়া সে জিনিসপত্র টানিতে সুরু করিয়া দিল।

জ্যাক বেলিসারকে মাতার নিকট পরিচিত করিয়া দিল। বেলিসার ইদাকে সহজেই চিনিতে পারিল—এতিয়োঁর সেই পরিচ্ছন্ন গৃহটির পরিচ্ছন্না কর্ত্রী!

এখন অতিরিক্ত একটা শয্যা, দুইখানা চেয়ার ও একটা জলের পাত্রের প্রয়োজন। জ্যাক ড্রয়ার খুলিয়া মূল্য বাহির করিয়া বেলিসারের হস্তে তাহা দিয়া ইদাকে কহিল, "রান্নাটা তা হলে মাদাম ওয়েবারই করে দেবে, কি বল, মা। বড় ভাল লোক, এই মাদাম ওয়েবার।"

"না, না জ্যাক, তাকে কষ্ট দেবার কি দরকার? আমিই রাঁধব। তার জন্য ব্যস্ত হয়ো না, তুমি। বেলিসার আমায় দোকান দেখিয়ে দিক—আমি গিয়ে বাজার করে আনছি—নিজেই রাঁধব। কেন, শুধু শুধু কতকগুলা বাজে খরচ করবে? তুমি ফিরে এসে দেখো,—সব ঠিক থাকবে।"

জ্যাক পোষাক পরিয়া কারখানায় চলিয়া গেলে ইদা গায়ে একখানা শাল ফেলিয়া বেলিসারের সহিত বাজারের পথে চলিল।

মাতাকে আপনার গৃহে আপনার আয়ত্তে সম্পূর্ণভাবে লাভ করিয়া জ্যাকের প্রাণ আজ উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার মনে হইতেছিল, আজিকার জগৎ যেন সেই চিরদিনকার পরিচিত পুরাতন জগৎ নহে—নূতন, আনন্দ-পরিপূর্ণ! আজিকার প্রভাতে আনন্দের এ কি বিচিত্র সুর জাগিয়া উঠিয়াছে—আকাশে বাতাসে এক অপূর্ব্ব রাগিণী! নির্জীব প্রকৃতি যেন কোন্ ললিত মোহনস্পর্শে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে! কাজের মধ্যেও সে আজ নূতন আনন্দ পাইল—অন্যদিন কারখানার কাজ সে কর্ত্তব্যের দায়ে করিয়া যাইত মাত্র; প্রাণহীন যন্ত্রের মত তাহার হাত পা নড়িত, প্রাণহীন-যন্ত্রের মতই সে চলিত, ফিরিত। কাজের মধ্যে আজ প্রথম প্রাণখানা সাড়া দিয়া উঠিল। দ্বিগুণ উৎসাহে সে কারখানার কাজ চালাইল। তাহার সে উৎসাহ সঙ্গী কারিকরগণের দৃষ্টি

এড়াইল না। সকলে কাণাঘুষা করিল, "হুজুরের আজ একবার ফুর্ত্তিটা দেখেছ! প্রাণের ধন মিলেছে বুঝি আজ!"

জ্যাক হাসিয়া উত্তর দিল, "ঠিক ধরেছ, বটে।"

কাজের শেষে লঘু চিত্ত লইয়া জ্যাক গৃহে ফিরিল। না, গৃহে নহে, মায়ের ক্রোড়ে! মা গৃহে আছে ত? ইদার সঙ্কল্প যত দৃঢ় হউক, চিত্ত তাহার অত্যন্ত চপল! কে জানে, ইতিমধ্যে যদি তাহার মতের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে? যদি সে আবার সেখানে ফিরিয়া গিয়া থাকে! জ্যাক চিন্তিত হইয়া পড়িল।

গৃহে পৌঁছিয়া আপনার কক্ষের দ্বারসম্মুখে দাঁড়াইতেই জ্যাক স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। তাহার সেই ছোট আঁস্তাকুড়, এ কি পরিপাটী সজ্জায় সুন্দর শ্রীতে ভরিয়া উঠিয়াছে!

বেলিসারের মোট-ঘাট সরাইয়া ফেলা হইয়াছে! একধারে শুভ্র কোমল শয্যা। মধ্যে ছোট একটি টেবিলে সুদৃশ্য ফুলদানি, তাহাতে নানা ফুল-পল্লবে রচিত সুবৃহৎ তোড়া! আর এক কোণে বড় টেবিলে কাচের প্লেট-গ্লাস প্রভৃতি সজ্জিত! ঘরের কোণে সুদৃশ্য হোয়াটনটে উৎকৃষ্ট মদ্যের বোতল ও বিবিধ আসবাব। ইদার বেশটিও দিব্য পরিচ্ছন্ন!

জ্যাককে দেখিয়া ইদা কহিল, "কি জ্যাক, ঘর কেমন সাজান হয়েছে?"

"চমৎকার হয়েছে, মা!"

"বেল আমাকে খুব সাহায্য করেছে অবশ্য—আমাদের বেলিসার! খাসা লোক, বেল।" জ্যাকের আনন্দ হইল। বেলিসার মাতার এতটা প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহার নামের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ অবধি বাহির হইয়া গিয়াছে!

ইদা কহিল, "আমি ওদের রাত্রে নিমন্ত্রণ করেছি। বেল আর মাদাম ওয়েবার এখানেই দুজনে খাবে।"

"কিন্তু এত ডিশ পাবে কোথায়, মা?"

"তার জন্য ভেবো না,

ইদা কহিল, "কি জ্যাক, ঘর কেমন সাজান হয়েছে?"

জ্যাক, কতকগুলা কিনে এনেছি, আর কিছু লেবিদাঁরদের কাছ থেকে ধার পাব।"

লেবিদাঁর জ্যাকের প্রতিবেশী। ইদা তাহার সহিত ইতিমধ্যেই আলাপ করিয়া লইয়াছে!

"তা ছাড়া আরও শোন, জ্যাক। খাবার দাবারও চমৎকার হয়েছে। কেক-টেকগুলা প্লা দি লা বোঁ থেকে এনেছি। সেখানে দরে সাত পেনি সস্তা পেয়েছি। অনেক দূরে দোকান, কাজেই আসবার সময় গাড়ী ভাড়া করতে হয়েছিল, আমাকে! আঠারো পেনি ভাড়া।"

জ্যাক হাসিল। ইদার উপযুক্ত কাজই বটে! সাত পেনি দাম বাঁচাইবার জন্য আঠারো পেনি গাড়ীভাড়া! তাহা ছাড়া দ্রব্যাদি যাহা আনা হইয়াছিল, সমস্তই উৎকৃষ্ট। রোলগুলা ভিয়েনা বেকারির, কফি ও অন্যান্য জিনিষও প্যালে রয়েল হইতে আমদানি!

জ্যাক কিয়ৎক্ষণের জন্য স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল। ইদা তাহা লক্ষ্য করিল।

ইদা কহিল, "বড্ড খরচ করে ফেলেছি না, জ্যাক?"

"না, না কে বললে মা?"

"তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, তুমি বিরক্ত হয়েছ। কিন্তু কি করব বল, জ্যাক? কিছুই ত ব্যবস্থা ছিল না। এত কষ্ট করে তুমি থাকবে, মা হয়ে কোন্ প্রাণে আমি তা দেখি, বল। যাহোক ভবিষ্যতে সাবধান হব। এত খরচ আর হবে না।"

তৎপরে একখানা সুদীর্ঘ খাতা টানিয়া ইদা কহিল, "একটা খরচের খাতাও কিনে আনলুম। খরচপত্রের হিসাব না রাখলে সব বড় এলোমেলো হয়ে পড়ে—হিসাবটা রাখা ভারী দরকার। লেভিকের দোকান থেকে আনলুম—এই পাশেই তার দোকান। ওর একটা লাইব্রেরী আছে—তাতেও কিছু চাঁদা দিয়েছি—বইটা-কাগজটা পড়তে পাব। মাসিক সাহিত্যের সংস্রবটা আমি রাখতে চাই—না হলে চলে কি? টেঁকা যাবে, কেন?"

এমন সময় বেলিসারের আগমনে মাতাঃপুত্রের হিসাবনিকাশে বাধা পড়িল। বেলিসারের পশ্চাতে পুত্রক্রোড়ে মাদাম ওয়েবারও আসিয়া উপস্থিত হইল। ইদা তখন অসঙ্কোচভাবে আদেশ-অনুরোধ করিয়া তাহাদিগের দ্বারা গৃহ-সজ্জার অবশিষ্ট ত্রুটিগুলি সারিয়া লইল।

এই দ্বিধাহীন তৎপরতা রীতিমতই ইদার অভ্যস্ত ছিল, কাজেই তাহার এতটুকু অপ্রতিভ হইবার কারণ ছিল না—জ্যাক কিন্তু মার ব্যবহারে মরমে মরিয়া যাইতেছিল। বেলিসার ও মাদাম ওয়েবার যেরূপ সন্তোষের সহিত ইদার ছোটখাট আদেশগুলি পালন করিতেছিল, তাহাতে জ্যাকের সঙ্কোচ কাটিতে বিশেষ বিলম্ব ঘটিল না।

তাহার পর যথাসময়ে টেবিলে কাপড় বিছানো হইল। প্লেট-কাঁটার সংমিশ্রনে, আহার্য্যের সুবাসে ও টেবিল-পার্শ্বে উপবিষ্ট নরনারী-চতুষ্টয়ের আনন্দ-কলরবে একটা উৎসবের রাগিণী বাজিয়া উঠিল। বেলিসার ও ওয়েবার জীবনে কখনও এমন সুখাদ্যে রসনা তৃপ্ত করিবার অবকাশ পায় নাই। মাতার পার্শ্বে ভোজনে বসিয়া শৈশবের ক্ষীণ স্মৃতি জ্যাকের মনটিকে উদ্বেলিত করিয়া তুলিতেছিল।

এ অপ্রত্যাশিত আনন্দের স্বাদ পাইয়া অতীত বহু দুর্দিনের কথা বেচারা ভুলিয়া গেল। এ কি উজ্জ্বল শুভ মুহূর্ত্ত জ্যাকের মলিন জীবনটাকে ক্ষণপ্রভার বিপুল দীপ্তিতে আজ ভরাইয়া দিয়াছে! হে শুভ, হে উজ্জ্বল, অভাগা জ্যাককে আর তুমি পরিত্যাগ করিয়ো না। জ্যাকের জীবন-নাট্যের শেষ অঙ্কগুলা এমনই সুমধুর আলোক-রশ্মিপাতে সমুজ্জ্বল করিয়া যবনিকা নিক্ষেপ করিয়ো—আর দুঃখ নয়, ভাবনা নয়, দ্বন্দ্ব নয়!

আহারাদির পর বেলিসার ও ওয়েবার বিদায় গ্রহণ করিলে ইদা শয্যা রচনা করিল। জ্যাক কহিল, "তুমি শোও, মা।"

"আর তুমি?"

"আমি পড়ব।"

ভোজন-টেবিলের উপর বাতি খাড়া করিয়া জ্যাক বহির গোছা নামাইল। ইদা কৌতূহল চিত্তে তাহার পার্শ্বে আসিয়া কহিল, "এ সব কি বই, জ্যাক? কি হবে পড়ে?"

"আমি ডাক্তারী পড়ছি, মা। ডাক্তার হব, তখন দুর্দ্দশা ঘুচে যাবে—আর লোহা পিটে বেড়াতে হবে না।"

তখন সেই বাতির অনুজ্জ্বল আলোকে বসিয়া জ্যাক মাতার নিকট আপনার কাহিনী বিবৃত করিল—আশা ও আনন্দে পরিপূর্ণ সুন্দর ভবিষ্যতের পরিচয় সে জ্ঞাপন করিল। জীবনে তাহার লক্ষ্য মিলিয়াছে—সেই চরম লক্ষ্যের অভিমুখে অবিচলিত চিত্তে সে আপনার জীবন তরীখানি বাহিয়া চলিয়াছে! কোন বাধাই বাধা বলিয়া সে আর মানিবে না। বিপদের কোন তরঙ্গ তাহাকে ভীত, পথভ্রষ্ট করিতে পারিবে না! সিসিল তাহার জীবনের লক্ষ্য, কাম্য! সিসিল তাহার ধ্রুবতারা! সেই সিসিল যেদিন সুখ-দুঃখ-ভাগিনী হইয়া তাহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইবে, সেদিন তাহার সকল কষ্ট, সকল শ্রম চরম সার্থকতা লাভ করিবে!

এ কথা এতদিন সে মার নিকট প্রকাশ করে নাই। যদি মা সে কথা আর্জেন্তঁর নিকট বলিয়া ফেলে! আর্জেন্তঁর দল যে সিসিলের প্রেম লইয়া বিদ্রূপ-কৌতুকে মাতিয়া উঠিবে, এ কথা মনে করিতে তাহার মাথায় রক্ত চন্‌মন্ করিয়া উঠিত। জানিলে বর্ব্বরের দল এ সুখে বাধা না দিয়া কখনও ক্ষান্ত হইবে না! এই কয়টা বর্ব্বরে মিলিয়াই ত তাহার জীবনটাকে বিপথে ঠেলিয়া দিয়াছে, আজ যখন সুযোগ পাইয়া সে পথ হইতে ফিরিয়া ধ্রুব পথ সে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে, তখন এ পথ হইতে আর সে হঠিবে না—সহস্র মুগ্ধ প্রলোভনেও নহে!

তাহার পর গদ্‌গদ ভাষায় জ্যাক আপনার প্রেমের কাহিনী বলিয়া চলিল। ইদা শুধু থাকিয়া থাকিয়া রীতিমত সাহিত্যিক ধরণে "বাঃ, চমৎকার ত! ঠিক যেন সেই গল্পের নায়ক-নায়িকার মত! বাঃ!" বলিয়া টিপ্পনী দিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতে জ্যাকের কাহিনীর মুক্ত প্রবাহ বাধা মানিল না। বিপুল উচ্ছ্বাসে বাঁধমুক্ত তটিনীর মতই সে আপনার কাহিনী বলিয়া চলিল। যখন তাহার কাহিনী সমাপ্ত হইল, তখন ইদা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া শুধু বলিল, "সত্যি জ্যাক—এ নিয়ে বেশ একখানা নভেল লেখা যায়! ঘটনা খাসা জমে উঠেছে ত!" (ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

তিব্বতীয়দের আচার ব্যবহার ও উৎসবাদি

বিগত আষাঢ় সংখ্যা "ভারতীতে" তিব্বতীয় বিবাহ প্রথার ও আশ্বিন সংখ্যায় তাহাদের বিবাহকালীন অনুষ্ঠানগুলির বিষয় আলোচনা করিয়াছি এই সংখ্যায় তাহাদের আচার ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

তিব্বতে প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া কেহ মুখ হাত ধৌত করে না, বহির্দ্দেশে গমন করিয়াও তাহারা কখনও শৌচ করে না, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত অঙ্গে কোনও দিন জল স্পর্শ করায় না। বিশেষ কার্য্যানুরোধে কখন কখন শুধু হাতের পাতা ও চক্ষু মাঝে মাঝে ধুইয়া থাকে। শরীরে আদৌ জল স্পর্শ না করান তাহাদের পক্ষে বড়ই গৌরবের বিষয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে গাত্রে ময়লা জমা হইতে থাকে, কালে ময়লার একটা পুরু আবরণ পড়িয়া আবলুসের ন্যায় কালো হইয়া যায়। তাহাদের হাতের তালু কিন্তু খুব পরিষ্কার থাকে; কারণ তাহারা অপরিষ্কার হাত দিয়া মাঝে মাঝে ময়দা প্রভৃতি চালিয়া দেওয়ায় হাতের সমস্ত ময়লাই ঐ ময়দার সঙ্গে উঠিয়া যায়। তিব্বতদেশীয় লোকের বিশ্বাস শরীর ধৌত হইলে তাহাদের সুখও চির অন্তর্হিত হয়। এই বিশ্বাস এতই প্রবল যে বিবাহকালে বরপক্ষীয় লোকেরা ক'নে দেখিতে আসিলে কেবল তাহাকে সুন্দরী দেখিয়াই ক্ষান্ত হয় না; তাহার সমস্ত শরীর ও পোষাক পরিচ্ছদাদি ময়লায় পরিপূর্ণ আছে কিনা তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখে। কারণ যদি তাহার হাত মুখ ইত্যাদি পরিষ্কার থাকে তবেই বুঝিতে হইবে সে অসুখী হইবে; কারণ সে তাহার শরীর ধুইয়া অমঙ্গল ডাকিয়া আনিয়াছে। বালকদের শরীরও ময়লাযুক্ত হওয়া একটা সুলক্ষণ। তাহারা পোষাক পরিচ্ছদ জন্মে পরিষ্কার করে কিনা সন্দেহ!

তিব্বতে প্রায় সকল লোকই, কি ধনী কি দরিদ্র, কি সুখী কি দুঃখী, কি বালক কি বৃদ্ধ সকালে উঠিয়া প্রত্যূষে 'চা'পান করে। তাহারা দৈনিক ব্যবহৃত 'চায়ে'র পেয়ালাও কখন ধোয় না, তাহাদের নিজেদের অথবা সমকক্ষ লোকদের দ্বারা ব্যবহৃত উচ্ছিষ্ট পাত্র তাহাদের নিকট অপরিষ্কার নহে; যখন কোন নিম্নশ্রেণীর লোক দ্বারা ঐ পেয়ালা ব্যবহৃত হয় তখনই তাহারা উহাকে ঝুটা জ্ঞান করে। কেবল চায়ের পেয়ালা কেন, তাহাদের ব্যবহার্য্য কোন বাসনই তাহারা ধৌত করে না; বিশেষ দরকার হইলে সময় সময় মুছিয়া রাখিয়া দেয়।

তিব্বতদেশে নানা প্রকার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পদ্ধতি প্রচলিত আছে, অধিকাংশ প্রথাই অদ্ভুত। ঘরের মধ্যেই তাহাদের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। মৃত্যুর অনতিকাল পরেই শবকে বিছানার সহিত দৃঢ় রূপে বাঁধিয়া তিন হইতে চৌদ্দ দিবস পর্য্যন্ত সেই ঘরের মধ্যেই ফেলিয়া রাখা হয়। তিব্বত দেশীয় লোকের বিশ্বাস শবকে ঐরূপে না বাঁধিলে সে কোন ভৌতিক আত্মা গ্রহণ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবে, তাহাতে তাহাদের অশেষ অকল্যাণ হইবে। শব যাহাতে না পচিয়া যায় তজ্জন্য তাহারা নানা প্রকার ঔষধাদি তৎগাত্রে মালিস

করিয়া দেয়। আমাদের দেশে যেমন প্রত্যেক সহরে শ্মশান আছে তিব্বতেও তেমনি গ্রামে গ্রামে বড় বড় মঠ আছে। তিন হইতে চতুর্দ্দশ দিবস মধ্যে শব নির্দ্দিষ্ট মঠে নীত হইলে তখন তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। পুরোহিত আসিয়া শবের পার্শ্বে বসিয়া তিব্বতীয় অন্ত্যেষ্টি মন্ত্রগুলি পাঠ করেন। পাঠ সমাপ্ত হইলে তাহার আত্মীয়েরা শবদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া শৃগাল কক্কুরের আহারের জন্য ফেলিয়া দেয়। ঐ জন্য অনেক কুকুর মঠে প্রতিপালিত হইয়া থাকে। দেবমঠে রক্ষিত কুক্কুরগণ ছোটলোকের শব খাইতে পায়না। তাহাতে তাহাদের মাহাত্ম্য নষ্ট হয়। অনেকে কুকুর দিয়া শব খাওয়াইবার জঘন্য প্রথাকে অপমানজনক জ্ঞান করিয়া আত্মীয় স্বজনের মৃতদেহ পশুপক্ষীর ভক্ষণের জন্য দূরে রাখিয়া আসে; অনেকে স্রোতেও ভাসাইয়া দেয়। কাহারও কাহারও বাড়ীতে মৃত্যুর পরে এক সপ্তাহকাল ধরিয়া লামাগণ নানা প্রকার ধর্ম্ম গ্রন্থাদি পাঠ করেন। তিব্বতবাসীদের বিশ্বাস, এইরূপ ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ করিলে পরলোকে মৃত আত্মার সদ্গতি হয়। সপ্তম দিবসে মৃতব্যক্তির আত্মীয় স্বজন সকলে একত্র হইয়া লামাদিগের সহিত সমস্বরে নানা প্রকার ধর্ম্মগ্রন্থ ও মন্ত্রাদি পাঠ করিবার পর পানভোজনে মনোযোগ দেয়। এই অন্ত্যেষ্টি-ভোজেও তিব্বতবাসীরা অত্যন্ত মদ্য পান করিয়া থাকে। বস্তুতঃ তিব্বতে মদ্য ব্যতীত কোনও ব্যাপার সম্পন্ন হয় না, এরূপ মদ্যপায়ী জাতি বোধ হয় পৃথিবীর আর কোথাও নাই।

তিব্বতে দাহপ্রথাও প্রচলিত আছে। উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিদিগের ও পুরোহিতদিগের মধ্যেই এই প্রথা প্রচলিত দেখা যায়। চারিদিকে ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাচীর তৈয়ার করিয়া উহার মধ্যে চিতা প্রজ্বলিত করা হয়। পুরোহিতদিগের সংকার কালে অনেকগুলি অনুষ্ঠানের আয়োজন হইয়া থাকে। একদল লোক নানা প্রকার বাদ্য বাজাইয়া শশ্মানভূমি মুখরিত করে; আর চিতার চতুষ্পার্শ্বে পুরোহিতগণ সমবেত হইয়া পারলৌকিক আত্মার সদ্গতির নিমিত্ত নানা প্রকার মন্ত্রাদি সমস্বরে পাঠ করেন। উত্তরাধিকারী পুরোহিত ব্যতীত পুরোহিত-দিগের চিতায় আর কেহ অগ্নিসংযোগ করিতে পারে না। চিতা ধৌত করিবার পূর্ব্বে মৃতব্যক্তির আত্মীয়েরা কিছু ভস্ম গ্রহণ করিয়া আদরে বাড়ীতে রাখিয়া দেয়।

তিব্বতবাসীগণের বিশ্বাস—মৃত্যুর পর আত্মা মাথার মধ্য দিয়া বাহির হইয়া যায়। এই জন্য মৃত্যুর অনতিপূর্ব্বে একজন প্রধান লামা মুমূর্ষু ব্যক্তির শিয়রে বসিয়া কয়েক গাছি চুল ধরিয়া থাকে। ঐ চুলের গোড়া দিয়াই নাকি আত্মা বাহির হইয়া যায়। তাহার প্রমাণ, ঐ চুলের গোড়াতে কিছু রক্ত দেখা যায়।

মৃতদেহ গৃহ হইতে লইয়া যাইবার পূর্ব্বে মৃতব্যক্তির আত্মীয়েরা সমবেত হইয়া পর লোকগত আত্মার ও মৃত দেহের বিবিধ প্রকার পূজা করিয়া থাকে। যাহারা শবের সঙ্গে শ্মশানে যায় তাহারা প্রত্যেকেই একখানি জ্বালানি কাষ্ঠ স্বহস্তে বহন করিয়া লইয়া যায়, এবং তথায় উহা একত্র করিয়া শব দাহ করে। সংকার-কারীগণের কার্য্য শেষ হইলে বাড়ী

ফিরিবার কালে তাহাদের সকলকেই দৌড়াইয়া আসিতে হয়, নতুবা তাহাদের বিশেষ অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা। তাহারা বাড়ীতে আসিবার পর লামাগণ আত্মার কল্যাণার্থে প্রার্থনা করেন।

মৃতব্যক্তির আত্মীয় স্বজন সকলকে জনসাধারণে নানা প্রকার উপহার দিয়া থাকে। এই উপহারের অর্থ সমবেদনা জ্ঞাপন। শোকতপ্ত আত্মীয় স্বজনেরা কিছু দিন মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া কাটায়;—ইহাই একমাত্র তাহাদের শোকের চিহ্ন।* গৃহে মৃত্যু ঘটিলে সেই বাড়ীর সকল লোক নিজ নিজ বস্ত্রাদি ছাড়িয়া লামা-দিগকে তাহা প্রদান করে। তাহারা ঐ সকল সাদরে গ্রহণ করে, কিন্তু কোন দিন ব্যবহার করে না, বিক্রয় করিয়া ফেলে। কোন তিব্বতবাসীর মৃত্যু হইলে পর তাহার আত্মীয়েরা এক সপ্তাহকাল ব্যবহারোপযোগী খাদ্যাদি তাহার উদ্দেশে কোন একটা উচ্চ বৃক্ষের উপর বাঁধিয়া রাখিয়া আসে। সাত দিবস পরে ঐ সকল দ্রব্য নামাইয়া পশু পক্ষীদের দেওয়া হয়। বড় বড় লামাদিগের ভস্মরাশি সকল ধর্ম্মমঠেই রাখা হয় এবং ভক্তদেরও তাহা দেওয়া হয়।

তিব্বতদেশের দুএকটি উৎসব আমাদের দেশের উৎসবের ন্যায়। আমরাও যেমন কোন কাজ করিবার সময় শুভক্ষণ শুভলগ্ন বিশেষভাবে মানিয়া চলি,—তিব্বতবাসীগণও শুভলগ্নের অস্তিত্বে খুব বিশ্বাস করে। তাহারা শুভদিন দেখিয়া তবে আত্মীয়স্বজনে মিলিয়া শস্য কর্ত্তন করিবার জন্য ক্ষেত্রে গমন করে; শস্য কর্ত্তন করিয়া বাড়ীতে আনিয়া একটী উৎসব করে। এই প্রথাটী আমাদের দেশের নবান্ন প্রথার অনেকটা অনুরূপ। প্রথমে পুরোহিত আসিয়া নূতন ধান্য গৃহ-দেবতাকে উৎসর্গ করিলে পর কিছু কিছু নূতন শস্য কোন একটা জিনিষে বাঁধিয়া গৃহের প্রতি স্তম্ভে লট্‌কাইয়া রাখিয়া দেওয়া হয়। তৎকালে বড় বড় লামাগণ উপস্থিত থাকিয়া গৃহ দেবতার নিকট প্রার্থনা করে যে, "আগামী বৎসর যদি প্রচুর শস্য হয় তবে গৃহস্বামী দরিদ্রদিগকে এক-তৃতীয়াংশ দান করিবে এবং আমাদেরও উহার অংশ দিবে।" তিব্বতবাসীগণ ধান্য অপেক্ষা যবের অধিক আদর করিয়া থাকে কারণ যবই তিব্বতে অতি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়; সেইজন্য যবান্নই তাহাদের প্রধান খাদ্য। যে দিবস তাহারা নূতন শস্য খাইতে আরম্ভ করে সেই দিনে তাহারা একটী সুবৃহৎ ভোজের অনুষ্ঠান করে। তাহাতে তাহারা তাহাদের আত্মীয় বন্ধুবান্ধব পাড়াপ্রতিবাসী প্রায় সকলকেই নিমন্ত্রণ করিয়া থাকে। পুরোহিত উপস্থিত থাকিয়া এই উৎসবোচিত ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করেন। এই উৎসবেও মদের প্রচুর প্রচলন দেখা যায়।

শ্রীরমণীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

* ইহারা ত সকল সময়েই মলিন বস্ত্র পরিধান করে। ভাঃ সঃ।

বৌদ্ধকথা

মহানিষ্ক্রমণ—মহানিক্ক্রমণং—মহানিষ্ক্রমণ।

('নিদানকথা' নামক মূল পালিগ্রন্থ হইতে)

সেই সময়ে রাহুলমাতা পুত্র প্রসব করিলেন। নৃপতি শুদ্ধোধন এই সংবাদ পুত্র বোধিসত্ত্বের (১) নিকট প্রেরণ করিলেন। সন্দেশবহ, প্রভু বোধিসত্ত্বের শ্রীচরণে সুসংবাদ নিবেদন করিল।

বৈরাগ্য বাসনাবিভোরচিত্ত বলিয়া উঠিল,

'রাহুল (২) জন্মিয়াছে, বন্ধন জন্মিয়াছে' (৩)

নৃপতি পুত্রের বাক্য শুনিলেন। শিশুর নাম রাহুলই রাখা হউক, অভিলাষ প্রকাশ করিলেন।

বোধিসত্ত্ব সঙ্গিজনসহ মনোমুগ্ধকর শোভন স্যন্দনে আরোহণ করিয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। (৪)

লাবণ্যময়ী ক্ষত্রিয়-কুমারী কিসাগোতমী নগরীর প্রাসাদোপরি বিচরণ করিতেছিলেন, বোধিসত্ত্বের অনুপম রূপমাধুরী অবলোকন করিয়া মুগ্ধ হইয়া তন্ময় হইয়া ভাববিহ্বলচিত্তে বলিলেন,

"নিব্বূতা (৫) নূন সা মাতা, নিব্বূতো নূন সো পিতা,
নিব্বূতা নূন সা নারী, যস্সায়ং ঈদিসোপতীতি"

'সেই মাতা কি সৌভাগ্যশালিনী, কি সৌভাগ্যশালী সেই পিতা, কীদৃশ সৌভাগ্যশালিনী সেই নারী, যাহার ঈদৃশ পতি।'

বোধিসত্ত্ব এই বাক্য শুনিলেন। আপন মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এইরূপ আত্মদর্শীর নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হয়, পিতার হৃদয় নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হয়, স্ত্রী এবং পুত্রের হৃদয় নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হয়। কি করিলে নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হওয়া যায়? রাগাগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হওয়া যায়; দোষাগ্নি, মোহাগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হওয়া যায়। মনোমধ্যস্থ সর্ব্বক্লেশ নির্ব্বাপিত হইলে—দূরীভূত হইলে নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হওয়া যায়। আহা! এই নারী আমাকে কি সুসংবাদই না প্রদান করিল! নিশ্চয়ই আমি নির্ব্বাণলাভে প্রযত্ন করিব। অদ্যই আমি গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কাম প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিব। এই নারী আমার আচার্য্য।

এইরূপ চিন্তা করিয়া বোধিসত্ত্ব আপন কণ্ঠ হইতে অমূল্য মুক্তাহার উন্মোচন করিয়া গুরুদক্ষিণাস্বরূপ কিসাগোতমীকে প্রদান করিলেন।

---

(১) বুদ্ধ পাঁচজন, চারিজন আবির্ভূত হইয়াছেন, পঞ্চম বুদ্ধ এখনও আবির্ভূত হন নাই। গৌতম ৪র্থ বুদ্ধ কাহারও শরণাগত হইয়া তাঁহার সৎকার্য্যাবলীর অনুসরণকরতঃ ক্রমশঃ শরণাগতের হৃদয়ে বুদ্ধত্ব লাভের বাসনা জন্মে। যতদিন পর্য্যন্ত না তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন, তত দিন তাঁহাকে বোধিসত্ত্ব বলা হয়। Mr. Grunwedel তাঁহার "Buddhistic Art" নামক পুস্তকে বোধিসত্ত্বের ব্যাখ্যা এইরূপ করিয়াছেন—

"The sum total of his good actions allows him at each reincarnation to be born as a being in a constantly ascending Scale of goodmen, till in the Mohita heaven he resolves to accept another human existence that he may show to bewildered men the way of salvation and then to enter Nirvana himself."

(২) রাহুল—রাহু—যাহা আচ্ছাদন করে।

(৩) "রাহুল জাতো, বন্ধনম্ জাতং"—নিদান কথা

(৪) বোধিসত্ত্ব—সিদ্ধার্থ—নবগোপকণ্ঠে একটি নিভৃত প্রাসাদে নিভৃত জীবন যাপন করিতেন।

(৫) 'নিব্বূত' শব্দের দুই রকম অর্থ (১) সৌভাগ্যশালী (২) নির্ব্বাণপ্রাপ্ত। কিসাগোতমী যে অর্থে 'নির্ব্বৃত' বলিয়াছেন, সিদ্ধার্থ অন্য অর্থে উহা গ্রহণ করিয়াছেন। গৌতম 'নির্ব্বাণপ্রাপ্ত' এইরূপ বুঝিয়াছেন।

কিসাগোতমী মনে করিলেন বোধিসত্ত্ব আমার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া এই মুক্তমালা অনুরাগের নিদর্শনস্বরূপ উপহার প্রদান করিয়াছেন।

বোধিসত্ত্ব প্রাসাদাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, আপন কক্ষে পালঙ্কের উপর গিয়া উপবেশন করিলেন।

কুমারের অভ্যর্থনার্থ, মনোরঞ্জনার্থ বিচিত্র অলঙ্কার-শোভিতা নৃত্যগীতকুশলা দেবকন্যাসদৃশা রমণীবৃন্দ গীতযন্ত্রাদিসহ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিল। বোধি-সত্ত্বের চিত্ত এই দৃশ্যে সংসারের ক্লেশে আরও অভিভূত হইয়া পড়িল।

মোহের মদিরা ঢালিয়া, সৌন্দর্য্যের ফোয়ারা ছুটাইয়া, কটাক্ষের বিজুলি চমকাইয়া, হাসির মাধুরী ছড়াইয়া যৌবনমদমত্তা কামিনীকুল বোধিসত্ত্বের উদাসচিত্তের চারিদিকে কি এক মায়াপুরী রচনা করিয়া তুলিল। সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা, নৃত্যের মোহনভঙ্গী প্রতিমুহূর্ত্তেই তাঁহাকে বাঁধিবার জন্য কত না ব্যাকুল; বক্ষের মোহন দোলন কতই না তাঁহাকে নীরব আহ্বান প্রেরণ করিল, অধরের সুরস রাঙিমা কত না ভঙ্গীতে তাঁহাকে স্পর্শ-পুলক নিবেদন করিল।

এমনি মায়াপুরীর মাঝখানে একেলা বোধিসত্ত্ব আপনাতে আপনি বিভোর। কোন আহ্বান, কোন আকর্ষণ তাঁহার অটল দৃঢ় উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তের দ্বারও স্পর্শ করিতে পারিল না। তাঁহার মন নির্ব্বাণে, উৎসবে নয়।

শীঘ্রই বোধিসত্ত্ব শয়ন করিয়া নিদ্রাভিভূত হইলেন। গন্ধপ্রদীপ জ্বলিতেছে, নৃত্যগীত চলিতে লাগিল।

যাহার জন্য এত সঙ্গীত, এত নৃত্য, এত আয়োজন, এত উৎসব, সে ত নিদ্রিত! রমণীবৃন্দ যন্ত্রাদি ফেলিয়া দিল;—সেইখানে সেই কোমল আস্তরণেই ঢলিয়া পড়িল।

রজনী নিশীথ হইল। সমস্ত নগরী নিস্তব্ধ, বিলাসের শেষ শিখাটিও নির্ব্বাপিত।

বোধিসত্ত্ব জাগ্রত হইলেন, পালঙ্কোপরি উপবেশন করিলেন।

ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, একবার চারিদিকে নিরীক্ষণ করিলেন, দীপালোকে কতই না দেখিলেন।

কত শিথিল কবরী, কত কাঁচলী মুক্ত চ্যুত, কত অধরপ্রান্তে ক্লেদপ্রবাহ, কত কণ্ঠে শ্লেষাজড়িত বিকট ধ্বনি, কত নয়নে স্বপ্নের বিভীষিকা ভঙ্গী, কত ললাটে ভীতি ও বিষাদের আকুঞ্চন প্রসারণ, কত না বসন ভ্রষ্ট চ্যুত, এমনি কত না কত কি!

বোধিসত্ত্বের মনে হইল তিনি যেন একটা বিকট শ্মশানের মাঝখানে দাঁড়াইয়া। রজনীর প্রথম যামে যাহা নন্দনকুঞ্জেরই মত শোভিতেছিল, তাহা যেন এখন একটা বীভৎস জীবন্ত শবাধার। বোধিসত্ত্বের চিত্তে বৈরাগ্যবহ্নি প্রবলতর বেগে জ্বলিয়া উঠিল।—'এখনই নিষ্ক্রমণ করিব'।

দ্বারের কাছে গিয়া ডাকিলেন "কে আছ?" তথায় শীতল মর্ম্মরপ্রস্তর সোপানে সুপ্ত ছিল ছন্ন (৬)। বোধি-সত্ত্বের আহ্বানে জাগিয়া উঠিল,

"আর্য্যপুত্র এই যে আমি ছন্ন।"

"এখনই আমি মহানির্ব্বাণলাভার্থ মহানিষ্ক্রমণ করিব, সত্বর একটি অশ্ব আনয়ন কর।"

"সাধু দেব!"

অশ্বশালা সুসজ্জিত, মর্ম্মরপ্রস্তরে গঠিত। গন্ধদীপ জ্বলিতেছে, পুষ্পপল্লবাঙ্কিত চন্দ্রাতপ, সুখে তাহারই তলে অশ্বগণ।

প্রবেশ করিয়াই ছন্ন বোধিসত্ত্বের প্রিয় অশ্ব অশ্বরাজ কন্থককে দেখিতে পাইল। তাহাকেই সজ্জিত করিল।

'আজিকার সাজবন্ধন এত কঠিন কেন' কন্থক আপন মনে তাহাই ভাবিতে লাগিল। এ ত প্রমোদকাননে অভিসারের সজ্জা নয়? সে বন্ধন কত মৃদু; আজ এত কঠোর লাগিতেছে কেন?"

অশ্বরাজ প্রিয় প্রভুর অভিলাষ বুঝিল।

'আমার প্রভুর মহানিষ্ক্রমণ মহানির্ব্বাণের জন্য, সে নিষ্ক্রমণ আমারই পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া!'

(৬) বাঙ্গালাগ্রন্থে 'ছন্দক' বলিয়াই পরিচিত। মূল পালিতে কিন্তু 'ছন্ন'ই আছে। এই 'ছন্ন' যে কেন "ছন্দক" হইল বুঝিতে পারিতেছি না।

কন্থক আপনাকে ধন্য মনে করিল। পূতগর্ব্বে তাহার সমস্ত শরীর পুলকে ভরিয়া গেল। কন্থক আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল।

'এই হ্রেষারব এখনই ত সুপ্ত নগরীকে জাগ্রত করিয়া তুলিবে। বোধিসত্ত্বের নিষ্ক্রমণ তবে ত আর হইবে না।" দেবগণ প্রমাদ গণিলেন।

'এই ধ্বনি নিদ্রিত নগরীর সুপ্তকর্ণে যেন প্রবেশ না করে।'

দেবতাগণের ইচ্ছা পূর্ণ হইল। সুপ্ত নগরী সুপ্তই রহিল।

'এখনই ছন্ন অশ্ব লইয়া আসিবে। একমুহূর্ত্ত মাত্র, একবার দেখিয়া আসি'। সন্তর্পণে গর্ভদ্বার (?) মুক্ত হইল। গন্ধদীপ জ্বলিতেছে। কুসুম বিছানো সুকোমল শয়নে মাতাপুত্র। মাতার স্নেহমণ্ডিত হাতখানি সন্তানের মস্তকে।

বোধিসত্ত্ব নির্নিমেষ চাহিয়া রহিলেন। মনে ভাবিলেন, 'একবার বুকে তুলিয়া লই'। 'না, হইল না! দেবীর হস্ত স্পর্শ করিতে হইবে, তখনই ত তিনি জাগিবেন। দেবী জাগিলে নিষ্ক্রমণ তো আর হইবে না।'

বোধিসত্ত্ব ফিরিলেন।

'এখন থাক্! বুদ্ধ হইয়া যখন ফিরিব, তখন দু'জনকেই দেখিব।'

বোধিসত্ত্ব মহানিষ্ক্রমণ করিলেন।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত।

শারীর স্বাস্থ্য-বিধান

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৯)

বিশ্রাম ও নিদ্রা।

স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য ব্যায়ামের যেরূপ প্রয়োজন, শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের পর বিশ্রামেরও সেইরূপ আবশ্যক হইয়া থাকে। শারীরিক পরিশ্রমে শরীর যেমন ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, মানসিক পরিশ্রমে মস্তিষ্কের উপাদান সেইরূপ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। বিশ্রাম দ্বারা শরীরের সর্ব্বাংশের ক্ষয়-পূরণ ও ক্লান্তি দূর হয় এবং মানসিক শক্তি-সমূহ পুনরায় সতেজ হইয়া উঠে।

বিশ্রাম দুই প্রকার, আংশিক ও পূর্ণ। কোন একটী কায করিতে করিতে ক্লান্তি বোধ হইলে তাহা পরিত্যাগ করিয়া অন্য প্রকারের কার্য্য আরম্ভ করিলে শরীর ও মনের আংশিক বিশ্রাম লাভ হয়। অঙ্ক কসিতে কসিতে বিরক্তি বোধ হইলে যদি ইতিহাস বা সাহিত্য চর্চ্চা করা যায়, তাহা হইলে মস্তিষ্কের আংশিক বিশ্রাম লাভ হইয়া থাকে। সেইরূপ সমস্ত দিনের কায কর্ম্মের পর অপরাহ্ণে বাগানে যাইয়া কিছুক্ষণ যদি গাছপালার সেবা করা যায়, তাহা হইলে তাহাকে পরিশ্রম না বলিয়া এক প্রকার বিশ্রাম বলিতে পারা যায়। এইরূপে অবসর কালে সহজ সাহিত্য বা কবিতার চর্চ্চা, সঙ্গীতের আলোচনা, তাস, দাবা, পাশা প্রভৃতি নির্দ্দোষ ক্রীড়ায় যোগ দান, কৌতুকাবহ গল্প গুজব করা প্রভৃতি কার্য্যে সময় অতি-

বাহিত করিলে শরীর ও মন উভয়ই আংশিক বিশ্রাম লাভ করিতে সমর্থ হয়। নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদ স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়। ইংরাজ পরিবারের মধ্যে সন্ধ্যার পর ২।৩ ঘণ্টাকাল যে গান, কবিতা পাঠ, খেলা, ভাল বই পড়া প্রভৃতি কার্য্যে পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি পরিবারস্থ সকলেই যোগ দিয়া থাকেন, তাহাতে সকলেরই শারীরিক ও মানসিক বিশ্রাম লাভ হইয়া মনের উন্নতি ও স্ফূর্ত্তি সাধিত হয়। আমাদের পরিবারের মধ্যেও সকলে একত্রে মিলিত হইয়া এইরূপ নির্দ্দোষ আমোদে দিবসের কিছু সময় অতিবাহিত করিলে আমাদের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও সামাজিক জীবনের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইবার সম্ভাবনা।

আমরা দেখিতে পাই যে বাঙ্গালী জাতির জীবনে আমোদ প্রমোদের ব্যাপারটা দিন দিন যেন একেবারে নিবিয়া যাইতেছে। বাঙ্গালীর "বারমাসের তের পার্ব্বণ" নানাবিধ প্রতিকূল কারণের সমবায়ে একেবারে লোপ-প্রাপ্ত না হউক, প্রায় জীবনশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। সেই সকল উৎসবের দিনে সরল প্রাণের হাসিরাশির প্রতিধ্বনি বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে আর ভাসিয়া বেড়ায় না, উৎসব-প্রাঙ্গণে আবালবৃদ্ধবনিতার আত্মহারা তন্ময়ত্বের দৃশ্য আর দৃষ্টি-পথে পতিত হয় না। আজকাল যেন কি একটা গুরুতর চিন্তার ছায়া কি বালক, কি যুবক, কি বৃদ্ধ, সকলেরই হৃদয়ের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। আগে, পল্লীগ্রামের ত কথাই নাই, সহরেও পাড়াপ্রতিবেশীরা একত্র হইয়া সন্ধ্যার পর খেলা ধূলা, গীত বাদ্য, হাস্য-কৌতুকে ৩।৪ ঘণ্টা কাল যেরূপ সুখে অতি-বাহিত করিত, আজ কাল তাহা কদাচ দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালীরা এখন যেন কেমন অস্বাভাবিক গম্ভীর হইয়া পড়িয়াছে; কি যেন একটা অকাল-বৃদ্ধত্বের ভাব আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলেরই মুখমণ্ডলে পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে। সঙ্গীতের চর্চ্চা বাঙ্গালী জাতির মধ্যে ক্রমশঃ লোপ প্রাপ্ত হইতেছে। ভারতবর্ষের অপর সকল জাতির স্ত্রীপুরুষ-মাত্রেই গান গাহিতে জানে এবং উৎসব ভিন্ন অন্য সময়েও প্রাণ খুলিয়া গান করিয়া থাকে। বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের কথা দূরে থাকুক, কয়জন বাঙ্গালী পুরুষ গান গাহিতে পারেন অথবা গান শিখিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন? আবার আমরা এমনই দেশাচারের পক্ষপাতী যে সঙ্গীত-চর্চ্চা অবশ্য স্ত্রী-শিক্ষণীয় ও শাস্ত্রানুমোদিত হইলেও স্ত্রীলোকের সঙ্গীতালোচনা আমরা নিতান্ত নিন্দনীয় বলিয়া মনে করিয়া থাকি। বাঙ্গালীর যাত্রা, বাঙ্গালীর হাফ্ আকড়াই, বাঙ্গালীর বারোয়ারি, বাঙ্গালীর কীর্ত্তন, বাঙ্গালীর কথকতা, বাঙ্গালীর পর্ব্বোপলক্ষে "মেলা" প্রভৃতি যে কোন জাতীয় আমোদের অবস্থা এখন নিতান্ত শোচনীয়। বর্ত্তমান সময়ে ইহাদিগের স্থান "পেশাদারী" থিয়েটারের দল-কতক পরিমাণে অধিকার করিয়াছে বটে কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, যে আমাদের থিয়েটার-গুলিকে নির্দ্দোষ-আমোদের স্থান বলিতে পারা যায় না। ছাত্রগণের পক্ষে, থিয়েটারে সাধারণতঃ যে ভাবে অভিনয় প্রদর্শিত হইয়া থাকে, তাহাত একেবারেই দর্শনীয় নহে; কত প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষও ঐ গরল পরিপাক করিতে সমর্থ না হইয়া নিজের ও পরিবারের শান্তি,

সুখ ও স্বচ্ছন্দতা যে চিরদিনের জন্য বিসর্জ্জন দিয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। নির্দ্দোষ আমোদের অভাবে নৈরাশ্য ও নিরানন্দের একটা করুণ আর্ত্তনাদ যেন এই বাঙ্গালী জাতির অন্তঃস্থল হইতে নিয়ত উত্থিত হইতেছে! ইহা শুভলক্ষণ নহে। যে জাতি প্রাণ খুলিয়া হাসিতে বা আমোদ করিতে পারে না, সে জাতির জীবনীশক্তি ও উন্নতির সীমা ক্রমে শেষ হইয়া আসিতেছে বুঝিতে হইবে। অতএব এখনো সময় থাকিতে আমাদের সাবধান হওয়া উচিত। যে আমোদ প্রমোদের কোলাহলে আমাদের জাতীয় জীবন কিছুদিন পূর্ব্বে মুখরিত হইত, আসুন, আমরা আবার তাহাকে পুনঃপ্রবুদ্ধ করিয়া, মলিনত্ব পরিহার পূর্ব্বক উহার অনাবিল স্রোতে অবগাহনপূর্ব্বক আমাদের ক্লান্ত দেহ ও অবসাদগ্রস্ত মনকে নূতন উৎসাহে ও নব আশায় অনুপ্রাণিত করিতে চেষ্টা করি। ভগবানের আশীর্ব্বাদে আমরা নিশ্চয় সফলকাম হইব।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে শারীরিক পরিশ্রমের পর যেরূপ বিশ্রামের প্রয়োজন হয়, সেইরূপ মানসিক পরিশ্রমের পর আমাদিগের মস্তিষ্ক বিশ্রাম লাভ করিবার সুবিধা না পাইলে শীঘ্রই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। যে কোন মানসিক পরিশ্রমের কার্য্য করিতে হইলেই মস্তিষ্কের অল্পবিস্তর উত্তেজনার আবশ্যক হয়। আমাদের দেহের যন্ত্রগুলি একটী জীবনীশক্তির উদ্দীপনায় স্ব স্ব কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। শরীরের সর্ব্বাংশে এই শক্তির সমতা সংরক্ষিত হইলেই দেহ-যন্ত্রসমূহের কার্য্যকুশলতা অক্ষুণ্ণ থাকে এবং ইহারই ফলে আমরা পূর্ণ স্বাস্থ্য ভোগ করিয়া থাকি; ইহার অসমান প্রয়োগ দ্বারা দেহ রোগ-প্রবণ হইয়া পড়ে। পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের জন্মদাতা গেলেন্ (Galen) এইজন্য বলিয়া গিয়াছেন—"Health is symmetry, disease is deformity"। যদি মস্তিষ্কের কার্য্যের জন্য এই জীবনীশক্তি অত্যধিক পরিমাণে ব্যয়িত হয়, তাহা হইলে শারীরিক অন্যান্য যন্ত্রাদির কার্য্য যে সমুচিত উত্তেজনার অভাবে শ্লথ হইয়া অসম্পূর্ণভাবে নিষ্পন্ন হইবে, তাহা স্বতঃসিদ্ধ। এদেশের ছাত্র-মণ্ডলীর মধ্যে এই শক্তির অপব্যবহার ও উহার বিষময় ফল প্রবল ভাবে বিদ্যমান থাকিতে দেখা যায়। আমাদিগের ছাত্রদিগের মধ্যে যে শারীরিক বিকাশ ও সামর্থ্যের অভাব লক্ষিত হয়, মস্তিষ্কের অনিয়ন্ত্রিত পরিচালনাই তাহার একটী প্রধান কারণ। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধি লাভের আশায় তাহারা যেরূপ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া মানসিক পরিশ্রম করিয়া থাকে, তাহাতে তাহারা বিবিধ উপাধি-ভূষণে ভূষিত হইতে সমর্থ হইলেও উক্ত চেষ্টায় তাহাদের শরীর যে জন্মের মত নষ্ট হইয়া যায়, তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত প্রতিদিন আমাদের নয়নপথে পতিত হয়। অবশ্য অত্যধিক মানসিক পরিশ্রমের ফলে অনেক স্থলে যশ, প্রতিপত্তি, ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতা লাভ হয় বটে, কিন্তু যদি আমরা স্থির ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখি যে প্রকৃতিদত্ত কি অমূল্য সম্পত্তি নষ্ট করিয়া আমরা এই সকল সম্পদের অধিকারী হইতে সমর্থ হই, তাহা হইলে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই কখনই এরূপ বিনিময়ের পক্ষপাতী হইবেন না। ছাত্রাবস্থায় অপরিমিত মানসিক পরিশ্রমের ফলে অনেকের জীবনের সুখস্বপ্ন

আরম্ভেই লয়প্রাপ্ত হইয়া যায়; তাহারা দুর্ব্বল দেহ ও ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া কোনমতে জীবনের অবশিষ্ট কয়েক দিন অতিবাহিত করিতে থাকে। মস্তিষ্কের নিয়মিত পরিচালনা দ্বারা স্বাস্থ্যরক্ষা হয়, অযথা পরিচালনা দ্বারা ইহার বিপরীত ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অধিক মানসিক পরিশ্রমের কার্য্য করিলে পরিপাক-যন্ত্র সর্ব্বপ্রথমে হীনতেজ হইয়া পড়ে, ক্ষুধা ও খাদ্য পরিপাক করিবার শক্তি উভয়ই কমিয়া যায়, ক্রমে অজীর্ণ ও তজ্জনিত বিবিধ উপসর্গ উপস্থিত হইয়া জীবনকে যন্ত্রণাময় করিয়া তোলে। প্রেসিডেণ্ট্ হেনল্ট্ অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ও অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী ছিলেন কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে ভল্টেয়ার্ দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন যে এ সকল সম্পদ তাঁহার পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র, কারণ তিনি খাদ্য পরিপাক করিতে পারেন না (It matters nothing, he *can't digest*)। একজন বিখ্যাত ইংরাজ গ্রন্থকার রহস্যচ্ছলে বলিয়াছেন যে যাঁহারা অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম করেন, তাঁহাদের খাদ্য-সংগ্রহের অভাব হয় না বটে, কিন্তু খাদ্য-পরিপাকের যথেষ্ট ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। পুনশ্চ পরিপাকের ব্যাঘাত হইলেই অল্প দিনের মধ্যে মস্তিষ্ক দুর্ব্বল এবং প্রকৃতি এরূপ কর্কশ হইয়া উঠে যে ঐ ব্যক্তির মনুষ্যোচিত গুণাবলী একে একে লোপ প্রাপ্ত হয়; তখন অনেক সময়ে তাহার সহবাস অন্যের পক্ষে অপ্রীতিকর হইয়া উঠে। যদি মানসিক পরিশ্রমের সহিত রীতিমত আহার ও নিদ্রার সুব্যবস্থা থাকে, তাহা হইলে মস্তিষ্কের পরিচালনা কিঞ্চিদধিক পরিমাণে সংসাধিত হইলেও বিশেষ অনিষ্ট উৎপাদন করে না। আমাদিগের ছাত্রমণ্ডলীর প্রচুর পরিমাণে আহার লাভ অনেক সময়েই ঘটিয়া উঠে না এবং নিদ্রার পরিমাণ যতটুকু সংক্ষেপ করিলে চলিতে পারে, তাহার সুব্যবস্থা তাহারা নিজেরাই স্থির করিয়া লয়। এই সকল কারণে তাহাদের দেহ যে অপরিণত ও দুর্ব্বল হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ইহার উপর বর্ত্তমান সময়ে তাহাদিগকে এত অধিক বিষয় পাঠ করিতে হয় এবং এত অধিক সময় "হাতে কলমে" শিক্ষা করিবার জন্য পরীক্ষাগারে (Laboratory) অতিবাহিত করিতে হয় যে তাহারা পড়া ছাড়া শরীরচালনা, আমোদ প্রমোদ প্রভৃতি স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অবশ্যপালনীয় অন্যান্য কার্য্য করিতে মোটেই অবসর প্রাপ্ত হয় না। আজ কাল অনেক কলেজে ছাত্রগণকে বেলা ১০টা হইতে আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যা ৬।৭টা পর্য্যন্ত অবিশ্রাম কার্য্য করিতে দেখা যায়; মধ্যে কিছু জলখাবার খাইবার জন্য অবকাশের বন্দোবস্ত অনেক কলেজেই দেখিতে পাওয়া যায় না। ইস্কুলে যেমন প্রতি ঘণ্টার শেষে ১০ মিনিট অথবা মধ্যে আধ ঘণ্টা টিফিনের ছুটী দেওয়া হয়, কলেজে সেরূপ কোন ব্যবস্থা প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রত্যেক কলেজে ১টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত ছাত্রদিগকে টিফিনের অবকাশ দেওয়া উচিত এবং তাহাদের বিশ্রাম করিবার ও জলখাবার খাইবার জন্য একটী প্রশস্ত গৃহ পৃথক্ করিয়া রাখা উচিত। ৫টার পর যাহাতে কোন কলেজে কোন-রূপ শিক্ষা না দেওয়া হয়, তদ্বিষয়ে অধ্যক্ষ-মহোদয়দিগের বিধিব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যক। কলিকাতা ক্যাম্পবেল মেডিকেল

ইস্কুলের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ মেজর্ রেট্ সাহেবের সুব্যবস্থা এ স্থলে উল্লেখ করিবার যোগ্য। পূর্ব্বে এই ইস্কুলে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ছাত্রদিগকে শিক্ষা প্রদান করা হইত, ইহাতে ছাত্রগণ অপরাহ্নে খেলা ধূলা কিছুই করিবার অবকাশ পাইত না। মেজর্ রেট্ একদিন সমস্ত অধ্যাপকদিগকে একত্র ডাকাইয়া বলিলেন যে তিনি তাঁহার ছাত্র-দিগের মঙ্গলের জন্য তাহাদিগকে ৫ টার পর ক্লাসে বদ্ধ করিয়া রাখিতে ইচ্ছা করেন না; ঐ সময়ে তিনি তাহাদিগকে মুক্ত স্থানে বায়ু-সেবন ও ক্রীড়ায় নিযুক্ত থাকিতে দেখিলে বিশেষ সুখী হইবেন। সেই অবধি ক্যাম্প্ বেল্ ইস্কুলে অপরাহ্নে কোন লেক্চার হয় না, ছাত্রেরা পরম সুখে ঐ সময়ে ক্রীড়া বা ব্যায়ামে নিযুক্ত থাকিয়া শরীর এবং মনের বিশ্রাম ও উন্নতি সাধন করে। মেজর্ রেটের সদ্দৃষ্টান্ত প্রত্যেক কলেজের অধ্যক্ষের অনুসরণ করা উচিত। এ বিষয়ে আমাদিগের বিশ্ববিদ্যালয়ের পথ-প্রদর্শক হওয়া কর্ত্তব্য কিন্তু আমরা শুনিতে পাই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের নবপ্রতিষ্ঠিত "ল" কলেজে ছাত্রগণ রাত্রি ৭।৭½টা পর্য্যন্ত লেক্চার্ শুনিবার জন্য গৃহ-মধ্যে আবদ্ধ থাকে। আমাদের বিশ্বাস যে এরূপ ব্যবস্থায় ছাত্রদিগের শরীর নষ্ট ও স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া যাইতেছে। ছাত্র-দিগের পরমহিতৈষী বন্ধু, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সুযোগ্য পরিচালক, মাননীয় ভাইস্-চান্সেলর্ মহোদয়ের নিকট আমরা এ বিষয়ের সুবিচার প্রার্থনা করিতেছি।

আমাদের অধিকাংশ সভাসমিতি ছাত্র-মণ্ডলী লইয়া গঠিত, তাহারা উপস্থিত না থাকিলে অনেক সময়ে সভার কার্য্যই হয় না। নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে, যে সময়ে ছাত্রেরা মুক্ত স্থানে থাকিয়া বিশুদ্ধ বায়ু সেবন বা ব্যায়াম চর্চ্চা করিবে, আমরা সেই অপরাহ্ন-কালেই যাবতীয় সভা আহ্বান করিয়া ছাত্রদিগকে জনাকীর্ণ গৃহ-মধ্যে আবদ্ধ রাখিবার প্রয়াস পাইয়া থাকি। ইউনিভার্সিটী ইন্‌ষ্টিটিউট্ বা অপর যে কোন স্থানে সভাসমিতি আহূত হউক না কেন, সভার অধ্যক্ষদিগের নিকট আমার সবিনয় নিবেদন এই যে তাঁহারা যেন ৫ হইতে ৭টা পর্য্যন্ত ছাত্র দিগকে গৃহ-মধ্যে আট্‌কাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা না করেন। ৪ টার সময় অথবা ৭টার পর সভা করিলে ছাত্রদিগের বিশ্রাম ও ব্যায়ামের সময়ের উপর হস্তক্ষেপ করা হয় না। হয় ত এইরূপ ব্যবস্থায় ২।৪ জন বড় লোকের সভায় উপস্থিত হইবার ব্যাঘাত হইতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের সুবিধার জন্য ছাত্রমণ্ডলীর অনিষ্ট সাধন করা বোধ হয় কোন বিবেচক ব্যক্তিই অনুমোদন করিবেন না।

ছাত্রদিগের সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, প্রাপ্ত-বয়স্ক দেশের মুখোজ্জ্বলকারী সুধী ব্যক্তিগণের সম্বন্ধেও তাহাই প্রযুজ্য। তাঁহারা শরীরকে অবহেলা করিয়া মস্তিষ্কের অনিয়মিত পরিচালনা করেন বলিয়া তাঁহাদের শরীর শীঘ্র ভগ্ন হইয়া যায় এবং অজীর্ণ, গ্রন্থিবাত, বহুমূত্র প্রভৃতি নানাবিধ দুশ্চিকিৎস্য রোগে আক্রান্ত হইয়া যৌবন অতিক্রম করিতে না করিতেই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়েন এবং আত্মীয় স্বজন ও স্বদেশবাসীগণকে শোকসাগরে ভাসাইয়া অকালে ইহলীলা সম্বরণ করেন। মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন, কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি মনস্বী ব্যক্তিবৃন্দের জীবনের ইতিহাস ইহার প্রকৃষ্ট

উদাহরণ স্থল। ইঁহাদের মত মনস্বী ব্যক্তিগণ যদি মানসিক পরিশ্রম, কায়িক পরিশ্রম ও বিশ্রামের সমতা রক্ষা করিতে যত্নবান হন, তাহা হইলে বহুদিন পর্য্যন্ত তাঁহাদের স্বাস্থ্য ও মানসিক শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে এবং তদ্দ্বারা দেশের ও দশের অশেষ মঙ্গল সাধিত হয়।

নিদ্রাই শরীর ও মনকে পূর্ণ বিশ্রাম প্রদান করে। চরক বলিয়া গিয়াছেন যে দেহ সম্বন্ধে আহার যেরূপ প্রয়োজনীয়, নিদ্রাও তদ্রূপ। তিনি এইরূপে নিদ্রার গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন—

"নিদ্রায়ত্তং সুখং দুঃখং পুষ্টি কার্শ্যং বলাবলং।
বৃষতা ক্লীবতা জ্ঞানমজ্ঞানং জীবিতং ন চ॥
অকালেঽতি প্রসঙ্গাচ্চ ন চ নিদ্রা নিষেবিতা।
সুখায়ুষী পরা কুর্য্যাৎ কালোযেবাগতা নরং॥

সুখ, দুঃখ, পুষ্টি, কৃষতা, বলাবল, বৃষতা, ক্লীবতা, জ্ঞান, অজ্ঞান, জীবন, মরণ সকলই নিদ্রার আয়ত্বাধীন। অকালে নিদ্রা যাওয়া, অতিশয় নিদ্রা যাওয়া বা একেবারে নিদ্রা না যাওয়ায় মনুষ্যের সুখ ও পরমায়ু নষ্ট হয়।"

চরকসার।

রাত্রিকালই নিদ্রার প্রশস্ত সময়। দিবা-নিদ্রা সাধারণতঃ স্বাস্থ্যের অনুকূল নহে। ইহা দ্বারা পরিপাকের বিলম্ব হয়, ক্ষুধা থাকে না এবং রাত্রিকালে সুনিদ্রালাভের ব্যাঘাত হয়। মহাভারতে বর্ণিত আছে যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর গান্ধারী শ্রীকৃষ্ণকে স্বীয় শত পুত্রের অকাল মৃত্যুর হেতু জিজ্ঞাসা করিবার সময় বলিয়াছেন যে তাঁহার পুত্রেরা কখনও দিবানিদ্রা গমন করে নাই। চরক ঋষি শারীরিক অবস্থা ও ঋতু বিশেষে দিবানিদ্রার পরিচর্য্যা করা যাইতে পারে, ইহা বলিয়া গিয়াছেন। ভারবহন, পথ-পর্য্যটন বা কার্য্যশ্রমে যাহারা ক্লিষ্ট, যাহারা অজীর্ণ, শ্বাস, হিক্কা বা ক্ষতাদি রোগে পীড়িত, বালক, বৃদ্ধ, দুর্ব্বল, আঘাতপ্রাপ্ত, রাত্রি জাগরণে ক্লান্ত, ভয় ক্রোধ বা শোকপ্রাপ্ত অথবা উন্মত্ত ব্যক্তির পক্ষে দিবানিদ্রা আচরণীয়। চরক গ্রীষ্মকাল ভিন্ন অন্য ঋতুতে সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে দিবানিদ্রা নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে গ্রীষ্মকাল ভিন্ন অন্য সময়ে দিবা-নিদ্রা গমন করিলে শ্লেষ্মা ও পিত্তের প্রকোপ বৃদ্ধি হয়। তিনি আরো বলিয়াছেন যে যাহারা স্থূলকায়, যাহারা ঘৃত দুগ্ধাদি স্নেহ দ্রব্য প্রত্যহ সেবন করিয়া থাকে, যাহাদের শরীরে শ্লেষ্মার প্রকোপ অধিক, তাহাদের দিবানিদ্রা সেবন করা কদাচ উচিত নহে।

অনুচিত দিবানিদ্রা সেবনে যে সকল রোগ উৎপন্ন হয়, তাহার বর্ণনা করিয়া চরক বলিয়া-গিয়াছেন যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিদ্রা সম্বন্ধে হিতাহিত বিবেচনা করিয়া নিদ্রা সেবন করিবেন।

শিশুদিগের বার ঘণ্টার অধিককাল, বালকবালিকাদিগের ৯ ঘণ্টা এবং প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে ৬।৭ ঘণ্টাকাল নিদ্রা যাওয়া বিধেয়।

রাত্রে স্বল্পাহারই সুনিদ্রার পক্ষে প্রশস্ত; গুরু ভোজনে নিদ্রার ব্যাঘাত, স্বপ্ন ও ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়।

যুবকদিগের পক্ষে অতিশয় কোমল শয্যায় শয়ন করা প্রশস্ত নহে। পরিষ্কৃত শয্যা সর্ব্বদা ব্যবহার করা উচিত। প্রত্যহ শয্যা রৌদ্রে দেওয়া কর্ত্তব্য এবং ৪।৫ দিন অন্তর বিছানার চাদর ও বালিসের ওয়াড় সাবানজলে কাচিয়া দেওয়া

বা পরিবর্ত্তন করা উচিত। মশারি প্রতি মাসে ধোবার বাড়ী পাঠান কর্ত্তব্য; মধ্যে প্রতি সপ্তাহে একবার রৌদ্রে দেওয়া উচিত।

শয়ন-গৃহে অধিক "আসবাব" রাখা উচিত নহে, কারণ "আসবাব" যত অধিক হইবে, গৃহমধ্যে বায়ু-স্থান ততই কমিয়া যাইবে। শয়ন-গৃহের দরজা জানালা সর্ব্বদা মুক্ত রাখা কর্ত্তব্য, এমন কি শীতকালেও গৃহের ২।১টী বায়ুপথ রাত্রিকালে খুলিয়া রাখা উচিত। শয়ন-গৃহের রুদ্ধাবস্থাই অনেক স্থলে অসুস্থতা ও অনিদ্রার প্রধান কারণ। নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে ঘরের আলো নিবাইয়া দিলে ভাল হয়, কেন না ঘরে আলো জ্বলিলে তদুৎপন্ন দূষিত পদার্থ বায়ুমধ্যে সঞ্চিত হইতে থাকে। যদি আলো রাখিবার একান্ত প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে বেড্ রুম্ ল্যাম্প্ (Bedroom lamp) নামক অতি ক্ষুদ্র বাতি ব্যবহার করা উচিত।

মেঝেতে শয্যা বিস্তার না করিয়া খাট, তক্তাপোষ বা খাটিয়া ব্যবহার করা উচিত। মেঝে ভিজা থাকিলে বিছানা আর্দ্র হয়, তাহাতে ঠাণ্ডা লাগিবার সম্ভাবনা। মেঝে যদি পাকা না হয়, তাহা হইলে তাহা হইতে দূষিত বাষ্প উত্থিত হয় এবং উহা নিশ্বাসের সহিত গৃহীত হইয়া শর্দ্দি কাশি উৎপাদন করে। পল্লীগ্রামে তক্তাপোষ বা খাটে শুইলে অনেক সময়ে সাপ, বিছা, কীট পতঙ্গাদির উপদ্রব হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

মশারি না খাটাইয়া (বিশেষতঃ পল্লীগ্রামে) কখনই শয়ন করিবে না। সকলেই জানেন যে একজাতীয় মশকের দংশন দ্বারা ম্যালেরিয়া ও অপর কয়েকটী ব্যাধির উৎপত্তি হইয়া থাকে। মশারি ব্যবহার করিলে এই সকল রোগের আক্রমণ হইতে অনেক পরিমাণে অব্যাহতি পাওয়া যায়। মশারি খাটাইলে সাপ, বিছা, ইঁদুর প্রভৃতি বিষাক্ত জন্তুর অত্যাচার হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

সুনিদ্রা না হইলে শরীর ও মন যেরূপ অসুস্থ হয়, তেমন আর কিছুতেই নয়। ২।৩ দিন উপর্য্যুপরি রাত্রি জাগরণ করিলে চেহারা অত্যন্ত খারাপ হইয়া যায়, বোধ হয় যেন ঐ ব্যক্তি ৬ মাস রোগ ভোগ করিয়াছে। এক রাত্রির সুনিদ্রাতেই তাহার মুখে স্বাস্থ্যের জ্যোতিঃ পুনরায় প্রকাশ পায়।

যাহা কিছু দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনার বিষয় আছে, শয়নের পূর্ব্বে সে সকল দূরে রাখিয়া মন স্থির করিয়া শয্যায় গমন করিবে। শয়নের পূর্ব্বে কিছুকাল সৎগ্রন্থ ও ধর্ম্মগ্রন্থের আলোচনা করিয়া শয়ন করিতে যাইলে মন অনেক পরিমাণে নিরুদ্বিগ্ন হয় এবং ভগবানকে "স্মরণ ও মনন" করিয়া নিদ্রা গমন করিলে নিদ্রার ব্যাঘাত হয় না। ইহা মহাপুরুষের বাক্য—কখনই ব্যর্থ হইবার নহে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচুনীলাল বসু।

রোহিণীর চা বাগান

এখানে আসতে গেলে দার্জ্জিলিং মেল ধরে, শুক্না (Sookna) ষ্টেষনে নামতে হয়। শুক্না থেকে এটা প্রায় ৭।৮ মাইলের পথ হবে। পথের দৃশ্য অতীব সুন্দর। প্রথমেই নিবিড় শালজঙ্গল; তারপরে বহু দূর বিস্তীর্ণ সুসজ্জিত চা বাগানের মধ্য দিয়ে উঁচু নীচু পথ ধরে উপলবিক্ষিপ্ত রোহিণী নদীর উপরকার কাঠের পুল পার হোয়ে ক্রমাগত চড়াই পথে এখানে পঁহুছিতে হয়। এই নদীর নাম থেকেই জায়গাটাও রোহিণী নাম প্রাপ্ত হয়েছে। রাস্তায় আসতে আরও কত ছোট ছোট পাহাড়ে নদী হু-হু শব্দে নীচে নেমে আসছে দেখতে পাওয়া যায়।

বাস্তবিক, রোহিণী আমাকে বিস্মিত, পুলকিত ও স্তম্ভিত করে রেখেছে। লতাগুল্মপরিশোভিত, মেঘ ঢাকা, গগনচুম্বি হিমালয়ের গৃহসকল কখনও রৌদ্র কিরণে উদ্ভাসিত হয়ে হাসছে আবার পরক্ষণেই মেঘের কাল ঘোমটা টেনে দিয়ে অশ্রুবর্ষণ করছে। এরূপ হাসি কান্নার অদ্ভুত সমাবেশ আমি আর কখনও দেখিনি। খোলা জানালার যে দিক দিয়ে বাইরে চেয়ে দেখ, দেখতে পাবে প্রকৃতির মোহিনী মূর্ত্তি। এমন শক্তি নাই যে ভাল করে বর্ণনা করি। ভাষা, ভাব সবই এর কাছে পরাজিত হয়। এখানে দেখবার এবং আশ্চর্য্যান্বিত হবার প্রধান জিনিষ হচ্ছে মেঘ আর কুয়াসা, বৃষ্টি আর

রোহিণীর চা ব'গান।

রদ্দুর। এই কুয়াসায় সব ঢেকে যাচ্ছে—টপটপ ক'রে বৃষ্টি পড়ল আবার কিছু নাই সব পরিষ্কার।

এখানকার দ্বিতীয় সৌন্দর্য্য রোহিণীর চা-বাগান। পাহাড়ের থাকে থাকে সমস্ত ঢালু জায়গায় সারবন্দী চা গাছের দৃশ্য দূর হতে কি সুন্দর দেখায়। আরও সুন্দর দেখায় যখন ভোর না হতে চায়ের টুকরী পিঠে ঝুলিয়ে চাঁচায়ের ছাতা (ঘুম) মাথায় করে নেপালী মেয়ে পুরুষ চায়ের কারখানা ঘর থেকে প্রফুল্ল মনে দল বেঁধে চা বাগানের দিকে যায়। সমস্ত সকাল ধরে তারা ঝুড়ি বোঝাই করে চা-এর পাতা তোলে; আর দুপুর বেলা শ্রান্ত দেহে নিজেদের শান্তিময় কুটিরগুলিতে ফিরে আসে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও ছোট ছোট কোদাল ও নিড়েন নিয়ে চা গাছের গোড়া পরিষ্কার করে। পুরুষদের মাসিক আয় হচ্ছে ৭৲ মেয়েদের ৫ থেকে ৬৷৷০, আর ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা দুই টাকা করে পারিশ্রমিক পায়। এখানে সবাই কাজ কর্ত্তে চায়। কেউ বসে খায় না। স্বামী স্ত্রী ছেলে

মেয়ে সকলেই সমান ভাবে খাটে। সে জন্য অভাব নাই। যা রোজগার করে তাতেই সন্তুষ্ট। ভবিষ্যতের জন্য কিছুই ভাবে না। এদের শরীর দেখলে বাস্তবিকই আনন্দ হয়। যেমন সুন্দর রং তেমনি বলিষ্ঠ দেহ। মেয়েরা আঁটা সাঁটা জামা কাপড় পরে, গায়ে অল্প সল্প গহনা দিয়ে নিঃশঙ্কচিত্তে স্বাধীন ভাবে কাজ করে। পুরুষদের পোষাক হচ্ছে এক লম্বা পেণ্টলুন, ওয়েষ্টকোট, কোট ও মাথায় এক টুপি আর কোমরে একখানি খুকরী। এই এদের সাধারণ পোষাক। পোষাকের জাঁকটা এবং তার জন্য খরচও পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের বেশী। এরা খুব পরিশ্রমী, বিনয়ী এবং সরল। দিন রাত্রি পাহাড়ে ওঠা নামা কোর্ত্তে হয়, সারা বছর কুয়াসা বৃষ্টি মাথায় করে থাকতে হয় সেই জন্যই এদের শরীর এত বলিষ্ঠ। খাওয়া দাওয়ার অনিয়মে ব্যায়রাম পীড়াও হয়। এদের নেপালী ভাষা একেবারে দুর্ব্বোধ্য নয়। এদের মধ্যে বিবাহের বাঁধাবাঁধি কোনও নিয়ম নাই। স্বামী ইচ্ছা করলে স্ত্রীকে এবং স্ত্রীও ইচ্ছা করলে স্বামীকে যখন তখন পরিত্যাগ করতে পারে। এ বিষয়ে উভয়েরই ক্ষমতা সমান। তবে যদি কোনও পুরুষ কোনও রমণীকে তার পিতামাতার অজ্ঞাতসারে বিবাহ করে নিয়ে আসে এবং যদি সে কথা পরে রাষ্ট্র হয় তা হলে কন্যার পিতামাতা প্রভৃতিকে প্রচুর পরিমাণে মদ এবং মুরগীর ভোজ দিতে হয়। এখানে courtship প্রথার প্রচলন আছে।

এ চা-বাগান কলিকাতার অ্যাণ্ড্রু ইউল কোম্পানির। ১৭০০ acre (একর) জমির উপর চাএর চাষ। 'কামানে' ৩০১৪ জন কুলি কাজ করে। এরা চা-বাগানকে 'কামান' বলে। যদিও Factoryতে Steam Engine আছে তবু এখনও water pressure-এই কাজ চলছে। প্রায় ২ মাইল দূরের খুব উঁচু পাহাড়ের উপর থেকে রোহিণী নদীর জল পাইপ দ্বারা এনে কল চালান হয়। সেটা একটা দেখবার জিনিষ বটে। খাবার জলও পাহাড়ের ঝরণা থেকে পাইপ দিয়ে আসে। রোহিণী নদীর উপর এ পাহাড়ের চূড়া থেকে ও পাহাড়ের চূড়া পর্য্যন্ত একটা ঝুলান সেতু (Hanging Bridge)। কারখানায় জল নিয়ে যাবার জন্য তার উপর টিনের drain বসান আছে। পুলটা কারখানার চীনে মিস্ত্রীদের দ্বারাই তৈয়ারী। এখানে পাহাড় Fern, orchid, moss যথেষ্ট পরিমাণেই পাওয়া যায়। জঙ্গলী কলাগাছও অনেক আছে।

বাঙ্গালীর মধ্যে এখানে ২।১ জন চা-বাগানের কর্ম্মচারী এবং একজন ডাক্তার আছেন। এখানকার বাড়ীগুলি প্রায় অধিকাংশই কাঠের। এখানে স্কুল, কাছারী, হাঁসপাতাল, আদালত, জেল, ডাকঘর, থানা, হোটেল, লাইব্রেরী, মিউজিয়াম কিছুই নাই। আছে মেঘ রদ্দুরের লুকোচুরী খেলা। আছে কুয়াসা বৃষ্টির ছড়াছড়ি, পার্ব্বত্য নদীর কুলুকুলু ধ্বনি, পাখীর গান, ফুলের সৌরভ, আর স্বাধীন পুরুষ রমণীর কর্ম্মব্যস্ততা ও উচ্চহাস্য।

শ্রীঅমলচন্দ্র দত্ত।

আমার বাল্যকথা

(৭)

শিক্ষা

আমি ইতিপূর্ব্বে পাঠশালায় গুরুমশায়ের কাছে আমার প্রাথমিক শিক্ষার কথা বলেছি, তার পরের ধাপ হচ্ছে পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন। পিতৃদেব যে চারজন পণ্ডিতকে বেদশিক্ষার জন্যে কাশীতে পাঠান বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার তার মধ্যে একজন। ইনিই আমার সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন। যদিও আমার শিক্ষক কিন্তু এঁর উপাধির উপযুক্ত পাণ্ডিত্যের যদি সার্টিফিকেট দিতে হয় তাতে আমার সঙ্কোচ বোধ হবে। এঁর

শিক্ষাগুণে সংস্কৃতশাস্ত্রে আমার যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মেছিল তা বলতে পারি না। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের 'সহর্ণের্ঘঃ' 'চপোদিতা কানিতার্ণঃ' প্রভৃতি সূত্র ও তত্তবৃত্তিগুলি কণ্ঠস্থ ও আবৃত্তি করতেই সব সময় যেত। তিনি বলতেন—

'আবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রানাং বোধাদপি গরীয়সী।' অর্থাৎ আবৃত্তিই সর্ব্বশাস্ত্রের সার, বোঝো আর না বোঝো তাতে কিছু যায় আসে না। কাব্যের মধ্যে রঘুবংশের কয়েক সর্গ বই আর বেশীদূর এগোয় নি। আমি যতদিন বিদ্যালঙ্কারের কাছে সংস্কৃত শিখেছিলুম, ততদিন যদি আর একজন ভাল পণ্ডিতের কাছে,—ওকথা থাক্ আর গুরুনিন্দা করব না। তাঁর নিকট শিক্ষায় আমার একটা লাভ হয়েছিল স্বীকার করতেই হবে। সংস্কৃত ভাষার বিশুদ্ধ উচ্চারণ একপ্রকার আয়ত্ত করে নিয়েছিলুম। কাশীতে সংস্কৃত অধ্যয়নের ফলে আর কিছু না হোক্ তাঁর ঐটুকু পাণ্ডিত্য — ঐ উচ্চারণ শুদ্ধিটুকু উপার্জ্জিত হয়েছিল, আর তাঁর ছাত্রও অল্পবিস্তর তার ফলভাগী হয়েছিল। বাঙ্গ্লাদেশে সংস্কৃত উচ্চারণ যে কি বিকৃত তা সকলেরই জানা আছে, সে উচ্চারণ ত আমার কাণে ভারি অশ্রাব্য ঠ্যাকে। আমাদের মধ্যে বড় বড় দিগ্গজ পণ্ডিতদেরও উচ্চারণ শুনলে মাথা হেঁট করতে হয়। আমাদের যেমন একপ্রকার 'বাবু' ইংরিজি আছে যা নিয়ে ইংরাজেরা বিদ্রূপ করে, তেমনি 'বাবু' সংস্কৃত উচ্চারণ শুনে না জানি তৈলঙ্গী বা মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিতেরা কি মনে করেন! সংস্কৃত কালেজের একজন ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষের সহিত আমার এই বিষয়ে কথা হয়। আমি বিনীতভাবে নিবেদন করেছিলুম যে, কালেজের বিদ্যার্থীদের বিশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ শেখাবার একটা সুব্যবস্থার প্রয়োজন। তিনি আমার একথা হুট করে উড়িয়ে দিলেন। বল্লেন, "এদেশে যে উচ্চারণ চলিত তাই ঠিক - মেড়ুয়াবাদীদের কাছে আমরা আবার উচ্চারণ কি শিখব? আর কোন্ প্রদেশকেই বা উচ্চারণের মানদণ্ড বলে গ্রহণ করা যেতে পারে?"

কিন্তু এ তর্কের মীমাংসা গায়ের জোরে হয় না। সংস্কৃতের কোন্ বর্ণের কি উচ্চারণ তা পরীক্ষা কর্‌বার অনেক উপায় আছে, আর সে পরীক্ষায় বাঙ্গ্লা-সংস্কৃত উচ্চারণের ভ্যাজাল ধরা পড়বেই। "ভাষা বিজ্ঞানের পারিপাট্যে সংস্কৃত অতুলনীয়। ভাষায় যতগুলি উচ্চারণ ঠিক ততগুলি বর্ণ সংস্কৃত বর্ণমালায় স্থান পাইয়াছে। প্রত্যেক বর্ণের একটিমাত্র নির্দ্দিষ্ট উচ্চারণ।" কিন্তু এদেশে আমরা কি সংস্কৃত বর্ণের যথানির্দ্দিষ্ট উচ্চারণ রক্ষা করি? তা ত নয়। আমরা বর্গীয় জ অন্তস্থ্য য, দুই ব, মূর্দ্ধণ্য ণ দন্ত্য ন, তালব্য মূর্দ্ধণ্য ও দন্ত্য স এই সকল ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের উচ্চারণে কোন প্রভেদ মানি না। যুক্তাক্ষরে প্রতি বর্ণের পৃথক্ উচ্চারণ না করে বাঙ্লা ধরণে এক বিকৃত উচ্চারণ করে থাকি—যথা—

কৃষ্ণ (ষ্ণ) = কিষ্ট

আত্মা = আত্তঁা

স্নান = স্তান

ক্ষীর (খ্ষীর) = ক্ষীর ইত্যাদি

অন্তাস্থ 'য'র পৃথক উচ্চারণ বাঙ্গলায় আদৌ নাই, যুক্তাক্ষরেও নহে। সংযুক্তবর্ণে 'য'কারের উচ্চারণ হয় না—যে অক্ষরে

সংযুক্ত থাকে তার দ্বিরুক্তির মত উচ্চারণ হয়, যেমন—

সত্য = সত্ত। বাদ্য = বাদ্দ ইত্যাদি।

বাঙ্‌লার অনেক স্থলে 'অ'কারের উচ্চারণ প্রাকৃত হ্রস্ব ওকারের মত যথা অরি অসি ইত্যাদি। সংস্কৃত উচ্চারণের বেলাতেও আমরা এই নিয়ম অনুসরণ করি। বাঙ্‌লা উচ্চারণের নিয়ম সংস্কৃত উচ্চারণে আরোপিত দূষিত হয় ব'লে এখানে সংস্কৃতের উচ্চারণ এরূপ হয়েছে। তাই বলছি সংস্কৃতের মত ঠিক উচ্চারণ করতে হলে আমাদের রীতিমত সংস্কৃত উচ্চারণ শিক্ষার প্রয়োজন। একথা সত্য যে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে সংস্কৃত উচ্চারণের বিশুদ্ধতা কোন কোন অংশে নষ্ট হয়েছে, কিন্তু এবিষয়ে বাঙ্গলা দেশের কাছে আর সকলকেই হার মানতে হয়। এদেশে সংস্কৃত উচ্চারণ যেরূপ বিকৃতি ধারণ করেছে এমন আর কোথাও দেখি নাই। বারাণসী বল, দাক্ষিণাত্য বল, এসকল স্থানের যে কোন পণ্ডিত হোন্ তাঁদের উচ্চারণ যে আমাদের তুলনায় বিশুদ্ধ সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। দুএকটি ব্যতিক্রম থাকতে পারে যেমন মহারাষ্ট্রে দেখেছি 'দ'এ 'ন'এ 'জ্ঞ'র উচ্চারণ হয় কিন্তু সেগুলি ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। অতএব এ ক্ষেত্রে আমরা নিশ্চয়ই ওসকল স্থানের সংস্কৃতজ্ঞদের গুরুস্থানীয় বলে মেনে নিতে পারি। সে যাহোক্, আমার মনে হয় বঙ্গদেশে সংস্কৃতের উচ্চারণ-সংস্কার নিতান্তই প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে এবং আমাদের সংস্কৃতানুরাগী বিদ্বন্মণ্ডলী এবিষয়ে মনোযোগ করুন, এই আমার সবিনয় নিবেদন।

বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত-সাহিত্যে আমার যা কিছু জ্ঞানলাভ হয়, সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষায় সেই বিদ্যাটুকু আমার বিলক্ষণ কাজে এসেছিল। আমার সময়ে সংস্কৃত ও আরব্য ভাষায় ৫০০ মার্ক পূর্ণমাত্রা নির্দ্ধারিত ছিল। এই ৫০০ মার্কের মধ্যে আমি সংস্কৃতে ৩৫০রও উপর পেয়েছিলুম। আমার পরীক্ষক ছিলেন ভট্ট মোক্ষমূলর। তিনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন। বোধকরি আমার লেখা পরীক্ষা করবার সময় আমার কাগজটার উপরে একটু সদয়ভাবে চোখ বুলিয়েছিলেন, নইলে অত উচ্চ সংখ্যা পাবার আমার আশা ছিল না। আমি সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষায় লাটিন গ্রীকের পরিবর্ত্তে আমাদের দুই Classic—সংস্কৃত ও আরবিক নিয়েছিলুম। ওখানকার ছাত্রদের নিজের ভাষায় অথবা ওদের চিরাভ্যস্ত লাটিন গ্রীক ভাষায় যদি আমাকে পরীক্ষা দিতে হত, আর আমাদের ক্ল্যাসিকদ্বয় তালবেতালরূপে যদি আমার সহায় না থাকত তাহলে ঐ পরীক্ষায় আমার জয়লাভের কোন সম্ভাবনাই থাকত না।

ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী

Oriental Seminaryর হেড মাষ্টার ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী আমাদের ইংরাজি শিক্ষক ছিলেন।—ধীর শান্তপ্রকৃতি, সুবিদ্বান—তাঁর কি এক মোহিনী শক্তি ছিল আমরা সহজেই তাঁকে মেনে চলতুম, আমাদের উপর তাঁর কোন জোর জবরদস্তী করতে হত না। আমাদের কাছে তাঁর ডাক-নাম ছিল কেবলমাত্র "*Sir*", —'Sir' এসেছেন শুনলেই আমরা গিয়ে হাজির। বিদ্যালয়ে আমাদের যে সকল পাঠ্য

পুস্তক ছিল তা ছাড়াও তিনি আমাদের অনেক বই পড়তে দিতেন। তার মধ্যে উল্লেখ যোগ্য —Gibbon's Decline and Fall—'রোম রাজ্যের অবনতি ও পতন' যার পত্রে পত্রে ঘোরতর রাষ্ট্র-বিপ্লব, রোম সম্রাটের অমানুষিক কাণ্ড-কারখানা—গিবনের মৃদঙ্গগম্ভীর ভাষায় পড়ে স্তম্ভিত হতে হত। এতদ্ভিন্ন ইংরাজি প্রবন্ধাদি লেখা বক্তৃতাদি অভ্যাস করা এ সকলের প্রতিও তিনি মনোযোগ দিতেন। যাতে আমাদের ইংরাজি ভাল বলবার ক্ষমতা জন্মে সেই উদ্দেশে তিনি আমাদের জন্য এক বক্তৃতা সমিতি স্থাপন করেছিলেন;—প্রতি সপ্তাহে তার অধিবেশন হত এবং পৃথিবীর প্রধান প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনা – নেপোলিয়ন প্রভৃতি মহা মহা বীরদের বীরত্ব-কাহিনী অবলম্বন করে আমরা বড় বড় তর্কবাগীশ একত্র হয়ে বাগ্মিতা ফলাবার চেষ্টা করতুম। সর্ব্বশেষে সভাপতি মহাশয় আমাদের তর্কবিতর্কের সুন্দর মীমাংসা করে দিতেন। এই সভার কার্য্য অনেক দিন বেশ নিয়ম পূর্ব্বক চলেছিল। মাষ্টারমশায়ের প্রতি আমাদের প্রগাঢ় ভক্তি ভালবাসা ছিল, তিনিও পিতার ন্যায় আমাদের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধনে যত্নবান ছিলেন। তাঁরি শিক্ষাগুণে আমি ঐ সময়ে প্রেসিডেন্সি কালেজের কোন এক সভায় "প্রাচীন ভারতের রণনীতি" বিষয়ক একটি ইংরাজি প্রবন্ধ পাঠ করি —কেশবচন্দ্র সেন সেই অধিবেশনে একজন প্রধান বক্তা-রূপে উপস্থিত ছিলেন।

সাত বৎসর বয়সে আমি হিন্দুস্কুলে ভর্ত্তী হই, তখন তার নাম ছিল 'হিন্দুকালেজ।' প্রথম দুই বৎসর একাদিক্রমে দুইটি প্রাইজ পাই—দ্বিতীয়খানি সচিত্র Robinson Crusoe—বালকের পক্ষে এমন সুপাঠ্য পুস্তক আছে কি না সন্দেহ। দুবৎসর পরে বনমালী বাবুর ক্লাসে উঠি। তিনি একজন অতি কঠোর প্রকৃতির মাষ্টার ছিলেন। ছেলেদের উপর বড়ই উৎপীড়ন করতেন, সব চেয়ে যে সুশীল বালক সেও তাঁর প্রচণ্ড চপেটাঘাত এড়াতে পারত না। বন্ধুবর তারকনাথ পালিত তাঁর চপেটাঘাতে একবার ঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন। আমরা তাঁকে যমের ন্যায় ভয় করে চলতুম—যমদূতের মত তাঁর সেই ভীষণ কৃষ্ণমূর্ত্তি মনে করলে এখনো ভয় হয়।

তারকনাথ পালিত

বনমালী বাবুর ক্লাসে আমার পড়াশুনা কেমন হত মনে নাই কিন্তু একটি জিনিসের জন্যে সে বৎসরটি আমার চিরস্মরণীয় থাকবে —সে কি না বন্ধুলাভ। আমার সহাধ্যায়ী শিক্ষার্থীদের মধ্যে আমি যে একটি বন্ধুরত্ন পেয়েছিলুম তিনি আমার চিরজীবনের সঙ্গী হয়ে রইলেন। ছেলেব্যালায় তিনি আমাকে কত ভালবাসতেন, আমাকে ভাল ভাল পায়রা —লক্কা মুখী লোটন গলাফোলা পায়রা এনে দিয়ে কতরকমে আমাকে সুখী করবার চেষ্টা করতেন, স্কুলে ও বাড়ীতে সর্ব্বদাই আমরা মাণিক জোড়ের মত একসঙ্গে থাকতুম। আমার ছেলেবেলাতেই একবার এমন বাত হয়েছিল —যে চলতে কষ্ট হোত—তখন তাঁর কাঁধে ভর দিয়ে দিয়ে চলতুম। বড় হয়ে যখন তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লুম তখনো আমরা বন্ধুত্ব-সূত্রে বাঁধা। আমি বিলাত যাই ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে,

বয়স তখন ১৯, বিলাত থাকতে আমাদের পত্র ব্যবহারে কোনদিন ত্রুটি হয়নি। যখন আমি বোম্বায়ে কাজ আরম্ভ করি তখনও তারক বিলাত যাননি। তিনি বিলাত যান আমি বিলাত থেকে ফিরে আসার বছর দুই পরে—১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে। বারিষ্টার হয়ে দেশে ফিরে আসতে আসতেই প্রায় তিনি ব্যারিষ্টারীতে প্রতিপত্তি লাভ করেন। আমি যখন বিদেশে কর্ম্মস্থলে তখন তিনি এখানে থেকে আমাদের বিষয় কর্ম্ম সংক্রান্ত সকল বিষয়ে পরামর্শদাতা ও সর্ব্বতোভাবে হিতচিন্তক ছিলেন। আমাদের পরিবারের সবাইকে আপনার মত করেই দেখতেন। তাঁর ভালবাসার চিহ্নসকল আমার জীবনময় ছড়ানো রয়েছে আর তাঁর কাছ থেকে সময়ে অসময়ে যে সকল উপকার পেয়েছি তার জন্য আমি তাঁর নিকটে চিরঋণী। আমার জীবনের উপর দিয়ে কতশত ঘটনা গিয়েছে, অবস্থার কত পরিবর্ত্তন হয়েছে, কত লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় বন্ধুতা হয়েছে যাঁদের নাম স্মৃতি মাত্রই রয়ে গিয়েছে কিন্তু এই যে বন্ধুতার কথা বলছি এ এখনো পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

আমি যাঁর কথাগুলি এই লিখছি আমার সেই প্রিয়সুহৃৎ এ সময়ে রোগশয্যায় শয়ান। ৫, ৬ বৎসর ধরে তিনি উৎকট পীড়ার কষ্ট পাচ্ছেন কিন্তু পীড়ার যন্ত্রণায় তাঁর স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি কখনো ম্লান হতে দেখিনি। কোন দিন একটু ভাল কোন দিন মন্দ, এই উত্থানপতনের মধ্যে তিনি ধীরভাবে দিনযাপন করছেন। এই দুঃখ কষ্টে তাঁর ধৈর্য্য অসীম, তাঁর বীর্য্য ও সাহসের হ্রাস নাই। তাঁর কি রোগ, চিকিৎসায় কি কি প্রয়োজন, তিনি এ সকলি তন্ন তন্ন করে জেনেছেন আর ডাক্তারেরা ঔষধ পথ্য যা কিছু ব্যবস্থা করেন, যাতে তার তিলমাত্র ব্যতিক্রম না হয় তিনি নিজেই তার তত্ত্বাবধান করেন। বলতে গেলে তিনি আপনিই আপনার চিকিৎসক, আপনিই আপনার ধাত্রী। আমার এক-জন ইংলণ্ডপ্রবাসী বন্ধু এদেশে এসে তাঁর এই অবস্থা দেখে

শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিত ১৮৭০

বলছিলেন, "তারক যেন যমের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন,"—সত্যই করছেন—যমের সঙ্গে যুদ্ধ করেই তিনি এতদিন পর্য্যন্ত জীবিত রয়েছেন।

ডাক্তার Lukis বলতেন 'পালিত কেবল তাঁর Will-powerএর জোরে বেঁচে আছেন —আমাদের ডাক্তারি শাস্ত্রের সবই যেন উল্‌টে দিয়েছেন।"

মৃত্যু আসুক তাতে তাঁর কোন ভয় নাই, কেবল ভয় এই যে, যে মহৎকার্য্য সমাধা করতে তিনি উৎসুক পাছে মৃত্যুতে সে কাজের কোন ব্যাঘাত হয়। তিনি তাঁর স্বোপার্জ্জিত প্রভূত ঐশ্বর্য্য দেশের কল্যাণব্রতে উৎসর্গ করেছেন, তা কারো অবিদিত নাই। আমাদের দেশে যাতে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রচার হয়, বিজ্ঞান-বলে যাতে কৃষিশিল্পের উন্নতি এবং ঐ সঙ্গে দেশীয় লোকের অর্থোপার্জ্জনের সহস্র দ্বার উন্মুক্ত হয়, এই তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা। তিনি প্রথমে তাঁর ধনবল একত্র ক'রে জাতীয় শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সহায়তা করেন, পরে যখন সেই বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা তাঁর মনঃপূত হল না, তার স্থায়িত্বের প্রতি সন্দিহান হলেন তখন সেখানকার দান উঠিয়ে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান কলেজ সংস্থাপন উদ্দেশে নূতন দান ব্যবস্থা করলেন—সামান্য দান নয় স্থাবর সম্পত্তি মিলে সাড়ে সাত লাখ টাকারও উপর। দান পত্রের ব্যবস্থা দু কথায় এই যে, প্রস্তাবিত বিজ্ঞানকলেজে—পদার্থ বিদ্যা ও রসায়ন বিদ্যা এই দুই বিদ্যায় দুইটি আসন প্রতিষ্ঠিত হবে—এই প্রথম। দ্বিতীয়, ইহাও বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য যে এই শিক্ষাকার্য্যে দেশীয় লোকেরাই অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হবেন। যদি তাঁদের যোগ্যতা অর্জ্জনের নিমিত্ত বিদেশে শিক্ষালাভ করা আবশ্যক হয় তা হলে এই ব্যবস্থাপত্রের কর্তৃপক্ষদের বিবেচনায় যাহা ধার্য্য হয় সেইরূপ শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হবে। কিছুদিন পূর্ব্বে এই নিয়মগুলি লিপিবদ্ধ ও দানপত্র গঠিত ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়ে সমর্পিত হয়েছিল। সম্প্রতি আবার প্রায় আরও ৮ লক্ষ টাকার বিষয় তিনি লেখাপড়া করে সেনেটের হাতে সমর্পণ করেছেন। এই শুভকার্য্য সুসম্পন্ন ক'রে এখন তিনি নিরুদ্বিগ্ন মনে তাঁর শেষ দিন প্রতীক্ষা করে রয়েছেন, ভৃত্য যেমন মাসের শেষে আপনার বেতন প্রতীক্ষা করে থাকে—"কালমেব প্রতীক্ষেত নির্দ্দেশং ভৃতকো যথা।"

এই বিরাট দান উপলক্ষে য়ুনিবারসিটির Vice-Chancellor মহোদয় বলেছেন :—

"প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, গুরুপ্রসন্ন ঘোষ, দ্বারবঙ্গাধিরাজ প্রভৃতি মহাত্মাগণ বিশ্ববিদ্যালয়ে লাখো লাখো টাকা দান করিয়া আমাদের গৌরবের পাত্র হইয়াছেন সত্য কিন্তু তারকনাথ পালিত মহাশয় তাঁর এই অসামান্য বদান্যতাগুণে আর সকলকে পরাস্ত করিয়া এই দাতৃমণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় হইয়া রহিলেন।"

ছেলেবেলা থেকেই তারকনাথ পালিত তেজস্বী, এইখানে তাঁর বাল্যকালের তেজস্বিতার একটি পরিচয় প্রদান করি। আমরা দুই বন্ধু প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে মেডিকেল কলেজে কেমেষ্ট্রীর লেকচার শুনতে যেতুম। একদিন প্রোফেসার আসার আগে আমরা দুজনে একটু চেঁচিয়ে কথা
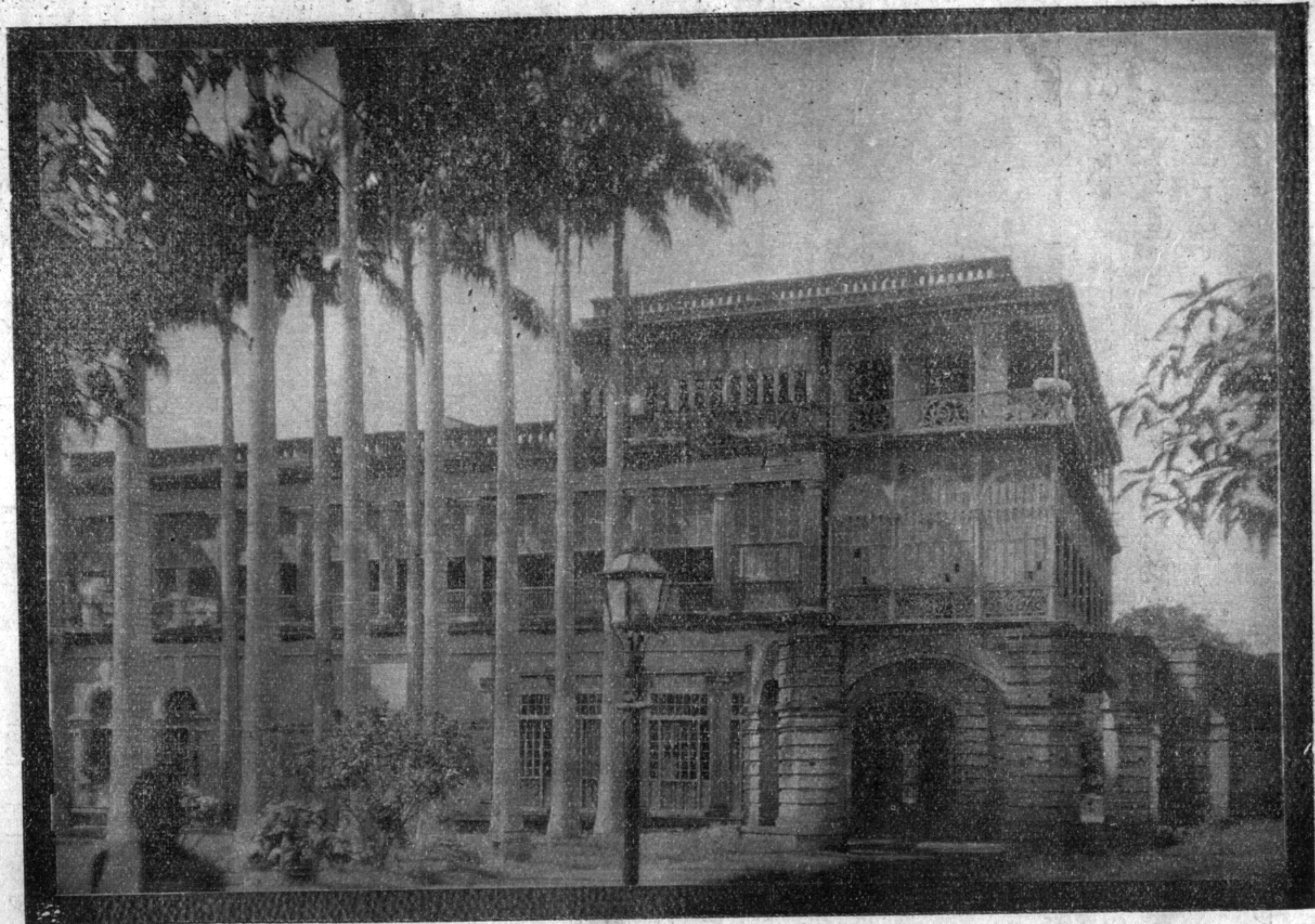
শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিতের বাসবাটী। এইরূপ প্রকাণ্ড দুইটি বাটী বৃহৎ কমপাউণ্ডসহ বিজ্ঞান-কলেজের জন্য তিনি দান করিয়াছেন।

কচ্ছিলুম। মেডিকেল কলেজের একজন ফিরিঙ্গীর বাচ্ছা তাইতে রূঢ়স্বরে বল্লে—"This is not a bazar. Don't make such a row"—তারক তাই শুনে ভারী রেগে উঠলেন আর বেশ দুকথা শুনিয়েও দিলেন। তখনই প্রোফেসার আসায় তখনকার মত বিবাদটা ঐখানেই থেমে গেল, কিন্তু লেকচার হয়ে যাবার পর ৫।৬ জন ফিরিঙ্গী-পুঙ্গব দল বেঁধে তাঁকে আক্রমণ করতে এল, তিনি তাতে ভয় না পেয়ে দেওয়ালের দিকে পিঠ করে সর্ব্বাগ্রে দলপতিকে এক ঘুসি বসিয়ে দিলেন। তখন চেলাগণ হাঁ হাঁ করে তাঁর উপর এসে পড়লো, ৪।৫ জনে মিলে তাঁকে কিল চড় বর্ষণ করতে লাগলো। কিন্তু আমার বন্ধুটি ত কিছুতে দমবার পাত্র নন, তাহলে তিনি আজ এই দেশপূজ্য তারকনাথ পালিত হতে পারতেন না। তিনি দুই হাতে শত হস্তের বল ধরে তাদের উপর ঘুষি চড় কিল বর্ষণ করতে ছাড়লেন না। খুব মার খেলেন সত্য—কিন্তু মারতেও কিছুমাত্র কসুর করেন নি। আসলে যে তাঁরই জয় লাভ হোল একথা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করতে হবে। কিন্তু তার পর দিন আমাদের প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রেরা এই খবরে ভারী রেগে গেল। রমানাথ নন্দী বলে একজন ছোকরা আমাদের দলের চাঁই হয়ে দাঁড়িয়ে Awake, arise or be for ever fallen—এই লাইনটা কাগজে লিখে সকলকে উত্তেজিত করতে লাগলো। পরদিন দল বেঁধে মারামারি করতে যাওয়া ঠিক হয়ে গেল। তারক প্রথমটা এতে অমত করলেন, বল্লেন, কার্য্যক্ষেত্রে তারাও মেরেছে আমিও মেরেছি শোধবোধ হয়ে গেছে—আবার এরকম সেজেগুজে মারামারি করতে যাওয়াটা ঠিক হবে না। কিন্তু সকলে যখন স্থির করলে যে—না—মারতেই হবে তখন তিনিও আগুয়ান হয়ে দাঁড়ালেন। তারপর যখন দেখা গেল ফিরিঙ্গি অনেক তখন সর্ব্বাগ্রে আমাদের উত্তেজক মহাশয় রণে ভঙ্গ দিলেন; অনেকেই তার অনুসরণ করলে,—আমরা যে দু তিন জন শেষ পর্য্যন্ত অটল ছিলুম তার মধ্যে ভৈরব বাঁড়ুয্যে একজন। তিনি আমাদের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। আসলে হার হোল আমাদের এই দ্বিতীয় দিনে, এদিনে তারক খুবই মার খেয়েছিলেন। তবুও ফিরিঙ্গিরা তাঁকে apology করাতে পারেনি। তাদের এ প্রস্তাবে তিনি বলেছিলেন, "আমি মরে যাব তবু apology করব না।"

প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্‌সিপ্যাল তখন ছিলেন সাটক্লিক সাহেব, তিনি আমাদের খুব ভাল বাসতেন। মেডিকেল কলেজের প্রিন্‌সিপাল ইটুয়েল তাঁকে লিখে পাঠালেন—যে আমরা দল বেঁধে মেডিকেল কলেজের ছোকরাদের মারতে গিয়েছিলুম। প্রিন্‌সিপালের কৈফিয়ৎ তলবে তারক তখন সমস্ত খুলে বল্লেন। সেই ফিরিঙ্গি কি রকম রূঢ় ব্যবহার করেছিল—যা থেকে এই মারামারির উৎপত্তি একলা তাঁকে তারা ৪।৫ জন মিলে কি রকম আক্রমণ করেছিল—সব শুনে সাটক্লিক সাহেব নেপথ্যে বল্লেন—served him right—; যাহোক প্রকাশ্যে দুজনেরই জরিমানা হয়ে মামলা মিটমাট হয়ে গেল।

আর কয়েক বৎসর পরে হিন্দুস্কুল থেকে

কিছুকালের জন্যে St Pauls' Schoolএ গিয়ে ভর্ত্তী হই। সেখানে ইংরাজ ফিরিঙ্গী আরমানী ছেলেরা আমার সহাধ্যায়ী ছিল; তাদের সঙ্গে যে, সকল সময়ে মিলে মিশে সদ্ভাবে থাকতুম তা বলতে পারি না, কখন কখন টকরাটকরি ঘুষোঘুসিও হত। এই রকম একটা দ্বন্দ্বযুদ্ধের কথা আমার মনে আছে। একটি ছেলের সঙ্গে আমার হাতাহাতি ব্যাপারের কথা আমাদের Rectorএর কাণে গিয়েছিল। কার দোষ সে বিষয় অনুসন্ধান না করেই বোধ করি আমাকেই প্রথমটা তিনি দোষী বলে সাব্যস্ত করে থাকবেন। কেননা আমাদের কিছু আগে একটা পরীক্ষা হয়ে গিয়েছিল তাতে আমার যে প্রাইজ পাবার কথা ছিল তা বন্ধ করবেন বলে শাসিয়ে ছিলেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমার সেরূপ কোন শাস্তি হয় নাই! আমি ইংরাজি সাহিত্যে বেশ ভালরকমই পরীক্ষা দিয়েছিলুম। Goldsmithএর একটা সেট বই তাতে প্রাইজ পাই। আমার ক্লাসের ছেলেদের সন্তুষ্ট করবার এক সহজ উপায় ছিল—তাদের মসলা বিতরণ করা। আমার পকেটে স্থপারি এলাচ লবঙ্গ প্রভৃতি মসলা থাকত, তাই খেতে তারা খুব ভালবাসত, কাজেই আমার সঙ্গে তাদের ভাব রাখতে হত। মাষ্টারেরাও আমাকে ভালবাসতেন—Pridham সাহেব আমাকে বড় অনুগ্রহ করতেন—তাঁর ঘরে নিয়ে গিয়ে আমাকে ছবি দেখাতেন আর তিনি নিজে যখন ছবি আঁকতেন আমি বসে বসে দেখতুম। অন্যান্য ছেলেদের মত মাষ্টারদের কাছ থেকে আমাকে বেত্রাঘাত সইতে হত না। এক একটা মাষ্টার ভয়ানক গোঁয়ার ছিল—ছেলেরা তার বেত্রাঘাতের ভয়ে সর্ব্বদাই সশঙ্কিত থাকত। আর দুই একটি ছেলের প্রতি তাঁর বিশেষ ক্রোধকটাক্ষ দেখতুম, তাদের প্রতি অকারণ অত্যাচার দেখে আমার ভারি কষ্ট হত। বেচারাদের পিঠের চামড়া বোধ করি কোনখানে অক্ষত ছিল না।

সেণ্টপল ছেড়ে পুনর্ব্বার হিন্দুস্কুল। সেখান থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ করি।

রামচন্দ্র মিত্র

কালেজে আমাদের যে সব শিক্ষক ছিলেন তাঁদের মধ্যে রামচন্দ্র মিত্র উল্লেখযোগ্য। তাঁর কাছে আমরা শ্যামাচরণ সরকারের বাঙ্গলা ব্যাকরণ ও অন্যান্য বাঙ্গলা বই পড়তুম। তাঁর সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রবাদ আছে; অনেকগুলি অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনাও আমাদের স্বচক্ষে দেখা;—তাঁর চেহারা ধরণ ধারণ সকলি কৌতুকাবহ। কোন বড় লোকের সঙ্গে আলাপ করতে হলে পায়ে পা ঠেকিয়ে 'I beg your pardon' ব'লে ক্ষমা প্রার্থনা করা হল; সেই আলাপের সূত্রপাত। ক্লাসের ছেলেরা দুষ্টুমি ক'রে অনেক সময় তাঁকে জ্বালাতন করত কিন্তু কোন্ ছেলের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করতে হবে—কোথায় নরম কোথায় বা গরম—তা তাঁর পাকা জানা ছিল। পাঁড়াগেঁয়ে ছেলেদের উপর তাঁর ভারি আক্রোশ, কেননা তিনি বেশ জানতেন তারা মুখের উপর কোন জবাব করতে সাহসী হবে না। অথচ অন্য অবাধ্য দুষ্টু ছেলে যাদের এক কথা বললে মুখের উপর দুকথা শুনিয়ে দেবে

তাদের প্রতি অতি নম্র ব্যবহার। 'শক্তের ভক্ত নরমের গরম' তাঁর সম্বন্ধে অবিকল খাটত।

একদিন আমাদের ক্লাশের একজন পাড়া-গেঁয়ে ছেলে পাঠ্য বই আনেনি এই নিয়ে তিনি তার প্রতি মহা খাপ্পা হয়ে কটুকাটব্য বর্ষণ করছেন দেখে তারক বল্লেন "ওকে ও রকম গালাগালি দিচ্ছেন কেন? ও কি করেছে? জানেন আমরা ফার্ষ্ট ইয়ার ক্লাশে পড়ি।"

তখনই তিনি নরম হয়ে অতি মৃদুস্বরে বল্লেন—"ও বই আনেনি তাই শাসন করলুম।" তারক উত্তর করলেন "আমিওত বই আনিনি আমাকেও কি ঐ রকম করে শাসন করবেন?" রামমিত্র বল্লেন (মৃদুমন্দ ভাবে) "ওঃ তুমি বই আননি—তা পাশের ছোকরার বই দেখে পড়।"

ছেলেরা যখন ভারি গোল করছে কিছুতেই বাগ মানে না তখন তিনি তাদের থামাবার একটি বিচিত্র উপায় অবলম্বন করতেন। নানা রকম মুখভঙ্গী করে কেদারা থেকে উঠে বোর্ডে খড়িতে বড় বড় অক্ষরে লিখতেন Silence! Silence! Silence! চুপ চুপ চুপ! তারপর চৌকিতে বসে বলতেন "এখন কে গোল করবে করুক দেখি!"

আমরা বিদ্যাশিক্ষার প্রণালী অনেক রকম শুনতে পাই, ওবিষয়ে নানামুনির নানা মত—কিন্তু রাম মিত্রের শিক্ষাপ্রণালী সম্পূর্ণ নূতন, আর কারো সঙ্গে তার তুলনা হয় না। দুএকটি নমুনা দিচ্ছি;—

পৃথিবী গোল কি করে মনে রাখতে হয়? রসগোল্লা খেতে খেতে তার গোলাকার ধ্যান করা।

ভূগোল শেখার সহজ উপায় কি? ষ্টুয়ার্টের জিওগ্রাফিখানি ২০ আনা মুখস্থ করা—লেখার সময় চার আনা ভুলে গেলেও—১৬ আনা মনে থাকবে।

Composition ভাল লিখতে হয় কি করে? ভাল ভাবায় প্রকৃতি বর্ণনা করতে গেলে সুশীতল সমীরণ এই দুটি কথা লিখতে হবে। তবে যেখানে সাধুভাষা মনে না আসে সেখানে 'ঠাণ্ডা বাতাস' বসিয়ে দেবে। কলসের সটা কোন্ স যদি মনে না থাকে তাহলে সেখানে 'ঘট' শব্দটা ব্যবহার করলেই ল্যাটা চুকে যাবে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

একবার পরীক্ষা দেবার সময় কোন ছাত্র তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল—মশায় এই বইটার কোন্ কোন্ অংশ ভাল করে দেখে রাখা চাই—আমাকে বলে দিন।

উত্তর—(খানিকক্ষণ চিন্তা করিয়া)

Mark the first Page!

Mark the second Page!!

বলতে বলতে বইটার কোন ভাগই বাদ গেল না, সে বেচারা 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' বলে প্রস্থান করলে।

রামমিত্রের নামে অনেক গল্প আছে, আর কত বলব। কেশবচন্দ্র তাঁর নকল করতে বিলক্ষণ পটু ছিলেন। কেশববাবু রামমিত্রের সম্বন্ধে একটি গল্প বলতেন সেটি হচ্ছে এই—

একদিন রামমিত্র ছেলেদের বটানিকাল গার্ডেনে বেড়াতে নিয়ে গেছেন। বাগানের মধ্যে যে একটা গাছের ঘর আছে সেইখানে তাঁর দলবল নিয়ে তিনি যেমন প্রবেশ করেছেন—অমনি সেখানে উপস্থিত একটা রুক্ষ মেজাজের ইংরাজ রেগে তাঁকে সম্ভাষণ করলে

—"Who the devil are you ?" তিনি ভীত হয়ে বল্লেন—"Professor Ram Chandra Mittra Professor Presidency College—"

উত্তর হোল—'D—your Professor' তখন তিনি ছেলেদের নিয়ে বাইরে এসে হাঁপ ছেড়ে বল্লেন—Let us forget and forgive, let us exercise the Christian virtue of forgiveness."

আমরা সকলে একবার সিংহলে বেড়াতে গিয়েছিলেম। ষ্টীমারে আমাদের সঙ্গে ছিলেন কেশববাবু আর কালিকমল গাঙ্গুলী ব'লে একটি আমুদে মজলিসী লোক,—'কোলাই কোমল গাঙ্গুলাই' বলে আপনার পরিচয় দিতেন। সমুদ্রের উপরে রামমিত্রের গল্প আমাদের এক প্রধান খোরাক ছিল। সে সব কথা শুনে হাসতে হাসতে আমাদের নাড়ী ছিঁড়ে যেত।

'কোলাই কোমল' শেষে আমাদের ভারি মুস্কিলে ফেলেছিলেন। দেশে ফেরবার সময় তিনি কি একটা কাজের ছুতো করে বোটে উঠে ডাঙ্গায় নেমে গেলেন। এই আসছি বলে কোথায় যে অন্তর্ধ্যান হলেন তার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। তাঁকে ছেড়ে ষ্টীমার চলে গেল। তার দুএক সপ্তাহ পরে তবে কলকাতায় আবার তাঁর দেখা পাই!

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সায়াহ্নে

আসিছে সন্ধ্যা আঁধার জড়ায়ে ধীরে ধীরে,
ফেলি ছায়া তার আমার প্রাণের তীরে তীরে!
আঁধারে অজানা লক্ষ্যে
কোথা কম্পিত বক্ষে
ছুটে যাই ?

কুসুম পড়িছে খসিয়া তাহার দলে দলে;
শীর্ণ জীবন হতেছে খিন্ন পলে পলে।
ফুরায় আমার দিন্ত!
তবুত আশার বৃন্ত
টুটে নাই!

পাগল করি সে ডাকেরে আকাশ-পুর হতে!
আহ্বানে তার চলিব কোথায় দূর পথে ?
মানস করিয়া ভ্রান্ত,—
পরাণ করিয়া শ্রান্ত
বিজনে,—

দিতেছে নিবায়ে আলোকের বীথি চারি ভিতে।
তবুও মোহিত হতেছে চিত্ত তারি গীতে।
মরণে এমন মাধুরী
কে ঢালে ? কাহার চাতুরী
জীবনে ?

শ্রীঅনঙ্গমোহিনী দেবী।

পোষ্যপুত্র *

'পোষ্যপুত্র' উপন্যাসখানি আলোচনা করিবার পূর্ব্বে ইহার লেখিকার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান বোধ হয় নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। লেখিকা শ্রীমতী অনুরূপা দেবী, মহাত্মা ৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌত্রী, রায় শ্রীযুক্ত মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় বাহাদুরের দ্বিতীয়া কন্যা। অনুরূপার স্বামী শ্রীযুক্ত শিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ, বি, এল মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন তীক্ষ্ণ মেধাবী ছাত্র ছিলেন, এক্ষণে মজঃফরপুরে ওকালতি করেন।

শৈশবে অনুরূপা ভূদেব বাবুর নিকটই শিক্ষালাভ করেন। এই সময় হইতেই বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি তাঁহার অনুরাগ সঞ্চারিত হয়। অবসর পাইলেই চলিত রূপকথা লইরা আপনার ভাষায়, বহুল পরিবর্দ্ধিত আকারে, অনুরূপা গল্প লিখিতেন। প্রসিদ্ধ গল্প-লেখক শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় অনুরূপার কনিষ্ঠ ভ্রাতা (মাতৃস্বসৃপুত্র)। অনুরূপাই তাঁহাকে প্রথম গল্পরচনায় উদ্যোগী করিয়া তুলেন। তাঁহারই উৎসাহে ও অনুরোধে কুন্তলীনের গল্প-প্রতিযোগিতায় সৌরীন্দ্রমোহন প্রথম গল্প-সাহিত্যে লেখনী পরিচালিত করেন; এবং তাঁহারই ফলে উৎকৃষ্ট গল্পলেখকগণের মধ্যে আজ সৌরীন্দ্রমোহন আপনার উচ্চাসনখানি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বাঙ্গালা ছোট গল্পের পাঠকপাঠিকা আজ সৌরীন্দ্রমোহনের সুমধুর ছোট গল্প পাঠে যে মুগ্ধ হইতেছেন, তজ্জন্য ধন্যবাদের পাত্র যদি কেহ থাকেন ত তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী, শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

বিবাহের পর অনুরূপা ক্রমে আপন চেষ্টায় ও স্বামীর যত্নে ইংরাজী ভাষায় বেশ শিক্ষা লাভ করেন। সংসারে গৃহ-কর্ম্মের অন্তরালে অনুরূপার সমস্ত অবসরটুকু সাহিত্য-সেবায় অতিবাহিত হয়। গুরুজন ও স্বধর্ম্মে সুগভীর শ্রদ্ধা, স্বজাতি ও স্বদেশীয় শিল্পাদির প্রতি অখণ্ড অনুরাগ, দরিদ্রের প্রতি প্রচুর করুণা—এমনই বিবিধ সদ্গুণে তাঁহার চিত্তটি ভূদেব বাবুর আদর্শ শিক্ষায় অপূর্ব্ব মাধুর্য্যে বিকশিত হইয়াছে। অনুরূপার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর নামও মাসিক সাহিত্যের পাঠক-পাঠিকার অপরিচিত নহে। ছোট গল্প ও কবিতা-রচনায় ইন্দিরা দেবীর খ্যাতিও আজ বঙ্গবিস্তৃত হইয়াছে। তাঁহার ছোট গল্পের বহি "নির্ম্মাল্য" সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে এবং ছোট গল্পের পাঠক-পাঠিকা তাহার বিচিত্র শোভার পরিচয় যে ইতিমধ্যেই লাভ করিয়াছেন, সে বিষয়ে আমাদিগের তিলমাত্র সন্দেহ নাই! সাহিত্যের সহিত ইঁহাদিগের সংস্রবের কাহিনী-টুকু সত্যই উপভোগ্য।

স্ত্রীশিক্ষা যে আমাদের দেশে অপরিহার্য্যবিধির মত প্রচলিত হওয়া উচিত, এবং এই শিক্ষার প্রভাবেই যে শুধু সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া বাঙ্গালীর সমাজ, হিন্দুর সমাজ আবার পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করিবে, সর্ব্বাঙ্গীণ সুখস্বাচ্ছন্দ্যের আলয়-স্বরূপ হইয়া উঠিবে, তদভাবে সমাজের উন্নতি অসম্ভব, আদর্শ হিন্দু পরিবারে লালিত অনুরূপারও ইহাই মত। এবং এই মত কার্য্যে পরিণত করিতে তাঁহার উদ্যোগ অধ্যবসায়ও অপরিসীম। তাঁহারই উদ্যোগে মজঃফরপুরে মহিলা শিল্পাশ্রম ও ভারত স্ত্রীমহামণ্ডলের আদর্শে বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হইতেছে, ইহা সবিশেষ আনন্দ ও গৌরবের কথা!

'পোষ্যপুত্র' অনুরূপার প্রথম উপন্যাস—সামাজিক উপন্যাস। ভারতীতে দুই বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া ধারাবাহিক রূপ প্রকাশিত হইয়াছিল—এক্ষণে স্বতন্ত্র গ্রন্থকারে মুদ্রিত হইয়াছে।

প্রায় পাঁচ শত পৃষ্ঠ ব্যাপী পুস্তকখানি একজন অন্তঃপুরচারিণী বাঙালী রমণীর রচিত, এ কথা ভাবিতে মনে সত্যই একটা বিমল আনন্দ, গৌরব ও গর্ব্ব অনুভব করি। লেখিকা স্কুলকলেজে শিক্ষিতা নন—অথচ তাঁহার রচনায় শিক্ষালব্ধ পাণ্ডিত্য, সুরুচি ও চিন্তাশীলতার অভাব নাই। এরূপ মার্জ্জিত রচনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শিক্ষিত যুবকের পক্ষেও গৌরবকর।

গ্রন্থের আখ্যান-ভাগের মনোরম অভিনবত্বই ইহার

* পোষ্যপুত্র। (উপন্যাস) শ্রীমতী অনুরূপা দেবী প্রণীত। মূল্য পাঁচ সিকা মাত্র।

উজ্জ্বল বৈচিত্র্য। পোষ্যপুত্র সামাজিক উপন্যাস। কিন্তু ইহাতে নাই—বিধবা-বিবাহ; উদ্দাম, নীতি-বর্জ্জিত ও চরিত্রহীন যুবার দীর্ঘ আস্ফালন; আত্মহত্যা বা বিষপান; —অবৈধ প্রণয়ও প্রশ্রয় পায় নাই। নিতান্ত স্বাভাবিক, পুরাতন পরিচিত ঘরের কথায়, আটপৌরে সাড়ী-পরিহিতা তরুণী গৃহলক্ষ্মীর মত, রচনাটী অপূর্ব্ব শ্রীতে মণ্ডিতা হইয়া উঠিয়াছে।

বড় সহজেই যাহাদের সহিত পাঠকের পরিচয় হইতে পারে—এমন দুইটী কল্যাণী নারী-চরিত্রের ছবি গ্রন্থখানিকে প্রকৃতই সমাদরের যোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। চিত্র-দুইটী দেবী প্রতিমার ভাস্বরতা ও মহিমায় স্বর্গের আভায় নিতান্তই হৃদয়ের কাছাকাছি আনিয়া দেয়। তাহা প্রেমে স্নিগ্ধ; ত্যাগে পবিত্র; সেবায় দিব্য, প্রীতি সৌজন্যে মনোরম ও আত্ম-পরিপূর্ণতায় সুমধুর। বসন্তের আনন্দ হিল্লোল, শরতের স্নিগ্ধ কমনীয়তা, বর্ষার প্রাণস্পর্শী নিবিড়তা একাধারে ভরিয়া উঠিয়াছে। এমন যে, পাঠকের চিত্তে বিভ্রম জন্মাইয়া দেয়—কোন্‌টী প্রিয়তর, কোন্‌টী মধুরতর। শিবানী, যৌবনের প্রথম উন্মেষ-মাধুরীতে বিকশিত হইতে না হইতে সুকঠিন তপস্যায়, আপনাকে বাহিরের বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অন্তরের মধ্যে দেবতার প্রতিষ্ঠা করিয়া লইতেছে। শান্তি, শৈশবের তরল আনন্দে, ফুলবনে ছোট পাখীটার মত, গাহিয়া, উড়িয়া সকলকে মুগ্ধ করিতেছে। কিশোরীর প্রেমোচ্ছ্বাসে সহসা বাধা পাইয়া পরম মৌনতায় হৃদয়ের নিভৃত প্রাঙ্গণে প্রাণপণ যুদ্ধ করিতেছে। দুইখানি হৃদয়ের ছবি কি অব্যক্ত-সুন্দর!

শান্তির চরিত্রাঙ্কনে লেখিকার কৃতিত্ব থাকিলেও, তাহার কল্পনায় (Conception) বিশেষত্ব নাই। কারণ, আকরে পদ্মরাগাণাম্ জন্মকাচমণেঃ কুতঃ? শান্তি আজন্ম আদর্শ পরিবারে লালিত; তাহার পিতার মহত্ত্ব, মাতার পুণ্য তাহাকে যে দেবীত্বের সীমায় আনিয়া দিবে, তাহা আর বিচিত্র কি? কিন্তু শিবানী চরিত্র লেখিকার লেখনীকে ধন্য করিয়াছে। দৈন্যে বা অতুল ঐশ্বর্য্যে, চঞ্চলতা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। অটল ধৈর্য্যে নির্ব্বাক তপস্যায় সে লোকচক্ষুর অন্তরালে আপনাকে মর্ত্ত্যের ধূলা হইতে স্বর্গের পুণ্যপথে উত্তীর্ণ করিয়া লইয়াছে। গভীর পঙ্ক হইতে উত্থিত হইয়া সে আত্মনিবেদনে দেবতার নির্ম্মাল্যে, বিকশিত শতদলে পরিণত হইয়াছে। বিসর্জ্জনের মধ্য দিয়া সে প্রতিষ্ঠার আবাহন করিয়া গীতোক্ত

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥

এই মহাবাক্যের মর্ম্ম দিব্য প্রকাশ করিয়াছে। অথচ তাহার চরিত্রের পারিপাট্য-সাধন-কল্পে বাহিরের শক্তি অতি অল্পই নিয়োজিত হইয়াছিল। এরূপ চরিত্র আমাদের সংসারে দুর্লভ নয়—কিন্তু তাহার আহরণে লেখিকার প্রতিষ্ঠার পরিচয় সুস্পষ্ট হইয়াছে।

শান্তির পিতা, রজনীনাথ। লেখিকা এই চরিত্রে "স্নেহে, শাসনে অটল, আদর্শ পিতৃ-চরিত্র অঙ্কনে প্রয়াস" পাইয়াছেন। রজনীনাথ স্নেহে ও শাসনে সত্যই আপনার কঠোর কর্ত্তব্য হইতে বিচলিত হন নাই! তাঁহার জীবন-আদর্শ যে অতি উদার, অতি পুণ্যময় ও মহৎ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শ্রদ্ধায় ও সম্ভ্রমে তাঁহার পানে আমাদের মস্তক স্বতই নত হইয়া আসে। উপকারকের প্রতি এরূপ আজন্ম কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের দৃষ্টান্ত সংসারে বিরল।—কিন্তু লেখিকা তাঁহাকে কিশোরী কন্যা ও শিশুর পুত্রের পিতারূপে আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন, এ জন্য তাঁহার পিতৃত্ব সম্পূর্ণরূপে প্রস্ফুট হইতে অবকাশ পায় নাই। জামাতার সহিত ব্যবহারে তিনি যথেষ্ট মনুষ্যত্ব দেখাইয়াছেন। কিন্তু শেষে এক ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়া জল প্রবেশ করায় তাঁহার মনুষ্যত্বের বিশাল তরণী নিমজ্জিতপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল। যেখানে আত্মবিস্মৃত হওয়া কর্ত্তব্য, সেইখানে তাঁহার আহত অভিমান মাথা তুলিয়া তাঁহার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটাইয়াছে। যেখানে ক্ষমা ত্বরিত হওয়া প্রয়োজন, সেইখানে তাহা অতিবিলম্বিত হইয়া পড়িয়াছে। ত্রুটি সামান্য;—কিন্তু পরিণাম ভীষণ। তথাপি, ধূলা মাটির সংসারে এই চরিত্র অনন্যসাধারণ এবং লোকশিক্ষার স্থল।

বিনোদচন্দ্রের চরিত্র সৃষ্টিতে লেখিকার কল্পনার বিকাশ দেখিতে পাই। শান্তি-শিবানী চরিত্রে যেমন

একটা পদ্ধতি ও শৃঙ্খলা আছে—বিনোদের চরিত্রে তেমনই আমূল বিশৃঙ্খলা। পাশাপাশি চিত্রখানি অতি মনোজ্ঞ হইয়াছে। জগতের একটি চিরন্তন সত্যের জীবন্ত ব্যাখ্যার মত বিনোদের চরিত্র আপনার বিশেষত্বে বিশিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। পরম কল্যাণময়ী জননীর স্নেহ-শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইলে, সুশিক্ষিত পুত্রের হৃদয়-গঠনে কি যে মারাত্মক অসম্পূর্ণতা থাকিয়া যায়, বিনোদের চরিত্র তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত! বিনোদচন্দ্র কখনই বিনোদচন্দ্রের ভূমিকা অভিনয় করিবার অবসর পাইত না, যদি তাহার মাতা ভুবনমোহিনী জীবিতা থাকিতেন।

পুণ্যশ্লোক রজনীনাথের শিক্ষা. দীক্ষা বিনোদের চরিত্রের কোন্ রন্ধ্রপথ দিয়া অন্তর্হিত হইল, এবং পশ্চাতে একখানি নাটকের আয়োজন সেই সঙ্কীর্ণ ছিদ্রপথের মধ্য দিয়াই আসন্ন হইয়া উঠিল, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। কাব্য হিসাবে বিনোদের চিত্রাঙ্কণ অপূর্ব্ব হইয়াছে।

বোধ হয় এখন আর বলিতে হইবে না যে, উপন্যাস খানি আধুনিক রচনা-পদ্ধতির অনুযায়ী; অর্থাৎ বিশ্লেষণাত্মক। প্রতি ক্ষুদ্র কার্য্য-কারণের কড়া-ক্রান্তি হিসাবের সুদীর্ঘ তালিকা। এরূপ রচনা-প্রণালীর মুখ্য উদ্দেশ্য, সমগ্র চিত্রখানি পাঠকের চিত্তে নখদর্পণের মত প্রাঞ্জল করিয়া দেওয়া। লেখিকা এ বিষয়ে যথেষ্ট সফলতা লাভ করিয়াছেন। প্রত্যেক চরিত্র স্ব-স্ব বিশেষত্বে ফুটিয়া উঠিয়াছে ফলে সমগ্র চিত্রখানি অতি উজ্জ্বল হইয়া পড়িয়াছে। শিল্পকলা হিসাবে, এইখানে অল্প একটু ত্রুটি ঘটিয়াছে, মনে হয়। দুই-একটি চরিত্র নেপথ্যের অস্পষ্টতায় থাকিলে অপরগুলিকে মনোজ্ঞ হইবার অবকাশ দিতে পারিত। কিন্তু প্রত্যেক চরিত্রাঙ্কনে লেখিকার তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণ, মানব-হৃদয়ের রহস্যসম্বন্ধে গভীর অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি হৃদয় দিয়া দেখিয়াছেন, হৃদয় দিয়া ভাবিয়াছেন এবং হৃদয় দিয়াই লিখিয়াছেন।

আর একটি ত্রুটি, যাহা সহজেই পাঠকের রস উপভোগের ব্যাঘাত জন্মাইয়া দেয়, তাহা স্থানে-অস্থানে বর্ণনা বাহুল্য। বিশ্লেষণাত্মক উপন্যাসেও বর্ণনার আতিশয্য পরিহার্য্য। কারণ, তাহাতে নাটকীয় গতি বাধা পাইয়া শিল্পের সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যটুকুকে ম্লান করিয়া দেয়। একটি উদাহরণের উল্লেখ করিতেছি। শিবানী যখন গভীর রাত্রে বিরাট অন্ধকারের সম্মুখে আপনার অসীম অন্ধকারময় হৃদয় মুক্ত করিয়া জীবনের জটিল সমস্যার কথা ভাবিতেছিল, লেখিকা যদি সেইটুকু ইঙ্গিতেই সারিয়া দিতেন, তাহা হ লে যথেষ্ট আর্টের পরিচয় দিতেন। পাঠক শিবানীর দুঃখের সহিত পরিচিত, সুতরাং সেই বিরাট অন্ধকারের ছায়ায় তাহার হৃদয়ে যে কি বিপুল, কি বিচিত্র বেদনার তরঙ্গ উঠিতেছিল নাটক তাহা স্ফুটতর করিয়া দিত। লেখিকার বর্ণনপ্রয়াস এস্থানে নিতান্তই ব্যর্থ হইয়াছে। আর একটি বর্জ্জনীয় বাহুল্য, নীরদের গুরুর অবতারণা। বোধ হয়, লেখিকার উদ্দেশ্য ছিল যে নীরদ যখন আসন্ন কর্ম্মের ঊর্ণাজালে আপনার বন্ধন জটিল করিয়া তুলিয়াছে, তখন কি কৌশলে তাহার মুক্তি সহজ করিয়া, দীর্ঘ বিদ্রোহী চিত্তকে গৃহের পানে ফিরাইয়া আনা যায়! এইজন্যই গুরুরূপী বৃহত্তর শক্তির সংঘর্ষের প্রয়োজন। মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া দেখিলে, হয়ত, এই সিদ্ধান্তে কোন খুঁত পাওয়া যায় না। কিন্তু আর্টের দিক দিয়া দেখিলে লেখিকা-অবলম্বিত কৌশলের উচ্চ প্রশংসা করা যায় না। খুব সহজেই লেখিকার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত, যদি তিনি বিনোদকে কোন ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করাইয়া তাহার সুপ্ত চৈতন্যকে (consciousness) জাগাইয়া তুলিতেন। কারণ মুক্তি ভিতর হইতেই সহসা প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

গ্রন্থখানি ভাব ও ভাষায় এমন চিত্তাকর্ষক হইয়াছে যে, ক্ষুদ্র ত্রুটিগুলি সহজেই উপেক্ষা করিতে পারি। লেখিকার এই প্রথম উদ্যম, যখন আমাদের এত আনন্দের আয়োজন করিয়াছে, তখন তাঁহার পরিণত কল্পনা ও চিন্তাশীলতা বঙ্গসাহিত্যের মন্দিরে যে ষোড়শোপচারে নৈবেদ্য প্রেরণ করিবে, সে বিষয়ে এতটুকু সন্দেহ নাই।

শ্রীগোলোকবিহারী মুখোপাধ্যায়।

সচিত্র হিন্দুপেট্রিয়ট

সম্ভবতঃ সকলেই জানেন, হিন্দুপেট্রিয়ট ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রথম স্বদেশী ইংরাজি সংবাদপত্র। ইহার আদি সম্পাদক ছিলেন স্বদেশগৌরব ৺ হরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তাঁহার মৃত্যুর পরে ৺কৃষ্ণদাস পাল ইঁহার সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন। ইঁহাদের সময় হিন্দুপেট্রিয়টের খ্যাতি প্রতিপত্তি গৌরবের সীমা ছিলনা, তখন ইহা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র ছিল।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ৺ শ্রীশচন্দ্র সর্ব্বাধিকারীর সম্পাদন কালে ইহা দৈনিক পত্ররূপে প্রকাশিত হইত। কিন্তু আমাদের অধিকাংশ কার্য্যেই যেরূপ হইয়া থাকে, ইঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুপেট্রিয়টেরও অন্তিম দশা ঘনাইয়া আসিল। যদি স্বদেশহিতৈষী বিজয়সিংহ মহোদয় অগ্রসর হইয়া ইহাকে উদ্ধার না করিতেন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ হিন্দুপেট্রিয়টের নামটি পর্য্যন্ত আজ লোপ পাইত।

৺কালিপ্রসন্ন সিংহ কলিকাতার একজন খ্যাতনামা পুরুষ। প্রধানতঃ তাঁহারি যত্নে উদ্যোগে ও সহায়তায় এক সময়ে হিন্দুপেট্রিয়ট সংস্থাপিত হইয়াছিল, আজ তাঁহারই সুযোগ্য পুত্র বিজয়চন্দ্র সিংহ মুমূর্ষু হিন্দুপেট্রিয়টকে নবজীবন দান করিয়া নববেশে নূতন আকারে জনসমাজে প্রকাশিত করিলেন। এখন হিন্দুপেট্রিয়ট দৈনিক সংবাদ পত্র নহে, সচিত্র সাপ্তাহিক পত্র। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার কল্যাণ কামনা করি।

হিন্দুপেট্রিয়ট কিরূপ শ্রীসম্পন্ন হইয়া প্রকাশিত হইতেছে তাহার নিদর্শন স্বরূপ নিম্নে তাহা হইতে কয়েকটি সচিত্র প্রবন্ধ অনুবাদ করিয়া উদ্ধৃত করিলাম। চিত্র কয়েক খানির জন্য আমরা সিংহমহাশয়ের নিকট ঋণী।

ভাঃ সম্পাদিকা।

পশুশিক্ষা

বনমানুষ

অধ্যাপক গার্ণার, বনমানুষ এবং তৎসম্পর্কীয় জাতির ভাষায় বুৎপত্তি এবং গবেষণা সম্বন্ধে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। নিম্নের চিত্রে প্রদর্শিত সুজি নামক বনমানুষীকে তিনি আপনার প্রথায় শিক্ষিত করিয়া তুলিয়াছেন। পেনসিলভিনিয়া শিক্ষামন্দিরে তাহার শিক্ষা সৌকর্য্যার্থে একটি স্বতন্ত্র গৃহনির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সাতিশয় যত্নের সহিত তাহাকে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। এখন সে বস্ত্র পরিধান করিতে শিখিয়াছে—পাঠাভ্যাসের অবসর কালে পরিচ্ছন্ন সুন্দর পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া মনের আনন্দে এঘরে ওঘরে নাচিয়া বেড়ায়। বহুল ধৈর্য্য এবং একান্ত অধ্যবসায়ের গুণে তাহার শিক্ষা এতদূর অগ্রসর হইয়াছে। প্রথমে পরিচ্ছদ পরিধান করিতে অত্যন্ত দৃঢ় ভাবে সে আপত্তি প্রকাশ করিত কিন্তু এখন শুইবার সময় ভিন্ন অন্য সকল সময়েই বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকে। তাহার ধরণ ধারণ অনেকটা গম্ভীর প্রৌঢ়বয়স্কা ভদ্র রমণীর মত এবং তেমনি সাবধানতার সহিত সাজসজ্জা করিয়া থাকে। যখন সে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে তখন তাহার স্বভাবে বন্যভাব বিশেষরূপে পরিলক্ষিত

হইত কিন্তু এখন, কেদারায় দিব্য বসিয়া কাঁটা চামচের সাহায্যে রাত্রিকালের আহার্য্য অতি সহজে সে ভোজন করে—এবং হস্ত ধারণ করিয়া বিদায় অভিবাদন জানাইতে
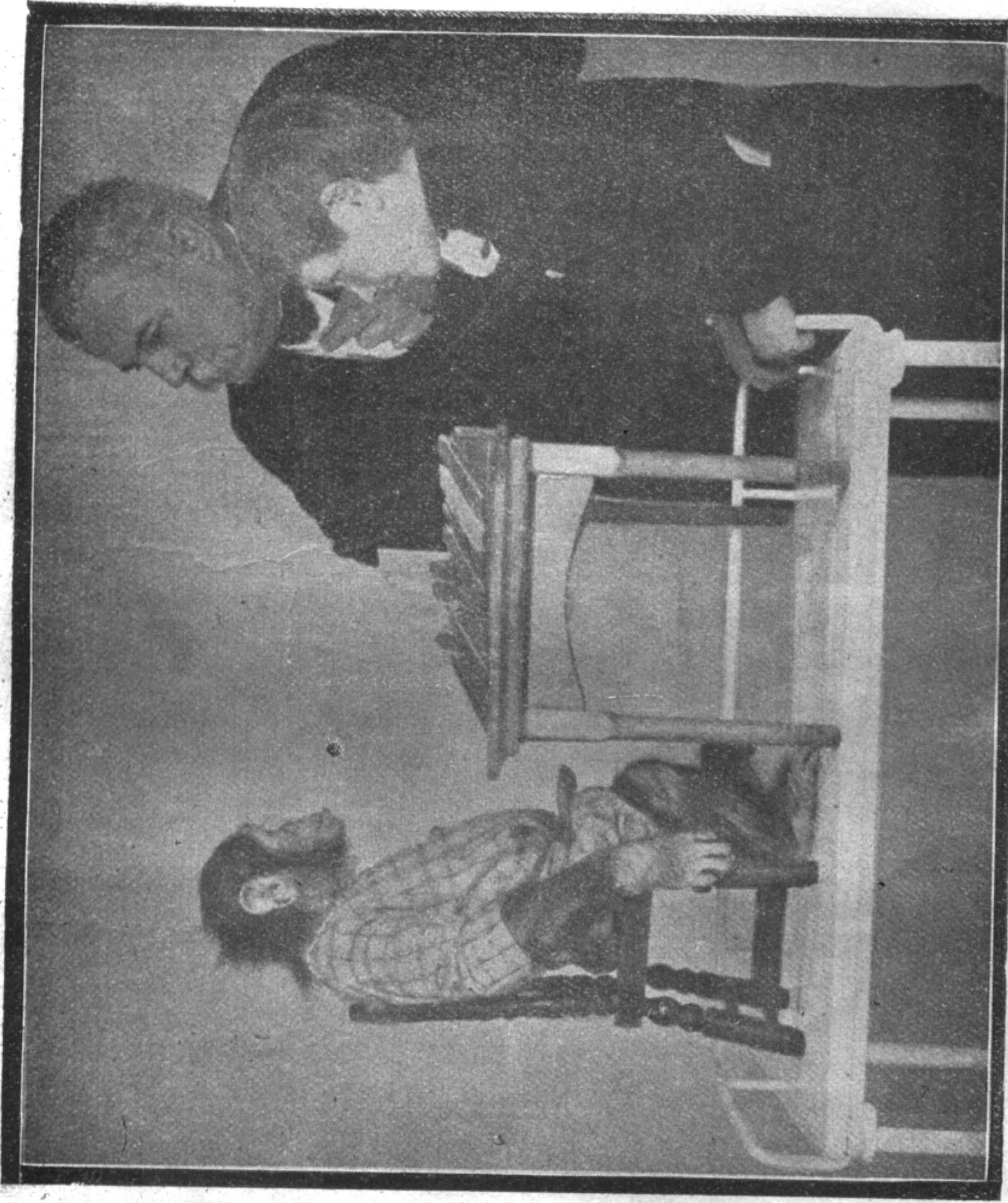
বনমানুষের কার্য্যকলাপ

পারে। বর্ণ সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান অতি অল্প দিনের মধ্যেই বিশেষ পরিপক্কতা লাভ করিয়াছে। রঙ্গের বাক্স হইতে দুইশত বিভিন্ন প্রকারের রক্ত সে চিনিয়া বাহির করিতে

পারে। প্রতিবেশী ছেলেমেয়েদের সহিত তাহাকে খেলা করিতে দেওয়া হয়। তাহাদের দেখা দেখি সে ঠিকমত নিয়মরক্ষা করিয়া লুকাচুরি খেলিতে শিখিয়াছে। চোরকে ধরিতে ও ধরা দিতে বেশ ভাল পারে। ছেলেরা কেন যে তার মত সহজে গাছে চড়িতে পারেনা ইহাই

বনমানুষের কার্য্যকলাপ

তার বিষম সমস্যা। মাঝে মাঝে এক একজনকে টানিয়া লইয়া গিয়া গাছে চড়াইবার চেষ্টা করে কিন্তু মনুষ্যসন্তানকে এবিষয়ে অপটু ও হীন দেখিয়া আবার ছাড়িয়া দেয়।

বিড়াল

বাঘ ভাল্লুকের মতো হিংস্র জন্তুকে বশ করাও সহজ, কিন্তু বিড়ালকে কিছুতেই সহজে বশে আনা যায় না। তাহাদের এমন গোঁ যে মানুষ অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধ কার্য্য তাহাদের দ্বারা করাইতে পারে না। কিন্তু মানুষের অসাধ্য কাজ নাই বলিলেও চলে। সম্প্রতি কালিফোর্নিয়ায় এক ভদ্রলোক বিড়ালদের শিক্ষা দিয়া তাহাদের দ্বারা নানা রকম কাজ করাইয়া লইতেছেন—সার্কাসে বাঘ ভাল্লুক বাঁদর প্রভৃতি জন্তু যেমন ক্রীড়াকৌশল দেখায়, তিনিও বিড়াল লইয়া সেইরূপ দেখাইতেছেন। তাহার একখানি চিত্র এই সঙ্গে দেওয়া হইল
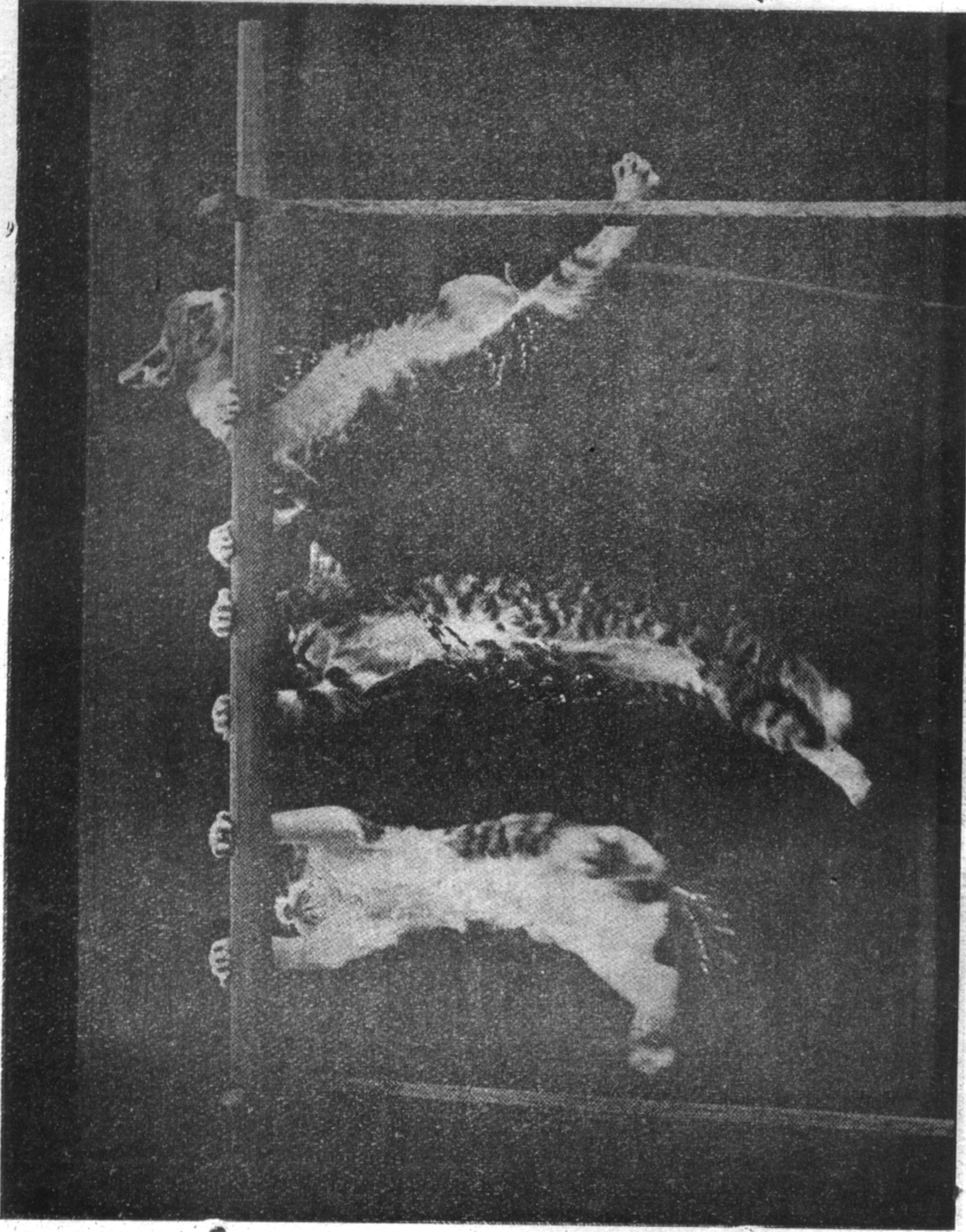
বিড়ালের ক্রীড়াকৌশল

সিন্ধুঘোটক

সিন্ধুঘোটকের মতন ভয়ঙ্কর জন্তু আর নাই বলিলেও চলে। পৃথিবীর কোনো পশুশালায় এতদিন সিন্ধুঘোটক ধরিয়া রাখা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু সম্প্রতি নিউইয়র্ক পশুশালায় ছুইটি সিন্ধুঘোটক রক্ষিত হইয়া প্রদর্শিত হইতেছে। শিশু সিন্ধুঘোটকটির

সিন্ধুঘোটক

বয়স আঠার মাস;—পাঁচ হাজার ডলার ইহার মূল্য। সিন্ধুঘোটক দুইটিই এখন পোষ মানিয়াছে; ইহাদের তত্ত্বাবধারকের সঙ্গে এই যমতুল্য জন্তু এখন বেশ সহজভাবে
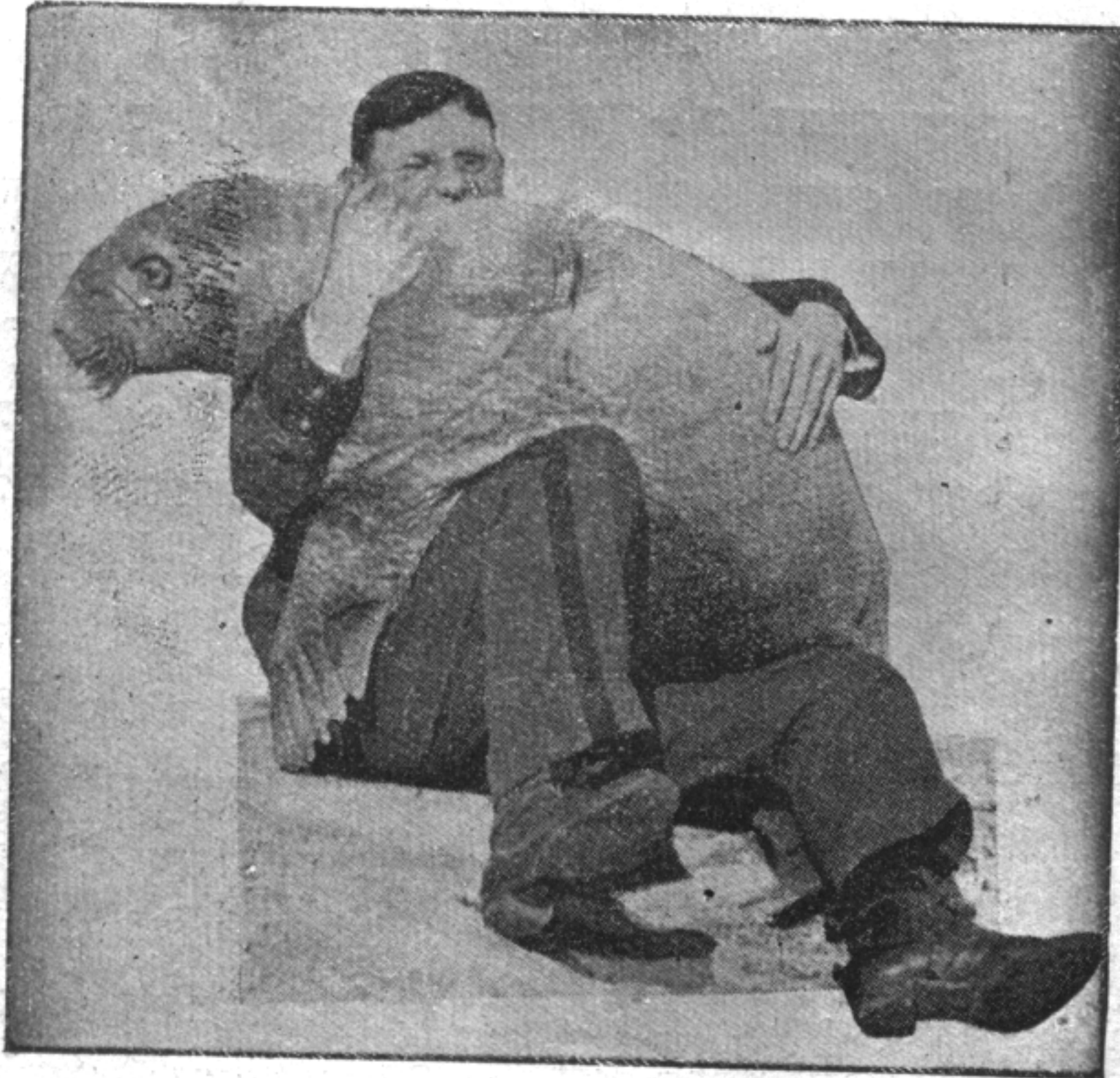
শিশু সিন্ধুঘোটক

গায়ে উঠিয়া, বুকে উঠিয়া খেলা করে। মানবশিশুকে লোকে যেমন করিয়া কোলে করে তত্ত্বাবধারকও তেমনি করিয়া এই সিন্ধুঘোটককে কোলে লইয়া বসিয়া থাকেন।

সমালোচনা

আলেখ্য। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, এম, এ প্রণীত। কলিকাতা, ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জি এণ্ড কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত। উইলকিন্স মেসিন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ৸০ আনা, বাঁধাই ১৲ এক টাকা। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। ইহাতে কয়েকটি ভ্রমণ-কাহিনী ও ছোট গল্প সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। লেখকের ভাষাটি বেশ লঘু, স্বচ্ছ ও মর্ম্মস্পর্শী। লিখিবার ভঙ্গীটিও চমৎকার উপভোগ্য। অত্যন্ত তুচ্ছ কথা ও ক্ষুদ্র ঘটনা লিপিকুশলতার গুণে উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়াছে। গ্রন্থকারের রচনা-শক্তি অনন্যসাধারণ, লেখায় দিব্য প্রবাহ আছে। আশা করি, এই শক্তির সদ্ব্যবহার করিয়া নবীন গ্রন্থকার ভবিষ্যতে সিদ্ধকাম হইবেন। গ্রন্থে কাঞ্চনজঙ্ঘা, করতোয়া নদী, পদ্মার জেলেডিঙ্গি প্রভৃতির পাঁচখানি চিত্র আছে। বইখানির ছাপা কাগজ বাঁধাই ও ছবিগুলি সবই সুন্দর। সৌন্দর্য্যের এমন সন্নিপাত বাঙ্গালা বহিতে অল্পই দেখা যায়।

ভারত-প্রদক্ষিণ। শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ রক্ষিত প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ। শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র পাল দ্বারা প্রকাশিত। মেটকাফ্ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দুই টাকা। এই সুদীর্ঘ ভ্রমণ-কাহিনীটি আগাগোড়া কৌতূহলোদ্দীপক তথ্যে পরিপূর্ণ। ভ্রমণে বাহির হইবার সুযোগ বা অবসর অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটে—যাঁহাদিগের ভাগ্যে তাহা ঘটে না, তাঁহারা এ গ্রন্থ পাঠ করিলে যে বিশেষ

আনন্দ লাভ করিবেন, সে বিষয়ে আমাদিগের এতটুকু সন্দেহ নাই। ভ্রমণ এখন অনেকেই করেন এবং সুলভ ছাপাখানার আশীর্ব্বাদে সেই ভ্রমণের কাহিনী প্রকাশ করিতেও ত্রুটি করে না; কিন্তু দেশ দেখিবার চক্ষু বা দেখিয়া তুলির সাহায্যে অপরকে সেই দেশ দেখাইবার ক্ষমতা অতি অল্প লোকেরই আছে! গ্রন্থকার সেই অল্প লোকের দলভুক্ত। তাঁহার দেশ দেখিবার চোখ আছে এবং তুলি টানিয়া সেই দৃশ্য আঁকিয়া অপরকে দেখাইবার ক্ষমতাও আছে; তাহার ফলে এই সুদীর্ঘ গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠা সরস ও সারবান তথ্যে পূর্ণ হইয়াছে। গ্রন্থখানি পাঠ করিলে ভারতবর্ষীয় নানা জাতির আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, ধর্ম্ম ও প্রকৃতি সম্বন্ধে বেশ মোটামুটি জ্ঞান লাভ হয়। গ্রন্থের ভাষা সর্ব্বত্র বেশ স্বচ্ছ ঝরঝরে না হইলেও, মোটের উপর চলনসই—শ্রুতিকটু নহে। গ্রন্থে অনেকগুলি চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে—চিত্রগুলি নানাস্থানের নানা কীর্ত্তির নিদর্শন-স্মৃতি। ছাপা কাগজ বাঁধাইও ভাল।

প্রাণের বেদনা। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দেব কবিকৌমুদী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত। গ্রন্থখানি কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের প্রতিবাদ। সাহিত্যের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই।

গিরি-কাহিনী। শ্রীযুক্ত প্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ঢাকা, আলেকজান্দ্রা ষ্টীম মেসিন-প্রেসে মুদ্রিত। ষ্টুডেণ্টস লাইব্রেরী, ঢাকা। গ্রন্থের মূল্য লিখিত দেখিলাম না—ছাপা কাগজও বাঁধাই বেশ হইয়াছে। গ্রন্থখানিতে খাসিয়া জাতির কয়েকটি প্রচলিত গল্প ও কিম্বদন্তী এবং তাহাদিগের দুই-চারিটি রীতিনীতির ঈষৎ আভাস প্রদত্ত হইয়াছে। বিষয়গুলি সুশৃঙ্খল বিন্যাসের অভাবে তেমন জমিয়া উঠিতে পারে নাই; লেখকের রচনাশক্তিরও বিশেষ পরিচয় পাইলাম না।

শৈব্যা। শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা, ৮১ কলেজ ষ্ট্রীট, চ্যাটার্জ্জি ব্রাদার্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পশুপতি প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য চারি আনা। ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য মহিষী শৈব্যার কাহিনী অবলম্বনে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচিত। রচনায় লেখক রূপকথার ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন—কিন্তু ক্ষমতার অভাবে সমস্তই ব্যর্থ হইয়াছে। ভাষা অত্যন্ত এলোমেলো, তাহার ফলে কাহিনীটি নেকামিতে পর্য্যবসিত হইয়া গিয়াছে।

অজীর্ণতা। ডাক্তার শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রকুমার মৈত্র প্রণীত। কলিকাতা, ৮৪ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। মূল্য পাঁচসিকা মাত্র। গ্রন্থকার চিকিৎসক ও কলিকাতা হোমিওপ্যাথি কলেজের অধ্যাপক। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্র আলোচনা ও আমাদিগের দেশে প্রচলিত খাদ্যাদির যথাযথ বিচার করিয়া তিনি এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। খাদ্য, পানীয় ও বায়ুর উপরই যে আমাদিগের স্বাস্থ্য মোটামুটি নির্ভর করিতেছে, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। বর্ত্তমান গ্রন্থে লেখক তাহারই সুনিপুণ সমন্বয়ে খাদ্যাখাদ্যের গুণাগুণ বিবৃত করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন স্বাস্থ্যের সুপ্রচলিত নিয়মগুলি কিরূপ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপিত তাঁহার বিশদ আলোচনা করিয়া সেগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। গ্রন্থখানি বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে পরিপূর্ণ। গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন, এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া একজন অজীর্ণ রোগীও যদি উপকার লাভ করেন, তাহা হইলেই তাঁহার ও প্রকাশক মহাশয়ের চারি বৎসরের শ্রম সফল হয়। ভুক্তভোগীগণ একবার পরীক্ষা করিতে পারেন।

কিণ্ডারগার্টেন গল্প পুস্তক। আর, ডি, বমগুয়েস্ পি, এল (জর্ম্মাণি) কর্ত্তৃক সম্পাদিত। কলিকাতা, ব্যাপ্‌টিষ্ট মিশন প্রেস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। গ্রন্থের নাম হইতেই ইহার উদ্দেশ্য সহজে উপলব্ধি হয়।

সার কথা। শ্রীমতী হেমলতা দেবী প্রণীত। ঢাকা, অতুল লাইব্রেরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ইষ্ট বেঙ্গল প্রিণ্টিং এণ্ড পাব্লিশিং হাউসে মুদ্রিত। মূল্য চারি আনা। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় কয়েকটি দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক সন্দর্ভ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। লেখিকার ভাষা প্রাঞ্জল, বিষয়গুলি কঠিন হইলেও, সহজ রচনার গুণে ফুটিয়াছে ভাল।

সপ্তক। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি, এল প্রণীত। প্রকাশক শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক এম, এ, বি, এল, ভবানীপুর, কলিকাতা। বাণী প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দশ আনা। এখানি গল্প-পুস্তক। সাতটি গল্প ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অধিকাংশ গল্পেরই আখ্যানবস্তু ভাল, কিন্তু সকল গল্পে ছোট গল্প লেখার আর্টটুকু তেমন ফুটিয়া উঠে নাই। আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগিয়াছে, 'বিভ্রম' গল্পটি। পাহাড়ী বালিকার সরল অনাসক্ত অনুরাগটুকু একটি কৌতূহলের অন্তরালে দিব্য ফুটিয়াছে। 'হৃদয় পরীক্ষা' ও 'সন্ধি-পত্র' গল্পের উপাখ্যান দুইটি বিচিত্র হাস্য-রসে উজ্জ্বল। গ্রন্থে কয়েকখানি চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে।

রাজা দেবীদাস। শ্রীস[illegible]রঞ্জন রায় এম এ প্রণীত ও প্রকাশিত। কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দেড় টাকা মাত্র। এখানি উপন্যাস। গ্রন্থকার ভূমিকায় বলিয়াছেন, অতীত বাঙ্গালার কীর্ত্তিকাহিনী স্মরণে আনন্দ ও কীর্ত্তনে পুণ্য আছে। * * দেবীদাসের আখ্যায়িকার মূলে ঐতিহাসিক সত্য নিহিত। কিম্বদন্তী ইতিহাসের ভিত্তি। তাহা ত্যাগ করি নাই। যেখানে উহাও নীরব, সেখানে বাধ্য হইয়া কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি।" লেখকের ভাষা সুন্দর, মার্জ্জিত ও সরল। বর্ণনার গুণে উপাখ্যানটিও আগাগোড়া কৌতূহল জাগাইয়া রাখে। কয়েকটি চরিত্রও বেশ ফুটিয়াছে। অনুগত মাধব দত্ত তাহার যোগ্যা সহধর্ম্মিণী তারা, রাজা দেবীদাস দাম্ভিক আমীনা প্রভৃতির চিত্র স্বাভাবিক হইয়াছে—উমার চরিত্রে কিন্তু গ্রন্থকার অনেকখানি রঙ দিয়া ফেলিয়াছেন, তাহার ফলে কতকটা পুঁথিগত হইয়া পড়ায় উমা জীবন্ত হইয়া উঠিতে পারে নাই। ইসমাইলকেও এমন শয়তান সাজাইবার প্রয়োজন ছিল না। তাহার শয়তানীর উদ্দেশ্যটা তেমন হৃদয়ঙ্গম হয় না। চরিত্রটি তেমন সুকৌশল পরিণতি লাভ করিতে পারে নাই। যাহা হউক, এ সকল ছোটখাট ত্রুটি-সত্ত্বেও আমরা উপন্যাসখানি পাঠ করিয়া সুখী হইয়াছি। রাজা দেবীদাসে গ্রন্থকারের যে শক্তির পরিচয় পাইয়াছি, আশা করি ভবিষ্যতে তাহা সম্যক বিকশিত হইয়া উপন্যাসপ্রিয় পাঠকপাঠিকাকে

অভ্যাসযোগ। শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সান্ন্যাল প্রণীত। কলিকাতা ভারতমিহির যন্ত্রে মুদ্রিত। মজুমদার লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। মূল্য আট আনা। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। মানব চিত্তে ভগবানের অনন্ত শক্তি পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান আছে, মোহ বা অজ্ঞানতা-বশতঃ সে শক্তি জড়ের মতই থাকে—উপযুক্ত সাধনা দ্বারা এই শক্তি বি শিত হয়—তখন মানুষ অসাধ্যসাধন করিতে পারে। গ্রন্থকারের ইহাই প্রতিপাদ্য—অদৃষ্টবাদ প্রভৃতি বেশ সুদৃঢ় যুক্তিতর্কে খণ্ডন করিয়া তিনি আপনার প্রতিপাদ্য ফুটাইতে সক্ষম হইয়াছেন। জগৎ কর্ম্মক্ষেত্র—কর্ম্ম করিলে তাহার ফল মিলিবেই। অদৃষ্টের দোহাই দেওয়া কাপুরুষতা—পুরুষকারই একমাত্র অবলম্বনীয়। এই অদৃষ্টবাদের ভীষণ মোহে দেশবাসী আজ কর্ম্মবিমুখ, অবসাদগ্রস্ত—কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মফল নিশ্চয় অতিক্রম করা যায়। সাধনার জয় অবশ্যম্ভাবী। বিশ্বামিত্র, ধ্রুব, সাবিত্রী প্রভৃতি উপাখ্যানে এ সত্য সুন্দরভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। অভ্যাসের শক্তি অসাধারণ—লেখক কয়েকটি প্রবন্ধে তাহা বুঝাইয়াছেন। ভাষা প্রাঞ্জল, সহজ, সমাসের কণ্টক নাই, সংস্কৃত শাস্ত্রবচনের জাল নাই। এমন দুর্দ্দিনে কর্ম্মের শক্তির কথা বুঝাইয়া যিনি দেশবাসীর মোহ ভাঙ্গিতে চেষ্টা করেন, তিনি সমগ্র দেশের কৃতজ্ঞতা-ভাজন সন্দেহ নাই।

তমসা। [illegible]যুক্ত সতীশচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত। ২৬।৬ রাজা ব্রজেন্দ্রনারায়ণ রায় [illegible]ট হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য বার আনা। এখানি নাটক—সেক্ষপীয়রের 'সিম্বেলিন' নাটক অবলম্বনে রচিত। সকল চরিত্রগুলি সম্যক না ফুটিলেও 'তমসা', 'বিজয়', 'কঙ্কর', 'অমর্ক', কনক' প্রভৃতি মন্দ হয় নাই। ভাষাটুকু ভাল - ছন্দে রচিত অংশগুলিতে প্রবাহ আছে। হাস্য-রসের অবতারণায় গ্রন্থকারের শক্তি আছে—চর্চ্চা রাখিলে ভবিষ্যতে গ্রন্থকারের হাত খুলিতে পারে।

প্রবাহিনী। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সেন প্রণীত। কাকিনা, শাহারিয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। শেখ এফজলল করিম কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য আট আনা। এখানি কবিতাপুস্তক। প্রকাশক

লিখিয়াছেন, "প্রবাহিনীর অধিকাংশ কবিতা অন্যূন বিশ বৎসর পূর্ব্বের রচনা। * * অপরিবর্ত্তিত অবস্থাতেই প্রকাশিত হইল। উদ্দেশ্য—তরুণ জীবনের বিস্মৃতপ্রায় দিনগুলিতে যে বিচিত্রভঙ্গ-বিশ্বসৌন্দর্য্য-রস-মুখর-নৃত্য-নিপুণ-কল্পনা-প্রবাহ-মালা অতলস্পর্শ হৃদয়তটিনীর উভয় কূল প্লাবিত করিয়া মানসরাজ্যে প্রেম করুণার একটা বেগবতী বন্যা বহাইয়া চলিতেছিল, সেই ভরা ভাদরের আবেশময়ী স্মৃতিটি দীর্ঘজীবিনী করিয়া রাখা।" ভাষা বটে! কিন্তু এ উদ্দেশ্য নাই বা সিদ্ধ হইত! এ "প্রবাহ-মালা" লোকচক্ষুর অগোচরে থাকিলে কাহারও কোন ক্ষতি ছিল না। কবিতাগুলিতে রবীন্দ্রনাথের ভাব কোথাও প্রচ্ছন্ন, কোথাও বা পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে। মল্লিনাথ প্রকাশক যে "হৃদয়িক কবি ললিতমোহনের ললিতকান্ত-প্রবাহিনীর" খরবেগে ঐরাবতের ন্যায়ই ভাসিয়া গিয়াছেন—তাহা এ গ্রন্থের কয়েক পৃষ্ঠার উপর চক্ষু বুলাইলেই স্পষ্ট বুঝা যায়! পরের ভাবের ঘরে চুরি করিয়া বিশ বৎসরের পূর্ব্বকার রচনা লইয়া গ্রন্থ ছাপাইতে বয়স্ক গ্রন্থকারের দ্বিধা বোধ হয় না,—আশ্চর্য্য!

মন্দার কুসুম। কুমারী প্রফুল্লনলিনী ঘোষ প্রণীত। কলিকাতা, ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, মেসার্স চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জি কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা, ইটালি, ইণ্ডিয়া প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা মাত্র। এখানি উপন্যাস। কিন্তু ইহার উপাখ্যানে কোনো বৈচিত্র্য নাই; লেখিকার লিপিকুশলতা ও চরিত্র চিত্রাঙ্কণ ক্ষমতার একান্ত অভাব।

গল্পের বই। শ্রীমতী সুখলতা রাও প্রণীত। প্রকাশক, ইউ রায় এণ্ড সন্স, ২২ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ব্রাহ্মমিশন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা মাত্র। 'গল্পের বই'য়ে কুড়িটি গল্প আছে—কুড়িটিই রূপকথা—ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য গল্পগুলির সৃষ্টি। সেগুলি শিশুচিত্তে আগাগোড়া কৌতূহল জাগরূক রাখিবে। ব্যাঙ রাজার ভাগ্য, কানুর ভবিষ্যৎ, বারো ভাইয়ের শেষ দশা জানিবার জন্য শিশুর দল ব্যগ্র অধীরতায় বহির পৃষ্ঠার উপর ঝুঁকিয়া পড়িবে। গল্পগুলি টাট্‌কা ফুলের মতই সুন্দর, উপভোগ্য। লেখিকার ভাষাটিও বেশ সহজ,—তাহাতে একটি সুর আছে—সুরটুকু একেবারে গিয়া প্রাণের তারে আঘাত দেয়, প্রাণকে সচেতন করিয়া তুলে। মধ্যে মধ্যে প্রাদেশিকতা দোষ ঘটিয়াছে। তৎসত্ত্বেও অসঙ্কোচে বলিতে পারি 'গল্পের বই' তাহার সুমধুর বৈচিত্র্যে শিশুগণের হৃদয় হরণ করিবে, দুষ্টামি ভুলাইবে! গ্রন্থে অনেকগুলি সুন্দর ছবি আছে সেগুলি আবার গ্রন্থকর্ত্রীর স্বহস্ত রচিত। বঙ্গনারীর হস্তে এমন চিত্র রচিত হয়—ইহা দেখিয়া শুধু আনন্দে নহে, গৌরবেও আমাদিগের চিত্ত ভরিয়া উঠে। গ্রন্থের ছাপা কাগজ প্রভৃতিও উৎকৃষ্ট হইয়াছে।

বঙ্গের কবিতা। শ্রীযুক্ত অনাথকৃষ্ণ দেব প্রণীত। দ্বিতীয় ভাগ। কলিকাতা সাহিত্যসভা হইতে প্রকাশিত। লোকনাথ যন্ত্রে মুদ্রিত মূল্য লিখিত দেখিলাম না। এই গ্রন্থে ধারাবাহিক কালক্রমের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া বিষয় বিভেদ অনুসারে ইংরাজ প্রভাবের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত বঙ্গীয় কবিগণের রচনার পরিচয় বিবৃত করা হইয়াছে। লেখকের ভাষা বেশ সরল ও প্রাঞ্জল—বিষয়গুলিও একটু সুশৃঙ্খল পর্য্যায়ে বিন্যস্ত। বর্ত্তমান গ্রন্থে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশ্বর গুপ্ত দাশরথি রায় অবধি সকল বঙ্গীয় কবির রচনা আলোচিত হইয়াছে। লেখকের পর্য্যালোচনা শক্তিও প্রশংসনীয়। এ গ্রন্থ যে 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' বিভাগে সম্পদস্বরূপ গণ্য হইবে, সে কথা আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৪৪, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

"নাহি উঠল তীরে সো ধনি রাই"

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত চিত্র হইতে

ভারতী

৩৬শ বর্ষ] পৌষ, ১৩১৯ [৯ম সংখ্যা

বাপুষ্টা

রাজ-সরকারের খাজনা আদায়-কার্য্যে ঘুরিতে ঘুরিতে বর্ষারম্ভে উত্তর কাশ্মীরে উপনীত হইয়াছি।

ঘন দেবদারু-বনের তলায় শৈবাল শ্যামল খণ্ড শিলা সকলের ভিতর দিয়া ক্ষুদ্র গিরিনদীটি বহিয়া চলিয়াছে; তাহারই তীরে কপোতেশ্বর মন্দির ও মন্দির-সংলগ্ন অতিথশালা। চারি দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত জনমানবের বাস নাই; কেবল মাঝে মাঝে প্রাচীন রাজাদের দুইচারিটা মঠ এবং রাজনগরীর ভগ্নাবশেষ।

আশ্বিনের পরেই ধান কাটা পর্য্যন্ত বাপুষ্টা বনে এই পুরাতন অতিথশালায় প্রাচীন মঠ-ধারীর সহিত নির্জ্জনতায় এবং আলস্যে দিন কাটাইতে হইবে। ভাদ্রের শেষে, কাছাকাছি গ্রামগুলার খাজনা আদায় বন্দোবস্ত করিতেছি। বহুদিনের অজন্মায় দেশ জ্বলিয়া গিয়াছিল; এবার চারি-দিকে,—তরুলতায়, মাঠে মাঠে, প্রকৃতির শ্যামলতা মঞ্জরিত হইয়া উঠিয়াছে; দিকে দিকে ধানের ক্ষেত, সবজী-বাগান ভরিয়া, চাষীদের সোনার স্বপনের মত, শরতের ধান এবং হলুদবরণ কেশর ফুল দেখা দিয়াছে। মেঠো গানের মিঠে সুর এই আনন্দের কথা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া কত করিয়া বলিয়া যেন আর শেষ করিতে পারিতেছে না। এই দেশ-জোড়া আনন্দের মাঝে আদায়ের তাগাদা লইয়া বাহির হইতে কেমন আমার বাধো-বাধো ঠেকিতে লাগিল। আমি আরও কয় দিন দুঃখী প্রজাদের আনন্দে বাধা দিব না স্থির করিয়া নির্জ্জন দেবদারু বনে বনে কপোতের কুহু কুহু এবং গ্রামের পথে পথে চাষীদের গান শুনিয়া দিন কাটাইতেছি। অকস্মাৎ এই সময়ে এত আশা ভরসা সমস্ত নির্ম্মূল করিয়া দিবার উপক্রম করিয়া অকালে মহা হিম এবং প্রচণ্ড তুষারপাতের লক্ষণ দেখা গেল।

সমস্ত আকাশের নীলিমা এক নিমেষে মুছিয়া দিয়া একটা ধূসর বিষণ্ন ছায়া দিনের পর দিন জলস্থল-আকাশ আক্রমণ করিয়া সুদীর্ঘ দুঃস্বপ্নের মত জাগিয়া আছে। চাষীর মুখে গান বন্ধ; দেশ জুড়িয়া একটা স্তব্ধ প্রতীক্ষা! এই সঙ্কট ও সংশয়ের মাঝখানে বাপুষ্টা বনে হঠাৎ এক রাত্রিশেষে লোকের কোলাহল এবং ঢোলের বাদ্য শুনিয়া আমি একটু অবাক হইয়া গেলাম। একবার মনে হইল, লোকগুলা

আমাকেই পাকড়াও করিতে আসিয়াছে। খাজনা কিছুতেই মাপ দিব না মনে মনে এই স্থির করিয়া মঠধারীকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। তাহার মুখে শুনিলাম, লোকেরা কপোতেশ্বরের পূজা দিতে আসিয়াছে। লোকগুলা দুর্ভিক্ষের হাত এড়াইবার জন্য পূজা দিতে আসিয়াছে আমার হাত এড়াইবার জন্য নয়। মঠধারীর কাছে এই আশ্বাসটা পাইয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলাম; এবং স্বচক্ষে একবার ফসলের অবস্থা ও আকাশের ভাবগতিক দেখিবার জন্য বন ছাড়িয়া মেঠো রাস্তায় বাহির হইয়া হইয়া পড়িলাম।

সন্ধ্যার সময় অতিথশালায় ফিরিয়া আসিয়াছি; লোকেরা পূজা দিয়া ফিরিয়া গিয়াছে; বিন্দু বিন্দু বৃষ্টির সঙ্গে একটা কন্‌কনে হাওয়া দেবদারু বন কাঁপাইয়া বহিতেছে। বরফ পড়িবার উপক্রম দেখিয়া আমি আগুন জ্ব'লাইলাম এবং কম্বলখানা পাতিয়া তোরঙ্গ হইতে বহুকষ্টে পাওয়া কবি কহ্লনের রাজতরঙ্গিণীখানা বাহির করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলাম। প্রতাপাদিত্যের পুত্র জলৌকা বত্রিশ বৎসর রাজ্যশাসন করিয়া স্বর্গে গমন করিলে তৎপুত্র তুঞ্জীন দিব্যপ্রভাবসম্পন্না রাজ্ঞী বাক্‌দেবীর সহিত, মেঘ ও বিদ্যুতের মত স্নেহবারিতে দীন প্রজার মন উৎফুল্ল করিয়া, ফলে ফুলে সুশোভিত ইন্দ্রধনুর ন্যায় নানা বর্ণ বিচিত্র রাজ্যখণ্ড, বহুদিন ধারণ করিয়া রহিলেন। এই সময়ে সহসা ঘোররূপা দুর্ভিক্ষ-রাক্ষসী যখন রাজারাণীর যশ-চন্দ্রিমা গ্রাস করিবার জন্যই যেন রাজ্যমধ্যে উপস্থিত হইল, তখন রাজভাণ্ডার শূন্য করিয়া বহুচেষ্টাতেও প্রজাগণ মারীভয় হইতে রক্ষা পাইল না। দেখিয়া মনোদুঃখে রাজা প্রাণত্যাগ করিলেন এবং রাজ্ঞী রাজার অনুগমনের জন্য প্রস্তুত হইয়া চিতাসজ্জার আদেশ দিলেন।

* * *

চারিদিক বরফে ঢাকা। কে যেন পৃথিবীর উপরে একখানা শবাচ্ছাদন সাদা চাদর টানিয়া দিয়াছে; তাহারি উপর দিয়া তুঞ্জীনের মৃতদেহ বাহকেরা লইয়া চলিয়াছে; সঙ্গে রাণী বাক্‌দেবী, আর দলে দলে বভুক্ষু কাতর প্রজা "রাণীমা দান কর, দান কর" বলিয়া চলিয়াছে। হায় রাণীর হাত আজ শূন্য! দারুণ দুর্ভিক্ষে রাণীর হাতের অলঙ্কার পর্য্যন্ত বিকাইয়া গেছে।

অনুচরেরা রাজ-দেহ চিতার উপরে তুলিয়া দিল। নির্ব্বাক রাণী ধীরে ধীরে চিতায় উঠিবেন এমন সময় ক্ষুধিতের দল আবার চীৎকার করিল, "দান দিয়া যাও, দান দিয়া যাও।"

আমার বুকের ভিতরে কে যেন একটা ধাক্কা দিয়া বলিল, দেখেছো লোকগুলার অন্যায়! ঠিক সেই সময় একটা প্রচণ্ড আলোয় আমার চক্ষু ঝলসিয়া গেল এবং কে যেন আমাকে ঠেলিয়া বলিল—"বাবুজী!" চক্ষু মেলিয়া দেখি—মঠধারী! আমার চোখের সম্মুখে লণ্ঠন ধরিয়া সে বলিতেছে—"বরফ পড়িতেছে শীঘ্র আহার করিয়া শয়ন করুন" স্বপ্নের সঙ্গে মিশিয়া গল্পটা বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল; হঠাৎ বাধা পাইয়া মনটা ক্ষুব্ধ হইল। আহারান্তে তুঞ্জীনের গল্পটা শেষ করিলাম।

রাজ্ঞী বাক্‌দেবীর বাক্য-ছাড়া আর এমন কিছু ছিল না যে তিনি দুঃখীকে দান করেন; তিনি ঊর্দ্ধমুখে কাতর কণ্ঠে শুধু বলিলেন—"হে

দেবতা, দীনের আহার প্রেরণ কর।” বলিয়া তিনি পতির সহিত চিতারোহণ করিলেন। সতীর বাক্য সার্থক করিয়া সেই সময়ে দেবতার বরের মত প্রজাদের ঘরে ঘরে অসংখ্য কপোত দলে দলে আসিয়া দেখা দিল। দিনের পর দিন এই কপোত-মাংস প্রজাদের অন্নস্বরূপ হইয়া রহিল। বাক্‌দেবীকে সেই হইতে লোকে বলিত বাকপুষ্টা। এবং যে বনে তিনি চিতারোহণ করিয়াছিলেন সেখানে কালে প্রজাদের অর্থে কপোতেশ্বর মন্দির ও তৎ সংলগ্ন অতিথ শালা প্রতিষ্ঠিত হইল।

পরদিন সকালে সত্যই দেখিলাম বরফ পড়িয়া মাঠ ঘাট ঢাকিয়া গিয়াছে। আমি খাজনা আদায় বন্ধ রাখিয়া সরাসর রাজধানীতে ফিরিরা আসিলাম এবং রাজার সাহেব মোনেজরের নিকটে খাজনা অনাদায়ের কারণ দেখাইয়া একতক্তা রিপোর্ট পাঠাইলাম। প্রত্যুত্তরে নিজের ‘হোম’ বাঙ্গালা মুলুকে গিয়া ‘চ্যারিটি’ করিতে আদেশ পাইলাম এবং সার্টিফিকেটের মধ্যে উক্ত পত্র ও রাজতরঙ্গিণীর ছেঁড়া পুঁথি লইয়া কাশ্মীর রাজ্য হইতে বিদায় লইলাম।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গিলগিটদিগের আমোদ প্রমোদ

গত চৈত্র সংখ্যায় ‘ভারতী’র পাঠক পাঠিকাগণ “গিল্‌গিট দিগের আমোদ প্রমোদ” শীর্ষক প্রবন্ধে ‘সিনো বাজনো’ উৎসবের বিবরণ পাঠ করিয়াছেন। অন্ত তাহাদিগের অন্যান্য দুই একটী উৎসবের বিবরণ নিম্নে প্রদান করিলাম।

‘আইবাই’ উৎসব

‘সিনো বাজনো’ উৎসবের পর তাহারা ‘আইবাই’ উৎসব অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিয়া থাকে। ‘আইবাই’ তাহাদের একটী মাসের নাম, সিনো বাজনো উৎসবের পরই এই উৎসবের সূচনা হয়। গিলগিট দিগের প্রধান অর্থাৎ ‘রা’ (Ra) মহাশয় এই উৎসবের দিন নির্দ্দেশ করিয়া সর্ব্বসাধারণে বিজ্ঞাপিত করিয়া দেন। গ্রামের যত যুবক ও বালকগণ নির্দ্ধারিত দিবস অপরাহ্নে ‘রা’ মহাশয়ের গৃহপ্রাঙ্গণে সমবেত হয়। ‘রা’ মহাশয় স্বীয় অনুচরবর্গাদি পরিবেষ্টিত হইয়া স্তূপীকৃত আখরোটের সম্মুখে গৃহছাদের উপর বিরাজ করিতে থাকেন। আখরোট-স্তূপের পার্শ্বে একটী ভস্মস্তূপও ভৃত্যগণ সজ্জিত করিয়া রাখে। তৎপর ‘রা’ মহাশয় ছাদের উপর হইতে সেই সকল স্তূপীকৃত আখরোট নিম্নে সমবেত লোকগণের উপর নিক্ষেপ করেন। যুবক ও বালকগণ আখরোট সঞ্চয়ের লোভে তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। এ দিকে সকলেই যখন আখরোট কুড়াইতে ব্যস্ত থাকে এবং গোলযোগ বেশ ঘনাইয়া আসে তখন ভৃত্যগণ ছাদের উপর সঞ্চিত স্তূপীকৃত ভস্মরাশি ক্ষিপ্রহস্তে সংগ্রামপ্রবৃত্ত যুবক ও বালকগণের মাথায় ঢালিয়া দেয়। নীচের দল বিশেষ বলশালী হইলে ‘রা’ কিম্বা তাহার অনুচরবর্গের মধ্যে যে কাহাকেও

বন্দী করিবার জন্য ধাবিত হয়। অন্যথা তাহাদের মধ্যে অনেকেই 'রা' ও তাহার অনুচরবর্গের হস্তে বন্দী হয়। যদি 'রা' স্বয়ং কিম্বা তাহার অনুচরবর্গের মধ্যে কেহ যুবক ও বালকগণের হস্তে বন্দী হয় তবে উপযুক্ত অর্থ বিনিময়ে তাহারা মুক্তি লাভ করে, কিন্তু গ্রামবাসীদিগের মধ্যে কেহ বন্দী হইলে 'রা' মহাশয় তাহাকে কিছু দিনের জন্য কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখেন।

গণোনী উৎসব

আষাঢ় মাসের গোড়ায় যখন গিলগিটের প্রধান ফসল গম্ ও যব পূর্ণ পক্কতা প্রাপ্ত হয় তখন গণোনী উৎসব সম্পন্ন হয়। এই উৎসব সম্পন্ন না হইলে কেহ নূতন শস্য আস্বাদন করিতে পারে না। রাজা অথবা গ্রামের প্রধান 'রা' একটী শুভ দিন নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহার অধীনস্থ সকল স্থানে এই উৎসব সম্পন্ন করিবার জন্য আদেশ প্রচার করেন। নির্দ্ধারিত দিবস অপরাহ্নে গৃহস্থগণ অল্প ঘৃতে প্রচুর পরিমাণ রুটী সেঁকিয়া স্ত্রীপুরুষ বালকবালিকাগণ সকলে মিলিয়া মাঠে বা ক্ষেত্রে গমনপূর্ব্বক সেখানে এক প্রান্তে বসিয়া চুপে চুপে খাদ্য গুলির সদ্ব্যবহার করে; তৎপরে কতকগুলি যবশস্যের অগ্রভাগ ছেদন করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসে। শস্যগুলি কিয়ৎকাল অগ্নির উত্তাপে রাখিয়া তুষ ছাড়াইয়া লয় এবং কিয়ৎ পরিমাণ দুগ্ধ অথবা দধিতে সেই অর্দ্ধ-দগ্ধ যবগুলি ভিজাইয়া রাখে, তৎপরে পরিবারস্থ প্রত্যেকে একটী কাষ্ঠ নির্ম্মিত হাতার দ্বারা তিন হাতা করিয়া এই অপূর্ব্ব খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্ত হয়। এই প্রকারে আহারাদি সম্পন্ন হইলে পর অপূর্ব্ব নৃত্যগীতে রাত্রি অতিবাহিত করে।

তুমনিখা উৎসব

শরৎ ও বসন্তকালে শস্য কর্ত্তন করিয়া শস্যপূর্ণ থলিগুলি লইয়া যখন তাহারা গৃহাভিমুখে গমন করে, তখন তাহারা নিম্নলিখিত গানটী গাহিয়া প্রার্থনা করে—

পরম দয়াল হে ভগবান দিও মোদের সুপ্রচুর
'উসুম' 'তুসুম' তাদের মত দিও মোদের সুপ্রচুর
সাহসী বীর 'থারকীর' মত দিও মোদের সুপ্রচুর
'কাটোয়াল' 'বাটোয়াল' বীরের মত দিও মোদের সুপ্রচুর
গিলগিট রাজ "মালিকের" মত দিও মোদের সুকপাল
শরৎকালের সন্ধ্যা হতে যেন পরদিন প্রাতঃকাল
শুধু শস্য বইতে পারি এমন দাওহে সুপ্রচুর
গ্রীষ্মের দীর্ঘদিনের মত দাওহে শস্য সুপ্রচুর
দাও সুপ্রচুর যতদিন না গর্দ্দভের শৃঙ্গ হয়
দাও সুপ্রচুর যতদিন না পর্ব্বতের শ্মশ্রু হয়।

সকল শস্য সংগৃহীত হইলে গিলগিটবাসীগণ 'তুমনিখা' উৎসব সম্পন্ন করে। কৃষিকার্য্যের গুরুতর শ্রম হইতে তাহারা মুক্ত হইয়াছে ইহাই এই উৎসবটি জ্ঞাপন করে। উৎসব সময়ে তাহারা যে সকল আমোদ আহ্লাদ ও ক্রীড়া কৌতুকের ব্যবস্থা করে তন্মধ্যে পোলো (polo) খেলাই তাহাদের সর্ব্বপ্রধান আমোদ। খেলা শেষে একটী ছাগবধ করিয়া তাহা অগ্নিতে ঝলসাইয়া লয় এবং সেই মাংস নৃত্য বাসরে উদরস্থ করে; এই নৃত্য অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত চলে। নৃত্য গীতাদি ব্যতীত একটী স্থান নির্দ্দেশ করিয়া লক্ষ্য বিদ্ধ করাও তাহাদের উৎসবের একটী প্রধান অঙ্গ। লক্ষ্য বিদ্ধের পর তাহাদের উৎসবের পরিসমাপ্তি হয়।

শীল আই থালি উৎসব

যে সকল স্ত্রীলোক সমস্ত জীবন ধর্ম্ম ও সতীত্ব রক্ষা করিয়া জীবন অতিবাহিত করিয়াছে এই উৎসবটী তাহাদের জন্য সম্পন্ন হয়। এই সকল স্ত্রীলোককে 'শীলো' অর্থাৎ সতী বলে এবং তাহাদের পুত্রকন্যাগণ অতি গর্ব্বের সহিত তাহাদের মাতার সতীত্বের কথা চারিদিকে প্রচার করিয়া বেড়ায় ও কাহারও সহিত কলহ বাধিলে বুক ফুলাইয়া বলে যে—"তোরা আমাদের কি বলিস্! জানিস্ আমাদের মা সতী—তোদের মা সে রকম নয়" ইত্যাদি!

এই উৎসব সম্পাদন করিবার নিমিত্ত সতী স্ত্রীলোকের একজন নিকট-আত্মীয় একটী প্রস্তর-বেদী প্রস্তুত করে। প্রস্তরখানি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ৫ গজ এবং উচ্চতায় ১ গজ হওয়া আবশ্যক। নির্দ্ধারিত দিবসে তাহার আত্মীয়স্বজনগণ একটী শ্বেত বর্ণের ছাগল সঙ্গে লইয়া বেদীর নিকট উপস্থিত হয়। এই ছাগটীকে সেই দিন তাহারা বিচারকের আসন প্রদান করিয়া অতিশয় সম্মানের চক্ষে দেখে। কারণ ছাগটীই সেইদিন একটী স্ত্রীলোকের ভবিষ্যৎ জীবনের শুভাশুভ নির্দ্দেশ করিয়া দেয়।

সতী স্ত্রীলোকটীকে একটী উৎকৃষ্ট রেশমের পোষাকে সজ্জিত করিয়া একখানি উচ্চ কাষ্ঠাসনে বসিতে বলা হয় এবং সেই পরিবারের একজন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি একটী রেশমী পাগড়ী মস্তকে ধারণ করিয়া ছাগটীকে স্ত্রীলোকটীর কাষ্ঠাসনের নিম্নে রাখিয়া দেয়। ছাগটীর মস্তকেও একটী রেশমের পাগড়ী পরাইয়া দেওয়া হয়, তৎপর ছাগটীকে সম্বোধন করিয়া বলে—

"হে শুভ্র ছাগনন্দন! যদি আমার কন্যা (কিম্বা যে সম্বন্ধ হইবে তাহা) তাহার সমস্ত জীবন সতীত্বধর্ম্ম বজায় রাখিয়া পুণ্যময় পথে বিচরণ করিয়া থাকে এবং মিথ্যাকথন, অপহরণ ব্যভিচার, বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি পাপ কার্য্য হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিয়া আজ পর্য্যন্ত পবিত্র জীবন অতিবাহিত করিয়া থাকে তাহা হইলে অনুগ্রহ করিয়া এই পুণ্যবতী রমণীর সম্মানরক্ষার্থ তুমি এই কাষ্ঠাসনে তোমার মাথা স্পর্শ করাও—অর্থাৎ প্রণাম কর।"

যদি ছাগটী কাষ্ঠাসনে মস্তক স্পর্শ করিয়া রমণীর সৎকার্য্যাবলী অনুমোদন করে তবে সমবেত ব্যক্তিবর্গ আনন্দধ্বনিতে কর্ণ বধির করিয়া তোলে এবং রমণীর আত্মীয়গণ বহুসংখ্যক ছাগ বধ করিয়া উপস্থিত জনমণ্ডলীকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে যদি ছাগটী কাষ্ঠাসনে মাথা না ঠেকায় অর্থাৎ রমণীর সতীত্ব অনুমোদন না করিয়া কাষ্ঠাসনের নিম্ন হইতে ডাকিতে ডাকিতে বাহির হইয়া আসে তাহা হইলে রমণীর আত্মীয়গণ অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া নীরবে বাড়ী ফিরিয়া আসে এবং স্ত্রীলোকটী যতদিন জীবিত থাকে তাহার সহিত আর কেহ বাক্যালাপ করে না।

"নাগী সুচিমী" উৎসব

"আসতর" জেলার "নানগাম" নামক স্থানে "নাগিনী" পর্ব্বত অবস্থিত। এই পর্ব্বতের সানুদেশে একখানি প্রস্তর বেদীতে এই দেবী অধিষ্ঠিত। পূর্ব্বকালে কেহ চুরী করিলে এই

দেবীর নিকট নিম্নলিখিতরূপে তাহার বিচার হইত।

গিলগিটের 'রা' বিচার কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার মানসে এই দেবীর নিকট একজন লোককে নিযুক্ত করেন। তাহাকে "যুঙ্ নী" এই উপাধি প্রদান করা হয়। বিচারের দিন এই ব্যক্তি দোষী ব্যক্তির নিকট হইতে ৮ গজ ধুতি গ্রহণান্তর তাহাকে এই দেবীর নিকট উপস্থিত করে। এই দেবীর বেদীর উপর একটা ছাগবধ করা হয় এবং তাহার মাংস রাঁধিয়া তাহার দ্বারা উপস্থিত জনমণ্ডলী উদর পরিতৃপ্ত করে। দেবীর নিকট এই সকল কার্য্য নির্ব্বাহার্থ আবশ্যকীয় নানাপ্রকার থালা বাসন ইত্যাদি সেই স্থানেই রক্ষিত থাকে এবং দেবীর সম্পত্তি বলিয়া কাহারও এ সকল লইয়া যাইবার অধিকার নাই।

আহারাদি সম্পন্ন হইলে পর দোষী ব্যক্তি দেবীর নিকট নিম্নলিখিত কথাগুলি উচ্চারণ করে—"হে নাগী সুচিমী! আমি যদি প্রকৃত দোষী হই তবে আমাকে শাস্তি প্রদান কর আর যদি আমি নিরপরাধ হই তবে যে আমার বিরুদ্ধে এই সকল অন্যায় অভিযোগ আনয়ন করিয়াছে তাহাকে দয়া করিয়া ঘোরতর বিপদ-গ্রস্ত কর।"

এই কার্য্য সমাপনান্তে সকলে অন্ধকার রজনীর দ্বিতীয় যামে স্বীয় গৃহে প্রত্যাগমন করে। যে সকল ব্যক্তি এই বিচার কার্য্য দর্শনার্থে দেবীর সম্মুখে উপস্থিত থাকে তাহাদের মধ্যে কাহারও পর দিবস দিনের বেলায় বাহির হইবার উপায় নাই—কারণ এই সকল ব্যক্তির মধ্যে যদি কাহারও পরদিন সেই গ্রামের কোন লোকের সহিত দেখা হয় তবে তাহাকে সেই অপহৃত দ্রব্যের সমুদয় মূল্য প্রদান করিতে হয়।

দেবীর নিকট যথাবিহিত প্রার্থনা করার পর বিচার ফলের নিমিত্ত সকলে কিছু দিনের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকে। যদি এই নির্দ্দিষ্ট দিবসের মধ্যে দোষী ব্যক্তি তাহার বিষয়-সম্পত্তি বা অর্থাদি কিম্বা আত্মীয় স্বজন সম্বন্ধে কোন প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবেই তাহার অপরাধ প্রতিপন্ন হইল, তখন তাহাকে চৌর্য্য জনিত সকল অর্থ প্রতিপক্ষকে প্রদান করিতে হয়।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা।

বাগ্দত্তা

(১৭)

এখানে আসিয়া সকলেরই দিন ভাল কাটিতেছিল তাহার মধ্যে মনীশের দিনগুলা বড়ই সুখে কাটিতেছে। উপাখ্যানবর্ণিত কাল্পনিক নরনারীগণের হর্ষবেদনাবিজড়িত সুখদুঃখ আশা নিরাশার লহরে আত্মনিমজ্জন না করিয়া সে অতীতে ও বর্ত্তমানে তুল্য বরণীয় মহাতীর্থধামের মহা মনীষীগণের প্রাতঃ-স্মরণীয় চরিত্র অনুশীলনে সচেষ্ট হইয়াছে। যেখানে যেটুকু ত্যাগের ইতিহাস খুঁজিয়া মিলিতেছে সেটুকু অমনি নিজের ছোট খাতা-খানিতে টুকিয়া লইয়া গৃহে ফিরিয়া সেইটিকে বিস্তৃত করিয়া লিখিতেছে। উমাকান্ত বলিয়াছেন আমাদের দেশে এখন লোকের মনকে

কর্ম্মের দিকে এবং ত্যাগের দিকে লইয়া যাইতে হইবে। জগতে যাহা কিছু পাওয়া যায় কেবল মাত্র এই দুইটি উপায়ের দ্বারা পাওয়া যায় ;—দেশের জন্য কর্ম্ম এবং দশের জন্য ত্যাগ।

মনীশ ক্ষত্রিয়-বীর চৈৎ সিংহ হইতে শুদ্ধাত্মা মহাযোগী ভাস্করানন্দ স্বামী তাঁহার গুরু জীবন্মুক্ত পণ্ডিত অনন্তরাম মিশ্র প্রভৃতি মহাত্মা গণের সংক্ষিপ্ত জীবনী সংকলন করিল।

উমাকান্ত একদিন তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন, মনীশ ! তুমি এইবার সংসারাশ্রম গ্রহণ করো, তোমার খুড়িমা বড় ব্যস্ত হয়েছেন।

মনীশ এ কথার কোন উত্তর করিল না বটে কিন্তু কারাদণ্ডের আদেশ যেরূপ কঠোর শুনায় এই শব্দটাও তাহার কানে সেইরূপ কর্কশ ঠেকিল। তাহার মনের তারে যে সুর বাজিতেছে এই সুরটার তাহার সঙ্গে যেন একেবারেই মিল নাই। সে বাহিরে আসিয়া নিজের পুস্তকগুলি একটু নাড়াচাড়া করিল, তারপর তাহার মধ্য হইতে একখানি গ্রন্থ বাছিয়া ছাদের উপরে চলিয়া গেল ! সেখানে অস্তগামী সূর্য্য ম্লান হইয়া নিবিয়া গেলেন, রুক্ষ হাওয়া শীতল হইয়া আসিল এবং দেখিতে দেখিতে অস্ফুট নক্ষত্রা-লোকে সমস্ত জগত ভরিয়া উঠিল। সে পুস্তক বন্ধ করিয়া চুপ করিয়া ছাদের উপর বসিয়া রহিল। তাহার সমস্ত চিত্ত ভরিয়া একটি যে তীব্র অস্বীকার জাগিয়া উঠিয়াছিল তাহাকে সে নীরবেই নিজের অন্তস্তলে নিবদ্ধ করিয়া মনে মনে এই কথা স্বীকার করিল যে, 'আমার পক্ষে যেটুকু ভাল তাহা আমার অপেক্ষা যাঁহারা অধিক বুঝিতে সক্ষম তাঁহারা আমার জন্য যাহা নির্দ্ধারিত করিয়া দিবেন আমি তাহাই করিব।'

পরদিন পূজাহ্নিক সারিয়া সত্যর পড়া দেখা হইয়া গেলে নিজের খাতা পত্র লইয়া সে উমাকান্তের বসিবার ঘরে গিয়া দেখিল শিবনারায়ণ এবং আরো দুই চারিটি ভদ্রলোক সেখানে উপস্থিত রহিয়াছেন। সে এক পাশে গিয়া বসিল। উমাকান্ত কহিতেছিলেন, "বেদকাণ্ড ত্রয়াত্মক। কর্ম্ম, উপাসনা এবং জ্ঞান এই তিনের পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ দেখাইবার জন্য কর্ম্মকে আদিতে ও মধ্যে উপাসনা ও পরে জ্ঞানের স্থান ভারতবর্ষীয় ঋষিগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বেদের কর্ম্মকাণ্ডে কর্ম্মের স্বরূপ যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে 'কর্ম্ম' শব্দের সাধারণ পরিচিত রূপের সহিত ইহার এক পর্য্যায় হইতে পারে না। এই কর্ম্মকাণ্ড বা কর্ম্ম যোগই জ্ঞানমার্গে উত্থিত হইবার সোপান, সোপান ত্যাগ করিয়া যেমন উচ্চারোহণ সম্ভব নহে, কর্ম্মযোগ ব্যতীত তেমনি জ্ঞানযোগ প্রাপ্তি অসম্ভব। অতএব কর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রথমতঃ কর্ম্মযোগ অভ্যাস করিতে যত্নবান হইতে হইবে।"

মনীশ স্থিরচিত্তে কথাগুলি শুনিতে লাগিল। তাহার তরুণ জীবনের উপরে এই প্রবীণ জীবনের যে একটি মৃদু গম্ভীর হিল্লোল আসিয়া তাহার অস্ফুট চেতনাকে সর্ব্বদা হিল্লোলিত করিতেছিল, আজিকার এই বাণী কয়টিও তাহার মধ্যে একটি স্পন্দন না তুলিয়া অমনিই মিলাইয়া গেল না। কর্ম্ম, উপাসনা, জ্ঞান, জ্ঞান, উপাসনা, কর্ম্ম এই ধ্বনি ওতপ্রোতভাবে গমকে গমকে যেন তাহার বক্ষ-শোণিতের

তালে উঠিয়া পড়িয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া নাচিতে লাগিল।

সেইদিন বাহিরের লোকেরা বিদায় লইলে উমাকান্ত কহিলেন "এসো মনীশ আজ একবার দুর্গা দর্শন করে আসা যাক্। মাতৃ দর্শনের জন্য মন আজ শিশুর মতই উৎসুক হয়েছে।" মনীশ উঠিয়া দাঁড়াইবার পূর্ব্বেই কমলার পিতামহীকে সঙ্গে করিয়া তাহার খুড়িমা গৃহে প্রবেশ করিলেন। উমাকান্ত প্রণতা নারী দুই জনকে আশীর্ব্বাদ করিয়া করুণাময়ীর অশ্রুস্ফীত নেত্রের প্রতি দৃষ্টি করিতেই তিনি কহিলেন "ইনি আমার সইমা।" এই বলিয়া বৃদ্ধার কাহিনী তাঁহার নিকট হইতে যাহা শুনিয়াছিলেন সংক্ষেপে কহিয়া গেলেন। বৃদ্ধা কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিলেন, "বাবা বড় কষ্ট পেয়েছি বাবা, এখন তুমি আমায় আশীর্ব্বাদ করো যেন মেয়েটিকে একটি ভাল পাত্তরের হাতে দিয়ে আমি শীগ্‌গির মরতে পারি। শিব আমি হবোনা তা জানি ; সাত জন্মের মহা পাতকী আমি, রাস্তায় ঘাটে একটা নোড়ানুড়ি হয়ে পড়ে থাকি সে-ও আমার ভাল। বলো যেন মনিষ্যি জন্ম আর পাইনে।"

সার্ব্বভৌম মহাশয় নত হইয়া বৃদ্ধার মস্তক স্পর্শ করিয়া সুগভীর সহানুভূতির সহিত কহিলেন, "আহা মা বড় কষ্ট পেয়েছ! ভয় কি মা, বিশ্বনাথের শরণাপন্ন হও, দেহান্তে মুক্তি পর্য্যন্ত লাভ করতে পারবে। হয়ত এই জন্মে জন্মজন্মান্তরের সমুদয় ভোগ কেটে গেল।"

এ সান্ত্বনার মত এত বড় সান্ত্বনা বুঝি আর জগতে দ্বিতীয় কিছু নাই। কতক বুঝিয়া কতক না বুঝিয়া কি যেন একটা গভীর ভাবাবেশে সংসার তাপদগ্ধ বৃদ্ধার দুই জ্যোতিহীন চক্ষু দিয়া প্রবল বেগে অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। পাগলের মত দুই হাতে পুনঃপুনঃ তাঁহার পদধূলি মাথায় লইতে লইতে তিনি ব্যাকুলভাবে বলিতে লাগিলেন "তাই বলো বাবা তাই বলো।"

উমাকান্ত পুনশ্চ তাঁহার মাথায় পিঠে সান্ত্বনার হস্ত বুলাইয়া কহিলেন "ভাল হবে মা, দয়াময়কে ডাক তিনি তোমার সকল দুঃখ মোচন করবেন। একটী মেয়ে আছে না ?"

"না বাবা একটি নাত্‌নী আছে, মনীশ তুই একবার সরে যাতো, এসো মা তুমি এসো।" করুণাময়ীর আহ্বানে দ্বারান্তরালবর্ত্তিনী কমলা আসিয়া প্রথমে ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে পরে অপর দুইজনকে প্রণাম করিয়া নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। উমাকান্ত তাহার সঙ্কোচকুণ্ঠিত মুখের উপর দৃষ্টি করিয়া আশ্চর্য্যে করুণাময়ীর প্রতি চাহিলেন, কহিলেন "দুর্গাপ্রতিমা মন্দির থেকে তুলে এনেছ নাকি ? আমি যে এক্ষণি মাকে দেখতে যাচ্ছিলাম। এমন লক্ষ্মীশ্রীযুক্ত মেয়ে তো দেখা যায় না।" গাঢ় রক্তবর্ণে কমলার যুগল গণ্ড রঞ্জিত হইয়া উঠিল।

কমলাকে পাইয়া করুণাময়ীও বড় সুখী হইলেন। নিজের পেটের মেয়ে নাই, এত বয়সে এখনও বধূর মুখ দেখা ভাগ্যে ঘটিল না, এই কুড়ানো মেয়েটি যেন তাঁহার দুহিতৃ-স্নেহের সমুদয় স্থান অধিকার করিয়া লইল। নিজের হাতের বালা দুই গাছি তাহার সুগোল দুখানি হাতে পরাইয়া একখানি ধোয়া কালা-পাড় সাড়ি পরিতে দিয়া অতৃপ্ত নেত্রে সেই অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানির পানে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ তাঁহার মনের মধ্যে

একটি অতর্কিত সাধ জাগরিত হইয়া উঠিল।

দ্বিপ্রহরে সেদিন বেড়াইতে বাহির না হইয়া কমলার পিতামহীকে লইয়া গৃহিণী তাঁহার দ্বিতল শয়নকক্ষের মেজের উপর মাদুর পাড়িয়া বসিয়া তাঁহার গল্প শুনিতে ছিলেন। বৃদ্ধা নিজের জীবনের সুখ দুঃখের কাহিনী সকরুণ বিলাপের মূর্চ্ছনায় গাহিয়া চলিয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে উভয়েই আঁচল প্রান্ত তুলিয়া নেত্র মার্জ্জনা করিতেছিলেন। কমলা নিকটে চুপ করিয়া বসিয়া জাঁতি লইয়া সুপারি কাটিতেছিল। এমন সময় বাহিরে জুতার শব্দ হইতেই বৃদ্ধা তাঁহার অনর্গল বকুনি থামাইয়া কহিলেন "বাবু আসবেন বুঝি? মা তুমি যাও, হয়তো তাঁর কিছু দরকার আছে। আমাদের নিয়ে যে সমস্তক্ষণই রইলে।"

জুতার শব্দ চিনিয়া গৃহকর্ত্রী কহিলেন "না ও সত্য।" এই সময় সত্যও বাহির হইতে ডাকিয়া বলিল "মা খাবার জল তো কুঁজোয় নেই কোথায় আছে?"

গৃহিণী কহিলেন "কুঁজোয় বুঝি জল আজ রাখেনি? কলসী ভাঁড়ার ঘরে আছে দাঁড়া জল বার করে দিচ্চি। কমল যাও তো মা সতিকে একগ্লাস জল দাও তো"। কমলার বয়সী মেয়ের পক্ষে পরঘরকে এত শীঘ্র আপন করিয়া লওয়া তেমন সহজ নহে বলিয়াই তাহার প্রতি আত্মীয়ভাব বেশী করিয়া প্রকাশ করিবার জন্যই তিনি এই আদেশটা করিলেন। কিন্তু কমলা তাঁহার আদেশ পালন করিতে আসিয়া একটু বিপদগ্রস্ত হইল। সতি বলিয়া যাহার পরিচয় প্রদান করিলেন, প্রথমতঃ তাহাকে বালক, কিশোর, অথবা তরুণ যুবক, ইহার কোন আখ্যাটা দেওয়া যাইবে তাহাই সহজে বুঝিয়া উঠা যায় না। দ্বিতীয়তঃ সেই ব্যক্তি এমনি অকুণ্ঠিত আগ্রহে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছিল যে সেই সমালোচক দৃষ্টির দ্রষ্টব্য হইয়া এই লম্বা দালানটা পার হওয়া তাহার পক্ষে প্রায় অসাধ্য। বহুদিন হইতেই সে কারাবাসিনীর মত নিজেদের ক্ষুদ্র কুটিরগহ্বরে নিজেকে রুদ্ধ রাখিয়াছিল, ছোটবেলা অবধি সে কলিকাতায় মানুষ। সেখানে পল্লিগ্রামের ন্যায় পরস্পরের মধ্যে নিঃশঙ্ক নির্ভরতা ও মেলামেশা ছিল না। কমলা সেই আশৈশব অভিজ্ঞতার ফলেই সত্যের কুণ্ঠাহীন দৃষ্টিতে কুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার বর্ত্তমান অবস্থা একে স্বতঃই তাহার উপরে একখানা লজ্জার কালো চাদর ঢাকা দিয়া রাখিয়াছে, বিশেষতঃ ঠাকুরমার ভয় ভাবনা তাহার নিজের প্রতি এমনি একটা প্রবল ধিক্কার আনিয়াছিল ও মনটাকে এমনি সঙ্কুচিত করিয়া ফেলিয়াছিল যে যেন এতটুকু সূর্য্যের তাপও সে তাহার নিজের অঙ্গে সহিতে পারিত না।

কিন্তু কমলা যাহাকে দেখিয়া অতটা লজ্জিত হইল সে ব্যক্তি তাহার লজ্জা বিজড়িতভাবে একটুও সঙ্কোচ বোধ করিল না। বরং প্রশংসা-সূচকভাবে কিছুক্ষণ তাহাকে দৃষ্টিদ্বারা অনুসরণ করিয়া ঈষৎ বিস্ময়ে বলিয়া ফেলিল "তুমি কে? তোমায় তো কখন দেখিনি।"

কমলা ঈষৎ বিরক্তির সহিত প্রশ্নকারীর দিকে চাহিতেই তাহার কটিবেষ্টিত অসংযত বস্ত্র, ও কুঞ্চিত কেশতলে সম্পূর্ণ সরল একখানি বালকের মুখ দেখিয়া তাহার

দ্বিধাগ্রস্ত- চিত্তকে হঠাৎ শান্ত করিয়া আনিল। ঈষৎ নতনেত্রে সে "আমি কমলা" এই কথাটি বলিয়াই তাহার সম্মুখ দিয়া বারান্দা অতিক্রম করিয়া ভাণ্ডারের মধ্যে প্রবেশ করিল। এই কমলা নামটির দ্বারা যদিও আর কেহ কোন অপরিচিতকে পরিচিত জ্ঞান করিত না, কিন্তু সত্যেন্দ্রের নিকট ইহাপেক্ষা অধিক পরিচয়ের প্রয়োজন ছিল না। সে পুনঃপ্রত্যাগতা কমলার নিকট হইতে জলের গ্লাসটা গ্রহণ করিয়া সরলভাবেই নিজের বিস্ময় প্রকাশ করিল, কহিল "তুমিতো খুব সুন্দর! গৌরীর চেয়েও সুন্দর তুমি!"

বোধহয় এই বালকটির চিত্তে তাহার গৌরী নামধারিণী সখীটিই সৌন্দর্য্যের আদর্শ ছিল। এই সরল প্রশংসালাভে কমলা বিরক্ত হইবে কি হাসিবে স্থির করিতে না পারিয়া রঞ্জিত হইয়া উঠিল। "সতুঃ! এই তোমার শীঘ্র ফেরা? কার সঙ্গে গল্প হচ্ছে?"

এই বলিয়া দালানটার ঠিক শেষ প্রান্তের ঘর হইতে সত্যর দাদা উঠিয়া আসিল, সেই ঘরটা তাহারি। সেইখানে বসিয়া সে এতক্ষণ তাহার অনাবিষ্ট ভাইটিকে অঙ্ক কষাইতেছিল। সত্য তাহার নূতন বন্ধুটির সাক্ষাতে ভর্ৎসিত হওয়ায় ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়াছিল, ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া তীব্রস্বরে উত্তর করিল "যাচ্ছি গো যাচ্ছি"—।

ইতিমধ্যে কমলা ও মনীশ পরস্পরকে দেখিয়া চকিতের মধ্যেই সরিয়া গিয়াছিল। মনীশ সত্যকে ঘরে আনিয়া নূতন অঙ্ক দিলে সে সবেগে পেন্সিল লইয়া লিখিতে আরম্ভ করিল। নিগূঢ় অভিমানে সে দাদার দিকে চাহিয়াও দেখিল না। যেখানে তাহার চিত্তাকর্ষণ করিবার মত কিছু আছে সেইখান হইতেই দাদা তাহাকে টানিয়া আনিবে!

মনীশ তাহার রাগ বুঝিয়া ঈষৎ হাসিল, তাহার ঘর্ম্মসিক্ত চুলগুলা ললাটের উপর হইতে সরাইয়া দিতে দিতে মৃদুস্বরে একটুখানি বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিল "ও মেয়েটি কে রে?"

ক্রুদ্ধ সতু দাদার স্পর্শ হইতে মস্তক একটুখানি সরাইয়া লইয়া খাতার উপর দুই চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কহিল "ও কমলা।"

মনীশ একটু চুপ করিয়া রহিল, জগতে যত কিছু মনশ্চাঞ্চল্যকর বস্তু আছে রূপই তাহাদের মধ্যে প্রধান। দর্শনেন্দ্রিয়ই সেইজন্য সব চেয়ে বালাই। আবার সে যাহা কিছু দেখে চুপ করিয়া সেইটুকুকেই সে ধ্যান করিতে পারে না, মন ও বুদ্ধির সহিত মিলাইয়া তাহাকে ভাল করিয়া যতক্ষণ সে বিশ্লেষ না করিতে পারে ততক্ষণ যেন তাহার দেখার সুখই অপূর্ণ থাকে। এইরূপ সম্যক দর্শনের চেষ্টা না থাকিলে বিজ্ঞানের নবতর আবিষ্কার সকল চির অনাবিষ্কৃত থাকিয়া যাইত।

জগতে যে এতবড় একটা সৌন্দর্য্য দেহধারী মানবের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া নেত্রপথে উপস্থিত হইতে পারে এরকম একটা সম্ভাবনাও কোন দিন তাহার মনের কোণেও স্থান পায় নাই। বিদ্যুতের মতই সে তাহার ক্ষণবিকাশের কৌতূহল তাহার স্থিরচিত্তে ক্ষণিকের জন্যই জাগাইয়া দিয়া গিয়াছিল। তাই সে পুনশ্চ প্রশ্ন করিল "কমলা কে?"

"আমি কি জানি" বলিয়া সত্য অঙ্কের

খাতার উপর গভীর মনোযোগ প্রদান করিল।

(১৮)

জলের মধ্যে ভাসমান ব্যক্তি যতক্ষণ ঢেউএর সহিত যুদ্ধ করিয়া চলে, ততক্ষণ প্রাণপণ বলে সে নিজের সমুদয় শক্তিকে জাগরিত রাখিবার চেষ্টা করে, কিন্তু যেই মাত্র তরঙ্গের আঘাত তাহাকে তটশায়ী করিল অমনি সেই তরঙ্গের মতনই সে আপনার সমস্ত সেই তটমূলে নিঃশেষ করিয়া দিয়া একেবারে ভাঙ্গিয়া যায়! কমলাকে করুণাময়ীর করুণ বাহুযুগলের আশ্রয়ে বাঁধিয়া দিয়া কমলার পিতামহী এমনিতর দারুণ নিশ্চিন্ত বোধ করিতে লাগিলেন।

এদেশের যতই অবনতি হউক, এ দেশীয় লোকের মনের ভিতর হইতে একটা প্রগাঢ় ধর্ম্মভাব এখনো ফুরাইয়া যাইতে পারে নাই। এই দরিদ্র দেশে বুভুক্ষুদের সংখ্যা অনেক কিন্তু দাতার সংখ্যা একেবারে কম নয়। তাই শুষ্ককণ্ঠ চাতক পক্ষীর ন্যায় উর্দ্ধমুখ পিপাসিতগণ কখনও বারিবিন্দু কখনও জলধারা প্রাপ্তে আনন্দ কোলাহলে বর্ষার জয়ধ্বনি করিয়া উঠে। কমলার পিতামহী করুণাময়ীর করুণায় যেন নিমগ্ন হইয়া পড়িলেন।

এই সময়ে শ্রীরামপুরের ঘোষাল পরিবারের একটি মেয়ের সহিত মনীশের বিবাহের কথাবার্ত্তা চলিতেছিল। মেয়েটি নাকি দেখিতে ভাল, এবং কন্যার পিতা খুব ধনবান। মেয়েদেখার জন্য সর্ব্বদা তাগিদ আসিতেছে, টাকাকড়ির ফর্দ্দ দিবারও অনুরোধ আসিয়াছিল। দেশে ফিরিয়া পাত্রী দেখিবেন এবং ভ্রাতুষ্পুত্রকে তিনি অর্থ বিনিময়ে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত নহেন, এই কথাই শিবনারায়ণ পাত্রীপক্ষকে জানাইয়া আপাততঃ তাহাদের নিরস্ত রাখিয়াছেন।

মনীশের খুড়িমা অনেকদিন হইতেই মনীশের বধূ ঘরে আনিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া আছেন, কেবল স্বামীর অনিচ্ছা জন্মিয়া সাধ মিটাইতে পারে নাই। তাঁহার ঘরে কন্যা ছিল না, কোনপ্রকার কুটুমকুটুম্বিতার সাধ তিনি মিটাইতে পারেন নাই। পাড়ার লোকের বধূ আসিলে সন্দেশ মোণ্ডা তাঁহার গৃহে উপঢৌকন আসিত, গ্রহণ করিতে তাঁহার নাসাপথে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস বহিয়া যাইত। তিনি যে কতদিনে বউ ঘরে তুলিয়া লোককে মিষ্ট মুখ করাইবেন সেই ইচ্ছায় আকুল হইয়া উঠিতেন। সেইজন্য তাঁহার মনে মনে বড়ই ইচ্ছা ছিল ধনীগৃহের কন্যা আনিয়া তিনি এইবার তত্ত্বতাবাস সাধ আহ্লাদ করিয়া মনের আক্ষোভ মিটাইবেন। কিন্তু যেদিন হইতে কমলা তাঁহার গৃহে আসিয়াছে সেই দিন হইতেই তাঁহার মনের ভিতরে একটা সুস্পষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটিয়া উঠিতেছিল। বিপরীত যুক্তি মনকে কেবলি বলিতেছিল 'বড় লোকের মেয়ে হয়ত 'দেমাকে' হইবে, না হয়ত বাপ সর্ব্বদা পাঠাইতে চাহিবে না, তাহার চেয়ে যদি এই এমনি একটি বধূ তাহার ঘরে আইসে তবে তাহাকে কখনও কাছ ছাড়াও করিতে হয় না অথচ খুব মনের মতও হয়। কারণ কমলা মেয়েটি অত্যন্ত সুন্দর এমন স্নিগ্ধোজ্জ্বললাবণ্য শ্রীটুকু বড় সহসা চোখে পড়ে না, শুধু রূপ নয় গুণের অংশও তাহাতে যথেষ্ট।" কিন্তু কথাটা তাঁহার উথাপন করিবার প্রয়োজন হইল না, স্বয়ং প্রজাপতিই একদিন,

ঘটকের বেশ ধরিয়া আবির্ভূত হইলেন। সার্ব্বভৌম মহাশয় নিজেই শিবনারায়ণের নিকট এ সম্বন্ধ তুলিলেন।

একদিন দ্বিপ্রহরে রৌদ্রের তেজ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বাতাস যেন অগ্নিশিখার ন্যায় লহরে লহরে অনল উদ্‌গার করিয়া ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে ছুটিতেছিল, পথের তপ্ত ধূলা অসহায় পথিকের উপরে অবিরল বাণ বর্ষণের মত বর্ষিত হইতেছিল, কাশীর রাজপথে আজকাল মধ্যাহ্নে বাহির হইবার উপায় নাই। করুণাময়ী নিজের শয়ন কক্ষে মেজের পাটির উপর শয়ন করিয়া গ্রীষ্মাতিশয্যে মধ্যে মধ্যে নিজের অঙ্গে হাতপাখার বাতাস দিতেছেন এমন সময় তাঁহার গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া মনীশ ডাকিল "খুড়িমা জেগে আছ?

"হাঁ। তুমি এসো বাবা, কেউ নেই" বলিয়া খুড়িমা গায়ে কাপড় টানিয়া দিলেন; মনীশ প্রবেশ করিয়া পাখাখানা তুলিয়া লইয়া বিছানার একপ্রান্তে বসিয়া কহিল "তুমি শোওনা খুড়িমা আমি তোমায় একটু বাতাস দিই,—ভারী গরম পড়েচে"।

খুড়িমা দেখিলেন সে কিছু বলিতে আসিয়াছে, কিন্তু মুখে লজ্জার আভাষ। সস্নেহে কহিলেন "কি বল্‌বি?"

"আমি যেন তোমায় কিছু বলতেই আসি?" "মনীশের কর্ণমূল লাল হইয়া উঠিল। খুড়িমা মনে মনে একটু হাসিলেন, কহিলেন "বেশ তো তুই না হয় কিছু বলতে আসিস্‌নে আমিই তোকে একটা কথা বল্‌বো ভাবচি।"

"কি?" "কমলার ঠাকুমার অসুখ খুব শক্ত; বাঁচবার আশা নেই"—মনীশের মুখ একটু খানি ম্লান হইয়া আসিল, সে মৃদুস্বরে কহিল "শুনেচি"।

খুড়িমা তাহার মুখের উপরে দৃষ্টি করিয়া কহিলেন "মেয়েটি এখন আমাদেরি উপর পড়্‌লো। বড় মেয়ে বেশিদিন আর রাখা যায় না, তুমি ওর জন্য একটি পাত্র সন্ধান করে দাও, এর পর হিন্দু ঘরে বিয়ে হওয়াই দায় হবে।"

মনীশ একটু হাসিয়া কহিল "এখনি দায় হয়েছে। সেই কথাই বলতে এসেছি। আমার একটি আইবড় বন্ধুর কথা মনে হওয়ায় আমি কয়দিন পূর্ব্বে তাঁকে সবকথা লিখেছিলাম, তাতে"—মনীশ একটু ইতস্তত করিল, 'সে লিখচে পনেরো বছরের মেয়ে বিয়ে করে সে সমাজে ঠ্যালা হতে পারবে না।'

করুণাময়ী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন, কহিলেন "তা আমি জানি, সহজে কেউ অত বড় মেয়ে ঘরে নিতে চাইবেনা।' মনীশ উঠিয়া গেল। কমলারা এদিকে থাকে বলিয়া সে সাধ্যমত অন্তঃপুরের সীমানায় পা দেয় না। কিন্তু সে যে এই অনাথা মেয়েটির জন্য কিছু করিতে পারিল না তাহাতে সে দুঃখিত হইল। সেইদিন উমাকান্ত মনীশকে ডাকিয়া অনেক গুলি উপদেশ দান করিলেন, কহিলেন,'একদিন তুমি আমাকে যে প্রশ্ন করেছিলে আজ আমি তোমার সেই প্রশ্নের উত্তর দিতেছি। চিরকুমার ব্রত বড় কঠিন ব্রত, বোধ হয় সংসারে ইহাপেক্ষা অন্য কোন কঠিন ব্রতই নাই। আমার বিবেচনায় চির-কৌমার ব্রত পালন করবার যোগ্য নর বা নারী পৃথিবীতে এপর্য্যন্ত কম পরিমাণেই জন্মগ্রহণ করেছে। ব্রত গ্রহণ করে তাহা কায়মনে যদি না

পালন করা হয় তবে ব্রতাবলম্বীর পাপের সীমা থাকে না। তুমি যদি নিজেকে এই ব্রত গ্রহণের যথার্থ যোগ্য পাত্র বলে বুঝে থাক তবে কিছুদিন ধরে নিজের মনের উপরে বিবিধপ্রকার পরীক্ষা নিয়ে সেই বিশ্বাসকে যাচাই করো। কেন না মানুষ সকল সময় নিজেকে ঠিক না বুঝেই নিজের সম্বন্ধে স্থির করে বসে, সেরূপ ভ্রম বাঞ্ছনীয় নয়।

যদি আমার মত জান্‌তে চাও তবে আমার বোধ হয় বিবাহই তোমার পক্ষে ভাল। তোমায় আমি দুর্ব্বলচিত্ত বলছি এমন মনে করো না। কিন্তু যেমন মূর্ত্তি উপাসনা দ্বারা সাধক উচ্চ অধিকারেই প্রবেশ করবার বল সংগ্রহ করে তেমনই গৃহধর্ম্ম পালন দ্বারা সাধারণতঃ মানবচিত্ত ধর্ম্ম সাধনেরই উপযোগী হয়ে উঠে। কৌমার ধর্ম্ম সাধারণের জন্য নয় এ ব্রত বিশেষ ব্যক্তির জন্য।"

মনীশ মুখ নত করিয়া রহিল। উমাকান্ত কহিতে লাগিলেন "বিবাহসংস্কার মানবজীবনের পক্ষে সামান্য নয়। বিবাহ করা না করা মানুষের ঠিক নিজের হাত নয়। ব্রহ্ম নিজেকে দুই অংশে বিভক্ত করে ভোক্তা ও ভোগ্য—পুরুষ ও প্রকৃতিরূপে বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। সেই জন্যই জগতের প্রতি অণু পরমাণুটি পর্য্যন্ত মিলনাত্মক। তাপ সংযোগে বিযুক্ত অণুসকল তাপমুক্ত হবামাত্রেই তাদের স্বজাতীয় অণুর সঙ্গে সংমিলিত হবার জন্য চেষ্টা করতে থাকে। প্রকৃত এক ভিন্ন দুই না থাকাতে এক হতেই দুই অংশে বিভক্ত একই নিজ অর্দ্ধের সঙ্গে মিলিত হয়ে পুনর্ব্বার একাত্ম হবার জন্য সেই বিয়োগকাল হতেই ব্যাকুল থাকে। যতদিন না সেই মিলন সাধিত হয় এক মানবাত্মার জন্য অপর মানবাত্মার আকুলতার সমাপ্তি ঘটে না।"

মনীশ চুপ করিয়া রহিল। তাহার অধ্যাপক তাহাকে আজ যেন নূতন লোকের এক অভিনব সমাচার প্রদান করিতেছিলেন। তাঁহার কথাগুলি তাহার বিস্মৃত যৌবনের মৃদুস্বরে বসন্ত পবনের হিল্লোল বহাইতেছিল, ব্রহ্মচারীর গৈরিক বসনের উপরে একখানি স্বর্ণসূত্রে গঠিত নীল উত্তরীয়ের প্রান্ত সেই মিঠা বাতাসে ঈষৎমাত্র কম্পিত হইয়া উঠিয়াছে; জগতের এই আদিরসের কথা সে নতনেত্রে ভাবিতে লাগিল। একটি মানবাত্মা অপর একটি মানবাত্মার জন্য গোপনে পীড়িত হইতেছে, জন্মের পর জন্ম নিঃশব্দে নিজের ও অজ্ঞাতে একটি ব্যথাভরা চিত্ত অপর একটি বেদনাকাতর চিত্তের অনুসরণ করিয়া ঋতধ্বজ বা পুণ্ডরীকের ন্যায় ফিরিতেছে। বড় সুন্দর মনে হইল।

অপরাহ্নে সে দিন একখানি ইংরেজি ঐতিহাসিক উপন্যাস খুলিয়া সে নিজের ঘরের জানালার সম্মুখে চেয়ারে আসিয়া বসিল। মনের ভিতরে যৌবননিকুঞ্জমধ্যবর্ত্তী যে কলকণ্ঠ অচেনা পাখীটা কুজন চেষ্টা করিতেছিল তাহারি প্ররোচনায় সে এই বইখানি খুলিয়াছিল, কিন্তু সংস্কার বা অভ্যাস যতটুকু সম্ভব গম্ভীর ভাবেরই কলা-উপাদান মনকে যোগান দিয়াছে।

ইতিমধ্যে বাড়ির ভিতরে কখন কি ঘটিয়া গিয়াছে তাহা কেই বা জানে; কিন্তু সকলকার ধরণ ধারণ হইতে কোন একটি বিশেষ ঘটনার সংবাদ পাওয়া যাইতেছিল। খুড়িমা যেন প্রতিদিনকার চেয়ে হাসিমুখ, শিব-

নারায়ণ কথাচ্ছলে দয়াধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন, শক্তি থাকিতে দয়ার পাত্রকে দুঃখে ফেলিয়া রাখিতে নাই, অধর্ম্ম স্পর্শ করে—ইত্যাদি। এ সকল উপদেশের মধ্যে কি কোন ইঙ্গিত ছিল না? মনীশের মনে একটা সন্দেহের ভার চাপিয়াছিল, তাঁহারা তাহার নিকট আজ কি চাহিতেছেন! স্পষ্ট করিয়া কেন বলিলেন না? কিন্তু সে বিশ্বাস করিবার মানুষ, সন্দেহ করা তাহার স্বভাব নয়, একটু পরেই মনকে বুঝাইল, বলিবার কিছু থাকিলে ঘুরাইয়া বলিবেন কেন? অমনই তো আদেশ করিতে পারিতেন।

মনীশ উপন্যাস খুব কম পড়িয়াছে তাই ইহার মধ্যে একটা নূতন স্বাদ পাইতেছিল। মনটা খুব নিবিষ্ট, কম্পিত নরনারীর দীর্ঘশ্বাসে বুক ভরিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস উঠিতেছিল, তাহাদের ক্বচিৎ সুখের সূচনা তাহার সহানুভূতিপূর্ণ চিত্ত স্পর্শ করিয়া ওষ্ঠপ্রান্তে আনন্দের হাস্য ঈষৎ চকিত করিতেছিল। উপন্যাস জগতের ঘটনাপূর্ণ জটিল চক্রের মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে পাঠকের চিত্ত বাস্তব জগতের একঘেয়ে গণ্ডী হইতে চরণ ছাড়াইয়া কল্পনা রাজ্যে ছুটিয়া চলিয়াছিল।

বাহিরের দালানে দাঁড়াইয়া সত্যকে ডাকিয়া কমলা কহিল:"তোমার চিঠি আমায় দেখালে না?" পকেট জামার সম্বন্ধ বহুদিনই ত্যাগ করিয়া গিয়াছে তাই সেই প্রদর্শনের বস্তুটাকে তাহার কোঁচার খুঁটে বাঁধিতে হইয়াছিল, ইহা দেখাইবার জন্যই সে এতক্ষণ ছটফট করিয়া বেড়াইতেছিল, কারণ এই প্রকাণ্ড পৃথিবীটার বিশাল ডাকের বন্দোবস্তের ভিতরে, এই একখানি মাত্র পত্র সে তাহার এতদিনকার পরিচিত জগতের ভিতরে পিয়নের ব্যাগ হইতে আজ লাভ করিয়াছে। বিনাড়ম্বরে সে পত্রখানি কমলার হস্তে প্রদান করিল। পত্রখানি গৌরীর লেখার সৌন্দর্য্যে ও রচনাগৌরবে প্রায় অপাঠ্য। মোটামোটি তাহাতে কথাটা এই যে, তাহার মেনির দুইটি বাচ্ছা হইয়াছে, একটি কালোয় সাদায় ছাপওয়ালা, এবং একটির রং সাদা। তাহারা কবে আসিবে, সে যেন শীঘ্র ফিরিয়া যায় নইলে গৌরী বড় রাগ করিবে, কাঁদিবে, তাহার সঙ্গে আড়ি করিবে, আর তাহার দাদুমণিকে যেন ফিরাইয়া লইয়া যায়, নইলে ভারি ঝগড়া হইবে ইত্যাদি। কমলার সহিত এই কয়মাসেই সত্যর একটা প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। সে এই শাসকমণ্ডলী পরিবৃত বন্ধুহীন দেশে এই স্নিগ্ধ লাবণ্য-জ্যোতিতে ভরা সমবয়সীটিকে পাইয়া যেন বর্ত্তাইয়া গিয়াছিল। মেয়েটির মধ্যে একটা সুদূরব্যবধানকারী মৌন গাম্ভীর্য্যের ভাব থাকিলেও একটি আকর্ষণজনক মধুরতারও অভাব ছিল না। তাহার দুটি চোখের দৃষ্টি হইতে যেমনি মৌন বিষণ্ণতাটুকু ঝরিয়া পড়িত, অপরাধক্ষমাসকরুণ হাসিটুকুরও তেমনি প্রাচুর্য্য ছিল।

পত্র পড়িয়া কমলা হাসিয়া কহিল, "গৌরীকে আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করচে, সে যেন তোমার কনের মতন চিঠি লিখেচে।"

কাহারও 'কনে' কাহাকেও চিঠি লেখে কিনা এবং সে চিঠি কি ছাঁদে লিখিত হয় সত্যর তাহা সবিশেষ জানা ছিল না, সে 'কনের' অর্থ আর একটু বড় করিয়া ধরিল,

ভ্রূশুদ্ধ দুই চোখ টানিয়া কহিয়া উঠিল "তুমি বুঝি দাদাকে ওমনি চিঠি লেখ? তুমিতো দাদার কনে!—"

"আঃ সত্য, ছিঃ—"কমলা লাল হইয়া উঠিয়া সবেগে বাধা দিল। সত্য তাহার লজ্জায় অধিক আনন্দিত হইয়া কহিল "মা বলেছেন দাদার তুমি বউ হবে, আমি আজ থেকে তোমায় বৌদিদি বলে ডাকবো, দেখো সত্যি কিনা।"

কমলা লজ্জারক্ত মুখে পাশের দ্বারটা ঠেলিয়া আপনাকে আততায়ীর দৃষ্টি হইতে লুকাইয়া ফেলিতে দ্রুতপদে ভিতরে চলিয়া গেল।

তখন আকাশে বর্ণের পর বর্ণ ফুটিয়া উঠিয়া চঞ্চলগতি নর্ত্তকীর লীলাচঞ্চল বিচিত্র অঞ্চলের সঙ্কুঞ্চন প্রসারণের মত শ্বেত লোহিত নীল, পীত, একটার পর আর একটা স্তরে স্তরে গাঢ় নীলের উপরে সঞ্চালিত হইতেছিল। কোথাও সুদূর উন্নত বৃক্ষশীর্ষ সূর্য্যাস্তের লাল আভায় আগুন লাগার মত জ্বলিতেছিল, কোথাও মরকতমণিপ্রভ রক্ত পাটলে ও বৈদূর্য্য মণিপ্রভ নীলাগ্নিজাল দেখিতে দেখিতে বিশুদ্ধ নীলায় পরিবর্ত্তিত হইতেছিল। অলক্ষ্যে মানবজীবনেও এমনি বর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিতেছিল কিনা তাহার কোন সজীব সাক্ষী ছিল না। দিনান্তকালের বিস্ময় সঞ্চারিণী প্রকৃতি নিজে গোধূলির রাজবাতি দুই হস্তে জ্বালাইয়া সেই বাতায়নতলে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া সবই দেখিতেছিলেন। কমলা সত্যের দত্ত লজ্জা এবং এই অতর্কিত সংবাদের গভীর বিস্ময়ের হাত এড়াইবার জন্য আচমকা যে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল সে গৃহ মনীশের। দ্বারের শিকল নড়িতেই মনীশ বইএর পাতা হইতে চোখ তুলিয়া দেখিল তাহারি নির্জ্জন ঘরের মধ্যে কাব্যের সেই অপূর্ব্ব প্রতিমা লজ্জাশ্রীমণ্ডিতা বালিকার বেশে দাঁড়াইয়া? সত্যেন্দ্রের শেষ কথাটা ইতিপূর্ব্বেই সে শুনিতে পাইয়াছিল, তাহার অজ্ঞাতে অকস্মাৎ তাহার দুই চোখের দৃষ্টি কোন্ সময় প্রীতিকোমল হইয়া আসিল তাহা সে জানিতেও পারিল না, এই মহিমাময়ী বালিকামূর্ত্তির আকস্মিক আবির্ভাব যেন কুমারী উষার প্রথম উদয়ে তাহার জীবনের আনন্দ প্রভাতের সূচনা করিয়া দিল, সে সম্ভ্রমপূর্ণ দৃষ্টি ভূমিলগ্ন করিল।

কমলা প্রথমে অপরব্যক্তির অবস্থিতি জানিতে পারে নাই, তাহার পর যখন সে সঙ্কোচজড়িত মনীশকে তাহার দৃষ্টির সম্মুখীন দেখিতে পাইল তখন লজ্জায় যেন মুহূর্ত্তে মরিয়া যাইতে চাহিল। কি নির্লজ্জই তিনি তাহাকে মনে করিলেন! এ লজ্জা ঢাকিবার স্থান বুঝি জগতে কোথাও নাই! সে কম্পিত দেহে চকিতে ফিরিতে গিয়া দ্বারে হোঁচোট্ লাগিয়া পতনোন্মুখ হইয়াও সামলাইয়া লইল!

মনীশ তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল, ততক্ষণে সে আকণ্ঠললাট রঞ্জিত হইয়া পলাইবার চেষ্টা করিতেছিল। মনীশ দুই পদ অগ্রসর হইয়া কহিল "আপনি ব্যস্ত হচ্চেন কেন, আমিই যাচ্চি—"

এই বলিয়া সে চাহিয়া দেখিল নারীমূর্ত্তি অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। কোন জ্ঞানী দার্শনিক সেখানে উপস্থিত থাকিলে হয় ত বলিতেন ইহা মায়ার বিকারমাত্র, ছলনাময়ী নারী মূর্ত্তিতে কিশোরকুমারের তপোবিঘ্নসাধন করিতে অকস্মাৎ সমুদ্ভূতা হইয়াছিল। কিন্তু

মনীশ এই আবির্ভাবকে আজ নিতান্ত অবহেলার চক্ষে দেখিতে পারিল না। উমাকান্তের আজিকারই একটি কথা তাহার মনে পড়িল। সুন্দর আমাদের অন্তরের জিনিষ তাই সব চেয়ে সৌন্দর্য্যই আমাদের চিত্তকে আকর্ষিত ও আনন্দিত করে। যে অন্ধ এই অসীম আকাশের উদার মহিমা, সমুদ্রের বিশাল সৌন্দর্য্য অথবা সতী রমণীর সপ্রেম-মুখের আনন্দবিকাশ নেত্র দ্বারা দেখিয়া ইহার মধ্যে ভগবানের স্থিতি গৌরব অনুভব করিতে পারে নাই, সে হতভাগ্য বৃথা এই বিরাট বিশ্বসাম্রাজ্যের প্রজা হইয়াছিল। তাহার সকল পূজাই ব্যর্থ!

মনীশ উপন্যাসস্বপ্নপূর্ণ বিক্ষিপ্ত চিত্ত সংযত করিয়া দ্বারের নিকট গিয়া একবার বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিল তারপর ফিরিয়া নিজের পরিত্যক্ত আসন গ্রহণ করিয়া কিছু ক্ষণ স্থির হইয়া রহিল। চোক দুইটা ঈষৎ মিলিত হইয়া আসিল বুকের ভিতরটা একটু খানি আলোড়িত হইয়া উঠিতেছিল কেদারার পৃষ্ঠে হেলিয়া পড়িয়া পরস্পরনিবদ্ধ করযুগলের উপর মস্তক রক্ষা করিয়া কি ভাবিতে লাগিল। মৃদু একটা নিশ্বাসের সহিত মনের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র ধ্বনি একটি অবিচ্ছিন্ন রাগিণীর মত বেহাগে ললিতে শ্রুতিমধুর স্বর ও ছন্দে বাজিয়া উঠিল "কমলা!" তাহার সমস্ত চিত্ত সহসা যেন নববসন্তাগমে তরুণ পত্ররাজিসম্পদ লাভে প্রফুল্ল উপবনের মত পুষ্প সুবাসে ও পাখীর গানে ভরিয়া উঠিল।

(১৯)

এক একজন মানুষ এমনি একটি অপরিসীম মন্দ ভাগ্য লইয়া সংসারে দেখা দেয় যে মানুষ শত চেষ্টা করিলেও তাহার ভাঙ্গা কপাল জোড়া লাগাইতে সক্ষম না হইয়া শেষে নিরুপায়ে দৈবকেই অভিশপ্ত করিয়া খেদ মিটাইতে বাধ্য হইয়া থাকে। কমলার পিতামহীর অনুরোধে এবং নিজের ইচ্ছাতেও উমাকান্ত শিবনারায়ণকে ডাকিয়া যেদিন কমলাকে মনীশের বধূরূপে নির্ব্বাচিতা করিয়া দিলেন সে দিনের সেই আনন্দসংবাদের পর আর কমলার ঠাকুরমা বাঁচিয়া থাকার কিছুমাত্র প্রয়োজন বোধ করিলেন না। কমলা ঔষধ সেবন করাইতে গেলে তাহার হাতখানি ধরিয়া কহিলেন "আর কেন দিদি, এবার আমায় যেতে দে। আর ত কোন দুঃখ মনে রইল না তবে এই বড় দুঃখ যে সোনার চাঁদকে আমার এই অন্ধ চোখের দৃষ্টি দিয়ে একবার জন্মের সাধ মিটিয়ে ভাল করে দেখতে পেলুম না।"

রোগ ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কবিরাজ আনাইবার প্রয়োজন হইল না, উমাকান্ত নিজেই কবিরাজী চিকিৎসায় যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন, কিন্তু তথাপি শেষের দিকে তাঁহারই আদেশে অপর একজন বিচক্ষণ বৃদ্ধ কবিরাজকে আনাইয়া বটিকা পাঁচন সেবন করান হইতে লাগিল। সস্ত্রীক শিব-নারায়ণ রাত জাগিয়া রোগীর সেবা করিতে লাগিলেন। যত্নের কোন ত্রুটিই হইল না।

সেদিন অষ্টমী তিথি এবং তাহার সহিত কোন্ একটা গুপ্ত গ্রহের যোগ হওয়ায় দেব-দেবীর মন্দিরে বিশেষ একটু সমারোহ হইবে। তাই ভোরের আলো না জাগিতে জাগিতেই গ্রামের পথ দিয়া অপর্য্যাপ্ত মল্লিকা কুঁড়ির আমদানি হইতেছিল।

মন্দিরের নহবতের করুণ সুরে সকাল বেলাকার নবীন রৌদ্র যেন একটা সতর্কতার প্রশান্ত ভক্তিভাবে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। করুণাময়ী স্নানের পর বিশ্বনাথ হইয়া আজ একবার দুর্গা দর্শন করিয়া আসিবেন এই সংকল্প লইয়া বাহির হইয়াছেন, কেননা আজিকার এই পুণ্য তিথিতে দেবীর ললাটে সিন্দূর প্রদান করিলে নিজের কপালের সিন্দূর অক্ষয় হয় এম্‌নি একটা কথা পাঁচজনের মুখে মুখে স্নানের ঘাটে শোনা গিয়াছে। কমলাকে রোগীর ঔষধ পথ্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ বুঝাইয়া দিয়া গেলেন।

বৃদ্ধা সেদিন অনেকটা সুস্থ বোধ করিতে ছিলেন। কমলা ধীরে ঠাকুরমার বিছানার পাশে ভূমে জানু পাতিয়া বসিয়া তাঁহার ললাটে হাত বুলাইতে লাগিল।

বৃদ্ধা তাহার স্পর্শে একবার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, নিজের শীর্ণ হস্ত উঠাইয়া তাহার সুকোমল হাতখানি ধরিয়া তাহাকে নিজের বুকের উপরে টানিয়া আনিয়া প্রাণপণ শক্তিতে চাপিয়া ধরিলেন। মুমূর্ষুর এই আদরে সহসা কমলার দুইচোখে জল ভরিয়া আসিল। শৈশবে পিতৃমাতৃ-হীনা কমলা জগতের মধ্যে একমাত্র স্নেহময়ী দুঃখিনী ঠাকুরমাকেই জানে। শুষ্ক বংশদণ্ড যেমন করিয়া নিজের বক্ষের পরে ক্ষুদ্র মাধবীলতাটিকে ধারণ করিয়া রাখে ঠাকুরমাই তাহাকে এতদিন অসীম দুঃখের মধ্যেও তেমনি করিয়া বুকে বাঁধিয়া রাখিয়া-ছিলেন। সে আশ্রয় আজ মৃত্যুর কঠোর হস্ত অধিকার করিতে প্রসারিত। বৃথা আশ্বাসে এতদিন ধরিয়া সে নিজের মনকে বুঝাইয়া রাখিয়াছিল—আর যেন সে পারে না, ক্রমেই আশার স্থলে নিদারুণ হতাশা জাগিয়া উঠিতেছে।

রোগীর রোগযন্ত্রণা কিছু কম থাকিলেও তাঁহার চোখ মুখের অবস্থা ভাল দেখাইতে ছিল না। কমলা নিজের অন্তরের বিষম ব্যাকুলতা সেই মুখের দিকে চাহিয়া কোন মতে চাপিয়া রাখিল।

জানালাগুলা খোলা আছে, আকাশের বিশাল ললাটে সোনার টীপের মত উজ্জ্বল সূর্য্য দেখা দিয়াছেন। গৃহমধ্যেও প্রভাতের রক্তাভ আলোক স্বর্ণবোনা চাদরের মত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। রাস্তার ওধারে বৃহৎ একটা কৃষ্ণচূড় গাছে ফুলের গন্ধগুলা সকালের বাতাসের সঙ্গে হাসাহাসি মাতামাতি করিতেছে। পাখীর গানে চারিদিক ভরিয়া উঠিয়াছে। কমলা উঠিয়া সজল চক্ষে জানালার বাহিরে উদার আকাশের দিকে শূন্য নেত্রে চাহিয়া রহিল, পাছে চোখ দিয়া জল বাহির হইয়া পড়ে সেই ভয়ে ঠাকুরমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতে সাহস হইতেছিল না। কে জানে কতক্ষণই বা জগতের এই একমাত্র আত্মীয়ের গভীর স্নেহে ভরা স্তিমিতপ্রায় দুইটি নেত্র সে আর দেখিতে পাইবে! হায়! এজগতে ঠাকুমা ভিন্ন আর যে কেহই তাহার নাই!

সারা প্রকৃতি তখন জাগিয়া উঠিতেছিল, বাহিরের বাতাস কাহার স্নিগ্ধকোমল নিশ্বাসের মত ধীরে ধীরে বহিয়া গেল। আকাশের রক্ততুলিকাপাতে সোনার জলের ছাপ গাঢ় হইয়া পড়িতে লাগিল। ঠাকুরমা ডাকিলেন "কমল!" কমলা ঠোঁটে ঠোঁটে

চাপিয়া দৃঢ়বলে আপনাকে ফিরাইয়া তাঁহার কাছে আসিয়া বসিল। তাহার নেত্রপল্লব নত হইয়া গণ্ড স্পর্শ করিতেছিল, বহু চেষ্টাতেও সে চোখ তুলিতে পারিল না!

"দিদি, তুমি অত কাতর হয়োনা, দুঃখ কি, মানুষ তো মরবার জন্যেই জন্মে থাকে! তোমায় যে আশ্রয়ে রেখে গেলুম, সেইখানে তোমার স্থান ধ্রুবতারার মত অচল করে নিয়ে সুখে থেকো, আর তোমায় কি বল্‌বো, আর কিছু বলবার নেই।"

কমলার আর সহিল না সে সহসা দুই হাতে মুখ আচ্ছাদন করিয়া অধীর হইয়া কাঁদিয়া উঠিল। "ঠাকুমা অমন কথা তুমি বলোনা, আমার কেউ নেই!—"

বলিতে বলিতে তাহার চারিধারের আলোক রেখার উপরে কে যেন একটা সূক্ষ্ম কালো পর্দা বিছাইয়া দিল। সে দেখিল সারা জগৎ যেন অন্ধকারে ঢাকিয়া গিয়াছে, সেই অন্ধকারে সে এতবড় একটা জগতের বক্ষে একেবারে একা! ভয়ে মুহূর্ত্তে তাহাকে যেন বজ্রস্তম্ভিত করিয়া ফেলিল, সে আর কাঁদিতেও পারিল না। বৃদ্ধার চোখেও আজ আবার দুই বিন্দু জল দেখা দিল স্বর ঈষৎ জড়াইয়া আসিয়াছিল, ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন

"দিদি দিদি কেঁদোনা, তোমার ভাবনা কি, যার হাতে তোমার দিয়ে যাচ্ছি, তুমিতো রাজরাণী—এই আশীর্ব্বাদ করি-----"

বলিতে বলিতে সহসা বাক্য থামিয়া গেল—কমলা চাহিয়া দেখিল কষ্টের চিহ্নটা মুখের উপরে বৈশাখী মেঘের মত অত্যন্ত দ্রুত বর্দ্ধিত হইতেছে। সে তড়িতাহতের মত যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখের উপর হইতে অকস্মাৎ দৃষ্টি ফিরাইয়া আবার ভয়বিস্ফারিতনেত্রে চাহিয়া আর্ত্তকণ্ঠে ডাকিল "ঠাকুমা!"

"দিদি-কমল?"

কমলার সর্ব্বশরীরের শোণিতচলাচল এক মুহূর্ত্তে স্তম্ভিত হইয়া গেল। মহাভয়ে আড়ষ্ট হইয়া থাকিয়া বহুক্ষণ পরে ঈষৎ সংজ্ঞা হইবার পর সে রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে ব্যাকুল হইয়া ডাকিল "মা!" আবার ডাকিল 'সত্য!" কেহ সাড়া দিল না। সম্মুখস্থিত বিশীর্ণ বিবর্ণ মুখ মুহুর্মুহু পরিবর্ত্তিত হইতেছিল, নিশ্বাসের জন্য রোগী যেন জলমগ্নের মত ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিলেন। কমলার শক্তিহীন কণ্ঠ আবার একবার কোন মতে উচ্চারণ করিল "ঠাকুমা!"

রোগী উত্তর দিল না, উত্তর দিবার শক্তিও আর ছিল না, কমলা ঊর্দ্ধ স্বরে কাঁদিয়া উঠিল।

ধীরে ধীরে এক ব্যক্তি গৃহে প্রবেশ করিল, শয্যার নিকট অগ্রসর হইয়া ঈষৎ বিজড়িত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল "কি হয়েছে?"

স্বর চিনিয়া কমলা মুখ তুলিতেই মনীশের আগ্রহব্যাকুল দৃষ্টির সহিত তাহার দৃষ্টি মিলিয়া গেল। সেই যৌবনশ্রীসম্পন্ন তরুণপুরুষের সান্নিধ্য আজ আর তাহার চেতনাকে সঙ্কুচিত মাত্র করিতে পারিতেছিল না, এতই সে উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। আর্ত্তকণ্ঠে সে কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল "দেখুন—দেখুন ঠাকুমা কি রকম কচ্চেন! কি হবে!"

মনীশ তৎক্ষণাৎ জড়িতভাব ত্যাগ করিল। কমলার পাশে আসিয়া নত হইয়া রোগিণীর ললাট ও নাড়ি স্পর্শ করিয়া মাথা তুলিয়া কহিল "ভয় কি? নাড়ি আছে! আমি

সার্ব্বভৌম মহাশয়কে ডেকে আনচি তুমি অত অস্থির হয়ো না।”

মনীশ দ্রুতপদে চলিয়া গেল এবং ক্ষণমাত্র পরে উমাকান্ত ও শিবনারায়ণ দুইজনকেই সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বহুক্ষণ ধরিয়া উভয় হস্তের নাড়ি পরীক্ষা করিয়া শিবনারায়ণের দিকে চাহিলেন। শিবনারায়ণ ও মনীশ ইঙ্গিত বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ লোক সংগ্রহের জন্য বাহিরে চলিয়া গেলেন। উমাকান্ত মাথার নিকটে বসিয়া পিপাসাশুষ্ক ওষ্ঠে গঙ্গাজল প্রদান করিতে লাগিলেন। কমলা নিঃশব্দে ঠাকুর-মার বুকের উপরে লুটাইয়া পড়িল। ভাষাহীন শব্দহীন নীরব হাহাকারে তাহার সমুদয় হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল।

নবীন সূর্য্য সহস্র তুলিকাপাতে জলে স্থলে আকাশের পুঞ্জ পুঞ্জ শুভ্র মেঘের অঙ্গে শত বর্ণ চিত্রিত করিয়া দিয়াছিলেন। অদূরে নগর সংকীর্ত্তন খোল করতালের সঙ্গে বিমান পূর্ণ করিয়া হরিনাম গাহিয়া চলিয়াছিল। কর্ম্মপূর্ণ ধরণীর কোলাহলনিশ্বাস গঙ্গাজলে জুড়াইয়া যাইতেছিল। ক্রমে প্রভাতের স্নিগ্ধ আলোকের উপরে দিবসের প্রখর কিরণ ব্যাপ্ত হইতে লাগিল—সূর্য্য দিগন্তের অনেকখানি উপরে উঠিয়া আসিলেন।

কমলার পিতামহী তাঁহার শীতল অবশ হস্তে কমলার উত্তপ্ত কম্পিতহস্ত দুইখানি প্রাণপণে তখনও ধরিয়া রাখিয়াছিলেন—শক্তি নাই তবু যেন ছাড়িবার ইচ্ছা করে না। অস্ফুট স্বরে কমলার পিতামহী কহিলেন “মা-গঙ্গা বাবা-বিশ্বনাথ সাক্ষী, পণ্ডিত মশাই তুমি নিজে সাক্ষী রইলে,—আমার কমলাকে আমি তোমার হাতে দিয়ে গেলুম। দাদা একবার মুখ ফুটে বলো তুমি তাকে গ্রহণ করেচ ?

উমাকান্ত মনীশের আনত মুখের দিকে দৃষ্টি করিলেন, মনীশ মৃদু অথচ পরিষ্কার স্বরে উচ্চারণ করিল—

“গ্রহণ করলেম।”

(ক্রমশঃ)

গোপন

আপন বুকের ধনে
কেহ নাহি রাখে দূরে,
যতনে তাহারে দেয়
রাখিয়া হৃদয়-পুরে।
শুক্তি রাখিয়াছে মুক্তা
রুদ্ধ করি বক্ষদ্বার,—
লুকা'য়ে রেখেছে সিন্ধু—
অমূল্য-রতন তার।

গোপনে রেখেছে সতী
পতিমূর্ত্তি হৃদে আঁকি,
নিভৃত হৃদয়ে ভক্ত
ইষ্টমন্ত্র দেছে রাখি'।
রেখেছে অমৃত মৃত্যু
হৃদয়ে গোপন করি',
গোপনে বিরাট বিশ্ব
রেখেছে প্রাণের হরি।

মেরায়া গ্রে ট্রেনিং কলেজ

ব্যায়াম ও ক্রীড়া

ইংলণ্ডের সমুদয় বিদ্যালয়ে শারীরিক ব্যায়াম ও ক্রীড়ার ব্যবস্থা আছে। শারীরিক মানসিক ও নৈতিক এই ত্রিবিধ শিক্ষা দ্বারাই যে সম্পূর্ণ শিক্ষা হইয়া থাকে তাহার অর্থ প্রত্যেক বৃটনবাসী বুঝেন এবং বুঝিয়াই ক্ষান্ত থাকেন না—তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে সম্যক্ চেষ্টা করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী হইতে কিণ্ডারগার্টেন শ্রেণীর শিশুরা পর্য্যন্ত কোন না কোনরূপ ব্যায়াম বা ক্রীড়া নিত্য নিয়মিতরূপে করিয়া থাকে। বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ নানাবিধ ক্রীড়া ও স্ফূর্ত্তিজনক ব্যায়ামের নিমিত্ত সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া কোন কোন স্থলে স্বয়ং উপস্থিত থাকেন। কেম্ব্রিজের ক্যাম নদীর এবং অক্সফোর্ডের আইসিল্ নদীর উপরে বিভিন্ন কলেজের বিভিন্ন চিহ্নশোভিত সুদৃশ্য নৌকাগুলি দর্শকের মন আকর্ষণ করে এবং বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে শারীরিক ব্যায়াম ও ক্রীড়া যে উপেক্ষার বিষয় নহে তাহা সম্যক উপলব্ধি করাইয়া দেয়। আজকাল ইংলণ্ডে সুইডিস্ ড্রিলের বিশেষ প্রচলন। কাউন্টি-কাউন্সিল স্কুল বা প্রাইভেট্ স্কুল সমূহে প্রায় সর্ব্বত্রই অন্ততঃ সপ্তাহে একদিন সুইডিস্ ড্রিল শিখাইবার নিমিত্ত শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত আছেন।

আমাদের মেরায়া গ্রে ট্রেনিং কলেজেও বিবিধ আমোদজনক খেলা ও ব্যায়ামের সুব্যবস্থা ছিল। কলেজসংলগ্ন টেনিসকোর্ট এবং প্রশস্ত ভূমিতে ছাত্রীরা টেনিস্, বাস্কেট বল, বাইসিকেল রেস্, ব্যাডমিণ্টন প্রভৃতি খেলিয়া থাকেন। হকি খেলিবার জন্য সুবিধা-মত ময়দান কলেজের সীমার মধ্যে না থাকায় ব্রগুস্ বেরী পার্কের সাধারণের হকি গ্রাউণ্ড সপ্তাহে দুইদিন বুধবারে ও শনিবারে খেলিবার নিমিত্ত লওয়া হইত এবং সেই নির্দ্দিষ্ট সময়ে কলেজের ছাত্রীগণের অধিকার-ভুক্ত হকি গ্রাউণ্ডে অপর কোন ছাত্রছাত্রীর আসা নিষেধ ছিল। কিন্তু কোন কোন সময়ে যখন কোন কলেজের ছাত্র বা ছাত্রী-গণ কর্ত্তৃক আমাদের ছাত্রীগণ হকি খেলিবার নিমিত্ত নিমন্ত্রিত হইতেন তখন সেই দল ব্রগুস্বেরী পার্কের গ্রাউণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। সে কি মহা সজ্জা! সেদিন ছাত্রীগণের সহিত কলেজের অধ্যক্ষ স্বয়ং ক্রীড়াভূমে উপস্থিত থাকিতেন এবং ক্রীড়ান্তে সমুদয় ছাত্রছাত্রী সহ কলেজে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক তাহাদিগের "চা" পানের ব্যবস্থা করিতেন। যাঁহারা খেলিতে আসিতেন, তাহাদের প্রত্যেককেই কলেজ ব্যাজ বা চিহ্ন ধারণ করিতে হইত নতুবা কাহারও ক্রীড়াভূমে অবতীর্ণ হওয়া দুষ্কর হইত। আম্পায়ার বা বিচারকগণেরও কোনরূপ চিহ্ন থাকা আবশ্যক। তাহাদের নিকট একটী করিয়া বাঁশী থাকে, যখন দুই দলে সীমাভূমির প্রান্তে হকির বল লইয়া ক্রমাগত কাড়াকাড়ি চলিতে থাকে তখন তিনি বাঁশী বাজাইলেই দুই দলের লোক যিনি যেখানে আছেন অমনি নিস্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া পড়েন এবং তিনি স্বয়ং সেস্থানে

আসিয়া বিচার পূর্ব্বক মীমাংসা করিয়া দেন। দর্শকগণ পর্য্যন্ত খেলোয়াড়দিগের উৎসাহে এরূপ উৎসাহিত ও উত্তেজিত হইয়া উঠেন যে সেস্থান করতালিতে ও শব্দে মুখরিত হইতে থাকে। আমরা ময়দানের পার্শ্বে মোটা ক্লোক পরিয়া দাঁড়াইয়া ঠাণ্ডায় কাঁপিতাম, আর যাঁহারা খেলিতেন তাঁহাদের রক্তবর্ণ গণ্ড বহিয়া স্বেদধারা বহিত। যেদিন যে দলের পরাজয় হইত সেদিন সেই লোহিতাভ মুখের উপর পরাজয়ের একটী ম্লান ছায়া পড়িত।

প্রত্যহ অপরাহ্ণ চারি ঘটিকার সময় টেনিস্ খেলিবার আয়োজন হইত। ক্রীড়া-সুনিপুণ-ছাত্রীগণ তাহাদের প্রথমার্দ্ধ সময় অনভিজ্ঞা ছাত্রীগণকে লইয়া খেলিবার পর শেষার্দ্ধ সময় সমকক্ষদের সহিত খেলিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেন। আমি ভারতীয় ছাত্রী সুতরাং হকি ষ্টীক্ গ্রহণের ভয়ে অনেক সময় লুকাইয়া থাকিতাম কিন্তু টেনিসের সময় আমার সহপাঠিকাগণ আমাকে খুঁজিয়া ঠিক বাহির করিতেন। যে সকল ছাত্রী হকি, বাস্কেটবল প্রভৃতি দৌড়াদৌড়ি খেলা হইতে বিরত থাকিতে ইচ্ছা করিতেন তাঁহাদিগকে ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিতে হইত এবং তাঁহাদিগকে সন্তরণ বা টেনিস্ খেলা প্রভৃতিতে নিয়মিত যোগদান করিতে হইত।

প্রতি বুধবার ১টার পরে কলেজ বন্ধ হইয়া যায় কিন্তু লাঞ্চের পর ২টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত প্রত্যেক ছাত্রী খেলিতে বাধ্য। এই দিন ২॥ হইতে ৫টা পর্য্যন্ত প্রিন্সিপালের গৃহদ্বার বন্ধুবান্ধবের অভ্যর্থনায় উন্মুক্ত—অর্থাৎ ইংরাজিতে যাহাকে বলে "At home" থাকিত। এই দিনে চারিজন ছাত্রী ও দুইজন অধ্যাপিকা প্রিন্সিপালের ভবনে নিমন্ত্রিত হইতেন। তাঁহার গৃহে খেলার আয়োজন থাকিত কিন্তু দৌড়'দৌড়ি ছুটাছুটীর খেলা নহে। তাঁহার বসিবার ঘরে "চা পানের" সহিত দাবা, ড্রাফ্‌ট্ অথবা ("পেসান্স গেম") ইত্যাদি খেলা হইত। এই সময়ে প্রিন্সিপাল ছাত্রীদের সহিত এরূপ ঘনিষ্ঠ ভাবে মেশেন যে তখন কলেজের উচ্চ পীঠসম্ভূত গাম্ভীর্য্যের বেষ্টনী সম্পূর্ণরূপে শিথিল হইয়া পড়ে। খেলা ও চা পানের পর তিনি প্রায় ছাত্রীদের সঙ্গে বিবিধ গল্প করেন ও অবশেষে ভ্রমণের গরম ক্লোকটী পরিধান পূর্ব্বক তাঁহাদের সহিত সান্ধ্য ভ্রমণে বহির্গত হন।

সন্তরণশিক্ষার নিমিত্ত ইংলণ্ডের স্থানে স্থানে সন্তরণাগার আছে তথায় স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাদের তত্ত্বাধীন ছাত্রছাত্রীগণের সন্তরণশিক্ষার নিমিত্ত সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া টিকিট ক্রয় করেন। টিকিটের দাম প্রত্যেক ছাত্রীকে এক আনা করিয়া দিতে হয়। এরূপ সন্তরণাগারে অবশ্য ইংলণ্ডের Seabath বা সমুদ্রস্নানের ন্যায় স্ত্রীপুরুষে একত্র সন্তরণ করিতে পান না। কাচ দিয়া ছাতটী ঢাকা একটী বৃহৎ চৌবাচ্ছায় ঈষৎ গরম জলপূর্ণ মোটা মোটা পাইপ সংলগ্ন রহিয়াছে এবং চৌবাচ্চার গাত্রের দেওয়ালে জলের গভীরতার পরিমাণ লিখিত আছে। সহজে যাহাতে কেহ গভীর জলে না পড়িয়া যায় তজ্জন্য এরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছে। বাস্তবিক ইহাকে

চৌবাচ্চা না বলিয়া একটী নাতিদীর্ঘ পুষ্করিণী বলিলেঅত্যুক্তি হয় না। অবতরণের সোপানের নিকট হইতে ইহার তলদেশ ক্রমশঃ ঢালু হইয়া যাওয়াতে অপর দিকে গভীর হইয়াছে। উহার তলদেশ শ্বেতবর্ণের চীনা মাটীতে নির্ম্মিত এজন্য গভীর জল হইলেও তলদেশ স্পষ্টরূপে দেখা যায়। এই চৌবাচ্চার পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক গুলি ঘর আছে তথায় সন্তরণকারী সন্তরণের পোষাক পরিধান পূর্ব্বক শুষ্ক বস্ত্র ও পাদুকা প্রভৃতি রাখিয়া যান্ এবং সন্তরণান্তে পুনরায় তথায় আসিয়া আলনার পরিষ্কার তোয়ালে এবং দেয়ালে সংলগ্ন আয়নার সাহায্যে বেশ সমাপন করিয়া বাহিরে আসেন। সন্তরণাগারের পার্শ্বেই একটী হোটেল আছে সুতরাং সেখানে ছাত্রীগণ কেক্ প্রভৃতি মিষ্টান্ন এবং গরম "চা" পান করিবার সুবিধা পান্। একদলের সন্তরণের পর অন্য বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ আসিতে আরম্ভ করেন তখন স্নানাগার ও চৌবাচ্চা তাঁহাদের ব্যবহারার্থে প্রস্তুত হইতে থাকে। সন্তরণশিক্ষয়িত্রী চৌবাচ্চার ধারে দাঁড়াইয়া হস্তপদ সঞ্চালন সম্বন্ধে শিক্ষা দেন্ এবং ৭।৮ বৎসরের বালিকা হইলে তাহার কটিদেশে একগাছি শক্ত দড়ি বাঁধিয়া সেই দড়ির অগ্রভাগ শিক্ষয়িত্রী স্বয়ং ধরিয়া থাকেন ও পাছে গভীর জলে যাইয়া না পড়ে তজ্জন্য সাবধানে তাহাকে চালাইয়া থাকেন।

সন্তরণের পোষাক সকলকেই পরিতে হয়। উহা ঘোর রক্তবর্ণ অথবা গাঢ় নীল বর্ণের একটী ঢিলা ইজারবডি এবং একটী রবারের টুপী। যাহারা সন্তরণে অপটু তাঁহাদের কটিদেশে একটী সোলার কটিবেষ্টনী (কর্কবেল্ট) থাকে। সন্তরণে পটু যাঁহারা তাঁহাদের নিমিত্ত বিবিধ ব্যায়াম আছে যেমন উচ্চ মই হইতে লাফাইয়া জলে পড়া, কয়েক মিনিট জলে ডুবিয়া থাকা ইত্যাদি। কোন কোন সময়ে একটী ৩।৪ বৎসরের শিশুর ন্যায় আকারের পুতুল হঠাৎ জলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক শিক্ষয়িত্রী শব্দ করিয়া উঠেন, অমনি সন্তরণপটু ছাত্রীগণ ছুটিয়া সেই জলমগ্ন পুতুলকে তুলিবার চেষ্টা করেন, অনেক সময় জলের মধ্যেই পাঁচ জনে মিলিয়া সেইটী লইয়া কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায় তৎপরে শিক্ষয়িত্রীর বংশীর রবে সকলেই ক্ষান্ত হন এবং তিনি বিচার করিয়া দেন সে জলমগ্ন পুতুলের উদ্ধারকর্ত্রী কে। এইরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ব্যায়ামক্রীড়ায় ছাত্রী-দিগের মধ্যে সংভাব না কমিয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় এবং পরস্পরের প্রতি ন্যায়বিচার করিবার ক্ষমতাও তাহাদের মধ্যে বিকাশ পাইতে থাকে।

সুইডিস্ ড্রিল ক্লাসেও ডাক্তারের সার্টি-ফিকেট লইতে হয়। এ খেলা প্রথমে বড় কঠিন বোধ হয়। কিন্তু পরে বেশ অভ্যস্ত হইয়া আসে। ইহাতে যে শরীরের প্রত্যেক মাংসপেশীর কিরূপ সুন্দর চালনা হয় তাহা যিনি না করিয়াছেন তাঁহাকে বুঝান কঠিন। সুইডিস্ ড্রিলের সহিত আমাদের ট্রেনিং কলেজে শরীরতত্ত্বসম্বন্ধীয় লেক্‌চার দেওয়া হইত এবং যে মাংসপেশীর চালনা যেরূপে আবশ্যক তাহা ছাত্রীদিগের দ্বারা করাইয়া দেখান হইত। সুইডিস্ জিম্‌নাষ্টিক ও ড্রিল শিক্ষার জন্য বিশেষ ভাবে "হলিডে কোর্স" (Holiday course) ইয়োরোপের কোন কোন স্থানে খোলা হয়। দেনমার্কের মিষ্টার

জাঙ্কার (Mr. Junker) গ্রীষ্মাবকাশের সময় বিদ্যালয়ের ইনস্পেকটার, শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী এবং ডাক্তার প্রভৃতির জন্য এইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ইনি স্বয়ং দেনমার্কবাসী এবং সুইডিস্ জিম্‌নাষ্টিক্ ও ড্রিলে সমধিক পারদর্শী। আমাদের কলেজের যে সকল ছাত্রী শারীরিক ব্যায়াম সম্বন্ধে বিশেষরূপে পারদর্শিনী হইতে ইচ্ছা করিতেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ জুন মাসে দেনমার্কে গিয়া মিষ্টার জাঙ্কারের শিষ্যা হইতেন। ফিরিয়া আসিয়া তাঁহারা এই শিক্ষার বহু প্রশংসা করিতেন।

শরীর, মন ও আত্মা লইয়া মানবজীবন সম্পূর্ণ। সুতরাং এই তিনটীর একত্র শিক্ষাই যে প্রকৃত শিক্ষা তাহা আমরা বুঝি কিন্তু বুঝিয়া নীরবে থাকিতে ভালবাসি। কলিকাতাস্থ ইউরোপীয় বিদ্যালয়গুলি ব্যতীত অন্যান্য বিদ্যালয়ে ব্যায়াম ও ক্রীড়ার উৎসাহ দেখিতে পাই না। আজ কাল গভর্ণমেণ্টের নিয়মে কোন কোন বালিকাবিদ্যালয়ে নিত্য নিয়মিত ব্যায়ামোদ্দেশে টেনিস্ বা ব্যাডমিণ্টন খেলার প্রচলন হইয়াছে বটে কিন্তু সে খেলা অনেকটা প্রাণহীন। যতদিন না আমাদের দেশের বালকবালিকা ও যুবকযুবতীর মধ্যে মনের প্রফুল্লতাউৎপাদক শারীরিক ব্যায়াম ক্রীড়ার সুব্যবস্থা হইবে ততদিন যে আমরা সুস্থ সবল বলিষ্ঠ জাতি হইতে পারিব না—ইহা বলা বাহুল্য মাত্র।

শ্রীমতী সরলাবালা মিত্র।

সনেট্

ফুটে ধীরে আধফোটা আধেক মুদিত
কবিতার কুঞ্জবনে সনেট্-প্রসূন ;
কচি কিশলয়'পরে শিশির সঞ্চিত,
ভাব-অলি ঘিরি' তারে করে গুণগুণ।
আধেক খুলিয়া গেছে কতগুলি দল,
আধেক লুকানো আছে গোপন হৃদয় ;
মরমে নিগূঢ় মধু করে টলমল,
সংযত রসের ধারা তবু চাপা রয়।

পাগল ভাবুক মন সৌরভে তাহার
ছুটি' আসি' সুধাটুকু লুটিবারে চায়,
বিরল মাধুরী হেরি' হ'য়ে মাতোয়ার
ভুলে' যায়—কোথা তার রস উথলায়!

সৌন্দর্য্যের অন্তরালে আছে তার হিয়া ;
যে পারে পশিতে তায় সে রহে ডুবিয়া!

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী

পিক ও বায়স

পিক কহে বায়সেরে "কেন ডাক আর,
তব রবে বিদ্ধ হয় শ্রবণ আমার।"

বায়স হাসিয়া কহে "কি বলিব হায়!
আমি ডাকি তাই লোকে আদরে তোমায়।"

শ্রীরত্নীণচন্দ্র হালদার।

শ্রীহর্ষ ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ

হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকাল ভারতেতিহাসের একটি উজ্জ্বল অধ্যায়। সাগরাম্বরা গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধঃপতনের পর যিনি দেশব্যাপী অরাজকতার স্থলে এক অপূর্ব্ব সাম্রাজ্যের ভিত্তিস্থাপন করিয়া তদুপরি অর্দ্ধশতাব্দকাল দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে রাজত্ব করিয়াছিলেন, যাঁহার রাজসভা বাণভট্ট প্রভৃতি কবি মহাকবিগণ কর্ত্তৃক পরিশোভিত হইয়া তৎকালে সরস্বতীর লীলানিকেতন বলিয়া বিবেচিত হইত, এবং যাঁহার সহিত সখ্যস্থাপন করিতে বিদেশীয় রাজণ্যবর্গ পর্য্যন্ত উৎসুক ছিলেন, সেই রত্নাবলীরচয়িতা প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীমৎ হর্ষবর্দ্ধনের নাম আমাদের সকলের নিকট বহুকাল হইতে পরিচিত হইলেও এতদিন এক ভাবে অপরিচিত ছিল। ভারতেতিহাসে হর্ষের নাম বড়ই একক। তিনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন, তাহাতে একমাত্র তিনি ব্যতীত আর কেহই ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন নাই, এবং একমাত্র বাণভট্টের শ্রীহর্ষচরিত ব্যতীত ভারতের কোন গ্রন্থেই ইহাদের কীর্ত্তিকথা লিপিবদ্ধ হয় নাই। বাণও তাঁহার পুস্তকে তদীয় আশ্রয়দাতার পূর্ব্বপুরুষগণের বিষয় অল্পই বলিয়াছেন এবং সে বর্ণনা হর্ষের পক্ষে যথেষ্ট হইলেও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের পক্ষে অতি সামান্য। এই থানেশ্বর রাজবংশ বহু অতীতে পুষ্যভূতি (১) নামক একজন কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়া, স্মরণাতীত কাল হইতে তথায় রাজত্ব করিতেছিলেন, এবং হর্ষবর্দ্ধনের পিতা প্রভাকরবর্দ্ধন একজন রাজ্যলোলুপ, যুদ্ধপ্রিয় নরপতি ছিলেন, ইহা ব্যতীত, এ সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ বাণের নিকটে আর অধিক কিছুই জানা যায় না। পুষ্যভূতি সম্বন্ধেও বাণ একরূপ নীরব এবং তাঁহার সূর্য্যভক্তিকেই একমাত্র বর্ণনীয় বিষয় স্থির করিয়া তৎসম্বন্ধেই যাহা কিছু বলিবার বলিয়াছেন। পূর্ব্বপুরুষ সম্বন্ধে ইহা অবশ্যই অতি সামান্য বর্ণনা, কিন্তু এতদিন পর্য্যন্ত আমাদিগকে ইহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইত। বাণ ব্যতীত চীন পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙও হর্ষ সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু পূর্ব্বপুরুষসম্বন্ধে তিনিও এই রাজকবির অনুরূপ! ফলতঃ বাণ বা হিউয়েন সাং কেহই আমাদিগকে হর্ষের পূর্ব্বপুরুষ সম্বন্ধে ইতিহাসের উপযোগী কোন তথ্যই প্রদান করেন না।

এ সম্বন্ধে এতদিন পর্য্যন্ত আমাদিগের জ্ঞান এইরূপ অল্পসীমাতেই আবদ্ধ ছিল সত্য, কিন্তু প্রত্নতত্ত্ববিদগণের ঐকান্তিক চেষ্টা এবং পরিশ্রমের ফলে আজকাল তাহা ঘুচিয়া

(১) 'শ্রীহর্ষচরিতে নামটি 'পুষ্পভূতি' এইরূপ আছে, কিন্তু পুষ্পভূতি কোনই সদর্থ প্রদান করে না। 'পুষ্যভূতি হইলে 'যাহার উপর পুষ্যা নক্ষত্র সন্তুষ্ট' এরূপ অর্থ করা যাইতে পারে। প্রাচীন কালে আষাঢ়ভূতি, সোমভূতি, ইন্দ্রভূতি প্রভৃতি নক্ষত্র বা গ্রহনামা পুরুষের অভাব ছিল না। তৎপরে দেবনাগরী হস্তাক্ষরে 'প' এবং য (प य) এই দুই অক্ষরের আকারগত পার্থক্য বড় সামান্য, সুতরাং একটির স্থলে আর একটির ভুলপাঠ কিছুমাত্র

গিয়াছে। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে যুক্ত প্রদেশস্থ আজিমগড় জেলার অন্তর্গত মধুবন নামক গ্রামের সন্নিহিত কোন একটি ভূখণ্ড আবাদকালে একখানি খোদিত তাম্রশাসন হলমুখে উত্থিত হয়। বহু পরীক্ষার পর ইহাকে মহারাজ হর্ষের অনুজ্ঞাক্রমে খোদিত একখানি তাম্রশাসন বলিয়া স্থিরীকৃত হইলে ডাক্তার বুলার ১৮৯২ সালের "এপিগ্রাফিকা ইণ্ডিকা" নামক মাসিক পত্রের প্রথম খণ্ডে তাহার একটি পাঠ প্রকাশ করেন, কিন্তু তাহাতে কিছু কিছু ভুল থাকায়, ডাক্তার কেলহর্ণ ১৯০২-০৩ সালের এপিগ্রাফিকা ইণ্ডিকার সপ্তম খণ্ডে তাম্রশাসনখানির প্রতিলিপি সহ আর একটি সংশোধিত পাঠ প্রকাশ করেন।

এই তাম্রশাসনখানি হইতেই আমরা হর্ষের ঊর্দ্ধতন পুরুষগণের যথার্থ পরিচয় প্রাপ্ত হই এবং ইহার তিন বৎসর পরে বাঁশখারা নামক স্থানে আর একখানি তাম্রশাসন পাওয়া যায়। এই তাম্রশাসন খানিও হর্ষ প্রদত্ত বলিয়া প্রমাণিত হয় এবং পূর্ব্বপুরুষগণ সম্বন্ধে প্রথম প্রাপ্ত তাম্রশাসনখানির যথার্থতা প্রতিপাদন করে। এই তাম্রশাসন দুইখানি এক্ষণে যথাক্রমে মধুবন এবং বাঁশখারা তাম্রশাসন নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। দুইখানি তাম্রশাসনই হর্ষের অনুজ্ঞাক্রমে খোদিত হয় এবং দুই খানিতেই হর্ষ ঊর্দ্ধতন চারি পুরুষের নাম এবং বিবরণ খোদিত করাইয়াছেন। কিন্তু বাঁশখারা তাম্রশাসনের বর্ণন মধুবনের বর্ণনের ন্যায় সম্পূর্ণ এবং বিশদ নহে, সুতরাং ঐতিহাসিক সরঞ্জাম হিসাবে মধুবনে প্রাপ্ত তাম্রশাসনের স্থান বাঁশখারা তাম্রশাসনের অপেক্ষা কিছু উচ্চে। বস্তুতঃ প্রত্নতত্ত্ববিদগণের অনুসন্ধিৎসার ফলে ভারতের নানা স্থান হইতে এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত তাম্রশাসন এবং খোদিত লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে মধুবনে প্রাপ্ত এই তাম্রশাসনের স্থান তন্মধ্যে অতি উচ্চে। কারণ হর্ষের পূর্ব্বপুরুষগণের সন্ধান পাওয়া ব্যতীত ইহার সাহায্যে আমরা ৭ম শতাব্দীর ভারতের অনেক নূতন তথ্য অবগত হইতে পারি। নিম্নে এই তাম্রশাসনখানির কিঞ্চিৎ বর্ণনা প্রদত্ত হইল।

হর্ষ একজন অপূর্ব্ব দানশীল নরপতি ছিলেন এবং তাঁহার দানশীলতা বিশ্বের ইতিহাসে এক অপূর্ব্ব ব্যাপার! এই তাম্রশাসনখানি মহারাজ হর্ষের অনুজ্ঞাক্রমে ২৫ সম্বতে (২) খোদিত হয়। একজন ব্রাহ্মণ একখানি জাল শাসনের জোরে সোমকুণ্ডক নামক একখানি গ্রাম অন্যায়পূর্ব্বক ভোগ করিতেছিল। মহারাজ হর্ষ এই তাম্রশাসনখানি দ্বারা সেই ব্রাহ্মণকে তাহার সেই অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া সামবেদী ও ঋগ্বেদী দুইজন পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে উক্ত গ্রাম খানি দান করেন। তাম্রশাসনখানি এক্ষণে লক্ষ্ণৌর মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। বাঁশখারা তাম্রশাসনখানিও এইরূপ একখানি দানপত্র।

---

(২) আমরা এক্ষণে সম্বত বলিতে বিক্রমসম্বতই বুঝি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সম্বৎ সম্বৎসরের সংক্ষিপ্তাকার মাত্র। প্রাচীনভারতে প্রত্যেক প্রবল নরপতিই আপনার রাজ্যলাভের সময় হইতে একটি সম্বৎ বা কাল প্রবর্ত্তন করিতেন। হর্ষও করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সম্বৎ ৬০৬ খৃষ্টাব্দে প্রবর্ত্তিত হয়। সুতরাং তাম্রশাসনখানি ৬৩১-৩২ খৃষ্টাব্দে খোদিত হইয়াছিল।

কিন্তু তাহার ঐতিহাসিক মূল্য অপেক্ষাকৃত অল্প বলিয়া তাহার বিবরণ দানে ক্ষান্ত রহিলাম।

হর্ষের বংশবর্ণনা দুইখানি তাম্রশাসনেই একরূপ এবং এই দুইখানি তাম্রশাসনের বর্ণনা হইতে আমরা নিম্নলিখিত বংশতালিকাটি প্রস্তুত করিলাম।

মহারাজ নরবর্দ্ধন = বজ্রিনী দেবী
|
মহারাজ রাজ্যবর্দ্ধন = অপ্সরা দেবী
|
মহারাজ আদিত্যবর্দ্ধন = মহাসেনগুপ্তা দেবী
|
পরম ভট্টারক মহরাজাধিরাজ প্রভাকরবর্দ্ধন = যশোমতী দেবী
|
পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ রাজ্যবর্দ্ধন — হর্ষ

হর্ষের পিতা প্রভাকরবর্দ্ধন এবং মাতা যশোমতীদেবীর নাম আমরা হর্ষচরিতেই পাই, কিন্তু অপর তিন জন রাজারাণীর নাম আমাদিগের নিকট সম্পূর্ণ নূতন! বাণ অথবা হিউয়েনসাং কেহই ইঁহাদের সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই। এক্ষণে হর্ষের এই বংশ-তালিকায় দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে তাঁহার পিতামহ, প্রপিতামহ এবং বৃদ্ধ-প্রপিতামহ এই তিনজনে কেবলমাত্র মহারাজ উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার পিতা প্রভাকর বর্দ্ধনই 'পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ' প্রভৃতি রাজচক্রবর্ত্তীত্ব জ্ঞাপক উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। এই ব্যাপার হইতে বুঝিতে পারা যায় যে তাম্রশাসনোল্লিখিত প্রথম তিন জন রাজার ক্ষমতা বড় বেশী ছিল না এবং হর্ষের পিতা প্রভাকরবর্দ্ধনের হস্তে থানেশ্বর রাজ-সিংহাসনের গৌরব যথেষ্ট পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। থানেশ্বররাজেরা যে গুপ্ত সম্রাটদিগের পূর্ণ সৌভাগ্যকালে করদাতা সামন্ত-রাজ ছিলেন. সেবিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। সমুদ্রগুপ্তের লৌহস্তম্ভের বর্ণনাতেই তাহা প্রমাণীকৃত হয়। কিন্তু ৫ম শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন সমগ্র গুপ্তসাম্রাজ্যে একটা ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, যখন স্কন্দগুপ্ত আর কিছুতেই নিজ বংশের গৌরব রক্ষা করিতে পারিতেছিলেন না, যখন রাজ্যাভ্যন্তরস্থ বহু করদ এবং মিত্ররাজেরা আপনাদের স্বাধীনতা জ্ঞাপন করিতেছিলেন তখন রাজ্যের সীমান্তবর্ত্তী থানেশ্বররাজেরা যে গুপ্ত সম্রাটদিগের অধীনতা পাশ হইতে মুক্ত হয়েন নাই তাহা কে বলিবে? মহারাজ হর্ষ সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগে রাজত্ব করেন, সুতরাং তদীয় বৃদ্ধ প্রপিতামহ মহারাজ নরবর্দ্ধন যে ৫ম শতাব্দীর স্কন্দগুপ্তের সমসাময়িক ছিলেন তাহা নিঃসন্দেহ, এবং গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধঃপতনকালে, দেশব্যাপী বিপ্লবের সুযোগে, তিনি যে আপনাকে স্বাধীন করিয়া লইয়াছিলেন এই অনুমানই যুক্তিসঙ্গত। (৩)

(৩) ডাক্তার বুলার কিন্তু এ সম্বন্ধে অন্যরূপ মত প্রকাশ করিরাছেন। তিনি ইঁহাদের কেবলমাত্র 'মহারাজ' উপাধি দেখিয়াই ইঁহাদিগকে গুপ্ত সম্রাটদিগের করদাতা সামন্তরাজ মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন। প্রাচীন ভারতে যে মহারাজ উপাধি অধীনস্থ সম্পদশালী রাজাদিগকে প্রদত্ত হইত তাহা নিঃসন্দেহ— দুইখানি শাসনেই তাহার নিদর্শন রহিয়াছে। কিন্তু স্বাধীন রাজারও যে কেবলমাত্র 'মহারাজ' উপাধি ধারণে সন্তুষ্ট হইতেন, তাহারও

পুত্র রাজ্যবর্দ্ধনের কোন প্রত্যক্ষ বিবরণ না পাইলেও তিনি যে নিশ্চিতই তাঁহার পিতাপেক্ষা কিঞ্চিৎ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়, কারণ তাহা না হইলে তিনি কখনই গুপ্তরাজকন্যা মহাসেনগুপ্তাকে স্বীয় পুত্র-বধূরূপে পাইতেন না।

অতঃপর প্রভাকরবর্দ্ধন। প্রভাকর বর্দ্ধনের বর্ণনা হইতে আমরা একজন প্রবল পরাক্রান্ত নরপতির একটি সম্পূর্ণ প্রতিকৃতি প্রাপ্ত হই। গুপ্ত সম্রাটদিগের হস্তে যে শাসনশক্তি কেন্দ্রীভূত ছিল, তাহা বিবিধ কারণে কক্ষচ্যুত হওয়ায় ভারতের সর্ব্বত্র একটা ঘোর অরাজকতার সৃষ্টি করিল, এবং প্রভাকরবর্দ্ধনও সেই সুযোগে 'পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ' প্রভৃতি রাজচক্রবর্ত্তীত্বজ্ঞাপক উপাধি ধারণ করিয়া, আপন রাজ্যের পরিসর বাড়াইয়া লইতে যত্নবান হইলেন। প্রভাকর যে একজন প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন, তাম্রশাসনোক্ত হর্ষের এই বিবরণই সে সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে—

"চতুঃ সমুদ্রাতিক্রান্তকীর্ত্তিঃ প্রতাপাশূরা-গোপনতান্যরাজো বর্ণাশ্রম ব্যবস্থাপন প্রবৃত্ত চক্র একচক্র রথইব প্রজানামার্ত্তিহরঃ পরমাদিত্যভক্ত পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীপ্রভাকর বর্দ্ধন।"

এই বর্ণনায় প্রভাকরবর্দ্ধনের কীর্ত্তিগাথা চারিসমুদ্রের বেষ্টনী অতিক্রম করিয়াছিল। তিনি একজন পরম শূর ছিলেন; তাঁহার প্রবল পরাক্রমের নিকট অন্যান্য রাজারা নত হইয়াছিলেন; প্রীতি প্রযুক্তও অনেকে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন; তিনি বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহার প্রজাবর্গের দুঃখরাশি নষ্ট করিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ইহা কি একজন প্রবলপরাক্রান্ত নরপতির বর্ণনা নহে? ডাক্তার বুলার কিন্তু ইহাকে ঐতিহাসিক তথ্যশূন্য, বাগাড়ম্বর বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। কিন্তু এসকল কথা উড়াইয়া দিবার কোন কারণই ত দেখা যায় না। রাজকবি বাণও ইহার সূর্য্যভক্তি এবং প্রতি-বেশী রাজাদিগের সহিত যুদ্ধের কথা লিপিবদ্ধ করিয়া এই উক্তির সত্যতা প্রতিপাদন করিয়াছেন।

প্রভাকর বর্দ্ধনের মৃত্যুর পর হর্ষ-ভ্রাতা রামবর্দ্ধন রাজা হন। তিনিও বহু যুদ্ধ করেন, এবং দেবগুপ্ত প্রভৃতি দুষ্ট রাজাদিগকে শাসন করিয়া অবশেষে এক বিশ্বঘাতকের হস্তে প্রাণ হারান। তাম্রশাসনে এই সমস্ত কথাই আছে কিন্তু এই বিশ্বাসঘাতকের নাম ইহাতে নাই। শ্রীহর্ষচরিতকার ইহাকে গৌড়রাজ শশাঙ্ক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, এবং হিউয়েন সাং ইহাকে কর্ণ সুবর্ণরাজ বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

এইবার হর্ষ। হর্ষ এই তাম্রশাসনে নিজের

বহু নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। কুশনরাজ কণিষ্কও তাঁহার একখানি তাম্রশাসনে কেবলমাত্র, 'মহারাজ কণিষ্ক' বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।—Cunningham's Archeological Reports Vol.I III. Pages 29 &c.,

সম্বন্ধে যে তথ্যটি লিপিবদ্ধ করাইয়াছেন, তাহা অতীব কৌতূহলপ্রদ। হর্ষ ইহাতে আপনাকে 'পরম মাহেশ্বরো' এবং 'মহেশ্বর ইব সর্ব্বসত্ত্বানুকম্পী' অর্থাৎ পরম শৈব এবং মহেশ্বরের ন্যায় সর্ব্বজীবে দয়াবান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই উক্তি হইতে আমরা হর্ষ সম্বন্ধে একটি নূতন তথ্য অবগত হই। হিউয়েন সাং হর্ষকে প্রথমাবধিই একজন পরম বৌদ্ধ বলিয়া বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। (৪) পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে হর্ষ এই তাম্রশাসন খানি ৬৩১-৩২ খৃষ্টাব্দে খোদিত করান। তিনি এ পর্য্যন্ত আপনাকে পরম শৈব বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন, এবং এ সংবাদটি আমাদিগের নিকট সম্পূর্ণ নূতন। হিউয়েন সাং ইহার বহু বৎসর পরে (১৬৪৩ খৃষ্টাব্দে) হর্ষের সাক্ষাৎ লাভ করেন। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে হর্ষের বৌদ্ধধর্ম্মের সারবত্তা বুঝিয়া বুদ্ধভক্ত হইয়া উঠা কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, এবং হিউয়েন সাংও বোধ হয়, সেই সময়কার ভাব দেখিয়াই এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু সে সময়েও তিনি সূর্য্য, শিব এবং বুদ্ধ এই তিনজনকেই ভক্তি করিতেন। তবে তিনি যে প্রথমাবধিই একটু বুদ্ধভক্ত ছিলেন তাহা অস্বীকার করিবার বিশেষ কোন কারণ নাই।

সূর্য্যই বোধ হয় এই বংশের কুলদেবতা ছিলেন। হর্ষের পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, এবং বৃদ্ধ প্রপিতামহ ইঁহারা সকলেই পরম সূর্য্যভক্ত ছিলেন এবং এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা পুষ্যভূতিও যে সূর্য্য উপাসক ছিলেন হর্ষচরিত হইতে আমরা সে বিষয় জানিতে পারি। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দী ভারতেতিহাসে একটি স্মরণীয় যুগ; একদিকে ধর্ম্মের জন্য উৎপীড়ন এবং অন্যদিকে বিভিন্ন ধর্ম্মকে সমন্বয় করিবার চেষ্টা এই যুগে একই সঙ্গে ঘটিতে থাকে। একদিকে কর্ণ সুবর্ণরাজ শশাঙ্ক কর্তৃক বৌদ্ধ নিগ্রহ এবং অন্যদিকে হর্ষ কর্তৃক বিভিন্ন দেবতাকে সমান ভাবে পূজার কথা শুনিতে পাই। এই সময়ের গুণেই হয়ত হর্ষের অগ্রজ রাজ্যবর্দ্ধন বৌদ্ধ এবং হর্ষ শৈব ধর্ম্মে অনুরক্ত হয়েন। কথিত আছে যে হর্ষের ভগিনী রাজ্যশ্রীও বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্রে এবং বিশেষতঃ মধ্যমিকা দর্শনে বিলক্ষণ বুৎপন্না ছিলেন, এবং এই বিদুষী রমণী যে সময়ে সময়ে পণ্ডিতগণের সহিত প্রকাশ্য সভায় দর্শনালাপ করিতেন, তাহা অবগত হইয়া আমরা তৎকালে ভারত-রমণীর অবস্থা কিঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি।

প্রভাকর বর্দ্ধন বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, মধুবন তাম্রশাসন হইতে আমরা তাহা জানিতে পারি। কিন্তু ইঁহারা কি বর্ণাশ্রমী ছিলেন হর্ষ তাম্রশাসনে সে প্রসঙ্গের কোন উল্লেখ করেন নাই। হিউয়েন সাং হর্ষকে 'কি-সী' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন---সংস্কৃতে ইহা 'বৈশ্য' দাঁড়ায়। তবে কি এই থানেশ্বর রাজবংশ বৈশ্যজাতীয়

(৪) হিউয়েন সাংএর বর্ণনায় আমরা দেখিতে পাই যে হর্ষবর্দ্ধন রাজ-গদিতে বসিবার পূর্ব্বে এক বৌদ্ধ মন্দিরে উপাসনা করেন এবং আশ্চর্য্যভাবে একজন বোধিসত্ত্ব তাঁহার সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে বর্ত্তমানের জন্য রাজোপাধি লইতে নিষেধ করিয়া কেবলমাত্র 'কুমার' উপাধি ধারণ করিতে বলিয়া অন্তর্হিত হন। এ কাহিনীর মূলে কিছু সত্য থাকিলেও, ইহা যে অতিরঞ্জিত তাহাতে সন্দেহ নাই।

ছিলেন? এ সম্বন্ধে সকলে একমত নহেন। কেহ বলেন 'হাঁ' কেহ বলেন 'না' মোট কথা এ সম্বন্ধে কোন সদুত্তর পাওয়া যায় না। ডাক্তার কনিংহাম তাঁহার Ancient Geography of India নামক গ্রন্থে ইহাদিগকে বৈশ্যদলভুক্ত রাজপুত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং ক্ষত্রিয়রাজগণের সহিত এই বংশের বৈবাহিক সম্বন্ধ ডাক্তার বুলারকে ঐ মত গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছে। বৈশ্য জাতীয় রাজপুত এখনও বর্ত্তমান আছে এবং লক্ষ্ণৌর দক্ষিণদিকের ভূভাগ এখনও বৈশওয়ারা নামে অভিহিত। এই দুইটি দেখিয়া কানিংহাম স্থির করিয়াছেন যে হর্ষের পূর্ব্বপুরুষগণ এই স্থান হইতে থানেশ্বর গিয়া নিজেদের জন্য তথায় একটী রাজ্য সংস্থাপন করেন এবং ইহারা বৈশ্য জাতীয় রাজপুত ছিলেন। এ যুক্তির উপর কতদূর নির্ভর করা যাইতে পারে তাহা বিশেষজ্ঞদিগের বিবেচনাধীন। তবে যতদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা কেহ ইহাদিগকে অন্য বর্ণের বলিয়া প্রতিপন্ন না করেন ততদিন ইহাদিগকে বৈশ্যজাতি বলিয়াই মানিয়া লওয়া যাউক।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মৈত্র বি, এ,

অজন্তার খোদিত শিল্প

পূর্ব্ব প্রবন্ধদ্বয়ে অজন্তার লিখিত চিত্র এবং প্রাকৃতির শোভা সম্বন্ধে বলা হ'য়েছে। এখন গুহাগুলির খোদিত শিল্পের বিষয় কয়েকটী কথা বল্‌বার চেষ্টা করব। গুহাগুলি প্রথমতঃ দুই শ্রেণীর;—'চৈত্য' ও 'বিহার'। চৈত্য-গুহা ভজন-পূজনের, আর বিহার গুহা-গুলি বৌদ্ধ উপাসকের বাসের জন্যে নির্ম্মিত। সমাপ্ত ও অসমাপ্ত গুহাগুলির মধ্যে ৯, ১০, ১৯, ২৬, স্যংখ্যক গুহাগুলি 'চৈত্য' আর বাকি "বিহার"। বিহার গুহাগুলির সাম্‌নে অর্থাৎ বাইরে থেকে পাহাড়ের গায়ে সারি সারি থাম দেওয়া বারাণ্ডা। কোন কোন গুহায় বারাণ্ডার দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বের সমুখে বারাণ্ডাওয়ালা এক একটী অতিরিক্ত প্রকোষ্ঠ। বারাণ্ডাতে প্রবেশ কর্‌লে সাম্‌নের দেয়ালের মধ্যে একটা বড় দুয়ার আর দুপাশে ছোট ছোট দুটী করে জান্‌লা আর তারই আবার দুধারে ছোট ছোট দুটি দরজা। সাম্‌নের বড় দ্বার দিয়ে প্রবেশ কর্‌লে একটা প্রকাণ্ড চারকোণা 'হলের' মধ্যে এসে পড়তে হয়। সেই 'হলটার আবার চারপাশে দেয়ালের সমান্তরালভাবে বিবিধ আলঙ্কারিক খোদিত ও অঙ্কিত চিত্রে ভূষিত থামের সার;—তাতে 'হলটীর' চারিধার একটা স্বতন্ত্র বারাণ্ডার মত দেখায়। দক্ষিণ আর বাম ভাগের দেয়ালের মধ্যে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বাসোপযোগী সারি সারি প্রকোষ্ঠের ছোট ছোট দ্বার! প্রধান প্রবেশ দ্বার দিয়ে 'হলে' প্রবেশ কর্‌লেই 'হলের' ভিতরে দেয়ালের মাঝে একটা কুলুঙ্গীর মত ক'রে খোদা প্রকাণ্ড বারাণ্ডা ও কুটুরী দৃষ্ট হয়—সেই ঘরের মধ্যে ধ্যানস্তিমিতনেত্রে শান্ত স্তব্ধ বিমলাত্মা বিশাল আকার এক বুদ্ধমূর্ত্তি রাজাসনে ব'সে

ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত। সকল বিহার গুহাগুলিই উল্লিখিত প্রকারে সজ্জিত। বিহার গুহার থামগুলির আলঙ্কারিক কারুকার্য্য এবং গঠনের বৈচিত্র্যতা এত উঁচু ধরণের যে,

১৯নং গুহার বাহিরের নাগেশের মূর্ত্তি

বিশেষজ্ঞদের মুখে শোনা যায় যে, অন্যকোন দেশের রাজপ্রাসাদেও সেরূপ উৎকৃষ্ট চারু-শিল্পকলাশোভিত থাম আছে কিনা সন্দেহ! চৈত্যগিরিগৃহগুলি খৃষ্টীয় গির্জ্জার মত

কতকটা অর্দ্ধ বৃত্তাকার খিলান দেওয়া ঘর; তার শেষভাগে একটা প্রকাণ্ড বৌদ্ধস্তূপ। ডানদিকে আর বাঁদিকে শ্রেণীবদ্ধ স্তম্ভ স্তূপটিকে পিছন দিক থেকে অর্দ্ধবৃত্তাকার ভাবে বেষ্টন করে আছে। অর্থাৎ ডিম্বনৎ অর্দ্ধবৃত্তকার হলটী সরু সরু বারাণ্ডা দিয়ে ঘেরা!—সামনের দিকটায় সোজা ভাবে পাঁচীল দেওয়া।

যে গিরিগাত্রে গুহাগুলি খোদিত সেই পাহাড়ে গিরিগুহায় ওঠ্‌বার একটী সুন্দর সোপান আছে। সোপানটী যে গুহা গুলির সঙ্গেই খুব প্রাচীনকাল থেকেই পাহাড়ের গায়ে খোদা হ'য়েছিল, তা' দেখলে বেশ বোঝা যায়। সিঁড়ির ধাপগুলি এমনভাবে তৈরী যে তাতে উঠ্‌তে বিশেষ কোন কষ্ট হয় না। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই প্রথমে ৭নং (১) গুহায় যাওয়া যায়। পরে, সেই গুহা থেকে গুহান্তরে যাবার পথ বা সিঁড়ি স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেক গুহার বাইরে পাহাড়ের গায়ে গায়ে র'য়েচে। সাত নম্বর গুহার বামদিকে প্রথম গুহা আরম্ভ হ'য়ে দক্ষিণদিকে অষ্টগুহা থেকে পর্য্যায়ক্রমে ২৮টী গুহা খোদা।

গুহাগৃহ বল্‌তে সাধারণতঃ একটা ঘনঘোর তিমিরাবৃত পর্ব্বতগহ্বরের কথাই সহসা মনে উদয় হয় কিন্তু, আসলে গুহাগৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে মনেই হয় না যে গিরিগহ্বরে জনশূন্য প্রদেশে রয়েচি! মনে হয় বিবর্ণিত কোন প্রাচীন যুগের রাজসভায় বা কোন এক অজানা রাজপুরীতে এসে পড়েচি! বিহার গুহাগুলির মধ্যে চার নম্বরের গুহাই আকারে বৃহৎ, আর চৈত্যগুহার মধ্যে দশ নম্বরের প্রত্যেক চৈত্যগুহায় একএকটি স্তূপ, আর প্রত্যেক বিহার গুহার গভীরতম প্রদেশে একটী নির্দ্দিষ্ট বিশেষ কক্ষে একটী করে ধ্যানীবুদ্ধের প্রশান্ত পারাবারের মত স্তব্ধ গম্ভীর এবং দীপশিখার মত সমুজ্জ্বল মূর্ত্তি! ১৫নং বিহার গুহার মূর্ত্তিটী অন্যান্য গুহার মূর্ত্তিগুলির চেয়ে বেশী ভাবপূর্ণ ব'লে আমাদের মনে হ'য়েছিল। বুদ্ধের সেই ধ্যানস্থ মূর্ত্তিটিতে দেবোপম ও ধর্ম্মৈশ্বর্য্যের শ্রী-যুক্ত ভাব শিল্পী যেন বিশেষভাবে ফুটিয়ে তুল্‌তে পেরেচেন! চৈত্যগুহাগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় দশ নম্বরের গুহা। তার মধ্যে যে একটি সুবৃহৎ স্তূপ আছে সেটীর প্রতি একমনে খানিকক্ষণ নিরীক্ষণ করলে তার বিশালতায় এবং স্বাভাবিক নির্জ্জন প্রদেশের নিস্তব্ধতায় একটা উদার ও মহৎভাব নিবিড়ভাবে মনকে ছেয়ে ফেলে! গুহাগুলির মধ্যে কয়েকটি দ্বিতল গুহাও আছে। ছয় নম্বরের দ্বিতল গুহাটীর নীচের তলার প্রায় সব থামগুলি একেবারে খসে পড়ে গেছে; কিন্তু, গুহাগুলি একটী আস্ত পাথরের গায়ে খোদা হয়েছিল ব'লে উপরের হলের' বা ঘরের থামের কিম্বা প্রাচীরের কোনরকম ক্ষতি হয়নি। দোতলা গুহাসকল অপরাপর গুহার চেয়ে ছোট বা অপকৃষ্ট নয়, ছয় নম্বরের দ্বিতল গুহাটী অন্য কয়েকটী গুহার চেয়ে অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ। ২৮টী গুহার মধ্যে দুরধিগম্য একটী গুহা। সেইটি ভিন্ন আমরা প্রায় সকল

(১) গুহাগুলির পরিচয়ের সুবিধার জন্যে রাজপুরুষেরা আজকাল গুহাগুলির সামনে থামের গায়ে অথবা দেয়ালে নম্বর লিখে দিয়েছেন।

গুহাই তন্ন তন্ন করে দেখ্‌বার সুযোগ পেয়েছিলুম। গুহাগুলির মধ্যে তৃতীয়, পঞ্চম প্রভৃতি কতকগুলি গুহা অসম্পূর্ণ-ভাবে খোদা। ২৬ সংখ্যক গুহাটীতে
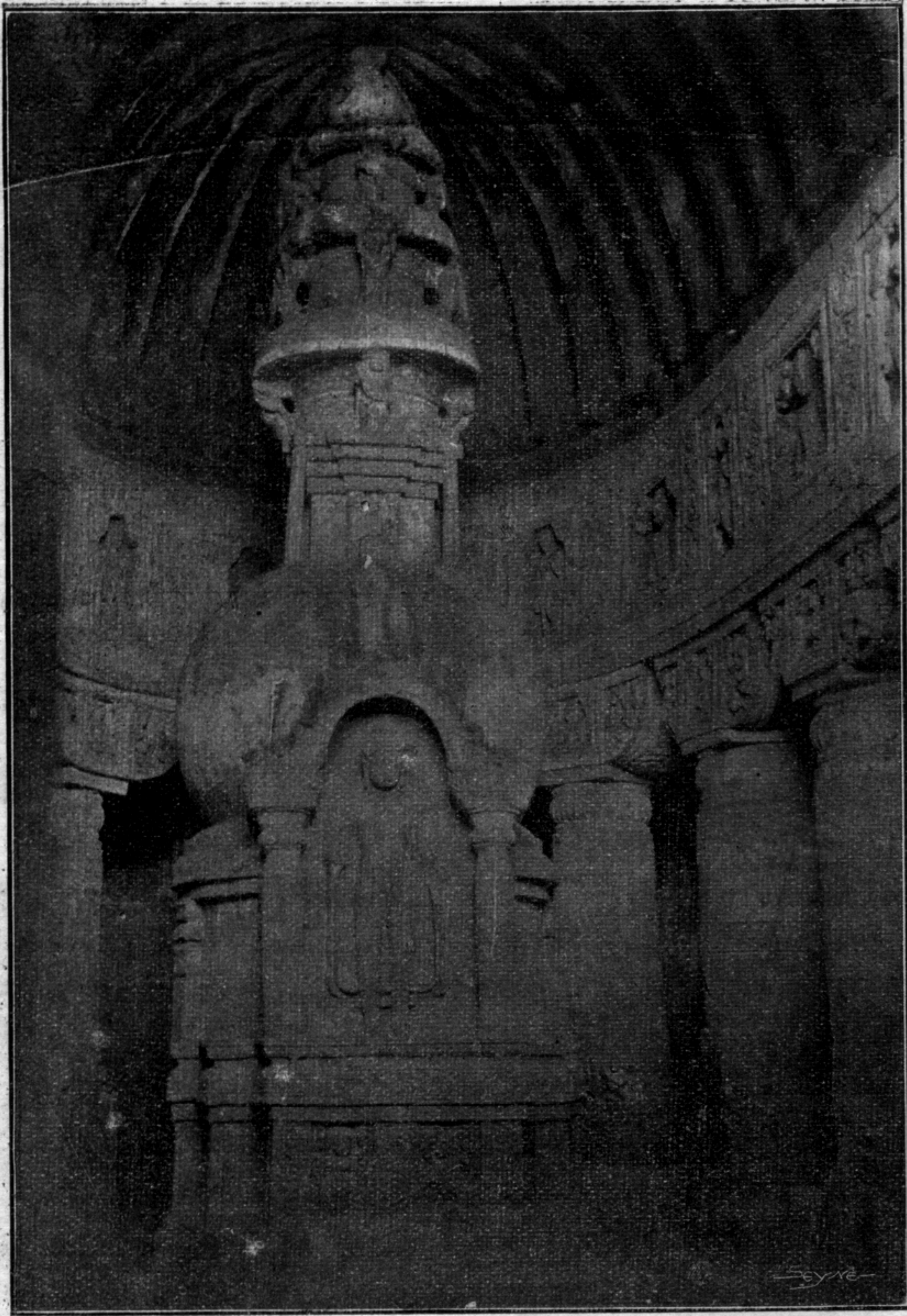
১৯নং গুহার ভিতরের স্তূপ ও বুদ্ধ মূর্ত্তি

খোদিত শিল্পের সংখ্যা এবং খোদাই কাজের উৎকর্ষও সবচেয়ে বেশী। এই গুহাটীর প্রারম্ভে একস্থানে একটী খোদিত মূর্ত্তিগঠনের 'বাটালী' দিয়ে খোদা যে অসমপ্ত

রেখাঙ্কিত মূর্ত্তি আঁকা আছে সেটী দেখ্‌লে তখনকার শিল্পীরা কি প্রণালীতে খোদাই কাজ আরম্ভ কর্‌তেন তার কতক আভাষ পাওয়া যায়। প্রথম গুহার থামে খোদিত আলঙ্কারিক কাজের নমুনা অত্যন্ত সুন্দর! ১ম নং গুহা ছাড়া দ্বিতীয়, ষষ্ঠ, সপ্তদশ, ত্রয়োবিংশতি ও চতুর্ব্বিংশৎ এবং আরো কয়েকটী গুহায় আমরা স্তম্ভের উৎকৃষ্ট আদর্শ দেখ্‌তে পাই। প্রথম নম্বর গুহার বাইরে বারাণ্ডার উপরে আল্‌সের নীচে মদমত্ত মাতঙ্গদলের যে খোদাই করা ছবি আছে সেটাতে স্বাধীন বন্য হাতীর স্বাভাবিক চপল ও নিরুদ্বেগ ক্রীড়ার ভাব শিল্পীর পরিকল্পনার শ্রেষ্ঠত্ব সপ্রমাণ ক'রে। ২য় নম্বর গুহায় পিতার পার্শ্বে উপবিষ্ট জননীর কোলে শিশু বুদ্ধের কোমল প্রতিমূর্ত্তি শিল্পজ্ঞানের বিশেষ পরিচায়ক। রাজারাণীর রাজজনোচিত গাম্ভীর্য্য ও পিতৃমাতৃজনোচিত অপত্য স্নেহাভিষিক্ত পুণ্যালোকবিমিশ্রিত কমনীয় হর্ষোজ্জ্বল ভাব,আর অশেষলাবণ্যসম্পন্ন বালকের সুকোমল গঠন ও তার মুখাবয়বে ভবিষ্যতের নিগূঢ় পরিচয় যেন লেখা আছে! তৃতীয় গুহাটী একটী অসম্পূর্ণ সাজসজ্জাহীন অসম্পূর্ণ ছোট কুঠুরীদ্বয় মাত্র—তাতে উল্লেখযোগ্য কিছুই নেই। চতুর্থ নম্বর গুহা আকারে সব চেয়ে বড় হ'লেও প্রায় অসম্পূর্ণ অবস্থায় প'ড়ে আছে। তার বাইরের বারাণ্ডার প্রাচীরগাত্রে খোদা অন্যান্য কতকগুলি খোদিতমূর্ত্তির মধ্যে তথাগতের যৌবনকালের সুন্দর-স্বরূপ মূর্ত্তিটীই উল্লেখযোগ্য। ৫নং গুহাটী একটী বিহারগুহা নির্ম্মাণের সূচনা। ৬নং গুহার দোতলায় দুইটি নাতিবৃহৎ বুদ্ধের ধ্যানমগ্ন মূর্ত্তি, আর দ্বিতল প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরে 'হলের' একপাশে একটা ছোট বারাণ্ডার উপর কতকগুলি হাতীর খোদিত চিত্র অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। আমাদের দেশের লোকেরা যেমন কোন কিছু শুভকার্য্যের প্রারম্ভে ১০৮টী শ্রীশ্রীদুর্গা নাম লিখে তবে কোন কার্য্য আরম্ভ করেন তেমনি সাত নম্বর গুহায় ভাস্করশিল্পীরাও এইরূপ অসীম কার্য্যে লিপ্ত হ'য়ে যেন বল পাবার জন্যে সংখ্যাতীত ধ্যানীবুদ্ধের খোদিত মূর্ত্তি গড়েছেন। ৮ম গুহাটী একটী জীর্ণ গুহা। তা'তে বড় কিছু দেখ্‌বার নেই। নবম গুহাটী একটী চৈত্যগুহা। আশ্চর্য্য এই যে চৈত্যগুহাগুলিতে সূর্য্যালোক প্রবেশের পথ আধুনিক ঊনবিংশতি শতাব্দীর শিক্ষিত সুরুচিসম্পন্ন ইংরাজদের বাড়ীর Skylightএর মত। নবম গুহায় খোদিত শিল্পের চেয়ে আঁকা-ছবিই বিশেষ দ্রষ্টব্য। সুবৃহৎ দশ নম্বরের চৈত্যগুহাটী পাহাড়ের বুক চিরে যে কি করে আর কত কারিকর মিলে খোদাই ক'রেছিল বলা সহজ নয়। গুহাগুলি স্থপতিবিজ্ঞানশাস্ত্র (Architectural Science) অনুযায়ী—কোথাও কোন গঠন দোষ স্পর্শ করেনি। গুহাগুলির সীমারেখা, কোণ, সমতা বা আকার প্রকার প্রভৃতির কোন যায়গায় কোন ব্যতিক্রম দেখতে পাওয়া যায় না। ১০,১২,১৪,২১,২৩,২৪,২৫, প্রভৃতি গুহাগুলির অনেক স্থানে অনেক সুন্দর সুন্দর খোদিত চিত্রের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দেখা যায়; ১৩নং গুহাটী ভিক্ষুদের একটী শয্যাগৃহ। গুহাটীর ভগ্নদ্বার দিয়ে প্রবেশ ক'রে একটা বড় ঘর, আর তার তিনদিকে ছোট ছোট

ছটী ঘর দেখা যায়। প্রত্যেক কুঠ্রীতে কামরার সঙ্গেই তিনটে ক'রে খোদাই করা পাথরের শয্যা,—সায় উপাধান। না দেখে প্রত্যয় করা অসম্ভব যে শয্যাগুলি পাথরের তৈরি হ'লেও এমনভাবে গঠিত যে, পাষাণের উপাধানের উপর মাথা রেখে পাষাণ-শয্যায় শুলে গায়ে ব্যথা বা কোনরকম অশোয়াস্তি বোধ হয় না;—বরং দ্বিপ্রহরের রৌদ্রতাপে গুহাগৃহাভ্যন্তরে সেই পাথরের শয্যায় শুয়ে যেন আরামে চোখ জড়িয়ে আসে! ১৬নং গুহায় বুদ্ধদেবের কতকগুলি মূর্ত্তি ছাড়া গুহার বাইরে বারাণ্ডার সাম্নে প্রবাহের নীচে যাবার একটী সুড়ঙ্গ পথ আছে। সেই পথে সিঁড়ি দিয়ে নাব্‌লে একটী ছোট প্রকোষ্ঠের মধ্যে নাগেশ্বরের ভগ্ন প্রতিকৃতি আর সেই ঘরটীর বাইরে প্রবাহের দিকে বার করা ছুটো প্রায় জীবন্ত হাতীর আকারের হাতীর ছবি খোদাই করা আছে। হাতী ছুটীর নাগেশের দ্বারের দিকে মুখ,—যেন পাহারায় নিযুক্ত। হাতী ছুটীর গঠন এত স্বাভাবিক যে, শুধু যেন তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠারই কেবল অভাব! ১৭নং গুহাতে উৎকৃষ্ট লিখিত চিত্রসংখ্যাই বেশী। এই গুহাটীতে বৌদ্ধভিক্ষুদের একটী জল রাখবার ঘর আছে। সেই ঘরটীতে সব সময় জল ভরা থাকে। সিঁড়ি দিয়ে তার উপরে উঠ্‌লে একটী চারকোণা গর্ত্ত; প'ড়ে যাবার সম্ভাবনায় জল তোলবার সুবিধার জন্যে তার মাঝে কাঠের পাটা লাগান থাক্‌ত। পাটা লাগাবার খাঁজগুলি এখনও বর্ত্তমান। ১৮নং গুহাটী একটী মাঝামাঝি রকমের গুহাপ্রকোষ্ঠ। ১৯নং গুহার বহির্দ্বারের অনেকগুলি মূর্ত্তি আশ্চর্য্য সুন্দর ও ভাবপূর্ণ! উক্ত গুহাটীর প্রবেশ-দ্বারের বহির্ভাগের কতকগুলি মূর্ত্তির মধ্যে সস্ত্রীক নাগরাজের আবেশগম্ভীরমূর্ত্তি আর ১৭নং গুহার লিখিত চিত্রের অনুরূপ বুদ্ধদেবের সাম্নে ভিক্ষাপাত্র হাতে মাতাপুত্রের একটী মূর্ত্তি উল্লেখযোগ্য। ঐ গুহাটীরই অভ্যন্তরে স্তূপের উপর একটী স্থির নির্ব্বিকার দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্ত্তি গিরিগুহার শোভা স্বরূপ বিরাজিত! প্রবেশদ্বারের উপর উভয়পার্শ্বে যে ছুটী সুন্দর মূর্ত্তি আছে সম্ভবতঃ সেছুটী ধনকুবেরের ছবি।—অন্ততঃ সেছুটীর ধনমদ-মত্তভাব দেখলে সেইরূপই অনুমিত হয়। ২০নং গুহা-প্রবেশের সোপানের সুচারু গঠন ও আলঙ্কারিক কারুশিল্প একান্তই বিস্ময়োৎপাদন করে! প্রায় প্রত্যেক গুহার প্রবেশ পথের চৌকাটের সাম্নে অর্দ্ধবৃত্তাকার পদ্মাঙ্কিত 'পাপোষ' আছে। কেন জানি না ২২ সংখ্যক গুহাটীর সম্মুখে গেলে হঠাৎ আমাদের বাঙলা দেশের পল্লীভবনের কথা মনে পড়িয়ে দিত। গুহাটীতে পল্লী-কুটীরের মত 'দাওয়া' অর্থাৎ উঁচু বারাণ্ডা। ২৬নং গুহাটী একটী খোদিত শিল্পের ভাণ্ডার! প্রথমতঃ বহির্দ্দেশ সজ্জা অন্যান্য গুহার চেয়ে শ্রেষ্ঠ; আর ভিতরে যে সমস্ত খোদিত শিল্প আছে—সেগুলি দেখলে বেশ অনুমিত হয় যে সেই গুহাটীতে খোদিত শিল্প বিশেষভাবে উৎকর্ষ সাধন করেচে। একটী চির-নির্ব্বাণে শায়িত বুদ্ধদেবের সুবৃহৎ মূর্ত্তি আছে। এই মূর্ত্তিটীর মত বড় খোদিত মূর্ত্তি অজন্তার আর কোন গুহায় নাই। বিকারবিহীন মহাতাপস বুদ্ধদেবের সেই মহানির্ব্বাণের

মূর্ত্তিটী দেখলে মন ভক্তি ও করুণায় আর্দ্র হ'য়ে ওঠে! তাপস-শ্রেষ্ঠ বুদ্ধের শান্তোজ্জ্বল মূর্ত্তির পাশে উপায়ান্তরহীনভাবে অবস্থিত ভক্তজনমণ্ডলীর বিষাদস্তব্ধ গম্ভীরমূর্ত্তি গুলিতে জগৎগুরু বুদ্ধের বিয়োগজনিত অসীম শোকভার যেন জীবন্তভাবে ব্যক্ত হ'য়েচে! বুদ্ধের অবেশমাধুরীমণ্ডিত ধ্যান-স্তিমিত লোচন আনন্দ বিভায় উদ্ভাসিত!—পার্থিব মৃত্যুকে যেন তিনি সত্যই জয় করেছেন,—পৃথিবীর দুঃখ সুখে আর তিনি বিচলিত নন। বুদ্ধদেবের মস্তক যে উপাধানে রক্ষিত সেটী পাথরের রচিত হ'লেও এমন ভাবে গঠিত যে দেখলে সুকোমল তুলোর বালিসের চেয়েও যেন নরম ব'লে মনে হয়! ২৬ নং গুহায় বুদ্ধের প্রলোভনের খোদিত ছবিটি অতি সুন্দর! ১ম নং গুহায় এইরূপ যে চিত্র আছে এটী ঠিক সে ধরণের নয়। এখানিতে বুদ্ধদেব গভীর ধ্যাননিমগ্ন! আর ষড়রিপু নানান-মূর্ত্তিতে তাঁর অটল মন টলাবার বৃথা প্রয়াস পাচ্চে! গুহাটির এক ধারে বারাণ্ডার ভিতর রেখাবন্দী সারি সারি কতকগুলি সুন্দর ভাবপূর্ণ মূর্ত্তি সজ্জিত। কবিতার ভাষায়,—অজন্তার ঐ সকল খোদিত এবং লিখিত শিল্পের ভাব ও পরিকল্পনা একদিকে অনন্ত অতল পারাবারের মত উদার, ও আকাশের মত অসীম, অন্যদিকে জ্যোৎস্নার মত মৃদু, তারকার মত উজ্জ্বল, এবং নীহারের মত যেন সুশীতল!

অনবধানতা বশতঃ "অজন্তার প্রকৃতির শোভা" শীর্ষক প্রবন্ধে সেখানকার একটী বিশেষ দ্রষ্টব্য "সপ্তকুণ্ডের" কথা বলা হয়নি। সেই অভাবটুকু পূরণ ক'রে আজকের প্রবন্ধ শেষ করব। গুহাশৈলের পাশে যে একটী নির্ঝরের কথা পূর্ব্ব প্রবন্ধে উল্লেখ করেছিলুম সেই ঝরণাটী প্রায় তিনশত ফুট উঁচু থেকে পড়ে নীচ সাতটী সুবৃহৎ কূপাকার কুণ্ড সৃজন করেছে! সেই স্থানটি এত রম্য যে বর্ণনার দ্বারা তার রমণীয়তা বোঝাতে পার্‌বো ব'লে মনে হয় না। সেখানকার লোকেরা সেই দর্শনীয় কুণ্ডগুলিকে চলিত ভাষায় "খোরা" ব'লে। সপ্তকুণ্ডের পাশে খাড়া প্রাচীরের মত পাহাড়ের গায়ে একটি অতি আশ্চর্য্য স্বাভাবিক উচ্চ স্তূপ অটলপদ প্রান্ত থেকে অটল চূড়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত। তাতে আবার ময়ূর পায়রা প্রভৃতি নয়ন-মনপ্রফুল্লকারী সুন্দর সুন্দর পাখীর বাস। অজন্তার যে স্থানটীতে শিল্পাশ্রমগুলি রচিত সেখানে মানুষের ক্ষমতা এবং জগৎপাতার অনন্ত সুন্দর রচনার পরিচয় প্রচুরভাবে একত্রীভূত দেখ্‌তে পাওয়া যায়। স্থানটী সত্যসত্যই তাপস, চিত্রশিল্পী ও কবিজন বাঞ্ছিত। সেই স্বাভাবিক স্তূপ আর কুণ্ডগুলি দেখ্‌তে হ'লে গুহাগুলি যে পাহাড়ের মাঝে খোদা তার অপর দিকে অর্থাৎ প্রবাহের অপর পাশে একটী পাহাড়ের চূড়ার উপর উঠ্‌তে হয়। সেখান থেকে নীচে অর্দ্ধ গোলাকার পাহাড়ের গায়ে খোদিত গুহাগৃহগুলির এক সঙ্গে সারিসারি সজ্জিত দৃশ্য (Panoramic View) বেশ স্পষ্ট ও সুন্দর দেখায়! আমরা সেই পাহাড়ের চূড়ায় ওঠ্‌বার সময় পথিমধ্যে পাহাড়ের গায়ে খোদা কতকগুলি ভাঙ্গা সিঁড়ির ধাপ দেখেছিলুম, তাতে বোধ হয়

জন্যে প্রবাহের নীচে থেকে সিঁড়ি তৈরী করেছিলেন, কালে সেগুলি ধ্বংস পেয়েছে!

বস্তুতঃ খোদিত শিল্পগুলি দেখ্‌লে বেশ বোঝা যায়, অজন্তার শিল্পীরা যে কেবল আঁকা ছবির জন্যেই প্রশংসার্হ তা' নয়; খোদিত শিল্পকলাতেও তাঁরা জগৎগৌরব-স্বরূপ। খোদিত চিত্রের মূর্ত্তিসকলের গঠন ও সজ্জা লিখিত চিত্রের গঠনাদির সঙ্গে খুব মেলে।

শ্রীঅসিত কুমার হালদার।

উইলিয়ম মেক্‌পীস্‌ থ্যাকারে*

জগতে যে সকল ব্যক্তি কোন না কোন বিষয়ে গুণাধিক্যের পরিচয় দিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন আমরা তাঁহাদের জন্মোৎসব করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকি। সম্প্রতি কিছুকাল ধরিয়া থ্যাকারের জন্মোৎসব লইয়া এখানকার ইংরাজ সাহিত্য মহলে বেশ একটা আন্দোলন চলিয়াছে। থ্যাকারের খ্যাতি প্রতিপত্তি উপন্যাস প্রণয়ন দ্বারা, সুতরাং আমরাও এ সময় তাঁহার জীবন সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিবার চেষ্টা করিব।

থ্যাকারের জন্মোৎসবে ভারতবর্ষে এত উৎসাহ প্রকাশের প্রধান কারণ এই যে তিনি কলিকাতা নগরীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার পিতামহ ১৭৬৬ খ্রীঃ অব্দে সপ্তদশবর্ষ বয়সে সামান্য কেরাণীর কাজ লইয়া কলিকাতায় আসেন। তাঁহারও নাম উইলিয়ম মেক্‌পীস্‌ থ্যাকারে ছিল। থ্যাকারের পিতামহ দশ-বৎসরের মধ্যে বিলক্ষণ অর্থ উপার্জ্জন করেন, এবং ২৬ বৎসর বয়সে কোম্পানীর কাজ ছাড়িয়া স্বদেশে ফিরিয়া শেষ জীবনটুকু সেইখানেই কাটান।

থ্যাকারের পিতামহ শেষ কয়েক বৎসর শ্রীহট্টের কালেক্টর ছিলেন। ইঁহার দ্বিতীয় পুত্র, রিচ্‌মণ্ড থ্যাকারে, আমাদের উপন্যাস লেখক থ্যাকারের পিতা। ১৭৯৮ অব্দে ইনিও কেরাণী হইয়া কলিকাতায় আসেন, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন তাঁহাকে কর্ম্মত্যাগ করিয়া মান্দ্রাজে তাঁহার ভ্রাতার নিকট গিয়া কিছুকাল থাকিতে হয়।

আরোগ্য লাভের পর কলিকাতায় ফিরিয়া ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কিছুকাল অধ্যয়ন করিয়া আরবী পারসী প্রভৃতি ভাষায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। অধ্যয়ন শেষ হইলে তিনি মেদিনীপুরের সহকারী কালেক্টর নিযুক্ত হন। মেদিনীপুর হইতে রিচ্‌মণ্ড বীরভূমের কালেক্টর হইয়াছিলেন। সেই সময়ের ইতিহাস হইতে দেখা যায় যে বীরভূম জেলা তখন রাজশাসনের একপ্রকার বহির্ভূত ছিল। মোগলরাজত্বে রাজা এবং জমীদারগণ নবাবকে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া দিতে বাধ্য ছিল এবং তৎপরিবর্ত্তে নবাব এক এক খণ্ড জমিদারী তাহাদের দান করিতেন। কিন্তু কোম্পানীর আমলে সৈন্য সাহায্যের কোনোই আবশ্যকতা ছিল না, রাজাদিগকে তৎপরিবর্ত্তে নিয়মিত রূপে কর প্রদান করিতে হইত। এই কারণে অনেক

* এ প্রবন্ধটি ছয় মাসের অধিককাল আমাদের হস্তে আসিয়াছে,—স্থানাভাবে এতদিন প্রকাশ করিতে

রাজপরিবার দুরবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। থ্যাকারে নানা উপায়ে তাহাদের দুরবস্থা দূর করিতে চেষ্টা করেন। ১৮৬৪ অব্দে সার উইলিয়ম হাণ্টার যখন বীরভূমে ছিলেন, তখন তিনি একবৃদ্ধ ব্রাহ্মণের মুখে "টিক্‌রী" অর্থাৎ থ্যাকারে সাহেবের গল্প শুনিয়াছিলেন। থ্যাকারে মেদিনীপুরে অল্পদিনের জন্য জজ হইয়াছিলেন।

মেদিনীপুর হইতে থ্যাকারে কলিকাতায় আসেন এবং সেক্রেটেরিয়ট আফিসে অনেক-দিন কার্য্য করেন। ১৮১৩ সালে লর্ড মিণ্টোর বিদায় উপলক্ষে যে বিদায়সম্ভাষণ রচনা করা হয় তাহার কিয়দংশ থ্যাকারের দ্বারা রচিত। ১৮১০ সালে তিনি এন্‌বেকার অ্যান নামে কোন বিখ্যাত বংশের সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করেন। বিবাহের পর তিনি আলিপুরের কালেক্টর নিযুক্ত হন। আলিপুর জেলার আয়তন তখন প্রায় ২০০০ মাইল, লোকসংখ্যা প্রায় ১৫ লক্ষ ছিল। থ্যাকারে এই জেলার ফৌজদারী এবং দেওয়ানী আদালতের জজ এবং পুলিশের কর্ত্তা ছিলেন। আলিপুরে তাঁহার নামের একটি রাস্তা এখনও বর্ত্তমান।

১৮১৫ সালে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী ভারতবর্ষেই বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু বালক উইলিয়মকে ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। উইলিয়ম তাঁহার পিতার এক-মাত্র পুত্র। তাঁহার বয়স তখন চারি বৎসর মাত্র। ভারতবর্ষের দৃশ্যাবলী স্বপ্নের ছায়ার ন্যায় থ্যাকারের স্মৃতিতে মুদ্রিত ছিল। ৪৮ বৎসর বয়সকালে তিনি কোনো ইংরাজী মাসিক-পত্রিকায় কলিকাতার গঙ্গার ঘাট বর্ণনা করিয়া এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তাঁহার মাতার আকৃতিও সময়ে সময়ে স্বপ্নবৎ তাঁহার স্মৃতিপথে আবির্ভূত হইত। চার্টার হাউসে অধ্যয়ন কালে তিনি তাঁহার মাতাকে প্রতিদিন সুদীর্ঘ পত্র লিখিতেন এবং তাঁহার মাতা দ্বিতীয়বার বিবাহ করিলে পরও মাতার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ও ভালবাসার অণুমাত্রও হ্রাস হয় নাই। পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইলেও তাঁহার মাতা তাঁহাকে আন্তরিক ভাল বাসিতেন এবং দ্বিতীয় বার স্বামী বিয়োগের পর তিনি পুত্রের গৃহেই অবস্থান করিয়াছিলেন। থ্যাকারের মৃত্যুর পর বৎসরেই তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়। থ্যাকারের পিতা, রিচ্‌মণ্ড থ্যাকারের সমাধি পার্ক ষ্ট্রীটস্থ সমাধি প্রাঙ্গণে এখনও বর্ত্তমান আছে।

এই রিচ্‌মণ্ড থ্যাকারের পুত্র আমাদের উপন্যাস লেখক উইলিয়ম মেক্‌পীস্ থ্যাকারে ১৮১১ খৃঃ অব্দে ১৮ই জুলাই তারিখে এই কলিকাতা নগরীতেই জন্মগ্রহণ করেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি অতি শৈশবেই থ্যাকারেকে ইংলণ্ডে লইয়া যাওয়া হয় এবং অধ্যয়নের নিমিত্ত তিনি চার্টার হাউসে প্রেরিত হন। তখন তিনি একটি শান্তশিষ্ট নম্র বালক ছিলেন। বিদ্যালয়ের অন্যান্য ছাত্রের সহিত তাঁহার বেশ সদ্ভাব ছিল। কিন্তু অধ্যয়ন বিষয়ে থ্যাকারে বিদ্যালয়ে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইতে পারেন নাই। বাল্যকাল হইতেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করিতে থ্যাকারে বিশেষ পটু ছিলেন, এবং অনেক ব্যঙ্গ কবিতা (Parody) রচনা করিয়াছিলেন। বিদ্যালয়ের প্রতি তাঁহার কিরূপ একটা বিদ্বেষভাব ছিল, চার্টার হাউসকে (Charter House) তিনি অনেকস্থলে বিদ্রূপচ্ছলে শ্লটার হাউস অর্থাৎ বধাগার বলিতেন। কিন্তু খ্যাতি প্রতিপত্তির

সঙ্গে সঙ্গেই এই ভাবটা পরিবর্ত্তিত হয়, এবং নিউকাম্ (Newcomes) উপন্যাসে কর্ণেল নিউকাম্ যে গ্রে ফ্রায়ার্শ ইনে (Grey Friars Inn) মানব জীবনের অভিনয় সমাপ্ত করেন, সেটী চার্টার হাউসেরই একটী চিত্র।

১৮২৯ অব্দে থ্যাকারে কেম্‌ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে ভর্ত্তি হন। কলেজেও তিনি বিশেষ খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করেন নাই। এই সময়েই তিনি স্নব্ (Snob) নামক একটি পত্রিকা প্রকাশের ভার লন, এবং তাহাতে নিয়মিতরূপে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরস্কারের নিমিত্ত টিম্বাক্টু (Timbuctoo) নামে একটি কবিতা ইহাতে প্রকাশ করেন, কিন্তু পুরস্কার পান নাই, তাহা কবি টেনিসন লাভ করিয়াছিলেন। অবশ্য এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে এই পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার অধিকাংশ রচনাই প্রশংসার যোগ্য নহে। জগতের প্রত্যেক কবি, প্রত্যেক লেখকের প্রথম প্রয়াস প্রায় এই শ্রেণীরই।

কেম্ব্রিজ কলেজ ত্যাগ করিবার পর থ্যাকারে কিছুকাল প্যারিসে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। চিত্রবিদ্যা তিনি কখনও সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু ইহাতে তাঁহার একটা স্বাভাবিক নৈপুণ্য ছিল। তাঁহার নিজের উপন্যাসের চিত্র তিনি নিজেই অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। এই চিত্রগুলির নানা দোষ সত্ত্বেও, একথা স্বীকার করিতে হইবে যে পুস্তকে যেখানে যে ভাব ব্যক্ত আছে, চিত্রেও ঠিক সেই ভাবটি অতি সুন্দররূপে পরিস্ফুট করিয়া গিয়াছেন।

উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন এবং সেই অর্থ ভারতবর্ষের কোনো ব্যাঙ্কে জমা রাখিয়াছিলেন। ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হওয়ায় তাঁহার সে অর্থ নষ্ট হয়।

প্রধানতঃ অর্থোপার্জ্জনের জন্যই থ্যাকারে সাহিত্যিক জীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন। ফ্রেজার্স মেগেজিন্ (Fraser's Magazine) নামক পত্রিকায় তিনি প্রথমে কাজ আরম্ভ করেন। সে সময়ে এই পত্রিকার প্রধান লেখক সুবিখ্যাত টমাস্ কার্লাইল্। অবশ্য থ্যাকারে যাহা কিছু লিখিতেন সমস্তই অনুমোদিত বা প্রকাশিত হইত না।

এইখানে থ্যাকারের সহিত ডিকেন্‌সের সংক্ষেপে তুলনা করা যাইতে পারে। ডিকেন্স থ্যাকারে অপেক্ষা এক বৎসরের ছোট, কিন্তু থ্যাকারের পূর্ব্বেই ডিকেন্‌স্ বেশ পশার প্রতিপত্তি জমাইয়া লইয়াছিলেন। থ্যাকারে যখন ফ্রেজার মেগেজিনে প্রবন্ধ লিখিতে ব্যস্ত তাহার পূর্ব্বেই ডিকেন্‌সের পিক্‌উইক্ পেপার্‌স্, ওলিভার টুইষ্ট ও নিকোলাস্ নিক্‌ল্‌বি প্রকাশিত ও সাধারণের দ্বারা সমাদৃত হইয়াছিল। ডিকেন্সের নাম পাঠকমণ্ডলীর কাহারও অবিদিত ছিলনা, থ্যাকারের নাম তাঁহার বন্ধুবর্গ ভিন্ন অপর কেহ তখনও জানিত না। এমন কি উপন্যাস বিভাগে তখন ডিকেন্সের প্রতিপত্তি প্রায় সেক্ষপীয়রের তুল্য হইয়া উঠিয়াছিল।

ইহার কারণ কি?—ডিকেন্স যে থ্যাকারের তুলনায় অসামান্য মেধাসম্পন্ন ছিলেন তাহা নহে। কিন্তু তিনি নিজের শক্তির উপর নির্ভর করিয়া দাঁড়াইতে জানিতেন, তিনি

জীবনের একটা স্থির উদ্দেশ্য ছিল, কখনও আত্মশক্তিতে অবিশ্বাস করিতেন না।

আর থ্যাকারের নিজের শক্তির উপর তেমন বিশ্বাসই ছিল না; সাধারণের দ্বারা তাঁহার পুস্তক সমাদৃত হইবে ইহা তিনি মনে করিতে পারিতেন না। তিনি নিজের ভাগ্যের দোষ দিতেন; এবং মনে করিতেন তাঁহার রচনায় যে সামান্য দুই একটি দোষ আছে সেগুলি তাঁহার খ্যাতির পক্ষে বিশেষ প্রতিকূল। অধিকন্তু তিনি অলসপ্রকৃতির লোক ছিলেন, পরিশ্রম করিতে কাতর হইতেন। সমালোচকদিগের তীব্র কটাক্ষে উৎসাহহীন হইয়া পড়িতেন--এবং তাহাদের মতামতে তাঁহার উদ্দেশ্যও অনেক সময় পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইত। সম্পাদক তাঁহাকে প্রবন্ধের আয়তন কমাইতে বলিলে তিনি অন্তরে দারুণ আঘাত পাইতেন, ডিকেন্স হয়ত এরূপ অনুরোধে ভ্রুক্ষেপও করিতেন না।

২৬ বৎসর বয়ঃক্রম কালে থ্যাকারে কর্ণেল ম্যাথিউ শ-এর কন্যা কুমারী ইসাবেলাকে বিবাহ করেন। কবিগণের ভাগ্যে সচরাচর যাহা ঘটিয়া থাকে থ্যাকারের ভাগ্যেও তাহাই হইয়াছিল, এ বিবাহে তিনি সুখী হইতে পারেন নাই। এই পত্নীর গর্ভে তাঁহার তিনটি কন্যা জন্মে। জ্যেষ্ঠাটির নাম এখন মিসেস্‌ রিচমণ্ড রিচী, ইংরাজি সাহিত্যের পাঠক সম্প্রদায়ের অনেকেরই নিকট ইনি সুপরিচিত। তিনিও তাঁহার পিতার ন্যায় অনেক উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। দ্বিতীয়া কন্যা জেনের শৈশবেই মৃত্যু হয়। কনিষ্ঠা কন্যার সহিত সুপ্রসিদ্ধ লেখক ও সমালোচক লেস্‌লি ষ্টিফেনের বিবাহ হয়। ১৮৪০ অব্দে থ্যাকারের

(Paris Sketch Book) প্রকাশিত হয়। ডিকেন্‌স্‌ উপন্যাসে যেমন (Boz) অভিধা গ্রহণ করিয়াছিলেন, থ্যাকারেও সেইরূপ এই পুস্তকে মাইকেল এঞ্জেলো টিটমার্শ (Michael Angelo Titmarsh) নাম লইয়া ছিলেন। এই সময়েই তিনি Punch পত্রিকায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন, এবং কিঞ্চিৎ প্রতিপত্তিও লাভ করেন। কিন্তু কবি হইবার অভিলাষ তাঁহার আদৌ ছিল না। মিল্টন, গোল্ডস্মিথ, স্কট, ম্যাথিউ আর্ণল্ড প্রভৃতি লেখকগণ গদ্যে অনেক পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন বটে, কিন্তু কবিযশই তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। থ্যাকারে আমোদের জন্যই কেবল কতকগুলি কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন মাত্র। একটি ক্ষুদ্র কবিতায় তাঁহার লেখনী তাহার প্রভুর বিষয় বলিতেছে :—

"Since he my faithful service did engage,
To follow him through his queer pilgrimage,
I've drawn and written many a line and page.
I have writ the foolish fancy of his brain."

প্রভু মোরে ভৃত্যরূপে নিয়েছেন বরে'
পিছু পিছু গেছি আমি তাঁরি পথ ধরে'।
লিখেছি অনেক ছত্র পূর্ণ করি পাতা,
যা কিছু প্রলাপে তাঁর ভরে' ছিল মাথা।

ইহা হইতেই বুঝা যায় যে এই সকল কবিতার প্রতি তাঁহার বিশেষ কোনো আস্থা ছিল না।

ভ্যানিটি ফেয়ার (Vanith Fair) উপন্যাস থানি থ্যাকারে সমস্ত শক্তি দিয়া লিখিয়াছিলেন

ছড়াইয়া পড়ে। এতকাল তিনি কেবল পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতেন মাত্র, এরূপ বৃহৎ আয়তনের উপন্যাস এই প্রথম। সাঁইত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে থ্যাকারে ইংলণ্ডে উচ্চশ্রেণীর লেখকরূপে গণ্য হইয়া কীর্ত্তি লাভ করেন। লোকে ডিকেন্স বা কারলাইল্‌কে যেরূপ লেখক বলিয়া জানিত, থ্যাকারেকে সেভাবে ইহার পূর্ব্বে কেহই জানিত না, কিন্তু এই সময় হইতে তাঁহার নাম সমগ্র ইংলণ্ডময় রাষ্ট্র হইয়া গেল। জানুয়ারী সংখ্যা এডিনবরা রিভিউতে থ্যাকারের সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল; ইহাতে থ্যাকারে সেই পর্য্যন্ত যে সকল পুস্তক লিখিয়াছিলেন সেগুলির এবং বিশেষতঃ ভ্যানিটি ফেয়ারের সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবন্ধের শেষ বাক্যটি এই,

"A writer with such a pen and pencil as Mr. Thackeray's is an acquisition of real and high value in our literature."

অর্থাৎ, থ্যাকারের ন্যায় লেখক ইংরাজি সাহিত্যের যথার্থই গৌরববর্দ্ধনকারী।

থ্যাকারের Newcomes উপন্যাসটি আগাগোড়া বিদ্রূপ এবং পরিহাসে পরিপূর্ণ। মানুষ মানুষকে কিরূপে ছলনা করে ইহাতে তাহাই দেখান হইয়াছে। একটি দৃশ্যে রমণলালের কথা আছে—রমণলাল ভারতবর্ষের সামান্য বণিকমাত্র, কিন্তু বিলাতভ্রমণে গিয়া সে তথায় আপনাকে ভারতীয় রাজপুত্র বলিয়া পরিচয় দিত। সেখানে সে এমন খাতির জমাইয়া লইয়াছিল যে, সমস্ত লণ্ডন সহর রমণলালের কথাই আলোচনা করে, লণ্ডনের যুবতীগণ তাহাকে বিবাহ করিতে উৎসুক—তাহারা তাহাকে দেবতার ন্যায় পূজা করে। এটি স্ত্রীলোকদের প্রতি আক্রমণ! বার্ণস্‌ নিউকামের চরিত্রে থ্যাকারে অর্থলোভী যুবকসম্প্রদায়কে আক্রমণ করিয়াছেন। বার্ণস্‌ অর্থসম্বন্ধে বড় হুঁসিয়ার লোক ছিল। সে রমণলালের প্রকৃত আর্থিক অবস্থা কর্ণেলের নিকট জানিয়া লইয়াছিল। প্রয়োজন হইলে সে শত্রুর নিকট হইতেও কায হাঁসিল করিয়া লইতে জানিত, এবং অর্থসম্বন্ধে শাইলকের ন্যায় কঠোর ছিল। উপন্যাসের নায়ক ক্লাইব নিউকাম্‌ দুর্ব্বল চরিত্র এবং পরিশ্রম করিতে বিমুখ, কিন্তু তাহার উচ্চ আশা ছিল। সে চিত্রবিদ্যা শিখিতেছিল; কিন্তু এই ব্যবসায়ে সে মনে মনে অপমান বোধ করিত। নিজের ক্ষমতার উপর নির্ভর করিতে সে আদৌ জানিত না, নিজের উপর একটা ঘৃণার ভাব ছিল। এই চরিত্র চিত্রিত করিবার সময় থ্যাকারে বোধহয় নিজের জীবনী কতকটা লিখিয়া ফেলিয়াছেন। উপন্যাসের নায়কের হউক আর নায়িকারই হউক, এই সকল স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা ভিন্ন মানব চরিত্র সুচিত্রিত করা যায় না। থ্যাকারের এইরূপ ধারণা ছিল। নিউকাম উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদগুলি বড়ই বিষাদপূর্ণ।

থ্যাকারের বর্ণনা অতি বাস্তব এবং খুব স্বাভাবিক। ভাব ও ভাষা সম্বন্ধে কেহ থ্যাকারের নিন্দা কখনও করে না। গল্প দ্বারা কোন সদুপদেশ দান করিবার দিকে তাঁহার সমস্ত উপন্যাসের একটা লক্ষ্য দেখা যায়।

থ্যাকারে তাঁহার উপন্যাসে লোকের দোষ এবং নির্ব্বুদ্ধিতা দেখাইয়া গিয়াছেন,

এইজন্য অনেকে তাঁহাকে মানবদ্বেষী বলিয়া থাকে। এভাবে সকল ব্যঙ্গরচনার লেখককেই (satirists) মানবদ্বেষী বলা যাইতে পারে। পোপ, সুইষ্ট প্রভৃতি অনেক ইংরেজ লেখককেই এই শ্রেণীভুক্ত করা যায়; থ্যাকারেও তাঁহাদের মধ্যে একজন। কিন্তু লেখকের হৃদয়ের ভাবটিকে তো দেখিতে হইবে। ইহাও দেখা আবশ্যক যে লেখক যে সকল লোক অথবা যে সকল রীতিনীতি লইয়া ব্যঙ্গ করিতেছেন সেগুলি যথার্থই ব্যঙ্গের যোগ্য, কিম্বা তাঁহার নিজের রুক্ষ মন্দ স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়াই সকল বিষয়কে তাচ্ছিল্য করিতেছেন কিনা। থ্যাকারের স্বভাব, আমরা যতদূর জানি, অতি নম্র, শান্ত এবং দয়ার্দ্র ছিল। থ্যাকারেকে কিছুতেই মানবদ্বেষী বলা যায় না। সেক্ষপীয়রের হ্যাম্‌লেট্‌ও ব্যঙ্গপ্রিয় ছিলেন, কিন্তু হ্যাম্‌লেট্‌কে মানবদ্বেষী কে বলিবে? তবে থ্যাকারে মানবহৃদয়ের দুর্ব্বলতা এবং দোষগুলিই স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন, এই দিকে তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। তাঁহার উপন্যাসের নায়কের চরিত্র অঙ্কিত করিবার সময়েও তিনি বিস্মৃত হন নাই যে চরিত্র স্বাভাবিক ভাবাপন্ন করিয়া অঙ্কন করিতে গেলে, দোষ এবং দুর্ব্বলতা তাহাতে থাকা চাই।

তবে একথাও স্বীকার করিতে হইবে যে তিনি সকল বিষয়ের, সকল চরিত্রের মন্দ অংশটাকেই অধিক প্রাধান্য দিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার উপন্যাসের প্রত্যেক চরিত্রেই অল্পাধিক উপহাস মিশ্রিত আছে। এই কারণেই কোন সমালোচক থ্যাকারে সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

'He is the most humorous of all satirists, and the most satirical of all humorists."

ভ্যানিটিফেয়ার লিখিবার পর হইতে থ্যাকারে তাঁহার পুস্তক হইতে কিছু কিছু অর্থ উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং তাহাতেই তাঁহার স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। কিন্তু এখনও তাঁহার মনের সন্দেহটুকু যায় নাই, তিনি এই আয়ের উপর নির্ভর করিতে পারিতেন না, কারণ তাঁহার পুস্তকের উপর পাঠক সমাজের যে একটা শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে তাহা বিশ্বাস করিতেন না। এই সময়ে জেনারেল পোষ্টাফিসে সহকারী সেক্রেটারির পদ খালি হওয়ায় থ্যাকারে সেই কর্ম্মের জন্য আবেদন করেন। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্যক্রমে তিনি সফলকাম হন নাই। তারপর তিনি সিবিল সার্ব্বিসে প্রবেশ করিবারও চেষ্টা করেন, সে বিষয়েও অকৃতকার্য্য হন।

এই সময়ে কিছুকাল তিনি বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেন। বাগ্মিতার জন্য তিনি কখনও খ্যাতি লাভ না করিলেও কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম বক্তৃতাটি ইংরাজী পাঠকগণ অনেকেই পড়িয়া থাকিবেন। সেটি "English Humourists of the 18th Century", ইহা সুইফ্‌ট, এ্যাডিসন্, ষ্টীল্, স্মলেট্, ফিল্‌ডিং প্রভৃতি লেখকের সম্বন্ধে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধের সমষ্টিমাত্র।

এই উদ্দেশ্যে তিনি আমেরিকা ভ্রমণে বাহির হন। আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি পার্লামেণ্টের মেম্বর হইবার জন্য চেষ্টা করেন এবং সে চেষ্টাতেও বিফল হন।

১৮৫৯ অব্দে তিনি কর্ণ্‌হিল্‌ পত্রিকার সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন। এই বিরাট কার্য্য তিনি সুচারুরূপেই চালাইয়াছিলেন, প্রথম প্রকাশকালেই ইহার গ্রাহকসংখ্যা এক লক্ষের উপর হইয়াছিল। ইহার লেখকগণ অধিকাংশই সুপ্রসিদ্ধ কবি এবং সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত। টেনিসন, মিসেস ব্রাউনিং, মিসেস গ্যাস্‌কেল্‌, চার্লস্‌ লেভার, জন্‌ রাস্‌কিন্‌, এনটনি ট্রলপ্‌, লর্ড লিটন্‌, ম্যাথিউ আর্ণল্ড প্রভৃতি খ্যাতমামা লেখকগণ এই পত্রিকায় প্রবন্ধ দিতেন। থ্যাকারে দুই বৎসরের উপর ইহার সম্পাদক ছিলেন, এবং মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত ইহার জন্য প্রবন্ধ লেখেন।

এইবারে আমরা থ্যাকারের জীবনের শেষ অঙ্কে আসিয়াছি। ১৮৬২ সালে তিনি প্যালেস্‌ গ্রীনের নূতন বাটীতে গিয়া অবস্থান করেন এবং পর বৎসর সেই গৃহেই তাঁহার মৃত্যু হয়। খৃষ্টম্যাস্‌ ডের পূর্ব্বদিন (২৪শে ডিসেম্বর ১৮৬৩) প্রাতে, মাত্র ৫৩ বৎসর বয়সে, হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। এই অকালমৃত্যুতে সাহিত্য-জগৎ যে, একটি উজ্জ্বল প্রতিভারত্ন হারাইল তাহা বলা বাহুল্যমাত্র।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

জেনারেল নোগী*

পোর্ট আর্থারবিজয়ী রুষজাপান যুদ্ধের প্রধান অভিনেতা জেনারেল নোগী পৃথিবী-দুর্ল্লভ সম্রাট মিকাদো মুৎসাহিতোর লোকান্তরের সঙ্গী হইতে চলিয়া গিয়াছেন একথা সকলেই জানেন। জাপানের মান অক্ষুণ্ণ রাখিতে, জাতীয়তার চরম বিকাশ প্রত্যক্ষ ফলাইয়া রণনৈপুণ্যে সমগ্র সুসভ্য জগৎ স্তম্ভিত করিতে নোগী কিনা করিয়াছিলেন?

পোর্ট আর্থারের ভীষণ যুদ্ধে যখন গোলা-গুলির অবিরাম বর্ষণে সহস্র সহস্র জাপানীসেনা প্রাণের দায় হইতে মুক্তি পাইতে লাগিল, নোগী তখনও অবিচলিতভাবে উৎফুল্ল নেত্রে যোদ্ধৃবৃন্দের প্রতি দৃক্‌পাত করিয়া অভয়বাণী শুনাইতেছিলেন। তাঁহার মুখনিঃসৃত বাক্য-রাশি সতেজে উচ্চ হইতে উচ্চস্বরে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল:—

সৈন্যগণ, তোমরা যে কর্ত্তব্যভার শিরোধার্য্য করিয়াছ, তাহা বড়ই দুরূহ, তবুও প্রাণপণে পালনীয়। জন্মভূমি জাপানের নিরাপদ অস্তিত্ব এবং তোমাদের বীর-সম্মান এই যুদ্ধের ফলাফলের উপর একান্তভাবে নির্ভর করিতেছে। দারুণ বাধাবিঘ্নসকল অতিক্রম করিয়া দেশ-মাতার সাহসী পুত্রের মত তাঁহার স্নেহের ঋণ সম্পূর্ণ পরিশোধ করিতে যত্নবান হও। শত্রুসমূহ ঘোর প্রতিকূলতা করিবে সত্য, যদি তোমাদের অধিনেতাগণ করাল মৃত্যুগ্রাসে পতিত হন, তাঁহাদিগের অপেক্ষা নিম্নপদস্থিত আর কোন বীর কর্ম্মচারীকে সেই সম্মানের পদে বরণ করিবে, যদি ইঁহারাও না অব্যাহতি পান এবং নিম্নতর পদবীর অন্য সকলেও আহত হন তবে পদাতিক সৈন্যগণ সে পদ গ্রহণ করিবে। বাধা যেমনই হউক, কিছুতেই প্রতিনিবৃত্ত হইবে না, প্রত্যেকে শেষ পর্য্যন্ত জন্মভূমির রক্ষাসাধনে যুদ্ধ করিয়া, সম্মুখ সংগ্রামে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া, যোদ্ধার চিরঅভীষ্ট স্বর্গ লাভ করিবে।

জাপানের জয় হইল। দেশে ফিরিবার কালে নোগী দেখিলেন,—

"ভরি ময়দান পাহাড় প্রমাণ
পড়ে আছে মৃতদেহ।"

* * *

তাই সংক্ষুব্ধচিত্তে সেই পাহাড় প্রমাণ মৃতের পানে চাহিয়া ভাবিতেছেন :—

"ভাবিতেছি শুধু স্বদেশে ফিরিয়া
মন যে কেমন হ'বে,...
ফিরিলনা যারা তাদের বারতা
সকলে শুধাবে যবে!
সুখে দুখে যারা দিন কাটায়েছে
পাকায়েছে চুল দাড়ি,
ক্ষীণ আশা লয়ে আছে পথ চেয়ে,...
তারা এসে তাড়াতাড়ি
শুধালে বারতা, কী দিব জবাব?
'গেছে সব গেছে মারা,
কেল্লা যাহারা করিল দখল
কেউ ফেরে নাই তারা।'
(শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদ।)

ধন্য নোগী পরের দুঃখ ভাবিয়াই তুমি আকুল, নিজের পুত্রের খবর কিছু রাখ কি? যারা দেশের জন্য যুদ্ধ করিয়া যুদ্ধসমাধি লাভ করিয়াছে, তাঁদের মধ্যে যে তোমার দুইটী পুত্রও স্থান লাভ করিয়াছে ইহা তোমার স্মরণপথে একবার জাগরুক হয় কি? জেনারেল নোগীর পুত্রদ্বয়ের শোচনীয় মৃত্যু সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত একজন প্রত্যক্ষদর্শী ইংরেজ লেখকের বর্ণনাই যথেষ্ট :—

অবরোধের বহুদীর্ঘ সপ্তাহসকল ধরিয়া, পরাজয়-নৈরাশ্যে শ্রান্ত সৈন্যগণকে ক্রমে নীরবে ক্ষয় হইতে দেখিয়া, যুদ্ধ প্রান্তরে তাঁহার আজ্ঞায় মৃত্যুঅন্তর্হিত অসংখ্য আত্মার কাতর দীর্ঘশ্বাস কল্পনা করিয়া তাঁহার মনের শান্তি ছিল না, হৃদয়ের ব্যথিত তন্ত্রীগুলি কে যেন দিবারাত্রি টানিয়া ছিঁড়িয়া দিতেছিল—তাই শিবিরে যখন অন্যে নিদ্রায় বিরাম উপভোগ করিত, তখন আপনাকে একেলা জানিয়া তিনি নতমস্তকে অজস্র অশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে প্রার্থনা করিতেন, এ বলিদানের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ কোন কঠোর শাস্তির বিধান যেন হয়। পূর্ব্বেই মৃত্যুর নিষ্ঠুর হস্ত একপুত্রকে তাঁহার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছিল, যুদ্ধ দুর্দ্দিনের সর্ব্বাপেক্ষা অন্ধকার প্রহরে যখন সমস্তই আশাশূন্য মনে হইতেছিল তখন মেটভি পর্ব্বতে, দ্বিতীয় পুত্রও মৃত হইল! এই নিদারুণ সংবাদে তাহার জীবনে যে অনন্ত কৃষ্ণ মেঘচ্ছায়া পুঞ্জীভূত হইল, বাহ্যিক ব্যবহারে তাহার কোনও আভাষ মাত্র প্রকাশ করেন নাই!

জেনারেল নোগী

এই প্রসঙ্গে একটী করুণা উদ্দীপক ঘটনা মনে পড়িতেছে। বহুপূর্ব্বে ইংলণ্ডের রাজা হেনরীর পুত্রকন্যা নর্ম্মাণ্ডিতে কোনও বিবাহ উৎসব উপলক্ষে সমুদ্রপথে গমন করিয়াছিলেন, ফিরিয়া আসিবার সময় মগ্নশৈলে আহত হইয়া জাহাজ ডুবিতে আরম্ভ করিলে, রাজপুত্র ও রাজকন্যা জীবন-তরীতে (Life boat)

আরোহণ করিয়া সমুদ্র পার হইবার চেষ্টা পাইলে অন্য কতকগুলি জাহাজের যাত্রী প্রাণের দায়ে তাহাতে ঝুঁকিয়া পড়িল। অমনি ক্ষুদ্র তরী ডুবিয়া গেল, রাজপুত্র ও রাজকন্যা সলিলসমাধি লাভ করিলেন। এই ভীষণ সংবাদ ইংলণ্ডেশ্বর হেন্‌রীর কর্ণগোচর হইবার পর হইতে কেহ কখনও আর তাঁহার মুখে হাসি দেখিতে পায় নাই। কিন্তু কর্ম্মবীর সংযতচিত্ত জেনারেল নোগীর অন্তর ভীষণ মর্ম্মপীড়ার দুঃসহ দহনে জ্বালাময় অগ্নিকণার জ্বলন্ত স্ফুলিঙ্গে দহিয়া গেলেও বাহিক অবস্থার কোনও পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। পূর্ব্বোক্ত ইংরেজ লেখক তাঁহার মন্তব্যের এইরূপে উপসংহার করিয়াছেন :—

এখন নিঃসন্তান, নির্ব্বংশ হইলেন, এই নিদারুণ বিপদ্‌পাতে মনে করিলেন, তাঁহার কর্ত্তব্যবুদ্ধির আদেশে প্রেরিত, মৃত্যুশায়িত অগণ্য ক্ষুব্ধ আত্মার বিরোধ চীৎকার যেন শান্ত হইয়া গেল। ইহার পর যখনই কেহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইত, হাসিমুখে তাহাকে অভ্যর্থনা করিতেন, দরিদ্র সৈনিকের শিবিরে যাইয়া খাদ্যদ্রব্য ভাগ করিয়া গ্রহণ করিতেন, সদা সর্ব্বদা বুকের পকেটে যে মিষ্টান্ন (চকোলেট) থাকিত তাহাই বিতরণ করিতেন, সকলের পানীয় জল সম্বন্ধে সম্বাদ লইতেন এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণীর প্রেরিত বিবিধ ফলের ডালি অর্দ্ধেক বিলাইয়া দিতেন; কখনো ভুলিয়াও কোন সামান্য কথায় কিম্বা ক্ষুদ্র কাজে পুত্র বিচ্ছেদের অসীম কষ্ট তিলমাত্র দেখাইতেন না!

এইরূপে ভীষণ বিপ্লবের যবনিকা পতনের পরেও জেনালের নোগী সম্রাট মিকোদো ম্যুৎসহিতোর সেনাপতিত্বে বরিত হইয়া সসম্মানে জীবন-নাট্যের সুদীর্ঘ দ্বিষষ্টিতম বৎসর কাটাইয়াছেন; কোন দিন কোনরূপ বিপাক ঘটে নাই, পূর্ব্বে যেমনটী ছিলেন তেমনি রহিলেন। তবে আজ সম্রাটের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই কেন নিজের মৃত্যু ডাকিয়া আনিলেন? কেন নিজের জীবনের এ হেন পরিণাম অন্বেষণ করিলেন?

নোগীর এই অত্যাশ্চর্য্য মৃত্যু বিবরণী লইয়া অনেক মাসিক এবং সংবাদ পত্রের স্তম্ভ পরিপূর্ণ হইয়াছে; ব্যক্তিভেদে রুচিভেদে ইহার কারণ-কল্পনায় মতের বিভিন্নতা প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু সেসকলের কোন মূল্য নাই। আসল বিষয় জানিতে হইলে নোগীর অন্তিম উইলের শরণ লওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। নোগী পূর্ব্বেই ভাবিয়াছিলেন তাঁহার বিস্ময়কর মৃত্যু লইয়া সমস্ত সভ্য জগতে একটা বিরাট হুলস্থূল পড়িবে—কারণ অনুসন্ধিৎসু হইয়া অনেকেই হয়ত জিজ্ঞাসা করিবে, নোগী এইরূপে নিজের জীবনে অন্তিম যবনিকা টানিয়া দিলেন কেন? দূরদর্শী জেনারেল তাই মৃত্যুর পূর্ব্বেই একখানা উইল রাখিয়া গিয়াছেন :—

যিনি চলিয়া গিয়াছেন তাঁহারি পদাঙ্ক অনুসরণ করিবার জন্য, আমি স্বেচ্ছায় স্বয়ং মৃত্যুর শরণাগত হইলাম, ইহাতে যে পাপ হইল তাহা বিদ্রোহ নয়। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে, দশম সেজির যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের সৈনিকগণের মধ্যে বীরত্বের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইতে দেখা গিয়াছিল, তাহার জন্য আমিই দায়ী। সেই অবধি এত দিন আমি মৃত্যুসুযোগ খুঁজিয়াও রাজকীয় সম্মানে অযোগ্য আপনাকে পরিপুষ্ট করিয়া কেবল বাঁচিয়াই আছি। সম্প্রতি আমি ক্রমে বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছি, অধিক দিন আর কার্য্যক্ষম থাকিতে পারিব না, এমন সময়ে উপস্থিত এই দুঃসহ মহা বেদনা আমার মনের পক্ষে যে কি ভয়ানক তাহা প্রকাশ করিবার মত কোন ভাষা আমার একেবারেই নাই। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় এই মনই আমাকে নূতন কর্ত্তব্যের পথ দেখাইয়া দিল।

প্রভুর জন্য অনুচর ইহা অপেক্ষা আর কিছু

উৎসর্গ করিতে পারে বলিয়া আমরা জানি না—ধারণাও করিতে পারি না। জগতের চক্ষে এরূপ দৃষ্টান্ত এই নূতন। সম্রাট মিকাদো মুৎসোহিতো লোকান্তরিত হওয়ায় নোগী পরলোকে প্রভুর পদসেবার্থ অনুগামী হইলেন, আর তাঁহার সাধ্বী পত্নী সতীত্বের উজ্জ্বল প্রতিমূর্ত্তি মিশেস নোগীও মর্ত্ত্যজ্বালা মিলনের আয়ুধরাগে রঞ্জিত করিয়া স্বামীর অনুমৃতা হইলেন। কি সুন্দর দৃশ্য!

সার হেমিণ্টন লিখিয়াছেনঃ—'If I were Japanese, I would venarate Nogi." কিন্তু আমরা একটু বিভিন্ন সুরে বলিতেছি ঃ—"বাঙ্গালী ও জাপানী, এই দুয়ের মধ্যে যে পার্থক্যটুকু আছে নোগীর পবিত্র আত্মোৎসর্গের ফুটন্ত সুরভি নিশ্বাসে সেই পার্থক্য লয় হইয়া আমাদের হৃদয়ের প্রতি স্তরে স্তরে সেই মহাপুরুষের প্রতি ভক্তিতরঙ্গ উথলিয়া উঠিয়াছে।"

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

আমার বাল্যকথা

(৮)

বিলাত যাত্রা

প্রেসিডেন্সি কালেজ থেকে আমার বিলাত যাত্রা। আমি কখনও স্বপ্নেও যা ভাবি নাই আমার ভাগ্যে তাই ঘটল। আমাদের জীবনে পদে পদে দেখা যায়—দৈবের কি বিচিত্র গতি! এক একটা অদৃষ্টপূর্ব্ব আকস্মিক ঘটনা এসে কত সময় আমাদের জীবনস্রোতকে কোন্ এক অজ্ঞাত নূতন পথে যেন বলপূর্ব্বক টেনে নিয়ে যায় যার পূর্ব্বাভাস কিছুই পাওয়া যায় নাই। আমার জীবনে এ কথা সপ্রমাণ দেখতে পাই। আমি বাল্যকালে এক ভাবে শিক্ষিত হচ্ছিলুম, আমার জীবন একভাবে গঠিত ও নিয়মিত হচ্ছিল দৈব-ঘটনায় কোন এক বন্ধু-মিলনে সে সমস্তই উল্টে গেল, আমার জীবন-প্রবাহ অন্যদিকে বিবর্ত্তিত হল। সেই বন্ধুর মন্ত্রণায় আমার বিদেশযাত্রা, ইংলণ্ডে গিয়ে সিবিল সর্ব্বিসের পরীক্ষা দেওয়া ইত্যাদি কারণে আমার পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট জীবনের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটল।

বাল্যকাল হতে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে আমার জীবন-সূত্র গ্রথিত ছিল। কিন্তু অনেকদিন পর্য্যন্ত আমাদের এই সমাজ এমন মৃদু মন্দ গতিতে চলছিল যে তার প্রভাব বিশেষ অনুভব করতে পারিনি। আমার পিতা সিমলা পাহাড় থেকে ফিরে আসবার পর এমন এক ঘটনা উপস্থিত হ'ল যাতে সেই সমাজের ইতিহাসে এক নূতন পৃষ্ঠা উদ্ঘাটিত হল। সেই ঘটনা হচ্ছে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে মিলন। কেশবের আগমনে আমাদের সমাজে নবজীবনের সঞ্চার হল। তিনি কোন্ সূত্রে প্রথমে আমাদের এই দলে প্রবেশ করলেন তা আমার বেশ মনে পড়ে। তিনি প্রথমে আমার সঙ্গে এসে সাক্ষাৎ করেন—আমি তাঁকে আমার পিতার নিকট নিয়ে যাই। তিনি আপনাদের কুলাচার অনুসারে গুরুমন্ত্র গ্রহণ করবেন কিনা এই বিষয় নিয়ে তাঁদের মধ্যে মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়েছিল।

পিতার সহিত তিনি এই বিষয় পরামর্শ করতে আসেন। পরামর্শে স্থির হল যে এই মন্ত্রে যখন তাঁর বিশ্বাস নাই তখন তাহা গ্রহণ করা যুক্তিসিদ্ধ নয়। মন্ত্র গ্রহণ না করাই তিনি স্থির করলেন। সেই অবধি তাঁর উপর তাঁর বাড়ীর লোকদের অত্যাচার আরম্ভ হল এবং পরিশেষে তিনি সব ছেড়ে ছুড়ে সস্ত্রীক আমাদের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করলেন—পিতাও তাঁকে স্নেহপূর্ব্বক আপনার পুত্ররূপে বরণ করে নিলেন। সেই সময় থেকে কেশবচন্দ্র ও তাঁর পত্নী আমাদের পরিবার ভুক্ত হয়ে আমাদের বাড়ীতে কিছুকাল বাস করেন। ব্রাহ্মসমাজের সেই মধ্যাহ্নকাল;—কেশবের প্রভাবে সমাজ এক নূতন মূর্ত্তি ধারণ করলে। আমিও সেই উৎসাহ তরঙ্গে গা ঢেলে দিলুম। ব্রাহ্মসমাজের বেদীহতে পিতার হৃদয়ভেদী প্রার্থনা ও উপদেশ, আর আমাদের রচিত নব নব ব্রহ্মসঙ্গীত মিলে সমাজে সাপ্তাহিক উপাসনার মধ্যে এক নূতন শ্রী, নূতন প্রাণ সঞ্চারিত হল। আমি এই সব নিয়ে মেতে আছি এমন সময় মনোমোহন ঘোষ আমাদের বাড়ী অতিথি হয়ে থাকতে এলেন। যেন একটা বোমা আকাশ থেকে পড়ে সব ভেঙ্গে চুরে দিয়ে গেল।

মনোমোহন ঘোষ

মনোমোহনের সঙ্গে আমাদের পৈতৃক সম্বন্ধ। তাঁর পিতা রামলোচন ঘোষ আমার পিতামহ দ্বারিকানাথ ঠাকুরের পরম বন্ধু ছিলেন, ঐ বন্ধুতা সূত্রে মনোমোহনের সঙ্গে আমারও বন্ধুতা জন্মেছিল। একজন ইংরাজ মাষ্টার আমাদের পড়াতে আসতেন তিনি মনোমোহনের সম্বন্ধে বলতেন "An old head on young shoulders"—যুবার ধড়ে বুড়ার মাথা। বাস্তবিকও তাই। তিনি আমার চেয়ে কিছু ছোট ছিলেন, তাঁর বয়স তখন ১৭ হবে অথচ Indian Mirror সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদকীয় ভার তিনি অকাতরে স্কন্ধে নিলেন। ঐ বয়সে তাঁর মাথায় Civil Service পরীক্ষার কল্পনা খেলছিল। দুঃখের বিষয় যে তাঁর মনের সাধ পূর্ণ হল না। তিনি ভেবেছিলেন এক, বলবত্তর দৈব তাঁকে অন্যদিকে নিয়ে গেল। আমার জীবনক্ষেত্র বোম্বাই, তাঁর হ'ল বাঙ্গলা দেশ; আমার কর্ম্ম গবর্ণমেণ্টের চাকরী, তাঁর স্বাধীন আইন ব্যবসা; তিনি যে ক্ষেত্রে জয়লাভ করলেন সেই তাঁর উপযুক্ত ক্ষেত্র, আমিও আমার উপযুক্ত কর্ম্মক্ষেত্র পেলুম। কেবল দুঃখ রইল আমাদের একযাত্রায় পৃথক ফললাভ ঘটলো।

আমাদের বিলাত যাওয়া একরকম ঠিক হয়েছে এমন সময় আমরা একদিন Botanical Gardenএ বেড়াতে যাই। পার হবার সময় একটা ষ্টীমারের ধাক্কায় আমাদের নৌকা উল্টে গেল। আমি সাঁতার জানতুম নৌকার একভাগ কোনরকম করে আঁকড়ে ধরে রইলুম কিন্তু মনোমোহন নৌকার তলায় পড়ে হাবুডুবু খেতে লাগলেন, তাঁর আর উদ্ধারের কোন উপায় ছিল না। শেষে অনেক ডাকাডাকির পর এক পান্‌সীর মাঝি তাঁকে টেনে ওঠালে। আমরা কাউকে কিছু না বলে সেই ভিজে কাপড়ে আমাদের গম্য স্থানে চলে গেলুম—সেখানে কাপড় শুকিয়ে বেড়িয়ে চেড়িয়ে যথা সময়ে বাড়ী

ফিরলুম। এই বৃত্তান্ত বাবামহাশয়ের কর্ণগোচর হওয়াতে আমাদের বিলাত যাওয়া বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল। তিনি বল্লেন "তোমরা এখানেই আপনাদের আপনারা সামলাতে পার না তোমাদের ঐ দূরদেশে পাঠান যায় কি করে ? তোমাদের কেউ সঙ্গী নেই, রক্ষক নেই, আপনার উপরে নির্ভর করেই যেতে হবে, তোমরা তা পেরে উঠবে কিনা এখন আমার সন্দেহ হচ্ছে।" বাস্তবিক ভেবে দেখতে গেলে আমরা অসম সাহসের কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম বলতে হবে। আমরা দুটি তরুণবয়স্ক বালক আর তখন ইংলণ্ডে যাওয়া এখনকার মত এপাড়া ওপাড়া নয়। Suez Canal তখন প্রস্তুত হয় নাই, Suez থেকে Alexandria পর্য্যন্ত রেলপথ। এই পথের সমুদায় বিঘ্নবাধা অতিক্রম করে যাওয়া আমাদের মত বালকের পক্ষে সহজ ছিল না। তখনকার কালে লোকে 'কালাপাণি' পার হওয়া এক অসাধ্য সাধন মনে করত—অকারণে নহে; কেন না আমাদের মধ্যে প্রথম যে দুইজন যাত্রী যান, রামমোহন রায় ও দ্বারিকানাথ ঠাকুর, তাঁদের আর দেশে ফিরে আসতে হয় নাই। কাজেই লোকেদের ধারণা ছিল যে ও দেশে গেলে আর ফিরতে হবে না—

"The land from whose bourne
no traveller returns"

যা হোক্ শেষে আমাদের যাওয়াই সাব্যস্ত হল। আমি ত আমার প্রিয়জনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অকূল পাথারে ভেসে পড়লুম। আমার সে সময়কার একটি বিদায়ের গান এই :—

কেমনে বিদায় লব থাকিতে জীবন
কোন্ প্রাণে চলে যাব বিজন গহন।
কেমনে ছাড়িব তারে, সদা প্রাণ চাহে যারে,
কেমনে সহিব বল বিচ্ছেদ-দহন॥
শরীর যদিও যাবে, মন সদা হেথা রবে,
যার ধন তারি কাছে রবে অনুক্ষণ।
দিবস ফুরায় যত, ছায়া যায় দূরে তত,
কভু না ছাড়য়ে তবু পাদপ-বন্ধন॥

আমরা পথের সমুদায় বিঘ্নবাধা অতিক্রম করে ভালয় ভালয় আমাদের গম্যস্থানে গিয়ে পৌঁছলুম, আমাদের জাহাজ Southampton বন্দরে নোঙর করবামাত্র আমার আত্মীয় *জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর আমাদের নিতে এলেন। আমরা তাঁর সঙ্গে লণ্ডনে গিয়ে তাঁর বাড়ীতে উঠলুম। তাঁর স্ত্রী কমলা ও দুই কন্যা আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা করে ডেকে নিলেন। তাঁদের অতিথি হয়ে কিছুকাল সুখে কাটান গেল। তাঁদের বাড়ী খৃষ্ট মিসনরিদের এক আড্ডা ছিল, তা ছাড়া সেখানকার অন্যান্য লোকদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করবার সুবিধা পেলুম। সেখানে Hodgson Pratt নামক একটি ভারতহিতৈষী মহাত্মার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হল, তিনি অভিভাবকের ন্যায় আমাদের অত্যন্ত যত্ন করতেন। তাঁরি পরামর্শে আমরা মাসকতক পরে Windsor এর নিকটবর্ত্তী একটি পল্লীতে এক সম্ভ্রান্ত ইংরাজ পরিবারের মধ্যে বাস করে আমাদের পরীক্ষার উপযোগী পাঠাভ্যাসে নিযুক্ত রইলুম। গৃহটি ছাত্রাবাস ধরণের স্থান, আমরা ছাড়া আরো

কয়েকজন ছাত্র ছিল। যিনি গৃহস্বামী তিনি আমাদের ইংরাজী শিক্ষক, সংস্কৃত আরব্য ফ্রেঞ্চ প্রভৃতি অন্য বিষয়ের জন্য অন্যান্য শিক্ষক নিযুক্ত ছিল। Dr G. একজন রুক্ষ প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাঁর স্ত্রীও সেইরূপ মুখরা। বুড় বুড়ীর মধ্যে যে খুব বনিবনাও ছিল তা নয়, মাঝে মাঝে প্রায়ই খিটিখিটি চলত। তাঁদের কন্যারত্ন—একটি প্রাপ্তবয়স্কা কুমারী গৃহের শ্রীস্বরূপা ছিলেন, তিনি অনেক পরিমাণে এই অশান্তির প্রতিবিধান করতেন। আমাদের পড়ার মাঝে যা কিছু সময় থাকত তাঁরি সংসর্গে কাটাতুম। কাছে একটি ছোট্ট নদী ছিল তাতে আমরা কেহ কেহ, বোটে করে ব্যাড়াতে বেরতুম। মনে আছে একবার আমি কৌতুকক্রমে তাঁর মনে ভারি আঘাত দিয়েছিলুম। তিনি আমাকে একটি ফুল উপহার দেন—সযত্নে আমার বুকের উপর কোটে পরিয়ে দিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ফুলটি শীঘ্র শুকিয়ে গেল। কে একজন জিজ্ঞাসা করলেন—'এর মধ্যে ফুল শুকিয়ে গেল—এর কারণ কি?' আমি উত্তর দিলুম 'ভিতর থেকে রস পায়নি বলে বেচারা অত শীঘ্র মুষড়ে পড়েছে।' Miss G মনে করলেন আমি তাঁর উপর কটাক্ষ করে এ কথা বল্লুম—যদিও আমি কেবল কথার কথামাত্র বলেছিলুম, কোনই গূঢ় অভিপ্রায় ছিল না। যা হোক্ আমার এই অনবধানের উক্তির দরুণ আমি তাঁর বিরাগভাজন হয়েছিলুম—কত সাধ্য সাধনার পর তাঁর মানভঞ্জন হল! এই ছাত্রাবাসে থেকে পাঠাভ্যাসে আমাদের বিস্তর খাটতে হোত, মাঝে মাঝে একটু বিশ্রাম নিয়ে সন্ধ্যা

এই অতিরিক্ত পরিশ্রমে যে আমার শরীর ভেঙ্গে পড়েনি এই আশ্চর্য্য। এই পরিশ্রমের কুফল হওয়া দূরে থাকুক সদ্য সদ্যই সুফল ফললো! ১৮৬২ সালে আমি সিবিল সার্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলুম। যখন পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয় তখন আমি মনোমোহনের সঙ্গে য়ুরোপে ভ্রমণে বেরিয়েছি—প্যারী নগরীতে 'পাস' হওয়া সংবাদ আমার হাতে এল। আমি 'পাস' মনোমোহন ফেল। আমি প্রথম বৎসরেই পরীক্ষোত্তীর্ণ হতে পারব এরূপ আশা করি নাই। আমার আশাতীত ফল লাভ হল তাতে আমার আনন্দ কিন্তু আমার বন্ধুর নৈরাশ্য সংবাদে সে এক রকম 'হরিষে বিষাদ' বোধ করলুম। সে যাই হোক্ আমাদের মনের কথা মনেই রইল। তখন আমরা ভ্রমণে বেরিয়েছি আমাদের ব্রত উদ্‌যাপন করা প্রথম কাজ। প্যারী হতে আমরা Switzerlandএ প্রবেশ করলুম। 'প্যারী' এই নামের সঙ্গে কি মধুর স্মৃতি জড়িত আছে। নগরটি কি সুন্দর! দুই বৃক্ষ শ্রেণীর মধ্য দিয়ে প্রশস্ত পথ গিয়েছে —(Boulvards), বিপনিগুলি কি সুসজ্জিত, কি লোভনীয়! প্রাসাদ চিত্রশালা সকলি মনোরম, প্যারীর কি এক সম্মোহন মন্ত্র আছে বিদেশীর মন লণ্ডন অপেক্ষা সহজে আকর্ষণ করে। লণ্ডন এক প্রকাণ্ড ব্যাপার, তার ভিতরে অনেক দেখবার জিনিষ অনেক শেখবার বিষয় আছে কিন্তু তার সঙ্গে পরিচয় হওয়া বিস্তর সময় সাপেক্ষ কিন্তু প্যারীর সৌন্দর্য্য প্রথম দর্শনেই নয়নমন হরণ করে! প্যারী হতে Swiss দের দেশে গিয়ে সেখানকার দর্শনীয় প্রধান প্রধান স্থান গুলি দেখে নিলুম।

যেখানে গিবন তাঁর রোম সাম্রাজ্যের ইতিহাস সমাপন করেন;—Chillon দুর্গ যার বন্দী কাহিনী বাইরণের কবিতায় বর্ণিত;—রিগির পাহাড় যার উপর থেকে সূর্য্যের উদয়াস্ত শোভা দেখবার জন্যে যাত্রীরা দলে দলে সমাগত হয়। তখন পাহাড়ের শৃঙ্গ পর্য্যন্ত রেলগাড়ী প্রস্তুত হয় নাই, পদব্রজে ওঠানামা শ্রান্তিজনক কিন্তু উপরে গিয়ে সূর্য্যাস্তের চমৎকার শোভা দর্শনের ফলে সকল শ্রান্তি দূর হয়। Switzerland এর পার্ব্বত্য দৃশ্য অতি সুন্দর। গিরি সরোবর সমন্বিত চমৎকার শোভা। সেখানকার পাহাড়গুলি হিমালয়ের মত বিরাট মূর্ত্তি নয়—তারা অভ্রভেদী দেব-আত্মা ভীষণ দর্শন' নহে—সে গিরিশ্রী অন্যরূপ, যেন আমাদের অপেক্ষাকৃত আয়ত্তের ভিতর—ঘরের জিনিস। ওদেশের ধবলাগিরি হচ্ছে Mont Blanc সেও 'সতত ধবলাকৃতি বিশাল অটল।' তার অধিত্যকায় শামুনি গ্রামে আমরা কয়েকদিন বাস করি—সেই গ্রাম হতে পর্ব্বতের তুষারমণ্ডিত গাত্র দিয়ে ওঠানামা করে মনের সাধে বেড়িয়ে বেড়াতুম।

শামুনি হতে সেই গিরিরাজের সম্মুখীন হয়ে কবি কোলরিজের স্তব মনে পড়ত—

"O dread and silent Mount!
I gazed upon thee,
Till thou, still present to the
bodily sense,
Did'st vanish from my thought.
Entranced in prayer,
I worshiped the Invisible
alone!—"

হে গিরিরাজ তোমাকে ভুলিয়া সেই অমূর্ত্তের ধ্যানে মগ্ন হইলাম!

শেষে ষ্টিমারে করে Lucerne সরোবরের উপর পরিভ্রমণে আমাদের ভ্রমণের পালা সাঙ্গ হল। য়ুরোপের মুক্তক্ষেত্র হতে আবার আমরা ক্ষুদ্র ছাত্রাবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করলুম। বাড়ী গিয়ে আমার এই জয়বার্ত্তা
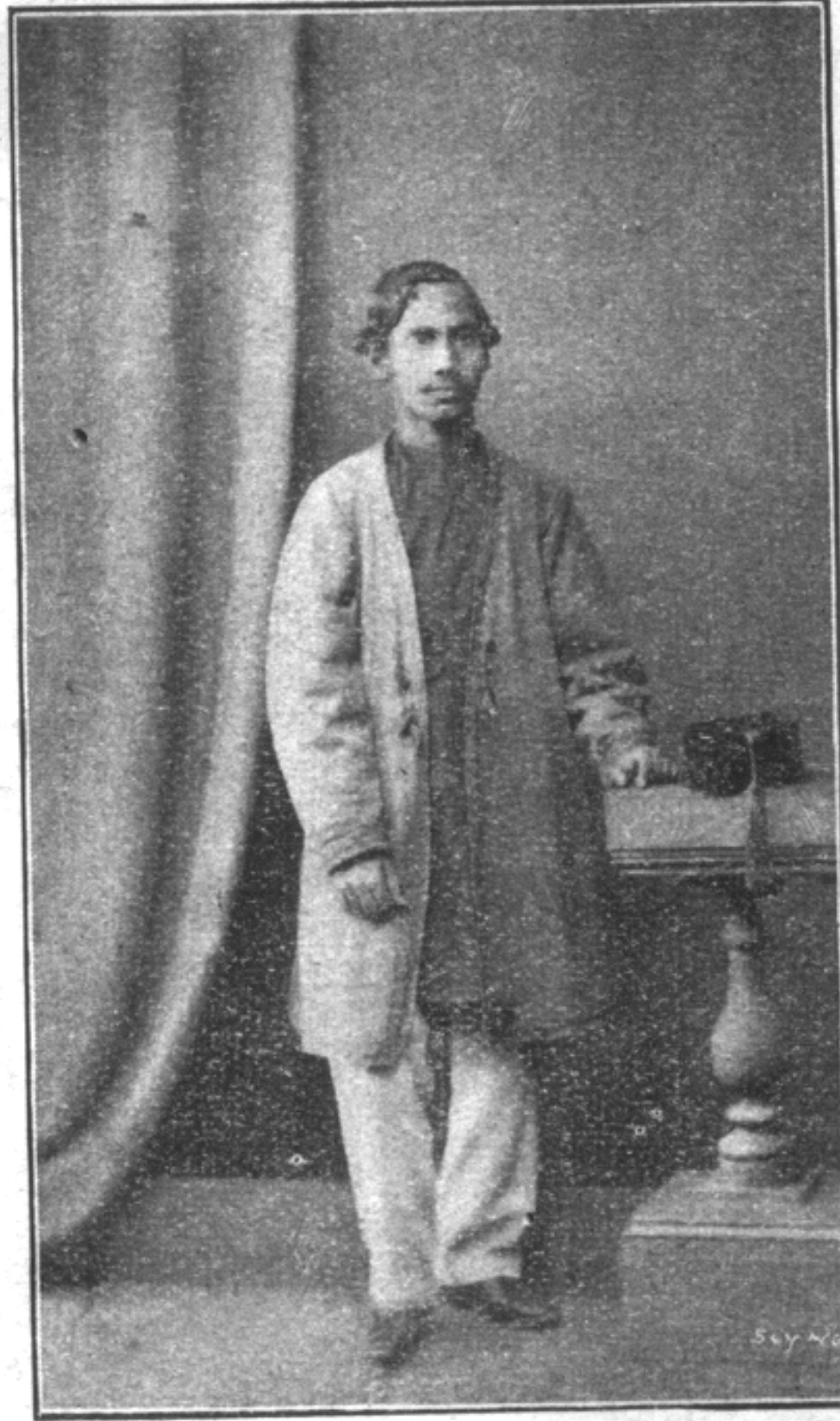
মনোমোহন ঘোষের অল্প বয়সের ছবি

ঘোষণা করবার জন্য মন ছটফট করছে কিন্তু এই গেল প্রথম পরীক্ষা, দ্বিতীয় পরীক্ষার জন্য আর এক বৎসর অপেক্ষা করতে হবে। সে বৎসর লণ্ডনে University Hall গৃহে সেই পরীক্ষার উপযোগী পড়াশুনায় সময় কেটে গেল। সেও এক ছাত্রাবাস কিন্তু প্রথমোক্ত পল্লীতে আমরা যে

ভাবে ছিলুম এখানে তা হতে স্বতন্ত্র বন্দবস্ত। পারিবারিক শৃঙ্খলার অভাব। যিনি আমাদের প্রিন্সিপাল ছিলেন তিনি নির্লিপ্ত ভাবে দূরে দূরে থাকতেন—তাঁর সঙ্গে খাবার টেবিলে যা আমাদের দেখা হত, আমাদের সব নিজের নিজের গোছগাছ করে নিতে হত। দু একটি ছাত্রের সঙ্গে আমার খুব হৃদ্যতা হয়েছিল। তাদের মধ্যে এখন

মনোমোহন ঘোষের অধিক বয়সের ছবি

কেবল একটির নাম (Schwanne) দেখতে পাই যিনি এক্ষণে পার্লমেন্টের মেম্বর। দ্বিতীয় পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে আমার দেশে ফেরবার সময় এল। তখন আমার বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কবির আশীর্ব্বাদ সহকারে ভারত অভিমুখে যাত্রা করলুম, মনোমোহন

'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন' পণে সে দেশেই পড়ে রইলেন। কবির আশীর্ব্বাদ—

সুরপুরে সশরীরে, শূরকুলপতি
অর্জ্জুন, স্বকাজ যথা সাধি পুণ্যবলে
ফিরিলা কাননবাসে; তুমি হে তেমতি
যাও সুখে ফিরি এবে ভারত মণ্ডলে,
মনোদ্যানে আশালতা তব ফলবতী!
ধন্য ভাগ্য, হে সুভগ, তব ভবতলে!
যাও দ্রুতে, তরি
নীল মণিময় পথ অপথ সাগরে!
অদৃশ্য রক্ষার্থে সঙ্গে যাবেন সুন্দরী
বঙ্গলক্ষ্মী। যাও, কবি আশীর্ব্বাদ করে!*

আমি আগেই বলেছি যে ছেলেবেলায় বাবামহাশয়ের কাছে আমরা অল্প সময়ই থাকতুম। একালে যেমন পিতাপুত্রে অপেক্ষাকৃত স্বাধীনভাবে মেলামেশা দেখি, তখনকার কালে তেমনটি ছিল না, ছোটরা বড়দের অত্যন্ত সমীহ করে চলতো। আমাদের যা কিছু আমোদ আহ্লাদ মেলামেশা সে পিতার পারিষদবর্গের সহিত, তাদের কাছেই মনখুলে কথা কবার সুযোগ হতো।

দেবেন্দ্রসভা

দেবেন্দ্র সভায় নানা লোকের সমাগম ছিল, তার মধ্যে কতকজন খাস দরবারের লোক। আমদরবারে যে সব লোক যাওয়া আসা করত তাদের কথা পাড়বার আবশ্যক নেই। এইমাত্র বলে রাখি যে একসময়ে ব্রাহ্মসমাজে যাঁরা ঘন ঘন যাওয়া আসা করতেন তাঁদের মধ্যে অনেকে ছিলেন সম্ভ্রান্ত স্বর্ণবণিক শ্রেণীর লোক। এখন আর সে দলের লোক দেখতে পাই না—এমন হতে পারে যে এক্ষণে কাঞ্চনদেবতার আরাধনায় মগ্ন থেকে তাঁরা আর উচ্চতর সাধনার সময় পান না।—যে সকল লোক এক সময়ে দেবেন্দ্র সভার অন্তরঙ্গ ছিলেন তাঁদের দু চার জনের কথা বল্লেই যথেষ্ট হবে।

বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত—ছোট্ট মানুষটি কিন্তু তাঁর ব্যবসাবুদ্ধি তীক্ষ্ণ ছিল। তাঁর মাথায় কতরকম speculation খেলত কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কিছুতেই সাফল্যলাভ করতে পারতেন না। আজ চায়ের ব্যবসা, কাল বই, পরশু কাপড়—তাঁর কথা শুনলে মনে হতো এবার বুঝি সোনার কাটি হাতে পেয়েছেন যাতে ছোঁয়াবেন সোনা ফলবে, শেষে দেখা যেতো কোনটাতেই তাঁর মনোমত ফললাভ হ'ল না।

আর এক ছিলেন রাজা কালিকুমার; জাতিতে স্বর্ণবণিক, হৃষ্টপুষ্ট, শুচিবাইগ্রস্ত লোক, যিনি সন্দেশ ধুয়ে খেতেন। তিনি পারস্য সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন—তাঁর সহচর একটি মুসলমান যুবক সঙ্গে সঙ্গে ফিরত। তাঁর ফারসী বয়েৎ আওড়ানো মনে পড়ে—একটি স্তোত্র মনে আছে তা এই :—

তু জান পাক-অয় সর্‌বসর্ বে আব খাক, অয়ি নাজ্‌নি

(তুমি প্রাণ, পবিত্র সর্ব্বশঃ না আপ মাটি হে প্রিয়তম)

বল্লা জ-জাঁ হম্ পাকতর রূহে ফদাক্ অয়ি নাজ নি

(ও আল্লা প্রাণ হতেও পবিত্রতর আত্মায় লীন হে প্রিয়তম)

তুমি প্রাণ, তুমি ওহে পূর্ণ পুণ্যময়,
প্রপঞ্চ অতীত তুমি, ওহে প্রিয়তম।
প্রাণ হতে পুণ্যতর তুমি হে মহেশ,
একাত্মা তুমি ও আমি ওহে প্রিয়তম॥

---

* মাইকেল মধুসূদন দত্ত—চতুর্দ্দশ পদী কবিতাবলী

বড়দাদা রাজার নাম রেখেছিলেন 'সম্ভোগ বিলাস।'

সম্ভোগ বিলাস নামে মাংসের ঢিবি
মধো শিবে নেড়ে আর গুড়গুড়ি জীবি।

নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

নবীনবাবু ছিলেন দেবেন্দ্র সভার বিদূষক। তিনি আমাদের সকলকে নিয়ে খুব হাস্য পরিহাস করতেন। আমাকে ডাকতেন 'পক্ষী' বলে। তিনি কখনো কখনো আমাদের কোন মিষ্টান্নের ভাগ দিয়ে বলতেন

অর্দ্ধ রুটি যদি খায় ঈশ্বরের জন
তাহার অর্দ্ধেক করে অন্যে বিতরণ।

কত পাগলামী ছড়া আওড়াতেন সব মনে নেই—দুএকটা বলি—

অজসা গরসা

দুই সাপ—এই কালীয়দমনের দুই সর্দ্দার রাম ও শ্যাম—

ধন্য ধন্য রাম শ্যাম তোমাদের কার্য্য
তোমাদের কার্য্য সকলের অনিবার্য্য
যখন তোমরা গিয়া চড় যার ঘাড়ে
অজসা গরসা আদি সবে তারে ছাড়ে।

অজসা গরসা যেন ছাড়ল, এখন রামশ্যামের হাত থেকে রক্ষা করে কে?

সাপ ও ব্যাঙের কথোপকথন

সাপ—"জিহ্বা লিড়ি বিড়ি সিড়ি কিচড়ি মিচড়ি
করি কুপ—"

(আমি যদি কুপ্ করে তোকে খেয়ে ফেলি?)

ব্যাঙ—"হম যদি পানিমে ডুব গয়া ভুসম ভুসড়ি থায়া
গুড়ড়ি মুড়ড়ি করি গুপ

(আমি যদি গুপ্ করে জলে ডুবে যাই?)

নবীনবাবু চার রকম ভিন্ন প্রকৃতি লোকের কথা বলতেন—

বেগবেগা, বেগচেরা, চেরবেগা, চেরচেরা। স্মরণশক্তির তারতম্যে এই চার রকম লোক হয়।

বেগ বেগা, যে শীঘ্র শেখে শীঘ্র ভুলে যায়;
বেগ চেরা, যে শীঘ্র শেখে চিরদিন মনে রাখে;
চের বেগা, যে দেরীতে শেখে শীঘ্র ভুলে যায়;
চের চেরা, যে দেরীতে শেখে দেরীতে ভোলে।

এর মধ্যে অবশ্য বেগচেরা হওয়াই প্রার্থনীয়। তার নীচে চেরচেরা। চেরবেগাই অধম।

উপরে নবীনবাবুকে বিদূষকরূপেই চিত্রিত করে দেখান গেল কেননা তাঁর ঐ দিক্‌টাই আমাদের চোখের সামনে থাকত কিন্তু তা ছাড়া আর আর দিকেও তিনি ব্যাখ্যানযোগ্য। সাহিত্য সমাজে তাঁর প্রতিপত্তি সামান্য ছিল না। কেবল আমাদের ঐ বয়সে তাঁর বিদ্যাসাধ্যের সর্ব্বাঙ্গীণ মর্য্যাদা আমরা বুঝতে পারতুম না। শ্রীযুক্ত অক্ষয়-কুমার দত্ত প্রথমে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনি অবসর নেবার পর নবীনবাবু সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করেন, ও দক্ষতাসহকারে কয়েক বৎসর সেই কার্য্য সম্পাদন করেন। তত্ত্ববোধিনী ভিন্ন তখনকার অন্যান্য সংবাদপত্রেও তাঁর প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হতো। ঐতিহাসিক তত্ত্বাবলীতে তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল এবং বিশ্বকোষের পাতা উল্টে দেখলে তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ অনেকগুলি লেখা দেখতে পাওয়া যায়।

অক্ষয়কুমার দত্ত

ইনি ছিলেন আমাদের সাহিত্যগুরু। ১৮৪৩ সালে তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকরূপে নিযুক্ত হন, সেই সময় থেকে আমাদের বাড়ী তাঁর যাওয়া আসা। এইকার্য্যে নিযুক্ত হওয়ার বিবরণ আমার পিতার আত্মচরিতে যা লেখা আছে তা এই ;—

"আমি ১৭৬৫ শকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রচারের সঙ্কল্প করি। পত্রিকার একজন সম্পাদক নিয়োগ আবশ্যক। সভ্যদিগের মধ্যে অনেকেরই রচনা পরীক্ষা করিলাম কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্তের রচনা দেখিয়া আমি তাঁহাকে মনোনীত করিলাম। তাঁহার এই রচনাতে গুণ ও দোষ দুইই প্রত্যক্ষ করিলাম। গুণের কথা এই যে, তাঁহার রচনা অতিশয় হৃদয়গ্রাহী ও মধুর। আর দোষ এই যে, ইহাতে তিনি জটাজূটমণ্ডিত ভস্মাচ্ছাদিতদেহ তরুতলবাসী সন্ন্যাসীর প্রশংসা করিয়াছিলেন। কিন্তু চিহ্নধারী বহিঃসন্ন্যাস আমার মতবিরুদ্ধ। আমি মনে করিলাম, যদি মতামতের জন্য নিজে সতর্ক থাকি, তাহা হইলে ইহার দ্বারা অবশ্যই পত্রিকা সম্পাদন করিতে পারিব। ফলতঃ তাহাই হইল। আমি অধিক বেতন দিয়া অক্ষয়বাবুকে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিলাম। আমি তাঁহার ন্যায় লোককে পাইয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আশানুরূপ উন্নতি করি। অমন রচনার সৌষ্টব তৎকালে অতি অল্প লোকেরই দেখিতাম। তখন কেবল কয়েকখানা সংবাদপত্রই ছিল। তাহাতে লোক-হিতকর জ্ঞানগর্ভ কোন প্রবন্ধই প্রকাশিত হইত না। বঙ্গদেশে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় সর্ব্বপ্রথমে সে অভাব পূরণ করে।"

অক্ষয় বাবুর একটা উঁচু Standing desk ছিল। ঘরের মধ্যে পদচারণা করতেন আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ লিখতেন "ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড ব্যাপার।"

তখনকার কালে অক্ষয় কুমার দত্ত আর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এঁরা বঙ্গভাষার দুই স্তম্ভ ছিলেন। যখন তাঁরা সেই ভাষা গড়ে তুললেন তখন তা সংস্কৃতবহুল হয়ে দাঁড়ালো। বিদ্যাসাগরমহাশয় ও অক্ষয়বাবু "উভয়েই সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ ও সংস্কৃত ভাষানুরাগী ছিলেন, সুতরাং তাঁরা বাঙ্গলাকে যে পরিচ্ছদ পরালেন তা সংস্কৃতের অলঙ্কারে পরিপূর্ণ হলো। অক্ষয়বাবুর লেখার এক নমুনা আরম্ভে দিয়েছি আর একটি নমুনা এখানে দিচ্ছি, তা হতেই এ কথার যাথার্থ্য সপ্রমাণ হবে।

সূর্য্যোদয়ের বর্ণনা

"অনন্তর বিশ্বলোচন তিমির-মোচন তরুণ বিভাকর, যবাকুসুম-সদৃশী আশ্চর্য্যময়ী মহীয়সী মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক, পূর্ব্বদিকস্থিত সুরাগ-রঞ্জিত প্রবাল-মণ্ডিত সুরম্য প্রাসাদ হইতে ক্রমে ক্রমে বহির্গত হইতেছে এবং স্বকীয় সুবর্ণময় রশ্মিজাল বিকীর্ণ পূর্ব্বক, নবপল্লব-পরিবেষ্টিত সমুন্নত তরুশিখা সকল অতি মনোহর হিরণ্ময় মুকুটে ভূষিত করিতেছে এই আশ্চর্য্য দর্শন দর্শন করিয়া ইত্যাদি।

"১৮৪৩ হইতে ১৮৫৫ সাল পর্য্যন্ত অক্ষয়বাবু সুদক্ষতা সহকারে তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদন কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, ইতিমধ্যে অর্থোপার্জ্জনের কত উপায় তাঁর হস্তের নিকট

এসেছে, তিনি তাহার প্রতি দৃক্‌পাতও করেন নাই। এই কার্য্যে তিনি এমনি নিমগ্ন ছিলেন যে, এক একদিন জ্ঞানালোচনাতে ও তত্ত্ববোধিনীর প্রবন্ধ লিখতে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইয়া যাইত, তিনি তাহা অনুভবও করিতে পারিতেন না।”

“অক্ষয়বাবু আমাদের ব্রাহ্মসমাজের জ্ঞান মার্গের প্রহরীরূপে দণ্ডায়মান ছিলেন। তাঁহারি

অক্ষয়কুমার দত্ত

প্রভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থবাদ প্রভৃতি ভ্রান্ত মত হতে সুরক্ষিত হয়েছিল। “ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্ম অগ্রে বেদান্তধর্ম্ম ছিল। ব্রাহ্মগণ বেদের অভ্রান্ততায় বিশ্বাস করিতেন। অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় এই উভয়ের প্রতিবাদ করিয়া বিচার উপস্থিত করেন। প্রধানতঃ তাঁহারি প্ররোচনাতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উক্ত উভয় বিষয়ে গভীর চিন্তা ও শাস্ত্রানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। অবশেষে বহু অনুসন্ধান ও চিন্তার পর অক্ষয়বাবুর অবলম্বিত মত যুক্তিসিদ্ধ জানিয়া বেদান্তবাদ ও বেদের অভ্রান্ততাবাদ পরিত্যাগ করিলেন।” (২)

বেদোপনিষদ্ ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাভূমি হয় মহর্ষির ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল, তাঁহাকে বেদান্ত-ধর্ম্ম ও বেদের অভ্রান্ততা হইতে বিচলিত করিতে অক্ষয় বাবুকে বহুপ্রয়াস পাইতে হইয়া-ছিল। পিতার আত্মচরিতে এই বিষয়ে তাঁর মনোগত ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি বলিতে-ছেন—“প্রথমে বেদ ধরিলাম, সেখানে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন করিতে পারিলাম না, তাহার পরে প্রামাণ্য একাদশ উপনিষদ্ ধরিলাম, কি দুর্ভাগ্য! সেখানেও ভিত্তি স্থাপন করিতে পারিতেছি না। তবে এখন আমাদের কি করিতে হইবে? আমাদের উপায় কি? ব্রাহ্মধর্ম্মকে এখন কোথায় আশ্রয় দিব? বেদে তাহার পত্তনভূমি হইল না—উপনিষদেও তাহার পত্তনভূমি হইল না। কোথায় তাহার পত্তন দিব? দেখিলাম যে আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়েই তাহার পত্তন ভূমি।” *** উপনিষদ্ হইতেই প্রথমে আমার হৃদয়ে আধ্যাত্মিক ভাবের প্রতিধ্বনি পাইয়াই আমি সমগ্রবেদ এবং সমস্ত উপনিষৎকে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিতে যত্ন পাইয়াছিলাম কিন্তু তাহা করিতে পারিলাম না, ইহাতেই আমার দুঃখ। কিন্তু এ দুঃখ কোন কার্য্যের নহে, যেহেতুক সমস্ত খনিতে কিছু স্বর্ণ হয় না। খনির আকর প্রস্তরখণ্ড সকল চুর্ণ করিয়াই

(২) রামতনু লাহিড়ী—পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত।

তাহা হইতে স্বর্ণ নির্গত করিয়া লইতে হয়।"

অক্ষয়বাবুর শেষ জীবনের কথা শাস্ত্রী মশায়ের বই থেকে এইখানে বলে এ ভাগ শেষ করি—

"ইহার পরেও অক্ষয়বাবু কয়েক বৎসর কার্য্যক্ষেত্রে দণ্ডায়মান ছিলেন। মধ্যে নর্ম্মাল বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে কিছুদিনের জন্য তাহার শিক্ষকতা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু প্রিয় তত্ত্ববোধিনীর সংশ্রব একেবারে পরিত্যাগ করেন নাই। অবশেষে ১৮৫৬ সালের আষাঢ় মাসে সন্ধ্যার পরে একদিন ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাতে উপস্থিত আছেন এমন সময়ে হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যান। তখন অনেক যত্নে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন হইল বটে, কিন্তু দুই দিবস পরে একদিন তত্ত্ববোধিনীর প্রবন্ধ লিখিতেছেন, এমন সময়ে মস্তিষ্কে একপ্রকার অভূতপূর্ব্ব জ্বালা হইয়া লেখনী ত্যাগ করিতে হইল। তদবধি সে লেখনী আর ধারণ করিতে পারেন নাই।

"ইহার পরে একপ্রকার জীবন্মৃত অবস্থাতে থাকিয়াও তিনি অনেক গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন। অধিক কি, তাঁহার "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" নামক সুবিখ্যাত ও পাণ্ডিত্য পূর্ণ গ্রন্থ এই অবস্থাতেই সঙ্কলিত। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি তিনি প্রাতঃকালে সুস্নিগ্ধ সময়ে শয্যাতে শয়ন করিয়া কোন দিন এক ঘণ্টা কোন দিন দেড় ঘণ্টা করিয়া মুখে মুখে বলিতেন, এবং কেহ লিখিয়া যাইত, এইরূপ করিয়া এই মহাগ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছিল।"

ধন্য তাঁর ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়! এই গ্রন্থখানি অক্ষয় কুমারের অক্ষয় কীর্ত্তিরূপে বঙ্গ সাহিত্য-সমাজে চিরদিন বিরাজমান থাকিবে।

এইরূপে যখন তিনি শিরঃপীড়ায় অবসন্ন হয়ে পড়লেন তখন তাঁর সঙ্গে আমি কাশীপুরে গঙ্গার ধারের এক বাগানে মাস দুই কাটিয়েছিলুম। কি পরিবর্ত্তন! আগেকার সে দিন আর নাই সে স্ফূর্ত্তি সে উৎসাহ নির্ব্বাপিত হয়েছে — সে অক্ষয় আর নাই। শরীরে তৈল মর্দ্দন, ওজন করে ঔষধ সেবন, মাপ জোক করে আহারের ব্যবস্থা এই প্রকার শরীর সেবাতেই দিনযাপন করতেন! সেই প্রখর জ্ঞানোজ্জ্বল চিত্ত সংশয় অন্ধকারে আচ্ছন্ন!

"জীবনের অবসানকালে তিনি বালিগ্রামের গঙ্গাতীরবর্ত্তী এক উদ্যান বাটীতে থাকিয়া এইরূপে গ্রন্থ রচনা করিতেন; এবং অবশিষ্ট কাল উদ্ভিদ্‌তত্ত্বের আলোচনা, ও সমাগত ব্যক্তিদিগের সহিত জ্ঞানানুশীলনে কাটাইতেন। সেখানে ১৮৮৬ সালের ১৫ই জ্যৈষ্ঠে তাঁহার দেহান্ত হয়।" ২০৭—২০৮ পৃঃ—

দেবেন্দ্র সভার সভাসদ আরো অনেক ছিলেন তাঁদের কথা বলবার আর প্রয়োজন নাই। একবার আমরা বাবামহাশয়ের সঙ্গে এই সব দলবল নিয়ে বিংগাহনগরের একটি উদ্যানে কিছুদিন যাপন করেছিলুম। সে সুখের দিন আমার স্মৃতিপটে চিত্রিত আছে। রাজা কালিকুমার ও পরিজনবর্গের আরো অনেকে তথায় উপস্থিত ছিলেন। পিতৃদেব এই দলবলে বেষ্টিত হয়ে একটি ধবল প্রস্তরাসনে বসতেন, তাঁর বর্ণনা বড় দাদার একটি কবিতায় আছে—

শুভ্রমূর্ত্তি কান্তিমান্, শুভ্র বেশ পরিধান,
উন্নত শরীর সুগঠন,
বেষ্টিত স্বজন গণে, ধবল প্রস্তরাসনে,
বসিয়া ব্রহ্মর্ষি তপোধন।

সংসার দুর্দ্দিনে ঝড় অসামান্য ঘোর
দিবারাত তাঁহার উপরে করে জোর।
অস্থির আশ্রিত গাছপালা অতিশয়,
অচল অটল তবু একই ভাবে রয়।

এখানে আমার জীবনস্মৃতির এই এক-পালা সাঙ্গ হল। এখনো পাঠকদের কাছ থেকে 'আমার কথাটি ফুরলো' ব'লে বিদায় নেবার সময় হয়নি, পরে আর এক ভাগ আরম্ভ করা যাবে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চয়ন

মাতৃঋণ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ইদার দুঃখ

মাতা-পুত্রে মিলিয়া একদিন এতিয়োঁ-ভ্রমণে আসিল। আনন্দে জ্যাকের চিত্ত ভরিয়া উঠিলেও, একটা দুশ্চিন্তা ক্ষণে ক্ষণে তাহার মর্ম্মে বিঁধিতেছিল। মাকে যে সম্পূর্ণ আপনার আয়ত্তে ফিরিয়া পাইয়াছে, ইহাতে সে সময় সময় অন্তরে গর্ব্বও অনুভব করিত, কিন্তু মাতার প্রকৃতির সহিত যেটুকু তাহার পরিচয় ছিল, তাহাতে সে বুঝিয়াছিল, মাকে সিসিলের সহিত মিশিতে দিতে বিপদের সম্ভাবনাও কতখানি! মা হইলে কি হয়, এমন চটুলভাসিনী প্রগল্‌ভা নারী জ্যাক জীবনে দুইটি দেখে নাই। কোন্ কথাটা বলিলে কি ফল হয়, কোন্ কথার কি মূল্য, ইদা তাহা ধারণাই করিতে পারিত না।

জ্যাকের চিন্তা হইল, এই প্রগল্‌ভতায় মাতার সম্বন্ধে সিসিল কি ধারণা করিবে! হয়ত ইদার প্রতি একটা তীব্র অবজ্ঞায় সিসিলের প্রাণ ভরিয়া উঠিবে! তাহার ভবিষ্যৎ সুখের আশায় সে সঙ্কুচিতা হইয়া পড়িবে! তখন জ্যাক কি লইয়া মাতার গর্ব্ব করিবে? মাতার নামের উল্লেখমাত্রেই তাহার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিবে! কিন্তু উপায় নাই! মাকে সিসিলের সহিত মিশিতে দিতেই হইবে। সে স্থির করিল, যখনই সে মাতাকে উদ্দাম গল্পে উদ্যত দেখিবে, তখন যেমন করিয়া হউক সেই উদ্দাম গল্পস্রোতে সে বাধা দিবে!

সিসিলের সহিত প্রথম আলাপে মাতা তাহাকে কন্যা-সম্বোধন করিল দেখিয়া জ্যাক কতকটা আশ্বাস লাভ করিল। কিন্তু তাহার কথার মধ্য দিয়া বিলাস-কৌতুক-প্লাবিত সমাজের সুরই ধ্বনিয়া উঠিতেছিল, তাহা যে শুধু আড়ম্বরপ্রিয় সর্ব্বসারল্যবর্জ্জিত মজলিস-সভার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি, জ্যাকের নিকট তাহা ধরা পড়িতে মুহূর্ত্ত বিলম্ব ঘটিল না।

ইদা যে সকল গল্প বলিত, সেগুলি অত্যন্ত চমকপ্রদ, কাজেই শ্রোতার চিত্ত বিপুল কৌতূহলে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। ভোজের [illegible]

উঠিলে ইদা বলিল, আহা, পিরেনিস! পাহাড়ের গা বহিয়া গলিত তুষারের ধারা ছুটিয়াছে! কি সুন্দর সে স্থান! পনের বৎসর পূর্ব্বে সে পিরেনিস ভ্রমণে গিয়াছিল, সঙ্গে ছিল, স্পেনের একজন ডিউক। লোকটির পয়সা অগাধ থাকিলে কি হইবে—মস্তিষ্কের বিকার ছিল; উন্মাদ বলিলেও চলে! চার ঘোড়ার গাড়ী হাঁকাইয়া উভয়ে পাহাড়ে উঠিয়াছিল। সে কি আমোদ! গাড়ীতে অসংখ্য শ্যাম্পেনের বোতল ছিল। বোতলকয়টা নিঃশেষ করিয়া ডিউক ত ক্ষেপিয়া উঠিবার মত হইল! পরে কাণ্ড যাহা ঘটিল—চমৎকার ইত্যাদি।

সিসিল সমুদ্রের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে ইদা বলিল, "সমুদ্র! ঠিক বলেছ মা—কিন্তু ঝড়ের সময় সমুদ্রের মূর্ত্তি যে কি দাঁড়ায়, তা জান না! আমি জানি। পামার কিছুদূরে অগাধ সমুদ্রে তখন আমাদের জাহাজ ছুটেছে। হঠাৎ ঝড় এল। কি সে উদ্দাম ঝড় —ভয় হল, বুঝি বা সব যায়, প্রলয় উপস্থিত। কোন মতে একটা কেবিনে মুখ গুঁজড়ে পড়ে রইলাম। কাপ্তেন এসে আমার সেবায় লেগে গেল। যেমন মেঘের ডাক, তেমনি বিদ্যুতের চমক! জাহাজে ছিল, কোথাকার,—বুঝি পিনাঙ্গের রাজা—নিজে আমার মুখে ব্রাণ্ডির পর ব্রাণ্ডি ঢেলে যত মূর্চ্ছা ভাঙ্গায়, ততই আবার ঘন ঘন মূর্চ্ছা হয়। কি করে সে রাত কাটল, কিছুই জানতে পারলাম না।"

এই সকল অসম্বদ্ধ গল্পগুলার সূত্র জ্যাক অন্য নানাবিধ প্রসঙ্গ তুলিয়া মাঝামাঝি কাটিয়া দিতেছিল। তথাপি সেই সকল গল্পের খণ্ডিত অংশগুলা দ্বিখণ্ডিত সর্পদেহের মত নাচিয়া নাচিয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া উঠিতেছিল—খণ্ড হইলেও তাহার প্রত্যেকটা যেন জীবন্ত, পরিপূর্ণ। সিসিল নিঃশব্দে সমস্ত কথা শুনিয়া যাইতেছিল। জ্যাকের আকস্মিক বাধাদান লক্ষ্য করিলেও তাহার অর্থ সে ঠিক বুঝিতে পারিল না।

অপরাহ্নে বহি খুলিয়া জ্যাক ডাক্তার রিভালের সম্মুখে পড়িতে বসিলে সিসিল ইদাকে কহিল, "এস মা, আমরা বাগানে একটু বেড়াই গে।" সহর্ষ সম্মতি দান করিয়া ইদা সিসিলের অনুসরণ করিল। জ্যাক চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহার পাঠ-রত মনও বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। এখনই মা না জানি কি অসম্বদ্ধ গল্প জুড়িয়া দিবে—মার তারল্য এখনই সিসিলের নিকট প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। তাড়াতাড়ি বহি বন্ধ করিয়া সে ডাক্তারকে কহিল, "পড়াটায় আজ কেমন মন লাগছে না—একটু বেড়ানো যাক্, দাদা!"

জ্যাক আসিয়া সিসিলের একখানা হাত আপনার হাতে চাপিয়া ধরিল। মধুর স্পর্শ! এ স্পর্শে যেন কি যাদু আছে! জ্যাকের সকল দুঃখ সকল অবসাদ এ স্পর্শে নিমেষে কোথায় ঝরিয়া যায়! পাল তুলিয়া দিলে অনুকূল বায়ুর মুখে বোঝাই নৌকাও যেমন নদীর খর বেগ কাটিয়া অনায়াসে বহিয়া চলে, সিসিলের স্পর্শে তাহারও ভারগ্রস্ত চিত্ত তেমনই কোন্ অনুকূল বায়ুর হিল্লোলে সমস্ত বাধা-বিপত্তি দুশ্চিন্তা-অনিশ্চিততার বেগ কাটিয়া সমুজ্জ্বল সিদ্ধি-ভবনের অভিমুখে ক্ষিপ্র ছুটিয়া চলে! আশার উন্মাদনায় প্রাণ ভরিয়া উঠে—শ্রুতির মূলে অশরীরী বাণী মুহুর্মুহু যেন আশ্বাস দেয়,—ভয় নাই, ভয়

নাই! সমস্ত দুঃখ যাতনা নির্ভয়ে দলিয়া যাও! কঠিন সিদ্ধি মধুর বাঁধনে ধরা দিবে রে, ধরা দিবে!

আজ মা উপস্থিত ছিল বলিয়া জ্যাকের আনন্দ কেমন বাধা পাইতেছিল। জ্যাক ও সিসিলকে লক্ষ্য করিয়া ইদা ডাক্তারকে বলিল, "দুটিতে যেন ঠিক সেই পরীর গল্পের নায়ক নায়িকা!" কথাটা জ্যাকের কানেও পৌঁছিয়াছিল—ডাক্তারের মুখের ভাব দেখিয়া সে বুঝিল, কথাটা তাঁহার বড় রুচিকর বোধ হয় নাই! তথাপি-কোলাহল-হীন নির্জন বনে সিসিলের সাহচর্য্যে জ্যাক একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়াছিল। বনে কোথাও নানা বর্ণের অজস্র বনফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। তাহারই মধ্যে মৌমাছি ও প্রজাপতির বিচিত্র সভা বসিয়াছে! কোথাও বা ওকের শাখায় বসিয়া একটা পাখী সুরের ফোয়ারা ছড়াইয়া দিয়াছে। চারিধারেই আনন্দের পরিপূর্ণ আয়োজন—তাহার মধ্যে এই সকল শোভা, সকল বর্ণ, সকল সুরের রাণী সিসিল তাহার পার্শ্বে! আলোকের এমন বিপুল সমারোহের মধ্যে অন্ধকার কোথায় লুকাইয়া রহিবে? কাজেই জ্যাকের চিত্তাকাশ আজ মুক্ত, নির্ম্মল, উজ্জ্বল!

বেড়াইতে বেড়াইতে চারিজনে আর্কার কুটিরে আসিল। আর্কা অভ্যর্থনা করিয়া সকলকে বসাইল। পুরাতন মনিব ইদাকে আতিথ্যে আপ্যায়িত করিবার উদ্দেশ্যে সাধ্যমত সে আহার্য্যের আয়োজন করিল। ইদা কিন্তু নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া তাহার এক টুকরা স্পর্শ করিল মাত্র—দেখিয়া জ্যাক ঈষৎ বিষণ্ণ হইল। তাহার পর সকলে 'আরাম-কুঞ্জ' দেখিবার জন্য উঠিল।

কুঞ্জ-গৃহের চূড়াটি বৃক্ষলতায় একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল। গৃহের আপাদমস্তক আইভি লতায় ছাইয়া ফেলিয়াছে! হার্জ্ এখন এখানে ছিল না, কারণ দ্বার জানালা সমস্তই রুদ্ধ ছিল। ফটকের সম্মুখস্থ সরু-পথটি বহুকাল মনুষ্য-চরণস্পর্শ-লাভে বঞ্চিত থাকায় আগাছায় ভরিয়া গিয়াছে। ইদা গৃহের সম্মুখে মুহূর্ত্তের জন্য দাঁড়াইল। পুরাতন সহস্র স্মৃতি তাহার চিত্তে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। চারিদিককার এই মূক প্রস্তরখণ্ডগুলা অবধি যেন সহসা মুখর হইয়া উঠিয়া তাহার কর্ণে কত কথা কহিয়া গেল। চারিধারে অজস্র ক্লিমেটিসের গাছ—নক্ষত্রের মত সহস্র শাদা ফুলে ভরিয়া রহিয়াছে। ক্লিমেটিসের একটা পুষ্পিত শাখা ছিঁড়িয়া লইয়া ইদা নাসিকার অগ্রে তাহা ধরিল, পরে ধীরে ধীরে চক্ষু মুদিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

জ্যাক জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে মা?"

"কিছু না, জ্যাক! মনের একটা খেয়াল এ শুধু! আর কিছু নয়—ওঃ, আমার জীবনের অনেকগুলো দিন এখানে যেন ঘুমিয়ে পড়ে আছে!"

সত্যই চতুর্দ্দিকে একটা সুপ্তির সুনিবিড় নীরবতা বিরাজ করিতেছিল। দ্বার-পার্শ্বে ফলকে লাটিনে লিখিত আরামকুঞ্জের অক্ষরগুলা লতা-পাতার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে, নিস্তব্ধ গৃহটিকে উচ্চস্তম্ভশোভিত একটি কবরের মতই স্তব্ধ-গম্ভীর মনে হইতেছিল। ইদা ধীরে ধীরে রুমালে চক্ষুপ্রান্ত মুছিল। সেদিনকার মত তাহার সকল সুখের সীমায় যেন কে পরদা টানিয়া দিল। অতীতের চিন্তায় তাহার মন একান্ত ভারগ্রস্ত বোধ হইল—বুকের উপর কে

যেন পাষাণ চাপিয়া ধরিল। সিসিল শুনিয়াছিল, দুর্ব্যবহারে ইদা স্বামীর গৃহ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে। কাজেই সে এই বিমর্ষতা দূর করিবার জন্য সহস্র চেষ্টা করিল—জ্যাক মাতার সম্মুখে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল চিত্র বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত করিয়া ধরিল; তথাপি সকলই বৃথা হইল।

অগত্যা সকলে সে স্থান ত্যাগ করিল। পথে ইদা জনান্তিকে সিসিলকে কহিল, "দেখ মা, এবার থেকে যখন তোমরা এখানে আসবে, আমায় যেন সঙ্গে নিও না। আমার মন অস্থির করে ওঠে। তোমাদেরও আমোদের ব্যাঘাত হয়।" ইদার স্বর কাঁপিয়া উঠিল। যে তাহার প্রতি ইতর পশুর মত ব্যবহার করিয়াছে, ঘৃণা ও লাঞ্ছনার পঙ্কে যে সবলে তাহাকে নিক্ষেপ করিয়াছে, এখনও সে পাপিষ্ঠকে ইদা তবে ভুলিতে পারে নাই, ভালবাসে! হা রে দুর্ব্বল-হৃদয়া নারী!

ইহার পর অনেকগুলি রবিবার আসিল, গেল—ইদা আর এতিঁয়োর পথে পদার্পণ করিল না। কাজেই জ্যাক ছুটির অবসরগুলা ভাগ করিয়া লইল; অর্দ্ধেক অবসর সিসিলের সঙ্গে গল্প করিয়া সে কাটাইত এবং সন্ধ্যার শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত্তগুলা বনে প্রান্তরে ভ্রমণে কাটাইবার পরিবর্ত্তে পারি ফিরিবার পথে ট্রেনেই তাহার অতিবাহিত হইত! সারাদিনের আনন্দ-প্রমোদের স্মৃতিতে পরিপূর্ণ চিত্ত লইয়া ট্রেনের শূন্য কক্ষে সে দেহভার হেলাইয়া দিত—পরিপার্শ্বস্থ কুটিরবাসী নরনারীর বা পান্থজনের আনন্দ-কলরবের একটা ক্ষীণ প্রতিধ্বনি শুধু তাহার কর্ণে আসিয়া আঘাত করিত—চারিধারেই হর্ষের তরল স্রোত ছুটিয়াছে, যেদিকে

দৃক্‌পাত মাত্র না করিয়া সে এতিয়োঁ ছাড়িয়া মাতার নিকট ফিরিয়া আসিত। আসিয়া সে প্রায়ই দেখিত, মাতা গৃহে নাই, হয় লেবিদাঁরের কুটিরে, নয় লেভিকের লাইব্রেরীতে বেড়াইতে বাহির হইয়াছে।

এত অবজ্ঞা-লাঞ্ছনাতেও ইদার হৃদয়ে এতটুকু পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। স্থান, কাল বা পাত্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীনা এই নারী একটা তুচ্ছ ইঙ্গিতে আপনার হৃদয়ের ভাণ্ডার মুক্ত করিয়া দিত—এবং বিদ্রূপ বা গ্লানির আশঙ্কা কিছুমাত্র না রাখিয়া ধন-ঐশ্বর্য্যের সাড়ম্বর বর্ণনায় ও চটুল আলাপে আসর মাতাইয়া তুলিত। লেবিদাঁর-গৃহিণীর অবস্থা তেমন সচ্ছল ছিল না—লোকের ছিন্ন বস্ত্রাদিতে তালি দিয়া রিপু করিয়া তাহার দিন-গুজরাণ হইত—সে বেচারী যৎকিঞ্চিৎ প্রাপ্তির আশায় একান্ত ধৈর্য্যে আগ্রহের ভাণ করিয়া ইদার কাহিনী শুনিত। এমনই ভাবে মন জোগাইয়া চলিলে যদি কোন দিন ইদা অকস্মাৎ প্রসন্ন হইয়া তাহাকে একটা সেলাইয়ের কল কিনিয়া দেয়! কিন্তু সত্বরই সে বুঝিল, ধন ঐশ্বর্য্য যত সহজে মুখের বাণীতে প্রকাশিত হইয়া পড়ে, তেমন ভাবে হস্ত হইতে কখনই স্খলিত হয় না! মুখ দাতা হইলে কি লাভ, হস্ত যে অত্যন্ত কৃপণ! যক্ষের মত সে সর্ব্বদা চাপিয়া আঁটিয়া বসিয়া থাকে, তাহাকে ভুলানো একান্ত দুঃসাধ্য। তথাপি জ্যাকের গৃহে লেবিদাঁর-গৃহিণীর ভোজের নিমন্ত্রণটা মধ্যে মধ্যে বাদ পড়িত না, সেইটাই ছিল, তাহার পক্ষে পরম লাভ! তাই তাহার ধৈর্য্য উৎপীড়িত হইলেও উদ্বাস্ত হইবার কোন লক্ষণ দেখাইল না। এমন নিমন্ত্রণ না

ইদার মত উৎকৃষ্ট বসন-ভূষণ-পরিহিতা নারী যে তাহার লাইব্রেরীতে পদার্পণ করিয়া গৃহ ও গৃহস্বামিনীকে কৃতার্থ করিতেছে, ইহাতে পল্লীর পাঠক-পাঠিকামহলে লাইব্রেরীর প্রতি সম্ভ্রম বাড়িয়া গিয়াছিল এবং তাহারই ফলে ছিন্ন মলিন গ্রন্থ ও পুরাতন সুলভ সংবাদপত্রে পরিপূর্ণ লাইব্রেরীর ক্ষুদ্র জীর্ণ গৃহ আপনার আর্থিক অবস্থাও কতক ফিরাইয়া লইয়াছিল।

এই সঙ্গ হইতে মাতাকে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্ত জ্যাকের সমস্ত চেষ্টা নিষ্ফল হইল। কর্ম্মস্থল হইতে ফিরিয়া জ্যাক প্রত্যহই প্রায় দেখিত, জানালার পার্শ্বে ইদা একখানা বহি লইয়া বসিয়া গিয়াছে—উত্তেজক ঘটনাপূর্ণ কোন ডিটেক্‌টিভের কাহিনী কিম্বা প্রেমের বর্ণনা বহুল কোন অপাঠ্য উপন্যাস! বহির পৃষ্ঠায় মলিন হস্তের সহস্র ছাপ—কোনখানে বা মাখনের দাগ—পেন্সিলের ঘন রেখায় বহুস্থল কণ্টকিত—পার্শ্বে বিচিত্র ছাঁদের অক্ষরে নানাবিধ মন্তব্য—ইতিপূর্ব্বে যে গ্রন্থখানি বহু অলস কারিকর ও নারীর হস্তে ফিরিয়াছে, তাহারই সহস্র নিদর্শন বহিখানির সারা অবয়বে সুস্পষ্ট সূচিত রহিয়াছে!

একদিন সে মাতাকে বহির পৃষ্ঠায় একান্ত নিবিষ্টচিত্তা দেখিয়া ললাটের উপর পতিত আপনার কেশের রাশি সরাইয়া মনের বিরক্তি মনে চাপিয়া জানালার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল! মাথার উপর পল্লীর নির্ম্মল আকাশ, গোধূলির স্বর্ণরশ্মিরেণু ফুটিয়া উঠিয়াছে—শান্ত মৃদু বায়ু লতায় পাতায় দোল দিয়া বহিয়া চলিয়াছে—এমন সময় ইদা অলসভাবে কতকগুলা কদর্য্য রচনা পড়িয়া সময় কাটাইতেছে! বাহিরের পানে চাহিলে চিত্ত জুড়াইয়া যায়, মনে শান্তি আসে—বিধাতার কি বিরাট বিচিত্র গ্রন্থের পৃষ্ঠা সম্মুখে উন্মুক্ত পড়িয়া রহিয়াছে—বিবিধ রসে তাহার পৃষ্ঠা পরিপূর্ণ—এ গ্রন্থ অবহেলা করিয়া অন্ধকূপবাসী কোন্ অক্ষম লেখকের মসীজর্জ্জর কদর্য্য রচনার রসাস্বাদ গ্রহণ করিতেছে! ধিক্!

জ্যাক একবার ইদার পানে চাহিল। ইদা তখন বহি বন্ধ করিয়া আকাশের পানে চাহিয়াছিল! দিনের আলো তখন ম্লান হইয়া আসিয়াছে—বহির পৃষ্ঠায় অক্ষর ভাল লক্ষ্য হয় না। ইদা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। সে কি ভাবিতেছিল। কি ভাবিতেছিল? সে কোথায়? কি করিতেছে? আশ্চর্য্য—তিন মাস দেখা নাই, তবু একখানি পত্রও কি তাহার লিখিতে নাই? ইদা সেই কথাই ভাবিতেছিল! সহসা বহিখানা তাহার ক্রোড়চ্যুত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল! ইদার চমক ভাঙ্গিল—বহিখানা কুড়াইয়া লইয়া সে দেখিল, অপর জানালার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, জ্যাক! জ্যাক ইদার পানেই চাহিয়াছিল। তাহার চোখ দুইটা যেন বাঘের চোখের মত জ্বলিতেছিল! এ কি ঈর্ষা—? না, অভিমান? না, ঘৃণা?

ইদা কহিল, "আমার শরীরটা আজ ভাল বোধ হচ্ছে না, জ্যাক—তোমার জন্য রান্নাবান্নাও হয়ে ওঠেনি—কি করি তাইত!"

জ্যাক নিমেষে বুঝিল, এ পীড়া কোথায়! এ ত শরীরে নহে, মনে! যে কীট ইদার মনে আশ্রয় লইয়াছে, সে তবে মরে নাই—দিনে দিনে বেশ সে বাড়িয়া উঠিতেছে, দেহ-মন সে বিষে জর্জ্জরিত হইলেও আজ ইদার

মুক্তি নাই! করুণ সহানুভূতিতে জ্যাকের প্রাণ ভরিয়া উঠিল! হায় অভাগিনী!

জ্যাক বলিল, "কেন মা, তোমার কি এখানে ভাল লাগছে না, আমার কাছে? কি কষ্ট হচ্ছে বল!"

"না জ্যাক, এ কিছু না—শুধু একটু মাথা ধরা। তুমি ভেবো না! তোমাকে বুকে করে রয়েছি, আর আমার কিসের দুঃখ থাকতে পারে, জ্যাক?"

ইদা উঠিয়া জ্যাককে আপনার বক্ষে চাপিয়া ধরিল—তাহার মস্তকে চুম্বন করিয়া কহিল, "তুমি ভেবোনা, জ্যাক—এ কিছু নয়!"

"তবে চল মা, বাহিরে কোথাও থেয়ে আসিগে!"

ইচ্ছা না থাকিলেও আপত্তি করিতে ইদার সাহস হইল না। তখন মাতা-পুত্রে হোটেলের অভিমুখে চলিল। জনবহুল পথ। ভিড় ঠেলিয়া উভয়ে চলিল। পথে কেহ কোন কথা কহিল না। কথা কহিবার জন্য উভয়ের অন্তরই ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু কি কথা প্রথমে কহা যায়? বহু বর্ষের বিচ্ছেদ মাতা-পুত্রের মধ্যে সত্যই একটা সুগভীর ব্যবধান রচনা করিয়াছিল। উভয়ের জীবন-গতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন পথে ছুটিয়াছিল। একদিকে আনন্দ বিলাস, প্রমোদ, অপর দিকে কাজ, কাজ, কাজ—তাহাও যত অভদ্র নীচ সঙ্গীর দলে মিশিয়া! জ্যাক কয়দিনে এটুক বুঝিয়াছিল যে, মাতার হৃদয়ে পূর্ব্বকার মত অসঙ্কোচ স্থান লাভের আশা এখন তাহার পক্ষে দুরাশামাত্র! ইদা এখন তাহার শত্রু আর্জেন্তঁর ভাবে এমন অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহার স্বাতন্ত্র্য একেবারেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে! তাহার জীবনের রাহু, তাহার কণ্টক আর্জেন্তঁ ইদাকে আপনার ছায়ায় এমনভাবে গড়িয়া তুলিয়াছে যে, কোন নিপুণ ভাস্করও কোমল মৃত্তিকার সাহায্যে এমন মূর্ত্তি গড়িয়া তুলিতে পারে না! দাম্ভিক কবির যত মিথ্যা দর্প, ভাণও আজ ইদার মজ্জায় মজ্জায় মিশিয়া গিয়াছে! ইদা এখন যেন আর্জেন্তঁরই সুস্পষ্ট প্রতিবিম্বটুকু!

একদিন সন্ধ্যায় ইদাকে লইয়া জ্যাক ভ্রমণে বাহির হইল। সুমোর পর্ব্বতের নিম্নেই বিস্তীর্ণ কানন-প্রান্তর—কুঞ্জ, ক্রীড়া-পর্ব্বত, সেতু, বাদ্য-বেদী প্রভৃতি সকল অনুষ্ঠানে তাহা সুসজ্জিত! কাননের সীমা বেড়িয়া সুদীর্ঘ দেবদারুর শ্রেণী চলিয়াছে! কানন দেখিয়া ইদার চিত্ত প্রফুল্ল হইল। বাদ্য-বেদীতে যন্ত্রীর দল নানা রাগিণীর সাহায্যে ঐকতান জাগাইয়া তুলিয়াছিল। দেবদারুর শির রক্তচ্ছটায় রঞ্জিত করিয়া সূর্য্য কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে অস্ত গিয়াছে—আকাশের গায় লাল আভাটুকু তখনও সম্পূর্ণ মিলাইয়া যায় নাই। একটা বেঞ্চে বসিয়া ইদা ও জ্যাক ঐকতান সঙ্গীত শুনিতেছিল। সহসা কাহাকে দেখিয়া জ্যাক উঠিয়া দাঁড়াইল। এ যে মসূঁ রুডিক!

সত্যই রুডিক! তাহার দেহ বাঁকিয়া পড়িয়াছে—বার্দ্ধক্য ঘনাইয়া আসিয়াছে! রুডিকের পার্শ্বে তাহারই হাত ধরিয়া একটি বালিকা এবং পশ্চাতে একটি বালক! বালিকার মুখে কে যেন জেনেদার মুখখানি অবিকল বসাইয়া রাখিয়াছে! সহসা তাহাকে দেখিলে মনে হয় যেন জেনেদাই আবার বালিকা-মূর্ত্তি ধরিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কথা কহিবার জন্য

যেমন জ্যাক অগ্রসর হইবে, অমনই তাহার দৃষ্টি জেনেদার প্রতি পতিত হইল। জেনেদা ও মঙ্গিন পরস্পরে হাত ধরিয়া রুডিকের পশ্চাতে আসিতেছিল। রুডিকের কোন দিকেই লক্ষ্য ছিল না—জেনেদা নিমেষে জ্যাককে চিনিয়া তাহাকে নিকটে আসিতে মৃদু ইঙ্গিত করিল। জ্যাক আসিলে জেনেদা কহিল, "একসঙ্গে একটু বেড়ানো যাক্, এস। অনেক কথা আছে—বলব। বাবাকে একটু এগিয়ে যেতে দাও। উনি কে?"

"আমার মা।" বলিয়া জ্যাক মাতার সহিত জেনেদার পরিচয় করাইয়া দিল।

মঙ্গিন কহিল, "এরা দুই পুরানো বন্ধু আপনাদের কথা কবে। আমি আপনার সঙ্গে বেড়াই, আসুন!" মঙ্গিন ও ইদা একত্রে চলিল! জ্যাক ও জেনেদা গতি মৃদুতর করিয়া পিছাইয়া পড়িল।

জ্যাক প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিল, বিবাহিত জীবনে জেনেদা অভীষ্ট সুখের অধিকারিণী হইয়াছে কি না। উত্তরে জেনেদা কহিল, এত সুখ যে পৃথিবীতে পাওয়া যাইতে পারে, ইহা তাহার ধারণাই ছিল না! তাহার স্বামীর মত স্বামী আর কাহার ভাগ্যে মিলিয়াছে! যেমন গভীর তাঁহার প্রেম, তেমনই অসীম উদার তাঁহার হৃদয়। জেনেদা তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে—এ স্থানের বিনিময়ে সে আজ স্বর্গও তুচ্ছজ্ঞান করে! মঙ্গিন তাহার সেবায় সুখী—মঙ্গিন নিজে বলিয়াছে, জেনেদার এত গুণ আছে, পূর্ব্বে জানিলে তুচ্ছ যৌতুকের জন্য মঙ্গিন এতটুকু লোভ করিত না—বিনা যৌতুকেই তাহাকে আপনার করিয়া লইত। স্বামীর এ ভালবাসায়

জেনেদার আজ কোন দুঃখ নাই, কোন অভাব নাই! তাহার দুই সন্তান—একটি পুত্র, একটি কন্যা! দুইটিই যেন রত্ন!

জেনেদার সুখের কথা শুনিয়া জ্যাকের মন আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল! দাম্পত্য জীবনের সুখ কি, তাহা ইহারা যেমন বুঝিয়াছে, এমন যদি সকলে বুঝিত!

জ্যাক কহিল, "আর সব খবর কি? মাদাম ক্লারিসা—"

জেনেদা কহিল, "মারা গেছেন, আজ দু বছর হল—লয়ার নদীরে ডুবে মারা গেছেন! ভারী দুর্ঘটনা ঘটে গেছে।"

"ডুবে? সে কি?"

"আমরা মুখে বলি, ডুবে গেছেন, অবশ্য সে শুধু বাবাকে ভোলাবার জন্য—আর উনিও তাই জানেন। কিন্তু আসলে তা নয়! তিনি আত্মহত্যা করেছেন! নার্ন্তের সঙ্গে দেখা বন্ধ হয়ে গেল—কাজেই—! যাক্—তাঁর মত অদৃষ্ট যেন কারও না হয়! এ যে কি বদ্‌নেশা, লোকে একেবারে বুদ্ধিশুদ্ধি মান-সম্ভ্রম সব হারিয়ে ফেলে!

নেশাই বটে! কথাটা জ্যাকের মর্ম্মের মধ্যে বিঁধিল! কিন্তু জেনেদা তাহা লক্ষ্য করিতে পারিল না।

জেনেদা বলিতে লাগিল, "আমরা ভেবে-ছিলুম, এ শোকের পর বাবাকে আর বাঁচাতে পারব না। আসল কাণ্ড যে কি উনি এখনও তা জানেন না! তারপর ইনিও পারিতে বদলি হলেন, বাবা একলাটি কার কাছে থাকেন, তাই এখানে আনলুম। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিশে গল্প-সল্প করে তবু একটু যাহোক শোক ভুলে আছেন! শরীর কি হয়ে গেছে,

দেখলে ত! আমাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বড়-একটা কন্ না। তুমি কাল এস জ্যাক—তোমায় দেখলে হয়ত একটু ভাল থাকতে পারেন। তোমাকে ভালও বাসেন। প্রায়ই তোমার কথা বলতেন--এখনও মাঝে মাঝে বলেন। চল, এখন ওঁর কাছে যাই, বেশীক্ষণ আবার দেখতে না পেলে ভাববেন ওঁরই কথা বুঝি কচ্ছিলুম।"

ইদা মঙ্গিনের সহিত রীতিমত উৎসাহে গল্প জুড়িয়া দিয়াছিল। সে বলিতেছিল, "চমৎকার লোক! যেমন কথায় বার্ত্তায়, তেমনি আমোদ-আহ্লাদে! প্রতিভাবান পুরুষ বটে।" জ্যাক ও জেনেদা আসিয়া পড়ায় সে কথা বন্ধ হইল! আকস্মিক রসভঙ্গে ইদা ঈষৎ বিরক্তিও বোধ করিল! ইদার কথার শেষ অংশটুকু জ্যাকের কানে গিয়াছিল। মুহূর্ত্তে সে বুঝিল, মঙ্গিনের সহিত ইদার আর্জেন্তঁর সম্বন্ধেই কথাই হইতে-ছিল! ধিক নির্লজ্জা নারী।

সত্যই আর্জেন্তঁর কথা হইতেছিল।

মঙ্গিন ইদার নিকট হইতে তাহার স্বামীর সংবাদ জানিতে চাহিয়া প্রশ্ন করিয়াছিল—এবং ইদাও উচ্ছ্বসিত আবেগে আপনাকে মুক্ত করিয়া দিয়াছিল! কবির প্রতিভা, নীচ হিংসা ও বিদ্বেষের সহিত তাঁহার অক্লান্ত সংগ্রাম, সাহিত্যজগতে কত উচ্চে তাঁহার আসন ও তাঁহার মস্তিষ্কে নাটক উপন্যাসের কি বিচিত্র আখ্যান গুমরিয়া ফিরিতেছে, সে সমস্ত কাহিনীর পুঙ্খাণুপুঙ্খ বর্ণনায় ইদা এতটুকু ত্রুটি রাখিল না। কোন বিষয়ে মনান্তর হওয়ায় কিছুদিনের জন্য তাহারা স্বতন্ত্রভাবে বাস করিবে, সেইজন্যই শুধু উভয়ে এ বিচ্ছেদ-দুঃখ সাধ করিয়া ভোগ করিতেছে। দীর্ঘ মিলনের অন্তরালে ক্ষুদ্র একটু বিরহ রচনা করিলে প্রেম গভীরতর হয়, ইত্যাদি। এমন সময় জ্যাক আসিয়া কাহিনীর কোন্ অসমাপ্ত ছত্রে ছেদ টানিয়া দিল।

জ্যাক ভাবিল, ইহাদিগের সহিত মাতার যে আলাপ হইল, তাহাতে মঙ্গলের সম্ভাবনা। লেবিদাঁর-লেভিকের দল ছাড়িয়া এই সকল সরল আড়ম্বরহীন বান্ধবের সঙ্গ প্রকৃতই ঈপ্সিত। ধর্ম্মপরায়ণা জেনেদা, স্নেহার্দ্র-হৃদয় মঙ্গিন—ইহাদিগের সঙ্গে মিশিলে-ফিরিলে একটা স্বাস্থ্যকর বায়ুর সংস্পর্শে মাতার অন্তরের মলিনতা ঘুচিতে পারে, ইহা ভাবিয়া আনন্দে জ্যাকের চিত্ত পরিপূর্ণ হইল। কিন্তু দুই চারি দিন পরেই জ্যাক বুঝিল, এই শ্রমশীলা ধর্ম্ম-পরায়ণা জেনেদার সংসর্গ ইদার তেমন মনঃ-পূত নহে—পুত্রের কথাতে ভঙ্গীতে যেমন একটা অসভ্য সমাজের গন্ধ পাওয়া যায়—জেনেদা প্রভৃতির সংসর্গেও সেই গন্ধ ভাসিয়া উঠে! কেমন একটা অভদ্র বেয়াদবী ভাব!

জ্যাকের গৃহে সেই গন্ধের প্রাচুর্য্য—অন্নেও সেই গন্ধ—চতুর্দ্দিকেই কেমন একটা কদর্য্যতা! এই সকল নীচ কারিকরগণের মধ্যে কোথায় এতটুকু শ্রী বা পারিপাট্য নাই! দারিদ্র্য তাহার নিরানন্দ মূর্ত্তি লইয়া চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! তাহার জীর্ণ কঙ্কালগুলা চতুর্দ্দিকে খট্‌খট করিয়া নড়িয়া ফিরিতেছে। পথে ঘাটে কোথাও পলাইয়া দুইদণ্ড হাঁফ ছাড়িবার উপায় নাই! সর্ব্বত্রই কুশ্রী বীভৎসতা,—আবর্জ্জনার স্তূপ! তথা হইতে অহর্নিশি একটা দূষিত বায়ু উত্থিত হইতেছে! দারিদ্র্যের এ দুর্গন্ধে ইদা আর তিষ্ঠাইতে পারে না। তাহার বুক যেন কে সবলে চাপিয়া

ধরিতেছে! আর সহ্য হয় না! ইদার প্রাণ আজ মুক্তির জন্য কাতর উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। মুক্তি চাই! মুক্তি চাই! এ নিরানন্দময়তার মধ্য হইতে মুক্তি চাই! ইহার মধ্যে বাস করা অপেক্ষা আত্মহত্যাও লক্ষগুণে শ্রেয়স্কর! (ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

পতঙ্গের ক্ষমতা

বেশী মোটা বা লম্বা মানুষই যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বলবান নহে, ইহা একটি সর্ব্ববাদীসম্মত সত্য কথা। প্রাণীগণের সম্বন্ধেও এই নিয়ম খাটে। ক্ষুদ্র অশ্বগণ বড় অশ্ব অপেক্ষা বেশী ক্ষমতাসম্পন্ন; এবং কতকগুলি ক্ষুদ্র ও নিকৃষ্ট জীবের ক্ষমতা এত অধিক যে, তাহাদের শরীরের ওজনের তুলনায় অশ্ব ও মনুষ্যের স্থূল শক্তি অতীব তুচ্ছ ও ক্ষীণ বলিয়া মনে হয়।

একটি বলবান গাড়ীটানা ঘোড়া সমতল ভূমির উপর আড়াই টন ওজনের মাল টানিয়া লইয়া যাইতে পারে; এবং গাড়ীর ওজনস্বরূপ তাহাতে আরও এক টন যোগ করা যাউক। তাহা হইলে ঘোড়াটি ওজনে যদি ১৪ cwt হয় তবে বুঝিতে হইবে যে সে নিজের ওজনের পাঁচগুণ বেশী বোঝা টানিতেছে। মানুষের ভারবহনের ক্ষমতাও এই একই পরিমাণে কার্য্য করে। অবশ্য মনুষ্য ও অশ্বগণ ইহাপেক্ষা অধিক ভারী দ্রব্য অল্পদূর পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া যাইতে পারে; এবং ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার অসামান্য ক্ষমতাসম্পন্নও আছে। আচ্ছা মোটামুটি ধরিলাম যে, মনুষ্য ও অশ্বগণ তাহাদের নিজেদের শরীরের ওজনের দশগুণ বেশী ভারবহন করিতে বা টানিতে সমর্থ। এবং মনে মনে এই আদর্শ লইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতঙ্গদের বলের সহিত উহার তুলনা করিয়া দেখা যাউক কি ফল হয়!

১নং ছবিতে একটি সাধারণ গুটিপোকা একটি ভার বিশিষ্ট ধাতুনির্ম্মিত গাড়ী ও ঘোড়া টানিতেছে। এই পোকাটির শরীরের ওজন ১৯ গ্রেণ; এবং গাড়ী, ঘোড়া
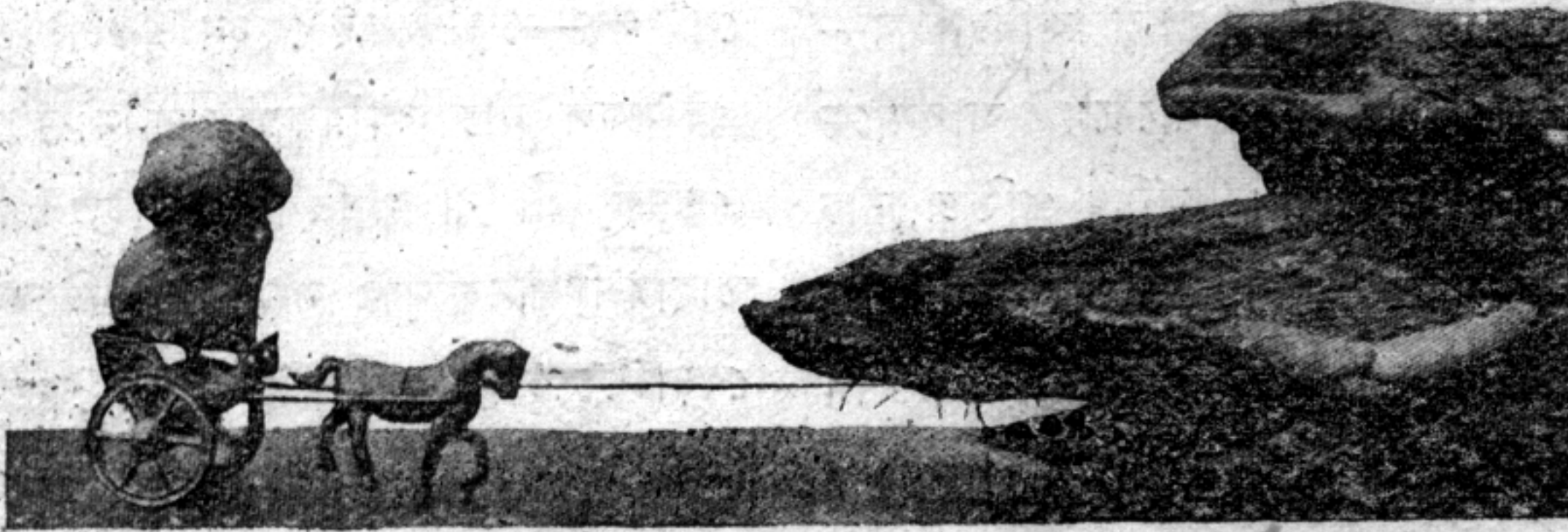
১নং। গুটিপোকা নিজের শরীর ওজনের ২৫ গুণ ভারি দ্রব্য টানিতেছে।

ও মাল সর্ব্বশুদ্ধ ভারী ৪৬৫ গ্রেন; তাহা হইলে মোটামুটি সে নিজের শরীরের ওজনের ২৫ গুণ ভারী দ্রব্য টানিতেছে। অবলম্বনস্বরূপ ইহাকে একখণ্ড শুষ্ক কাষ্ঠ দিলেই সে অক্লেশে কোন মসৃণ টেবিলের উপর দিয়া বোঝা টানিয়া লইয়া যাইতে পারিবে। অবশ্য গাড়ীর চাকাদুটিও সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিবে।

আমরা পূর্ব্বেই ঠিক করিয়া লইয়াছি যে মনুষ্য ও অশ্বগণ তাহাদের ক্ষমতার দশগুণ বেশী ভার টানিতে

সমর্থ; কিন্তু এই গুটিপোকার ক্ষমতার সহিত তুলনা করিলে তাহা অত্যন্ত সামান্য বলিয়া জ্ঞান হয়। যেমন ক্ষুদ্র অশ্ব বড় অশ্ব অপেক্ষা অধিক ভারবহনে সক্ষম, সেইরূপ এই পোকা অপেক্ষা আরও ক্ষুদ্র পতঙ্গগণ ইহাপেক্ষা বেশী ভারী দ্রব্য অনায়াসে টানিতে পারে।

২নং ছবিতে একটি উড়ো মাছি ১৭০ গ্রেন ওজনের একটি খেলনার রেলগাড়ী টানিতেছে। মাছিটির শরীরের ওজন এক গ্রেন মাত্র। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, রেল গাড়ির ভার উহার শরীরের ভারের অপেক্ষা ১৭০ গুণ বেশী। এক গ্রেন ওজনের মাছির
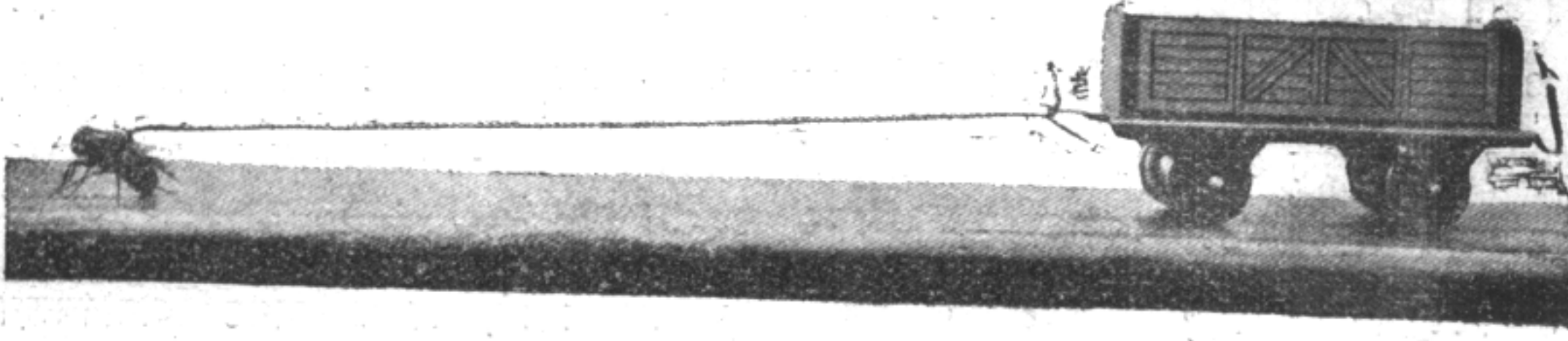
২নং। উড়ো মাছি নিজের শরীরের ভারের অপেক্ষা ১৭০ গুণ ভার টানিতেছে।

ক্ষমতা ১৯ গ্রেন ওজনের গুটিপোকার ক্ষমতার ৭গুণ। এই ক্ষুদ্র মাছির ক্ষমতার সহিত বিশালকায় মনুষ্য ও অশ্বের শক্তির তুলনা করা হাস্যজনক!

একটি সাধারণ গুবরে পোকা লইয়া নিম্নলিখিত ব্যাপারটির পরীক্ষা করা হইয়াছিল। এই পোকারা মাটীতে বাস করে, রাত্রে বাগানের চতুর্দ্দিকে উড়িয়া বেড়ায়। বাগানের পাথর বা কাষ্ঠখণ্ড স্থানান্তরিত করিলে প্রায়ই ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা দেখিতে বেশ সুশ্রী; আলোতে ইহাদিগকে বাহির করিলেই ইহারা অস্থির হইয়া উঠে এবং কোন আচ্ছাদনের অন্ধকারময় তলদেশে পলায়ন করিবার চেষ্টা করে। ইহাদের উজ্জ্বল পক্ষাবরণগুলিতে সূর্য্যরশ্মি পতিত হইলে, বেগুণে ও নীল আভা ফুটিয়া উঠে। ৩নং ছবিতে যে গুবরে পোকাটি মালসমেত গাড়ী টানিতেছে, তাহার দেহের দৈর্ঘ্য এক ইঞ্চি মাত্র এবং তাহার শরীরের ওজন ছয় গ্রেন। সে সর্ব্বসমেত ১০৯৩ গ্রেন ওজনের মাল ধীরে ধীরে টানিতেছে। অতএব সে নিজের দেহের ভারের ১৮২ গ্রেন বেশী ভারী দ্রব্য টানিতেছে। পূর্ব্বোক্ত মাছির অপেক্ষা ইহার শরীরের ওজন অনেক বেশী কিন্তু ইহার ভারবহনের ক্ষমতা মাছি হইতে অতি সামান্যই অধিক!

গুবরে পোকা অপেক্ষা মাছিকেই ভারবহন সম্বন্ধে

৩নং। গুবরে পোকা নিজের দেহের ওজনের চেয়ে ১৮২ গুণ ভারী দ্রব্য টানিতেছে।

পরীক্ষা করা বেশী সুবিধাজনক। কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই পোকাগুলি কেবল নিশাযোগেই ভ্রমণ করে; এবং তাহাদিগকে আলোকে আনিলেই তাহারা কোন আচ্ছাদনের ভিতরে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠে। সে কেবলই পালাইবার জন্য চেষ্টা করিবে এবং তাহাকে যে গাড়ী টানিতে দেওয়া হয় তাহা টানার পরিবর্ত্তে সে তাহার তলদেশে যাইয়া পায়ের দ্বারা সেটাকে আঁকড়াইয়া ধরে। সেইজন্য ইহার ভারবহন-ক্ষমতা পরীক্ষা

করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার; এবং ইহার দ্বারা ভার বহন করাইবার অভিলাষও প্রায়ই ব্যর্থ হইয়া থাকে।

৪ নং ছবিতে একটি ক্ষুদ্র মৌমাছি পূর্ব্বাঙ্কিত ছবির দুইখানি গাড়ী টানিতেছে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে প্রথম গাড়ীটি শূন্য, দ্বিতীয়টি মালবোঝাই গাড়ী ও মাল সর্ব্বশুদ্ধ ওজনে ৬০১ গ্রেন; মৌমাছিটির শরীরের ভার দুই গ্রেন মাত্র। তাহা হইলে সে নিজের দেহের ওজনের ৩০০ গুণ বেশী ভারী দ্রব্য টানিতেছে এবং তাহার শক্তি, মনুষ্য ও অশ্বের সর্ব্বোচ্চ পরিমাণে নির্দ্ধারিত শক্তির অপেক্ষা ৩০ গুণ অধিক। যথার্থই ইহা কি আশ্চর্য্যের বিষয় নহে?

কিন্তু এই ক্ষুদ্র মৌমাছির অলৌকিক ক্ষমতাও নিম্নলিখিত পতঙ্গের শক্তির সহিত তুলনা করিলে অতীব তুচ্ছ বলিয়া মনে হইবে। আমরা ইহাকে "কাণকোটারি" বলিয়া থাকি, ইংরাজীতে "ear-wig" বলে; কারণ সাধারণ লোকের ধারণা যে, এই পোকারা কানের ভিতর দিয়া মস্তিষ্কে যাইয়া উপস্থিত হয়। ইহারা সাধারণত শীতপ্রধান দেশেই বাস করে; এবং ইহাদের দেহের আকারের পরিমাণে এমন বলবান ক্ষমতা-সম্পন্ন পতঙ্গ আর আছে কিনা সন্দেহ। অবশ্য ইহাকে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান বলিতে গেলে, তাহার অখণ্ড প্রমাণস্বরূপ আরও
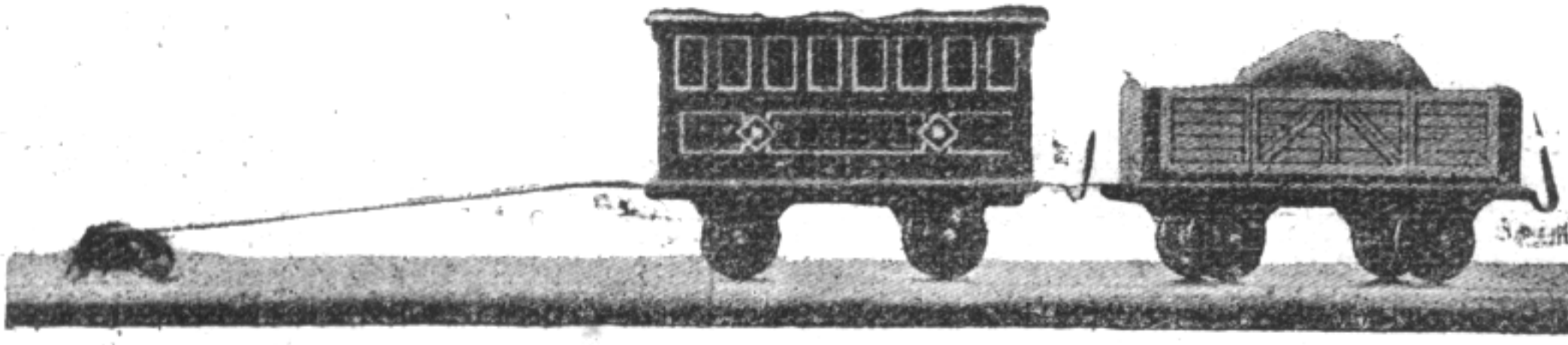
৪নং। মৌমাছি নিজের ওজনের তিনশত গুণ ভারী দ্রব্য টানিতেছে।

অনেকগুলি পতঙ্গের ক্ষমতা পরীক্ষা করা আবশ্যক। এই জাতীয় একটি বড় পোকাকে আঙ্গুলের মধ্যে আস্তে আস্তে চাপিয়া ধরিলে, ইহা পলায়ন করিবার জন্য যুদ্ধ করিবে; তখনই ইহার প্রবলপ্রতাপ অনুভব করা যায়। কিন্তু একটি পূর্ণবয়স্ক কাণকোটারির শরীরের ওজন আধ গ্রেনের অধিক নহে। এই ক্ষীণদেহ পতঙ্গ কি অদ্ভুত ব্যাপারই না সাধন করিতে সমর্থ! তাহা দেখিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। গুবরে পোকার ন্যায় ইহারাও অন্ধকারেই থাকিতে ভালবাসে; এবং আলোতে বাহির হইলেই তাড়াতাড়ি কোন আচ্ছাদনের নিম্নে পলায়ন করে; তবে এই সুবিধা যে, ইহাদের যে গাড়ী টানিতে দেওয়া হয় গুবরে পোকার ন্যায় সেই গাড়ির তলদেশে ইহারা লুক্কায়িত হইবার চেষ্টা করে না, বরং গাড়ীখানা টানিয়া লইয়া পলায়ন করিবার চেষ্টা করিতেছে এইরূপ মনে হয়।

৪নং ছবিতে যে মালগাড়ীটি আছে, উহার মাল তুলিয়া লইলে, কেবল গাড়ীটির ওজন ১৭০ গ্রেন। একটি অর্দ্ধ গ্রেন ওজনের কানকোটারি অতি সহজেই এই শূন্য মালগাড়ী টানিতে পারে এবং চালবিহীন প্রথম গাড়ীটিও অনায়াসে স্থানান্তরিত করিতে পারে।
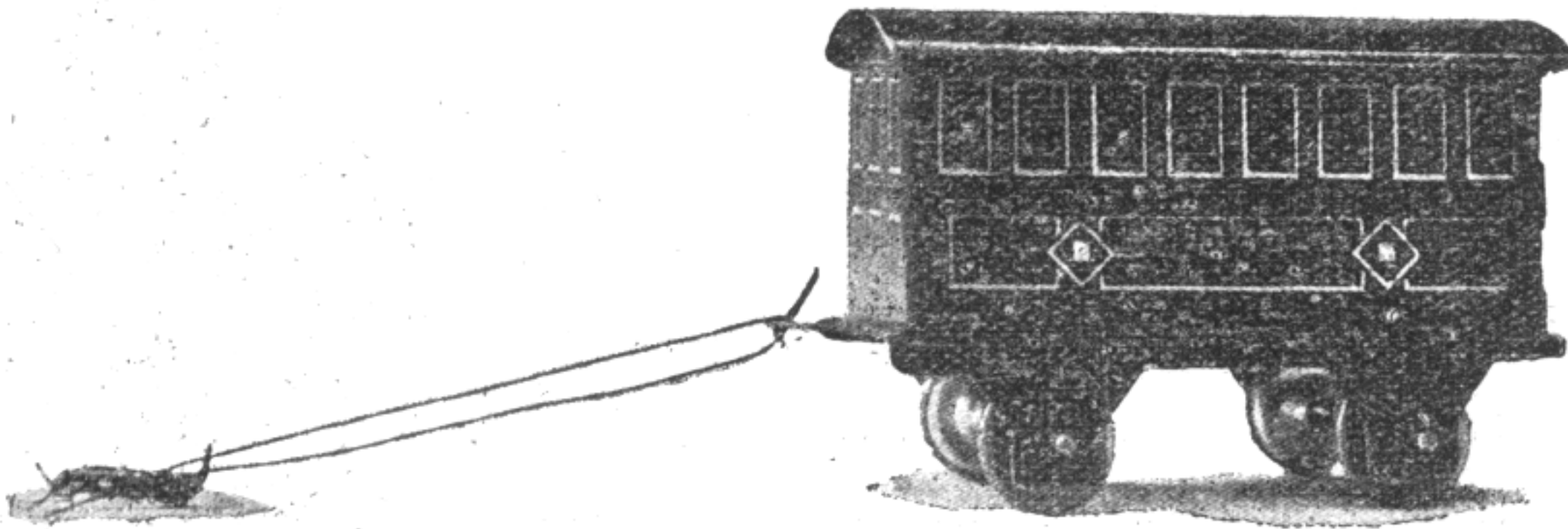
৫নং। কাণকোটারি নিজের দেহের ওজনের ৫৩০ গুণ ভার টানিতেছে।

কিন্তু শেষোক্ত গাড়ীতে চাল সংযুক্ত করা হইলে, সে ধীরে ধীরে ইহাকে টানিয়া লইয়া যায়। কারণ তখন সে তাহার ক্ষমতার শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়াছে; এবং মধ্যে মধ্যে বিশ্রামলাভের জন্য তাহাকে থামিতে হয়। চালবিশিষ্ট গাড়ীর ওজন ২৬৫ গ্রেন (৫নং ছবি) এবং পোকাটির শরীরের ভার অর্দ্ধ গ্রেন মাত্র। তাহা হইলে সে নিজের দেহের ওজনের ৫৩০ গুণ বেশী ভার টানিতেছে। দৈহিক আকারের পার্থক্য ছাড়িয়া দিলে, এই পোকার ভারবহন-ক্ষমতা মনুষ্য বা অশ্বের ক্ষমতা অপেক্ষা ৫৩ গুণ বেশী এবং এই অসামান্য অভিনয়ের সহিত তুলনা করিলে পূর্ব্বোক্ত মৌমাছির আশ্চর্য্যজনক ক্ষমতাও নিষ্প্রভ হইয়া যায়!

এতক্ষণ আমরা কেবল গাড়ী লইয়াই ক্ষমতা পরীক্ষা করিতেছিলাম; কিন্তু ইহার মধ্যে একটি কথা আছে। গাড়ীর চাকাগুলি ঘুরিতে থাকায় পতঙ্গদের ভার টানিবার বিশেষ সাহায্য করে। এইবার একেবারে নিশ্চল পদার্থ লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক্ কি ফল হয়। ৫নং ছবির কানকোটারি পোকাকে লইয়া প্রথম আরম্ভ করা যাক্।

গাড়ীটি সরাইয়া দিয়া, প্রত্যেক লাগামে আলপিন বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। একটি দুটি করিয়া সর্ব্বশুদ্ধ আটটি পিনের ভার তাহাকে টানিতে দেওয়া হইল। একটুকরা সাদা কার্ডবোর্ডের উপর পোকাটি ও পিনগুলি রক্ষিত হইয়াছে। কাগজের উপরিভাগ এই পত্রিকার (ভারতীর) মলাট অপেক্ষা একটু মোটা। কার্ডবোর্ডটি সমতলভাবে থাকিলে, সে ইহার উপর দিয়া এই আটটি পিনই ধীরে ধীরে টানিয়া লইয়া যাইতে সমর্থ। কিন্তু বোর্ডটি আস্তে আস্তে খাড়া করিয়া ধরিলে, পিনের ভার যেমন পোকাটিকে পশ্চাদ্ভাগে টানিতে আরম্ভ করে তখন দেখা যায় সে তাহার ক্ষুদ্র নখের দ্বারা বোর্ডটি দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। বোর্ডটি সম্পূর্ণ রূপে খাড়া করিয়া ধরিলে সে আর নড়িতে পারে না এবং পাছে ভারটি পড়িয়া যায় এই ভয়ে সে আর নড়ে না নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া থাকে। কিছুক্ষণ পরে সে হয়ত ভার টানিয়া চলিতে আরম্ভ করিবে এই আশায় স্থির হইয়া যদি ইহার কার্য্যাবলী নিরীক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে বিফল মনোরথ হইতে হইবে; কারণ সে কিছুতেই নড়ে না। তারপর পুনর্ব্বার অগ্রসর হইবার জন্য ইহাকে ধীরে ধীরে নড়াইয়া দিলেই, সে চলিতে আরম্ভ করিবে বটে, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই পদস্খলিত হইয়া পিনের ভারে একেবারে বোর্ডের নীচে পড়িয়া যাইবে। পিন ও সূতার ওজন ১৩ গ্রেন; পোকাটির শরীরের ওজন অর্দ্ধ গ্রেন মাত্র। তাহা হইলেই বুঝা যাইতেছে ক্ষেত্রের উপর ইহার দেহের ভারের ২৬ গুণ বেশী সে সমতল ভারী দ্রব্য বহন করিতে সমর্থ। (৬নং চিত্র) ১৫ cwt ওজনের একটা ঘোড়া এই প্রকারে তিন টন ওজনের
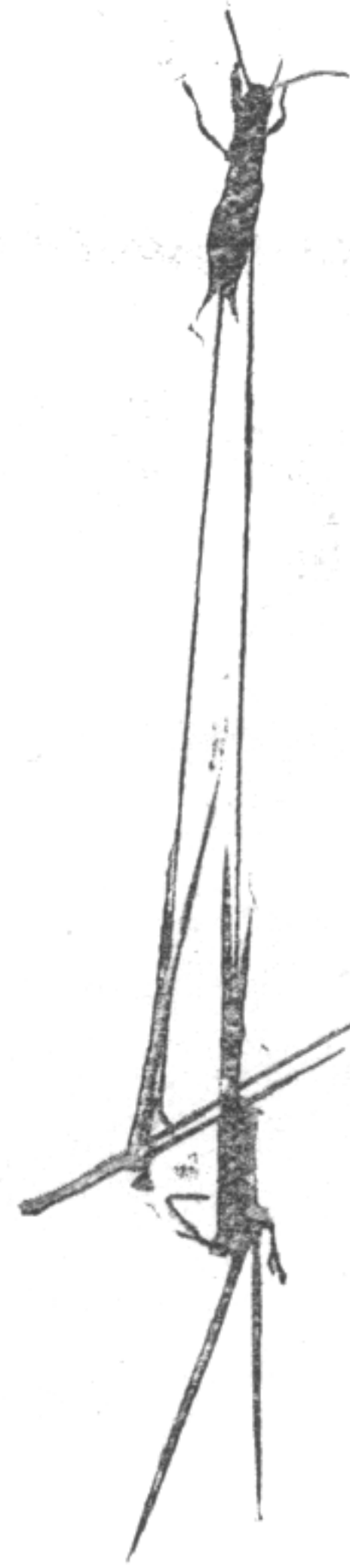
৬নং। কাণকোটারি নিজদেহের চেয়ে ২৬ গুণ ওজনের ভারী দ্রব্য কার্ডবোর্ডের উপর নিশ্চলভাবে ধরিয়া আছে।

গাছ টানিয়া লইয়া যাইতে বেশ ভার বোধ করে। কিন্তু সে নিজের দেহের ওজনের চার গুণ মাত্র বেশী ভার টানিতেছে।

পরবর্ত্তী পরীক্ষা কিছু স্বতন্ত্র প্রকারের। ইহাদের দ্বারা পতঙ্গের ভার উত্তোলন করিবার ক্ষমতা অবগত হওয়া যায়।

একটি dragon flyকে (পতঙ্গ বিশেষ) বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জ্জনীর মধ্যে তাহার পক্ষ দ্বারা চাপিয়া ধরিলে সে অবশ্য পলায়ন করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিবে। কিন্তু তাহার মুক্ত পদতলে দিয়াশলায়ের বাক্স বা ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ড রাখিয়া দিলে সে তাহা জড়াইয়া ধরিয়া পলায়ন করিতে উদ্যত হইবে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এই পোকা ৪৭ গ্রেন পর্য্যন্ত ভার বহন করিতে সক্ষম। ৭নং ছবিতে সে ৪০ গ্রেন ওজনের এক মাংস সিদ্ধ করিবার কাঠের শিক বহন করিয়া চলিয়াছে। পোকাটির শরীরের ভার ৪ গ্রেন। তাহা হইলে সে তাহার দেহের দশগুণ বেশী ভার বহন করিতেছে। তারপর পতঙ্গটিকে হাত হইতে মুক্ত করিয়া অতি সাবধানে সুতায় ঝুলাইয়া দেওয়া হউক্। এখন ভারবহনের সময় তাহার পক্ষ ও পদ দুই একসঙ্গে কার্য্য করিবে। কারণ পতঙ্গের পক্ষ ও পদের স্থূল শক্তি কার্য্যের সময় পরস্পরকে সাহায্য করে বলিয়া মনে হয়। এই অবস্থায় সে বাহ্যিক কোন অসুবিধা প্রকাশ না করিয়া বেশ উড়িয়া বেড়াইতে পারে। পরে বিশ্রামের সময় কিছুর উপর অবতরণ করিতে না পাইলে সে কেবল ঝুলিতেই থাকিবে। তখন ইহার পদতলে পূর্ব্বোক্ত শিকটি দেওয়া হইলে, সে পূর্ব্বাপেক্ষা আরও সহজে ইহা বহন করিতে সমর্থ হইবে। তারপর তাহাকে ৫৪ গ্রেন ওজনের একটি বড় কাষ্ঠের ছিপি উত্তোলন করিতে দেওয়া হইয়াছিল। ইহা সে অনেকক্ষণ দৃঢ়ভাবে ধরিয়া রাখিয়াছিল। ছিপির তলদেশে একটু একটু করিয়া ২৯ গ্রেন মলম আঁটিয়া দেওয়া হইল (৮নং ছবি দেখুন)। তাহা হইলে সে সর্ব্বশুদ্ধ ৮৩ গ্রেন বা নিজের শরীরের ওজনের ২০ গুণ বেশী ভারী দ্রব্য বহন করিতেছে। এবং ইহার পাখা ধরিয়া থাকিলে, সে যে ভার বহন করিতে সমর্থ, ঝুলন অবস্থায় তাহার দ্বিগুণ উত্তোলন করিতেছে। সে এই ভার যতক্ষণ না তাহার ফোটোচিত্র সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়াছিল ততক্ষণ পর্য্যন্ত অর্থাৎ দশমিনিটকাল ধরিয়া বহন করিয়াছিল। এবং বোধহয় কোনরূপ নাড়াচাড়া না পাইলে সে আরও অনেকক্ষণ এইভাবে বহন করিতে পারিত।

৭নং। ড্রাগোনফ্লাই ৪০ গ্রেণ ওজনের একটি শিক তুলিয়া ধরিয়াছে।

এই প্রকারে গুবরেপোকাকেও সুতা বাঁধিয়া ঝুলাইয়া দেওয়াতে, সে পূর্ব্বোক্ত ছিপিটি ও ২৭০ গ্রেন মলম বা সর্ব্বশুদ্ধ ৩২৪ গ্রেন বহন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। তাহার শরীরের ওজন ছয় গ্রেন; তাহা হইলে সে নিজের দেহভারের ৫৬ গুণ বেশী ভার টানিতে পারে; এবং ইহার তুলনায় পূর্ব্বলিখিত পতঙ্গের (dragon fly) শক্তি অতীব তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়।

পুর্ব্বোক্ত dragon fly লম্বমান অবস্থায় নিজের শরীরের ২০গুণ বেশী ভার বহন করিতে সমর্থ। কিন্তু তাহাকে বাগানে খোঁটা বাঁধিয়া ছাড়িয়া দিলে, সে নিজের দেহের ভারের অপেক্ষা বেশী ভারী মাল টানিয়া লইয়া যাইতে পারিবে না। বোধহয় খোঁটার টানে তাহার অনেকটা শক্তি অপচয় হইয়া যায়।

৮নং। ড্রাগোনফাই নিজের শরীরের ২০ গুণ ভার ঝুলাইয়া রাখিয়াছে।

বলবান কানকোটারি পোকার ভারউত্তোলন ক্ষমতা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সে নিজের দেহের ওজনের ১০৪ গুণ ভারী দ্রব্য বহন করিতে সমর্থ। তাহা হইলে এ ক্ষেত্রেও আমরা তাহার বিশেষ প্রাধান্য লক্ষ্য করিয়া থাকি।

এইবার একটি বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষার কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। আমরা পূর্ব্বে যে গুটিপোকার বিষয় আলোচনা করিয়াছি, সেইরূপ একটি পোকাকে আহারের সময় বৃক্ষশাখা হইতে স্থানান্তরিত করিয়া, তাহার জড়াইয়া ধরিবার ক্ষমতা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল। অর্দ্ধ আউন্স হইতে ৫০ আউন্স ভারী বৃক্ষ পত্রাদি ওজন করিবার স্প্রীং নির্ম্মিত যন্ত্রবিশেষের টানিবার তারের সহিত পোকাটি যে বৃক্ষশাখায় বসিয়া আহার করিতেছিল, তাহার এক ক্ষুদ্র অংশ সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইল। তারপর পোকাটিকে আস্তে আস্তে বৃক্ষশাখা হইতে টানিয়া আনা হইয়াছিল। তাহাতে দেখা যায় সে ৪০ আউন্স ভারের টান বহন করিতেছে। ইহা তাহার নিজের শরীরের ওজনের ৯২ গুণ বেশী। আমরা যে গুটিপোকাদের আহারের সময় আশ্রয়স্থান হইতে তাহাদিগকে নড়াইয়া ফেলিয়া দিতে বা ফুঁ দিয়া উড়াইয়া দিতে অসমর্থ হই, তাহার কারণ আমরা এই পোকাদের জড়াইয়া ধরিবার ক্ষমতা হইতেই এখন স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি!

শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

বালক গণিতকার

সিংহলনিবাসী মান্যবর অরুণাচলম সেখানকার শাখা রয়াল আসিয়াটিক সোসাইটির কোন সভায় একজন শিশু গণিতকার সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন—ভারতীর পাঠকগণের প্রীতির জন্য নিম্নে ভাষান্তরিত করিয়া তাহা সঙ্কলন করিলাম।

"সেদিন যে বালকটি আপনাদিগের সমক্ষে গণিতে অসাধারণ পারদর্শিতা দেখাইয়াছে তাহার জীবন চরিত্র ও বুদ্ধিবৃত্তি সম্পর্কে যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহাই এ রচনার অবলম্বন। তাহার অদ্ভুত ক্ষমতা কোন বিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকের পক্ষেই অত্যাশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইত কিন্তু যখনই ভাবি বিদ্বান পণ্ডিত হওয়া দূরে থাকুক সে একেবারে অজ্ঞ নিরক্ষর তখন বিস্ময়ের পরিসীমা থাকে না। তামিল মাতৃভাষার লিখন পঠন প্রণালী পর্য্যন্ত সে কিছুই জানে না—এবং অতি দরিদ্র কর্ম্মজীবি বংশে তাহার জন্ম। এখন তাহার বয়স সবে মাত্র ষোড়শ বৎসর, এই অপূর্ব্ব শক্তির বিকাশ

দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম হইতেই প্রকাশ পাইয়াছে। এই গণনা শক্তি ভিন্ন তাহার মস্তিষ্কের আর যে বিশেষ কোন ক্ষমতা আছে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না—মনে হয় যেন এক অংশের অসম উৎকর্ষলাভে অন্য ভাগে বিষম অপরিণতি ঘটিয়াছে। আত্মরক্ষায় সে সম্পূর্ণ অক্ষম—অর্থের মূল্য বুঝিতে একেবারে অসমর্থ, একশত টাকার একখানি নোটের পরিবর্ত্তে কাচের দশটি মার্ব্বেল পাইলে অধিক খুসী হয়। মানসিক ব্যাপারে এমন নূতন সমস্যা ইহার পূর্ব্বে আর কখন বুদ্ধিগোচর হয় নাই তাই ইহা মীমাংসা করিবার বৈজ্ঞানিক প্রলোভন সম্বরণ করা কঠিন। কলম্বো সহরে সে সবে একমাস মাত্র আসিয়াছে ইহার মধ্যে তাহাদিগের মাতা পুত্রের সহিত কথাবার্ত্তা বলিবার সুযোগও আমার ঘটিয়াছে। তাহার বংশ বিবরণ তাহার বাল্য জীবনযাপনপ্রণালী জানিতে পারিলে তাহার এই অপরূপ বুদ্ধির সম্বন্ধে কতক জ্ঞান লাভ করিতে পারিব এই আশায় তাহাদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া তত্ত্বানুসন্ধান করিয়াছিলাম। তাহারা চালিয়া নামক তন্তুবায় জাতীয় দক্ষিণ ভারতবাসী এবং অত্যন্ত সরল প্রকৃতির লোক, এই জাতি হইতেই সিংহলী সানাগম সম্প্রদায়ের উৎপত্তি। মদুরা হইতে ২৩ ক্রোশ দূরে অবস্থিত শ্রীবিন্নিপত্তর নামক ক্ষুদ্র গ্রামে ইহার পিতৃমাতৃপরিবারের বসতি। পিতার মৃত্যু হইয়াছে। পুত্রের এই অপূর্ব্ব শক্তি বিকাশের কারণ সম্বন্ধে তাহার মাতা যাহা বলেন তাহা কোন বৈজ্ঞানিক কিম্বা সাধারণ ব্যক্তি প্রত্যয় করিবেন না তবে তাহা ধর্ম্মমুগ্ধ হিন্দুর মন স্পর্শ করিবে সন্দেহ নাই।

জন্মকথা। দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর তাড়নায় ইহার পিতা মাতা উপার্জ্জন আশায় মাদুরা নগরে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং সেখানে সামান্য বেতনের সাহায্যে কায়ক্লেশে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাকে। প্রথম পুত্রের মৃত্যুর পর যখন দুইটি কন্যা মাত্র তাহাদের জীবনের আশ্রয় হইল তখন পিতা মাতা দুজনেই ভবিষ্যতের অবলম্বন স্বরূপ আবার একটি পুত্রকে একান্ত মনে কামনা করিতে লাগিলেন। এই উদ্দেশ্যে মাতা প্রায়ই দুইক্রোশ দূরে সুব্রহ্মণ্যদেব এবং কাণ্ডস্বামী অথবা অমরসেনাপতির মন্দিরে প্রার্থনা করিতে যাইতেন। এই সময়ে একবার একজন পূজক দশাপ্রাপ্ত অবস্থায় উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীর প্রশ্নোত্তরে নানাবিধ বার্ত্তা প্রচার করিতে থাকেন। এই সুযোগে স্ত্রীলোকটি আপন আবেদন জ্ঞাপন করিয়া আদেশ প্রার্থনা করে। প্রত্যুত্তরে জানিতে পারে তাহার মনস্কামনা শীঘ্রই পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা তবে প্রত্যেক সোমবাসরে উপবাসী থাকিয়া ঐ মন্দিরে আসিয়া পূজা করিতে হইবে। সেই পূজারীর কথামত এই নারী ছয় মাস

Seyne

বালক গণিতকার।

ধরিয়া প্রতি সোমবারে মন্দিরে পূজার্চ্চনা করিত। কাল পূর্ণ হইলে অল্পদিনের মধ্যেই তাহার এই পুত্র জন্মিল—তাহার নাম রাখা হইল আরমকাণ অর্থাৎ ষড়ানন। বালকের প্রতি পায়ে এবং হাতে একটি করিয়া অধিক অঙ্গুলি। ইহা ভিন্ন তাহার শরীরে অন্য কোন বিশেষত্বের চিহ্ন দৃষ্ট হয় না। হস্তপদের অক্ষমতা এবং অঙ্গুলির এই অনাবশ্যক বাহুল্যে সে বড় একটা কোন কাজই করিতে পারিত না—পথে অন্য বেকার বালকদিগের সহিত বসিয়া খেলা করিত এবং মন্দিরযাত্রী পথিকদিগের নিকট ভিক্ষা করিয়া দু'চার পয়সা উপার্জ্জন করিত।

বুদ্ধিবিকাশ। প্রায় চারি বৎসর পূর্ব্বে যখন তাহার বয়স দ্বাদশ বৎসর তখন একবার দেবমন্দির হইতে ফিরিয়া তাহার মাতা শুনিলেন তাঁহার ষড়ানন অঙ্কে গণনার জমা খরচের হিসাবে বড় নিপুণ হইয়া উঠিয়াছে—এ কথা তাঁহার সহজে বিশ্বাস হইল না—কেমন করিয়া এ অসম্ভব সম্ভব হইল ইহা ভাবিয়া তিনি কিছু উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। সে নিজে বলিল কার্ত্তিক মাসে সে অপরাপর যাত্রীগণের সহিত একত্র হইয়া মন্দিরে পূজা ও ভিক্ষা করিতে গিয়াছিল, এবং রাত্রিতে যখন ঘুমাইয়া পড়ে তখন স্বপ্নে এক সন্ন্যাসী আসিয়া তাহার জিহ্বার উপর কি যেন লিখিয়া দিয়া গেলেন। আজ পর্য্যন্ত প্রমাণ স্বরূপ সে জিহ্বাগ্রে এক বিচিত্র চিহ্ন দেখাইয়া থাকে। পরদিন প্রাতে যখন সে মিষ্টান্ন লোভে ও ভিক্ষার আশায় মোদকের দোকানের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল তখন তাহাদের হিসাবের জটিল প্রণালী দেখিয়া বড় আশ্চর্য্য হইয়া গেল, তাহার মনে হইতে লাগিল এ কাজ সে অতি সত্বর ও অনায়াসে করিতে পারে এবং সে কথা বলায় দোকানদারেরা তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য অত্যন্ত কঠিন প্রশ্ন দিয়াও ঠকাইতে পারিল না। অল্পদিনের মধ্যেই তাহার খ্যাতি চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া গেল। অনেকেই তাহার এই অদ্ভুত ক্ষমতা পরীক্ষা করিতে আসিত এবং নিপুণতার পরিচয় পাইয়া কিছু কিছু পুরস্কার দিয়া যাইত। এই অর্থ লাভে তাহার বিধবা মাতার দুরবস্থা দূর হইয়া সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে দিন কাটিতে লাগিল।

দশ মাস পূর্ব্বে রামস্বামী আইয়ার নামক একজন ব্রাহ্মণ বালকের মাতাকে মাসিক ২২ টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়া তাহাকে লইয়া যান এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে এই বালকের অত্যদ্ভুত ক্ষমতার পরীক্ষা দেখাইয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন। তাঁহার এই পর্য্যটনের এক সময় গত মাসে তিনি এখানকার কলম্বো বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হন এবং বহু ভদ্র লোকের অনুরোধে এই বালকটিকে তাঁহাদের নিরাপদ আশ্রয়ে রাখিতে সম্মত হইয়া যান। তাহার মাতাকেও সংবাদ দিয়া এখানে আনা হইয়াছে, মাদ্রাজ ব্যাঙ্কের কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সকনাথান এখন তাহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

অস্পষ্ট মানস-বৃত্তি। কেমন করিয়া এই নিরক্ষর বালক গণিতের দুরূহ প্রশ্ন সকলের উত্তর দান করে, অক্লেশে কঠিন সমস্যা পূরণ করে, জটিল নিয়মের মুখাপেক্ষী না হইয়া অবলীলাক্রমে হিসাব পরিষ্কার করিয়া দেয়, এ এক আশ্চর্য্য রহস্য। আধুনিক বিজ্ঞানবিৎগণ হয়ত বলিবেন তাহার মনের কোনও অপ্রত্যক্ষ সঙ্গোপন অংশে পূর্ব্ব পিতাপিতামহদিগের অর্জ্জিত এই বিশেষ বুদ্ধি সঞ্চিত আছে—তাহারি প্রভাবে ইহার এই সহজ সংস্কার। আমি সাবধানে অনুসন্ধানের দ্বারা যতদূর জানিতে পারিয়াছি তাহার পূর্ব্ব পুরুষেরা গণিত কিম্বা অন্য কোনও বিষয়েই দক্ষ কিম্বা ব্যুৎপন্ন ছিলেন না সর্ব্বাংশেই সাধারণ সামান্য ব্যক্তির মত ছিলেন। ভারতবর্ষ কিম্বা সিংহল যেখানে জাতিবিচারের নিয়ম অক্ষুন্ন, যেখানে সে সীমা অতিক্রম করা সমাজে থাকিয়া কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়, যেখানে বংশপরম্পরায় একই নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিতে হয় সেখানে তন্তুবায়জাতীয় সাধারণবুদ্ধি অজ্ঞ বালকের এই অসামান্য ক্ষমতা অতীব বিস্ময়কর। হিন্দু কিম্বা বৌদ্ধ আমরা বলিব এ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল—বিশ্বাস যাহার যেমনি হউক ইহা যখন প্রমাণ করা অসম্ভব তখন তাহা প্রচার করিলে লোকে গ্রহণ করিবে কেন?

এই বিস্ময়কর শক্তির আদিকারণ যাহাই হউক—ইংলণ্ডের মর্গান, ব্যারেজ, বুথ হার্সেল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গণিতকারগণ যে বলিয়াছিলেন ইউরোপের এখনও ভারতবর্ষের নিকট অনেক শিখিবার আছে সেকথা অমূলক হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে জগদ্বিখ্যাত এভারেষ্ট যাঁহার নামে হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ চূড়ার নূতন নামকরণ হইয়াছে, তাঁহার ভাগিনেয়ী শ্রীমতী বুশ লিখিয়াছিলেন একজন ব্রাহ্মণপণ্ডিত তাঁহার মাতুলকে প্রথমে গণিত শাস্ত্র সাধনায় দীক্ষা দিয়াছিলেন, তাঁহারি শিক্ষা এবং নির্দ্দেশে তিনি ইহার কঠিন সমস্যা সকল আয়ত্ত করিতে সক্ষম হয়েন এবং এই শিক্ষায় যে নূতন তথ্য লাভ করেন তাহা পুনরায় আপন শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন।

এই বালকের গণনাশক্তি পরীক্ষা করিতে গিয়া আমি দেখিয়াছি ইহা কোন অলৌকিক আলোকলব্ধ কোন মন্ত্রশক্তির সঙ্গোপন ব্যাপার নয়,—ইহা অতি প্রত্যক্ষ সহজ সরল সংখ্যাগণনাপ্রণালী। যদি তাহাকে ২৫৫৫+৩৩৪৭ দ্বারা গুণ করিতে দেওয়া হয় তাহা হইলে সে ৫৫ বাদ দিয়া ৩৫০০ এবং ৩৩৪৭'কে ৩৫০০এ বাড়াইয়া ৬৩ বাদ দিয়া লয়, এবং ২½ হাজারকে ৩½ হাজার দিয়া সহজে গুণ করিয়া আবশ্যকমত ৫৫ যোগ এবং ৬৩ বিয়োগ করিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে নির্ভুল উত্তর জানাইয়া দেয়। ইহা নিতান্তই যেন বিদ্যুৎ শক্তিতে মানস-অঙ্ক সাধন।

কালিদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণ

(Sylvain Levi-র ফরাসী হইতে)

কালিদাসের সমুজ্জ্বল যশোভাতি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের স্মৃতি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিয়াছে। কিন্তু জয়মাল্য অর্জ্জন করিবার পূর্ব্বে,—কতকগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত যশের বিরুদ্ধে, এবং যাহারা নূতনের বিদ্বেষী তাহাদের বিরুদ্ধে কালিদাসকে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। কালিদাসের যেটি প্রথম রচনা সেই মালবিকাগ্নিমিত্রের প্রস্তাবনায় এই যুদ্ধের একটু প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। সূত্রধার, পারিপার্শ্বিককে ডাকিয়া নাট্যাভিনয়সম্বন্ধে আদেশ করিতেছেন :—

"সূত্রধার।—উপস্থিত সভ্যমণ্ডলী শ্রীকালিদাসবিরচিত "মালবিকাগ্নিমিত্র" নামক নাটক এই বসন্তোৎসবে অভিনয় করতে আমাকে বলচেন। অতএব, তোমরা এখনি সঙ্গীত আরম্ভ করে' দেও।

পারিপার্শ্বিক।—না, তা হতে পারে না। ভাস ও সৌমিল্য প্রভৃতি খ্যাতনামা কবিদের রচনাসকল অতিক্রম করে'[১], বর্ত্তমান কবি কালিদাসের রচনাকে সভ্যমণ্ডলী এত অধিক আদর করবেন কি বলে'?

সূত্রধার।—এ যে তোমার নিতান্ত অবিবেচনার কথা হল। দেখ :—

শুধু পুরাতন বলি', কোন কাব্য নহে মাননীয়
অথবা নূতন বলি' নহে দূষ্য ইহাও জানিও।

পরীক্ষিয়া দোষগুণ সাধু সুধীগণ
তার মধ্যে একটিরে করেন বরণ।
পর-বুদ্ধি-অনুযায়ী যার মতি-গতি
বিবেচনা-শক্তিহীন সে ত মূঢ় অতি॥

পারিপার্শ্বিক।—তার সন্দেহ কি, এবিষয়ে পণ্ডিতেরা যা বলেন তাই প্রমাণ বলে' ধর্ত্তব্য।"

ভাসের খ্যাতি, বহুকাল যুঝাযুঝি করিয়া তবে সাহিত্য ক্ষেত্র হইতে অন্তর্হিত হয়।

কবি বাণ যিনি সপ্তম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন, তিনি, অন্যান্য প্রখ্যাত সাহিত্য-নায়কদিগের মধ্যে, ভাসকে কালিদাসের পার্শ্বে বসাইয়াছেন। "সূত্রধারকর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত এবং বহুপাত্র ও পতাকাবিশিষ্ট ভাসের নাটকগুলি দেবালয়ের ন্যায় সুপ্রতিষ্ঠিত।" ঐ একই যুগে, বাক্‌পতি তাঁহার রচিত কবিতায়, ভাসকে ঐরূপ গৌরবের স্থান প্রদান করিয়াছেন:— "তিনি (বাক্‌পতি) ভাসের রচনায়, "রঘু"-গ্রন্থকারের রচনায়, সুবন্ধুর রচনায় এবং হরিচন্দ্রের রচনায় আনন্দলাভ করেন।" অষ্টম শতাব্দীতে, রাজশেখর, ভাসকে সুপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যের অন্তর্ভূত কবিগণের মধ্যে স্থান দিয়াছেন।

আর এক শতাব্দী পরে, সোমদেব তাঁহার "রহস্য-তিলক" নামক আখ্যায়িকায়, "মহাকবি ভাসে"র একটি শ্লোক সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। আরও অনেক পরে, "প্রসন্ন-রাঘবের" গ্রন্থকার জয়দেব, ভাস ও কালিদাসের নাম এক সঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন:— "পরিহাসের কবি ভাস, আর সৌন্দর্য্যের কবি কালিকাস।" কাব্যসংগ্রহ গ্রন্থাদিতে ভাসের রচিত যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা হইতে তাঁহার প্রতিভা সম্বন্ধে যে ধারণা হয় তাহা নিতান্ত অসম্পূর্ণ। তাঁহার নাট্যরচনার কিরূপ প্রকৃতি তাহার আভাস পাইবার জন্য অনেক অনুসন্ধান হইয়াছে; তৎসম্বন্ধে ক্ষুদ্রতম প্রমাণও উপেক্ষিত হয় নাই। M. Peterson পূর্ব্বোল্লিখিত বাণের শ্লোকটিকে ভিত্তি করিয়া, ভাসের রচিত নাটকাদির লক্ষণ নিরূপণের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ শ্লোকে ভাসের নাট্যরচনার বিশেষ কোন পরিচয় নাই। আবার M. Pischel ভাণের ঐ শ্লোকটি হইতে সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, মৃচ্ছকটিক নাটক ভাসের রচিত। কিন্তু পরে তিনি এই মতটির পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। কতকগুলি নিদর্শন হইতে আমরা এই রহস্যটির সম্বন্ধে একটি অলক্ষিতপূর্ব্ব আলোক প্রাপ্ত হইয়াছি। "অভিনব গুপ্ত",—যিনি আধুনিক সাহিত্যসম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয়, যিনি ভরত ও আনন্দবর্দ্ধনের ভাষ্যকার, যিনি দশম শতাব্দীর শেষভাগে গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছিলেন, তিনি "স্বপ্নবাসবদত্তা" নামক এক গ্রন্থের উল্লেখ করেন। রাজশেখরের রচিত একটি শ্লোকে, এই গ্রন্থের একটু পরিচয় পাওয়া যায়। "পণ্ডিতেরা ভাসের অসংখ্য নাটককে পরীক্ষার্থ অগ্নিতে নিক্ষেপ করুন না কেন, কিন্তু এ কথা নিশ্চিত, "স্বপ্নবাসবদত্তা"র গৃহদাহের অনলে ঐ সকল গ্রন্থ ভস্ম হইয়া যায় নাই।" অতএব দেখা যাইতেছে, ভাস, সর্ব্ব প্রথমে রঙ্গমঞ্চে বৎস উদয়নের চরিত-বৃত্তান্তের অবতারণা করেন। আরও অনেক পরে, শ্রীহর্ষদেবও তাহাই করিয়াছেন। রত্নাবলীর গৃহদাহদৃশ্য সাক্ষাৎভাবে ভাস হইতেই গৃহীত। মনে হয়, যেন অনুকরণকারী পূর্ব্ববর্ত্তী নাটককারের সম্মানার্থে ইচ্ছা করিয়াই, যে অগ্নিদাহে বাসবদত্তা মরিতে মরিতে বাঁচিয়া যান সেই লাবণকের অগ্নিদাহের পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। ভাসের একটি গুণবাচক প্রসিদ্ধ নাম "জলণমিত্তে"—অর্থাৎ জ্বলন-মিত্র। "গৌড়বহো" গ্রন্থে ইহার সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে।

তাহার পর যে একটি নান্দী আছে তাহা রত্নাবলীর নান্দীকে স্মরণ করাইয়া দেয়। "যে সময়ে বিবাহের অনুষ্ঠান হইবে, ঈশ্বরাধনা করিতে করিতে অন্যমনস্কা হইয়া গৌরী দেখিলেন,—তাঁহার সম্মুখে তাঁহার পতির মূর্ত্তি অঙ্কিত; দেখিলেন, পতি গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ করিয়া আছেন; তখন তিনি ক্ষোভে, বিস্ময়ে, রোষে ও লজ্জায় অভিভূত হইয়া বৃদ্ধাদের কথাসত্ত্বেও স্বীয় প্রিয়তমের উপর পুষ্পাঞ্জলি বিকীর্ণ করিতে অনেকক্ষণ ধরিয়া ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। মহাশক্তি-শালী সেই পুষ্পাঞ্জলি তোমাদের রক্ষা করুন।" সোমদেবের "যশস্তিলকে" যে শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে, ভাসকে "কবিতার হাস" কেন বলা হইয়াছে তাহারই একটা ব্যাখ্যা আছে,—অর্থাৎ শুধু অনুপ্রাসের খাতিরে তাঁহাকে ঐ পদবী দেওয়া হয় নাই বাস্তবিকই তাঁহার কবিতাগুলিতে যেন একটু পরিহাসের ভাব আছে; —যথা "সুরা হইয়াছে পান করিবার জন্য, রূপসীর রূপ হইয়াছে দেখিবার জন্য; সুন্দর পরিচ্ছদ হইয়াছে পরিধানের জন্য;—ইহাই মুক্তির প্রকৃত পন্থা। পিণাকধারী ঈশ্বরের জয় হউক; তিনিই ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন।" এইরূপ চটকদার বাক্-ভঙ্গী ও লীলাময়ী কল্পনার বিকাশ ভাসের অন্যান্য কবিতাতেও পরিদৃষ্ট হয়। যথা:—"স্বকীয় বল্লভ হইতে দূরে অবস্থিত কেবল ললনার মুখের সহিত নিশানাথের সাদৃশ্য উপলব্ধি হইতেছে; আজ সূর্য্যের দীপ্তি, কোন অস্তগৌরব মহৎ ব্যক্তির প্রভুত্বের ন্যায় ক্ষীণ; নবপরিণীতা পত্নীর রোষ "ঘুটের আগুনের" ন্যায় এবং শীতল বায়ু দুর্ব্বৃত্তের সংস্পর্শের ন্যায় কষ্টজনক।"

"দরিদ্র হঠাৎ সমৃদ্ধ হইলে যেরূপ হয়, সূর্য্যের রশ্মি আজ সেইরূপ প্রখর; অকৃতজ্ঞ জনের মিত্র ত্যাগের ন্যায়, হরিণ স্বকীয় শৃঙ্গত্যাগ করিতেছে; তাপসজনের চিত্তের ন্যায় জল শীতল হইয়াছে। দরিদ্র প্রেমিকের ন্যায় বালুকারাশি শুষ্ক হইয়াছে।" (শরতের বর্ণনা)

"সৈকত ভূমিতে চন্দ্ররশ্মি পতিত হইলে, বিড়াল তাহা দুগ্ধ ভাবিয়া লেহন করে; যদি তাহা বৃক্ষ কোটরে সংলগ্ন হয়, হস্তী তাহাকে পদ্মের শিকড় বলিয়া মনে করে; উহা যদি প্রণয়ীদের শয্যার উপর পতিত হয়, রমণী এই কথা বলিয়া উহাকে ধরিতে যায়:—"ঐ আমার আঙিয়া।" অহো! চন্দ্রমা স্বকীয় কিরণচ্ছটায় প্রমত্ত হইয়া, সমস্ত জগৎকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলে!" (চন্দ্রের স্তুতিবাদ)

প্রণয়লীলার দৃশ্যগুলির বর্ণনায় ভাসের এইরূপ ধরণের একটু রসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়; যথা:—

"কঠিন হৃদয়া রমণি, তোমাদের যে কোপ আমাদের সুখের প্রতিবন্ধক, সেই কোপকে পরিত্যাগ কর; আমাদের প্রত্যেক দিন অতি-বাহিত হইলে, যম তাঁহার খাতায় তাহা লিখিয়া রাখেন। যৌবনের একটা নির্দ্দিষ্ট সময় আছে এবং মিলন স্বল্পকালস্থায়ী। আমাদের কাল কেবল কলহে অতিবাহিত হয়, তাহা না করিয়া বরং এস আমরা সুখভোগেই কাল অতিবাহিত করি।

"অলীক প্রণয়ের ভাণ করিয়া তুমি আমাকে সর্ব্বদাই প্রতারণা করিয়াছ; আমি লক্ষ্য করিয়াছি, শুধু কথাতেই তোমার যত

আদর যত্ন ও অনুনয় বিনয়; সমস্ত খুলিয়া বলাই ভাল, তুমি আমাকে ভালবাস না, কেন মিছে কষ্ট পাও; তোমাকে আমারও ভাল লাগে না; আমি তোমার প্রতি উদাসীনঃ—যেখানে মনের মিল, সেইখানেই প্রাণের খিল।”

এই শ্লোকগুলিতে একটু সূক্ষ্ম রুচি ও মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়—উহার মধ্যে একটু মৃদু ও সুকুমার পরিহাসের ভাবও আছে। “অর্থদ্যোতনিকায়” যে শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতে অনুমান হয়, ভাস একটি নাট্যশাস্ত্রের গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বায়ুরন্ধ্র

বায়ু নৌ-বিদ্যার ব্যবহারিক শিক্ষা যেরূপ অল্প দিন মাত্র আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে ব্যোমযন্ত্রপরিচালন বিষয়ে অভূতপূর্ব্ব উন্নতি ভাবিয়া দেখিলে, বিস্মিত হইতে হয়। রাইট (wright) ভ্রাতৃদ্বয় তাঁহাদের চালক যন্ত্রখানি ভূপৃষ্ঠ হইতে বায়ুসাগরে ভাসমান করিবার বহুপূর্ব্ব হইতেই বায়ুনৌবিদ্যার মূল সূত্রগুলি বৈজ্ঞানিক সমাজে পরিজ্ঞাত ছিল; এবং সভ্যজগতে উপযুক্ত ব্যোমযন্ত্র নির্ম্মাণ করিবার পক্ষে বিচক্ষণ শিল্পীর নিপুণতারও অভাব ছিল না। কিন্তু, তথাপি যখন ব্যোমযন্ত্রখানি সর্ব্বপ্রথমে বায়ু তরঙ্গে ভাসাইয়া দেওয়া হইল, তখন ব্যোমচারী নাবিক আপনাকে যে এক বিশাল বায়ু সমুদ্রের সম্মুখীন দেখিলেন, তাহাতে বুঝিলেন যে ব্যোমযন্ত্র-পরিচালনরূপ শিল্পের বর্ণমালা হইতে আরম্ভ করিয়া আদ্যন্ত সমস্তই তাঁহাকে নূতন করিয়া শিখিতে হইবে।

যদিও বায়ু বিজ্ঞানের বিবিধ গবেষণা ফলে প্রমাণিত হইয়াছিল যে, ভূপৃষ্ঠের সন্নিকটস্থ বায়ুস্তরসমূহ সতত আলোড়িত অবস্থায় রহিয়াছে, তথাপি এইরূপ আলোড়িত অবস্থার বিপদজনকতা ঠিক কতটুকু, তাহা অনুভব করিবার জন্য ব্যোম নাবিকের অসমসাহসিকতা অপেক্ষা করিতেছিল। ভূপৃষ্ঠসংলগ্ন অথবা তৎসন্নিহিত বায়ুরাশি—যাহা কি বেগ, কি গতি বিষয়ে অত্যন্ত নিয়মিত ভাবে বহিতেছে বলিয়া বিবেচিত হইত, কার্য্যকালে দেখা গেল যে তাহাও ভূপৃষ্ঠের বন্ধুরতা নিবন্ধন অচিন্তিতপূর্ব্বরূপে পরিবর্ত্তিত হয়—একটি ক্ষুদ্র নালা, একটা বেড়া, এতটুকু একটা ঢিবি বায়ুপ্রবাহের ধারাবাহিকতা বিনষ্ট করে, এবং এই আলোড়ন ভূপৃষ্ঠ হইতে উপরস্থ বায়ুস্তরের অনেকদূর পর্য্যন্ত প্রসৃত হয়।

ভূপৃষ্ঠের বন্ধুরতা বশতঃ বায়ুপ্রবাহের যে বিশৃঙ্খল ভাব পরিদৃষ্ট হয়, ব্যোমনাবিক কার্য্যতঃ দেখিলেন যে তদ্ব্যতীত বায়ু মণ্ডলের অস্থিরতার আরও অনেক কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে। অনেক স্থলেই ব্যোমনাবিক এইরূপ অনুভব করেন যে তাঁহার যন্ত্রখানি যেন গর্ত্তের মধ্যে বেগে পতিত হইতেছে। পক্ষান্তরে, পথিমধ্যস্থ প্রস্তর খণ্ডের সহিত কোনও স্থলযানের সংঘর্ষের ন্যায় একটা প্রবল

"ঝাঁকুনি"র অনুভূতিও অনেক সময় উপলব্ধি হয়। এই সকল অননুভূতপূর্ব্ব অভিজ্ঞতার কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া ব্যোমচারী নাবিকেরা ক্রমেই স্বীয় মনোমত একটি অভিধানের সৃষ্টি করিতেছেন। "বায়ু-রন্ধ্র" "উপলখণ্ড" "সুইস্‌-পনীর" প্রভৃতি অবৈজ্ঞানিক বাক্যগুলি বায়ু নৌবিদ্যার সচরাচর ব্যবহৃত কথাবার্ত্তায় গৃহীত হইতেছে।

উপরি উক্ত অনুভূতিগুলির বিজ্ঞান-সম্মত কারণ নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইলে, প্রথমেই, ঊর্দ্ধগামী অথবা অধোবাহী বায়ু প্রবাহ উহাদের একটি প্রধান কারণ বলিয়া স্বতঃই অনুমিত হয়। পৃথিবী পৃষ্ঠে অবতরণ-কারী কোন বায়ুপ্রবাহে এরোপ্লান প্রবেশ করিলে, তৎক্ষণাৎ চাপের যে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, তাহাতে ব্যোমযন্ত্র ইতিপূর্ব্বে যে বলে উদ্ভাসিত ছিল, সেই বলের হ্রাস হয়; এবং ব্যোমমার্গে কোনরূপ বিবর থাকা সম্ভবপর না হইলেও, গর্ত্ত মধ্যে পতন রূপ একটা অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে এরোপ্লেন কোন ঊর্দ্ধগামী বায়ু প্রবাহের মধ্যে পড়িলে, যন্ত্রনিম্নস্থ বায়ুরাশির চাপের বৃদ্ধি হওয়ায় যন্ত্রখানি সবলে ঊর্দ্ধে উত্তোলিত হয়; এবং ইহাতেই একটা প্রবল সংঘাতের অনুভূতি উপলব্ধ হয়।

অধ্যাপক টমসনের মতে বায়ুসাগরে ব্যোম-যন্ত্র পরিচালন কালে রন্ধ্র মধ্যে পতন কিংবা প্রস্তরাঘাতরূপ যে অনুভূতি উপলব্ধ হয়, তাহা লম্বভাবে প্রবাহিত ঊর্দ্ধগামী অথবা অধোবাহী বায়ু প্রবাহের ক্রিয়া ব্যতীতও ঘটিতে পরে। চক্রবালের সহিত সমান্তরালভাবে প্রবাহিত পশ্চাৎগামী বায়ু অথবা অকস্মাৎ শিথিলগতি অগ্রগামী বায়ুপ্রবাহও উহার অন্যতম কারণ।

কোন ব্যোমনাবিক অপেক্ষাকৃত নিস্তরঙ্গ বায়ুস্তরে ব্যোম-যন্ত্র পরিচালন করিবার কালে, যদি পশ্চাৎবাহী বাতাসের বেগ বর্দ্ধিত হইয়া যন্ত্রের বেগের সমান হইয়া পড়ে এবং এত অল্প সময়ে বায়ুর ঐ বেগ বর্দ্ধিত হয় যে ব্যোম নাবিক স্বীয় যন্ত্রের বেগ বর্দ্ধিত করিবার অবকাশই না পান, অথবা যদি যন্ত্রের বর্দ্ধিত বেগের তুলনায় বায়ুর বেগ অধিক হয়, তাহা হইলে ব্যোমযন্ত্র একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। ঊর্দ্ধে উঠিবার, নিম্নে অবতরণ করিবার, সমান্তরালভাবে গমন করিবার সমস্ত কৌশল বিফল হয়; এবং ব্যোমযন্ত্রটি কর্ত্তিতসূত্র ঘুড়ির ন্যায় যে কোন মুহূর্ত্তে ভূতলে আছড়াইয়া পড়িতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে আরোহীর ভাগ্যক্রমে যদি এরোপ্ল্যানখানি সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্য হইবার পূর্ব্বেই বায়ুর অবস্থা পরিবর্ত্তিত হয়, তবেই রক্ষা; নতুবা পতন অনিবার্য্য।

পশ্চাদ্‌বাহী বায়ু ব্যতীত অগ্রগামী শিথিলগতি বায়ুপ্রবাহও এরোপ্লানে দুর্ঘটনা ঘটাইবার অন্যতম মারাত্মক কারণ। এ ক্ষেত্রে যদিও পূর্ব্ববর্ণিত অবস্থার ন্যায় পশ্চাৎ অনুসরণকারী বায়ুর বেগ বর্দ্ধিত হয় না, তথাপি সম্মুখবাহী বায়ুপ্রবাহের বেগ হ্রাস হওয়ায়, ফল একই রূপ দাঁড়ায়। এরূপ অবস্থায়, যদি পশ্চাদ্বাহী বায়ুপ্রবাহের বেগের হ্রাস না হয়, অগবা ব্যোমযন্ত্রের আপেক্ষিক গতি বৃদ্ধি না ঘটে, তাহা হইলে ব্যোম-যন্ত্রখানি বিকল হইয়া পড়িবেই। আরোহী অবশ্য এরূপ ক্ষেত্রে ত্বরিত গতিতে অবতরণ

করিবার প্রয়াস পাইবেন, কিন্তু ভূপৃষ্ঠ সন্নিকট হইলে দুর্ঘটনা অপরিহার্য্য হইয়া উঠিবে।

অল্প দিন হইল অধ্যাপক হামফ্রেজ (Prof. William J. Humphreys) ওয়াশিংটন নগরে এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাহাতে তিনি দেখান যে, এরোপ্লানঘটিত দুর্ঘটনা নিম্নোক্ত প্রকারেও ঘটিতে পারে :—ভূতলাভিমুখে অবতরণকালে, ব্যোমনাবিক যদি নির্দ্দিষ্টবেগে প্রবাহমান অনুকূল বায়ুস্তর হইতে সহসা একই দিকে অথচ দ্রুততর বেগে প্রবাহিত স্তরমধ্যে প্রবেশ করেন, তাহা হইলে প্রতিঘাতের আকস্মিক পরিবর্ত্তন বশতঃ পতনের যথেষ্ট সম্ভাবনা দাঁড়ায়। অধ্যাপকের বিশ্বাস, গত তিন চারি বৎসরে এরোপ্লানঘটিত যে শতাধিক দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই পূর্ব্বোক্ত-কারণ সম্ভূত। বায়ুর অবস্থার ঐরূপ পরিবর্ত্তন পূর্ব্ব হইতে অনুমান করা যায় না এবং তজ্জন্য কোন উপায় অবলম্বন করাও অসম্ভব। এ ক্ষেত্রে যন্ত্রারোহীর উর্দ্ধে উঠিয়া গিয়া এরূপ স্থানে অবতরণ করা উচিত, যে স্থানের বায়ুরাশির প্রাকৃতিক অবস্থা যন্ত্রের সমতা রক্ষার উপযোগী।

অতএব দেখা যাইতেছে যে টসমন এবং হামফ্রেজ অধ্যাপকদ্বয় যে সকল কারণের উল্লেখ করিয়াছেন, এরোপ্লান ঘটিত অধিকাংশ দুর্ঘটনা সেই গুলির জন্য ঘটিয়াছে; অথবা এই কথাই বলা উচিত যে সেই কারণগুলির অনভিজ্ঞতা বশতঃই ঘটিয়াছে। ইহাতে এই বিশ্বাস ক্রমেই দৃঢ়ীভূত হইতেছে যে, বায়ুনৌবিদ্যা বিষয়ে শিক্ষাদান কালে বায়ুনভোবিদ্যা শিক্ষার্থীর পাঠ্যতালিকাভুক্ত করিতে হইবে; এবং ভূপৃষ্ঠের বন্ধুরতা বশতঃ বায়ু প্রবাহের যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরিবর্ত্তনশীলতা পরিদৃষ্ট হয়, তদ্‌বিষয়ক নিয়মাবলী বিশেষ করিয়া শিক্ষা দিতে হইবে।

যে শিক্ষার্থী অপেক্ষাকৃত নিস্তরঙ্গ বায়ুরাশিবেষ্টিত ক্ষেত্রের উপর ব্যোম যন্ত্র পরিচালন শিক্ষা করিয়াছেন, দেশদেশান্তরে শূন্যমার্গে পরিভ্রমণ করিবার পক্ষে তাঁহার শিক্ষা সম্পূর্ণ অনুপযোগী হইয়াছে, বলিতে হইবে। এরূপ প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে প্রথমে বিশেষ বিশেষ স্থানে সংগৃহীত বায়ু রাশির বিশেষ অবস্থা সম্বন্ধীয় তথ্যগুলি পরিজ্ঞাত হইতে হইবে; এবং প্রবীণ ব্যোমনাবিকগণের দেশ বিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতার সহিত বিশেষ রূপ পরিচয় লাভ করিতে হইবে। আমেরিকার যুক্ত রাজ্যসমূহের উপর দিয়া রজার (Rodger) সাহেবের অত্যাশ্চর্য্য ব্যোম ভ্রমণ এই জীবন মরণ সংক্রান্ত বিষয়ে বহু মূল্যবান্ তথ্য প্রদান করিবে, সন্দেহ নাই।

শ্রীদীনবন্ধু সেন।

বঙ্গভাষা বনাম বাবু-বাঙ্গলা ওরফে সাধুভাষা

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "ভারতী" পত্রিকাতে প্রকাশিত "বাল্যকথা", "ঢাকা-রিভিউ এবং সম্মিলনের" মতে অপ্রকাশিত থাকাই উচিত ছিল। লেখক যে কথা বলেছেন, এবং যে ধরণে বলেছেন, দুয়ের কোনটিই সম্পাদক মহাশয়ের মতে "সুযোগ্য লেখক এবং সুপ্রসিদ্ধ মাসিকের উপযোগী নয়।" শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা সম্বন্ধে ভালমন্দ কোন কথাই আমার মুখে শোভা পায় না। তার কারণ এস্থলে উল্লেখ করবার কোন প্রয়োজন নেই, কেননা তা শুধু "ঘরওয়ালা ধরণের" নয়, একেবারে পুরোপুরি ঘরাও কথা। আমি যদি প্রকাশ্যে সে লেখার নিন্দা করি, তাহলে আমার কুটুম্ব-সমাজ সে কার্য্যের প্রশংসা করবে না; অপর পক্ষে যদি প্রশংসা করি, তাহলে সাহিত্য-সমাজ নিশ্চয়ই তার নিন্দা করবে। তবে "ঢাকা রিভিউ-"এর সম্পাদক মহাশয় উক্ত লেখকের ভাষা সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করেছেন, সে সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে।

প্রথমতঃ সম্পাদক মহাশয় বলেছেন যে, সে "রচনার নমুনা যে প্রকারের ঘরওয়ালা ধরণের, ভাষাও তদ্রূপ"। ভাষা যদি বক্তব্য বিষয়ের অনুরূপ হয়, তাহলে অলঙ্কার শাস্ত্রের মতে যে সেটা দোষ বলে' গণ্য, এ জ্ঞান আমার পূর্ব্বে ছিল না। আত্মজীবনী লেখবার উদ্দেশ্যই হচ্ছে ঘরের কথা পরকে বলা। ঘরাও ভাষাই ঘরাও কথার বিশেষ উপযোগী বলে, সেই ভাবেই তাঁর "বাল্যকথা" বলেছেন। ৺কালি সিংহ যে "হুতোম প্যাঁচার নক্সার" ভাষায় তাঁর মহাভারত লেখেননি, এবং মহাভারতের ভাষায় যে "হুতোম প্যাঁচার নক্সা" লেখেননি, তা'তে তিনি কাণ্ডজ্ঞানহীনতার পরিচয় দেননি। সে যাই হোক্, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পক্ষ হয়ে কোনরূপ ওকালতি করা আমার অভিপ্রায় নয়, কারণ এ বিষয়ে বাঙ্গলার সাহিত্য-আদালতে তাঁর কোনরূপ জবাবদিহি করবার দরকারই নেই। আমি এবং "ঢাকা রিভিউ"-এর সম্পাদক যে কালে, পূর্ব্ববঙ্গের নয় কিন্তু পূর্ব্বজন্মের ভাষায় বাক্যালাপ করতুম, সেই দূর অতীত কালেই, ঠাকুর মহাশয় "সুযোগ্য লেখক" বলে' বাঙ্গলাদেশে খ্যাতি এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন।

যে ধরণের লেখা "ঢাকা রিভিউ"-এর নিতান্ত অপছন্দ, সেই ধরণের লেখারই আমি পক্ষপাতী। আমাদের বাঙ্গালী জাতির একটা বদনাম আছে, যে আমাদের কাজে ও কথায় মিল নেই। এ অপবাদ কতদূর সত্য তা আমি বলতে পারিনে। তবে এ কথা নিশ্চিত যে আমাদের কথায় ও লেখায় যত অধিক অমিল হয়, তত আমরা সেটি অহঙ্কারের এবং গৌরবের বিষয় বলে' মনে করি। বাঙ্গালী লেখকদের কৃপায়, বাঙ্গলা ভাষায় চক্ষুকর্ণের বিবাদ ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। সেই বিবাদ ভঞ্জন করবার চেষ্টাটা আমি উচিত কার্য্য বলে মনে করি। সেই কারণেই, এদেশের বিদ্যা-

উদ্ধার করবার জন্য আমরা সাহিত্যকে সেই মুক্তপথ অবলম্বন করতে বলি, যে পথের দিকে আমাদের সিদ্ধাঙ্গনারা উৎসুক নেত্রে চেয়ে আছেন। "ঢাকা রিভিউ"-এর সমালোচনা অবলম্বন করে আমার নিজের মত সমর্থন করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

অভিযোগ

সম্পাদক মহাশয়ের কথা হচ্ছে এই—

"মুদ্রিত সাহিত্যে আমরা "করতুম" "শোনাচ্ছিলুম" "ডাকতুম" "মেশবার" ("খেনু" "গেনু"ইবা বাদ যায় কেন?) প্রভৃতি প্রাদেশিক শব্দ ব্যবহারের পক্ষপাতী নহি। অন্য ভাষাভাষী বাঙ্গালীর অপরিজ্ঞাত ভাষা প্রয়োগে সাহিত্যিক্ সঙ্কীর্ণতা প্রকাশ পায় বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।"

উপরোক্ত পদটি যদি সাধুভাষার নমুনা হয়, এবং ঐরূপ লেখাতে যদি "সাহিত্যিক" উদারতা প্রকাশ পায়, তাহলে লেখায় সাধুতা এবং উদারতা আমরা যে কেন বর্জ্জন করতে চাই, তা ভাষাজ্ঞ এবং রসজ্ঞ পাঠকেরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারবেন। এরূপ ভাষা সাধুও নয়, শুদ্ধও নয়, শুধু যা-খুসি-তা ভাষা। কোন লেখক-বিশেষের লেখা নিয়ে, তার দোষ দেখিয়ে দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার বিশ্বাস ওরূপ করাতে সাহিত্যের কোনও লাভ নেই। মশা মেরে ম্যালেরিয়া দূর করবার চেষ্টা বৃথা, কারণ সে কাজের আর অন্ত নেই। সাহিত্য-ক্ষেত্রে কতকটা আলো এবং হাওয়া এনে দেওয়াই সে স্থানকে স্বাস্থ্যকর করবার প্রকৃষ্ট উপায়। তা সত্ত্বেও, "ঢাকা রিভিউ" হতে সংগৃহীত উপরোক্ত পদটি, অনায়াসলব্ধ বাক্য নিয়ে অযত্নসুলভ রচনার এমন খাঁটি নমুনা, যে তার রচনা-পদ্ধতির দোষ বাঙ্গালী পাঠকদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার লোভ আমি সম্বরণ করতে পারছিনে। শুনতে পাই, কোন একটি ভদ্রলোক তিন অক্ষরের একটি বাক্য বানান করতে চারটি ভুল করেছিলেন। "ঔষধ" এই বাক্যটি তাঁর হাতে "অউসদ" এই রূপ ধারণ করেছিল। সম্পাদক মহাশয়ও একটি পদ রচনায় অন্ততঃ পাঁচ ছ'টি ভুল করেছেন।

১। সাহিত্যের পূর্ব্বে "মুদ্রিত" এই বিশেষণটি জুড়ে দেবার সার্থকতা কি? অমুদ্রিত সাহিত্য জিনিষটি কি? ওর অর্থ কি সেই লেখা যা এখন হস্তাক্ষরেই আবদ্ধ হয়ে' আছে, এবং ছাপা হয়নি? তাই যদি হয়, তাহলে সম্পাদক মহাশয়ের বক্তব্য কি এই যে, ছাপা হবার পূর্ব্বে লেখায় যে ভাষা চলে, ছাপা হবার পরে আর তা চলে না? আমাদের ধারণা, মুদ্রিত লেখামাত্রই এক সময়ে অমুদ্রিত অবস্থায় থাকে, এবং মুদ্রাযন্ত্রের ভিতর দিয়ে তা রূপান্তরিত হয়ে' আসে না। বরং কোনরূপ রূপান্তরিত হলেই আমরা আপত্তি করে' থাকি, এবং যে ব্যক্তির সাহায্যে তা হয়, তাকে আমরা মুদ্রাকরের সয়তান বলে' অভিহিত করি। এইরূপ বিশেষণের প্রয়োগ শুধু অযথা নয়, একেবারেই অনর্থক।

২। "ডাকতুম" "করতুম", প্রভৃতির "তুম" এই অন্তভাগ প্রাদেশিক শব্দ নয়, কিন্তু বিভক্তি। এস্থলে "শব্দ" এই বিশেষ্যটি ভুল অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ সম্পাদক মহাশয় বোধ হয় একথা বলতে চান না যে, "ডাকা" "করা" "শোনা" প্রভৃতি ক্রিয়া

শব্দের অর্থ কলিকাতা প্রদেশের লোক ছাড়া আর কেউ জানেন না। একথা নির্ভয়ে বলা চলে যে "ডাকা" "শোনা" "করা" প্রভৃতি শব্দ, "অন্য ভাষাভাষী" বাঙ্গালীর নিকট অপরিজ্ঞাত হলেও, বঙ্গ "ভাষাভাষী" বাঙ্গালী মাত্রেরই নিকট বিশেষ সুপরিচিত। সম্পাদক মহাশয়ের আপত্তি যখন ঐ বিভক্তি সম্বন্ধে, তখন "শব্দের" পরিবর্ত্তে "বিভক্তি" এই শব্দটিই ব্যবহার করা উচিত ছিল।

৩। "সাহিত্যিক্" এই বিশেষণটি বাঙ্গলা কিম্বা সংস্কৃত কোন ভাষাতেই পূর্ব্বে ছিল না, এবং আমার বিশ্বাস উক্ত দুই ভাষার কোনটির ব্যাকরণ অনুসারে "সাহিত্য" এই বিশেষ্য শব্দটি "সাহিত্যিক্" রূপ বিশেষণে পরিণত হতে পারেনা। বাঙ্গলার নব্য 'সাহিত্যিক্'দের বিশ্বাস, যে বিশেষ্যের উপর অত্যাচার করলেই তা বিশেষণ হয়ে ওঠে। এইরূপ বিশেষণের সৃষ্টি আমার মতে অদ্ভুত সৃষ্টি। এই পদ্ধতিতে সাহিত্য রচিত হয় না, Literature শুধু literatural হয়ে ওঠে।

৪। "ভাষাভাষী" এই সমাসটি এতই অপূর্ব্ব, যে ওকথা শুনে হাসাহাসি করা ছাড়া আর কিছু করা চলে না।

৫। "আমরা" শব্দটি পদের পূর্ব্বভাগে না থেকে, শেষ ভাগে আসা উচিত ছিল। তা নাহলে পদের অন্বয় ঠিক হয় না। "করতুম"এর পূর্ব্বে নয়, "ব্যবহার" এবং "পক্ষপাতী" এই দুই শব্দের মধ্যে এর যথার্থ স্থান।

অযথা এবং অনর্থক বিশেষণের প্রয়োগ, ভুল অর্থে বিশেষ্যের প্রয়োগ, অদ্ভুত বিশেষণ পদ্ধতি প্রভৃতি বর্জ্জনীয় দোষ, আজকালকার মুদ্রিত সাহিত্যের পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে দেখা যায়। সাধুভাষার আবরণে সে সকল দোষ, শুধু অন্যমনস্ক পাঠকদের নয়, অন্যমনস্ক লেখকদেরও চোখে পড়ে না।

"মুদ্রিত" সাহিত্য বলে কোন জিনিষ না থাকলেও, মুদ্রিত ভাষা বলে যে একটা নতুন ভাষার সৃষ্টি হয়েছে, তা অস্বীকার করবার যো নেই। লেখার ভাষা শুধু মুখের ভাষার প্রতিনিধি মাত্র। অনিত্য শব্দকে নিত্য করবার ইচ্ছে থেকেই অক্ষরের সৃষ্টি। অক্ষর সৃষ্টির পূর্ব্বযুগে, মানুষের মনে করে' রাখবার মত বাক্যরাশি কণ্ঠস্থ করতে করতেই প্রাণ যেত। যে অক্ষর আমরা প্রথমে হাতে লিখি, তাই পরে ছাপান হয়। সুতরাং ছাপার অক্ষরে উঠলেই যে কোন কথার মর্য্যাদা বাড়ে তা নয়। কিন্তু দেখতে পাই অনেকের বিশ্বাস তার উল্টো। আজকাল ছাপার অক্ষরে যা' বেরোয় তাই সাহিত্য বলে' গণ্য হয়। এবং সেই একই কারণে মুদ্রিত ভাষা সাধুভাষা বলে' সম্মান লাভ করে। গ্রামোফোনের উদরস্থ হয়ে' সঙ্গীতের মাহাত্ম্য শুধু এদেশেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আসলে সে ভাষার ঠিক নাম হচ্ছে বাবু-বাঙ্গলা। যে গুণে ইংলিশ বাবু-ইংলিশ হয়ে উঠে, সেই গুণেই বঙ্গভাষা বাবু-বাঙ্গলা হয়ে উঠেছে। সে ভাষা আলাপের ভাষা নয়, শুধু প্রলাপের ভাষা। লেখার যা' সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান গুণ—প্রসাদগুণ—সে গুণে বাবু-বাঙ্গলা একেবারেই বঞ্চিত। বিত্তের মত ভাষাও কেবলমাত্র পুঁথিগত হয়ে উঠলে তার ঊর্দ্ধগতি

না সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। আসলে এই মুদ্রিত ভাষায় মৃত্যুর প্রায় সকল লক্ষণই স্পষ্ট। শুধু আমাদের মাতৃভাষার নাড়িজ্ঞান লুপ্ত হয়েছে বলে' আমরা নব্য বঙ্গ-সাহিত্যে প্রাণ আছে কি নেই তার ঠাওর করে' উঠতে পারিনে। মুখের ভাষা যে জীবন্ত ভাষা, এ বিষয়ে দু'মত নেই। একমাত্র সেই ভাষা অবলম্বন করেই আমরা সাহিত্যকে সজীব করে তুল্‌তে পার্‌ব। যেমন একটি প্রদীপ থেকে অপর একটি প্রদীপ ধরাতে হলে পরস্পরের স্পর্শ ব্যতিরেকে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না, তেমনি লেখার ভাষাতেও প্রাণ সঞ্চার কর্‌তে হলে মুখের ভাষার সম্পর্ক ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। আমি সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারের বিরোধী নই, শুধু ন্যূন অর্থে, অধিক অর্থে, কিম্বা অনর্থে বাক্যপ্রয়োগের বিরোধী। আয়ুর্ব্বেদ মতে ওরূপ বাক্যপ্রয়োগ একটা রোগবিশেষ, এবং চরক সংহিতায় ও রোগের নাম "বাক্য দোষ"। পাছে কেউ মনে করেন যে আমি এই কথাটা নিয়ে একটু বাড়াবাড়ি করছি, সেই কারণে, একশত বৎসর পূর্ব্বে "অভিনব যুবক সাহেব জাতের শিক্ষার্থে"—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার যে উপদেশ লিপিবদ্ধ করে গেছেন, সেটি এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।—

"শাস্ত্রে বাক্যকে গো শব্দে যে কহিয়াছেন তাহার কারণ এই ঃ—ভাষা যদি সম্যকরূপে প্রয়োগ করা যায়, তবে স্বয়ং কামদুঘা ধেনু হন, যদি দুষ্টরূপে প্রয়োগ করা যায়, তবে সেই দুষ্টভাষা স্বনিষ্ঠ গোত্ব ধর্ম্মকে স্বপ্রয়োগ কর্ত্তাকে অর্পণ করিয়া, স্ববক্তাকে গোরূপে পণ্ডিতের নিকটে বিখ্যাত করেন। আর বাক্য কহা বড় কঠিন, সকল হইতে কহা যায় না; কেন না, কেহ বাক্যেতে হাতি পায়, কেহ বাক্যেতে হাতির পায়। অতএব বাক্যেতে অত্যল্প দোষও কোন প্রকারে উপেক্ষনীয় নহে, কেন না, যদ্যপি অতিবড় সুন্দরও শরীর হয়, তথাপি যৎকিঞ্চিৎ এক শ্বিত্র-রোগ-দোষেতে নিন্দনীয় হয়।" —(প্রবোধ চন্দ্রিকা)

বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের মতে "বাক্য কহা বড় কঠিন"। কহার চাইতে লেখা যে অনেক বেশি কঠিন, এ সত্য বোধহয় "অভিনব যুবক" বঙ্গলেখক ছাড়া আর কেউ অস্বীকার করবেন না। Art এবং artlessness-এর মধ্যে আশমান জমিন্ ব্যবধান আছে, লিখিত এবং কথিত ভাষার মধ্যেও সেই ব্যবধান থাকা আবশ্যক। কিন্তু সে পার্থক্য ভাষাগত নয়, style গত। লিখিত ভাষার কথাগুলি শুদ্ধ, সুনির্ব্বাচিত, এবং সুবিন্যস্ত হওয়া চাই—এবং রচনা সংক্ষিপ্ত ও সংহত হওয়া চাই। লেখায় কথা ওল্টানো চলে না, বদলানো চলে না, পুনরুক্তি চলে না, এবং এলেমেলো ভাবে সাজানো চলে না। "ঢাকা রিভিউ"-এর সম্পাদক মহাশয়ের মতে যে ভাষা প্রশস্ত, সে ভাষায় মুখের ভাষার যা যা দোষ সে সব পূর্ণমাত্রায় দেখা দেয়, কেবলমাত্র আলাপের ভাষার যে সকল গুণ আছে—অর্থাৎ সরলতা, গতি ও প্রাণ—সেই গুণগুলিই তাতে নেই। কোন দরিদ্র লোকের যদি কোন ধনী লোকের সহিত দূর সম্পর্কও থাকে, তাহলে প্রায়ই দেখ্‌তে পাওয়া যায় যে, সে গরিব বেচারা সেই দূর সম্পর্ককে অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তাতে পরিণত কর্‌তে চেষ্টা করে। কিন্তু সে চেষ্টার ফল কিরূপ হয়ে থাকে তা'ত সকলেরি নিকট প্রত্যক্ষ।

আমরা পাঁচজনে মিলে আমাদের মাতৃভাষার বংশমর্য্যাদা বাড়াবার জন্যই সংস্কৃত ভাষার আশ্রয় গ্রহণ কর্‌তে উৎসুক হয়েছি। তার ফলে শুধু আমাদের ভাষার স্বীয় মর্য্যাদা রক্ষা হচ্ছে না। সাধুভাষার লেখকদের তাই দেখ্‌তে পাওয়া যায় যে পদে পদে বিপদ ঘটে থাকে। আমার বিশ্বাস যে, আমরা যদি সংস্কৃতভাষার দ্বারস্থ না হয়ে ঘরের ভাষার উপরই নির্ভর করি, তাহলে আমাদের লেখার চাল স্বচ্ছন্দ হবে, এবং আমাদের ঘরের লোকের সঙ্গে মনোভাবের আদান প্রদানটাও সহজ হয়ে আস্‌বে। যদি আমাদের বক্তব্য কথা কিছু থাকে, তাহলে নিজের ভাষাতে তা যত স্পষ্ট করে বলা যায়, কোন কৃত্রিম ভাষাতে তত স্পষ্ট করে বলা যায় না।

বাঙ্গলা ভাষার বিশেষত্ব

কেবলমাত্র পড়ে-পাওয়া-চোদ্দ-আনা-গোছ সংস্কৃত শব্দ বর্জ্জন করলেই যে আমাদের মোক্ষলাভ হবে তা নয়। আমরা লেখায় স্বদেশীভাষাকে যেরূপ বয়কট করে আস্‌ছি, সেই বয়কটও আমাদের ছাড়্‌তে হবে। বহুসংখ্যক বাঙ্গলা শব্দকে ইতর বলে সাহিত্য হতে "বহিষ্করণ"-এর কোনই বৈধ কারণ নেই। মৌখিক ভাষার মধ্যেই সাধু এবং ইতর, উভয় প্রকারেরই বাক্য আছে। যে বাক্য ইতর বলে আমরা মুখে আনতে সঙ্কুচিত হই, তা আমরা কলমের মুখ দিয়েও বার করতে পারিনে। কিন্তু যে সকল কথা আমরা ভদ্রসমাজে নিত্য ব্যবহার করি, যা কোন হিসেবেই ইতর বলে গণ্য নয়, সেই সকল বাক্যকে সাহিত্য থেকে বহির্ভূত করে রাখায় ক্ষতি শুধু সাহিত্যের। কেন যে বাক্য-বিশেষ ইতর শ্রেণীভুক্ত হয়, সে আলোচনার এ প্রবন্ধে স্থান নেই। তবে একথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে, যে ভদ্র এবং ইতরের প্রভেদ আমাদের সমাজে এবং সাহিত্যে যেরূপ প্রচলিত, পৃথিবীর অন্য কোনও সভ্যদেশে সেরূপ নয়। আমরা সমাজের যেমন অধিকাংশ লোককে শূদ্র করে' রেখে দিয়েছি, ভাষারাজ্যেও আমরা সাধুতার দোহাই দিয়ে তারই অনুরূপ জাতিভেদ সৃষ্টি কর্‌বার চেষ্টা করছি, এবং অসংখ্য নির্দ্দোষী বাঙ্গলা কথাকে শূদ্রশ্রেণীভুক্ত করে,' তাদের সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে এক পংক্তিতে বস্‌তে দিতে আপত্তি করছি। সমাজে এবং সাহিত্যে আমরা একই সঙ্কীর্ণ মনোভাবের পরিচয় দেই। বাঙ্গলা কথা সাহিত্যে অস্পৃশ্য করে রাখাটা শুধু লেখাতে বাম্‌নাই করা। আজকাল দেখ্‌তে পাই অনেকেরই চৈতন্য হয়েছে যে, আমাদেরই মত রক্তমাংসে গঠিত মানুষকে সমাজে পতিত করে রাখবার একমাত্র ফল, সমাজকে দুর্ব্বল এবং প্রাণহীন করা। আশা করি শীঘ্রই আমাদের সাহিত্য-ব্রাহ্মণদের এ জ্ঞান জন্মাবে, যে অসংখ্য প্রাণবন্ত বাঙ্গলা শব্দকে পতিত করে রাখার দরুণ, আমাদের সাহিত্য দিন দিন শক্তিহীন এবং প্রাণহীন হয়ে পড়ছে। একালের ম্রিয়মাণ লেখার সঙ্গে তুলনা করে দেখলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, "আলালের ঘরের দুলাল" এবং "হুতোম প্যাঁচার নক্সার" ভাষাতে কত অধিক ওজঃ-ধাতু আছে। আমরা যে বাঙ্গলা শব্দমাত্রকেই জাতে তুলে

নি.ত চাচ্ছি, তাতে আমাদের "সাহিত্যিক্ সঙ্কীর্ণতা" প্রকাশ পায় না, যদি কিছু প্রকাশ পায় ত উদারতা।

আর একটি কথা। অন্যান্য জীবের মত ভাষারও একটা আকৃতি ও একটা গঠন আছে। বৈজ্ঞানিকদের মতে, জীবে জীবে প্রভেদ ঐ গঠনের পার্থক্যেরই উপর নির্ভর করে, আকৃতির উপর নয়। পাখা থাকা সত্বেও তেলাপোকা যে পোকা, কিন্তু পাখী নয়, এ জ্ঞান আমাদের দেশের নিরক্ষর লোকেরও আছে। এমন কি, কবিরাও পতত্রকে পতঙ্গের প্রতিবাক্য হিসেবে ব্যবহার করেন না। অন্যান্য জীবের মত ভাষার বিশেষত্বও তার গঠন আশ্রয় করে থাকে, কিন্তু তার দেহাকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। ভাষার দেহের পরিচয় অভিধানে, এবং তার গঠনের পরিচয় ব্যাকরণে। সুতরাং বাঙ্গলায় এবং সংস্কৃতে আকৃতিগত মিল থাকলেও, জাতিগত কোনরূপ মিল নেই। প্রথমটি হচ্ছে analytic, দ্বিতীয়টি inflectional ভাষা। সুতরাং বাঙ্গলাকে সংস্কৃতের অনুরূপ করে' গড়ে' তুল্‌তে চেষ্টা করে' আমরা যে বঙ্গভাষার জাতি নষ্ট কবি শুধু তাই নয়, তার প্রাণবধ কর্‌বার উপক্রম করি। এই কথাটি সপ্রমাণ কর্‌তে হলে এবিষয়ে একটি বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখ্‌তে হয়, সুতরাং এস্থলে আমি শুধু কথাটার উল্লেখ মাত্র করে' ক্ষান্ত হলুম।

বিজ্ঞান ছেড়ে দিয়ে সহজ জ্ঞানেতেই জানা যায়, উক্ত দুই ভাষার চালের পার্থক্য ঢের। সংস্কৃতের হ.চ্ছে "করিরাজ বিনিন্দিত মন্দগতি", কিন্তু বাঙ্গলা, গুণী লেখকের হাতে পড়্‌লে, দুল্‌কি, কদম, ছার্‌তক, সব চালেই চলে। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যৌবনকালে লিখিত এবং সদ্যপ্রকাশিত "ছিন্নপত্র" পড়্‌লে সকলেই দেখ্‌তে পাবেন, যে সাহস করে' একবার রাশ আলগা দিতে পার্‌লে, নিপুণ এবং শক্তিমান লেখকের হাতে বাঙ্গলা গদ্য কি বিচিত্র ভঙ্গীতে ও কি বিদ্যুৎবেগে চল্‌তে পারে। আমরা "সাহিত্যিক্" ভাবে কথা কইনে বলে, আমাদের মুখের কথায় বাঙ্গলা ভাষার সেই সহজ ভঙ্গীটি রক্ষিত হয়। কিন্তু লিখ্‌তে বসলেই আমরা তার এমন একটা কৃত্রিম গড়ন দেবার চেষ্টা পাই, যাতে তার চলৎশক্তি রহিত হয়ে আসে। ভাষার এই আড়ষ্ট ভাবটাই সাধুতার একটা লক্ষণ বলে' পরিচিত। তাই বাঙ্গলা সাহিত্যে সাধারণ লেখকের গদ্য গদাই-লস্করি ভাবে চলে; এবং কুলেখকদের হাতের লেখা একটা জড়পদার্থের স্তূপমাত্র হয়ে থাকে। এই জড়তার বন্ধন থেকে মুক্ত হবার একমাত্র উপায় হচ্ছে, লেখাতেও মৌখিক ভাষার সহজ ভঙ্গীটি রক্ষা করা। কিন্তু যেই আমরা সে কাজ করি অমনি আমাদের বিরুদ্ধে সাধুভাষার কলের জল ঘোলা করে দেবার, এবং বাঙ্গলা সাহিত্যের বাড়াভাতে "প্রাদেশিক শব্দের" ছাই ঢেলে দেবার, অভিযোগ উপস্থিত হয়।

ভাষামাত্রেরই, তার আকৃতি ও গঠনের মত, একটা বিশিষ্ট প্রকৃতিও আছে, এবং প্রকৃতিস্থ থাকার উপরই তার শক্তি এবং সৌন্দর্য্য নির্ভর করে। বঙ্গভাষার সেই প্রকৃতির বিশেষ জ্ঞানের অভাববশতঃই আমরা সে ভাষাকে সংস্কৃত কর্‌তে গিয়ে

বিকৃত করে ফেলি। তা ছাড়া প্রতি ভাষারই একটি স্বতন্ত্র সুর আছে। এমন অনেক সংস্কৃত শব্দ আছে যা বাঙ্গলার সুরে মেলে না—এবং শোনবামাত্র কানে খট্ করে' লাগে। যার সুরজ্ঞান নেই, তাকে কোনরূপ তর্কবিতর্ক দ্বারা সে জ্ঞান দেওয়া যায় না। "সাহিত্যিক" এই শব্দটি ব্যাকরণ-সিদ্ধ হলেও যে বাঙ্গালীর কানে নিতান্ত বেসুরো লাগে—এ কথা যার ভাষার জ্ঞান আছে তাকে বোঝানো অনাবশ্যক, আর যার নেই তাকে বোঝানো অসম্ভব।

এই বিকৃত এবং অশ্রাব্য "সাহিত্যিক ভাষার" বন্ধন থেকে সাহিত্যকে মুক্ত করবার প্রস্তাব করলেই যে সকলে মার-মুখো হয়ে ওঠেন, তার একমাত্র কারণ এই যে, উক্ত ভাষা ইংরাজিশিক্ষিত বাঙ্গালীর স্বাভাবিক ঢিলেমি, মানসিক আলস্য, এবং পল্লব-গ্রাহিতার অনুকূল। মুক্তির নাম শোনবামাত্রই, আমাদের অভ্যস্ত মনোভাবসকল বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। রাজা রামমোহন রায়ের মতে, সাধুসমাজের লোকেরা যে ভাষা "কহেন এবং শুনেন" সেই ভাষাই সাধুভাষা। কিন্তু আজকালকার মতে, যে ভাষা সাধু সমাজের লোকেরা কহেনও না শুনেনও না, কিন্তু লিখেন এবং পড়েন, সেই ভাষা সাধুভাষা। সুতরাং ভাল হোক্ মন্দ হোক্, যে ভাষায় লেখাপড়া করা লোকের অভ্যাস হয়ে গেছে, সেই অভ্যাসবশতঃই সেই ভাষায় লেখাপড়া করা লোকের পক্ষে অতি সহজ। কিন্তু যা করা সোজা তাই যে করা উচিত, এরূপ আমার বিশ্বাস নয়। বাবু-বাঙ্গলা পরিত্যাগ করে' বাঙ্গলা ভাষায় লিখ্‌তে পরামর্শ দিয়ে, আমি পরিশ্রম-কাতর লেখকদের অভ্যস্ত আরামের ব্যাঘাত কর্‌তে উদ্যত হয়েছি, সুতরাং এ কার্য্যের জন্য আমি যে তাঁদের বিরাগভাজন হব তা বেশ জানি। "নব্য সাহিত্যিক"দের বোল্‌তার চাকে আমি যে ঢিল মার্‌তে সাহস করেছি তার কারণ, আমি জানি তাদের আর যাই থাক্ হুল নেই। বড় জোর আমাকে শুধু লেখকদের ভন্‌ভনানি সহ্য কর্‌তে হবে।

সে যাই হোক্ "ঢাকা রিভিউ"য়ের সম্পাদক যে আপত্তি উত্থাপন করেছেন, তার একটা বিচার হওয়া আবশ্যক। আমি ভাষা-পুরাতত্ত্ববিদ্ নই, তবুও আমার মাতৃভাষার সঙ্গে যেটুকু পরিচয় আছে, তার থেকেই আমার এইটুকু জ্ঞান জন্মেছে যে, মুখের কথা লেখায় স্থান পেলে, সাহিত্যের ভাষা প্রাদেশিক কিম্বা গ্রাম্য হয়ে' উঠবে না। বাঙ্গলা ভাষার কাঠাম বজায় না রাখ্‌তে পার্‌লে আমাদের লেখার যে উন্নতি হবে না, এ কথা নিশ্চিত। কিন্তু সেই কাঠাম বজায় রাখ্‌তে গেলে, ভাষারাজ্যে বঙ্গভঙ্গ হবার কোন সম্ভাবনা আছে কি না, সে বিষয়ে একটু আলোচনা দরকার। আমি তর্কটা উত্থাপন করে দিচ্ছি, তার সিদ্ধান্তের ভার, যাঁরা বঙ্গভাষার অস্থিবিদ্যায় পারদর্শী, তাঁদের হস্তে ন্যস্ত থাক্‌ল।

ভাষায় প্রাদেশিকতা

প্রাদেশিক ভাষা—অর্থাৎ dialect—এই নাম শুনলেই আমাদের ভীত হবার কোনও কারণ নেই। সম্ভবতঃ এক সংস্কৃত ব্যতীত, গ্রীক ল্যাটিন প্রভৃতি মৃত ভাষাসকল এক সময়ে লোকের মুখের ভাষা ছিল।

এবং সেই সেই ভাষার সাহিত্য সেই যুগের লেখকেরা "যচ্ছ্রুতং তল্লিখিতং" এই উপায়েই গড়ে তুলেছেন। গ্রীক সাহিত্য ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মতে জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য। কিন্তু এ অপূর্ব্ব সাহিত্য কোনরূপ সাধুভাষায় লেখা হয় নি, dialect-এই লেখা হয়েছে। গ্রীক সাহিত্য একটি নয়, তিনটি dialect-এ লেখা। এইটেই প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে মুখের ভাষায় বড় সাহিত্য গড়া চলে। আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যও মৌখিক ভাষার অনুসারেই লেখা হয়ে থাকে, "মুদ্রিত সাহিত্যের" ভাষায় লেখা হয় না। পৃথিবীতে এমন কোন দেশ নেই যেখানকার উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিমের লোকেরা ঠিক সমভাবেই কথা বলে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইতালি প্রভৃতি দেশেও dialect-এর প্রভেদ যথেষ্ট আছে। অথচ ইংরাজি সাহিত্যের ভাষা, ইংরাজ জাতির মুখের ভাষারই অনুরূপ। এর থেকেই বোঝা যায় যে, পাঁচটি dialect-এর মধ্যে কেবল একটিমাত্র সাহিত্যের সিংহাসন অধিকার করে। এবং তার কারণ হচ্ছে সেই dialect-এর সহজ শ্রেষ্ঠত্ব। ইতালির ভাষায় এর প্রমাণ অতি স্পষ্ট। ইতালির সাহিত্যের ভাষার দুটি নাম আছে। 'এক lingua purgata অর্থাৎ শুদ্ধ ভাষা, আর এক lingua Toscana অর্থাৎ টস্কানি প্রদেশের ভাষা। টস্কানির কথিত ভাষাই সমগ্র ইতালির অধিবাসীরা সাধুভাষা বলে গ্রাহ্য করে' নিয়েছে। আমাদের দেশে প্রচলিত নানারূপ বুলির মধ্যেও যে, একটি বিশেষ প্রদেশের ভাষা সাহিত্যের ভাষা হবে তাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি ? ফলে হয়েছেও তাই।

চণ্ডিদাস থেকে আরম্ভ করে ভারতচন্দ্র পর্য্যন্ত লেখকেরা প্রায় একই ভাষায় লিখে গেছেন। অথচ সেকালের লেখকেরা একটি সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা করে, পাঁচজনের ভোট নিয়ে, সে ভাষা রচনা করেন নি ; কোন স্কুলপাঠ্য গ্রন্থাবলী থেকেও তাঁরা সাধুভাষা শিক্ষা করেন নি—বাঙ্গলা বই পড়ে' বই লেখেন নি। তাঁরা যে ভাষাতে বাক্যালাপ কর্‌তেন, সেই ভাষাতেই বই লিখ্‌তেন, এবং তাঁদের কলমের সাহায্যেই আমাদের সাহিত্যের ভাষা আপ্‌নাআপ্‌নি গড়ে উঠেছে!

আমরা উত্তর বঙ্গের লোক, যে প্রাদেশিক ভাষাকে দক্ষিণদেশী ভাষা বলে থাকি, বঙ্গভাষার সেই dialect-ই সাহিত্যের স্থান অধিকার করেছে। বাঙ্গলা দেশের মানচিত্রে দক্ষিণ দেশের নির্ভুল চৌহদ্দি নির্ণয় করে দেওয়া আমার সাধ্য নয়। তবে মোটামুটি এই পর্য্যন্ত বলা যেতে পারে যে, নদিয়া শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানে, ভাগিরথীর উভয় কূলে, এবং বর্ত্তমান বর্দ্ধমান ও বীরভূম জেলার পূর্ব্ব ও দক্ষিণাংশে যে dialect প্রচলিত ছিল, তাই কতক পরিমাণে সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে সাধুভাষার রূপ ধারণ করেছে। এর একমাত্র কারণ, বাঙ্গলা দেশের অপরাপর dialect অপেক্ষা উক্ত dialect-এর সহজ শ্রেষ্ঠত্ব।

উচ্চারণের কথা

Dialect-এর পরস্পরের মধ্যে ভেদ প্রধানতঃ উচ্চারণ নিয়েই। যে dialect-এ শব্দের উচ্চারণ পরিষ্কাররূপে হয়, সে dialect প্রথমতঃ ঐ এক গুণেই অপর সকল dialect-এর

অপেক্ষা পূর্ণাঙ্গ, এবং সেই কারণেই শ্রেষ্ঠ। ঢাকাই কথা এবং খাস-কল্‌কাত্তাই কথা—অর্থাৎ সুতানুটির গ্রাম্য ভাষা—দুয়েরি উচ্চারণ অনেকটা বিকৃত; সুতরাং ঢাকাই কিম্বা খাস-কলকাত্তাই কথা পূর্ব্বেও সাহিত্যে নিজেদের আধিপত্য স্থাপন করতে পারেনি এবং ভবিষ্যতেও পার্‌বে না। পূর্ব্ববঙ্গের মুখের কথা প্রায়ই বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ হীন, আবার শ্রীহট্ট অঞ্চলের ভাষা প্রথম ও তৃতীয় বর্ণ হীন। যাদের মুখে "ঘোড়া" ও "গোরা" একাকার হয়ে যায়, তাদের চেয়ে যাদের মুখ হতে ঐ দুই শব্দ নিজ আকারেই বার হয়, তাদের ভাষা যে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হবে, এ আর কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। 'রড়যোর-ভেদ', চন্দ্রবিন্দু বর্জ্জন, 'স' স্থানে 'হ'য়ের ব্যবহার, প্রভৃতি উচ্চারণের দোষে পূর্ব্ববঙ্গের ভাষা পূর্ণ। স্বরবর্ণের ব্যবহারও উক্ত প্রদেশে একটু উল্টোপাল্টা রকমের হয়ে থাকে। যাঁরা 'করে'র পরিবর্ত্তে 'করিয়া' লেখবার পক্ষপাতী,তাঁরা মুখে 'কইর‍্যা' বলেন। সুতরাং তাঁদের মুখের কথার অনুসারে যে লেখা চলেনা তা অস্বীকার করবার যো নাই। অপরপক্ষে খাস কলকাত্তাই বুলিও ভদ্রসমাজে প্রতিপত্তি লাভ করতে পারেনি এবং পারবে না। ও ভাষার কতকটা ঠোঁটকাটা ভাব আছে। ট্যাকা, ক্যাঁঠাল, ক্যাঙালী, নুচি, আঁব, বে, দোর, সকালা, বিকালা, পিচাশ (পিশাচ অর্থে), প্রভৃতি বিকৃত উচ্চারিত শব্দও সাহিত্যে প্রমোশন পাবার উপযুক্ত নয়। পূর্ব্ববঙ্গের লোকের মুখে স্বরবর্ণ ছড়িয়ে যায়, কল্‌কাতার লোকের মুখে স্বরবর্ণ জড়িয়ে যায়। এমন কোনই প্রাদেশিক ভাষা নেই যাতে অন্ততঃ কতকগুলি কথাতেও কিছু না কিছু উচ্চারণের দোষ নেই। কম বেশি নিয়েই আসল কথা। Tuscan dialect সাধু ইতালীয় ভাষা বলে' গ্রাহ্য হয়েছে, কিন্তু Florenceএ অদ্যাবধি 'ক'র স্থলে 'হ' উচ্চারিত হয়, 'seconda' 'sehonda' আকারে দেখা দেয়। কিন্তু বহুগুণ সন্নিপাতে একটি আধটি দোষ উপেক্ষিত হয়ে থাকে। সকল দোষগুণ বিচার করে' মোটের উপর দক্ষিণদেশী ভাষাই উচ্চারণ হিসাবে যে বঙ্গদেশে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ dialect, এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই।

প্রসিদ্ধ এবং অপ্রসিদ্ধার্থ বাক্য

দ্বিতীয় কথা এই যে, প্রতি dialect-এই এমন গুটিকতক কথা আছে, যা' অন্য প্রদেশের লোকদের নিকট অপরিচিত। যে dialect-এ এই শ্রেণীর কথা কম, এবং বাঙ্গালী মাত্রেরই নিকট পরিচিত শব্দের ভাগ বেশি, সেই dialectই লিখিত ভাষার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। আমার বিশ্বাস দক্ষিণদেশী ভাষায় ঐরূপ সর্ব্বজনবিদিত কথা গুলিই সাধারণতঃ মুখে মুখে প্রচলিত। উত্তর বঙ্গের ভাষার তুলনায় যে দক্ষিণবঙ্গের ভাষা বেশি প্রসিদ্ধার্থক, এ বিষয়ে আমি নিজে সাক্ষ্য দিতে পারি। উদাহরণ স্বরূপ আমি দুইচারটি শব্দের উল্লেখ করতে চাই। উত্তর বঙ্গে, অন্ততঃ রাজসাহী এবং পাবনা অঞ্চলে, আমরা সকলেই 'পৈতা, 'চুপকরা', 'সকাল', 'সথ্', 'কুল', 'পেয়ারা', 'তরকারি', প্রভৃতি শব্দ নিত্য ব্যবহার করিনে, কিন্তু তার অর্থ বুঝি। অপরপক্ষে 'নগুণ', 'নককরা', 'বিয়ান'

'হাউস', 'বোর', 'আস-সব্রি', 'আনাজ' প্রভৃতি আমাদের চল্‌তি কথাগুলির অর্থ দক্ষিণদেশবাসীদের নিকট একেবারেই দুর্ব্বোধ্য। এই কারণেও দক্ষিণদেশের মুখের কথা লিখিত ভাষার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। খাস কল্‌কাত্তাই ভাষাতেও অপরের নিকট দুর্ব্বোধ্য অনেক কথা আছে, এবং তা ছাড়া মুখে মুখে অনেক ইতর কথারও প্রচলন আছে, যা' লেখা চলে না। ইতর কথার উদাহরণ দেওয়াটা সুরুচিসঙ্গত নয় বলে' আমি খাস কল্‌কাত্তাই ভাষার ইতরতার বিশেষ পরিচয় এখানে দিতে পারলুম না। কল্‌কাতার লোকের আটহাত আটপৌরে ধূতির মত তাদের আটপৌরে ভাষাও বি-কচ্ছ, এবং সেই কারণেই তার সাহায্যে ভদ্রতা রক্ষা হয় না। স্ত্রীর প্রতি 'ম'কারাদি প্রয়োগ করা, যাদের জঙ্গল কেটে কলকাতায় বাস সেই সকল ভদ্রলোকেরই মুখে সাজে, বাঙ্গালী ভদ্রলোকের মুখে সাজে না। এই কারণেই বাঙ্গালে ভাষা কিম্বা কলকাত্তাই ভাষা, এ উভয়ের কোনটিই অবিকল লেখার ভাষা হতে পারে না। আমি যে প্রাদেশিক ভাষাকে দক্ষিণদেশী ভাষা বলি, সেই ভাষাই সম্পূর্ণরূপে সাহিত্যের পক্ষে উপযোগী।

বিভক্তির কথা

আমি পূর্ব্বে বলেছি যে ঐ দক্ষিণদেশী ভাষাই তার আকার এবং বিভক্তি নিয়ে এখন সাধুভাষা বলে' পরিচিত। অথচ আমি তার বন্ধন থেকে সাহিত্যকে কতকটা পরিমাণে মুক্ত করে' এ যুগের মৌখিক ভাষার অনুরূপ করে' নিয়ে আসবার পক্ষপাতী। এবং আমার মতে, খাস কলকাত্তাই নয়, কিন্তু কলিকাতার ভদ্রসমাজের মুখের ভাষা অনুসরণ করেই আমাদের চলা কর্ত্তব্য।

জীবনের ধর্ম্মই হচ্ছে পরিবর্ত্তন। জীবন্ত ভাষা চিরকাল এক রূপ ধারণ করে থাকেনা, কালের সঙ্গে সঙ্গেই তার রূপান্তর হয়। Chaucer-এর ভাষায় আজকাল কোন ইংরাজ লেখক কবিতা লেখেন না Shakespeare-এর ভাষাতেও লেখেন না। কালক্রমে মুখে মুখে ভাষার যে পরিবর্ত্তন ঘটেছে তাই গ্রাহ্য করে' নিয়ে তাঁরা সাহিত্য রচনা করেন। আমাদেরও তাই করা উচিত। ভাষার গঠনের বদলের জন্য বহু যুগ আবশ্যক, শব্দের আকৃতি ও রূপ নিত্যই বদ্‌লে আস্‌ছে। ভাষা একবার লিপিবদ্ধ হলে, অক্ষরে শব্দের রূপ অনেকটা ধরে রাখে, তার পরিবর্ত্তনের পথে বাধা দেয়, কিন্তু একেবারে বন্ধ করতে পারে না। আর, যে সকল শব্দ লেখায় ব্যবহৃত হয় না, তাদের চেহারা মুখে মুখে বদলে যায়। আজকাল আমরা নিত্য যে ভাষা ব্যবহার করি, তা আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের ভাষা হতে অনেক পৃথক। প্রথমতঃ সংস্কৃত ভাষার অনেক শব্দ আজকাল বাঙ্গলায় ব্যবহৃত হয় যা' পূর্ব্বে হ'ত না; দ্বিতীয়তঃ অনেক শব্দ যা' পূর্ব্বে ব্যবহার হত তা' এখন ব্যবহার হয় না; তৃতীয়তঃ, যে কথার পূর্ব্বে চলন ছিল তার আকার এবং বিভক্তি অনেকটা নতুন রূপ ধারণ করেছে। আমার মতে সাহিত্যের ভাষাকে সজীব করতে হলে তাকে এখনকার ভদ্রসমাজের প্রচলিত ভাষার অনুরূপ করা চাই। তার জন্য অনেক কথা যা পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল

কিন্তু সংস্কৃতের অত্যাচারে যা আজকাল আমাদের সাহিত্যের বহির্ভূত হয়ে পড়েছে, তা' আবার লেখায় ফিরিয়ে আনতে হবে। তারপর মুখে মুখে প্রচলিত শব্দের আকারের এবং বিভক্তির যে পরিবর্ত্তন ঘটেছে, সেটা মেনে নিয়ে, তাদের বর্ত্তমান আকারে ব্যবহার করাই শ্রেয়। "আসিতেছি" শব্দের এই রূপটী সাধু, এবং "আস্‌ছি" এই রূপটি অসাধু বলে গণ্য। শেষোক্ত আকারে এই কথাটি ব্যবহার করতে গেলেই, আমাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনা হয়, যে আমরা বঙ্গ সাহিত্যের মহাভারত অশুদ্ধ করে দিলুন। একটু মনোযোগ করে' দেখলেই দেখা যায় যে "আসছি" "আসিতেছি"-র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আকার। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে যে, "আসিতেছি" র ব্যবহার আছে তার কারণ, তখন লোকের মুখে কথাটি ঐ আকারেই ব্যবহৃত হ'ত। আজও উত্তর এবং পূর্ব্ববঙ্গে মুখে মুখে ঐ আকারই প্রচলিত। সমগ্র বাঙ্গলাদেশ ভাষা সম্বন্ধে পূর্ব্বে যেখানে ছিল, উত্তর এবং পূর্ব্ববঙ্গ আজও সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু দক্ষিণ বঙ্গ অনেক এগিয়ে এসেছে। "আসিতেছি"তে "আসিতে" এবং "আছি" এই দুটি ক্রিয়া গা-ঘেঁষাঘেষি করে রয়েছে, দুয়ে মিলে একটি ক্রিয়া হয়ে ওঠেনি। কিন্তু শব্দটির "আসছি" এই আকারে "আছি" এই ক্রিয়াটী লুপ্ত হয়ে "ছি" এই বিভক্তিতে পরিণত হয়েছে। সুতরাং "আসছি"র অপেক্ষা "আসিতেছি" কোন হিসেবেই অধিক শুদ্ধ নয়, শুধু বেশি সেকেলে, বেশি ভারী, এবং বেশি অচল আকার। সুতরাং "আসিতেছি" পরিহার করে "আসছি" ব্যবহার করতে আমরা যে পিছ-পাও হইনে, তার কারণ এ কার্য্য করাতে ভাষাজগতে পিছনো হয় না, বরং সর্ব্বতোভাবে এগোনোই হয়।

ঐ একই কারণে "করিয়া" যে "করে"' অপেক্ষা বেশি শুদ্ধ, তা নয়, শুধু বেশি প্রাচীন। ও দুয়ের একটিও সংস্কৃত ব্যাকরণের বিভক্তি নয়, খাঁটি বাঙ্গলা বিভক্তি। প্রভেদ এই মাত্র, যে পূর্ব্বে মুখের ভাষায় "করিয়া"র চলন ছিল, এখন "করে"র চলন হয়েছে। চণ্ডিদাস তাঁর সানুনাসিক বীরভূমি সুরে মুখে বল্‌তেন "করিঞা", তাই লিখেছেনও "করিঞা"। কৃত্তিবাস ভারতচন্দ্র প্রভৃতি নদিয়া জেলার গ্রন্থকারেরা মুখে বলতেন "কর্য্যা" "ধর্য্যা", তাই তাঁরা লেখাতেও, যে ভাবে উচ্চারণ কর্‌তেন সেই উচ্চারণ অবিকল বজায় রাখবার জন্য, "ধরিয়া" "করিয়া" আকারে লিখতেন। সম্ভবতঃ, কৃত্তিবাসের সময়ে অক্ষরে আকার যুক্ত য-ফলা লেখবার সঙ্কেত উদ্ভাবিত হয়নি বলেই, সে যুগের লেখকেরা ঐ যুক্ত স্বরবর্ণের সন্ধি বিচ্ছেদ করে লিখেছেন। ভারতচন্দ্রের সময়ে সে সঙ্কেত উদ্ভাবিত হয়েছিল, তাই তিনি যদিচ পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদের লিখন-প্রণালী সাধারণতঃ অনুসরণ করেছিলেন, তবুও নমুনা স্বরূপ কতকগুলি কবিতাতে "বাঁধ্যা" "ছাঁন্দ্যা" আকারেরও ব্যবহার করেছেন। অদ্যাবধি উত্তর বঙ্গে আমরা দক্ষিণ বঙ্গের সেই পূর্ব্ব প্রচলিত উচ্চারণ ভঙ্গিই মুখে মুখে রক্ষা করে আস্‌ছি। "করে"র তুলনায় "কর্য্যা" শুধু শ্রুতিকটু নয়, দৃষ্টিকটুও বটে, কেননা ঐ আকারে শব্দটি মুখ থেকে বার কর্‌তে হলে, মুখের কিঞ্চিৎ অধিক ব্যাদান করা দরকার। অথচ লিপিবদ্ধ বাক্যের এমনি

একটি মোহিনী শক্তি আছে, যে মুখরোচক না হলেও তা আমাদের শিরোধার্য্য হয়ে উঠে। "ইতাম" "তেম" এবং "তুম" এর মধ্যেও ঐ একই রকমের প্রভেদ আছে। তবে "উম" রূপ বিভক্তিটি অদ্যাবধি কেবলমাত্র কলিকাতা সহরে আবদ্ধ, সুতরাং সমগ্র বাঙ্গলা দেশে যে সেটি গ্রাহ্য হবে সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে, বিশেষতঃ যখন "হালুম" "হলুম" প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে অপর এক জীবের ভাষার সাদৃশ্য আছে।

এই এক "উম" বাদ দিয়ে কলিকাতার বাদবাকি উচ্চারণের ভঙ্গিটি যে কথিত বঙ্গ ভাষার উপর আধিপত্য লাভ করবে, তার আর সন্দেহ নেই। আসলে হচ্ছেও তাই। আজকাল উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম সকল প্রদেশরই বাঙ্গালী ভদ্রলোকের মুখের ভাষা প্রায় একই রকম হয়ে এসেছে। প্রভেদ যা আছে সে শুধু টান্ টুনের। লিখিত ভাষার রূপ যেমন কথিত ভাষার অনুকরণ করে, তেমনি শিক্ষিত লোকদের মুখের ভাষাও লিখিত ভাষার অনুসরণ করে। এই কারণেই দক্ষিণ-দেশী ভাষা—যা কালক্রমে সাহিত্যের ভাষা হয়ে উঠেছে—নিজ প্রভাবে শিক্ষিত সমাজেরও মুখের ভাষার ঐক্য সাধন করছে। আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে, আমার বিশ্বাস ভবিষ্যতে কলিকাতার মৌখিক ভাষাই সাহিত্যের ভাষা হয়ে উঠবে। তার কারণ কলিকাতা রাজ-ধানীতে বাঙ্গলাদেশের সকল প্রদেশের অসংখ্য শিক্ষিত ভদ্রলোক বাস করেন। ঐ একটি মাত্র সহরে সমগ্র বাঙ্গলা দেশ কেন্দ্রীভূত হয়েছে। এবং সকল প্রদেশের বাঙ্গালী জাতির প্রতিনিধিরা একত্রিত হয়ে পরস্পরের কথার আদানপ্রদানে একটি নব্য ভাষা গড়ে' তুলছেন যে ভাষা সর্ব্বাঙ্গীন বঙ্গভাষা। সুতানুটি গ্রামের গ্রাম্যভাষা এখন কলিকাতার অশিক্ষিত লোকদের মুখেই আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। আধুনিক কলিকাতার ভাষা বাঙ্গালী জাতির ভাষা, আর খাস্-কলকাত্তাই ভাষা শুধু সহরে Cockney ভাষা।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

শারীর-স্বাস্থ্য-বিধান

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

১০

পরিচ্ছদ।

পরিচ্ছদের প্রধান উদ্দেশ্য দেহকে শীতাতপ, বায়ুপ্রবাহ ও বৃষ্টি হইতে রক্ষা করা, শারীরিক সহজ উত্তাপের সমতারক্ষণ এবং লজ্জা নিবারণ। এতদ্ব্যতীত পরিচ্ছদ দ্বারা শরীরের শোভা বর্দ্ধিত হয় এবং স্থলবিশেষে আকস্মিক আঘাত নিবারিত হইতে পারে। কিন্তু ইহা সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে শরীরের শোভা-বর্দ্ধন পরিচ্ছদের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে - উহা গৌণ উদ্দেশ্য মাত্র। এই শেষোক্ত কথাটী স্মরণ রাখিলে আমরা অনেক অসুবিধা ও অর্থনাশের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইতে পারি।

সচরাচর আমরা তুলা, পাট, শণ, পশম ও

রেশম নির্ম্মিত বস্ত্রাদি পরিচ্ছদের জন্য ব্যবহার করিয়া থাকি। তুলা, পাট বা শণের সুতানির্ম্মিত বস্ত্রকে আমরা 'শীতল' কাপড় এবং পশম নির্ম্মিত বস্ত্রকে 'গরম' কাপড় বলিয়া থাকি। রেশমনির্ম্মিত বস্ত্র পশমী কাপড়ের ন্যায় তত গরম নহে, সুতার কাপড়ের ন্যায় শীতলও নহে।

যাহা হউক, কোন কাপড়ই আপনা হইতে শীতল বা গরম নহে। যে বস্ত্র শরীর হইতে তাপ পরিচালন করে না, তাহাকে আমরা 'গরম' কাপড় বলিয়া থাকি এবং যে বস্ত্র আমাদিগের শরীর হইতেও অল্পবিস্তর উত্তাপ বাহিরের দিকে পরিচালন, করিয়া দেয়, তাহাদিগকে ঠাণ্ডা বা সুতার কাপড় কহে। সুতার কাপড়ে হাত দিলেই উহা ঠাণ্ডা বোধ হয়, কিন্তু পশমী কাপড় স্পর্শ করিলে হাতে ঠাণ্ডা লাগে না। ইহার কারণ এই যে সুতার কাপড় তাপ-পরিচালক বলিয়া উহাতে হাত দিলেই হাত হইতে শারীরিক তাপ তৎক্ষণাৎ পরিচালিত হইয়া যায়, এইজন্য বস্ত্রখণ্ড শীতল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু পশমী কাপড় তাপ-অপরিচালক বলিয়া উহাতে হাত দিলে হাতের তাপ অপরিচালিত না হইয়া হাতেই থাকিয়া যায়, সুতরাং পশমী বস্ত্র স্পর্শে গরম বলিয়া অনুভূত হয়। গ্রীষ্মকালে সুতার কাপড় ব্যবহার করিলে শরীর শীতল থাকে কিন্তু শীতকালে এরূপ বস্ত্রের দ্বারা শীত নিবারিত হয় না এবং শরীরে ঠাণ্ডা লাগিবারও সম্ভাবনা। লংক্লথ, নয়নসুখ, মল্‌মল্ কট্‌ন্ ড্রিল্, জিন্, লিনেন্ প্রভৃতি বস্ত্র এই শ্রেণীর অন্তর্ভূত। শরীর শীতল রাখে বলিয়াই এই সকল বস্ত্র সকলেই গ্রীষ্মকালে ব্যবহার করিয়া থাকে।

লংক্লথ্ প্রভৃতি সুতানির্ম্মিত বস্ত্রের দোষ এই যে উহা ভালরূপে ঘর্ম্মশোষণ করিতে সমর্থ হয় না। গ্রীষ্মকালে যখন এই সকল বস্ত্র ঘামে ভিজিয়া যায়, তখন ঘাম শুকাইবার সময় দেহ হইতে তাপ অপহৃত হইয়া সমধিক শৈত্য উৎপাদন করে, সুতরাং ভিজা জামা অধিকক্ষণ গায়ে লাগিয়া থাকিলে ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি হইবার সম্ভাবনা। পশমী বস্ত্র উৎকৃষ্ট ঘর্ম্মশোষক বলিয়া উহা গায়ের উপরে থাকিলে ঘাম শুকাইবার সময় ঠাণ্ডা লাগিবার কোন সম্ভাবনা থাকে না; এইজন্য গায়ের উপরেই (Next to skin) পাতলা ফ্লানেলের জামা পরিধান করাই যুক্তিসিদ্ধ। কিন্তু এদেশে যেরূপ প্রচণ্ড গ্রীষ্ম, তাহাতে গ্রীষ্মকালে এরূপ বস্ত্রের ব্যবহার আরামদায়ক নহে এবং অনেকস্থলেই ইহার প্রয়োজন হয় না। সুতানির্ম্মিত বস্ত্র অপেক্ষা রেশমীবস্ত্র ঘর্ম্ম অধিক পরিমাণে শোষণ করিতে সমর্থ, এবং ইহা সুতার বস্ত্রের ন্যায় তাপ-পরিচালক নহে। পুনশ্চ রেশমী জামা ঠিক গায়ের উপর পরিলে উহা মসৃণ ও কোমল বলিয়া সবিশেষ আরামদায়ক হয়। কিন্তু রেশমী জামা ব্যবহার করা অনেকেরই সাধ্যাতীত। যাঁহারা সঙ্গতিপন্ন, গ্রীষ্মকালে তাঁহারা স্বচ্ছন্দে রেশমী গেঞ্জি ব্যবহার করিতে পারেন; ইহা দ্বারা ঘাম শুকাইবার সময় শরীরে ঠাণ্ডাও লাগিবে না অথচ উহার পরিধান অতিশয় তৃপ্তিকর বোধ হইবে। চেলি, তসর, গরদ, সাটিন প্রভৃতি বস্ত্র এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

সাধারণ লোকের পক্ষে আল্‌গা-বুনন তুলার বস্ত্র ঠিক গায়ের উপর গ্রীষ্মকালের জন্য ব্যবহারের উপযোগী। লংক্লথ্, কটন্ ড্রিল্ প্রভৃতির ন্যায় ঘন-বুনন তুলার বস্ত্র ঠিক গায়ের উপর না পরিয়া আল্‌গা-বুনন সূতার গেঞ্জি পরিধান করিয়া তাহার উপর ঐ সকল বস্ত্রের জামা ব্যবহার করা উচিত। আল্‌গা-বুনন সূতার গেঞ্জি দ্বারা ঘর্ম্ম শোষিত হয়, সুতরাং উপরকার জামা ভিজিয়া ঠাণ্ডা লাগিবার সম্ভাবনা থাকে না। আজকাল প্রায় সকলেই ভিতরে সূতার গেঞ্জি ব্যবহার করিয়া থাকেন ইহা দ্বারা কাপড় কম ময়লা হয় এবং ঘাম শুকাইবার সময় হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিবার সম্ভাবনা থাকে না। তবে গেঞ্জিটী যাহাতে সর্ব্বদা পরিষ্কার থাকে, তদ্বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ময়লা জামা গায়ের উপর পরিধান করিলে চর্ম্মের স্বাভাবিক ক্রিয়ার প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত হইয়া বিবিধ রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা।

সূতার কাপড় যত আল্‌গা-বুনন হইবে, উহা ততই অধিক ঘর্ম্ম শোষণ করিতে সমর্থ হইবে। এতদ্ব্যতীত আল্‌গা বুননের মধ্যে বায়ু আবদ্ধ থাকে বলিয়া এরূপ বস্ত্র দ্বারা ঘন-বুনন সূতার কাপড় অপেক্ষা শীত অধিক পরিমাণে নিবারিত হয়। বায়ু একটি তাপ-অপরিচালক পদার্থ; আল্‌গা-বুনন বস্ত্রের ছিদ্র মধ্যে যে বায়ু আবদ্ধ থাকে, তাহা শরীরের সহজতাপ বাহিরে নিষ্ক্রমণ হইতে দেয় না, সুতরাং শীতকালে আল্‌গা-বুনন সূতার বস্ত্র কতক পরিমাণে শীত নিবারণ করে। পশম তাপ-অপরিচালক বলিয়া উহা দ্বারা শীত নিবারিত হয়; এতদ্ব্যতীত পশমনির্ম্মিত বস্ত্রমাত্রেই আল্‌গা-বুনন হইয়া থাকে, সুতরাং তন্মধ্যস্থিত আবদ্ধ বায়ুও শীত নিবারণের সহায়তা করিয়া থাকে। এই কারণে শীতকালে একটী মোটা জিনের জামার স্থানে ২।৩টী পাতলা লংক্লথের জামা পরিলে শীত অধিক পরিমাণে নিবারিত হয়, কারণ উহাদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ তাপ-অপরিচালক বায়ু আবদ্ধ থাকে। তুলার জামা, বালাপোষ বা তোষকের তুলার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ বায়ু আবদ্ধ থাকে বলিয়া এরূপ বস্ত্র গরম কাপড়ের ন্যায় শীত নিবারণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

মেরিনো, আল্‌পাকা, সার্জ্জ্, বনাত, ফ্লানেল্, সাল, মলিদা, আলোয়ান লুই, ধোসা প্রভৃতি নানাবিধ পশুলোমজাত বস্ত্র আমরা শীত নিবারণের জন্য ব্যবহার করিয়া থাকি। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে পশম-নির্ম্মিত বস্ত্র মাত্রেই তাপ অপরিচালক; আমাদের শারীরিক উত্তাপ এই সকল বস্ত্র দ্বারা পরিচালিত হইয়া যায় না বলিয়া আমাদের শরীর সর্ব্বদা গরম থাকে, সুতরাং শীত নিবারণের জন্য আমরা এই শ্রেণীর বস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকি। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে ফ্লানেল্ প্রভৃতি পশমীবস্ত্র অধিক পরিমাণ ঘর্ম্ম শোষণ করিতে সমর্থ, সুতরাং ইহা ঠিক গায়ের উপর পরিলে ঘাম শুকাইবার সময়ে শরীরে ঠাণ্ডা লাগিবার সম্ভাবনা থাকে না। ব্যায়াম বা ক্রীড়ার সময় অত্যন্ত ঘর্ম্ম নিঃসরণ হইয়া থাকে; এরূপ স্থলে ফ্লানেলের জামা ঠিক গায়ের উপর ব্যবহার করাই যুক্তিসঙ্গত। ফ্লানেল্ শীতকালে দেহকে যেমন গরম রাখে

গ্রীষ্মকালে তেমনই ফ্লানেলের ব্যবহারে শরীর শীতল থাকে। তবে অনভ্যাসবশতঃ অনেকেরই পক্ষে গ্রীষ্মকালে ফ্লানেলের ব্যবহার সুখকর হয় না। অনেকের ফ্লানেলের জামা ঠিক গায়ের উপর পরিলে গা জ্বালা করে ও চুল্‌কায় এবং অনেক সময়ে গায়ে চুলকোনার ন্যায় ব্রণ বাহির হয়। ফ্লানেলের পরিবর্ত্তে ঠিক গায়ের উপর রেশমের বা আল্‌গা বুনন সুতার বস্ত্র ব্যবহার করা যাইতে পারে। ফ্লানেলের মধ্যে 'ল্যানোলিন্' (Lanoline) নামক বসাজাতীয় একপ্রকার পদার্থ অবস্থিতি করে; ইহা থাকে বলিয়াই ফ্লানেল এরূপ উৎকৃষ্ট গুণসম্পন্ন। কিন্তু কাচিবার দোষে এই পদার্থ ফ্লানেল্ হইতে নির্গত হইয়া যায়; তখন ফ্লানেল্ এক প্রকার অকেজো হইয়া পড়ে। ধোবারা যেরূপ ভাবে কাপড় কাচে, তাহাতে ফ্লানেল্ একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। ফ্লানেল্ ফুটন্ত জলে কাচা উচিত নহে। ফ্লানেল কাচিবার জন্য ঈষদুষ্ণ জল ও উৎকৃষ্ট সাবান ব্যবহার করাই উচিত। ভাঁটিতে ফ্লানেল্ বস্ত্র ফুটাইলে উহার মধ্যস্থিত সমস্ত লানোলিন্ বহির্গত হইয়া উহা একেবারে নষ্ট হইয়া যায়।

আজকাল 'ফ্লানেলেট্' (Flanellete) নামক এক প্রকার বস্ত্র বালক বালিকাদিগের পোষাকের নিমিত্ত বহুল পরিমাণে ব্যবহার হইয়া থাকে। ইহা বেশ নরম হইলেও ইহার মধ্যে পশম নাই, কেবল সুতা নির্ম্মিত। ইহার দোষ এই যে অগ্নি-সংযুক্ত হইলে ইহা অতি শীঘ্র জ্বলিয়া যায়; সেইজন্য ইহা বালক বালিকা-দিগের পোষাকের জন্য ব্যবহৃত হওয়া নিরাপদ নহে।

পশমী বস্ত্র মাত্রেরই দোষ এই যে কাচিলে উহা সঙ্কুচিত হইয়া যায় এবং উহাদিগের কোমলত্ব নষ্ট হয়। পুনশ্চ পশমনির্ম্মিত বস্ত্র সূতানির্ম্মিত বস্ত্রের ন্যায় দৃঢ় ও টেঁকসই হয় না। অনেক সময়ে পশমের সহিত অল্প পরিমাণ সুতা মিশ্রিত করিয়া গরম বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। শীত নিবারণের জন্য সাধারণের পক্ষে এরূপ বস্ত্রের ব্যবহার সবিশেষ উপযোগী। এরূপ বস্ত্র সহজে ছিঁড়ে না, কাচিলে বেশী ছোট হইয়া যায় না এবং আমাদের এদেশে যেরূপ শীত হয়, তাহা এরূপ বস্ত্র দ্বারা সহজেই নিবারিত হইয়া থাকে।

গ্রীষ্মকালে শ্বেতবর্ণের বস্ত্র ব্যবহার করা প্রশস্ত। সাদা রংএর কাপড় সূর্য্য বা অগ্নির উত্তাপ সামান্য পরিমাণে শোষণ করে মাত্র, অধিকাংশ উত্তাপ প্রতিফলিত হইয়া কাপড় হইতে নির্গত হইয়া যায়, এইজন্য সাদা রংএর কাপড় বেশী গরম হয় না। কৃষ্ণবর্ণের বস্ত্র মাত্রেই সূর্য্যতাপ বা অগ্নিতাপ অত্যন্ত অধিক পরিমাণে শোষণ করিতে সক্ষম; সুতরাং এই রংএর বস্ত্র শীঘ্র উত্তপ্ত হইয়া উঠে, সেইজন্য গ্রীষ্মকালে উহার ব্যবহার সুখকর হয় না। শীতকালে কৃষ্ণবর্ণের পরিচ্ছদ আরামদায়ক হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন রংএর কাপড় ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় তাপ শোষণ করিয়া থাকে। কৃষ্ণবর্ণের বস্ত্র সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে তাপ শোষণ করিতে সমর্থ। গাঢ় নীলবর্ণ বস্ত্র তাপ শোষণ সম্বন্ধে দ্বিতীয় স্থান, তৎপরে ফিকা নীল, তদপেক্ষা কম গাঢ় সবুজ, তৎপরে লাল, তাহার নীচে ফিকে সবুজ, তৎপরে গাঢ় পীত, অনন্তর ফিকা হরিদ্রা এবং সর্ব্বশেষে শাদা রংএর কাপড় সর্ব্বাপেক্ষা অল্প তাপ শোষণ করিয়া থাকে। এইজন্য

গ্রীষ্মকালে শাদা কাপড় ব্যবহার করিলে শরীর স্নিগ্ধ থাকে এবং এইজন্যই ভারতবর্ষের ন্যায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশে শাদা কাপড়ের ব্যবহার অধিক প্রচলিত। রাঙ্গা রংয়ের কাপড় ঠিক গায়ের উপরে থাকিলে সূর্য্যের রশ্মি-বিশেষ (Chemical rays) হইতে দেহকে রক্ষা করিয়া "শর্দ্দি গর্ম্মি" নিবারণ করে। এই মত কতদুর বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপিত, তাহা এপর্য্যন্ত নির্ণীত হয় নাই; কিন্তু এই মত অনুসরণ করিয়া কেহ কেহ গ্রীষ্মকালে এদেশে "সোলারো" (Solaro) নামক লাল কাপড়ের জামা ঠিক গায়ের উপর ব্যবহার করিয়া থাকেন।

কোনপ্রকার রঙিন্ বস্ত্র ঠিক গায়ের উপর ব্যবহার করা সঙ্গত নহে। সচরাচর যে সকল রংয়ে বস্ত্র রঞ্জিত করা হয়, তাহাদিগের অধিকাংশের সহিত খনিজ বিষাক্ত পদার্থ মিশ্রিত থাকে। অনেকস্থলে এরূপ বস্ত্র ব্যবহার করিয়া চর্ম্মের প্রদাহ এবং বিবিধ চর্ম্মরোগের আবির্ভাব হইয়াছে। আমরা বালকবালিকাদিগের পরিচ্ছদ প্রায়ই রঙ্গিন কাপড়ে প্রস্তুত করাইয়া থাকি। বাহিরের কাপড় রঙ্গিন্ হইলে কোন ক্ষতি হয় না, কিন্তু যে কাপড় ঠিক গায়ের উপর থাকিবে, তাহা রঙ্গিন্ হইলে অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা।

যে পোষাক গায়ে আঁটিয়া ধরে, তাহা কখনই ব্যবহার করা উচিত নহে। কি স্ত্রীলোক, কি পুরুষ, কাহারো পরিচ্ছদ গায়ে আঁটিয়া থাকা স্বাস্থ্য-রক্ষার অনুকূল নহে। পরিচ্ছদ যত আলগা ও হালকা হইবে, রক্তসঞ্চালন ও শারীরিক অন্যান্য ক্রিয়া ততই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে থাকিবে। ভারতবাসী কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক, সকলেই ঢিলা পোষাক ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহাতে শরীর আরামে থাকে, শরীরের কোন স্থানে অযথা চাপ পড়িয়া কোন শারীরিক যন্ত্র স্থানচ্যুত হয় না, এবং রক্ত-সঞ্চালন, শ্বাস-ক্রিয়া, অঙ্গচালনা প্রভৃতি স্বাভাবিক ক্রিয়াগুলি সহজে সম্পন্ন হইয়া থাকে। মেমেরা যেরূপ পোষাক পরিয়া থাকেন, তাহা স্বাস্থ্যরক্ষার অনুকূল নহে। বেশী আঁট স্কার্ট্ (Close-fitting skirts) গায়ে লেপা আস্তিন (Tight sleeves), ষ্টেস্ (Stays), গার্টার্ Gaiter) কোমরবন্ধ ও গলাবন্ধ (Waist-bands and neck-bands), আঁট দস্তানা (Gloves) ও কসা সরু জুতার ব্যবহার মেমেদের মধ্যে বিস্তৃত ভাবে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগের ব্যবহারে শরীর বিকৃত এবং দেহাভ্যন্তরস্থ যন্ত্রাদি স্থানচ্যুত হইয়া পড়ে এবং উহাদিগের স্বাভাবিক ক্রিয়ার ব্যাঘাত সাধিত হয়। কটিদেশ অপ্রশস্ত এবং দেহের উপরিভাগ উন্নত রাখিবার চেষ্টায় যে সকল পোষাকের তোড়জোড় ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা দ্বারা হৃৎপিণ্ড, ফুস্ফুস, যকৃৎ ও প্লীহা স্বস্থানচ্যুত হইয়া বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং তজ্জন্য তাহাদিগের স্বাভাবিক ক্রিয়ার বিশেষ প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত হয়। ইংরাজ এরূপ বুদ্ধিমান জাতি হইয়া কিরূপে এই অস্বাভাবিক স্বাস্থ্যনাশক প্রথার সমর্থন করেন, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। তবে সকল ইংরাজ এই কুপ্রথার পক্ষপাতী নহেন। কিন্তু

স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদগণ এবং চিকিৎসকেরা এবিষয়ের প্রতিবাদ করিলেও এপ্রথার সংস্কার এখনো বহুসময়সাপেক্ষ। আশা করি আমাদের দেশের যে সকল মহিলা বিলাতী পোষাকের পক্ষপাতী, এই কথাগুলি তাঁহাদের চিন্তার বিষয় হইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচুণীলাল বসু।

নব্য চীনের জাতীয় সঙ্গীত

স্বাধীনতা—ইহজীবনে মুকতি—
তুমি বিধাতার শ্রেষ্ঠ দান,
শান্তির সাথে মিলি' স্বাধীনতা!
জগতে জাগাও নূতন প্রাণ।
গম্ভীর তুমি দেবতার মত
দৈত্যের মত শকতিমান,
অযুত হস্তে সাধ' কল্যাণ
জ্ঞানের ধ্যানের অয়ি নিধান!

মর্ত্ত্য ভুবনে এস স্বাধীনতা
সূর্য্যের মত হও প্রকাশ,
হের নর-লোক হয়েছে নরক
তুমি কর তার তিমির-নাশ।
মহিমা তোমার ছেয়েছে আকাশ
কিরণে হাসিছে ও মধুহাস,
মেঘ-স্যন্দনে ঝঞ্ঝা-বাহনে
এস তুরন্ত,—ঘুচাও ত্রাস।

সুরূপা য়ুরোপা ভাগ্যবতী সে
কিছুরই অভাব নাহিক তার,
আমি শুধু, হায়, চাহি গো তোমায়
অয়ি স্বাধীনতা! প্রিয়া আমার!
তোমারি চিন্তা করে সারা চীন
জাগরণে কিবা স্বপনে আর,
তবু তুমি হায় এমনি চপল
ধরা নাহি দাও একটিবার।

মধু বহে বায় মধুর ধরায়
ফুলে ফুলে বাস—কানন ছায়,
জনে জনে আজ রাজ-অধিরাজ,
মোরা বিস্ময়ে নেহারি, হায়!
দুনিয়ায় ফেরে নূতন বাতাস
নব নব সুরে পাখীরা গায়,
শুধু সারা চীন হ'য়ে আছে হীন,—
প্রণত পিকিন্-রাজের পায়!

মহতী এসিয়া নহে তো মরুভূ,—
তবে কেন এই বিষাদ-গান?
এ নব যুগের নব সাধনায়
এসিয়া সে দিবে নূতন প্রাণ।
হের নব রাগে পৌরুষ জাগে
দিকে দিকে শোনো বাজে বিষাণ,
জেগেছে পুরুষ ভাঙিয়া গড়িতে
স্বর্গে মর্ত্ত্যে নব বিধান!

আমরা সবাই চক্র ঘোরাই
গড়িয়া তুলিতে বর্ত্তমান,
উন্নত যাহে হয় জনে জনে
ধ্রুব যাহে হয় দেশের মান।
'হিন্-য়ুন্' যোন্ সহায় মোদের,—
পিতৃ লোকের যিনি প্রধান,
অতীতের বীর! ধর গো শরীর,
স্বাধীনতা! সুধা করাও পান।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

বিমল দেবী *

(১)

পঞ্চাসর গুর্জরের গৌরবময়ী রাজধানী; ইহার অতুল ধনৈশ্বর্য্য ও শোভা সমৃদ্ধির কথা এখনও লোকে গাহিয়া থাকে,—"সমুদ্র কন্যা সরস্বতীর অধিষ্ঠান রাজধানী পঞ্চাসর"।

পঞ্চাসরের শেষ রাজা জয়শেখর অতুল পরাক্রমশালী ও নানা বিদ্যাবিশারদ বলিয়া প্রসিদ্ধ; তাহার সুশাসনে প্রজাগণ সুখী ও সন্তুষ্ট। জয়শেখরের ভগিনী বিমলদেবী রূপে গুণে সরস্বতী,—সংস্কৃত, কাব্যকলা, নৃত্যগীত ও অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শিনী এবং শান্ত-সুশীলা ও শৌর্য্যশালিনী বলিয়া প্রখ্যাতা।

মুলতানের রাজা ও রাণী পুত্রকন্যা সমভিব্যাহারে প্রভাস পুণ্যক্ষেত্র দর্শনে আগমন করেন। পুত্র সুরপাল অতুল শৌর্য্যশালী ও কন্যা রূপসুন্দরী অতুল রূপবতী। রাজা ও রাণী প্রভাস ক্ষেত্র সন্দর্শনের পর পঞ্চাসরের রাজার আতিথ্য স্বীকার করেন। জয়শেখর বিশেষ যত্ন ও আদর সহকারে আতিথ্যসৎকার সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। সুরপাল ও জয়শেখরের সহিত বন্ধুত্ব সংস্থাপিত হইল। এক দিন দুই দিন করিয়া জয়শেখর রাজারাণীদিগকে পঞ্চসরে এক মাস রাখিলেন। সুরপালের শৌর্য্যবীর্য্য দেখিয়া বিমলদেবী তাহার প্রতি অনুরাগিণী হইলেন! রূপসুন্দরীও জয়শেখরের গুণবত্তায় মোহিত হইলেন। মুলতানের রাজা ও রাণী দেশে ফিরিয়া গেলেন অতঃপর জয়শেখর

---

* 'রত্নমালিকা' নামক একখানি প্রাচীন ঐতিহাসিক কাব্য গ্রন্থ হইতে চিত্রটী অঙ্কিত। রত্নমালিকার কৃষ্ণকবি শোলাঙ্কী-রাজ ভীমভোলার সমসাময়িক। ভীম ভোলার রাজত্ব কাল ১১৯৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১২৪২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। কৃষ্ণকবি স্বীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—সমস্ত বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াও যে রত্নমালিকা গ্রন্থখানি পাঠ না করিবে তাহার সমস্ত বিদ্যা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে এবং একমাত্র রত্নমালিকা গ্রন্থ পাঠে তাহার সমুদয় জ্ঞান জন্মিবে দুগ্ধের যেমন সারভাগ নবনীত, কবি তদ্রূপ সমুদয় গ্রন্থ আহরণ করিয়া সত্য-রত্ন সকল এই কাব্যে লিপি বদ্ধ করিয়াছেন।

এই গ্রন্থোক্ত ১০৮টী রত্ন কাহিনীর কেবল মাত্র ৮টী রত্ন পাওয়া গিয়াছে। কাঠিবারের অন্তর্গত ওয়া দোয়ান নগরীতে এক ব্রাহ্মণ গৃহে ফরবস্‌সাহেব এই ছিন্ন গ্রন্থখানি প্রাপ্ত হন, প্রসিদ্ধ কবি দলপতরাম উক্ত গ্রন্থখানি সাধারণ্যে প্রকাশ করেন।

"দাস কো প্রণাম দীল ধার কৈ দয়ালু মাত,
দীজিয়ে হিমতবল-কল ব্রহ্ম-বালিকা;
শব্দ-রত্ন আকরতে সুকবি আগে অনেক,
প য়ে গ্রন্থ-রত্ন তো আধার দীল পালিকা
মৈ পুনী হনি সুবাত চাতক্ত রিবব্যাত মাত,
রত্ন যু আগে কবিকী পারকে প্রনালিকা;
তোকু অবলম্বিকে সুপুরুষ কোবিদ কাম,
নাম মেরা রছন রচীক্ত রত্নমালিকা।"

একজন ভাটকে নারিকেল ফল সহ মুলতানে পাঠাইলেন।

রাজা ও রাণী অতি আনন্দ সহকারে রূপসুন্দরীকে জয়শেখরের করে সমর্পণ করিলেন। এই বিবাহের পর ভগিনীসহ সুরপাল পঞ্চাসরে আসিলেন, ইহার কিছুকাল পরে সুরপাল জনকজননীর আজ্ঞা লইয়া বিমলদেবীর পাণিগ্রহণ করিলেন। সুরপাল মুলতানরাজার দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন, কাজেই পঞ্চাসরে রাজসেনাপতি রূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

(২)

মহারাষ্ট্র দেশে(১) কল্যাণকটক নামক নগরীতে ভুবড় বা ভুদেব নামে এক পরাক্রমী রাজা ৭৫২ বিক্রম সম্বতে রাজত্ব করিতেন। ভুবড়ের রাজধানী কল্যাণ কটক বিজিত জাতির ধন রত্ন, অশ্ব গজ রথ প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্য পূর্ণ ছিল। নগরীর গৃহগুলি বিবিধ বর্ণমিশ্রিত চারুচিত্রে চিত্রিত ছিল।" "তৎকালে সিংহল রাজধানী অপেক্ষা ইহা কোন অংশে ন্যূন ছিল না; রবি অর্দ্ধ বৎসর দক্ষিণায়নে সিংহলে ও উত্তরায়ণে কল্যাণ নগরীতে অবস্থান করিতেন।"

ভুবড় রাজা কেবল যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন এমন নহে,—বিদ্যাসমৃদ্ধি বিস্তারের জন্যও তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিতেন। তিনি ব্যাকরণ ও কাব্যকলার প্রতি সমধিক অনুরক্ত ছিলেন। "তিনি বিদ্বান লোকদিগকে এতদূর সম্মান করিতেন,—নদীর জল প্রবাহ যেমন স্বতঃই সাগরের দিকে প্রবাহিত হয়, বিদ্বান ব্যক্তিগণও তদ্রূপ ভুবড়ের রাজসভায় উপনীত হইতেন।

ভুবড়ের ১৬ জন সুদক্ষ সেনাপতি ছিল, তাহারা দিগ্বিজয়ের জন্য চতুর্দ্দিকে প্রেরিত হইত। যুদ্ধবিজয় শেষে তাহারা অতুল ধনরত্ন লইয়া কল্যাণকটকে আগত হইত।

অবশেষে সেনাপতিগণ কহিল,—এখন সমস্ত দেশই বিজিত হইয়াছে। সমস্ত রাজন্যবর্গ মহারাজা ভুবড়ের অধীনতা স্বীকার করিয়াছে।

একদিন রাজা ভুবড় রাজ সভাতলে বসিয়া আছেন, চতুর্দ্দিকে বিদ্বজ্জনমণ্ডলী, ও নিপুণ সেনাপতিগণ আসীন। কবিগণ স্বরচিত কবিতা দ্বারা পরস্পর উত্তর প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া রাজার চিত্ত বিনোদন করিতেছেন। কবিরাজ কামরাজ কবিগণের ভূষণ রূপে সেখানে বিরাজিত, সেই সময় একজন বিদেশী কবি রাজসভায় আগমন করিল। রাজা তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। বিদেশী কবি উত্তর করিল,—

"শঙ্কর কবি নামটি আমার
বিদিত ভুবনে মহা রাজন!"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনার পরিচয় কি ও কি জন্য কোথা হইতে আগমন?

শঙ্কর কবি গাহিল,—

"শ্যামল শষ্য নবীন শষ্প
জড়িত যাহার চারু চরণ
গন্ধে বরণে সকল ফুলের
গৌরব যেই করে হরণ
নির্ম্মল নদ নদীর সলিলে
মহিমা যাহার করে ঘোষণ

(১) রত্নমালিকা ও প্রবন্ধচিন্তামণি গ্রন্থে কল্যাণ কটক কান্যকুব্জ দেশে বলিয়া লিখিত আছে। বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণ মহারাষ্ট্রের কল্যাণ নগরীকে কল্যাণ কটক নির্দ্দেশ করেন।

গুর্জ্জর দেশ নামটি তাহার
সেথায় আমার বাস ভবন;
ধার্ম্মিক লোক সেথায় সবাই
তাঁহাদের দেহ চাঁপা বরণ,
'পঞ্চআসর' রাজধানী যার
গৌরব ময় চারুকেতন,
পর্ব্বত সম কিরীট তুলিয়া
শ্রী 'জয়শেখর' রাজরতন,
পণ্ডিত যত ভূষিল তাঁহারে
অর্পিয়া এই যশোভূষণ,
লাবণ্যময়ী রূপসুন্দরী
মহিষী মহলে যার আসন,
ইন্দ্রের মত সহোদর যার
নাম সুরপাল কুলভূষণ;
ইচ্ছা করিলে পারেন করিতে
নন্দন বন তিনি হরণ
স্বর্গে কি কাজ থাকিতে তাঁহার
গুজরাত সম দেশ এমন,
শিক্ষার শেষে দিগ্ বিজয়েতে
আগমন মম হেথা রাজন্।
কাব্য সমরে কবিরে তোমার
করিতেছি আমি আবাহন।"

রাজা ভুবড় গুর্জ্জরের এবম্বিধ প্রশংসা শুনিয়া লজ্জায় অধোবদন হইলেন। কামরাজ ও শঙ্কর কবি উভয়ের বাক-যুদ্ধ চলিতে লাগিল, অবশেষে শঙ্করের নিকট কামরাজ পরাজিত হইল।

শঙ্কর হাসিয়া বলিলেন,—

"রহিবে শিব বিজয়ী চির
কামেরে ভস্ম করিয়া,
সব অশিব রবে শিবের
চরণের তলে পড়িয়া।"

রাজা ভুবড় আপনার কণ্ঠের বহুমূল্য হার শঙ্কর কবিকে পুরস্কার দিয়া বিদায় দিলেন।

(৩)

সভা ভঙ্গ হইলে রাজা ভুবড় সমস্ত সেনাপতি বৃন্দকে নির্জ্জনে আহ্বান করিলেন এবং সমস্ত দেশ বিজিত হইয়াছে বলিয়া তাহারা যে রাজাকে মিথ্যা সংবাদ দিয়াছিল তজ্জন্য তাহাদিগকে যথেষ্ট তিরস্কার করিলেন, এবং অবিলম্বে সকলকে গুর্জ্জরবিজয়ের জন্য প্রস্তুত হইতে আদেশ প্রদান করিলেন, ইতি-পূর্ব্বে তাঁহার সেনাপতি মীর অর্ব্বুদাচলের নিকট সুরপাল কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিল, কাজেই মীর মুখ্য সেনাপতিরূপে বিশাল সৈন্য বাহিনী লইয়া যুদ্ধ যাত্রা করিলেন।

ইতিমধ্যে শঙ্কর পঞ্চাসরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া জয়শেখরকে সমুদয় কথা জানাইলেন। জয়শেখর আশুযুদ্ধ সম্ভাবনায় আনন্দিত হইয়া তদীয় সেনাপতিবর্গের মধ্যে স্বর্ণবলয় ও কর্ণাভরণ সকল বিতরণ করিতে লাগিলেন।

ভুবড় রাজার সৈন্যবাহিনী অগ্রসর হইতে লাগিল। অগণিত অশ্বারোহী ও গজারোহী চার হাজার যুদ্ধ রথ, চার হাজার ধনুর্ধারী সৈন্য ও অগণিত পদাতিক সৈন্যে বাহিনী পূর্ণ ছিল। কয়েকটি গ্রাম লুণ্ঠন করিয়া সেনাপতি মীর পঞ্চাসর হইতে ৬ মাইল দূরে আসিয়া শিবির সন্নিবেশিত করিল। এই সংবাদ শুনিয়া রাজা জয়শেখর ক্রোধপ্রজ্জলিত হইয়া উঠিলেন এবং নিরীহ পল্লীবাসিদের প্রতি অত্যাচার একান্ত ধর্ম্মবিগর্হিত বলিয়া তিরস্কার সহকারে মীরকে এক পত্র লিখিলেন। মীর প্রত্যুত্তরে জানাইল, রাজা জয়শেখর ভুবড় রাজার অধীনতা স্বীকার করিলেই মীর রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে।

এদিকে সুরপাল সীমান্ত প্রদেশ হইতে

প্রত্যাগমন পথে সেনাপতি মীরের আগমন সংবাদ শুনিয়া তাহাকে পঞ্চাসরের সন্নিকটে আসিয়া হঠাৎ আক্রমণ করিলেন। মীর সে আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে অসমর্থ হইয়া বাত্যাতাড়িত ধূলিকণার ন্যায় ছিন্নবিছিন্ন হইয়া সৈন্যদলসহ পলায়ন করিল। সুরপাল শত্রুর পশ্চাৎ ধাবিত না হইয়া পঞ্চাসর নগরীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। মীর পরাজিত হইয়া অত্যন্ত দীন বেশে ভূবড় রাজার নিকট যাইয়া উপস্থিত হইল। এবার রাজা ভূবড় স্বয়ং সমুদয় সৈন্য ও সেনাপতিবর্গ লইয়া যুদ্ধ যাত্রা করিলেন।

ভূবড় আসিয়া কয়েক দিন যুদ্ধের পর পঞ্চাসর নগরী অবরোধ করিলেন।' তথাপি সুরপালের অদ্ভুত কৌশলে নগরী আত্মরক্ষায় সমর্থ হইল। রাজা ভূবড় সুরপালকে বিচলিত করিবার নিমিত্ত পত্র লিখিলেন,—সুরপাল, যদি তুমি একটু সাহায্য কর তবে জয়শেখরকে পরাজিত করিয়া তোমার মস্তকে রাজ মুকুট পরাইয়া দিই। সুরপাল স্বীয় পত্নীর মনোগত অভিপ্রায় জানিবার জন্য স্ত্রীকে সে পত্রখানা প্রদর্শন করিয়া বলিলেন—এস, আমরা রাজারাণী হই। বিমলদেবী ক্রোধ প্রজ্জলিত হইয়া বলিলেন,—ছার রাজ্য! পাপের মুকুট আমি মাথায় পরিতে চাই না। আমি পতিব্রতা নারী কিন্তু পতি হইতেও যে পরমেশ্বর শ্রেষ্ঠ এ কথা আমি ভুলি নাই। সুরপাল পত্নীর মুখে এবম্বিধ কথা শুনিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—ধন্য তুমি! ধন্য তোমার পিতা মাতা। দেশের প্রতি ঘরে ঘরে তোমার মত ধার্ম্মিকা সাধ্বী স্ত্রী বিরাজ করুক। তোমার মত স্ত্রী পাইয়া আমিও ধন্য।

অতঃপর সুরপাল ভূবড়কে লিখিলেন,—তুমি পবিত্র ধর্ম্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া এতাদৃশ অধম পাপ বুদ্ধির শরণাপন্ন হইয়াছ জানিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলাম।

(৪)

জয়শেখর ও সুরপাল অসীম বিক্রমে নগরী রক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু ক্রমাগত বিপক্ষ সৈন্যদলের দৃঢ় চেষ্টায় নগরীর প্রাচীর স্থানে স্থানে ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল। কিছুদিন পরে প্রাচীরের এমন অবস্থা হইয়া উঠিল যে অল্প দিনের মধ্যে বিপক্ষ সৈন্য নগরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নগরী ধ্বংস করিয়া ফেলিবে। বহিস্থ খাদ্য দ্রব্যের সরবরাহও বন্ধ হইয়া যাওয়ায় বিশাল নগরী ক্ষুধার্ত্ত হইয়া উঠিল। জয়শেখর সমস্ত সৈন্য লইয়া বাহিরে যাইবার শেষ চেষ্টা করিয়া জয় পরাজয় নির্দ্ধারণ করিবেন স্থির করিলেন।

জয়শেখর সুরপালকে এ কথা জানাইয়া তাঁহার সম্মতি গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন,—যদি পরাজিত হই তবে অন্তঃপুরের মহিলারা লাঞ্ছিত হইবেন, বিশেষতঃ রূপসুন্দরী অন্তঃসত্বা তুমি রূপসুন্দরী ও বিমলদেবীকে লইয়া দূরে কোন নিরাপদ স্থানে রাখিয়া আইস। সেইদিন রাত্রিকালে সুরপাল রূপসুন্দরী ও বিমলদেবীকে লইয়া নগরীর বহির্গত হইলেন এবং সুদূরঅরণ্যে এক ভীলপল্লীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পরদিন প্রভাতে জয়শেখর সমস্ত সৈন্যবাহিনী হইয়া নগরীর দ্বার খুলিয়া রণাঙ্গণে ঝাঁপ দিলেন। প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম হইল। জয়শেখরের সৈন্য একে একে হত হইতে লাগিল, তথাপি অল্পসংখ্যক সৈন্য

লইয়া অতুল পরাক্রমে যুদ্ধ করিতে করিতে সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে গুজরাতের গৌরব রবি রাজা জয়শেখর ছিন্ন শির হইয়া রণক্ষেত্রে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। আর রাজা ভূবড় পঞ্চাসর নগরী অধিকার করিয়া সমুচ্চ দুর্গশিরে জয়পতাকা উড্ডীন করিয়া দিলেন।

(৫)

যে রাত্রে সুরপাল রূপসুন্দরী ও বিমলদেবীকে লইয়া নগরী পরিত্যাগ করেন, তৎপরদিবস যুবরাজ কর্ণ এ সংবাদ অবগত হইয়া অল্পসংখ্যক সৈন্যের সহিত সুরপালের অনুসরণ করিল। সুরপাল রূপসুন্দরী ও বিমলদেবীকে ভীলপল্লীতে রাখিয়া সত্বর অন্য পথে পঞ্চাসর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। অল্পকাল পরে বিমলদেবী ও রূপসুন্দরী সংবাদ পাইলেন, যুবরাজ কর্ণ তাহাদের পলায়নের সংবাদ অবগত হইয়া এদিকে আসিতেছে। বিমলদেবী একজন ভীলকে রূপসুন্দরীকে লইয়া অরণ্যের কোন নিভৃত স্থানে লুকাইয়া রাখিয়া আসিতে অনুমতি করিলেন।

রূপসুন্দরীকে লইয়া যাইবার অত্যল্পকাল পরেই যুবরাজ কর্ণ সৈন্য সমভিব্যাহারে সেইস্থানে উপস্থিত হইল এবং তথায় বিমলদেবীর মুখকান্তি দেখিয়া বিমোহিত হইল। কর্ণ বিমলদেবীকে বন্দিনী করিয়া নগরীতে লইয়া আসিল এবং তাঁহাকে সান্ত্বনা দানের জন্য বিবিধ চেষ্টা করিতে লাগিল। কর্ণ মনে করিল, কিছুদিন পরে বিমলদেবীর শোক প্রশমিত হইলে তিনি তাহাকে বিবাহ করিতে অস্বীকৃত হইবেন না, এবং এই উদ্দেশ্যে সুরপালের মিথ্যা মৃত্যু সংবাদ রটনা করিল।

এদিকে সুরপাল পঞ্চাসরের ধ্বংস অবস্থা দেখিয়া যেস্থানে বিমলদেবী ও রূপসুন্দরীকে রাখিয়া আসিয়াছিলেন, তথায় প্রত্যাগমন করিয়া সমস্ত বিপদের সংবাদ অবগত হইলেন, এবং অবিলম্বে কয়েকজন ভীল লইয়া সৌরাষ্ট্র অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কর্ণ তখন সৌরাষ্ট্রপ্রদেশে অবস্থান করিতেছিল।

বিমলদেবী সুরপালের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া চিতানলে প্রাণত্যাগ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। কর্ণ তাহাকে বিবিধ রূপে সান্ত্বনা করিতে প্রয়াসী হইলেন। সতীনারীর প্রতি এবম্বিধ ব্যবহারে কর্ণের সৈন্যমণ্ডলী কর্ণের প্রতি রুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। অগত্যা কর্ণ নগরীর বাহিরে চিতাসজ্জিত করিতে আদেশ দিল। এ সংবাদ অবগত হইয়া নগরীর ও তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থানসমূহের জনমণ্ডলী সতীর আত্মবিসর্জ্জন দেখিতে সম্মিলিত হইল।

বিমলদেবী চিতারোহণের জন্য প্রস্তুত হইলেন। দর্শকগণের অনেকেই কর্ণের সৈন্যমণ্ডলী। তাহারা বিমলদেবীর পাদদ্বয় ধারণ করিয়া তাহাদের কৃত কর্ম্মের নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিল। কর্ণও অধোবদনে বিমলদেবীর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিল। দাউ দাউ করিয়া চিতা জ্বলিয়া উঠিল, বিমলদেবী চিতা প্রদক্ষিণ করিয়া চিতা আরোহণ করিবেন এমন সময় জনমণ্ডলীর ভিতর হইতে সুরপাল বাহির হইয়া বিমলদেবীকে সবলে আকর্ষণ পূর্ব্বক জনমণ্ডলী পার হইয়া অরণ্যের দিকে ছুটিয়া গেলেন। অরণ্যের প্রান্ত দেশে আসিয়া সুরপাল বলিলেন,—বিমলদেবী ভয়

নাই, শীঘ্র অশ্বে আরোহণ কর, পশ্চাতে শত্রুসৈন্য আসিতেছে।

সেখানে দুটী অশ্ব সুসজ্জিত ছিল, অবিলম্বে দুইজন অশ্বে আরোহণ করিয়া তীরবেগে অশ্ব ছুটাইয়া দিলেন। এবম্বিধ ঘটনায় জনমণ্ডলী ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিল। অবশেষে কর্ণের সৈন্যমণ্ডলী সজ্জিত হইয়া বহুদূর পর্য্যন্ত সুরপালের অনুসরণ করিয়াও তাহাকে ধরিতে পারিল না। অনেক অরণ্য পর্ব্বত পার হইয়া সুরপাল ও বিমলদেবী অরণ্যের এক নিরাপদ স্থানে উপস্থিত হইলেন। সুরপাল বিমলদেবীর সমস্ত দুঃখ কাহিনী শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—তোমার মত পতিব্রতা স্ত্রী পাইয়া আমি ধন্য হইয়াছি। কিছুদিন পরে একজন ভীলমুখে তাঁহারা সংবাদ পাইলেন, রূপসুন্দরী একটী পুত্র সন্তান প্রসব করিয়াছেন।

তখন সুরপাল ও বিমলদেবী সেই দুর্গম গিরিপথ ও অরণ্য পার হইয়া রূপসুন্দরীর নিকট উপস্থিত হইলেন। সেখানে আনন্দের পরিসীমা রহিল না। বিমলদেবী রূপসুন্দরীর পুত্র বনরাজকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন,—তোকে দেখিয়া আমি এখন সন্তোষের সহিত মরিতে পারিব তুমি অমর হইয়া আমার পিতৃবংশ উজ্জ্বল কর—এই আশীর্ব্বাদ করিতেছি।

সেখানে কিছুদিন অবস্থানের পর জলবায়ুতে বিমলদেবী অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার শরীর দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিল একদিন স্বামীর অঙ্কে মাথা রাখিয়া বিমল-দেবীর পবিত্র আত্মা স্বর্গে গেল।

বিমলদেবীর সতীত্ব গাথা কালের বুকে অমর রেখা আঁকিয়া গেল।

* * * *

রূপসুন্দরীর পুত্র বনরাজ স্বীয় বীরত্বে পিতৃরাজ্য পুনরধিকার করিয়া অনহিলবার পাটনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন।

বিলাতে গীতাঞ্জলি

গীতাঞ্জলি (ইংরাজি)—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। লণ্ডন হইতে ইণ্ডিয়া সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দশ শিলিং ছয় পেন্স।

"নৈবেদ্য" "খেয়া" "গীতাঞ্জলি" প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে একশত তিনটি কবিতার অনুবাদ এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। অনুবাদ রবীন্দ্রনাথের নিজের। কবি য়ীটস্ এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়াছেন এবং বিখ্যাত চিত্রকর রোটেনষ্টাইন কর্ত্তৃক অঙ্কিত রবীন্দ্র-নাথের আধুনিক সময়ের একখানি প্রতিকৃতি ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে।

গ্রন্থখানি বাহির হইবামাত্রই বিলাতের "টাইমস" "নেশন" "এথিনিয়ম" প্রভৃতি সাময়িক-পত্রে ইহা সমালোচিত হইয়াছে। সেখানকার গুণীসমাজ একবাক্যে ইহার প্রশংসা করিয়াছেন। যাঁহাদের জন্য এই কবিতাগুলি অনুবাদিত হইয়াছে, স্বীকার করিতেই হইবে, তাঁহারাই এই গ্রন্থের প্রকৃষ্ট

সমালোচক। সেইজন্য তাঁহাদেরই মতামতের মর্ম্মানুবাদ আমরা এইস্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"মুখ্যভাবে পরম সত্তার সাক্ষাৎলাভে আত্মা যে কথাটি ব্যক্ত করিতে চায় তাহাই ধ্যানীর কবিতা, তাহাই মুনির কবিতা, এবং তাহাই সকল সাহিত্যের মুকুট মণি। উহা সমস্ত সুকুমার সাহিত্যের নিগূঢ় উদ্দেশ্যটি সার্থক করিয়া তোলে। সকল কবির হাতে ইহা পূর্ণ অবয়ব লাভ করিতে পারে না; কারণ এ অমূল্য সামগ্রী যিনি সৃষ্টি করিবেন তাঁহার মধ্যে একাধারে নানা বিচিত্র গুণের সমাবেশ ও সমন্বয় হওয়া আবশ্যক; বলা বাহুল্য তেমন কবি জগতে সুদুর্লভ। সুসংযত শিল্প-নৈপুণ্য, বন্ধনহীন ভাবোন্মাদ এবং নির্ভীক সত্যদৃষ্টি, এ তিনের পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান থাকা চাই। যিনি ধ্যানরসের রসিক, যিনি পরম তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনের উচ্চ আশা অন্তরের মধ্যে পোষণ করেন, তাঁহাকে নিপুণ শিল্পীও হইতে হইবে, প্রেমিকও হইতে হইবে এবং ঋষিও হইতে হইবে। এমন প্রতিভা সকল যুগেই বিরল, কিন্তু কেবল এই প্রতিভার জ্যোতিই মানুষের অধ্যাত্ম উন্নতির দুর্গম পথে একমাত্র অবলম্বন। পুরাকালের ঋষিদের মত এই ধ্যানী কবি-সমাজই এখন মনুষ্য-জাতির চক্ষুস্বরূপ। প্রাচ্যভূমির সুফি কবি জালালুদ্দিন রুমি এবং প্রতীচ্যের সেণ্ট্ ফ্রান্সিস্, কার্ম্মেলাইট্ সেণ্টজন্ প্রভৃতি এই শ্রেণীভুক্ত। ইহাঁদের সকলেরই ভাষার এক ছাঁদ, কারণ ইহাঁরা এক রাজধানীর বাসিন্দা। ইহাঁদের দলটি খুবই ছোট; এই ছোটখাট দলটিতে আজ আমাদের আর একটি কবির নাম যোগ করিয়া লইতে হইবে, এই কবিটি বাঙালী, ইহাঁর নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ইহার নব প্রকাশিত গীতাঞ্জলি নামক গ্রন্থখানি সমালোচনা করিতে হইলে যে নিরিখের প্রয়োজন তাহার জন্য আমাদিগকে প্রাচীন কালের ঋষি-কবিদিগের শরণাপন্ন হইতে হয়। নহিলে, ইহার যথার্থ মূল্য নিরূপণ করিবার অন্য কোনো নিরিখ বা আদর্শ নাই। এই যে শতাবধি কবিতার (কবির স্বকৃত অনুবাদ) গুচ্ছ আমরা পাইয়াছি, এগুলির মধ্যে কবির অধ্যাত্মজীবনের সুগভীর স্বানুভূতির লক্ষণ সুস্পষ্ট। এই স্বানুভূতি বিচিত্র অথচ বিকার-হীন; চমৎকার অথচ নিতান্ত সহজ; ধ্যানীদের সেই চিরন্তন ধারা; সেই দেশকালবিজয়ী অনাহত সুর, সেই চিরনূতন অথচ চিরন্তন সৌন্দর্য্য দৃষ্টি, পরমার্থ-বিষয়ে সেই গভীর স্পৃহা।...এই কবিতাগুলির প্রকাশ ও প্রচার সমগ্র মানব-জাতির অধ্যাত্ম-জীবনের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। ইহা পূর্ব্বতন ধ্যানী-সমাজের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে এবং সেই সঙ্গে আমাদের বর্ত্তমান যুগের মানব-হৃদয়কে ব্রহ্ম-বিহারের সুপরম যোগে যুক্ত করিয়া দিয়াছে। মানব জাতির অধ্যাত্ম উন্নতির ইতিহাসে যাঁহাদের অনুরাগ আছে তাঁহাদের কাছে ইহার মূল্য অনেক।" —নেশন

১৬ই নভেম্বর ১৯১২।

বিলাতের টাইম্‌স্ বলেন—"এই গ্রন্থের কবিতাগুলি, বিদেশী জিনিস বলিয়া, কেবল কৌতূহলের উদ্দীপনা করিয়াই নিরস্ত হয় না; এগুলি ইংলণ্ডের বর্ত্তমান কবি-সমাজের সম্মুখে একটি নূতন আদর্শ লইয়া উপস্থিত হইয়াছে,

নূতন পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছে, ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এ দেশের (ইংলণ্ডের) ভবিষ্যৎ কবিরা ভাব ও উচ্ছ্বাসের মধ্যে যদি এই প্রকার সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে পারেন তবে ইংলণ্ডেও একদিন এইরূপ উচ্চ-শ্রেণীর কবিতা জন্মিতে পারিবে। ...ইঁহার কবিতা পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন বাইবেলের Psalm রচয়িতা রাজা ডেভিডের মত আর এক ডেভিডকে আমরা লাভ করিয়াছি।"

এথিনিয়াম্ বলেন ঃ—"মিষ্টার ঠাকুরের অনুবাদগুলি স্বপ্নাবেশের মত সুন্দর ও মনোহর।...তর্জ্জমাতেও যাহা এমন পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের আধার, আসলে না জানি, তাহা আরো কত চমৎকার! এ বিষয়ে যতই ভাবা যায় ততই বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িতে হয়।"

ইহা অপেক্ষা আমরা বেশী কথা আর কি বলিব! গীতাঞ্জলি পড়িলে তাহা অনুবাদ বলিয়া একেবারেই মনে হয় না। পড়িতে পড়িতে যেন একটি নূতন সৌন্দর্য্যমাহাত্ম্যে মনোপ্রাণ পরিপূর্ণ ও অভিভূত হইয়া উঠে।

মহাকালমহিমা

বসন্ত চলিয়া যায় নিয়ে রতিকাম,
সারা অঙ্গে লিখে দিয়ে শুধু শ্যাম নাম!

আসেন নিদাঘ সাথে রুদ্রভোলানাথ,
ভস্মে ঢাকা বৈশ্বানর, খরনেত্র পাত,
কিরণ ময়ূখমালা ফণীসম শ্বাসে
শ্যাম কোথা কাম সম পলায় তরাসে!
শুষ্ক হায় পত্রাবলী, লুপ্ত অঙ্গরাগ
গুপ্ত কোথা কাজলের সজল সোহাগ!
রক্তসন্ধ্যা তপ্ত কণ্ঠ, রুদ্রাক্ষে ঘেরিয়া
অঙ্গে তারা নামাবলী আসিল পরিয়া!

বরষা বারুণী ভরি আসিল কলসে,
অনুরাগে হলধর চলেন হরষে,
ঘননীলবাস অঙ্গে সুবর্ণের ভাতি;
সঞ্জীবনী রসে ধরা জাগে রাতারাতি,
গঙ্গাভ'রে, যমুনায় উজান জোয়ার,
প্রেমের সঙ্গমে বুকে আজি পারাবার!

কনকে শ্যামলে হাসে শরৎ-শোভন,
রাম সাথে অভিরাম অনুজ লক্ষ্মণ,
ধন্য আজি পঞ্চবটী পূর্ণ জনপদ,
কাননে ভরিয়া ওঠে রাজার সম্পদ,
পর্ণশালে দেখি কার সোনার আঁচল
তোরণ বাঁধেন দ্বারে নিজে আখণ্ডল!

ক্ষণহাসি ক্ষীণতনু হেমন্তের দিন
ধরিতে সহেনা ভর পলকে বিলীন,
নিমেষে দিনের শেষে মুগ্ধ চন্দ্রালোকে
যে জন জাগিতে পারে অনিমেষ চোখে,
চঞ্চলা কমলা হয়ে অচঞ্চলা সতী
তারি ঘরে নিশিদিন করেন বসতি!

জীর্ণ দেহ শীর্ণ বাহু পাংশু ব্যোম-কেশ
বৃদ্ধ শীত আসিছেন দ্বিজ ছদ্মবেশ,
দাঁড়ায়ে স্থবির সম উমার দুয়ারে
বাঞ্ছিতেরে ব্যাজস্তুতি করে বারে বারে,
বিরাগ বিমুখ হেরি প্রিয়ার আনন,
শিবরূপে প্রকাশিয়া স্বরূপ আপন
যবে ধরিবেন হাতে, নবরবি করে
সুনীল কণ্ঠের দ্যুতি জাগিবে অম্বরে,
গাহিবে নীরব পিক পঞ্চমে আবার
শ্যাম শোভা দিবে দেখা অঙ্গে বসুধার!
তনু দেহ ফিরে পুন পাইবে অতনু
লাবণ্যে ভরিবে বিশ্ব অণু পরমাণু!

মাননীয় রাও বাহাদুর রঙ্গনাথ নরসিংহ মাধোলকার
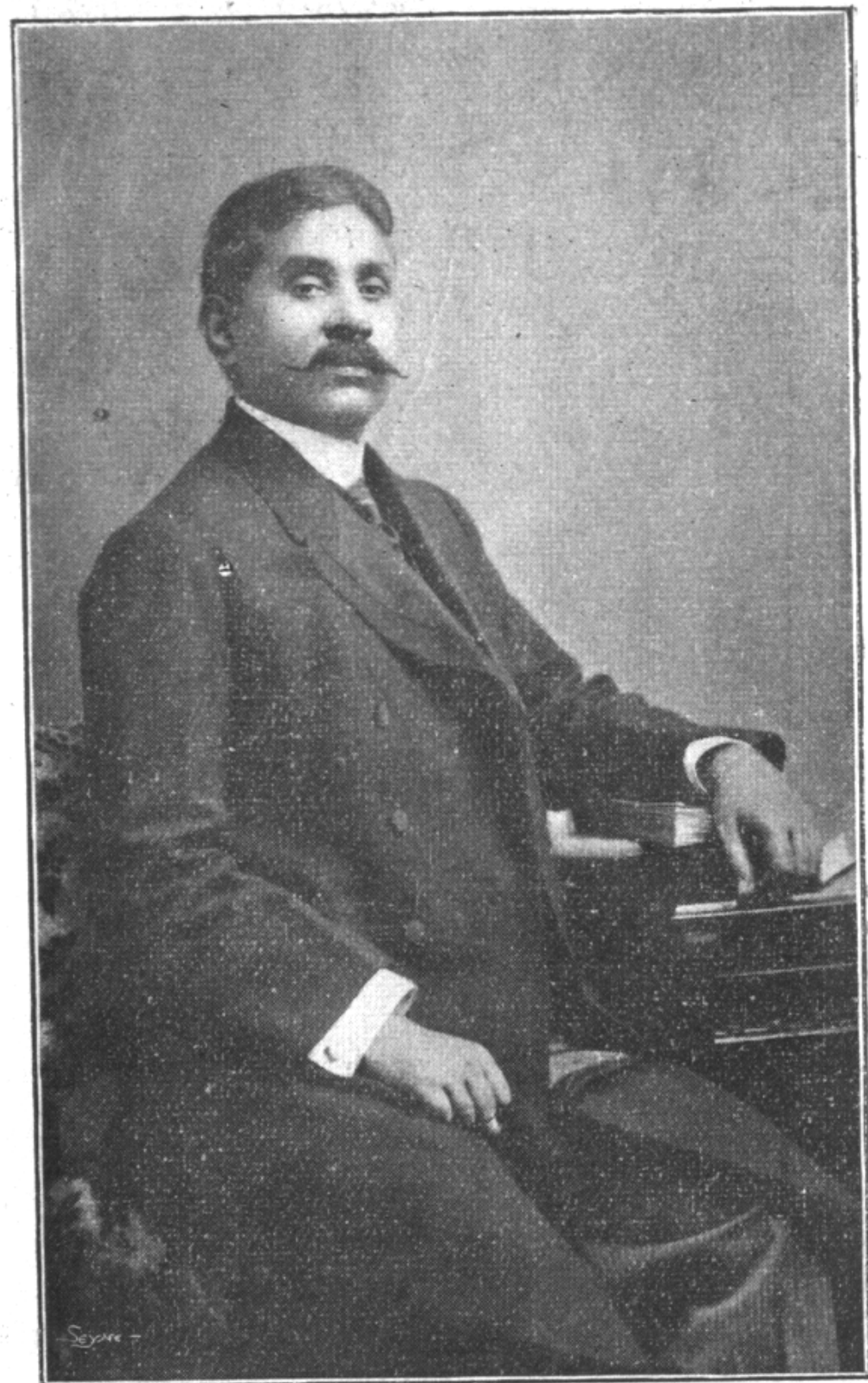
মাননীয় সচ্চিদানন্দ সিংহ

সাময়িক প্রসঙ্গ

জাতীয় মহাসমিতি

এবার বাঁকিপুরে জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন হইবে। মাননীয় রাও বাহাদুর **রঙ্গনাথ নরসিং মাধোলকার** মহোদয় সভাপতি পদে বৃত হইয়াছেন। রঙ্গনাথ দাক্ষিণাত্যের অন্তরর্গত ধুলিয়া গ্রামে ১৮৫৭ সনের ১৬ই মে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ মহারাষ্ট্র প্রাধান্যের সময় মাধোল নামক জমিদারীর কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন এবং সেই সময় হইতে এই বংশ মাধোলকার নামে প্রথিত হইয়াছেন। রাও বাহাদুর রঙ্গনাথ ১৮৮৮ সনে জাতীয় মহাসমিতিতে যোগদান করেন এবং তদবধি তিনি ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট। ১৮৯০ সনে কংগ্রেস হইতে বিলাতে যে তিনজন প্রতিনিধি প্রেরিত হন মাননীয় মাধোলকার তাঁহাদেরই অন্যতম। মধ্যপ্রদেশে যে প্রাদেশিক সমিতি আছে, ইনিই তাহার প্রতিষ্ঠাতা। ভারতীয় শিল্পোন্নতি সভার সম্পাদকরূপে মাধোলকার দেশের প্রভূত উপকার সাধন করিয়া আসিতেছেন। ১৯০৯ সনের Indian Council Acts এর নিয়মানুসারে মাধোলকার মহোদয় বড়লাটের সদস্য নির্ব্বাচিত হন এবং এই সভাতেও তিনি অনেক সময় নিজ বিদ্যা, বুদ্ধিমত্তা ও স্বদেশপ্রিয়তার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া দেশবাসী ও সঙ্গে সঙ্গে গবর্নমেণ্টেরও প্রশংসাভাজন হইয়াছেন।

মাননীয় সচ্চিদানন্দ সিংহ মহাশয় এবারকার জাতীয় মহাসমিতির কর্ম্মাধ্যক্ষ হইয়াছেন। অনেকদিন ধরিয়া বিশেষ যোগ্যতার সহিত ইনি এলাহাবাদের সুপ্রতিষ্ঠিত ইংরাজী মাসিক পত্র হিন্দুস্থান রিভিউ সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন। কংগ্রেসের সঙ্গে সঙ্গে যে Social Conference বা সামাজিক বৈঠকের অধিবেশন হইবে, ইনি তাহার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

শোক সংবাদ

রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব—রাজা বিনয়কৃষ্ণ ইহ সংসারে নাই,—এ শোক সংবাদে আমরা নিতান্ত মর্ম্মাহত হইয়াছি। তাঁহার মত এমন বিনয়ী, এমন অমায়িক এমন সাধুসজ্জন দুল্লর্ভ।

শোভাবাজার রাজবংশের পরিচয় বাঙ্গলা দেশে কাহারো অবিদিত নাই। সেই বংশে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ৺ বিনয় কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের জন্ম হয়, তিনি ৺ মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের গোষ্ঠী-জাত ৺ কমল কৃষ্ণ বাহাদুরের কনিষ্ঠ পুত্র। বালককাল হইতে দেশ হিতকর সকল কার্য্যেই তাঁহার উৎসাহ ও চেষ্টা ছিল। কংগ্রেস মিউনিসিপাল বিল, সমুদ্রযাত্রা সমাজ সংস্কার, সাহিত্য পারিষদ, সংবাদ পত্রের স্থাপনা ও উন্নতি বিধান, প্লেগ-বিভীষিকাবিহ্বল জনসমূহকে আত্মনির্ভীকতায় বরাভয় প্রদান প্রভৃতি সমস্ত মঙ্গল অনুষ্ঠানেই তাঁহার কল্যাণ হস্তের শুভ চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। নবযৌবনের প্রথম উন্মেষিত শক্তি লইয়া তিনি অনেক রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দান করিয়াছিলেন। অনেক দিন কংগ্রেসের কোষাধ্যক্ষ হইয়া নিপুণতার সহিত কার্য্য নির্ব্বাহ করেন কিন্তু কিছু দিন হইল স্বাস্থ্য ভঙ্গ এবং সঙ্গে সঙ্গে বয়সোচিত অভিজ্ঞতায় আন্দোলন অপেক্ষা স্থির নিষ্ঠাই দেশের এবং দশের উন্নতি সাধনার মূলাধার জানিয়া ক্রমে এ সকল কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। শেষ পর্য্যন্ত কেবল সাহিত্য পারিষদ এবং শোভাবাজারের দাতব্য সভা তাঁহার সহানুভূতি, আনুকূল্য, অর্থসাহায্য ও অশ্রান্ত অধ্যবসায় হইতে বঞ্চিত হয় নাই। সাহিত্য চর্চ্চা তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ চেষ্টা এবং অবসরের আনন্দ ছিল ইহারি ফলে কয়েক খানি সুন্দর গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। দানে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন; সাহায্য-প্রার্থী দরিদ্র ছাত্র, সাহিত্যসেবী, অনাথ আতুর ভগ্নমনোরথ হইয়া কখনো তাঁহার নিকট হইতে শূন্য হস্তে ফিরিত না। মনের সৌন্দর্য্য এবং চরিত্র আদর্শে তাঁহার মত আর একটি ধনী সন্তান খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। বংশগৌরব অপেক্ষা সাহিত্য-খ্যাতি তাঁহার নিকট অধিক প্রীতিকর ছিল। অনেকে স্ত্রীশিক্ষা স্ত্রী স্বাধীনতা সম্বন্ধে মুখে মুখে লম্বা লম্বা বক্তৃতা দিয়া কার্য্যতঃ বিপরত আচরণই

করেন। কিন্তু রাজা বাহাদুর শত বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়া তাঁহার পত্নীকে যেরূপ সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন, ইংরাজ নারীগণের সহিত তিনি যেমন শোভন ভাবে মিশিতেন তাহা দেখিলে হৃদয় আনন্দ পূর্ণ হইত।

এই অল্পদিন পূর্ব্বে অকস্মাৎ তিনি যখন সাংঘাতিক রোগাক্রান্ত হইয়া পড়েন তখন কল্পনাতেও আসে নাই এত সত্বর তাঁহার শোকাবহ মৃত্যুসংবাদ শুনিতে হইবে। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে বাঙ্গালা দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা শোক অনুভব করিয়াছে বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবেনা। কেননা তাঁহার একটিও শত্রু ছিলনা।

ইঁহার পত্নী সুপণ্ডিত ৺প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারীর কন্যা। ইনি রূপে গুণে যেন স্বয়ং লক্ষ্মী, স্বামীর প্রকৃত সহধর্ম্মিণী। কি করিয়া তিনি এই শোক বহন করিবেন মনে করিতেও অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠে, এ দুঃখে কি করিয়া ইঁহাকে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিব জানি না।

অভিজাতবংশজাত, নিষ্কলঙ্কচরিত্র, দেশপ্রমিক এই বঙ্গ সন্তানের স্মৃতি চিরস্থায়ী করিবার জন্য প্রস্তাব চলিতেছে। তাহা ত্বরায় কার্য্যে পরিণত হউক এই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

৺মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি ও সখারাম গণেশ দেউস্কর—গত মাসে আমরা আরো দুই জন সুপরিচিত সাহিত্য-সেবীকে হারাইয়াছি। মহেন্দ্রনাথ বহুদিন হইতে সাহিত্য সেবা করিয়া আসিতেছিলেন। ইনিই সর্ব্বপ্রথম 'প্রাচীন ভারতবর্ষীয় আর্য্য রমণীগণের শিক্ষা' সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইঁহার রচিত অক্ষয়কুমার দত্তের একখানি জীবনী-গ্রন্থও আছে। বঙ্গসাহিত্যের উন্নতির জন্য ইঁহার একান্ত চেষ্টা ছিল। প্রথম সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠার সময় ইনি যথেষ্ট সাহায্য ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন। এজন্য বঙ্গ সাহিত্য-সেবী মাত্রেই তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ইঁহার স্মৃতি রক্ষার চেষ্টা করুন ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয় মহারাষ্ট্রীয় হইয়া এই বঙ্গভাষাকেই মাতৃভাষা করিয়াছিলেন। ইহার জন্য বঙ্গবাসীমাত্রেরই নিকট তিনি আদরণীয়। মহারাষ্ট্র ইতিহাসের অনেক তথ্য ইনি বঙ্গভাষায় দান করিয়াছেন। তিনি কিরূপ স্বদেশপ্রাণ ছিলেন তাহা তাঁহার রচিত "দেশের কথা" প্রভৃতি গ্রন্থগুলি পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায়। তিনি যে শুধু সাহিত্য-সেবী ছিলেন তাহা নহে—তাঁহার মত স্বদেশ ভক্তও দুর্লভ। বাংলা দেশ ও বাংলা ভাষাকে তিনি এতই ভাল বাসিতেন যে কথাবার্ত্তায় পোষাকে পরিচ্ছদে কোথাও তিনি বাংলাকে ভুলিতেন না। বঙ্গবাসীর হৃদয়মন্দিরে তাঁহার স্মৃতি উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে—ইহা আমাদের বিশ্বাস।

মহেন্দ্রনাথ ও সখারামের চিত্র ভারতীতে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সংগ্রহ করিতে না পারায় প্রকাশিত হইল না। তজ্জন্য আমরা বিশেষ দুঃখিত।

ছিন্ন লতিকা

সাধের কাননে লতাটি আমার
ছাইয়া কানন-কুঞ্জ,
মোহন সুবাসে ভরাইয়া দিক্
ফুটাইত ফুলপুঞ্জ।
সুশীতল ছায়া দিয়াছিল কত,
নিদাঘ তাপিত পান্থে।
সাজিয়া সুচারু শোভন সজ্জায়
শোভিত বিজন প্রান্তে।
আকাশ হইতে সহসা অশনি,
পড়িল খসিয়া হায়!
পুড়িল কোমল শাখা পল্লব
শুখাল মুকুল তায়।
তবু ছায়া ঢালি ধরণীর বুকে,
রহিল পড়িয়া লতা।
মৃদুল বাতাসে হেলিত দুলিত,
অপরের সুখে রতা।
হায়রে নাজানি কোন অভিশাপে,
ঝটিকা কাঁপায়ে বন।
ছিন্ন করিল লতাটি, আমার
শূন্য হৃদয় মন!

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৪৪, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড হইতে
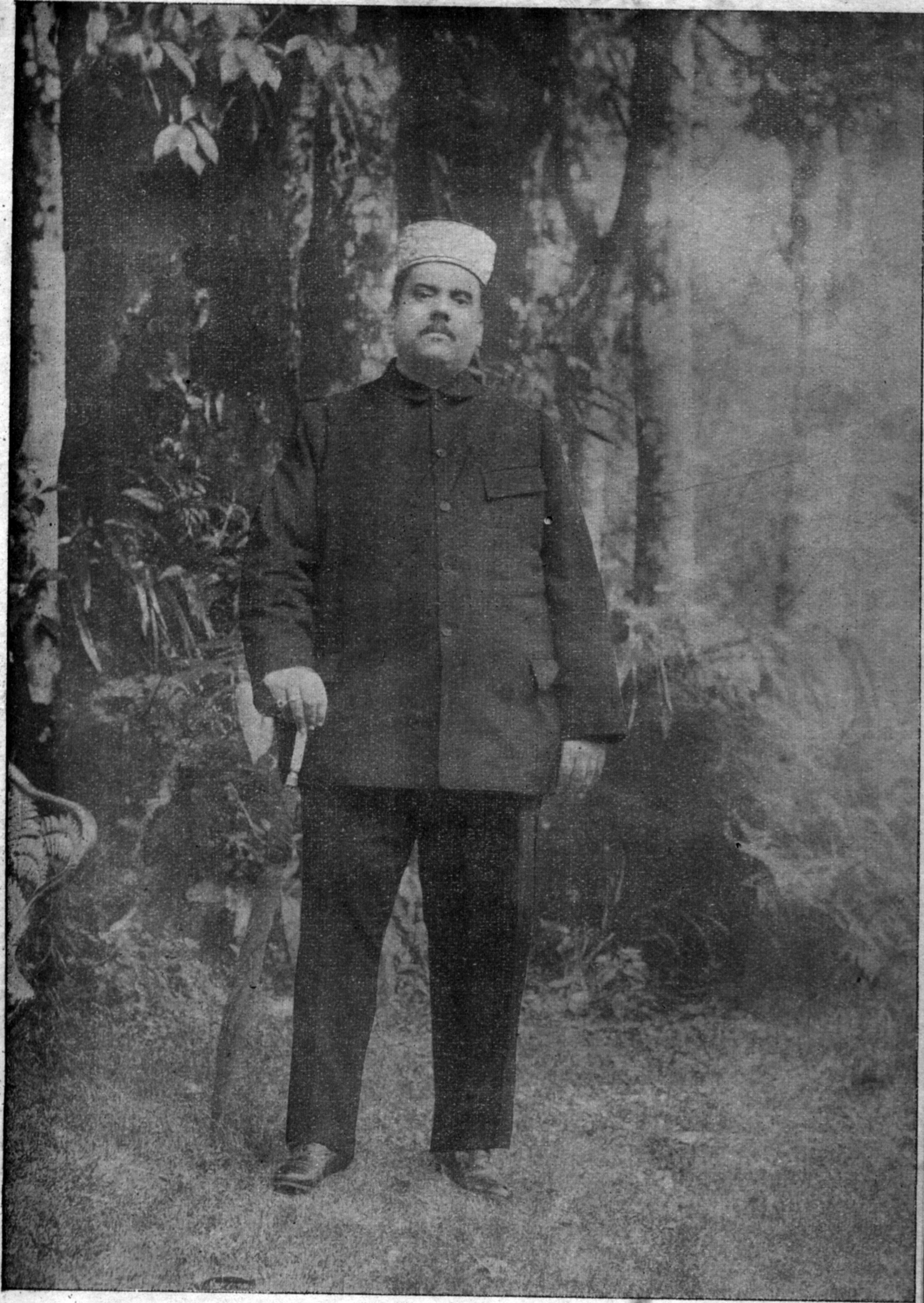
রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব

মন্দির পথে

ভারতী

৩৬শ বর্ষ] মাঘ, ১৩১৯ [১০ম সংখ্যা

বাগ্‌দত্তা

১৭

গভীর রজনীর প্রশান্ত বিশ্রামসুখে আঘাত করিয়া শ্মশানবাসীগণ সমকণ্ঠে উচ্চারণ করিল "বলো হরি, হরিবোল !"

সুমধুর হরিনাম ! এই হরিধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিলে প্রাণ জুড়াইয়া যায় কিন্তু সময় বিশেষে আবার এই আকস্মিক উচ্চারিত শব্দটা যেন কি এক প্রকার শিহরণ আনিয়া দেয়, প্রাণ সহসা চমকিয়া উঠে।

মূর্চ্ছিতবৎ কমলা এই শব্দে যেন হৃতসংজ্ঞা ফিরিয়া পাইল। স্বপ্নাভিভূতের মত তখন সে চারিদিকে চাহিয়া পুনশ্চ সভয়ে নয়ন মুদ্রিত করিল। বালিকার পক্ষে এ দৃশ্য অসহ্য !

নৈশাকাশের তলে চিতাবহ্নি সহস্র রক্ত জিহ্বা বিস্তার করিয়া ঊর্দ্ধমুখে গর্জ্জন করিতেছে ; অর্দ্ধ জাহ্নবীবক্ষ সেই তীব্র অনল দীপ্তিতে আলোকদীপ্ত। কমলা গভীর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া আবার সাতঙ্কে সেই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের দিকে দৃষ্টি ফিরাইল। কেমন করিয়াই বা সে না চাহিয়া থাকে, ওই অগ্নিরাশি যে আজ তাহার এ পৃথিবীর মধ্যে যাহা কিছু সম্বল সকলই ভস্ম করিয়া জ্বলিতেছে—এতদিনে সে যে যথার্থ অনাথা হইল ! দুইহস্তে মুখ ঢাকিয়া আর্ত্তস্বরে সে কাঁদিয়া উঠিল "আমার কি হবে ঠাকুমা, আমায় কোথায় রেখে গেলে !"

কিন্তু মানুষের জীবনে কেবল একটা স্রোতে দুঃখের প্রবাহ বহে না। এ জগতে সর্ব্বপ্রকার সুখের ছায়া স্বরূপ যেমন কিছু না কিছু দুঃখ বিদ্যমান, জীবনের পশ্চাতে উহার ছায়া স্বরূপে যেমন মৃত্যু নিত্য প্রতিষ্ঠিত, তেমনি সেই মৃত্যুর ভিন্ন তালে সুখও জীবনের স্থিতিরূপে চিরপ্রত্যক্ষ। উহারা সর্ব্বদাই একসঙ্গে থাকে উহাদের বাস্তবিক ভিন্ন সত্ত্ব নাই, একই বস্তুর বিভিন্ন দুইটিরূপ, সেই এক বস্তুই জীবন মৃত্যু, ভাল, মন্দ, দুঃখ, সুখ প্রভৃতি পৃথক ভাবে প্রকাশ পায়। কমলারও এই গভীর দুঃখের নিবিড় অন্ধকারে তাই বুঝি বিধাতা একটা আলোক রশ্মি সেই মুহূর্ত্তেই প্রেরণ করিলেন।

দাহকারীগণ চিতা মধ্যে রাখিয়া অদূরে বসিয়া আছে, শিবনারায়ণ নিজেও এই দলের সহিত আসিয়াছেন, কিন্তু কমলাকে এখানে আনিয়া বিপদ বড় অল্প হয় নাই। প্রথম হইতেই সে প্রায় বীতসংজ্ঞ ছিল; বৃদ্ধার মুখাগ্নি

করিবার পরই সে সম্পূর্ণ অচেতন হইয়া যায়; শিবনারায়ণ তাহাকে এতগুলি বাহিরের লোকের মধ্যে এঅবস্থায় ফেলিয়া রাখা অনুচিত বিবেচনায় মনীশের সাহায্যে একটু দূরে সরাইয়া আনিয়া তাহারই প্রতি ইহার রক্ষণের ভার দিয়া নিজে শবদাহের বন্দোবস্ত করিতে গেলেন। তখন মনে হইল করুণাময়ী আসিতে চাহিয়াছিলেন তাঁহাকে সঙ্গে আনিলেই ভাল ছিল।

মনীশ পিতৃব্যের নিয়োগে ধীরে ধীরে মূর্চ্ছিতা কমলার নিকটস্থ হইল। এতবড় বিপদের সময়—তথাপি তাহার স্বভাবজাত একটা কুণ্ঠা প্রতিপদে তাহাকে বিপরীত দিকে ঠেলিতেছিল। কিন্তু না ইহা দুর্ব্বলতা, কাপুরুষের এ ব্যবহার! সে নিজের চিত্তকে সবল করিয়া কর্ত্তব্যের ভার মাথায় লইতে আসিল।

শ্মশান বহ্নির যজ্ঞকুণ্ডপার্শ্বে জাহ্নবী সৈকতবেদিকা পরে, শৃগালসারমেয়-নাদশব্দিত সন্ধ্যা যামিনীর মধ্যে যে মিলনের গ্রন্থি বিধাতা পুরুষ বাঁধিয়া দিয়াছেন সে বিবাহের বর কতটুকু লজ্জা সঙ্কোচের অধিকার রাখে! সে অঞ্জলি করিয়া জল আনিয়া নিস্পন্দ কমলার চোখে মুখে সিঞ্চন করিল। অদূরস্থ অগ্নিশিখা প্রচণ্ড অন্তরে শোকদীর্ণ হৃদপিণ্ডের দাহ শোষণ করিতে করিতে অট্টহাসি হাসিতেছিল। সেই রুদ্রআলোকে মনীশ কমলার মৃত্যু-বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। তাহার নেত্রতারকা স্পন্দিত হইয়া দুই চোখের দৃষ্টি জলের আভাবে ঝাপ্‌সা হইয়া আসিল। কি অসহায় সেই মুখচ্ছবি! সহানুভূতিপূর্ণ বেদনায় তাহার চিত্ত ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

যখন কমলার কষ্ট সীমার মধ্যে ফিরিল সে মুখ ফুটিয়া কাঁদিয়া উঠিল তখন মনীশ তাহার জন্য অনেকখানি নিশ্চিন্ত বোধ করিল। সে তাহার দিকে দুইপদ অগ্রসর হইয়া সান্ত্বনাপূর্ণ কোমল কণ্ঠে সহসা বলিয়া ফেলিল, "তিনি তোমাকে আমাদের কাছে দিয়ে স্বর্গে গেছেন, তাঁর জন্য শোক ক'রো না।"—এইটুকু সে যেন কাহার দ্বারা প্ররোচিত হইয়া একনিশ্বাসে বলিয়া ফেলিয়াছিল, বলা শেষ হইলে যেন একটু লজ্জানুভব করিতে লাগিল। কিন্তু এই যে কথা কয়টি সে উচ্চারণ করিল, শ্রোত্রীর কর্ণে ইহা দেবতার অভয়বাণীর মত অমৃত বর্ষণ করিয়াছিল। চকিতে মাথা তুলিয়া সে ঊর্দ্ধমুখে চাহিল। একমুহূর্ত্তে সমস্ত ঘটনা তাহার বিলুপ্তপ্রায় স্মৃতিসাগরের তলদেশ আলোড়িত করিয়া মনশ্চক্ষের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল। গভীর বিষাদের মধ্যেও একটা পরম আশ্বাসে তাহার বালিকাচিত্ত ঈষৎ শান্ত হইয়া আসিল। মনে পড়িল—মৃত্যুচ্ছায়াকম্পিত মুখের উপরে জীবনের সেই মুহূর্ত্তেও কি গভীর স্নেহের রেখা বর্ণে বর্ণে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সেই শীতল হাতখানি কি নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে তাহার হস্তে অপর এক অপরিচিত হস্তের যোগসূত্র বন্ধন করিয়া শেষ নিশ্বাসেও তাহারি কথা উচ্চারণ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। এতক্ষণ পরে সে নিজের কথা ভুলিয়া তাঁহার কথা ভাবিয়া কাঁদিল। যে যতই বড় হোক্ জগতে নিজের স্ব-ই সবচেয়ে বড়, মানুষ তাই গভীর শোকের প্রথম উচ্ছাসেই বলে "ওগো আমার কি হলো!" এবং ইহার পরে বলে "তুমি কোথায় গেলে!"

ভোরের আলো ফুটিতে না ফুটিতে করুণাময়ী আসিয়া অনাথাকে কোলে তুলিয়া লইয়া কহিলেন—

"এসো আমার লক্ষ্মি! আমার ঘরে চলো।"

দশদিনে দশপিণ্ড ও শ্রাদ্ধাদি যথাবিধি সম্পন্ন করাইয়া কমলার অশৌচগতে শিব-নারায়ণ সপরিবারে স্বগ্রামে ফিরিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ভট্টাচার্য্যমহাশয় যে আর গৃহে ফিরিবেন না ইহা জানাই ছিল, তথাপি যাত্রাকালে আবার নূতন করিয়া তাঁহার বিচ্ছেদব্যথা সকলকার চিত্তেই জাগিয়া উঠিল। করুণাময়ীর কয়দিন ধরিয়াই স্বস্তি নাই, এ কয়দিন তিনি ক্রমাগতই চোখ মুছিতেছেন, মধ্যে মধ্যে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ঘরে অছিলায় এটা সেটা নাড়াচাড়া করিতে করিতে রুদ্ধকণ্ঠে বলিতেছেন, "বাবা, আপনি যাবেন না আমরা কেমন করে সেখানে থাকবো বাবা! আমার যে একটুও মন সরচে না!"

উমাকান্ত একথার উত্তর একটুখানি সকরুণ স্নেহের হাস্যদ্বারাই শেষ করিয়া দিতেছিলেন। শেষ মুহূর্ত্তে রোদনপরায়ণা করুণাময়ীর মাথায় স্নেহপূর্ণ হস্ত রাখিয়া গভীর করুণার সহিত কহিলেন—

"তোমার সব ভাল হবে, মা আমার!" এই ক্ষুদ্র কয়টি কথা, কিন্তু ইহার মধ্যে যে কত বল, কত ভরসা, তাহা শ্রোতারাই শুধু বুঝিল, পিতৃগৃহ হইতে শ্বশুরালয়যাত্রী নববিবাহিতা বালিকার মত প্রৌঢ়া গৃহিণী কাঁদিয়া বিদায় লইলেন। কমলার দুটি চোখের মৌন দৃষ্টি হইতে ভক্তি কৃতজ্ঞতার দুইটি ধারা নিঃশব্দে বাহির হইয়া আসিল। সে কোনদিন বেশি কথা কহিতে জানে না মনের যেটুকু স্বাধীন বৃত্তি ছিল বুঝি সেটুকুও দুঃখের চাপে মরিয়া গিয়াছে। কিন্তু ভাষা অনেক সময় যে গভীর ভাব প্রকাশে অসমর্থ, আমাদের মনোদর্শন স্বরূপ দুইটি নেত্রতারকা তাহার সে ত্রুটি সম্পূর্ণরূপে সারিয়া লইতে সক্ষম। একা সত্যই আনন্দে আটখানা হইতেছিল। গাড়িতে উঠিয়া সে কমলার কানের কাছে মুখ আনিয়া চুপি চুপি কহিল "গৌরী বাঁদর-মুখীটা আমাদের দেখে কি রকম আশ্চর্য্য হয়ে যাবে ভাবো দেখি! তোমার খুব আহ্লাদ হচ্চে, না?" কমলা এ প্রশ্নের কোন জবাব দিতে পারিল না দুঃখে তাহার বুকখানা ফুলিতেছিল। একদিন সে জগতের মধ্যে প্রধান অবলম্বন তাহার স্নেহময় দাদাকে হারাইয়া এই কাশীধামে আশাহীন হৃদয় লইয়া প্রবেশ করিয়াছিল! আজ সেই হৃদয়ে কি স্নিগ্ধ মধুর সুখের আশা স্ফুটনোন্মুখ পুষ্পমুকুলটির মত সঙ্কোচসরমে বিস্ফারিত হইয়া উঠিতেছে, কিন্তু তথাপি মনে সুখ নাই,—হায় কোথায় রহিলেন তাহার স্নেহময়ী ঠাকুরমা! কমলার জীবনের দুঃখতমিস্র কাটিয়া সৌভাগ্যসূর্য্য উঠিবে কিন্তু দুঃখের সাথীতো তাহা দেখিবে না! দুঃখ সহিয়াই তাঁহারা যে চলিয়া গিয়াছেন। এ কষ্ট কিছুতে ভুলিবার নহে।

পরপারে পৌঁছিয়া সকলেই কাশীর দিকে ফিরিয়া যুক্তহস্তে প্রণাম করিলেন। কমলার অপলক দৃষ্টি তাহার মধ্যকেন্দ্রে,—মণিকর্ণিকায় নিবদ্ধ রহিল। সেইখানেই সে ইহজীবনের সমস্ত আশ্রয়হারা হইয়াছে, কিন্তু আজ যে আবার

এই নূতন আশায় বুক বাঁধিয়া নবীন জগতে প্রবেশ করিতে চলিয়াছে সেও ঐ উহারই দান। ওইখানেই অনাথা, পরিত্যক্তা, কমলা শুনিয়াছে—তাহার নিরাশার মুহূর্ত্তে স্বপ্নাভিভূতের মত শুনিয়াছে,—করুণাদীপ্তমূর্ত্তি পুরুষ তাহার হাতে হাত রাখিয়া বলিতেছেন "গ্রহণ করলেম।"

পল্লীগ্রামে এতবড় অনূঢ়া কন্যা সাধারণের তীব্র আলোচনার নিতান্ত ছোটখাট বিষয় নয়, করুণাময়ীর সহিত কমলাকে দেখিয়া তাঁহার প্রতিবেশিনীগণ চমকিয়া গালে হাত দিলেন। একজন অন্যরূপ বুঝিয়া ছোটস্বরে বলিয়াছিলেন "আহা! এমন রূপের ডালি মেয়ে এই বয়সে কপাল পুড়ে গ্যাছে!" কিন্তু গাঙ্গুলী-গৃহিণী যখন জিহ্বা দংশন করিয়া কহিয়া উঠিলেন "ষাট্ এটি আইবড় মেয়ে, দিদি এই আমার মনুর বউ হবে।" অমনি সহানুভূতিকারিণীর মুখের ভাব বদলাইয়া গেল, চোখে মুখে একটা অবজ্ঞা, অপছন্দর ছায়া স্পষ্ট ভাসিয়া উঠিল। এই বয়সে তাহাকে দারুণ, বিড়ম্বনাপূর্ণ জীবন-বৈধব্যের মধ্যে দেখা সহিতে পারা যায়,—কিন্তু ওরে বাপ্‌রে! এতবড় ধেড়ে মেয়ে আজও কুমারী? সর্ব্বনাশ! করুণাময়ীর স্বভাব-গুণে পাড়ার লোকে তাঁহাকে সুচক্ষেই দেখিত, বাড়ীর কর্ত্তার কাছে অনেক লোকেই বাধ্যবাধকতার সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, তাই অন্য বাড়ীতে হইলে এই ব্যাপারটি যতদূর সঙ্গীণ হইয়া দাঁড়াইত এখানে ততদূর হইল না। বিশেষ সার্ব্বভৌম মহাশয় নিজে এই বাক্‌দানের কর্ত্তা জানিয়া নিতান্ত সাহসী ভিন্ন বাকি দুএকজন মুখফোঁড় বলিল "পণ্ডিত মশাই সর্ব্বশাস্তর জেনেও যখন এতবড় একটা অকল্যাণকর কাণ্ড করতে মত দিয়েচেন তখন আর বলবার কি আছে, হিন্দুধর্ম্ম এইবারে দেশ থেকে উঠে গ্যালো।"

কোন পুরমহিলা স্নানের ঘাটে দৃষ্টা সখীর সহিত চোখে চোখে ইঙ্গিতের আদানপ্রদান করিয়া বলিলেন "ওলো, এ হোল ভাল, ছেলেমেয়ের বে দিতে আর পুরুৎ ডাকতে হবেনা, দিনক্ষণ দেখতে হবে না, খরচ খরচা নেই, বরকনেকে একসঙ্গে ঘর কর্‌না করতে দিলেই চুকে যাবে, শুনেচি সায়েব-বিবিদের ওই রকমই নাকি হয়।"

কথাগুলা পাঁচকাণ হইতে হইতে ছয়কাণে উঠিতেও বড় বেশি বিলম্ব হইল না, মনীশ শুনিয়া আরক্ত হইয়া উঠিল, তাহার জন্য কমলাকে দশজনের শ্লেষ কেন সহ্য করিতে হয়? সে তখনি খুড়িমার নিকটে গিয়া বলিল "সতু যাহোক করে এবার যখন ক্লাশটা উঠে গ্যাছে তখন আর ওকে এখানে রাখা নয়, আমি ওকে নিয়ে কল্‌কাতা যাই কি বলো খুড়িমা?" করুণাময়ী ক্ষণেকের জন্যও এ সম্ভাবনা চিত্তে স্থান দেন নাই, চকিত হইয়া কহিয়া উঠিলেন "সে কিরে! দুজনে তোরা বাড়ীছাড়া হবি?" মনীশ ক্ষীণ হাসিয়া উত্তর করিল "নাগেলে সত্যটার যে পড়াশোনার সুবিধা দেখিনে খুড়িমা! নিজের দলে একবার ভিড়লে আর কি ওকে পাওয়া যাবে? ওকি, এরই মধ্যে তোমার চোখে জল এলো বুঝি? না, না খুড়িমা যাবোনা থাক্—তুমি চুপ করো।" বলিতে বলিতে মনীশের নিজের

বাহির হইয়া আসিয়াছিল, সে তাহা সম্বরণ করিতে করিতে হাসিয়া কহিল "এই করেই তোমরা আমাদের মাটি করে দিলে খুড়িমা, কোথাও গিয়েই ত টি'কতে পারিনে?" এই বলিয়া সে আনন্দোৎফুল্ল নেত্রে— অশ্রুহাস্য সম্মিলনে যমুনাজাহ্নবীসঙ্গম সদৃশ খুড়িমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল।

কিন্তু ব্যাপারটা এই খানেই চুকিল না। অন্য কোন উপায় ঠাওরাইতে না পারিয়া মনীশ যখন একটা উডেন্ পেন্‌সিলের মুখকে ছুরিকা দ্বারা কর্ত্তনের পর কর্ত্তনে অতি সূক্ষ্ম করিয়া তুলিয়াছে এমন সময়ে এক খানা পাতছেঁড়া মসিরঞ্জিত খাতাহাতে সত্য আসিয়া বলিল "দাদা অঙ্ক কষাবে না?"

মনীশ মুখ তুলিয়া একটু হাসিল, "আজ যে এত চাড়? কি ভাগ্য।"

সত্য কহিল "সত্যি বল্‌চি দাদা এবার থেকে খুব পড়বো,—যা বলবে শুনবো দেখো তুমি—"

মনীশ সেই কালিমাখা খাতাখানার মধ্যে একখানাও ব্যবহারযোগ্য পৃষ্ঠা যদি খুঁজিয়া পায় তাহারি সন্ধান করিতেছিল। ভাইএর আকস্মিক সুমতিতে প্রীত হইয়া কহিল "আমি তো জানি তুমি খুব ভালছেলে, নিজেকে তুমি এতদিন বুঝতে পারনি বৈতো নয়—এসো—"

সত্য ঘাড় হেঁট করিয়া নিবিষ্টমনে অঙ্ক কষিল, বুদ্ধিতে সে খাটো ছিলনা চিত্ত স্থির করিবামাত্র অতি সহজেই সফল হইতে পারিল, আনন্দে মনীশের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সে কহিল "বেশতো পারো!" বিস্মিতও হইল—এই ক্ষমতাটা চাপিয়া রাখিয়া মানুষ নিজেই নিজের ক্ষতি করে।

সত্য যখন দেখিল দাদা বেশ একটু গলিয়াছে তখনি সে কাজ হাসিল করিবার চেষ্টা দেখিল, বিনীতভাব ধারণ করিয়া কহিল "দাদা মিথ্যে মিথ্যে কলকাতায় যাবার দরকার কি? তুমি বাবাকে বলো যে 'সত্তি এই খানেই মন দিয়ে পড়বে বলচে', তুমি বল্লেই বাবার মত হবে' খন।"

এতক্ষণে মনীশ কতকটা বুঝিল, তাই বটে! তাহার আশার মধ্যে একখানা সন্দেহের ছায়া পতিত হইল। বিস্ময়েরও কারণ ছিল, কাকা কেন একথা বলিলেন? তিনি কি করিয়া তাহার মনের কথা পাইলেন? ভাইকে সে এই কথাই জিজ্ঞাসা করিল। সত্য কহিল "মা বাবাকে বলেচেন তুমি মাকে বলেচ আমায় নিয়ে তুমি কলকাতা যাবে। বাবা তাই শুনে বল্লেন "খুব ভালকথা বলেচে তাই করুক"। ও দাদা তোমার পায়ে পড়ি তুমি—"

মনীশ সবেগে বাধা দিল "পায়ে পড়ি কি? কাকাবাবু বলেচেন তার পরেও তুমি এই সব বল্‌চো? তাঁর আদেশ বেদবাক্য নয়?"

আশা ফুরাইতেই সত্যেন্দ্রের সজাগ বুদ্ধি-বৃত্তি ক্ষুব্ধ রোষে অচেতন হইয়া পড়িল। দাদা তাহাকে কেমন করিয়া বিদ্বান করে তাহা দেখিয়া লইবার প্রতিজ্ঞা করিয়া ছাড়া পাইবামাত্র বেলের আটার দ্বারা ছেঁড়া ঘুড়ি খানা জুড়িয়া বোতলচুর মাঞ্জা লাগানো সুতা লাটাইয়ে জড়াইতে জড়াইতে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। তাহার বিশ্বাস দাঁড়াইয়াছিল এই রূপেই সে তাহার জ্যেষ্ঠের উপরে প্রতিশোধ লইতে সক্ষম।

১৮

এত বড় থুবড়ো মেয়ে ঘরে রাখিয়া ভ্রাতা ভগিনীর কণ্ঠনলী দিয়া কিরূপে অন্নজল উত্তীর্ণ হইতেছে এই অঘটিতপূর্ব্ব কাণ্ডের কোন মীমাংসা ভট্টাচার্য্য গৃহের বড়বধূ খুঁজিয়া পান না। মেয়ে খাইয়া খাইয়া দিন দিন হাতি হইয়া উঠিতেছে, তিনি হইলে এতদিন কোন্ কালে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া মেয়ে পার করিবার ভাবনাই ভাবিতেন, এই দেখনা বলে,— যার বে' তার মনে নাই, পাড়াপড়শীর ঘুম নেই! মামা, মাসী দিব্য করিয়া নাসারন্ধ্রে সরিষাসার নিষেক পূর্ব্বক নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রাসুখ ভোগ করিতেছেন, কিন্তু তিনি ত চোখে ঠুলি পরিয়া থাকিতে পারেন না। বলিলে বোনটিতো দুই ঠোঁট এক করেন না, ভাই বলেন-"সুপাত্র না মিলিলে কি করিব?" সুপাত্র কি ফরমাইসে বিধাতা গড়িয়া পাঠাইবেন? সুচক্ষে দেখিতে বাহির হইলেই সু খুঁজিয়া মেলে, সুপাত্রের ভাবনটা কি?

একদিন নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিলে স্বামীকে গিয়া বলিলেন "তু ভাই বোন মিলে যে ক্রমাগত পাত্র বিদায় করচো মেয়ের দিকে আর যে চাওয়া যায় না!"

ভক্তিনাথ বৈশেষিক দর্শনের একটা টীকা লিখিতেছেন,—আজ কাল অবসরের একান্তই অভাব, পাঁচ ছয় খানা ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতের টীকা, ভাষ্য সম্মুখে খোলা—থাকের কলম বালির হরিদ্রাভ কাগজের খাতার উপরে কখনও ধীরভাবে, কখন দ্রুতগতিতে বিচরণ করিতেছিল। ফলে সারির পর সারি মূল্যবান ও শ্রেণীবদ্ধ মুক্তাপংক্তি সজ্জিত হইতেছিল। নিজের কর্ম্ম হইতে মুখোত্তোলন না করিয়া তিনি কহিলেন "তবে না হয় তার দিকে চেয়োনা।" এই বলিয়া সম্মুখে একটু নত হইয়া কীটদংষ্ট পুঁথির একটি অংশ বিশেষ সাবধানে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। এই পুস্তক অনেক যত্নে সংগ্রহ হইয়াছে আজকাল ইহার প্রচার নাই বলিলেই হয়।

বড়বধূ এইরূপে অবজ্ঞেয় হইবেন তাহা নাজানিয়া বলিতে আসেন নাই, যথেষ্ট সংযমের সহিত কহিলেন "আমিই না হয় যেন চোখ বুজেই থাকবো, কিন্তু পাড়াশুদ্ধ,—দেশশুদ্ধ সবার চোখই কি বুঝিয়ে রাখতে পারবে?"

"বড়বউ তোমার কি ঘরের কাজ কিছুই নেই? না থাকে আমার বইগুলা ঝেড়ে রাখনা।"

বড়বধূ এবার একটু চটিলেন, বলিলেন "কাজ থাকবে না কেন যথেষ্ট আছে, তোমাদের ঘরে এসে কখনও কাজের অভাব দেখলাম না। কিন্তু যাই বলো আর যাই কও—তোমাদের এ ব্যাভারটা ভাল হচ্চে না এর পর ওই মেয়ে নিয়ে যখন ভুগতে হবে তখন বলবে যে হ্যাঃ! তোমাদের ঘরে যদি এই রকম হবে তবে অন্যলোকে দেবেনা কেন বুড় করে মেয়ের বে'?" এই বলিয়া তিনি সশব্দপদে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

কিন্তু বাড়ীর নূতন গৃহিণী যে খোঁচাটুকু বিঁধিয়া গেলেন তাহার মধ্যে যে একটা অখণ্ডনীয় সত্যের আঘাত আছে ইহা অস্বীকার করা চলে না। গৌরীর বয়স বার বৎসর হইতে যায় তাঁহাদের গৃহে ইতিপূর্ব্বে আর কখনও এতবড় করিয়া কন্যার বিবাহ দেওয়া

হয় নাই। কাদম্বিনীকে নবমে ও বিন্ধ্যাকে দশমে দান করা হয়। একটা দুর্বলতার বশেই এই মাতৃহীনা পিতৃত্যক্তা মেয়েটাকে তাঁহারা এপর্য্যন্ত পরহস্তে সঁপিতে পারেন নাই, কিন্তু কার্য্য অনুচিত হইতেছে নিঃসন্দেহ। যাহা করিতেই হইবে তাহাতে এত মোহ কেন?

পুঁথিপত্র তুলিয়া মোটা দোবজাখানা গায়ে দিয়া ভক্তিনাথ বাড়ীর বাহির হইয়া গেলেন, ফিরিতে প্রায় রাত্রি এক প্রহর হইল।

ভিতরে আসিতে পা ধুইবার জল লইয়া বড়বধূ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আমার ওপর রাগ করেচ? রাগ করো এবার থেকে না হয় আর কিছু বলবো না।"

ভক্তিনাথ পত্নীর হস্ত হইতে জলপাত্র গ্রহণ করিয়া একটু সঙ্কুচিতভাবে কহিলেন "রাগ করিনি, তুমি যা বলেচ ভেবে দেখলাম সেটা ঠিকই; তাই হরীশ ঘটকের কাছে গেছলাম। বিন্ধ্য—শুনে যাও—তোমার গৌরীর জন্য আজ একটি পাত্র দেখে এলাম।" বিন্ধ্যবাসিনী তখন রান্নাঘরের রোয়াকে ছেলেদের পরিবেশন করিতেছিলেন এই সংবাদে পরিবেশন পাত্র হস্তেই এই দিকে একটু সরিয়া আসিলেন তাঁহার সমুৎসুক নেত্রদুটি তাঁহার হইয়া প্রশ্ন করিল। ভক্তিনাথ কহিতে লাগিলেন "ক্রোশখানেকের ভিতরেই ছেলের বাড়ী, ছেলের বাপের নিজের চতুষ্পাঠী আছে; টোলে নবন্যায় পড়ান হয়, ছেলেটি পাঠ শেষ করেচে। পাত্র ভাল, বয়স আন্দাজ—ত্রিশ বত্রিশ, বিবাহের প্রশস্ত বয়স,—এমন কিছু অধিক নয়, অবস্থা স্বচ্ছল। তোমার পছন্দ হয়?"

বিন্ধ্যবাসিনী সহসা প্রশ্নটার উত্তর দিতে সমর্থ হইলেন না, দাদা বলিতেছেন বরপাত্র ভাল, সুপাত্র! সে কি করিয়া বলিবে—'না,' কিন্তু—ধক করিয়া মনের মধ্যে একটা অবাধ্য 'কিন্তু' দেখা দিয়া নিমেষে বলিয়া উঠিল, "এই কি তাঁহার গৌরীর যোগ্যবর?"

বিন্ধ্যাকে নীরব দেখিয়া বড়বধূ প্রমাদ গণিলেন। দেবতার কৃপায় যদি বা তাঁহার পণ্ডিত-মূর্খ স্বামীটির একটু সুমতি হইল অমনি শনিগ্রহ আর একজনকে ভর করিয়া আবার আসিয়া জুটিবে না কি? তাড়াতাড়ি মধ্যস্থ হইয়া কহিয়া উঠিলেন, "ওমা তা আর পছন্দ হবে না তুমি নিজে চোখে দেখে পছন্দ করচ; সে জায়গায় আমরা মুখ্যু সুখ্যু মেয়ে মানুষে কি বেশি বুঝবো না কি, কি বলিস্ ঠাকুর ঝি? ও দিব্যি হবে, ঐখানেই তুমি ঠিক করে ফ্যালো; অনর্থক দেরি করো না।"

বিন্ধ্যবাসিনী এই ওকালতির পর আর মুখ ফুটিয়া ইচ্ছা অনিচ্ছা জ্ঞাপন করিতে সাহসী হইলেন না, শুধু অল্প মৃদুস্বরে ভাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "খরচ পত্র কি রকম লাগবে কিছু বুঝেছেন?"

ভক্তিনাথ কহিলেন, "তা কিছু তো লাগবেই, সাত আটশো টাকা খরচ করতে হবে, তাই যদি তোমার মনে বেশী লাগে ভেবে দেখো, টাকা আমি যে করে পারি জোগাড় করে তুলবো।"

এই বলিয়াই তিনি মুখ হাত ধুইবার জন্য বাহিরের দিকে ফিরিলেন, গলাটা ঈষৎ বুজিয়া আসিয়াছিল, চোখ দুইটা ছল ছলে হইয়া আসিয়াছিল; আত্মীয়-বর্জ্জিত-প্রবাসে অনাথার মত যে বোন শিশুকন্যাকে ফেলিয়া

জন্মের মত চলিয়া গিয়াছে তাহাকেই মনে পড়িতেছিল।

কিন্তু টাকার কথাটা বড় বধূর মনে তেমন মোলায়েম ঠেকিল না। স্বামীকে যে ওই বাপেখেদানে মেয়েটা একেবারে গলায় আঁকসি দিয়া টানিবে ইহা কোনপ্রাণে তিনি সহিবেন? ওরে বাপরে! এমন অলক্ষণে মেয়েকেও ঘরে স্থান দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহার বাছাগুলি এইবার রাস্তার ভিখারী হইল!

দুঃখে অভিমানে কাঁদিয়া রাগিয়া তিনি বাড়ী মাথায় করিলেন, ভক্তিনাথকে এই সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে বলিতে গেলে তিনি অত্যন্ত গম্ভীর মুখে উত্তর করিলেন, "মেয়ে বড় হয়েছে, সুপাত্র ত্যাগ করিব না।" সেখানে হাজার মাথামুড় খুড়িয়াও আর হুকুম টলিবে না জানিয়া সমুদয় ঝাল যে সহিতে বাধ্য তাহার প্রতি ঝাড়িতে তিনি চিরদিনের মত আজও দ্বিধা করিলেন না। গৌরীর প্রতি শাসনদণ্ড উদ্যত করিয়া ক্ষতি পূরণ চাহিতেছিলেন, কিন্তু হায়, জগতে যেমন হাসি মুখে, তেমনি রাঙ্গা চোখে কিছুতেই অর্থ প্রসব করিতে পারে না।

সত্য দেশে ফিরিয়া নিজের দলের লোকদের নিকট সংবাদ পাইল গৌরী আজকাল আর তাহাদের দলে ভিড়িয়া আম বাগানে, জাম বাগানে ঘুরিতে পায় না, মাছ ধরার পাঠ তো সে বিহীনে এক প্রকার উঠাইয়া দিতেই হইয়াছে। শুনিয়া সত্যর মনে অত্যন্ত আনন্দ হইল, হুঁ. সে দেশে নাই, গৌরী কি সুখে খেলার দলে মিশিবে? এইবার সে এখনি গিয়া তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া সকল লোককে তাহার প্রভুত্বটা একবার দেখাইয়া দিতেছে দেখ না! সদম্ভে সে ভট্টাচার্য্য বাড়ীর দিকে তাহার পবন গতিকে চালাইয়া দিল। সঙ্গীরা অবিশ্বাসে মাথা নাড়িয়া বলিল "মাসির চোখে ধূলো দেওয়া যায়, মামীর চোখ উটের চোক, দেখা যাক্ উট চোক বোজেন কি না বোজেন।"

খিড়কির দোরে ঘা পড়িল, জানালায় ঢিল পাটকেলের কাঁড়ি জমা হইল কিন্তু সঙ্কেত সফল হইল না। রান্না ঘরের পাশ দিয়া সশব্দচরণ কোন পঠনশীল সুবোধ বালক গোশব্দের শব্দরূপ উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি করিতে করিতে নাহোক পঞ্চাশবার আনাগোনা করিল, কিন্তু তাহাতে অদূরস্থ গোগৃহের মধ্যে গাভীদলের অজ্ঞাত চেতনা উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়া নীরবে সাড়া দিতেছিল কিন্তু গৌ অক্ষরযুক্ত নামধারী কোন নর বা নারীর চিহ্ন মিলিল না। কেবল ভিতর হইতে কর্কশ কণ্ঠের একটা সাড়া পাওয়া গেল, "হ্যাপলা হ্যাথ্‌তোরে কোন্ হতচ্ছাড়া ছোঁড়া পাঁদারে বিদ্যে ছড়াতে এসেচে, কাণ ঝালাপালা করে তুল্লে!"

সম্বোধিত হ্যাপলার বহিরাগমনের পূর্ব্বেই সে পাড়ি গুটাইল, ক্রোধে ক্ষোভে সঙ্গীদলে সেদিন আর সে মিলিল না।

বাড়ীর ভিতরে তখন মধ্যাহ্নিক বিশ্রামে বড় বধূ কাঁথার উপর বিচিত্র বর্ণের সূতা দিয়া পদ্মফুল তুলিতেছিলেন, আর বিন্ধ্য মাতৃ দৃষ্টান্তানুসারে কাচা কাপড়ে ঠাকুর আরতির দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতেছিল, তাঁহাদের খাওয়া দাওয়া সমাপ্ত হইবার পর সূর্য্যপাটে বসিতে আর অধিক বিলম্ব থাকে না।

১৯

গৌরী মাসীর নিকটে সদ্য র্ভৎসিত হইয়া তাঁহার দুইটি আব্দারে শিশুকে ঘরে লইয়া গিয়া ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করিতেছিল এমন সময় মঙ্গলা গাইটা দড়ি ছিঁড়িয়া উঠানে দাপাদাপি করাতে সদল বলে জানালার নিকট আসিয়া হাসিয়া কুটিকুটি হইল। সত্যর সাড়া আসিতেই বড়বধূ বলিলেন "ওই হলো গো ঠাকুজ্জি! দস্যি মেয়েকে সামলান দায় হবে, গৌরি, গৌরি ওকি হচ্ছে?"

এমন সময় সহসা সম্মুখে নজর পড়িল—ঘরের ভিতর দিয়া গৌরী পদাঙ্গুলে ভর করিয়া খিড়কির দিকে চলিয়াছে। বড়বধূ তর্জ্জন করিয়া উঠিলেন "অমন মেয়ের আবার বে দেওয়া কেন? গাঁয়ের চৌকিদার করে দিতে হয়। দেবে শাশুড়ি দুদিনে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে তখন টেরটি পাবেন সব, যেমন নাই দিয়ে দিয়ে মেয়েকে মাথায় তুলচেন।" বিন্ধ্যবাসিনী কঠিন স্বরে ডাকিলেন "গৌরি!"

গৌরীর মাথার উপরে যে ঘোরতর একটা দুর্দ্দিন বজ্রপাতের মত আকস্মিক পতনের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল তাহা সে ইহারি মধ্যে উপলব্ধি করিতেছে। প্রথমতঃ দিদিমা দাদাবাবু বিহনে এ বাড়ীতে তাহার অবস্থার যথেষ্ট বদল হইয়াছিল। তাহার উপর আবার বিবাহ! বনের চপল হরিণীকে ধরিয়া শিকল দিয়া বাঁধিবার এ চেষ্টা কেন? সে কনে দেখা দিবার কালে খিড়কি দিয়া বাহির হইয়া প্রথম দিনটা ঘোষেদের বাড়ীর গোয়াল ঘরের কোণে লুকাইয়া আত্মরক্ষা করিল, কিন্তু সেদিন বাড়ী ফিরিলে লাঞ্ছনার সীমা রহিল না, ভক্তিনাথ শুদ্ধ সেদিন গম্ভীর মুখে শাসন করিতে আসিয়া বলিলেন "ছি; মা অমন কাজ করতে নেই" এইটুকু বলিতেই সহসা তাহার অসহায় মুখচ্ছবি নেত্রে পড়িয়া তাঁহাকে ব্যথিত করিয়া তুলিল, আর কিছুই বলা হইল না। বড়বধূ কহিলেন, "ভুগবেন—নিজেরাই ভুগবেন।" গৌরী যখন বুঝিল আর নিষ্কৃতি নাই সেই যে তাহার দুই চোখ দিয়া অজস্র ধারা নামিল তাহা আর থামিল না। আর একজন মাত্র তাহার এই অসহায় রোদনের সঙ্গী ছিলেন, তিনি তাহার মাসিমা বিন্ধ্যবাসিনী। এবিবাহ কেন কে জানে কিছুতেই তিনি মনে ধরাইতে পারিতেছিলেন না। অথচ ইহাপেক্ষা ভাল পাত্র আনিতে মূল্যও ভালরূপ প্রয়োজন। বিন্ধ্য জানেন এ সংসার হইতে তাহা ব্যয় করা অসম্ভব, এই কয়েকশত টাকা সংগ্রহ করিতেই ভাইকে বেগ পাইতে হইতেছে। অগত্যাই নিরুপায় বিধবা হরিদ্রা ও কালি-রঞ্জিত বসনাঞ্চলে তাঁহার অশ্রু ভারাক্রান্ত চক্ষুদ্বয় নিঃশব্দে মুছিয়া ফেলিয়া সাবধানে ডালের হাঁড়িতে জিরার ফোড়ন ছাড়িয়া দিলেন। সারাদিন বরং কোনপ্রকারে কর্ম্ম কার্য্যের মধ্যে উথলিত অশ্রুপ্রবাহ রুদ্ধ রাখা চলে, কিন্তু গভীর রাত্রির কর্ম্মহীন অবকাশের মধ্যে শব্দহীন অন্ধকারে নিদ্রিতা বালিকার নিশ্চিন্ত আলিঙ্গনের নিবিড় বেষ্টনে সে অশ্রু আর বাধা মানিতে চাহে না, গৌরী সেই তপ্ত অশ্রু স্পর্শে কোন দিন জাগিয়া উঠিয়া বুকফাটা বেদনায় কাঁদিয়া উঠিয়া বলে "ওগো মাসিমা আমার বিয়ে দিওনা গো দিওনা আমি তাহলে মরে যাবো।' বিন্ধ্যবাসিনী দুইহাতে তাহাকে বুকে টানিয়া রুদ্ধশ্বাসে

বলিয়া ওঠেন "থাম্ আবাগি থাম্ আমায় অমন করে আর পোড়াস্‌নে।"

এই আগত বিচ্ছেদের ব্যথা উভয়কেই যেন নিদারুণ শূলব্যথার মত কষ্ট দিতেছিল। গৌরী যে ধনবানের কন্যা হইয়াও অর্থাভাবে যোগ্য পাত্রের হাতে পড়িলনা এই দুঃখ আরও বেশি তাহার মাসিকে বিঁধিতেছিল। তাহার উপর ইহার গৃহকর্ম্মে অনভিজ্ঞতা, নারী জনোচিত লজ্জাশীলতা, গাম্ভীর্য্যের একান্ত অভাব। এ চিন্তাতো বড় সামান্য চিন্তা নয়, কে তাঁহার এই চঞ্চল মৃগশাবককে করুণার চক্ষে চাহিয়া ক্ষমা করিবে? বড় বধূ স্বামীকে ডাকিয়া বলিলেন "এই যে সর্ব্বস্ব পণ করে ভাগ্নির বে দিচ্চ এদিকে মাসি বোনঝির চোখেতো বান ডেকেচে, কোনদিন বা বাড়ীবাগান ভাসে!"

ভক্তিনাথ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন? বিন্ধ্যর কি এ পাত্র পছন্দ হয়নি?"

বড়বধূ এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর না দিয়া কহিয়া উঠিলেন "হয়েচে কি না হয়েচে তা সে আমায় বলেচে নাকি? আমিতো আর জান্ নই যে জান্‌ব।"

"তবে শুধু শুধু মানুষের নামে লাগাতে এসোনা,—কি গ্রহ! মেয়ের বিয়ে দেবে—চিরদিন মানুষ ক'র্‌লে—কাঁদবে না সে? তোমার মতন তো পাষাণী নয়।"

ভক্তিনাথ বিরক্তভাবে চলিয়া গেলেন। বড়বধূ রাগ করিয়া উপরের ঘরে গিয়া শুইয়া রহিলেন, ননদ আসিয়া না সাধিলে সেদিন আহার করিলেন না। এক মার পেটের ভাইবোন তো, একজনকে না আঁটিতে পারিলে অপরজনের উপর কেনইবা শোধ না তুলিবেন?

যেদিন সত্য গৌরীকে ডাকিতে আসিয়া একাই ফিরিয়া গেল গৌরীর পক্ষে সেদিনের মত কষ্টের দিন এপর্য্যন্ত আর আসে নাই। মাসিমার সমুদয় উপদেশ ভর্ৎসনার মধ্য হইতে নিজের বিদ্রোহিচিত্তকে রুদ্ধ করিয়া সে পাথরের মত বসিয়া রহিল, কিন্তু অনেকক্ষণ পরে যখন বিন্ধ্য কাছে আসিয়া "রাণু মা উঠে এসোমা" বলিয়া ডাকিয়া গায়ে হাত দিলেন তখন সে আর রাগ করিয়া থাকিতে পারিল না, তাহার অজ্ঞাতে কেমন করিয়া মনটা গলিয়া উঠিল, উঠিয়া হঠাৎ মাসিমার কণ্ঠলগ্ন হইয়া সে উচ্ছ্বসিত স্বরে কহিল "আমি ভারি দুষ্ট মাসিমা না?"

"না মা, তুমি আমার সোনা মেয়ে, "এই বলিয়া মাতৃস্বসা দুই হাতে তাহার মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া তাহাকে চুম্বন করিলেন। তারপর ত্বরিৎদৃষ্টিতে চারিদিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন বড়বধূ দেখিতে পাইয়াছেন কিনা, এখনি বলিবেন 'ঐ করেই তুমি মেয়েটার মাথা খেলে! কি করিবেন? মা-হারা সন্তান যে মানুষ করিয়াছে সে-ই জানে, কেমন করিয়া সে পালয়িত্রীকে আকুল করে। বিশেষ এই কুহকিনী মেয়েটাকে শাসন করা যে কি দায় তাহা তিনিই জানেন।

সারাবেলাটা গৌরী সেদিন মাসিমার কাছে কাছে রহিল। বৈকালে যখন উঁচু খোঁপার চারিপাশে সোনার পুঁটে সাজাইয়া 'বেলফুল' গা ধুইতে ডাকিতে আসিল তখনও সে মনটাকে দুষ্ট ঘোড়ার মত রাশ টানিয়া

ফিরাইয়া রাখিল, মুখ গম্ভীর করিয়া কহিল "না ভাই এখন যাবো না মাসিমার সঙ্গে যাবো, তুমি যাও।"

"ক্যানলো, চল্‌না আজ মন্‌মিছরি শ্বশুর বাড়ী থেকে এসেচে, সত্যদারা এসেচে, যাবিনি?" বড় প্রলোভন, কিন্তু তথাপি মাসিমার সে আদরের শাসনে একটা অলঙ্ঘ্য নিষেধশক্তি নিহিত ছিল, রাণী সংক্ষেপে কহিল "না ভাই বড় হয়েছি।" এক-দিনের মধ্যে সে এতখানি কি বড় হইয়া গেল ইহা না বুঝিয়া বেলফুল রাগিয়া বলিল "বুঝেচি লো, বুঝেচি, বিয়ে তো আর কারু কক্ষণো হবে না, দেখলুম ভাই দেখলুম!" সে মল বাজাইয়া চলিয়া গেল।

এদিকে যত বেলা পড়িয়া আসিতে লাগিল গৌরীর প্রাণের ভিতরটা ততই ছটফট্ আনচান্ করিয়া উঠিতে লাগিল, একবার পুকুরঘাটে যাইতে পারিলে হয়ত সত্যর দেখা পাইতে পারে! সে কি মনে করিতেছে। কত রাগ করিতেছে! বাড়ীতে টেঁকা অসহ্য হইয়া উঠিল। রান্নাঘরের দালানে মাসিমা তরকারি কুটতেছিলেন, সে পিছন হইতে গলাটা জড়াইয়া ধরিল। বিন্ধ্য আচমকা চমকিয়া উঠিয়া বাঁট ছাড়িয়া দিলেন "সর্ব্বনাশি এক্ষণি কেটে খুন হয়েছিলি যে।"

মাসিমার স্বর স্নেহবিগলিত, গৌরী তাঁহার কাণের কাছে মুখ আনিল, "একবারটি—মাসিমা আজকের মতন একবারটি সত্যদাদের বাড়ী যাই না! যাইনা মাসিমা!"

এ কণ্ঠকে অবহেলা করিতে কি মাসিমার সাধ্য আছে? বিন্ধ্য 'না' বলিতে গিয়া বলিয়া বসিলেন "তা যা শীগ্‌গির আসিস্ কিন্তু রাস্তাঘাটে বেড়াস্‌নি, মনে থাকবে?" "খু—উব্" বলিয়া একলম্ফে গৌরী গামছা ও কলসী লইয়া বাড়ীর বাহির হইল, বড়বধূ গৃহান্তর হইতে তাহার পদধ্বনি শুনিতে পাইয়া বিরক্তভাবে কহিয়া উঠিলেন "চলন দেখচো—মেয়ে যেন ঘোড়ার নাচ নাচচেন।"

সত্যদের বাড়ী সত্যর দেখা মিলিল না, কিন্তু সে একটি অপরিচিত সুন্দর মুখ সেখানে দেখিল। এমন মুখ সে আর কখনও বুঝি দেখে নাই, ঈষৎ সঙ্কোচের সহিত কিছুক্ষণ তাহাকে দেখিয়া ক্রমে একটু নিকটস্থ হইল, তারপর হঠাৎ চট্ করিয়া কলসী নামাইয়া তাহার হাত ধরিয়া একেবারে প্রশ্ন করিল "তুমি কে ভাই? কোথা থেকে এলে?"

এই সরল প্রশ্নকারিণী মেয়েটিকে কমলার ভালই লাগিল, সবাই তাহাকে এখানে পরীক্ষার ছাঁদেই যাহা কিছু জিজ্ঞাসা পড়া করিতেছিল, তাহার এতখানি বয়স অবধি অবিবাহিতা থাকা অপরাধের কৈফিয়ৎ লইয়া তাহাকে লজ্জার মাটিতে মিশাইয়া দিতে চাহিতেছিল,—ইহার মধ্যে খোলাখুলির ভাবটা মোটেই থাকা সম্ভব ছিল না। সেটা বলাই বাহুল্য সে তাই এই বালিকাটিকে দেখিয়া যেন একটা সত্য বস্তু পাইয়া আশ্বস্তভাবে সরিয়া আসিয়া কহিল "আমি কমলা, কাশী থেকে এসেচি ভাই, তোমার নাম কি?" "গৌরী গো, গৌরী, আমার নাম তুমি জাননা? সত্যদা তোমায় বলেনি? হ্যাঁগা, সত্যদা কোথা গেল?"

"তুমিই গৌরী? তোমার কথা ঢের শুনেচি বইকি, এসো এসো আমি যে তোমাকেই খুঁজছিলুম।"

কমলাই যখন তাহার পরিত্যক্ত শূন্যকুম্ভ দর্শনে তাহার গা ধুইবার কথা স্মরণ করাইয়া দিল তখন তাহার সহিত গৌরীর বন্ধুত্ব বেশ পাকাপাকি হইয়া গিয়াছে। কমলা খিড়কীর দ্বার পর্য্যন্ত আসিয়া তাহাকে বিদায় দিল, বলিল "কাল এসো।"

'আসবো' বলিতে গিয়া হঠাৎ গৌরীর স্মরণ হইল তাহা পারিবে না, ক্ষুণ্ণমনে সে তখন কহিল "আমার যে ভাই আস্‌বার যো নেই, তুমিই যেওনা।"

কমলা মুখ নত করিয়া ঈষৎ হাসিল "আমি কি এখানে কোথাও যেতে পারি? কেন তোমার আসবার যো নেই ভাই?"

গৌরী কহিল "আমার যে বিয়ে হবে ভাই, তুমি শোননি? মাসিমারা তাই কোথাও যেতে দেন্ না।"

কমলা একথায় কৌতুক অনুভব করিল না, বরং সে যেন সহসা একটা ব্যথা বোধ করিল, কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল "বিয়ের কথা শুনিনিতো! কবে বিয়ে?"

"কে জানে, বলি মাসিমাকে যে বিয়ে ফিয়ে দিও না, সে ওরা কিছুতেই শুন্‌বে না।" বলিতে বলিতে দুঃখটা উথলাইয়া উঠিবার উপক্রম করিল দেখিয়া নিজের ঘড়াটা টানিয়া লইয়া ছুটিয়া পলাইল। কমলা বিস্ময় ও ঈষৎ করুণার সহিত চাহিয়া রহিল। বাস্তবে ও কল্পনায়, সংসারে ও পুস্তকে কত প্রভেদ! সে সত্যর নিকট গৌরীর যে চিত্র পাইয়াছিল, এবং আজ তাহার নিজের যে পরিচয় স্বয়ং পাইয়াছে ইহাতে এমন কোন কঠিন চিত্ত ঔপন্যাসিক নাই, যে এই দুটি অনভিজ্ঞ শিশুহিয়াকে একত্র বন্ধনে বদ্ধ করিবার জন্য দুবৎসর প্রতীক্ষা না করিয়া, থাকিতে পারিত! কিন্তু বাস্তব সংসার এসব চাহিয়া দেখে না, বরং কঠিন উপহাসে ভাঙিয়া দলিয়া ষ্টীম রোলারের মত নিজের গতিপথে চলিয়া যায়। গৌরী যখন ঘাটে পৌছিল তখন সন্ধ্যার ছায়া সলিল চুম্বন করিয়াছে, সন্ধ্যার দীপ জলের মধ্যে প্রদীপ শিখার মত স্পন্দিত হইতেছে। বাতাবি লেবুর গাছ-গুলা হইতে অপর্য্যাপ্ত পুষ্পগন্ধ উত্থিত হইয়া নির্জ্জন উদ্যানে সন্ধ্যাচারিণী বনদেবীর মৃদু-নিশ্বাসের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। গৌরীর মনে ভয়ডর নাই, গ্রামের মেয়েরা স্বভাবতঃ সহরের মেয়েদের চেয়ে সাহসী, তাহারা ভূতপ্রেতের কল্পিত অস্তিত্ব মানিলেও একা বনে বাদাড়ে ঘুরিতে ভীত হয় না। তাহা ভিন্ন গৌরী তো বনবিহঙ্গী—গৃহকপোতী নয়। তাহার মনে যে একটা ভয় জাগিতেছিল তাহা ভূতের ভয় নয় তাহাপেক্ষাও বড় ভয়। অনেক দেরী হইয়া গিয়াছে ইহার পর আর কখনও সে মাসিমার নিকট শীঘ্র ফিরিবার গ্যারান্টি দিয়া মুক্তি আদায় করিতে সক্ষম হইবে না, অথচ সত্যদার সহিত দেখাটাও হইল না। এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল "গৌরি!"

"তুমি এলে?" ধড়মড়িয়া সে ফিরিয়া দাঁড়াইল। "কি করে জানলে,—তুমি কি করে জান্‌লে যে আমি এখানে এসেচি? রাগ করনিতো তুমি ঠিক বলচো, সত্যি বলচো?" সত্য শপথ করিয়া বার বার জানাইল সে রাগ করে নাই—বড় মামীকে সে কি চেনেনা? তখন আশ্বস্ত হইয়া গৌরী তাহার পুরাতন সাথীর সহিত নূতন করিয়া

সুখদুঃখের কথা কহিতে বসিল। সে কহিল 'মাছ টাছ ধরা আর হবেনা সত্যদা এক একদিন লুকিয়ে পালিয়ে আসব' খন। রোজ কিন্তু আসতে পাবোনা বড় মুস্কিল!" সত্যর মুখখানার ভাব তাহারই মত সঙ্গীন হইয়া আসিয়াছিল সে কহিল "এসেই বা কি করবি, আমিতো দু এক দিনের মধ্যে দাদার সঙ্গে কল্‌কেতা যাচ্চি।" বলিয়া সে গভীর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। গৌরী চমকিয়া উঠিল "সে কি ভাই! কেন?"

"জানিনা ওঁরাই জানেন। তুই কমলাকে দেখেছিস?"

"হ্যাঁ কমলাতো বেশ!"

"ও কে জানিস্?"

"কমলা, কে? না!"

"আমাদের বউ।"

"তোমার বউ?" বলিতে বলিতে সে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। সহাস্যস্রোত পর্দ্দায় পর্দ্দায় আঘাত করিয়া কাননমধ্যে সঙ্গীতস্রোত হইয়া উঠিল প্রকৃতি যেন এই টুকুরই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন—সৌন্দর্য্য সৌরভের সঙ্গে সঙ্গীত মিশ্রিত হইল। "বড় থাক্‌তে ছোটর বিয়ে! বড় থাক্‌বে গালে হাত দিয়ে! মনীশদার বিয়ে হলোনা তোমার বিয়ে।"

সত্য এ পরিহাসে রাগ করিয়া তাহার আঁট সাঁট বাঁধা গোঁপায় একটা বৃথাটান দিয়া কহিয়া উঠিল "হবেতো হবে, তোর কি!"

গৌরী অনেকক্ষণ ধরিয়া হাসিয়া যখন থামিল তখন হঠাৎ তাহার চোখ দুইটায় জল আসিয়া পড়িয়াছে, একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সে মুখ নীচু করিয়া জলের দিকে চাহিল। সত্য তাহার গালে একটা চড় মারিবার জন্য হাত তুলিয়া কি ভাবিয়া সহসা তাহা সম্বরণ করিয়া, হাসিতে হাসিতে কহিল "ওরে হিংসুক! আমার বিয়ে নয় রে দাদার বিয়ে! তোর যা বিস্তে হচ্চে রাণি, কেউ তোকে বিয়ে করবে না দেখিস্! বড় থাকতে কখন ছোটর বিয়ে দেখেছিস তুই?"

এত বড় অপমানের কথাটা সত্যর মুখ হইতে বাহির হইবামাত্রেই সে হাসিয়া উঠিয়া সগর্ব্বে কহিল! "ইঃ হবে না ত কি? সবতো ঠিক্।"

এবার শ্রোতার মুখে সেই ঈর্ষার ছায়া খানা আসিয়া পড়িল কিনা অন্ধকারে ঠিক দেখা গেল না।

অভিসারিকা

কাটেনা যামিনী কেগো অভিসারে
চলেছে মাধব-আশে?
নিখিল নয়নে যবনিকা ধরি
কুয়াশা নামিয়া আসে!

কোমল পায়ের করুণ পরশে
বনের শুকান পাতা,
মর মর সুরে গাহিছে চরণে
শ্যাম-বিরহের গাথা!

চন্দ্রাবলী আজ নাহি আর সাথে
বিশাখা আসেনা কাছে,
নিবিড় তিমিরে বনপথ রেখা
কোথায় মিলায়ে আছে ?

ঝিল্লী মঞ্জীর থামিল সহসা
কানন নীরব হয়,
হায় একাকিনী বিরহিণী নারী
কে তারে দেখালে ভয় !

কাঁপিছে বক্ষ চরণ অবশ
আধেক পথের পরে—
তবে কি ফিরিবে ব্যর্থ ব্যথায়
হতাশে শূন্য ঘরে ?

পথে বসে আজ বিবশা রমণী
ফেলিছে চোখের জল,
বিহ্বল শ্বাসে মুদিল নয়ন
আকাশে তারকাদল !

শিশির বাতাসে নীলিমা আঁচল
অঙ্গে জড়ায়ে আসে,
বাসক সজ্জা অলকের ফুল
ঝরিছে পথের পাশে !

কুঞ্জ কোথায়, কই বাতায়নে
ইঙ্গিত দীপালোক ?
সঙ্কেত বেণু কেন গো বাজেনা
হরিয়া সকল শোক !

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

চীন দেশের ধর্ম্ম

চীন দেশে তিনটি ধর্ম্মের প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ, কনফুসীয় ও তাওই ধর্ম্ম। তন্মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাবল্যই অধিক পরিলক্ষিত হয়। কনফুসীয় ধর্ম্মাবলম্বীরা পণ্ডিত সম্প্রদায় বলিয়া উল্লিখিত। তাউই ধর্ম্মের প্রধান দেবতা ধ্রুব নক্ষত্র। কনফুসীয় মতাবলম্বীরাও উক্ত দেবতার পূজা করিয়া থাকেন। বৌদ্ধদিগের এক দেবতা আছে, তাহাকে ষষ্ঠী বা করুণা দেবী বলে। আমাদের দেশের ষষ্ঠীদেবীর সহিত ইহার খুব সাদৃশ্য আছে। লোকে পুত্রকামনায় এই দেবীকে পূজা দিয়া থাকে; পণ্ডিত সম্প্রদায়ীরাও পুত্রার্থে ইহাকে পূজা করেন। আমাদের দেশে এক ধর্ম্মভুক্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষভাব এমন প্রবলভাবে বর্ত্তমান যে লোকমত এক হইবার কোন উপায় নাই। চীন দেশে বিভিন্ন তিনটি ধর্ম্মের অস্তিত্ব থাকিলেও উহা এরূপ ভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে, সকল লোকেই ঐ তিন ধর্ম্মের আচার অনুষ্ঠান পালন করিয়া থাকে, সুতরাং কে যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায় না। ইহা ছাড়া পিতৃপুরুষগণের পূজাকেও লোকে ধর্ম্ম বলিয়া মানে এবং প্রত্যেকেই অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত এ রীতি পালন করিয়া থাকে। কনফুসিয়াও মৃত ব্যক্তিকে সম্মান প্রদর্শনের ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন।

আদিম চীনেরা 'সাংতি' নামে এক দেবতার পূজা করিত। 'সাংতি' শব্দের অর্থ 'মহান স্বর্গ বা ঈশ্বর'। চীনের ধর্ম্ম

গ্রন্থে উক্ত দেবতার বিষয় এইরূপ উল্লেখ আছে। 'তুমি স্বর্গ, মর্ত্ত্য এবং মনুষ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা, তোমার সৃষ্টি শক্তিতেই এই সকলের উদ্ভব হইয়াছে।' কথিত আছে সম্রাট হোয়াংতি খৃঃ পূঃ ২৬৯৭ সালে এই দেবতার এক মন্দির নির্ম্মাণ করেন, পরবর্ত্তী সম্রাটগণ এই মন্দিরে আরাধনা করিয়া আসিতেন। পিকিন নগরের চীনা সহরে অর্দ্ধক্রোশব্যাপী এক উদ্যানে 'স্বর্গ মন্দির' নামে এক মন্দির আছে। বৎসরের প্রারম্ভে এই মন্দিরে পূজা দিয়া সু-বৎসরের জন্য প্রার্থনা করা হয়। বিবিধ অনুষ্ঠানসহ এখানে পূজোপহার প্রদত্ত হইয়া থাকে। সম্রাট সাম্রাজ্যের প্রতিনিধি স্বরূপ একাকী যাইয়া মন্দিরে ঈশ্বরের আরাধনা করিতেন। এখানে পৌত্তলিকতার লেশ মাত্রও নাই। মন্দিরটির ছাত নীলবর্ণ টালি দ্বারা আচ্ছাদিত। বৎসরের মধ্যে তিন বার বা কখন কখন ৪।৫ বার সম্রাট এই মন্দিরে উপাসনা করিতেন। মন্দিরের নিকটেই একটি বাটী আছে তাহার নাম 'অনশন ভবন'। পূর্ব্বদিন বৈকাল বেলা সম্রাট মন্ত্রিগণ ও করদ রাজগণসহ উক্ত মন্দিরে যাইয়া উপবাস ও উপাসনায় রাত্রি যাপন করিতেন তজ্জন্যই উহার ঐরূপ নামকরণ হইয়াছে। মন্দিরে শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত একটি বেদী আছে। সাতাইশটি ধাপ অতিক্রম করিয়া এই বেদীতে উঠিতে হয়। প্রাতঃকালে সম্রাট অগ্রে গিয়া বেদীতে আরোহণ করেন। বেদির নাম 'স্বর্গ বেদী।' মন্দিরে 'সাংতি' দেবের একখানি প্রস্তরফলক আছে, সেইখানির সম্মুখে সম্রাট সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করতঃ রীত্যনুযায়ী নৈবেদ্য উৎসর্গ এবং স্তবস্তুতি করেন। সাংতির নিকট দেশের জন্য মঙ্গল প্রার্থনাই এই স্তবের উদ্দেশ্য। এই মন্দিরে সম্রাট অথবা রাজকীয় পরিবারাদি ভিন্ন অন্য কেহ উপাসনা করিতে পারে না অথবা বেদীতে উঠিতে পারে না, প্রজাগণের সে অধিকার নাই।

কন্‌ফুসীয় সম্প্রদায়

খৃঃ পূঃ ৫৫১ সালে শিক্ষাগুরু কুং জন্মগ্রহণ করেন। পারিবারিক প্রাচীন রীতি অনুসারে তাঁহার নাম কন্‌ফুসিয়াস বলিয়া আখ্যাত। তিন বৎসর বয়সে কন্‌ফুসিয়াস পিতৃহীন হইয়া, মাতাকর্ত্তৃক সযত্নে লালিত পালিত হন। বাল্যকাল হইতেই বিদ্যাশিক্ষার প্রতি তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ এবং দেশের প্রাচীন ব্যবস্থার প্রতি অচলা ভক্তির পরিচয় পাওয়া যাইত। ঊনত্রিংশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার বিবাহ হয়। বিদ্যা-চর্চ্চার অন্তরায় ভাবিয়া তিনি চারিবার স্ত্রীত্যাগ করেন। কনফুসিয়াস তেইশ বৎসর বয়সের সময় গোচারণ মাঠের ও পশুপালের প্রধান তত্ত্বাবধারকের পদে নিযুক্ত হন, সেই সময়ে তাঁহার মাতা পরলোক গমন করেন। দেশের প্রথানুসারে তিনি সরকারী কার্য্য ছাড়িয়া দিয়া মহা আড়ম্বরের সহিত তাঁহার মাতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করতঃ তিন বৎসর দিবারাত্র নির্জ্জনে বাস করিয়া দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করেন। কথিত আছে এই সময়ের মধ্যে তিনি অপর কাহারও সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করেন নাই। কন্‌ফুসিয়াস মৃতব্যক্তির সমাধিস্থল বা গৃহের

কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে মৃতদিগের আরাধনা করিবার বিধি দিয়াছেন। গৃহের যে স্থানে এইরূপ আরাধনা হয় চীনেরা উক্ত স্থানকে অতি পবিত্র বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকে। আমাদের দেশে যেমন চণ্ডিমণ্ডপ বা পূজার নির্দ্দিষ্ট ঘর থাকে চীনেদেরও তদ্রূপ পিতৃগণের আরাধনার নিমিত্ত "পিতৃগণের কক্ষ" বলিয়া একটি কক্ষ নির্দ্দিষ্ট থাকে। আমাদের মধ্যে যেমন বাৎসরিক শ্রাদ্ধের দিনে পিতৃগণের উদ্দেশে পিণ্ডদান এবং লোকজন খাওয়ান হয় চীনেরাও সেইরূপ বৎসরান্তে পিতৃতিথিতে ঐরূপ ভোজের সহিত নানা সামগ্রী উপহার প্রদান করিয়া থাকে, কিন্তু পিণ্ডদান করে না। তাহাদের মধ্যে পিতৃমাতৃভক্তি অতুলনীয়, আমাদের মধ্যে তাহার কণামাত্রও নাই।

কনফুসিয়াস নিজে 'সাংতিকে' মানিতেন কিন্তু তাহার পূজা করিতেন না। তিনি মনুষ্যের ঐহিক মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রাখিতেন এবং তদনুযায়ী সরল এবং সৎপথে থাকিয়া মানুষ যাহাতে সমাজের মঙ্গলকার্য্যে ব্রতী হয় সেইরূপ শিক্ষা দিতেন। তাঁহার মত এই, মানুষ যখন জন্মে তখন সৎ এবং গুণবান থাকে, অতএব সাবধানে ও আত্মসংযমপূর্ব্বক উক্ত গুণাবলীর চর্চ্চা করিলে লোকে দেবতুল্য জ্ঞানী এবং স্বর্গের উপযুক্ত হইতে পারে, তদ্বিপরীতে মনুষ্যাধম রূপে পরিগণিত হয়।

তাঁহার শিক্ষার মূলসূত্র এইরূপঃ 'মানুষ সর্ব্বাগ্রে আত্মশাসন করিবে, পরে পরিবারস্থ সকলের শাসন করিবে। সন্তান পিতাকে যেরূপ প্রেমভক্তি করে, দেশের রাজাকে তদনুরূপ ভক্তি শ্রদ্ধা করিবে, কারণ সম্রাট প্রজাগণের পিতাস্বরূপ, এইরূপ করিলে গার্হস্থ্য শান্তি, সামাজিক শৃঙ্খলা এবং রাজ্যের রক্ষণ এবং উন্নতি সাধিত হয়।' এই নীতিমূলে চীনদেশে আবহমানকাল শান্তি বিরাজ করিতেছিল।

কিছুকাল শোকসন্তপ্তচিত্তে কাল কাটাইবার পর কনফুসিয়াস কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। তিনি নানা রাজ্যে ভ্রমণ করেন, অনেক রাজা রাজ্যের সুব্যবস্থার জন্য তাঁহাকে নিযুক্ত করেন, তিনি এইরূপে অনেক রাজ্যেরই আর্থিক ও নৈতিক উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমাগত তের বৎসরকাল বিভিন্ন রাজ্যে পরিভ্রমণ করিয়া দেখিলেন কেহই তাঁহার সুপরামর্শমত কাজ করেন না এবং লোকেও তাঁহার কথায় তেমন আস্থা স্থাপন করে না, তখন তিনি নিতান্ত দরিদ্র অবস্থায় স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অনেকস্থলে তিনি অযথা উৎপীড়নও সহ্য করিয়াছেন, একস্থানে তাঁহাকে কারারুদ্ধ পর্য্যন্ত হইতে হইয়াছিল। দেশে ফিরিয়া তিনি ভাবিলেন, যদি উপদেশপূর্ণ পুস্তক লিখিয়া যাই তাহা হইলে ভবিষ্যবংশীয়দের উপকার হইতে পারে। এই স্থির করিয়া জীবনের অবশিষ্টাংশ পুস্তক রচনায় অতিবাহিত করিয়া ৭০ বৎসর বয়সে খৃঃ পূঃ ৪৭৯ সালে মানবলীলা সম্বরণ করেন। যেমন হইয়া থাকে 'দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝা যায় না', তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে লোকে কনফুসাসের কার্য্যাবলীর প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে আদর করিতে আরম্ভ করিল। তদবধি লোকে তাঁহার প্রতি অশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়া আসিতেছে, তাঁহার বংশাবলী অদ্যাপি

বর্ত্তমান আছে, তাহারা আজ প্রায় ৭১ পুরুষ ধরিয়া নানা উপাধি ও সম্মানলাভ করিয়া আসিতেছে। এক্ষণে তাঁহার সমাধিস্তম্ভ চীনবাসীদের মহাপুণ্যতীর্থ। তাঁহাকে লোকে এক্ষণে দেবভাবে দেখিয়া থাকে, তাঁহার নামে প্রায় সকল নগরেই লোকে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছে। চীনেদের প্রত্যেক কলেজেই কনফুসিয়াসের স্মরণার্থ প্রস্তরফলক অতি পবিত্রভাবে রক্ষিত হইয়াছে, চীনের যে কোন প্রধান ব্যক্তি কলেজ পরিদর্শনে গমন করেন তিনি উক্ত প্রস্তরফলকের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া প্রার্থনা করেন "হে সিদ্ধপুরুষ, তুমি মহান, তুমি সকল গুণের আধার, তোমার শিক্ষা নির্দ্দোষ, মনুষ্যলোকে তোমার তুল্য কেহ নাই, রাজগণ তোমাকে মান্য করিয়া আসিতেছেন, এই কলেজে তুমিই আদর্শদেবতা,—ভক্তিভাবে পূজোপহার প্রদান করিতেছি তুমি গ্রহণ কর।"

শ্রীআশুতোষ রায়।

আমার বোম্বাই প্রবাস *

(১)

বোম্বাই যাত্রা

আমি সিবিল সর্ব্বিস্ পকেটে ক'রে ১৮৬৪ সালের শেষভাগে ইংলণ্ড হতে দেশে ফিরলুম। পথের মধ্যে একবার ইটালীর বিখ্যাত পুরী Florenceএ নেমে আমার বন্ধু Pulzky'র বাড়ীতে সপ্তাহকাল যাপন করা গেল। ইংলণ্ডে Dr. G.—র ছাত্রাবাসে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ, তিনি তাঁর পিতার ভবনে আমাকে সাদরে ডেকে নিয়ে আতিথ্য-দান করলেন। পুলজ্কীরা হঙ্গরি জাতীয় সম্ভ্রান্ত বংশের লোক; তাঁদের সঙ্গে আমাদের অনেক বিষয়ে চরিত্রগত মিল দেখা গেল। তাঁদের রীতি নীতি দেখে মনে হত তাঁদের ঘর যেন পূর্ব্ব পশ্চিমের সন্ধিস্থল, আমাদের মত কতকটা ঢিলেঢালা সাদাসিদে ভাব অথচ পশ্চিমেরও বিশেষত্ব আছে। Pulzky'র পিতা ভারতবর্ষের কলাকৌশলের নিদর্শন বিবিধ সামগ্রী সংগ্রহ করেছেন ও আমাদের দেশের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জানাতেন, বলতেন ইণ্ডিয়া আমার স্বপ্ন-রাজ্য। Florence নগরীর চিত্রশালা প্রভৃতি যা যা দ্রষ্টব্য দেখতে দেখতে ঐ হঙ্গরীয় পরিবার মধ্যে সপ্তাহকাল সুখস্বচ্ছন্দে অতিবাহিত হল। নগরের মধ্যে কত উৎকৃষ্ট ফলের বাগান, আমরা আঙ্গুর ও আঞ্জীর (Fig) পেড়ে খেতুম—সে যে কি মিষ্টি লাগত কি আর বলব! পুলজ্কী পরিবারের একটি বালিকা আমার এমন ন্যাওটো হয়েছিল সে কিছুতেই আমাকে ছাড়তে চায় না—তাকে আমি দু একটি বাঙলা গান শিখিয়েছিলুম—শেষে কত চোখের জল ফেলে আমার কাছ থেকে বিদায় নিলে! সেই ছবিটি এখনো আমার মনে অঙ্কিত আছে। Florence হতে

---

* এই ভাগের অনেক কথা আমার প্রণীত "বোম্বাই চিত্র" হইতে সংগৃহীত।

Pisa—Pisaর লীনস্তম্ভ (leaning tower) দর্শন করে জিনিবায় এক পূর্ব্বমুখী ষ্টীমার ধ'রে যথাসময়ে কলকাতায় এসে উত্তীর্ণ হলুম।

বাড়ী এসে আত্মীয় স্বজনের সহিত দেখা সাক্ষাৎ, বন্ধুবান্ধবদের অভিনন্দনের মধ্যে সময়টা বিদ্যুৎবেগে চলে গেল। আমাদের বড়লাট তখন Lord Lawrence, ছোটলাট Sir Cecil Beadon—দুই কর্ত্তারই দর্শন স্পর্শন মিষ্টভাষণ লাভ হল। প্রথম সিবিলিয়নকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে বেলগেছে (হায় সে বাগান আর আমাদের নাই) এক বিরাট সভা আহূত হল, সেখানে কলকাতার গণ্যমান্য অনেকে উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে আমার ইংলণ্ড প্রবাসের অনেক কথা বার্ত্তা হল। তখন মনে মনে অহঙ্কার হল যেন কি একটা দুর্লভ রত্ন আমার করতলন্যস্ত হয়েছে। এই সকল মায়া কাটিয়ে নবেম্বর মাসে আমি ও আমার স্ত্রী—আমরা দুটিতে ষ্টীমারে চড়ে বেরিয়ে পড়লুম। সে সময়ে বোম্বাই ও কলিকাতার বন্ধনী রেলগাড়ী ছিল না, প্রধানতঃ সমুদ্রের উপর দিয়েই গতিবিধি। মাঝে মাঝে এক এক স্থানে পাথের সংগ্রহ করা, বাণিজ্য দ্রব্যের আদান প্রদান, এই রকম করে আমাদের জাহাজ থেমে থেমে চলতে লাগল, বোম্বাই পৌঁছতে আমাদের প্রায় ১ মাস অতীত হয়ে গেল। মান্দ্রাজে নেমে মুদলিয়ার নামে একটি সম্ভ্রান্ত মান্দ্রাজীর বাড়ীতে উঠলুম। জাহাজেই তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়। তিনি নিরামিষভোজী, ইংলণ্ডে তাঁর অন্নকষ্টের গল্প করতেন, দুধ ও ফলারের উপরেই অধিকাংশ নির্ভর করে কষ্টশ্রেষ্টে কোনমতে দিনপাত করতে হত। য়ুরোপে আমাদের জাতের নিয়ম রক্ষা করে চলতে হলে যে কি কষ্ট যে ভুক্তভোগী সেই জানে। মুদলীয়ার বেশ ইংরাজি বলেন, তাঁর সঙ্গে মন খুলে কথা কবার কোন বাধা নাই কিন্তু তাঁর অন্তঃপুরবাসিনী মহিলারা ইংরাজির কোন ধার ধারেন না, না তাঁরা আমাদের ভাষা বোঝেন, না আমরা তাঁদের ভাষা বুঝি, কেবল ইঙ্গিত ইশারায় আমাদের কথাবার্ত্তা চলত। তাঁদের সব ঘরাও বন্দবস্ত আমাদের পছন্দসই ছিল না কিন্তু তাঁরা যথাসাধ্য আমাদের আতিথ্য সংকারের কোন ত্রুটি করেন নাই। আহার সামগ্রী কলাপাতের উপর সাজানো, ডাল ভাত চাটনী তরিতরকারী দধি পায়স মিষ্টান্ন মিলে আমাদের ভূরি ভোজনের আয়োজন হত।

আমরা যে মান্দ্রাজে নেমে ডাঙ্গায় দুতিন দিন কাটিয়েছিলুম সে আমাদের ভাগ্যি বলতে হবে—জাহাজে ফিরে গিয়ে শুনি যে ইত্যবসরে বরুণ দেবের কোপে ঝড় তুফান উঠে সমুদ্র তোলপাড় হয়ে গিয়েছে, জাহাজের দোলায় যাত্রীরা ব্যতিব্যস্ত, তীর থেকে মধ্যসমুদ্রে জাহাজ নিয়ে যেতে হয়েছিল। আমাদের একটি দাসীর মুখে শুনলুম তাদের দুর্দ্দশার আর সীমা ছিল না। পথে আমাদের আর কোন উপদ্রব হয় নাই। আমরা এইরূপে ধীরে ধীরে বোম্বাই গিয়ে পৌঁছলুম।

বন্দরে উঠে দেখি মাণকজী করসদজী নামক একটি পারসী ভদ্রলোক আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। তিনি আমাদিগকে অভ্যর্থনা করে তাঁদের বাড়ী নিয়ে গেলেন, তাঁদের গৃহে প্রায় ৩ মাসকাল আমরা অতিথি হয়ে রইলুম। সেই অজ্ঞাত সহর, অপরিচিত

লোকের মধ্যে বাস, এই অবস্থায় তাঁর বাড়ীতে স্থান পেয়ে বড়ই সুবিধা হয়েছিল, তাঁদের এই অযাচিত অনুগ্রহ আমাদের পরম ভাগ্য মনে করলুম। তাঁর গৃহে বাস ক'রে বোম্বাই সম্বন্ধে আমাদের অনেক অভিজ্ঞতা জন্মাল; ভাওদাজী, জমসদজি জিজিভাই বাটলীওয়ালা, জগন্নাথ শঙ্করসেট, রাম বালকৃষ্ণ, ডাক্তার আত্মারাম পাণ্ডুরঙ্গ প্রভৃতি খ্যাতনামা লোকদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হল। মাণকজীদের সম্বন্ধে আমার সেই সময়কার এক পত্রে এই রূপ লিখিত আছে—

—মাণকজী করসদজী—

"বোম্বাই গিয়াই এই পরিবারের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ। আমার কর্ম্মস্থলে যাইবার পূর্ব্বে আমি কয়েক মাস সস্ত্রীক ইঁহাদের বাটীতে বাস করি। বাড়ীটা বড় সড় কোটাবাড়ী দোতালা, ইংরাজি ধরণে সাজানো ও কতকগুলি মূল্যবান্ চিত্রফলকে অলঙ্কৃত। বৃদ্ধ মাণকজী গৃহকর্ত্তা, তাঁর দুই কন্যা তাঁহার গৃহ-প্রদীপ। একজন পারসী ভৃত্য—তার নাম জিলা। জিলাকে জরির কাপড় পরাইয়া সাজাইয়া দিলে চাকর মনিবে বড় তফাৎ জানা যায় না। মনিব অপেক্ষা চাকর সুশ্রী ও এক হাত উচ্চ। মাণকজী যেমন আকারে খর্ব্বকায়, স্বভাবেও তাঁর কতকটা তেমনি ছেলেমানুষি জাঁকের ভাব, ঐ ক্ষুদ্র দেহটি আত্মম্ভরিতায় পূর্ণ। কোন কোন লোক আছে —সে আপনার চোখে আপনি মস্ত লোক— সারাদিন সগর্ব্বে পুচ্ছ ফুলাইয়া বেড়ায়, সময় নাই অসময় নাই অবাধে আপনার গুণগান করিয়া যায়, শ্রোতা কি ভাবি-তেছে সে দিকে ভ্রুক্ষেপ নাই; মাণকজী ঐ
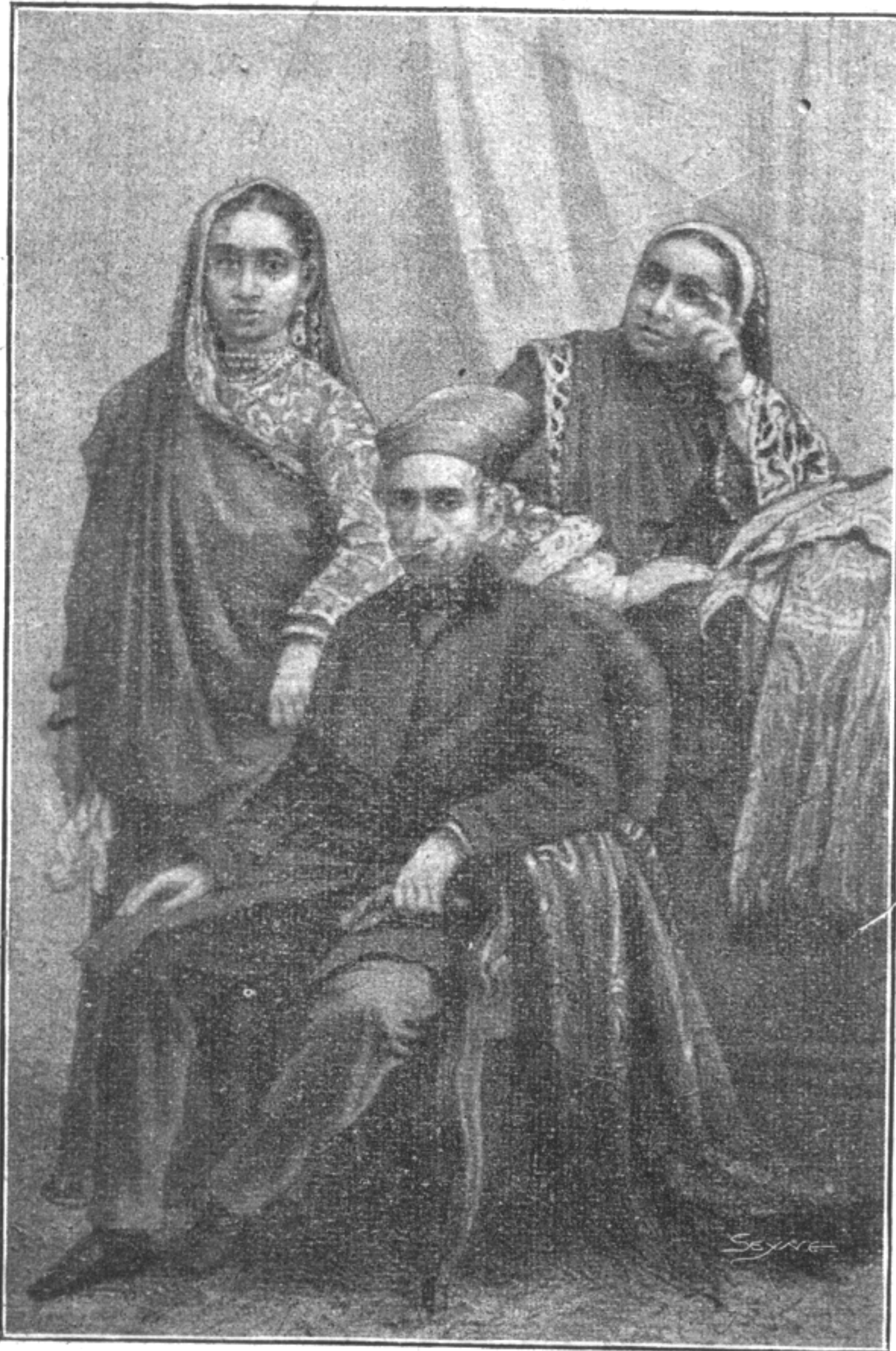
মাণকজী করসদজী ও তাঁহার দুই কন্যা।

ধরণের লোক; বড় বড় ইংরাজ ও রাজা রাজড়ার পরিচিত বলিয়া আপনার পরিচয় দিতে তাঁর বড় আমোদ, য়ুরোপের সমুদায় মুকুটধারী সম্রাটদেরই সহিত তাঁহার গলাগলি ভাব এই ভাবে অনেক সময় তিনি তাঁর য়ুরোপ প্রবাসের গল্প করিতেন। কোন্ লর্ড তাঁহাকে কোন্ পত্র লিখিয়াছিল, তিনি তাহার কি উত্তর দিয়াছিলেন, কোন্ কালে তাঁর কোন্ পামফ্লেট ছাপা হইয়াছিল এই সব আত্ম-কাহিনী শুনাইতে তিনি বড় ভাল বাসিতেন, যে শুনছে সে কোনমতে রেহাই পেলে বাঁচে। মানুষ দোষ গুণে জড়িত, দোষ ধরিতে গেলে কার না ধরা যায়? মাণকজীর অনেক সদ্‌গুণও আছে—সহৃদয় সাদাসিদে সরল অন্তঃকরণ, কেবল সঙ্গে সঙ্গে একটু খামখেয়ালী ভাব মেশান। মাণকজী ইংরাজদের সঙ্গে মিশিতে ভাল বাসিতেন কিন্তু আপনাকে ছোট করিয়া নয়—তিনি তাহাদের খোসামুদে ছিলেন না। এ দিকে যেমন ইংরাজভক্ত তেমনি আবার ইংরাজের সঙ্গে যুদ্ধ করিবারও ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি যখন ছোট আদালতের জজ ছিলেন, তখন গবর্ণর সর বার্টল ফ্রেয়র কোন এক সংবাদ পত্রের রিপোর্ট দৃষ্টে তাঁর কাজের দোষ ধরিয়া তাঁহাকে অপদস্থ করেন। মানকজী শীঘ্র ছাড়িবার পাত্র নন, অনেক লেখালেখির পর যখন দেখিলেন যে এদেশে কোন প্রতিকারের সম্ভাবনা নাই তখন স্বয়ং ইংলণ্ডে গিয়া House of Lords পর্য্যন্ত আপনার মামলা চালাইয়া কাজ ফতে করিয়া ফিরিলেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁর পদহানির ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য হইলেন—শুধু তা নয় তিনি দেশে ফিরিয়া আসিয়া নিজ কোর্টের উচ্চতর আসন অধিকার করিয়া লইলেন। মাণকজী একটি পারসী বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া যুবরাজ-পত্নী আলেকজান্দ্রার নামে তাহার নামকরণ করিয়াছেন। এটি তাঁর বিশেষ যত্নের ধন—তাঁর বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র অবলম্বন। লোক দেখাইবার এই একটি জিনিস পাইয়া মাণকজী হাতে এক কাজ পাইয়াছেন, নতুবা পেন্সন লইয়া নিষ্কর্ম্মার ন্যায় জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইতেন। কোথায় ব্রিটিষ রাজপরিবার, কোথায় বড়লাট সাহেব—কোথায় পোর্ত্তগীজ গবর্ণর জেনেরেল—কোন একজন বড় লোক বোম্বায়ে এলে হয়, অমনি মাণকজী তাঁহাকে ধরিয়া আপনার স্কুল পরিদর্শনার্থে লইয়া যাইতে ব্যস্ত। ঈশ্বরের কৃপায় স্কুলটি এখন ভাল চলিতেছে—ছাত্রী সংখ্যা শতাধিক, তাহাদের প্রায় সকলেই পারসী বালিকা—দুএকজন মাত্র হিন্দু-কন্যা। এই স্কুলের উত্তরোত্তর উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে শুনিয়া আমরা আহ্লাদিত হইয়াছি।

কিন্তু য়ুরোপীয় সভ্যতার খাতিরে বৃদ্ধ মাণকজী তাঁর জরতোস্তী প্রার্থনামালা আবৃত্তি করিতে শৈথিল্য করেন না। প্রত্যহ সকালে উঠিয়া তাঁর জন্দাবস্তার মন্ত্রগুলি আবৃত্তি করেন। বিজির বিজির করিয়া 'মনশ্নি গবশ্নি কোনশ্নি' কত কি মন্ত্রপাঠ চলিয়াছে, তার মাঝে কাজকর্ম্ম হাসি গল্প—তারও কোন বাধা নাই। মনে হয় ইনি একজন গোঁড়া অগ্নি উপাসক।

মাণকজীর দুই কন্যারত্নের গুণের কথা

কি কহিব, তাঁহাদের সহাস্ত সুন্দরমূর্ত্তি আমাদের হৃদয়ে চিরমুদ্রিত থাকিবে। তাঁহাদের যত্ন শুশ্রূষা কখনই ভুলিতে পারিব না। আমার স্ত্রীর সেই প্রথম দূরপ্রবাস। অন্তঃপুরের কারাগার হইতে সহসা স্বাধীন সমাজের পূর্ণ আলোকে পড়িয়া পিঞ্জরের পাখীকে মুক্তআকাশ, মুক্ত বাতাসে ছাড়িয়া দিলে যেরূপ হয়, সেইরূপ কতকটা থতমত খাইয়া গিয়াছেন—এই দুই পারসী ভগিনীর সংসর্গে তিনি অনেক অংশে সেই পরিবর্ত্তনের ধাক্কা সামলাইতে পারিয়াছিলেন। মেয়ে দুটি বয়স্কা কিন্তু উভয়েই অবিবাহিতা। বড়টির তখন Courtship চলিতেছিল। আমরা থাকিতে থাকিতে তাঁহার পিতা অনেকানেক ইংরাজ স্ত্রীপুরুষ নিমন্ত্রণ করিয়া এক সাহেবী ভোজ দিয়া "ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্য রীতি" অনুসারে কন্যার বিবাহোৎসব সম্পন্ন করেন। তাঁহার জামাতা করসদজী কামা পারসী-মণ্ডলীর মধ্যে প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত। তাঁর সঙ্গে পারসী ধর্ম্ম সংক্রান্ত অনেক আলোচনা হইত। তিনি এক একবার আমাকে ভজাইবার চেষ্টা করিতেন—বলিতেন 'তোমরা ত একেশ্বরবাদী, তোমরা আমাদের ধর্ম্ম গ্রহণ করনা কেন?' আমি বলিতাম, "অনেক বিষয়ে তোমাদের মতে আমাদের মতের ঐক্য আছে সত্য কিন্তু মতের মিল যাই থাকুক, একটা জায়গায় মনের মিল নেই, Sentimentএ ভারি ঘা লাগে—সে তোমাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। যখন মনে করি যে মৃত্যুর পরে আমার দেহ তোমাদের শবস্তম্ভে নিক্ষিপ্ত হয়ে শকুনিদের উদরস্থ হবে তখন যেন গাত্র শিহরিয়া উঠে।" মাণকজীর কনিষ্ঠা কন্যা সিরিণবাই সুশিক্ষিতা, লোকজনের সহিত কথাবার্ত্তায়, সামাজিকতায়, গৃহকার্য্যে সুদক্ষ। দুঃখের বিষয় তাঁহার শরীর নিতান্ত অপটু, তথাপি এই রুগ্ন শরীর লইয়া বৃদ্ধ পিতার সেবা শুশ্রূষা, ভগিনীর গৃহকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ, বালিকা বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান প্রভৃতি কর্ত্তব্যসাধনে অম্লানবদনে তৎপর রহিয়াছেন। তাঁহাদের উদার আতিথ্য সৎকার লাভ করিয়া তাঁহাদের বাটীতে যতটুকু সময় সুখে কাটাইয়াছি তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট আমরা দুশ্চ্ছেদ্য কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ আছি।"

'কামা' স্বামীস্ত্রী উভয়েই পরলোকগত হইয়াছেন—সে বৃদ্ধ মাণকজীও আর নাই।

পরিচ্ছদ-সমস্যা

আমরা এই পারসী পরিবারের মধ্যে বাস ক'রে আমাদের পরিচ্ছদ-সমস্যা পূরণ করতে পারলুম। বিলাত থেকে কলকাতায় এসে অবধি এই সমস্যা আমার মনে উদয় হ'ত—বাহিরে নিয়ে যেতে হলে আমাদের মেয়েদের পোষাক কি রকম হওয়া উচিত? এখানকার অনেক দোকান ঘুরে শেষে এক ফরাসী মিলিনরের সাহায্যে একটা পোষাক প্রস্তুত করে নেওয়া গেল। ফুলো ফুলো পাজামা জাঙ্গিয়া পেশওয়াজ আর মাথার ওড়না সবশুদ্ধ দেখতে oriental ধরণ, রুচিসঙ্গত মন্দ হয় নি। অনেকটা তুর্কী মহিলাদের সাজ। বোম্বায়ে এই কাপড়ের খুব সুখ্যাতি বেরিয়েছিল। যে সব মেম মাণকজীর বাড়ী আসতেন তাঁরা দেখে একবাক্যে very pretty বলে প্রশংসা

করতেন। কিন্তু যতই Pretty হোক্ না কেন আমাদের দেশী কাপড়ের সঙ্গে থাপ খায় না এই এক দোষ। এমন একটা পোষাক চাই যা দেখতে সুশ্রী অথচ আমাদের লোকের চক্ষে বিদেশী ব'লে ঘৃণিত না হয়। ক্রমে পার্সীসাড়ী ও জামার নমুনায় একটা পোষাক ঠিক করা গেল। পারসী স্ত্রীপুরুষ যে কাপড় পরে তা তাদের নিজস্ব নয়—গুজরাটী পরিচ্ছদের অনুকরণ। পারসীরা যখন স্বদেশ হতে নির্ব্বাসিত হয়ে প্রথমে ভারতবর্ষে আসে তখন তারা হিন্দু মুসলমান উভয় জাতির মনোরক্ষা ক'রে চলতে বাধ্য হত। তাদের চালচলন দেশীয় অনুকরণে ক্রমে অনেক পরিবর্ত্তিত হয়েছে। হিন্দুদের অনুরোধে গোমাংস এবং মুসলমানদের যাহা হারাম তাহাও তাদের বর্জ্জনীয়। আহারে যেমন, তাদের পরিচ্ছদেও তেমনি বদল। পুরুষদের গুজরাটী কোর্ত্তা পাগড়ী, মেয়েদের গুজরাটী ধরণের সাড়ী। পারসী মেয়েদের সাড়ী আমাদের বেশ পছন্দ হল—তাই একটু আধটু পরিবর্ত্তন ক'রে আমরা একরকম আমাদের সাড়ীর মত করে নিলুম, তাছাড়া মাথার ওড়না সে আমাদের নিজস্ব জিনিস। এই বেশ ক্রমে বাঙ্গলাদেশে ভদ্রসমাজে প্রচলিত হয়ে পড়েছে। আশ্চর্য্য এই যে গোঁড়া হিন্দু পরিবারের মেয়েরাও এই পরিচ্ছদ গ্রহণ করতে এখন সঙ্কুচিত নন—এটা খুবই সুখের বিষয় বলতে হবে।

মারাঠী স্ত্রীদের বেশভূষা ঠিক আমাদের মেয়েদের ধরণের নয়। মারাঠী স্ত্রীগণ মাথায় কোনরূপ আবরণ-বস্ত্র ব্যবহার করেন না—খোলা মাথায় চক্রাকার খোঁপা, তার উপর ফুলের মালা ও স্বর্ণাভরণ। নাকে মুক্তাগুচ্ছ নথ। মারাঠী মেয়েদের সাড়ী পরবার ধরণ একটু আলাদা; সাড়ী, তার উপর আবার মাল-কোচা। সামনের দিক্‌টা দেখতে মন্দ দেখায় না, পিছনে মালকোচার বাঁধন স্পষ্ট ধরা পড়ে। মেয়েদের এ পুরুষবেশ আমাদের চক্ষে অদ্ভুত ঠেকে,—কিন্তু পরিচ্ছদপরিধানরুচি অনেকটা অভ্যাসের উপর নির্ভর। এক কাল ছিল যখন মারাঠা বীরাঙ্গনাদের অশ্বারোহণে সৈন্যসহ এক স্থান হতে স্থানান্তরে যাতায়াত করতে হত, তখনকার কালের পক্ষে মাল-কোচাই উপযুক্ত বেশ। বোম্বাইয়ের হিন্দু স্ত্রীদের একটি অঙ্গাবরণ আমার বেশ পছন্দ হয়—ওদেশে তাহাকে 'চোলী' বলে; আমরা বলি কাঁচুলী। কি মারাঠী কি গুজরাটী সব মেয়েই এই চোলী ধারণ করে। গুজরাটী মেয়েরা যেভাবে সাড়ী পরে আমরা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করে সেই ধরণে আমাদের মেয়েলী পোষাক প্রস্তুত করে নিলুম।

পারসী রমণীগণ গুজরাটী মেয়েদের মত রেশমী সাড়ী পরে, কেবল মাথায় একটা রুমাল জড়িয়ে রাখে। পারসীদের জাতীয় পরিচ্ছদ 'সদ্‌রা' ও 'কস্তী'। সদরা একটা মলমলের জামা আর কস্তী বাহাত্তর সূতার কটিবন্ধ, প্রত্যেক জরতোস্তীর ইহা পরিধেয়। জন্দ্‌অবস্তায় সদরা সুভদ্র মঙ্গল বসন বলিয়া ব্যাখ্যাত। কস্তী কটিদেশে তিন ফের জড়িয়ে চার গ্রন্থিতে বাঁধা হয়। প্রত্যেক গ্রন্থি বাঁধবার সময় এক এক মন্ত্র উচ্চারণ করতে হয়। প্রথম মন্ত্র, ঈশ্বর এক ও

অদ্বিতীয়; দ্বিতীয়, জরতোস্ত ধর্ম্মই সত্য; তৃতীয়, জরতোস্ত ঈশ্বরের দূত; চতুর্থ, সদাচরণ করিবে এবং পাপকর্ম্ম পরিহার করিবে। এই চারমন্ত্র পাঠের পর সদরা ও কস্তী পরিধান ক'রে পারসী মানবক জরতোস্ত ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। শুধু মানবক কেন, পারসী স্ত্রীপুরুষ উভয়েই এই দীক্ষা গ্রহণ করে।

পারসী জাতি

বোম্বায়ে যে জাতির বিশেষ প্রভাব লক্ষিত হয় সে পারসী জাতি। এ জাতির সংখ্যা সামান্য, সমস্ত হিন্দুস্থানে ১ লক্ষ হয় কি না সন্দেহ কিন্তু ইহাঁদের অসামান্য উদ্যম, ব্যবসায়-তৎপরতা, কর্ম্মনিষ্ঠতা ও বদান্যতা গুণে ইহাঁরা এ দেশীয় জনপদের অগ্রগণ্য সন্দেহ নাই। পারসীরা যেরূপে এদেশে প্রবেশ লাভ করিল তাহার বৃত্তান্ত এই। সপ্তম শতাব্দীতে পারস্য দেশ মুসলমান কর্ত্তৃক বিজিত ও তাহার শেষ রাজা রাজ্যভ্রষ্ট হইলে পর অবশিষ্ট কতিপয় অগ্নি-উপাসক ধর্ম্মনাশ ভয়ে দেশত্যাগী হইয়া বনজঙ্গল পাহাড়পর্ব্বতের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এইরূপে কতক বৎসর অতি কষ্টে অতিবাহিত করিয়া তাঁহাদের একদল লোক ভারতবর্ষে কাঠেওয়াড় প্রান্তে দিউ নামক বন্দরে আসিয়া অবতীর্ণ হন। তথায় তাঁহারা ঊনবিংশতি বৎসর যাপন করিয়া জনৈক পারসী জ্যোতিষীর পরামর্শে সে স্থান হইতে গুজরাটে প্রস্থান করেন। এই যাত্রীদল সমুদ্রের উপর প্রবল ঝড় তুফানে আক্রান্ত হইয়া পরিশেষে গুজরাটের অন্তর্গত সঞ্জান নামক স্থানে নির্ব্বিঘ্নে উপনীত হইলেন। সেই প্রদেশ তখন যাদুরাণা নামে এক ক্ষত্রিয় রাজার শাসনাধীন ছিল। যখন পারসীগণ যাদুরাণার শরণ প্রার্থনা করিলেন তখন রাণা তাঁহাদের রীতিনীতি ধর্ম্মাদি জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করাতে তাঁহারা নিজ জাতির বৃত্তান্ত ষোড়শ সংস্কৃত শ্লোকে সন্নিবিষ্ট করিয়া রাজার কর্ণগোচর করেন। এই সকল শ্লোক হইতে পারসীদের আচার ব্যবহার বিশ্বাস ও ধর্ম্ম বিষয়ে কতক আভাস পাওয়া যায়। তাঁহারা 'গৌরাধীরাঃ সুবীরা বহুবল নিলয়াস্তে বয়ং পারসীকাঃ' বলিয়া কেমন গর্ব্বের সহিত আপনাদের পরিচয় দিয়াছেন। নমুনা স্বরূপ একটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

> সূর্য্যং ধ্যায়ন্তি যেবৈ হুতবহমনিলং ভূমি মাকাশমাদ্যং
> তোযেশং পঞ্চতত্ত্বং ত্রিভুবনসদনং স্থায়মন্ত্রৈ স্ত্রিসন্ধ্যং
> শ্রীহোর্মজ্দং সুরেশং বহুগুণ গরিমাণং তমেকং কৃপালুং
> গৌরা ধীরাঃ সুবীরা বহুবল নিলয়াস্তে বয়ং পারসীকাঃ।

আমরা সূর্য্য, অগ্নি, অনিল, জলস্থল আকাশ পঞ্চভূত, ও বহুগুণ যুক্ত সুরেশ হোর্মজ্দকে স্থায় মন্ত্র দ্বারা ত্রিসন্ধ্যা ধ্যান করি। আমরা সেই গৌর ধীর সুবীর ও মহাবল পারসিক।

রাজা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে স্বীয় রাজ্যে বাস করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন ও তাঁহাদের বাসযোগ্য একখণ্ড ভূমি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। কিন্তু এইরূপ অনুমতি দিবার পূর্ব্বে তাহাদের নিকট হইতে কতক গুলি কড়ার আদায় করিয়া লইলেন। যথা—

তাহারা স্বভাষা ছাড়িয়া দেশভাষা ব্যবহার করিবেন, শস্ত্র পরিত্যাগ করিবেন, তাঁহাদের স্ত্রীগণ হিন্দুনারীদের বেশ ধারণ করিবে, রাত্রে বিবাহলগ্ন পরিপালিত হইবে,—এইরূপ

কতকগুলি নিয়ম পালন করিতে তাঁহারা অগত্যা প্রতিশ্রুত হইলেন। অল্পকাল মধ্যে তাঁহাদের অগ্নিমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল। তাঁহাদের যত্ন পরিশ্রমে সে অঞ্চলের শ্রী ফিরিল। বনজঙ্গল পরিষ্কৃত হইয়া ফলপুষ্প-শোভিত উদ্যান, পতিতভূমি শস্যশালিনী উর্ব্বরা ভূমিতে পরিণত হইল। এই ঘটনার তারিখ বিষয়ে মতভেদ দৃষ্ট হয় কিন্তু তাহা অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ মোটামুটি মানিয়া লওয়া যাইতে পারে। সঞ্জানে কিছুকাল বাস করিয়া পারসীরা ক্রমে উত্তর গুজরাটের নওসাড়ী, ভরুচ, খম্বায়ৎ প্রভৃতি স্থানে বাকন্দাদার ও বাসন্দারূপে ছড়াইয়া পড়িলেন।

ইহার ছয়শত বৎসর পরে আল্লাউদ্দীন বাদসাহের সেনাপতি আলপ খাঁ সঞ্জান আক্রমণ করেন। সে সময়ে পারসীদের বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। রাণার আদেশক্রমে ১৪০০ কবচধারী অশ্বারোহী পারসী সেনা সজ্জীভূত হইল—আর্দেসর পারসী তাহাদের নেতা। তাঁহাদের বলবিক্রমে প্রথমে মুসলমান সৈন্য বিপর্য্যস্ত, পরাজিত ও তাড়িত হয়। কিন্তু আলপ খাঁ সহজে ছাড়িবার পাত্র নন, পরদিবস ভগ্নসেনা একত্র করিয়া পুনরায় যুদ্ধারম্ভ করেন। সেই যুদ্ধে হিন্দু ও পারসীদের পরাজয়। বীর আর্দেসর বাণাঘাতে হত হইলেন ও সঞ্জান মুসলমানদের হস্তে পতিত হইল। পারসীরা তাঁহাদের সাধের সঞ্জান হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া অন্যত্রে বাসস্থান অন্বেষণ করিতে বাধ্য হইলেন। এইক্ষণে সঞ্জানে একটি মাত্র পারসীরও বসতি নাই—কেবল পারসী শ্মশানস্তম্ভের ভগ্নাবশেষে তাহাদের স্মৃতিচিহ্ন রহিয়াছে।

ইহার পর শতাব্দী পর্য্যন্ত পারসী ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই সংবাদ পাওয়া যায় না। ১৪১৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদের পূতাগ্নি সঞ্জানের অগ্নিমন্দির হইতে নওসাড়ীতে স্থানান্তরিত হয়।

১৫৭৮ সালে আকবর বাদসাহের আদেশ ক্রমে পারসীরা নওসাড়ী হইতে তাঁহাদের কতকজন বিচক্ষণ পুরোহিত দিল্লীতে প্রেরণ করে। তাঁহারা সম্রাটকে পারসী ধর্ম্মের ব্যাখ্যান ও উপদেশ শ্রবণ করান। উদার-মতি আকবর তাঁহাদের উপদেশ শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া পারসী গুরুকে নওসাড়ীর নিকটস্থ ভূমিসম্পত্তি উপহার দেন। কথিত আছে যে সম্রাট পারসী সদরা (জামা) ও কস্তী (কটিবন্ধ) পরিধান করিয়া পারসী ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

য়ুরোপীয়দের আবির্ভাবের পর হইতেই পারসীদের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির সূত্রপাত বলিতে হইবে। তাঁহারা দালাল ও মধ্যস্থ হইয়া ইউরোপীয় বণিকদের অনেক কার্য্য করিতেন। ইংরাজদের সহিত প্রথম হইতেই তাঁহাদের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা বন্ধন হয়। সুরাটের বাণিজ্য হ্রাসোন্মুখ হইয়া যখন বোম্বাই সহর শির উত্তোলন করিতে আরম্ভ করে তখন পারসীরা বোম্বায়ে আসিয়া কেহ বাণিজ্য-ব্যবসা, দোকানদার কণ্ট্রাক্টদারের কাজ, কেহ বা পোত নির্ম্মাণ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া সুখ্যাতি লাভ করেন। ব্রিটিষ রাজ্যবৃদ্ধি ও ইংরাজ সওদাগরদের প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে পারসী-দের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদিত হয়।

প্রাচীনকাল হইতেই পারসীদের ইংরাজ রাজভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। সুরাটে যখন ইংরাজ বণিকগণ মোগল কর্তৃপুরুষদের

অত্যাচারে প্রপীড়িত হন তখন রোস্তম নামক একজন পারসী ইংরাজদের প্রতিনিধি স্বরূপে ঔরঙ্গজীবের রাজসভায় উপস্থিত হইয়া বাদসাহের নিকট তাহাদের হইয়া আবেদন করেন। তাহারও পূর্ব্বে রোস্তমজী দোরাবজী কিরূপে বোম্বাই সহর রক্ষা করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ এই :—

১৬৯২ সালে বোম্বায়ে এক ভয়ানক মড়ক ও দুর্ভিক্ষ হয় তাহাতে অনেক য়ুরোপীয় বাসন্দা ও দুর্গরক্ষক সেনা মারা পড়ে। এই সুযোগে জিঞ্জিরার হাবসী নবাব বহুসংখ্যক সেনা লইয়া সহর আক্রমণ করেন। দ্বীপ ও কেল্লা নবাবের হস্তগত হয়। ইংরাজেরা এই মড়কের উপদ্রবে এরূপ হীনবল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে হাবসীদের সঙ্গে পারিয়া উঠেন নাই। এই ঘোরতর সঙ্কটে রোস্তনজী রোস্তম সদৃশ বীরত্ব সহকারে অরিদল বিপক্ষে কটিবদ্ধ হইলেন। ধীবর জাতি হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তিনি আততায়ীদের সহিত যুদ্ধ করেন ও তাহাদিগকে সংগ্রামে পরাস্ত করিয়া তাড়াইয়া দেন। এই গোলযোগের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সুরাট কুঠীর অধ্যক্ষ বোম্বায়ে আসিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। এই একজন পারসীর সাহায্যে বোম্বাই পুরী এক ভয়ানক বিপদ হইতে উদ্ধার পাইল।

পারসীরা অশেষ বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যে তাঁহাদের স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে ও তাঁহাদের ব্যবসা-নৈপুণ্য দানশীলতা ও সার্ব্বজনিক কার্য্যে তৎপরতা বশত ভারতে তাঁহাদের কীর্ত্তিকলাপ বিস্তার হইতেছে।

পারসী ধর্ম্ম

পারসী-জাতি সাধারণতঃ অগ্নি উপাসক বলিয়া প্রখ্যাত কিন্তু ঐ সংজ্ঞা তাহাদের প্রতি আরোপ করা ঠিক হয় না। যে সকল পণ্ডিতেরা পারসীধর্ম্ম সবিশেষ অনুশীলন করিয়াছেন তাঁহাদের মতে পারসীরা বাস্তবিক একেশ্বর উপাসক, অগ্নি সূর্য্যে ঈশ্বরের বিশেষ প্রকাশ দেখিয়া তাঁহারা ঐ দুই পদার্থে শ্রদ্ধাভক্তি অর্পণ করেন।

পারসীরা জরতোস্তের শিষ্য ও অনুচর বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেন। জরতোস্তের জন্মকাল নির্ণয় করা সুকঠিন। ডাক্তার হৌগের মতে অন্ততঃ তাহা খৃষ্টাব্দের সহস্র বৎসর পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট করা অসঙ্গত নহে! যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে বলা যাইতে পারে যে এই জরতোস্ত খৃষ্টাব্দের সহস্রবর্ষ পূর্ব্বে পারস্য রাজা গুষ্টাস্পের রাজত্বকালে প্রাদুর্ভূত হন। তাঁহার সময়ে পারসীধর্ম্ম ঘোরতর পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল। তিনি তাহা সংশোধনে ব্রতী হইয়া একেশ্বরবাদ প্রচার করেন। তিনি যে সকল ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন তাহা প্রাচীন ইরাণী ভাষায় লিখিত ও তাহার নাম অবস্তা। এই সকল গ্রন্থের অধিকাংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে—অবশিষ্ট অল্পভাগ পারসীদের নিকট পাওয়া যায় ও তদন্তর্গত মন্ত্রাবলী তাঁহাদের মুখে শ্রবণ করা যায়। জরতোস্তের উপদেশ এই যে ঈশ্বর একমাত্র সর্ব্বশক্তিমান জগতের স্রষ্টা পাতা ও সর্ব্বসুখদাতা। তিনি জ্ঞানস্বরূপ জ্যোতির জ্যোতি। তিনি পুণ্যের পুরস্কর্ত্তা পাপের শাস্তা। তাঁহার নাম অহুরমজ্‌দ (অপভ্রংশ,

হোমর্জ্দ)। আশ্চর্য্য এই যে সংস্কৃত ও সংস্কৃত মূলক সমস্ত ভাষায় ঈশ্বরের নাম দিব ধাতু অর্থাৎ প্রকাশ হইতে উৎপন্ন—জেন্দ ভাষায় উল্টা দেব শব্দে অসুর বুঝায়। ঈশ্বর অর্থে অসুর শব্দের প্রয়োগ। বেদ ও অবস্তার মধ্যে ইন্দ্র মিত্র বৃত্রহা প্রভৃতি কতকগুলি নামের ঐক্য দেখা যায়—সে সকল নাম যে সমান অর্থে ব্যবহৃত তা নয়। বেদের দেবতা হয়ত অবস্তার দানব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইন্দ্র যিনি দেবাদিদেব অবস্তায় তিনি দানবেশ্বর, সয়তান অহ্রিমানের নীচেই গণনীয়। আবার আশ্চর্য্য এই যে ইন্দ্রের অপর মূর্ত্তি বৃত্রঘ্ন অবস্তায় দেবতার মধ্যে গণ্য। দেবসংখ্যা দুয়েতেই সমান। বেদের ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবের অনুরূপ অবস্তার ৩৩ জন "রতু" প্রধান, তাঁহারা জরতোস্ত প্রচারিত অহুরমজ্দের সত্যধর্ম্ম সংরক্ষণে নিযুক্ত। পারসীদের যমসেদ (যমক্ষেত) বেদের যমরাজা—উভয়েরই পিতৃনাম বিবস্বৎ। বেদে যমরাজার যেরূপ বর্ণনা আছে তাহা পৌরাণিক দানবরূপী যমের সঙ্গে কিছুই মেলে না। বেদের যম মানবকুলের আদিপুরুষ, যিনি মর্ত্ত্য হইতে স্বর্গের পথ আবিষ্কার করিয়াছেন, সে পথ দিয়া তাঁহার বংশজেরা সকলেই গমন করে ও গিয়া তাঁর সেই সুখরাজ্যে বাস করে। ইরাণী গ্রন্থে আছে যমসেদ সত্যযুগের রাজা ছিলেন, প্রজারা তাঁহার রাজ্যে রোগ-শোক হইতে মুক্ত হইয়া পরম সুখে বাস করিত।

জগতে মঙ্গল অমঙ্গল দুই আত্মা শক্তি অহুরমজ্দের অধীনে কার্য্য করিতেছে। মঙ্গল শক্তি স্পেণ্টো মৈন্যুষ জ্যোতি ও সৌন্দর্য্যের আকর, সমুদায় সুখকারী ও হিতকারী বস্তুর জনয়িতা। অমঙ্গল শক্তি আঙ্গ্রৈমৈন্যুষ যত অমঙ্গলের আকর, দুঃখ ক্লেশের জনয়িতা, পাপ চিন্তার প্রবর্ত্তক। স্পেণ্টো জীবনদাতা, আঙ্গ্রে সংহর্ত্তা—আলোক একের, অন্ধকার অন্যের প্রতিকৃতি। এ উভয় শক্তি যদিও পরস্পর বিরোধী—তথাপি দিবারাত্রের ন্যায় অবিচ্ছিন্ন ও সৃষ্টিরক্ষণে উভয়েই নিযুক্ত।

জরতোস্ত প্রাকৃতিক শক্তি বা পদার্থ বিশেষে দেবত্ব আরোপ করিয়া তাহার পূজা করিবার বিধান দেন নেই সুতরাং তাঁহার ধর্ম্ম পৌত্তলিকতা দোষে দূষিত নহে। সূর্য্য সেই জ্যোতির্ম্ময় ঈশ্বরের প্রতিরূপ, অগ্নি সেই পবিত্র স্বরূপের প্রকাশক ও স্মারক বলিয়া অর্চ্চনীয়। কিন্তু মূলে যাহা উন্নত ও পরিশুদ্ধ তাহার স্রোত কালসহকারে কলুষিত হইয়া যায়—পারসী ধর্ম্মের অবস্থাও কতকটা সেইরূপ। জ্ঞানীদের ধর্ম্ম এক আর অজ্ঞেরা নকলকে আসল মনে করিয়া লইয়া সূর্য্যের স্তবে প্রবৃত্ত হয়—অগ্নি মন্দিরে অগ্নিকেই দেবতারূপে অর্চ্চনা করে।

জরতোস্তের গ্রন্থ সকল নীতিগর্ভ উপদেশে পরিপূর্ণ—তাহার সার তিন কথায় ব্যক্ত হইতে পারে—হুমাতা, হুখ্তা, হ্বরষ্টা, অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে আত্মশুদ্ধি রক্ষা করা।*

অগ্নিমন্দির
আতস বেহরাম

বোম্বাই সহরের ভিন্ন ভিন্ন ভাগে পারসীদের অগ্নিমন্দির প্রতিষ্ঠিত, তাহার সংখ্যা সব মিলিয়া ৩৩। এতদতিরিক্ত মন্দির

* History of the Parsees by Dosabhai Framji.

কতকগুলি শ্রীমন্ত পারসী পরিবারের নিজস্ব সম্পত্তি, তাহাতে সাধারণের যাইবার অধিকার নাই। এই সকল মন্দিরের নির্ম্মাণ কৌশল বিশেষ কিছুই নাই। মধ্যপ্রকোষ্ঠে পূতাগ্নি প্রতিষ্ঠিত তাহার সংরক্ষণে একজন পুরোহিত নিযুক্ত, চন্দন কাষ্ঠ প্রভৃতি খোরাক যোগাইয়া নিরন্তর অগ্নি প্রজ্বলিত রাখা তাঁহার কাজ।

অগ্নিমন্দিরে অগ্নিপ্রতিষ্ঠার যে নিয়ম তাহা কৌতুকজনক। অগ্নির নানা জন্মস্থান হইতে নানাজাতীয় অগ্নি সংগ্রহ করা হয়। বিদ্যুজ্জাতীয় অগ্নি আহরণ বিশেষ ফলদায়ক। শুনিতে পাই হোর্মজী ওয়াডিয়ার আতস বেহরামের জন্য তাড়িতাগ্নি কলিকাতা হইতে বহুকষ্টে সংগৃহীত হয়। কলিকাতার অনতিদূরে এক বৃক্ষবিশেষে বজ্রপাতের সংবাদ পাইয়া নৌরজি বাঙ্গালী নামক পারসী তথায় সত্বর উপস্থিত হইয়া তাহা হইতে এক তড়িদ্দগ্ধ শাখা সংগ্রহ করেন। কাষ্ঠ সংযোগে সেই অগ্নি অনেকদিন পর্য্যন্ত জিয়াইয়া রাখা হয়—পরে তাহা স্থলমার্গে পারসীহস্তে বহু যত্নে বোম্বায়ে প্রেরিত ও আতস বেহরামে স্থাপিত হয়।

অগ্নিসংস্কার

এই সকল নানাজাতীয় অগ্নি ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে রক্ষিত হইলে পর তাহা সংস্কৃত ও শোধিত হয়। অগ্নি সংস্কারের নিয়ম এই—অগ্নির উপর একটি ত্রিদণ্ড ছিদ্রময় ধাতু পাত্র রক্ষিত হয়। সেই পাত্রস্থিত সুগন্ধি চন্দন প্রভৃতি কাষ্ঠখণ্ড তলের অগ্নি সংযোগে দগ্ধ হইয়া নবানল উদ্ভূত হয়। এই দ্বিতীয় অগ্নি হইতে তৃতীয়—তৃতীয় হইতে চতুর্থ এইরূপ নবম সংস্কারে যে অগ্নি প্রসূত হয় তাহাই পূতাগ্নি। এই প্রকারে প্রত্যেক জাতীয় অগ্নি সংস্কৃত হইলে সেই সমস্ত অগ্নি একটা বৃহৎ পাত্রে রাশীকৃত হইয়া যথানির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয় ও সেই পূত হুতাশন আহুতি যোগে অহর্নিশি প্রজ্বলিত থাকে।

শবস্তম্ভ

জীবন্তের জন্য অগ্নিমন্দির ও মৃতের জন্য শবস্তম্ভ পারসীদের এই দুইটি পরম প্রয়োজনীয় বস্তু। যেখানে পারসীর বসতি সেখানেই এই দুই জিনিস দেখিতে পাইবে। মালাবার শৈলোপরি পারসীদের পঞ্চ শবস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত। সেই সকল স্তম্ভ প্রস্তরময় প্রাচীর বেষ্টিত কতিপয় বিঘা (প্রায় ৬০০০০ গজ) অধিকার করিয়া আছে। প্রাচীরের অভ্যন্তরে এক একটি অগ্নিমন্দির। মৃতদেহ শুভ্রবসনে আচ্ছাদিত হইয়া পাহাড়ের উপর সমানীত হয়। আত্মীয় স্বজন বন্ধু শুভ্রবেশে শবের পশ্চাৎ জোড়ে জোড়ে গমন করে—পথিমধ্যে এক বিশ্রামগৃহে শব স্থাপিত হয় ও তথায় উপাসনাদি হইয়া স্তম্ভে সমানীত হয়। স্তম্ভ প্রস্তরময় ১৬,১৭ হাত উচ্চ। প্রাচীরের একটি দ্বার দিয়া বাহকেরা প্রবেশ করিয়া দেহটিকে যথাস্থানে আনিয়া রক্ষা করে। স্তম্ভের উপর কোন ছাদ নাই—অন্তর্ভাগে প্রস্তরনির্ম্মিত গোলাকার শ্মশানভূমি। ভিতরে তিন স্তর গড়ানো ভাবে নামিয়া গিয়াছে। মধ্যে এক গভীর গর্ত্ত। পুরুষের দেহ উপরি স্তরে, নারীদেহ মধ্যভাগে ও শিশুদেহ অধস্তরে স্থাপিত হয়। যথাস্থানে শবপ্রতিষ্ঠা করিয়া বাহকেরা চলিয়া যায়। একপাল শকুনি প্রাচীরের উপরে বসিয়া

শিকার প্রতীক্ষা করিয়া থাকে, দেহ নামাইবা মাত্র তাহার উপর ঝাঁকিয়া পড়ে ও দুই ঘণ্টার মধ্যে মাংস নিঃশেষে ভক্ষণ করিয়া অস্থিমাত্র রাখিয়া যায়। কতক দিন পরে বাহকেরা ফিরিয়া আসে ও শুষ্ক অস্থিখণ্ড সংগ্রহ করিয়া মধ্যবর্ত্তী কূয়ার মধ্যে নিক্ষেপ করে তাহা বায়ু বৃষ্টির প্রভাবে ক্রমে লয় প্রাপ্ত হয়। এই সকল শুষ্ক অস্থিখণ্ড ব্যতীত শ্মশানে শবের আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। মৃতদেহ হইতে রসাদি নির্গমনের বিহিত উপায় কল্পিত হইয়াছে। বালুকা ও কয়লার মধ্য দিয়া শোধিত হইয়া তাহা
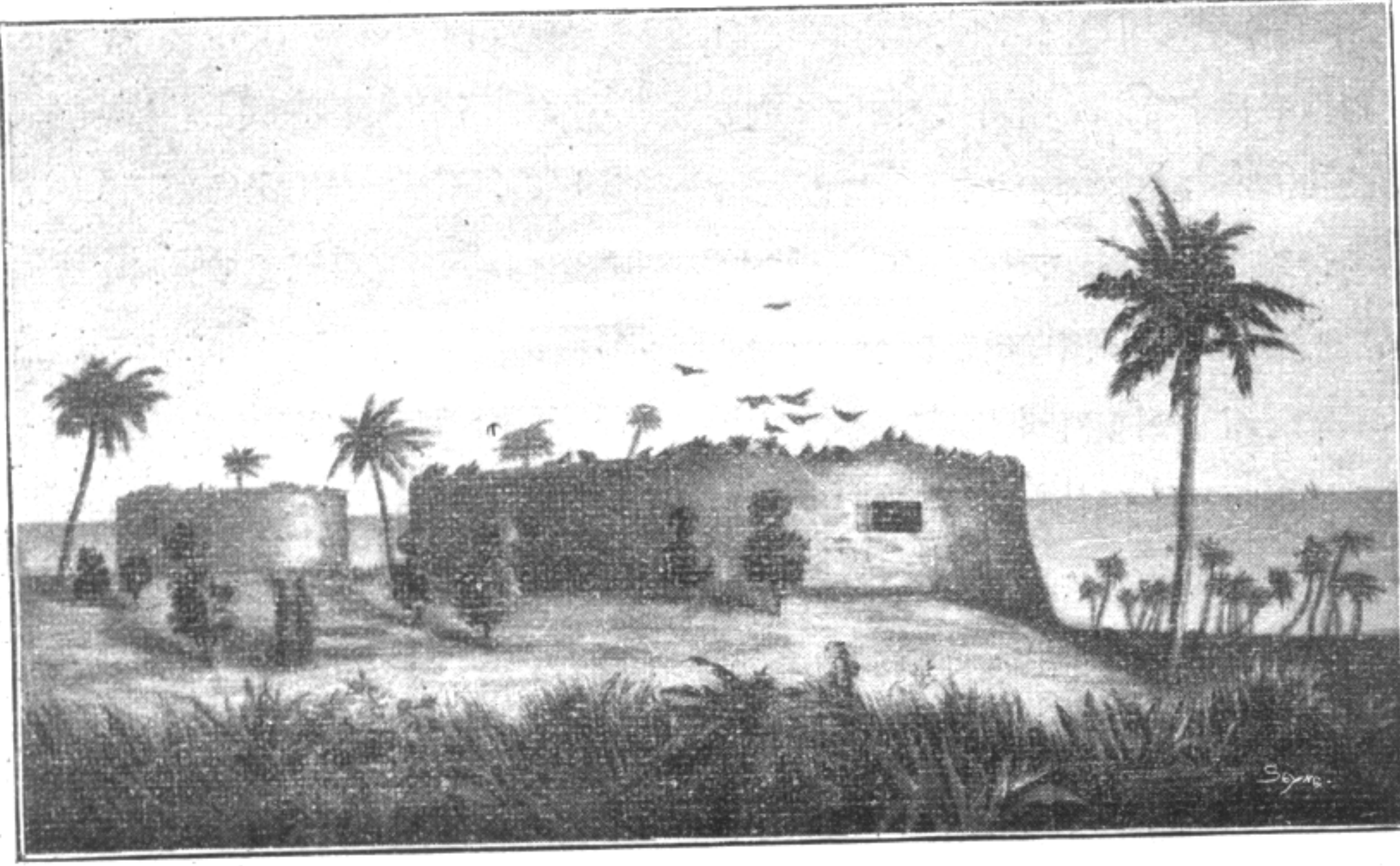
পারসীকদের শবস্তম্ভ।

ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হয়। পারসীগণ প্রাচীন কাল হইতে এইরূপ সমাধি ব্যবস্থা পালন করিয়া আসিতেছে। ইহার এক গুণ এই যে শ্মশান ক্ষেত্র দুর্গন্ধ দূষিত বায়ু হইতে সুরক্ষিত। অপর গুণ এই যে মানুষে মানুষে সাম্যভাব ইহাতে বজায় থাকে; ধনী দরিদ্র উচ্চ নীচ সকলেরই অস্থি একস্থানে মিলিয়া যায়।

উথম্না

পারসী ধর্ম্মগ্রন্থে আছে যে জীবাত্মা তিন দিন পর্য্যন্ত মর্ত্ত্য লোক পরিত্যাগ করে না, চতুর্থ দিবসে ইহলোক হইতে লোকান্তরে গমন করে। সেইদিন মৃতের কল্যাণ উদ্দেশে দানাদি কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই বিধির নাম 'উথম্না'।

হিন্দু ও পারসী যে মূলতঃ একজাতি, ঘটনা ক্রমে উভয় শাখা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে তাহা এই উভয় জাতির ভাষা ও ধর্ম্ম, মত ও বিশ্বাস, আচার ব্যবহারের তুলনা হইতে স্পষ্ট প্রতীতি হয়। অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সৌসাদৃশ্য হইতেও এ বিষয়ের প্রমাণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। প্রেতাত্মার কল্যাণ উদ্দেশে হিন্দুদের শ্রাদ্ধ তর্পণাদি নিয়ম হইতে পারসী রীতি ভিন্ন নহে। পারসী সম্বৎসরের শেষ দশাহ পিতৃপুরুষদের জন্য উৎসর্গীকৃত। এই দশদিন গৃহের এক

প্রকোষ্ঠ পরিষ্কৃত ও ফল ফুলে সুসজ্জিত হইয়া পিতৃপুরুষদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া প্রার্থনা বন্দনাদি অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানকে প্রবরদিগান বা মুক্তাদ বলে। এই সময়ে প্রেতাত্মাগণ মর্ত্ত্য ধামে অবতীর্ণ হইয়া সন্তান সন্ততিদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যান। যদি দেখেন আমরা তাঁহাদিগকে বিস্মৃত হই নাই তাহা হইলেই তাঁহারা সন্তুষ্ট।

কুকুরের শুভদৃষ্টি

অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্বন্ধীয় একটি অদ্ভুত রীতি পারসীদের মধ্যে প্রচলিত—সে কি না কুকুর দিয়া শবের মুখ দর্শন করাইবার রীতি। কুকুরের দৃষ্টি শুভদৃষ্টি। কুকুরে জীবাত্মাকে সৎপথ প্রদর্শন করিয়া স্বর্গধামে লইয়া যায় ও আহরিমানের অমঙ্গল চেষ্টা নিবারণ করে এই তাহাদের বিশ্বাস। মহাভারতে কুকুরের সঙ্গে যুধিষ্টিরের স্বর্গারোহণের যে আখ্যান আছে এই পারসী ক্রিয়া পদ্ধতি সেই কথা স্মরণ করাইয়া দেয়—কোন প্রাচীনতর প্রথা হয়ত এ উভয়েরই মূল।

ভারতবর্ষে আসিয়া অবধি পারসীদের সামাজিক অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। যতদিন তাঁহারা হিন্দু ও মুসলমান রাজ্যের প্রজা ছিলেন ততদিন এই উভয় জাতির মন যোগাইয়া চলিতে হইত—সেই অনুসারে তাঁহাদের আচার ব্যবহার নিয়মিত হইত। আবার যখন ইংরাজ রাজ্য তাহাদের স্থান অধিকার করিল, সে অবধি 'যখন যেমন তখন তেমন' নীতি অনুসারে তাঁহারা আর এক স্রোতে গা ঢালিয়া দিলেন। বর্ত্তমান কালে তাঁহাদের সমাজ অনেকটা য়ুরোপীয় আদর্শে গঠিত হইতে দেখা যাইতেছে। বলা যাইতে পারে পারসীরা ভারতবর্ষীয় জাপানী। অশন বসন, গার্হস্থ্য অনুষ্ঠান, সামাজিকতা এক্ষণে সকল বিষয়েই তাঁহারা "পাশ্চাত্য সভ্য রীতি" অনুকরণ করিতে জাপানীদের ন্যায় তৎপর, অথচ তাঁহারা আপনাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিতেছেন। আমাদের মত তাঁহাদের উপর অতীতের গুরুভার চাপিয়া নাই, এ দেশের অন্যান্য জাতির ন্যায় তাঁহারা জাতিভেদের কঠিন শৃঙ্খলে বদ্ধ নহেন, সুতরাং পরজাতির সঙ্গে সামাজিক ভাবে মেলা মেশা তাঁহাদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ। ফলেও দেখা যায় তাঁহারা পৃথিবীর দেশ বিদেশ নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়া স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন। হিন্দু সমাজের তুলনায় তাঁহাদের সমাজ পরিবর্ত্তন ও উন্নতিশীল তাহার আর সন্দেহ নাই। আগেই বলিয়াছি পুনর্ব্বার বলিতে দোষ নাই যে, তাঁহাদের ব্যবসাবুদ্ধি, কর্ম্মক্ষমতা, বদান্যতাদিগুণে তাঁহারা বোম্বাই সমাজের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছেন। স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা তাঁহাদের মধ্যে যে পরিমাণে উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহা এদেশে অন্যান্য জাতির মধ্যে দেখা যায় না। এ বিষয়ে তাঁহারা সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টান্তস্থল।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রাচীন ভারতে বিবিধ ধাতুর নমুনা

তাম্র ও রৌপ্য

সেপ্টেম্বর মাসের "ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলনে" এই সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধে প্রাচীন লৌহের বিবিধ নমুনা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম। ঐ প্রবন্ধে সর্ব্বজনবিদিত দিল্লির লৌহস্তম্ভ ও পুরী এবং কনারকের লৌহের কড়ি ভিন্ন-ধারের ও আবু শৈলের লৌহস্তম্ভ এবং বুদ্ধ গয়ার মন্দিরে প্রাপ্ত লৌহ কীলকাদির বিষয় আলোচিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে তাম্র ও রৌপ্যের কয়েকটি প্রাচীন নমুনা সম্বন্ধে যেটুকু সন্ধান পাইয়াছি তাহা আলোচিত হইবে।

প্রথমেই মনে রাখিতে হইবে যে স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র এই তিন ধাতু মুদ্রাপ্রস্তত-কল্পে বহুপ্রাচীন কাল হইতে ভারতে প্রচলিত আছে। অশোকের সময়ের পূর্ব্ববর্ত্তীকালেরও রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। অথচ বৈদিক সাহিত্যে স্বর্ণ ও লৌহের যেরূপ ভূরি ভূরি উল্লেখ আছে, সে হিসাবে রৌপ্য ও তাম্রের উল্লেখ খুবই কম। তবে কি রৌপ্য ও তাম্রের খনি ভারতে ছিল না? তাম্র ও রৌপ্য কি বিদেশ হইতে আমদানি হইত?

রৌপ্য যে বিদেশ হইতে আমদানি হইত তাহার প্রমাণ আছে। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ষ্ট্রাবো (Strabo) ভারতের দক্ষিণ প্রদেশের বর্ণনা কালে বলিয়া গিয়াছেন যে ঐ স্থানে বিদেশ হইতে রৌপ্য আমদানি হইত।(১) এমন কি মোগল সম্রাজ্যের সময় সুপ্রসিদ্ধ টেভার্নিয়ার (Tavernier) তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখিয়া গিয়াছেন যে এক জাপান ভিন্ন সমগ্র এশিয়া প্রদেশে রৌপ্যের খনি নাই।(২) টেভার্নিয়ারের উক্তি যে সঠিক নহে তাহা প্লিনী (Pliny) প্রণীত Natural History পাঠে জানা যায়। তিনি খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে পঞ্চনদ বর্ণনা কালে তথায় স্বর্ণ ও রৌপ্যের খনির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তী কালেও যে ভারতে রৌপ্য ও তাম্রের খনি ছিল তাহার সঠিক প্রমাণ টড (Tod) সাহেবের রাজস্থান পাঠে জানা যায়। চতুর্দ্দশ খৃষ্টাব্দে চিতোরের রাজা লক্ষ রাণা তাঁহার রাজ্যে টিন, রৌপ্য ও তাম্রের খনি আবিষ্কার করিয়া উহার আয় হইতে রাজ্যের যথেষ্ট সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। টড সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন :—(৩)

"লক্ষ রাণা নরহত্যার দ্বারা ১৪:৯ শালে (সম্বত, ১৩৭৩ খ্রীঃঅঃ) চিতোরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া প্রথমেই মারোয়ারের পার্ব্বত্য প্রদেশের অধিবাসীদিগকে বশীভূত করিলেন এবং তাহাদের প্রধান দুর্গ বেরাটগড় ভগ্ন করিয়া দিয়া তথায় বেদনর সংস্থাপন করিলেন। এইরূপে স্বীয় রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশ বশীভূত করিয়া তিনি ইহা অপেক্ষা এক অধিক

(১) আমার "আয়ুর্ব্বেদ ও আধুনিক রসায়ন—ধাতুবর্গ" প্রবন্ধ দেখুন।

(২) Tavernier's travels (Ball's edition), Vol. II. p-662—"as for silver mines there are none in the whole of Asia, save only in the kingdom of Japan."

কল্যাণকর কার্য্য করিয়াছিলেন, যাহাতে তাঁহার রাজ্যের সমৃদ্ধি বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। তিনি জোয়োরা প্রদেশে রৌপ্য ও বঙ্গের (টিন) খনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই প্রদেশ ছাপ্পানের ভীলগণের নিকট হইতে খেৎসিং দখল করিয়া লইয়া ছিলেন। লক্ষ রাণা এই সকল খনি হইতে রীতিমত ধাতু আহরণ করিয়াছিলেন। প্রবাদ এই যে, এই সকল খনি চিতোরের স্থাপয়িতার সময় আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং সপ্ত ধাতুই ইহাতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত। ইহা কাল্পনিক বলিয়াই মনে হয়। স্বর্ণ যে পাওয়া যাইত তাহার কোন প্রমাণ নাই। রৌপ্য, টিন, তাম্র, সীসক ও এন্টিমনি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত, কিন্তু অনেক বৎসর ধরিয়া যে টিন পাওয়া গিয়াছিল, তাহাতে রৌপ্য খুব অল্পই থাকিত।”

আইন আকবরীতেও রৌপ্য ও তাম্রের খনির উল্লেখ আছে। খুব সম্ভবতঃ ভারতে রৌপ্য ও তাম্র প্রচুর পরিমাণে উদ্ধৃত হইত না, বিদেশ হইতে ঐ দুই ধাতুর আমদানি প্রয়োজন হইত।

রৌপ্য ও তাম্র খনিজ পদার্থ হইতে প্রাচীন ভারতে কিরূপে প্রস্তুত হইত তাহা “আয়ুর্ব্বেদ ও আধুনিক রসায়ন” শীর্ষক প্রবন্ধগুলিতে নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

এক্ষণে এই দুই ধাতুর প্রাচীন কয়েকটি নমুনার পরিচয় প্রদত্ত হইবে।

অশোক স্তম্ভে তাম্র কীলক

অধিকাংশ অশোক স্তম্ভ একখানি অখণ্ড প্রস্তর হইতে প্রস্তুত। কিন্তু নেপাল রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশস্থ রামপুরা নামক গ্রামে একটি ভগ্ন অশোক স্তম্ভ হইতে একটি বৃহৎ তাম্র কীলক প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এচ, বি, ডব্লিউ গেরিক (Mr. H. B, W. Garrick) সাহেব উহা কলিকাতার মিউজিয়মে দান করিয়াছেন। এই কীলকটি গোলাকার এবং অশোক স্তম্ভের দুইখানি প্রস্তর আট্‌কাইবার জন্য স্তম্ভের মধ্যদেশে সন্নিবিষ্ট ছিল। কলিকাতার মিউজিয়মের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে উহা সংরক্ষিত আছে। আমি উহার মাপ লইয়াছিলাম। (৪) উহা লম্বে

অশোক স্তম্ভের ভিতর তাম্রকীলক।

২৪¾ ইঞ্চি, মাঝখানের পরিধি ১৪ ইঞ্চি ও দুই ধারে অপেক্ষাকৃত সরু বলিয়া ধারের পরিধি ১২ ইঞ্চি। উহার ওজন লইবার কোনও সুবিধা ছিল না; তবে এক জনে খুব কষ্টে উহা উত্তোলন করিতে পারে। দেখিয়া বোধ হয় যে উহা ব্রঞ্জ (bronze) নহে, বিশুদ্ধ তাম্রের দ্বারা প্রস্তুত। অশোকের সময়ে এত বড় বৃহৎ তাম্রকীলক প্রস্তুত হওয়া গৌরবের কথা। (৫)

---

(৪) Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, p. 131, May, 1870.

(৫) মিউজিয়মের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী মদীয় শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ মহাশয় আমাকে ঐ কীলক ও অন্যান্য ধাতুদ্রব্যের প্রাচীন নমুনা দেখিবার বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

গুঞ্জেরিয়া গ্রামে প্রাপ্ত তাম্রের অস্ত্রশস্ত্র ও রৌপ্যের দ্রব্যাদি !

বালাঘাটের ডেপুটী কমিশনার এ, ব্লুমফিল্ড সাহেব ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে বালাঘাটের অন্তর্গত মাউ তালুক ভুক্ত গুঞ্জেরিয়া গ্রামের এক স্থান খনন কালে ভূমধ্য হইতে ৪২৪ খণ্ড তাম্র ও ১০২ খণ্ড রৌপ্য প্রাপ্ত হন। তিনি উহার মধ্যে ৮ খণ্ড রৌপ্য ও ১৭ খণ্ড তাম্রের তৈজসাদি এসিয়াটিক সোসাইটিকে উপহার প্রদান করেন। এক্ষণে উহা কলিকাতার মিউজিয়মে রক্ষিত হইয়াছে। এই ৪২৪ খণ্ড তাম্রের ওজন ১০ মন ১৪$\frac{১}{২}$ সের ও ১০২ খণ্ড রৌপ্যের ওজন ১ সের অর্দ্ধ তোলা। এই অদ্ভুত আবিষ্কারের সংবাদ ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে এসিয়াটিক সোসাটির মে মাসের সভায় পঠিত হয়। তাম্রের তৈজসাদি অধিকাংশই শাবল, খোন্তা, কুঠার, লাঙ্গলের ফাল প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র। রৌপ্য নির্ম্মিত তৈজসগুলি কি জন্য ব্যবহৃত হইত তাহা সঠিক নির্ণীত হয় নাই। ঐ গুলি সমস্তই পাতলা রৌপ্যের চাকৃতি হইতে প্রস্তুত, একখানি গোলাকার, অপরগুলি গোলাকার বটে কিন্তু উহাদের মুখগুলি গরুর শৃঙ্গের মত বাঁকান। যে সভায় ঐ প্রবন্ধ পঠিত হয় সে সভায় ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র উপস্থিত ছিলেন। তিনি এবং অপর কেহ কেহ মত প্রকাশ করেন যে রৌপ্য নির্ম্মিত দ্রব্যগুলি হিন্দুর কোন ক্রিয়াকলাপে ব্যবহৃত হইত।

তাম্রের অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে কতকগুলি লম্বে ২৪$\frac{৩}{৪}$, ২১$\frac{১}{২}$ ও ১৭$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি এবং ধারাল দিকে চওড়ায় ৩ বা ৪ ইঞ্চি। অপর কতকগুলি লম্বে ৮$\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চি ও চওড়ায় ৬$\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি। অধিকাংশ অস্ত্রই $\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চি পুরু।

রৌপ্যের চাকতিগুলি এক শৃঙ্গ হইতে অপর শৃঙ্গ পর্য্যন্ত ৪$\frac{১}{২}$, ৫ ও ৫$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি চওড়া। অপর দিকের ব্যাস ৪ হইতে ৫$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি।

যে স্থান হইতে ঐ গুলি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল, সে স্থানটা পোড়ো জমি। সকলগুলি এক স্থানেই ছিল। তিন ফুট লম্বা, তিন ফুট চওড়া ও ৪ ফুট গভীর এক গর্ত্ত খনন করিয়া উহাদিগকে উত্তোলন করা হয়।
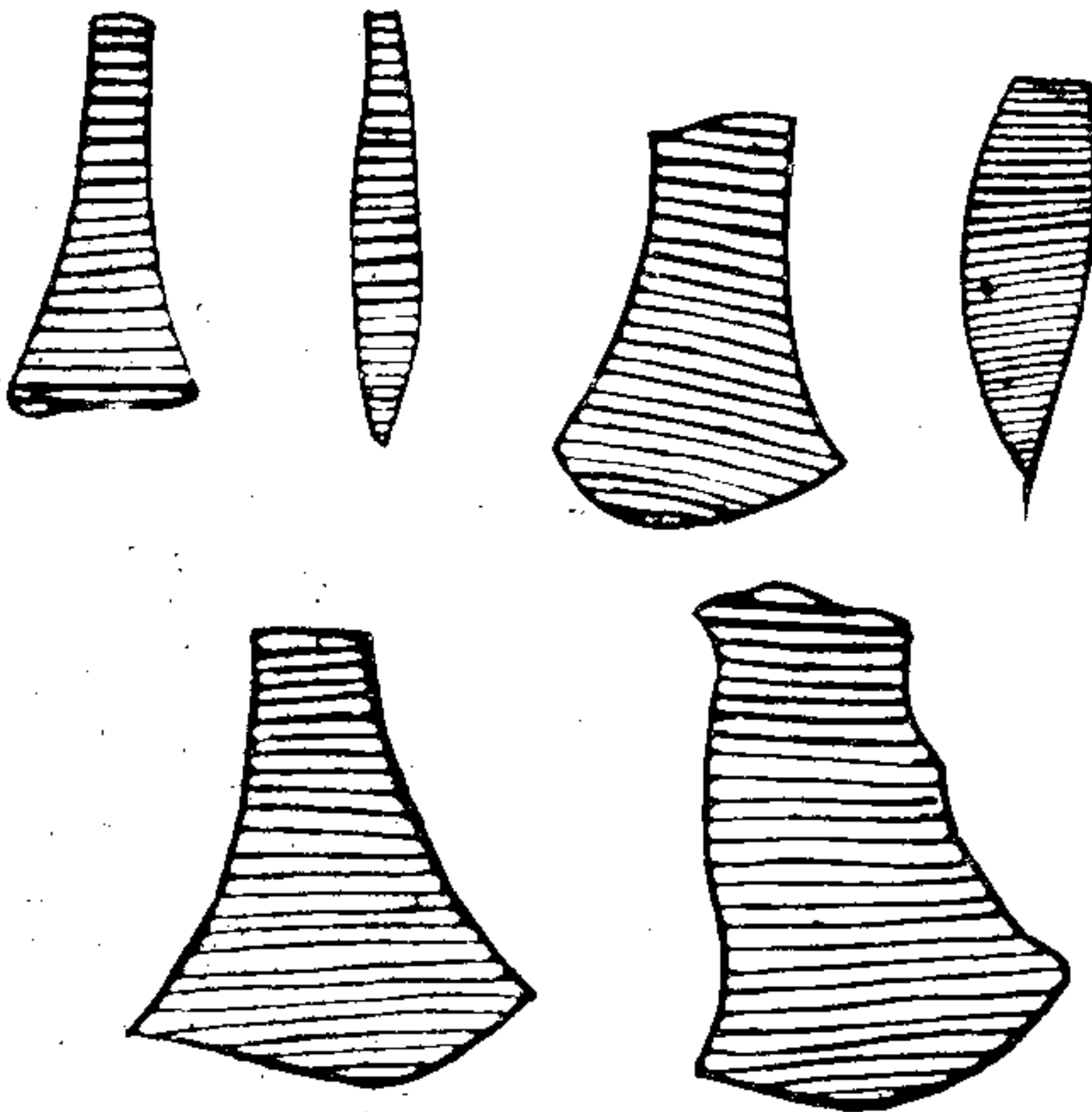
গুঞ্জেরিয়া গ্রামে প্রাপ্ত তাম্রনির্ম্মিত অস্ত্রশস্ত্র।

এই তাম্র ও রৌপ্যের রাসায়নিক পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। এ, টুইন সাহেব পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে তাম্রনির্ম্মিত তৈজসগুলি বিশুদ্ধ তাম্রের দ্বারা প্রস্তুত, উহাতে শতকরা ১½ ভাগ সীসক আছে। রৌপ্যও বিশুদ্ধ, মাত্র শতকরা ·৩৭ ভাগ স্বর্ণ আছে।

এই তাম্র ও রৌপ্য কোন শতাব্দীর যে তাহা সঠিক নির্ণয় করা কঠিন। যেস্থানে উহা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল সে স্থানটা পতিত জমি, আশেপাশে কোনও ঐতিহাসিক স্থান বা মন্দিরাদি নাই। কেবল ঐ স্থানের তিন মাইল দক্ষিণপশ্চিম দিকে একটি বৌদ্ধ মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে। তবে এটা ঠিক যে এই তাম্র ও রৌপ্য অতি প্রাচীনকালের—যখন ভারতে মানব-

গুঙ্গেরিয়া গ্রামে প্রাপ্ত রৌপ্যনির্ম্মিত দ্রব্য।
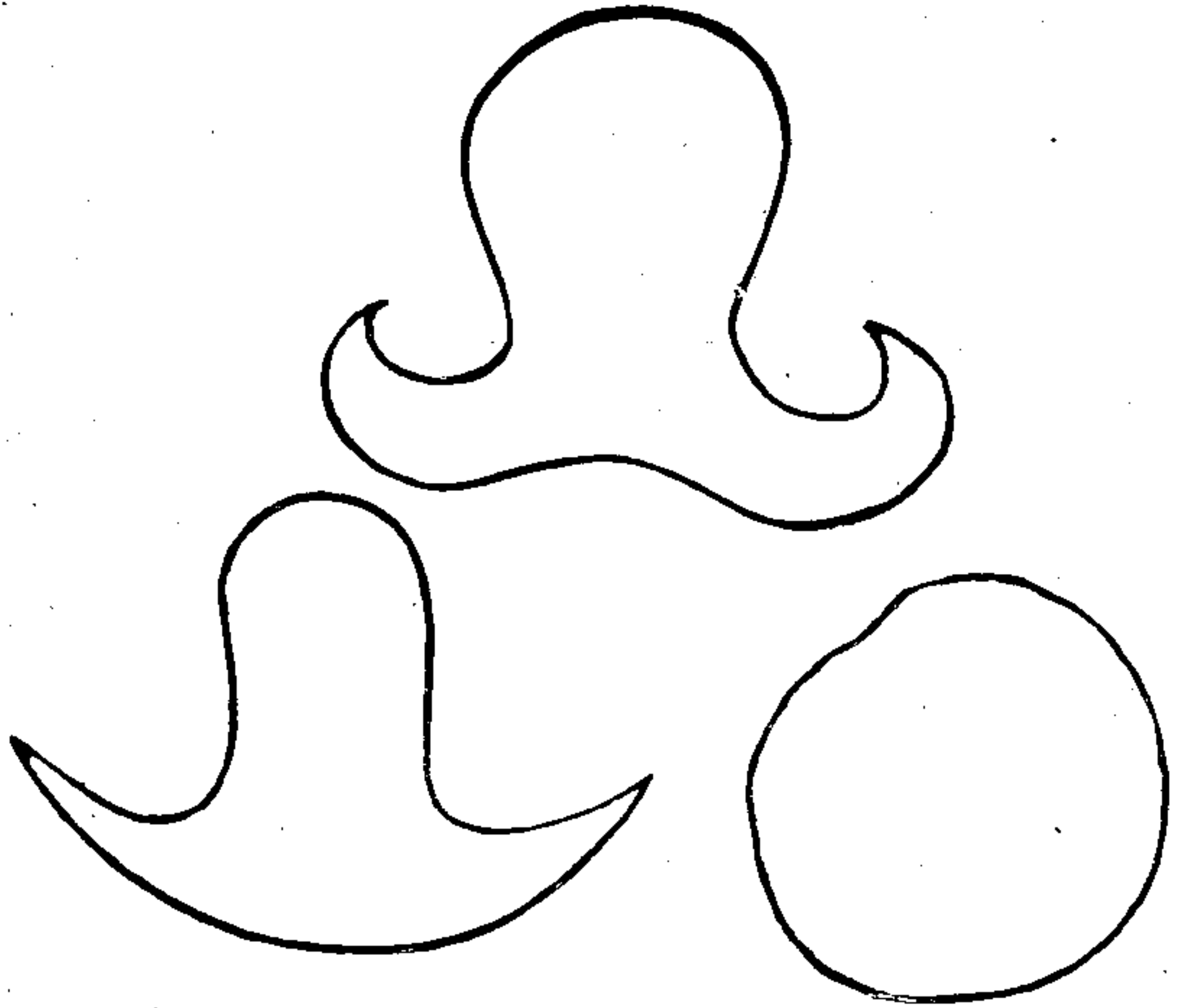
সমাজ লৌহের অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করিতে শিখে নাই, তাম্রের অস্ত্র শস্ত্র ব্যবহার করিত। প্রাণীতত্ত্ব ও ভূতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে মানবসমাজ যত সভ্যতার উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতে থাকে, তত তাহাদের ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হয়। প্রথমে প্রস্তরনির্ম্মিত অস্ত্রশস্ত্র পরে তাম্র ও ব্রঞ্জ (Bronze) নির্ম্মিত অস্ত্রাদি, ও ক্রমে ধাতুবিত্যার ক্রমোন্নতি সহকারে লৌহনির্ম্মিত অস্ত্রাদি ব্যবহৃত হইয়াছে। ভারতে ব্রঞ্জনির্ম্মিত প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্রাদি প্রায় মিলে না। অতএব ভারতে তিনটি অস্ত্রযুগ চলিয়া আসিয়াছে—প্রস্তরযুগ, তাম্রযুগ ও লৌহযুগ। ভারতে লৌহশিল্পের

প্রাচীন নমুনা দৃষ্টে বেশ বুঝা যায় যে পৃথিবীর অপরাপর দেশ অপেক্ষা ভারতে লৌহযুগ প্রাচীনতর কাল হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। পঞ্চম খ্রীষ্টাব্দের নির্ম্মিত দিল্লীর লৌহস্তম্ভ দৃষ্টে বেশ প্রতীয়মান হয় যে তাহার অনেক শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে লৌহযুগ ভারতে প্রবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে। অশোকস্তম্ভের তাম্রকীলক দৃষ্টে মনে হয় যে তাম্রযুগ অশোকেরও বহু পূর্ব্ববর্ত্তী। অতএব গুঙ্গেরিয়া গ্রামে আবিষ্কৃত তাম্র ও রৌপ্যনির্ম্মিত তৈজসাদি অশোকযুগেরও পূর্ব্বে নির্ম্মিত। এই অস্ত্রগুলি পরীক্ষা করিলে মনে হয় যে ঐগুলি পূর্ব্বে কখনও ব্যবহৃত হয় নাই—নূতন অবস্থাতেই আছে। এতগুলি তাম্র ও রৌপ্যের নূতন তৈজসাদি একস্থানে প্রাপ্ত হওয়াতে স্বতই অনুমিত হয় যে ঐস্থানে নিশ্চয়ই তাম্র ও রৌপ্যের কারখানা বা দোকান ছিল।

রাজপুতানায় আবিষ্কৃত তাম্র-দ্রব্যাদি

রাজপুতানার অন্তর্গত নাগর নামক একটি স্থানের ধ্বংসাবশেষ খনন করিয়া প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কার্লাইল সাহেব (Mr. (Carllyle) ভূগর্ভ হইতে অনেক দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহার মধ্যে তাম্রের আংটি, পাত, চাবি, চরকার কাটি, (spindle) তার, প্রভৃতি বিবিধ তাম্রঘটিত দ্রব্য বহুলপরিমাণে ছিল।(৬) এখানে তাম্রের যে একটা কারখানা ছিল এবিষয়ে সন্দেহ নাই।

এই নাগর নামক স্থানের ধ্বংসাবশেষ অতি প্রাচীন। স্থানীয় প্রবাদ এই যে উহার স্থাপয়িতা যদুবংশের শ্রীকৃষ্ণের সমসাময়িক। এই প্রবাদ ছাড়িয়া দিলেও ঐস্থানে প্রাপ্ত বহুসংখ্যক মুদ্রাই উহার প্রাচীনত্ব ঘোষিত করিতেছে। কার্লাইল সাহেব এস্থান হইতে ছয় সহস্র মুদ্রা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। জেনারাল কানিংহাম তাহার মধ্যে ছয়শত মুদ্রা অশোকাক্ষরে খোদিত বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন এবং উহাদের কাল খৃষ্টপূর্ব্ব ২৫০ অব্দ হইতে ২৮০ খৃষ্টাব্দ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কার্লাইল সাহেব মনে করেন যে সুবিখ্যাত পম্পে (Pompey) নগরের মত এই স্থান সহসা আগ্নেয়গিরির প্রস্রবণে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। যাহা হউক এই স্থানে প্রাপ্ত তাম্রনির্ম্মিত চাবিকাটি, চরকার কাটি প্রভৃতি দৃষ্টে বোধ হয়, যে উহারা লৌহযুগের পূর্ব্বেই নির্ম্মিত হইয়াছিল।

শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী।

---

(৬) তাম্রঘটিত এই সকল বিবিধ তৈজসাদির পরিচয় Archeological Survey of India Report Vol. VI. p.162-195 ও এবং Archeological Survey of India Report Vol. XII, p. 363 দেখুন।

প্রাচীনলিপির পাঠোদ্ধার

ভারতবাসীর শুভমুহূর্ত্তে ইংরাজী ১৭৮৪ সালের জানুয়ারী মাসে বিশ্ববিখ্যাত সার উইলিয়ম জোন্স কর্ত্তৃক এশিয়াখণ্ডের শিল্প, ইতিহাস, শাস্ত্র, সাহিত্য প্রভৃতির অনুসন্ধান লিখিত "বঙ্গদেশীয় এসিয়াটিক সোসাইটী" স্থাপিত হয়। ইহাতে সে সময়ের নানাদেশীয় সুপণ্ডিতগণ একত্রিত হইয়া নিজ নিজ মতানুসারে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের সফলতার জন্য কার্য্যক্ষেত্রে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ঐতিহাসিক বিষয়ে পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে কেহ প্রাচীনলিপি, কেহ দানপত্র, কেহ প্রাচীন মুদ্রা, কেহ পুরাতন পুস্তকাদির তথ্য নির্ণয় করিতে সূচনা করেন। এইরূপ আলোচনায় সর্ব্বপ্রথমে ভারতবর্ষীয় প্রাচীন-লিপির উপরই সুধীগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল।

ইংরাজী ১৭৮৫ সালে চার্লস্ উইল্কিন্স্ সাহেব দিনাজপুরের বোদাল নামক স্থানের স্তম্ভলিপি পাঠ করেন।(১) এই লিপি বাঙ্গলার রাজা নারায়ণপালের সময়ের বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়। উক্ত সালেই পণ্ডিত রাধাকান্ত শর্ম্মা দিল্লীর চৌহান-নৃপতি বীসলদেব বা বিগ্রহরাজের (২) সময়ের লিপির পাঠোদ্ধার করেন। এই লিপি দুইখানির অক্ষরে দেবনাগরীর সহিত যথেষ্ট মিল ছিল বলিয়া অতি সহজেই পঠিত হয়। কিন্তু সেই বর্ষেই জে, হ্যারিংটন সাহেব বুদ্ধগয়ার সমীপবর্ত্তী "নাগার্জ্জুনী" ও "বরাবর" গুহায় ইহাপেক্ষা পুরাতন মৌখরীবংশীয় (৩) রাজা অনন্তবর্ম্মার যে তিনখানি লিপি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা "গুপ্তলিপির" (৪) তুল্য হওয়ায় তাহার পাঠোদ্ধার অপেক্ষাকৃত কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু চার্লস উইল্কিন্স সাহেবের চারি বৎসরের প্রভূত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে, ১৭৮৯ সালে উহার পাঠোদ্ধার সাধিত হয়।

---

(১) ইং ১৭৮১ সালে উইল্কিন্স সাহেব মুঙ্গেরে প্রাপ্ত রাজা দেবপালের একখানি দানপত্র পাঠ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাও ১৭৮৮ সালে মুদ্রিত হয়। Asiatic Researches, Second Edition, Vol I.P. 110-113

(২) ইনি বিদ্বান্ ও সুকবি ছিলেন। ইঁহার রচিত "হরকেলি" নাটকের অংশবিশেষ খোদিত অবস্থায় আজমীরে পাওয়া যায়। বল্লভদেব "সুভাশিতাবলী"তে তাঁহার রচিত একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। ("সুভাশিতাবলী" ১৯৫ পৃষ্ঠা, ১১৬২ শ্লোক।)

(৩) জেনারল কানিংহাম গয়ায় একটি মুদ্রা পাইয়াছিলেন। তাহাতে "পালি" অক্ষরে "মোখলীণাং" (মৌখরীণাং) লিখিত ছিল। (Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol III, Introduction P. 14) ইহা হইতে এই বংশের সুপ্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয়। "হর্ষচরিতে" দেখা যাইতেছে, শ্রীহর্ষের ভগিনী রাজ্যশ্রীর এই বংশীয় রাজা অবন্তিবর্ম্মার পুত্র গ্রহবর্ম্মার সহিত বিবাহ হইয়াছিল। (হর্ষচরিত, Bombay Edition, উচ্ছ্বাস ৪, ১৫৬ পৃঃ) দেববর্ণারক নামক স্থানে প্রাপ্ত একখানি লিপিতে শববর্ম্মার পর অবন্তিবর্ম্মার নাম এবং তিনি যে গ্রহবর্ম্মার পিতা ছিলেন, একথারও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

(৪) গুপ্ত বংশীয় নৃপতিগণের সমসাময়িক প্রচলিত লিপিকে "গুপ্ত-লিপি" বলা হইয়া থাকে।

ইহা হইতেই "গুপ্তলিপির" অর্দ্ধেক বর্ণমালার জ্ঞান প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

ইহার কয়েক বৎসর পরে, দাক্ষিণাত্যে ডাক্তার বী, জী, ব্যাবিংটন সাহেব মামল্লপুরের কতকগুলি সংস্কৃত ও তামিলভাষার প্রাচীন-লিপি পাঠ করিয়া ইং ১৮২৮ সালে উহার বর্ণমালা প্রস্তুত করেন।(৫)

তৎপরে ওয়াল্টার সাহেব প্রাচীন কানেড়ি অক্ষর অতিশয় যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা করেন। ইং ১৮৩৩ সালে তিনি উহার বর্ণমালা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ইং ১৮৩৪ সালে কাপ্তেন ট্রোয়ার এই কঠোর অধ্যবসায়সাধ্য অনুসন্ধানে যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি প্রয়াগের স্তম্ভ-খোদিত সমুদ্রগুপ্তের শিলালিপির কিয়দংশমাত্র পাঠ করেন।(৬) এই সালে ডাক্তার মিল কর্ত্তৃক এই লিপির সম্পূর্ণ পাঠ এবং ১৮৩৭ সালে ভিটারীর স্তম্ভস্থিত স্কন্দগুপ্তের লিপির পাঠোদ্ধার সাধিত হয়।(৭)

১৮৩৫ সালে ডব্লিউ, এইচ, বোথন সাহেব বল্লভীর বহু দানপত্রের পাঠ প্রকাশিত করেন। (৮)

ইং ১৮৩৭—৩৮ সালে জেম্‌স্ প্রিন্‌সেপ্ সাহেব দিল্লী, কহাউ, এরণের স্তম্ভগুলির, সাঞ্চী ও অমরাবতীস্তূপের এবং গিরনার পর্ব্বতের "গুপ্তাক্ষরে" লিখিত শিলালিপিগুলির পাঠ প্রস্তুত করেন। (৯) কাপ্তেন ট্রোয়ার, ডাঃ মিল এবং প্রিন্‌সেপ্ সাহেব মহোদয়গণের বিপুল শ্রমদ্বারা চার্লস্ উইল্‌কিন্‌স্ সাহেবের অর্দ্ধসমাপ্ত গুপ্তাক্ষরের বর্ণমালা সম্পূর্ণ হইয়াছিল। ইহাদ্বারা গুপ্তরাজগণের সময়ের লিপি, দানপত্র ও মুদ্রা প্রভৃতি পাঠের কতদূর সাহায্য হইয়াছিল, তাহা বলাই নিষ্প্রয়োজন।

গুপ্তলিপি অপেক্ষাও প্রাচীনতর "পালি-লিপি"র (১০) পাঠোদ্ধার করা ইহাপেক্ষাও অতীব দুষ্কর হইয়াছিল। ইং ১৭৯৫ সালে সার চার্লস্ মেলেট্ সাহেব ইলোরা-গুহা হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি লিপির ছাপ প্রস্তুত করিয়া সুপ্রসিদ্ধ উইলিয়ম জোন্সের নিকট প্রেরণ করেন। তিনি আবার সেই ছাপগুলিকে উইল্‌ফোর্ড সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দেন। কিন্তু উইলফোর্ড সাহেব নানা চেষ্টা সত্ত্বেও উহার পাঠ আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। সে সময়ের একটি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত তাঁহাকে প্রাচীন লিপি সম্বন্ধীয় বর্ণমালার নানাপুস্তক দেখাইয়া নিজ কল্পনা বলে সেই লিপিগুলির একটী আংশিকপাঠ প্রস্তুত করেন। উইংফোর্ড সাহেব সেইভাবে উহার পাঠ ও ভাষান্তর প্রণয়ন করিয়া পুনরায় উইলিয়াম জোন্সের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। বহুদিন পর্য্যন্ত এই পাঠের শুদ্ধাশুদ্ধ সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু তাহার বহুদিন পরে সেই পাঠ এবং ভাষান্তর একেবারে ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপাদিত হইল।

---

(৫) Transactions of Royal Asiatic Society, Vol II, P. 264—269, Plate. 13,15,17,18

(৬) Journal of Asiatic Society Bengal, Vol III, P. 118.

(৭) J. A. S. B. Vol. VI, P. 1

(৮) J. A. S. B. Vol. IV, P. 876.

(৯) J. A. S. B Vol. VI, P. 7.

(১০) রাজা অশোকের ধর্ম্মাজ্ঞার ভাষা পালি বলিয়া এই লিপির "পালি" নাম দেওয়া হইয়াছে। এই

বঙ্গীয় এসিয়াটিক্ সোসাইটির সংগ্রহে দিল্লী ও এলাহাবাদের স্তম্ভের এবং খণ্ডগিরির গাত্রস্থ লিপিগুলির ছাপ্ গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু উইলফোর্ড সাহেবের যত্ন নিষ্ফল হওয়ায় বহুবর্ষ পর্য্যন্ত এই লিপিগুলির পাঠোদ্ধার করিতে কেহই অগ্রসর হয়েন নাই। কিন্তু প্রিন্‌সেপ সাহেবের মনে লিপিগুলির বৃত্তান্ত জানিবার জন্য একটী প্রবল কৌতূহল জাগ্রত হইয়াছিল। তিনি ইং ১৮৩৪-৩৫ সালে এলাহাবাদ, রাধিয়া এবং মথিয়ার স্তম্ভগুলির লিপি আলোচনার্থ প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি কৌতূহলবশে কোনো শব্দের মিল আছে কিনা দেখিবার জন্য দিল্লীর লিপির সহিত মিলাইয়া মিলাইয়া এই লিপিগুলির পাঠ প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। এইরূপ চারিটি লিপি সম্মুখে রাখিয়া মিলাইতে মিলাইতে দেখা গেল যে চারিটি লিপির মধ্যে কোনই প্রভেদ নাই। ইহাতে তাঁহার উৎসাহ আরও বাড়িয়া গেল এবং কৌতূহল চরিতার্থ হইবে বলিয়া তিনি মনে মনে দৃঢ় আশা পোষণ করিতে লাগিলেন। এলাহাবাদের লিপি হইতে বিভিন্ন আকৃতির অক্ষরগুলিকে পৃথক করিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন যে, উহাতে অনেকগুলি অক্ষরের সহিত স্বরের জন্য গুপ্তাক্ষরের অনুরূপ পাঁচটি চিহ্ন সংযুক্ত আছে। তিনি সেগুলিকে একত্র করিয়া পৃথক ভাবে সাজাইলেন। (১১) ইহা হইতে সে সময়কার পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে এইগুলিকে গ্রীক্ (যুনানী) বলিয়া যে ভ্রান্ত ধারণা ছিল, তাহা নিরাকৃত হইল। স্বরবর্ণের চিহ্ন জ্ঞাত হইলে পর, মিঃ প্রিন্সেপ্ সমস্ত অক্ষরের পরিচয় লাভের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিলেন। লিপিখানির প্রত্যেক অক্ষর মিলাইয়া উহার বর্ণমালার ক্রমানুসারে গ্রথিত করায় তাঁহার প্রায় এই সমস্ত অক্ষরের সম্বন্ধে বিশিষ্ট অধিকার জন্মিয়াছিল।

প্রিন্‌সেপ্ সাহেবের সহিত পাদরী জেমস্ ষ্টিভেনসনও এই অনুসন্ধানে যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি উক্ত লিপির 'ক', 'জ', 'প', এবং 'ব' অক্ষর পড়িতে সমর্থ হইয়াছিলেন। (১২) তৎপর এই অক্ষরের সহায়তায় তিনি লিপিখানির পাঠোদ্ধার ও ভাষান্তর করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠেন। কিন্তু কোন কোন অক্ষর-পরিচয়ে ভ্রমবশতঃ বর্ণমালা সম্পূর্ণ না হওয়াতে (১৩) এবং লিপির ভাষাকে সংস্কৃত বলিয়া পাঠ করায় তাঁহার সমস্ত চেষ্টা নিষ্ফল হইয়াছিল। কিন্তু প্রিন্‌সেপ সাহেব নিরাশ হয়েন নাই। ইং ১৮৩৬ সালে অধ্যাপক লাসেন একটি ব্যাক্‌ট্রিয়ান মুদ্রায় এই অক্ষরে লিখিত এগাথোক্লিস (Agathocles) নাম পড়িয়াছিলেন। ইং ১৮৩৭ সালে মিঃ প্রিন্সেপ সাঞ্চীতে প্রাপ্ত স্তম্ভ-খোদিত কয়েকখানি লিপি একত্রিত করিয়া তাহার আলোচনা করেন। তাহাতে তিনি লক্ষ্য করিলেন যে, সকল লিপিরই শেষ ভাগের দুইটি অক্ষর সম্পূর্ণ এক এবং প্রত্যেক লিপিরই

(১১) Journal of the Asiatic Society, Bengal, Vol, III, P. 117 Plate 5.

(১২) J. A. S. B. Vol III. P. 485.

(১৩) "ন" কে "র" পড়িয়াছিলেন। "দ"র পরিচয়ও অসমাপ্ত ছিল।

আরম্ভে "স" অক্ষর দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। ইহাকে তিনি প্রাকৃত ভাষার ষষ্ঠী বিভক্তির এক বচন ধরিয়া লইয়া এই অনুমান করিয়াছিলেন যে, এই লিপিগুলি বিভিন্ন ব্যক্তির বিষয় প্রকটিত করিতেছে, অন্তে স্থিত দুইটি অক্ষরের মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তী অক্ষরের সহিত আকারের চিহ্ন রহিয়াছে এবং পরবর্ত্তী অক্ষরের অন্তে অনুস্বার দৃষ্ট হইতেছে। এইরূপে প্রথম অক্ষর "দা" ও দ্বিতীয় অক্ষর "নং" (দানং) পড়িলে প্রকৃত পাঠোদ্ধার লাভ হয়। এই অনুমানানুসারে "দ" এবং "ন" অক্ষরের প্রকৃত জ্ঞান হওয়াতে বর্ণমালা একরূপ সম্পূর্ণ হইয়া গেল। সেই সঙ্গে সঙ্গে দিল্লী, এলাহাবাদ, সাঞ্চী, মথিয়া, রাধিয়া, গিরনার, ধৌলী প্রভৃতি স্থানের লিপিগুলির যথাযথ পাঠ অনায়াসেই উদ্ধৃত হইয়াছিল। ইহার পর, লিপির ভাষা সংস্কৃত বলিয়া যে অনুমান করা হইয়াছিল, তাহা অসত্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইল এবং ঐ ভাষা উক্ত স্থানের প্রাদেশিক প্রাকৃত-ভাষা বলিয়াই গৃহীত হইল। পালি অক্ষরের এবম্বিধ পাঠোদ্ধারে পরবর্ত্তী সময়ের লিপি পাঠ যথেষ্টরূপে সুগম হইয়াছিল। কারণ, ভারতবর্ষের যাবতীয় প্রাচীন লিপিগুলি ইহা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে।

ইহার পর কর্ণেল টড্ ব্যাক্‌ট্রিয়ান এবং সীথিয়ান (১৪) মুদ্রার একটি বিরাট সংগ্রহ প্রকাশ করেন। তাহার মধ্যে কতকগুলি গ্রীক্ এবং কতকগুলি গান্ধার লিপিতে মুদ্রিত। জেনারেল ওয়াণ্টর সাহেব ইং ১৮৩০ সালে মানিকালার স্তূপ খনন করাইয়াছিলেন। (১৫) তাহাতে তিনি এই অক্ষরের কয়েকটি মুদ্রা এবং দুইটি লিপি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার পর সার আলেক্‌জেণ্ডার বার্ণস্ প্রমুখ পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ এইরূপ আরও কতকগুলি মুদ্রা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে যেগুলি গ্রীক্ অক্ষরে লিখিত সেগুলি অনায়াসে পঠিত হইয়াছিল। কিন্তু গান্ধার অক্ষরে লিখিত মুদ্রাগুলি পড়িবার জন্য সে সময়ে বিশেষ কোন প্রয়াস দৃষ্ট হয় নাই। কিন্তু এই অক্ষরের উদ্ধার সাধনে নানা-প্রকার জল্পনা কল্পনা চলিতে লাগিল। ইং ১৮২৪ সালে কর্ণেল টড্ সাহেব কড্‌ফিসসের (Kadphises) মুদ্রার এই আকারের অক্ষরকে "সাসেনিয়ন" নামে অভিহিত করিলেন। ইং ১৮৩৩ সালে এপোলোডোটসের (Apollodotos) ব্যাক্‌ট্রিয়ান মুদ্রার এই অক্ষরকেই মিঃ প্রিন্‌সেপ "পহলবি" অনুমান করিয়াছিলেন। আবার তিনি একটি সীথিয়ান মুদ্রার লিপি ও মানিকালার লেখের লিপিকেও "পালি" স্থির করিয়াছিলেন। এই লেখ্যের আকৃতি বক্র হওয়ায় তাঁহার এইরূপ অনুমান হইয়াছিল যে ছাপা এবং মহাজনী লিপির নাগরাক্ষরের মধ্যে যেরূপ বিভিন্নতা আছে সেইরূপ দিল্লী প্রভৃতির লেখ্যগুলির পালিলিপির ও লিপির মধ্যে সেইরূপ বিভিন্নতা আছে। কিন্তু পরে তিনি নিজেই আপনার অনুমান অসত্য বলিয়া প্রচার

(১৪) সীথিয়ান নৃপতিগণের মুদ্রার বিশেষ বিবরণের জন্য Princep's "Indian Antiquities" Vol I, Plate 21—22 দ্রষ্টব্য।

(১৫) Ibid, Vol I, P. 93—99.

করিয়াছিলেন। ইং ১৮৩৪ সালে কাপ্তেন কোর্ট এক স্তূপমধ্য হইতে এইরূপ অক্ষরের আর একটী লেখা প্রাপ্ত হন। এই লিপি-খানিকে দেখিয়া মিঃ প্রিন্‌সেপ পুনরায় এই অক্ষরকে "পহলবি" স্থির করেন। মিঃ মেসন সাহেব যখন পুরাতত্ত্বানুসন্ধানের নিমিত্ত আফগানিস্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন তিনি স্থির করেন যে, গ্রীক্ অক্ষরে যে কতক-গুলি নাম মুদ্রার একপৃষ্ঠায় পাওয়া যায় তাহারই অপরপৃষ্ঠায় সেই নামগুলিই গান্ধার লিপিতে লিখিত রহিয়াছে। মিনেণ্ড্রো (Menandrou) এপোলোডোটো (Apollodotou) অরমেয়ো (Ermaiou), বেসিলিয়স (Basileos) এবং সোটরস্ (Soteros) প্রভৃতি শব্দের 'পহলবি' চিহ্ন দেখিতে পাইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ প্রিন্‌সেপ সাহেবের নিকট পত্র লিখিয়াছিলেন। মিঃ প্রিন্‌সেপ উক্ত চিহ্নানুসারে মুদ্রাগুলি পড়িয়া দেখিলেন যে বিশুদ্ধ পাঠ সংকলিত হইয়াছে। গ্রীক অক্ষরানুসারেও পড়িলেন; পড়িয়া দেখিতে পাইলেন, ক্রমানুসারে ১২ জন নৃপতির নাম পাওয়া যাইতেছে এবং তৎসহ ৬টি উপাধিও সংযুক্ত রহিয়াছে। এ প্রকারে এই অক্ষরের বিশেষ জ্ঞান হওয়ায় ইহাও জানিতে পারিলেন যে এই এই অক্ষর দক্ষিণ হইতে বামে পাঠ করিতে হয়। ইহা হইতে সিদ্ধান্তও হইয়া গেল, যে এই অক্ষর সেমিটিক বর্গের অন্তর্গত। এইরূপে গ্রীক্ অক্ষরের সাহায্যে বহু অক্ষরের পরিচয় লাভ ঘটিয়াছিল। কিন্তু "পহলবি" ভাষার নিয়মানুসারে পাঠ করিতে উদ্যোগ করায় অক্ষরের প্রকৃত পরিচয়ে অশুদ্ধতা হইতেছিল। এই জন্য অনুসন্ধানও বিশেষ অগ্রসর হইতে পারে নাই। ইং ১৮৩৮ সালে প্রাচীন ব্যাক্‌ট্রীয়া রাজ্যের সীমায় প্রাপ্ত কতকগুলি মুদ্রায় পালি অক্ষর দেখিতে পাওয়াতে এবং পূর্ব্বোক্ত লেখাগুলির ভাষাকে পালিরূপে পাঠ করায় উহার অনুসন্ধানকার্য্য অনেকটা অগ্রবর্ত্তী হইয়াছিল। মিঃ প্রিন্সেপ মাত্র ১৭টী অক্ষর চিনিতে পারিয়াছিলেন। এই অনুসন্ধানের অন্যতম কার্য্যকারী মিঃ নৌরিস্ মাত্র ৬টী অক্ষরের পরিচয় লাভ করেন। অবশেষে মিঃ প্রিন্সেপ্ বিলাতে চলিয়া গেলে সুবিখ্যাত কানিংহাম সাহেব অবশিষ্ট ১১টী অক্ষরের এবং সংযুক্তাক্ষরের উদ্ধার সাধন করিয়া এই বর্ণমালা সম্পূর্ণ করেন।

আজকাল আমাদের দেশে পুরাতত্ত্বা-লোচনায় অনেকেই যোগদান করিতেছেন। ইহা অতীব শুভ লক্ষণ, সন্দেহ নাই। কিন্তু অনেকক্ষেত্রেই এবম্বিধ আলোচনা প্রকৃতপথে পরিচালিত হইয়াছে কিনা, তাহা অসংশয়ে বলা যায় না। এ অবস্থায় এ কার্য্যের ও তাহার প্রণালীর প্রকৃত নেতা ও প্রথম উদ্যোক্তা ইংরেজগণের নিকট যে আমাদের শিক্ষণীয় বহু বিষয় পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা উপেক্ষা করা যায় না। এ বিষয়টী যত শীঘ্র আমাদের উপলব্ধ হইবে, ততই দেশের মঙ্গল বুঝিতে হইবে। কারণ, এই জ্ঞানের অভাববশতঃ এদেশ ছাড়িয়া কালানুরূপ সংস্কৃত-শিক্ষার নিমিত্ত বিদেশগমন বর্ত্তমান সময়ে অতি নিরর্থক বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। ইংরেজগণেরও প্রাচ্য-জ্ঞানের প্রতি আমা-দের যে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আছে, তাহাও আমাদের সম্পূর্ণ আত্ম-প্রসাদ-লাভের যোগ্য

নহে। (১৬) আধুনিক সময়ে আমরা যদি এদেশের পাণ্ডিত্যের গভীরতার সহিত অপর দেশের বৈজ্ঞানিক প্রণালীর সংযোগ স্থাপন করিতে পারি তাহা হইলে আমাদের প্রকৃত তথ্যানুসন্ধান সমগ্র জগতের আদর্শনীয় হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রথম অবস্থায় বিদেশীয় পণ্ডিতগণ কিরূপ বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়া কেবলমাত্র প্রবল অধ্যবসায় ও উৎসাহের সহিত আমাদের দেশের ইতিহাসের নিমিত্ত প্রাচীন লিপির উদ্ধার সাধন করেন, তাহাই প্রদর্শন করা এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। এ কালে নানা সুবিধা সত্ত্বেও যদি আমরা এই কার্য্যে অবহেলা করিয়া অবসর কালকে সুদীর্ঘ করিতে থাকি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই জগতের নিকট আমাদের মুখ দেখাইবার পথ থাকিবে না।

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

যাচনা

প্রতিদিন প্রভু একটুকু কাজ,
দিও মোর শিরে তুলে,
যাহে রত রহি চিত্ত আমার,
বিপথে যাবেনা ভুলে।
প্রতিদিন প্রভু বক্ষে আমার,
একটু আঘাত দিও,
যাহার ব্যথায় জাগিয়া চিত্ত,
তোমারে স্মরিবে প্রিয়।

প্রতিদিন দিও দিবসের শেষে,
একটু বিমল শান্তি,
যাহার পরশে দূরে যাবে সখা
সারা দিবসের ক্লান্তি।
প্রতিদিন প্রভু করুণা ভরিয়া,
তোমার দুয়ারে ডেকো,
প্রতিদিন মোরে হে চিরশরণ!
তোমারি চরণে রেখো।

কুমারী সুধেন্দুমুখী রায়।

মণিকারের প্রতি

ক্ষুদ্র হাতুড়িটি নিয়ে শুধু রাত্রি দিন,
দীপ জ্বালি অন্ধগৃহে ওগো মণিকার!
অক্লান্ত, অনন্যকর্ম্মা, বিরামবিহীন,
সন্তর্পণে গড়িতেছ স্বর্ণ চন্দ্রহার!
ওগো শিল্পি! অন্তরের সর্ব্ব অনুরাগ
প্রাণের যতন রাশি বিন্দু বিন্দু করি,
ঢালিতেছ ক্ষুদে ক্ষুদে প্রতি ক্ষুদ্রভাগে
জীবন-সঞ্চিত অর্ঘ্য দি'ছ তায় ভরি'।

একি শুধু তুচ্ছ তব দগ্ধোদর লাগি,
একি শুধু ঘৃণ্য হেয় অর্থ মুষ্টি তরে?
উথলিয়া উঠে নাকি ওগো অনুরাগী
আর কোনো তৃপ্তিরস হৃদি কুম্ভ ভরে'?
ভকতের অকৃত্রিম আনন্দের ধারা;
সাধনায় করেনি কি তোমা আত্মহারা?

শ্রীকালিদাস রায়।

(১৬) কারণ, তাহার ফলে সত্য নির্ণয়ে যে সকল রহস্যজনক দৃষ্টান্তের অভিনয় হইয়া গিয়াছে তাহা কোন ক্রমেই ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের অনুকরণীয় হইতে পারে না। যাহা হউক, সে কথার উল্লেখ মূলতঃ এ প্রবন্ধের বহির্ভূত বিষয়।

৭ই পৌষ

মহর্ষির দীক্ষা দিন উপলক্ষে আজ আমরা এখানে সকলে সমবেত হইয়াছি। যাঁহারা আমাদিগকে ধর্ম্মপথের—কল্যাণ পথের প্রকৃত সন্ধান জানাইয়া দেন, তাঁহারা আমাদের গুরু ও নমস্য। বর্ত্তমান যুগে মহর্ষিদেবের সমুন্নত জীবনের প্রভাব যেরূপ বিশেষ ভাবে কার্য্য করিয়াছে, তাহা নিতান্তই বিস্ময়জনক। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা কিন্তু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ না হইলে ব্রাহ্মসমাজ বুঝি এ ভাবে স্ফূর্ত্তিলাভ করিতে পারিত না। অদ্যকার এই শুভদিনে মহর্ষিদেব ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই দিন হইতেই তিনি আপনার সমুদয় বল বীর্য্য ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতিকল্পে নিয়োগ করিতে আরম্ভ করেন। এ দিনটি যে কেবল তাঁহার জীবনের একটি পবিত্র দিন তাহা নহে, এ দিন আমাদের সকলেরই পক্ষে স্মরণীয়। এই দিন হইতেই আমরা ধর্ম্মে, কর্ম্মে, নিষ্ঠায়, পবিত্রতায়, সাধুতায়, স্বার্থ-বিসর্জ্জনে, সাধনে ভজনে, একটি আদর্শ জীবন প্রত্যক্ষ করি।

১। আমরা তাঁহার প্রথম ধর্ম্ম জীবন আলোচনা করিয়া দেখিতে পাই, প্রকৃত সত্য অবধারণ করিবার জন্য তাঁহার কি ঔৎসুক্য, কি ব্যাকুলতা। প্রকৃত সত্য বুঝিবার জন্য তিনি বেদান্তবাগীশ প্রভৃতি চারি জনকে বেদাধ্যয়ন জন্য বারাণসীতে প্রেরণ করিতেছেন—অস্থির হইয়া বেড়াইতেছেন, ঈশ্বরের স্পর্শ এক একবার লাভ করিতেছেন, পরক্ষণেই তাঁহাকে হারাইতেছেন। এই সময়কার তাঁহার রচিত সঙ্গীত হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিয়া দিতেছে,—

আহা কে দিবে আনিয়ে তাঁরে,
হারায়ে জীবন শরণে কি কায জীবনে আমার।

ঈশ্বরের অন্বেষণে জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে তিনি প্রস্তুত, তাঁহাকে না পাইলে তিনি ফিরিবেন না।

২। তাঁহাতে আমরা আরো দেখিতে পাই, ধর্ম্মের জন্য অসাধারণ মুক্তহস্ততা। একান্ত ব্যাকুলতার পরে যখন তিনি তাঁহাকে লাভ করিলেন, তখন সে আনন্দ একাকী তিনি ধারণ করিয়া রাখিতে পারিলেন না। কিসে সকল লোক সেই আনন্দ উপভোগ করিবে, তাহার জন্য তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন,—নিজে প্রচারব্রত গ্রহণ করিলেন, আচার্য্য উপাচার্য্য প্রচারক নিয়োগ করিয়া সে আনন্দ বিলাইতে আরম্ভ করিলেন, অর্থব্যয়ের ইয়ত্তা রহিল না। তিনি তাঁহার আয়ের বহুল অংশ ধর্ম্ম প্রচারের জন্য অকাতরে ব্যয় করিতে লাগিলেন। প্রকৃত পক্ষে ধর্ম্ম জগতে তাঁহার মত মুক্তহস্ত পুরুষ নিতান্তই বিরল।

৩। তাঁহার দীনতা। তিনি ধনীর সন্তান। কিন্তু তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার জন্য সমুদয় অভিমান বিসর্জ্জন দিয়া—জনসাধারণের সহিত তুল্যভাবে মিশিতেন। অপরকে উচ্চ আসন দিতেন। প্রথমে তিনি বেদীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া উপদেশ দিতেন; বলিতেন আমি "ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে বসিয়া উপদেশ দিবার অধিকারী নই। বিদ্যাবাগীশ, বেদান্ত বাগীশ প্রভৃতি পণ্ডিতগণেরই উহাতে উপযুক্ত

অধিকার। আমি বিষয়ীর পুত্র। বিষয়ী যজমানের ন্যায় আচার্য্য ও পুরোহিতগণের অধস্তন সোপানে দাঁড়াইয়া কার্য্য করাই আমার পক্ষে ঠিক"। অনেক পরে সকলের অনুরোধে তিনি বেদীতে বসিতে আরম্ভ করেন।

৪। তাঁহার নিষ্ঠা। ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান তাঁহার রসনাবিনির্গত। এই সময়ে তিনি প্রতি বুধবারে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া সমস্তদিন প্রায় বেদীর নিম্নে ধ্যানস্থ হইয়া বসিতেন। মধ্যাহ্নের কিছু পূর্ব্বে একবার বাটী গিয়া স্নানাহার করিয়া আসিতেন সন্ধ্যার পূর্ব্বে আর একবার বাটী গিয়া স্নানান্তে পট্টবাস পরিধান পূর্ব্বক বেদীতে আসিয়া বসিতেন। প্রত্যা-দেশের ন্যায় অপূর্ব্ব ব্যাখ্যান তাঁহার মুখ হইতে সহজে বিনির্গত হইত। বৃদ্ধ বয়সে তিনি বলিতেন যে, "যখন আমি এ বয়সে ব্যাখ্যান পাঠ করিয়া জ্ঞানের সহিত মিলাইয়া দেখি আশ্চর্য্য হইয়া যাই,—বুঝিতে পারি না কেমন করিয়া সেই তরুণ বয়সে আমার মুখ হইতে সেই সকল উপদেশ বাহির হইয়াছিল।"

তাঁহার ব্যাখ্যান শ্রবণে সকলের হৃদয়ে কেন যে অমন দারুণভাবে ব্রহ্মানুরাগ জ্বলিয়া উঠিত যদি তাহার কারণ জিজ্ঞাসা কর, বলিব সে রহস্যের মূল তাঁহার অপূর্ব্ব নিষ্ঠা ও সাধনা।

৫। তাঁহার ভোগ।

"বিষয়ের সুখ যাহা, জানি তা।

কাজ নাই সে সুখে সে ধনে" ইহাই তাঁহার রচিত সঙ্গীত। বিষয়রাজ্যে তাঁহার ভোগ ছিল না, কিন্তু তাঁহার প্রকৃত সম্ভোগ "ব্রহ্মজ্ঞানে ব্রহ্মধ্যানে, ব্রহ্মামৃত রস পানে"।

তিনি বলিতেন "আমরা যে জেগে আছি এ জাগা নয়, এ যে মৃত্যু, এ যে অসাড়তা। আত্মার জাগাই জাগা, আত্মার স্পন্দনই প্রকৃত স্পন্দন।" তাঁহার বিরচিত সঙ্গীত হইতে তাঁহার হৃদয়ের প্রকৃত পরিচয় পাই—

"যোগী জাগে, ভোগী রোগী কোথায় জাগে
ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মামৃত রস পান
প্রীতি ব্রহ্মে যার সেই জাগে।"

৬। তাঁহার উপাসনাপরায়ণতা। মহর্ষি পরিবারবহুল সংসারে অবস্থান করিতেন। কত বিপ্লব কত শোকাবহ ঘটনা তাঁহার মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু সকল অবস্থাতেই তিনি অচল, অটল। একদিনের জন্যও তাঁহার উপাসনা ব্রত ভঙ্গ হয় নাই। তাঁহার ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরের ভাব সন্দর্শন করিয়া আমরা বিহ্বল হইয়া থাকিতাম।

৭। প্রকৃতির ভিতর দিয়া ঈশ্বর সন্দর্শন। আমরা প্রতিদিন "যোদেবোগ্নৌ যোপ্সু" এই মন্ত্র পাঠ করি। কিন্তু তিনি যে অগ্নিতে জলেতে সর্ব্ব বস্তুতে রহিয়াছেন—এ বাক্যের প্রকৃত মর্ম্ম আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। কিন্তু মহর্ষিদেব ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য, তাঁহার শক্তি, সকল পদার্থের ভিতরে সুস্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতেন। তিনি যৌবনকালে নৌকায় পদ্মার উপর বিচরণ করিতেছেন—পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাপাতে চারিদিক ধবলিত, তদ্দর্শনে তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া যাইত। তিনি অনিমিষনেত্রে সে শোভা সন্দর্শন করিতেন। সকল শোভার আকর, সকল সৌন্দর্য্যের প্রস্রবণ যিনি, তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়া, তাঁহার স্বত্বায় তিনি ডুবিয়া যাইতেন, তিনি নৌকার ছাদে বসিয়া অমৃত পান

করিতেন। চক্ষে নিদ্রা নাই আলস্য নাই, সমস্ত রাত্রি এইভাবে কাটিয়া যাইত। তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য।

আমরা তাঁহার পার্ক ষ্ট্রীটস্থ আবাস-নিকেতনে প্রায়ই যাইতাম। প্রাতে গিয়া দেখিয়াছি তিনি উদীয়মান সূর্য্যের উপরে পলকহীন দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার সমুদয় হৃদয় বিগলিত। যিনি সূর্য্যের সূর্য্য; তাঁহারই ধ্যানে নিমগ্ন।

বোলপুর শান্তিনিকেতনে তাঁহার বারাণ্ডার পূর্ব্বদিকের সমুন্নত গাছগুলি তিনি কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন। প্রাতঃসূর্য্যের উদয় দেখিয়া সে মহিমার মধ্যে নিত্য নিয়মিতরূপে ডুবিবেন এই তাঁহার প্রাণের সাধ ছিল। তিনি এত স্থান থাকিতে সেই বিশাল প্রান্তরের ভিতরে বোলপুরে শান্তিনিকেতন কেন প্রতিষ্ঠিত করিলেন -- তাহার উত্তরে তিনি বলিতেন যে সেই অসীমের সহিত হৃদয়ের ভাব মিলাইতে হইলে ঐরূপ অনুকূল প্রবাসের নিতান্ত প্রয়োজন। এই বিজন স্থানে কেন তিনি মন্দির স্থাপন করিলেন, তাহার উত্তর এই যে, লোকের কলরব নিবৃত্তি না হইলে ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ করা যায় না। তাই তিনি বিজন প্রান্তরে মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করিলেন, এবং জনসাধারণের সাধনের স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন।

৮। তাঁহার অনুশাসন। তাঁহাকে প্রীতি কর, তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন কর ইহাই তাঁহার উপদেশ। ঈশ্বরকে প্রীতি করা সকল ধর্ম্মেরই আদেশ, কিন্তু তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে না পারিলে যে উপাসনা অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়, ইহাই তাঁহার অনন্যসাধারণ বিশেষত্ব। আমরা প্রতিদিন প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিয়া দিবসের কার্য্যে প্রবৃত্ত হই, কিন্তু তাঁহার শিক্ষা "যাঁহার কৃপায় তুমি খুলিলে নয়ন, তাঁরে আগে দেখিও।" আজকাল ত কত মধুর সঙ্গীত রচিত হইতেছে, কিন্তু তাঁহার সঙ্গীতের বিশেষত্ব অনুভব করিয়া আমরা আশ্চর্য্য হইয়া যাই।

৯। তাঁহার অপরিবর্ত্তনীয় ভাব। "তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাস্য" তপস্যার দ্বারা তাঁহাকে লাভ করিতে হইবে। জ্ঞানে তিনি লভ্য, প্রেমে তিনি উপভোগ্য। ঋষিদিগের এই যে প্রাচীন বাক্য বর্ত্তমানযুগে তাঁহার জীবনে তাহার প্রত্যক্ষ নিদর্শন পাইয়াছি। ভাবের স্রোতে তিনি একদিনের জন্যও জ্ঞান হারাইয়া ফেলেন নাই, তাঁহার বিশ্বাসে, সাধনে, প্রচারে ও শ্রদ্ধায় একদিনের জন্যও তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনে কোন পরিবর্ত্তন আমরা লক্ষ্য করি নাই। বাক্যে ও ব্যবহারে নিষ্ঠার এমন অপূর্ব্ব সম্মিলন আর কোথাও দেখি নাই।

১০। ঈশ্বরের মঙ্গলস্বরূপে তাঁহার আশ্চর্য্য বিশ্বাস। আমরা তাঁহাকে শেষ বয়সে প্রায়ই বলিতাম যে "আপনার অভাবে ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিক ভাবের যে ভয়ানক দুর্গতি হইবে তাহা আলোচনা করিয়া আমরা ভীত হই।" তিনি আমাদিগকে আশ্বাস দিয়া বলিতেন যে, "ঈশ্বর তাঁহার এই পবিত্রতম সত্যধর্ম্মকে কখনই বিনষ্ট হইতে দিবেন না, তিনি ইহার উন্নতি ও রক্ষার উপায় ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের সত্য ম্লান হইবার নহে। রামমোহন রায়ের বোঝা যে আমার মস্তকের উপরে

আসিয়া পড়িবে কে ভাবিয়াছিল। তাঁহার মঙ্গলভাবে বিশ্বাস স্থাপন কর। তিনি নিশ্চয় উহার উপায় বিধান করিবেন।

১১। তাঁহার অনন্যপরায়ণতা। ব্রহ্মই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারই তাঁহার জীবনের একমাত্র পরম উদ্দেশ্য ছিল। তাই অন্য কোন সংস্কারে তিনি আপনার সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করেন নাই। তিনি আপনার পরিবারের ভিতরে স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতি যথোচিত সংস্কার আনয়ন করিয়াছিলেন সত্য,—কিন্তু সে সমস্তের প্রধান লক্ষ্য ছিল ধর্ম্ম। ব্রাহ্মধর্ম্মকে সর্ব্বসাধারণের উপভোগ্য করিবার জন্য তাঁহার চিরব্যাকুলতা ছিল। ব্রাহ্মধর্ম্মের এমন অনন্যপরায়ণ সেবক কুত্রাপি আর দৃষ্টিগোচর হয় না। তিনি অনেক কষ্টে ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য লাভ করিয়াছিলেন তাই উহার উপর তাঁহার এত অনুরাগ।

১২। প্রশংসাবিমুখতা। কত গ্রামে কত নগরে কত দূর দূরান্তরে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছেন, কত ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন—সংবাদপত্র তাহার সন্ধান জানে না। তিনি নিস্পৃহ ভাবে প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছেন,—নীরবে সাধনা করিয়াছেন। প্রশংসা লাভের ব্যাকুলতা তাঁহাকে কখন আকুল করিয়া তোলে নাই। মহর্ষির দেহান্তে তাঁহার ভস্মরাশি শান্তিনিকেতনে স্থান পাইবে এবং তাহার উপরে একটি মন্দির নির্ম্মিত হইবে এক সময়ে তাঁহার জীবদ্দশায় এইরূপ একটি প্রস্তাব তাঁহার সন্তানসন্ততি ও শিষ্যবর্গের মধ্যে উঠিয়াছিল। যখন একথা মহর্ষির কর্ণে পৌঁছিল তিনি তাঁহার সুযোগ্য পুত্র ও পৌত্রকে ডাকিয়া বলিলেন যে "তোমরা কখনও এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইও না। এ অবতার-প্লাবিত দেশে ওকথা মুখে আনিও না। আমার আদেশ জানিয়া উহা হইতে নিবৃত্ত থাকিবে। ঈশ্বরের প্রাপ্য সম্মানের বিন্দুমাত্র আরোপ করিয়া পাছে আমার সমাধির উপর কেহ ফলপুষ্প উপহার দেয় ইহাই আমার দারুণ আশঙ্কা।"

যখন চিন্তা করি বিস্মিত হইয়া পড়ি—ভবিষ্যৎ দৃষ্টির কি আশ্চর্য্য প্রখরতা তাঁহাতে বিদ্যমান ছিল। তাঁহার সম্বন্ধে যতই চিন্তা করি তাঁহার অসাধারণ মহত্ব ও অপূর্ব্ব ঋষিভাব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া যাই। তিনি চলিয়া গিয়াছেন—কিন্তু অন্ধের নয়নেও দিব্য চক্ষু ফুটাইয়া গিয়াছেন। তাহার দৃষ্টান্তে তাঁহার উপদেশে অপার আনন্দময় সূক্ষ্ম প্রস্রবণের সন্ধান আমরা লাভ করিয়াছি, মুক্তির পূর্ব্বাভাস দেখিতে পাইয়াছি, আমাদের জীবন ধন্য হইয়াছে।

শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়।

চয়ন

কালিদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আর এক কবি—সৌমিল্ল বা সোমিল। সৌমিল্লের নামের সঙ্গে সঙ্গে কবি রামিলা বা রামিলকের নাম স্বতই আসিয়া উপস্থিত হয়, কেননা, এই দুই কবি দুশ্চেদ্য বন্ধনে পরস্পরের সহিত আবদ্ধ। সোমিল ও রামিল দুজনে মিলিয়া "শূদ্রক-কথা" রচনা করেন। সম্ভবতঃ কাহিনী-গ্রথিত রাজা শূদ্রকের ইতিহাসকে আশ্রয় করিয়া যে গল্পগুলি রচিত হয় তাহাই "শূদ্রক-কথা"। রাজশেখর তাঁহার রচিত এক শ্লোকে, এই "শূদ্রক-কথার" গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন :—"শূদ্রক-কথার" দুই গ্রন্থকার রামিল ও সৌমিলের জয় হোক্! তাঁহাদের রচিত কাব্য অর্দ্ধনারী-আকৃতি শিবের ন্যায়।" অলঙ্কারশাস্ত্রকার শার্ঙ্গধর তাঁহার গ্রন্থে এই দুই কবির সম্মিলিত রচনার দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি সুললিত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন :—"রোগাক্রান্ত হওয়ায় সে কি শীর্ণকায় হইয়াছিল? আহত হওয়ায়, তাহার কি রক্তপাত হইয়াছিল? সর্পদংশনে দেহ বিষাক্ত হওয়ায় তাহার কি মুখ দিয়া ফেন নিঃসৃত হইতেছিল? কিন্তু এক্ষেত্রে সেরূপ কিছুই ত ঘটে নাই। তবে, হতভাগ্য যাত্রাপথে কিরূপে মৃত্যুমুখে পতিত হইল? হাঁ, বুঝেছি! মধুলুণ্ঠনকারী কতকগুলি ভ্রমরের সে গুঞ্জন শুনিতে পাইয়া সেই নির্ব্বোধ আম্র-মুকুলের নিকটে আসিয়া চক্ষু উন্মীলিত করে।" (বসন্তকালেই আম্র বৃক্ষ মুকুলিত হয়; "সেই বসন্তকালই আনন্দের কাল, প্রেমের কাল, গীতোচ্ছ্বাসের কাল"—শকুন্তলা। অতএব প্রবাসীজন, স্বকীয় প্রিয়তমা হইতে দূরে থাকায়, হঠাৎ এই সময়ে বিরহবেদনা অনুভব করিল।)

"সুভাষিতাবলী" গ্রন্থে রামিলার একটি শ্লোক সংরক্ষিত হইয়াছে।—"পরপুরুষের ন্যায় সূর্য্যকরস্পর্শ করিতে তাহার সঙ্কোচ হইল, এবং সদ্বংশজাত কুলকামিনীর ন্যায়, লাজুক ছায়া গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল।"

(গ্রীষ্ম বর্ণনা)

রামিল ও সোমিলের ন্যায় "কবিপুত্র" নামে আর দুইটি কবিরও পরিচয় পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী নাট্যসাহিত্যে এইরূপ একত্র মিলিয়া নাট্য-রচনার একটিমাত্র দৃষ্টান্তও পাওয়া দুর্ঘট; আশ্চর্য্য, যাহা কিছু দৃষ্টান্ত—কালিদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়েই প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুভাষিতাবলীতে, নিম্নলিখিত শ্লোকটি কবিপুত্রের নামে আরোপিত হইয়াছে :—"ভ্রূভঙ্গের লালিত্য, বক্র অপাঙ্গ-দৃষ্টি, কমনীয় বাক্য, লজ্জার হাসি, মন্থরগতি—এই সমস্তই রমণীর ভূষণ, রমণীর বলবিক্রম।"

পূর্ব্ববর্ত্তী কবিশ্রেণীর মধ্যে কবি "চন্দ্র" বা "চন্দ্রকের" নামও ধর্ত্তব্য। নাট্যকবিদের মধ্যে যাহাদের নাম এখনও প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বোধহয় এই চন্দ্রক

তুঞ্জিনের রাজত্বকালে কাশ্মীরপ্রদেশে চন্দ্রকের আবির্ভাব হয়। "এই মহাকবি,—যাঁহাতে দ্বৈপায়নমুনি যেন অংশতঃ পুনর্জ্জীবিত হইয়াছিলেন—ইনি এমন একটি নাটক রচনা করেন যাহা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের দর্শনযোগ্য" (রাজতরঙ্গিনী — II-১৬)।

এমন যে গৌরবান্বিত রচনা,—সর্ব্বসমেত ইহার ৯টি শ্লোক মাত্র বিদ্যমান, এবং উহাদের প্রামাণ্যসম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ সন্দেহের উদ্রেক হয়। যে সকল নাম কতকাল ধরিয়া যশোগৌরবে গৌরবান্বিত ছিল, একে একে সমস্তই অন্তর্হিত হইয়াছে, দুই একটি মাত্র নাম বিস্মৃতির করালগ্রাস হইতে অনেক কষ্টে উদ্ধার পাইয়াছে—ইহা সপ্রমাণ করিতেও কষ্টবোধ হয়। ইতিবৃত্তকার কহ্লান যখন মহাভারতকার কৃষ্ণদ্বৈপায়নের সহিত চন্দ্রকের তুলনা করিয়াছেন, তাহা হইতে অনুমান হয়, মহাভারতের বর্ণিত যুধিষ্ঠিরাদির ইতিহাস হইতে কবিবর চন্দ্রক তাঁহার নাটকের বিষয় নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনার যে দুই টুক্‌রা পাওয়া গিয়াছে তাহার সগর্ব্ব যুদ্ধসাজ বেণীসংহারের ধরণধারণ স্মরণ করাইয়া দেয়। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার সময়ে একজন যোদ্ধা এইরূপ বলিতেছেন :—"আমি যুদ্ধে যাইতেছি, এবং আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি আমার যুদ্ধের অশ্বগণকে কেহ পশ্চাদ্‌ভাগে দেখিতে পাইবে না; যুদ্ধের ফলাফল অনিশ্চিত; তাই ইহা অপেক্ষা অধিক কিছু আমি এক্ষণে অঙ্গীকার করিতে পারি না; জয়পরাজয় অদৃষ্টের হাতে।"—এক ব্যক্তি যুদ্ধক্ষেত্রের এইরূপ বর্ণনা করিতেছে :—শকুনীগৃধিনী কর্ত্তৃক নীত শবের অন্ত্রাদি বৃক্ষের মাথায় ঝুলিতেছে; তৃষ্ণার্ত্ত শৃগাল রক্তাপ্লুত অসি লেহন করিতেছে, বিবর-প্রবেশাভিলাষী সর্প হস্তীর শুণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে।"(১) আর চারিটি শ্লোক নান্দীর অন্তর্ভুত।

"গৌরী একটি চন্দ্রকলা লইলেন যাহা অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে এবং একটি বলয় লইলেন যাহা প্রণয়কলহে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে; এই দুইটিকে তিনি একত্র করিলেন; এবং একত্র করিয়া তাঁহার পতি শিবকে বলিলেন :—একবার দৃষ্টিপাত কর। হে-হেন শিব, গৌরী ও লীলা-চন্দ্রকলা তোমাদিগকে রক্ষা করুক।"(২)

"মা, কৃষ্ণ খেলা কর্‌তে কর্‌তে মাটি গিলেছে। এ কথা সত্য কি কৃষ্ণ?—এ কথা কে তোমায় বলেছে?—বলদেব। সে মিথ্যা কথা বলেছে আমি হাঁ-করচি, তুমি দেখ না।—আচ্ছা, হাঁ কর্‌। কৃষ্ণ হাঁ করিল; মুখের মধ্যে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়া কৃষ্ণের মা হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। সেই কেশব তোমাদের রক্ষা করুন!"(৩)

"মা, আমার পিতা এত যত্ন করে' হাতের মুঠার মধ্যে কি ধরে' আছেন?—বাছা, ও একটা সুমধুর ফল; উনি ঐ ফলটা আমাকে দেবেন না, তুই গিয়ে ওঁর কাছ থেকে নে।

(১) ক্ষেমেন্দ্র—"ঔচিত্যবিচার চর্চ্চা"—১২৩।
(২) "সুভাষিতাবলী"।

মাতৃকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া গুহ (কার্ত্তিকেয়) তাহার পিতার হাত ধরিল; তাহার পিতা তখন উষার আরাধনা করিতেছিলেন। গুহ পিতার হাত ধরিয়া ঝাঁকাইল। ধ্যানভঙ্গ হওয়ায় শম্ভু প্রথমে উত্যক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু পুত্রকে দেখিয়া হাসিয়া উঠিলেন। শম্ভুর সেই হাস্য তোমাদিগকে রক্ষা করুক।(৪)

চন্দ্রক করুণরসের ন্যায় আদিরসেও কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তাঁহার আবির্ভাবের পঞ্চশতাব্দী বা ততোধিক পরে, "দশরূপ" নামক অলঙ্কারশাস্ত্রে মিশ্ররসের আদর্শ স্বরূপ একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে ঃ—

"তাঁহার রোষ-কষায়িত একটি লোচন অস্তমান সূর্য্যের দিকে চাহিয়া আছে, তাঁহার অমল-কমল অপর লোচনটি স্বীয় বল্লভের পানে তাকাইয়া আছে; এইরূপেই, নাট্যকলা-কুশল নটীর ন্যায়, চক্রবাকী দিবাবসানে আসন্ন বিচ্ছেদের কাল উপলব্ধি করিয়া, দ্বৈ মিশ্ররসাত্মক ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে।"

এক প্রেমিক স্বীয় প্রেয়সীকে প্রেমোৎসবে আহ্বান করিতেছেন।—"শান্ত হও; একটু আনন্দ প্রকাশ কর; তোমার কোপ পরিত্যাগ কর; প্রিয়তমে, আমার সর্ব্বাঙ্গ শুষ্ক হইয়াছে, তুমি তাহার উপর বাক্যামৃত বর্ষণ কর। সুখের আশ্বাস দিয়া তোমার মুখটি আমার দিকে একবার ফিরাও; মুগ্ধে, সময় মৃগের ন্যায়, একবার চলিয়া গেলে আর ফিরে না।"(৫)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কুহকিনী

(১)

সেটী একটী বন পথ। একজন পথিক অশ্বপৃষ্ঠে ধীরে ধীরে সেই বনপথ ধরিয়া চলিয়াছিল। এই পথটী বরাবর গিয়া লণ্ডনের উত্তর দ্বারে মিলিয়াছে। পথিকের গন্তব্য স্থান ইংলণ্ড। পথিক আপন মনে একটী গান গাইতেছিল। সেটী কতকটা যুদ্ধ সঙ্গীতও বটে আবার কতকটা প্রণয় সঙ্গীতও বটে। তাহার হস্তে কোষমুক্ত অসি, পৃষ্ঠে দীর্ঘ বর্ষা আর চক্ষে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। এই বনপথে ডাকাতের বড়ই উপদ্রব কাজেই পথিক পূর্ব্ব হইতেই এই সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিল। তবে ভরসার মধ্যে ডাকাতেরা তাহার মত যোদ্ধার সম্মুখীন হইতে বড় একটা সাহস করে না। মোটা গোছের পুরোহিত আর ধনী গোছের ইহুদীই তাহাদের প্রধান লক্ষ্য।

কাজেই পথিক কতকটা নিশ্চিন্ত মনেই চলিয়াছিল। তাহার পায়ের নীচে সবুজ মখমল পাতা আর মাথার উপর অনন্ত নীলাকাশ। পথিক কত পথ ছাড়াইয়া গেল, কত শূকরের দল, কত মেষের পাল পিছনে ফেলিয়া আপন গন্তব্য মুখে ছুটিয়া চলিতে লাগিল। কত গ্রামবাসীকে ছাড়াইয়া

---

(৪) সুভাষিতাবলী।

(৫) "সুভাষিতাবলী"—"কাব্যপ্রকাশ।"

আসিল। তাহাদের মধ্যে অনেকেই পথিকের পরিচিত। আর যাহারা অপরিচিত তাহাদের মধ্যে কেহ বা তাহার চক্‌চকে সোনার ঢালখানা আবার কেহ বা তাহার বহুমূল্য শিরস্ত্রাণ দেখিয়া আভূমি নত হইয়া প্রণাম করিল। সে তাহাদিগকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়া আবার আপন গন্তব্য পথে ছুটিয়া চলিল।

পথিকের গতির বিরাম নাই। ক্রমে সূর্য্যদেব পশ্চিম প্রান্তে ঢলিয়া পড়িলেন। নীলাকাশ হইতে কি যেন একটা দীপ্তি খসিয়া পড়িল। সবুজ ঘাস কেমন একটা মলিনতা মাখা হইয়া পড়িল।

হঠাৎ পথিক দেখিল একদল লোক কি বলাবলি করিতে করিতে ছুটিয়া আসিতেছে। সকলের চখেই যেন কি একটা ভয়ের চিহ্ন, মুখে কি একটা উদ্বেগ মাখান। যেন কাহাকেও খুঁজিয়া বেড়াইতেছে।

পথিক একটু বিস্মিত হইয়া পরিচিতের মত জিজ্ঞাসা করিল—"কি হে ব্যাপার কি ?" আগন্তুকগণ তাহার সেই চক্‌চকে ঢালখানা, সেই উন্নত কিরীটটা দেখিয়া একটু ভীত ভাবে বলিল—"মহাশয়! আমরা একটা ডাইনীকে খুঁজচি।"

"ওঃ তবে তোমরা খুব সাহসী দেখচি। তা এখানে খুঁজচ ব্যাপারটা কি ?"

আগন্তুকগণ পাশের ঝোপ ঝাপ গুলি ভাল করিয়া দেখিয়া বলিল—"মহাশয় আমরা কুকুর নিয়ে উইন নগর থেকে এই বার মাইল তাকে তাড়া ক'রে এসেচি। এখন সে ব'নের মধ্যে কোথাও লুকিয়ে প'ড়েচে আর দেখতে পাচ্চি না।"

পথিক ঘোড়ার লাগামটা টানিয়া বলিল —"ডাইনী! কুহকিনী! সত্য ব'লচ ?"

"হাঁ মহাশয় সত্যই ব'লচি। এই সাত বছর ধ'রে আমাদের দেশে তার অত্যাচার চ'লেছে। আমরা ত অস্থির হ'য়ে প'ড়েচি। সাত বছর আগে সে যখন আমাদের গ্রামে প্রথম আসে তখন তাকে দেখলে সকলেরই দয়া হ'ত। আর এখন হতভাগিনী কি অত্যাচারটাই না ক'রচে। এই কাল আমার চারটে শূওর মেরে ফেলেচে.........।"

অপর একজন তাহার কথায় বাধা দিয়া আপন বাত-পঙ্গু হাতখানি তুলিয়া বলিল— "আর মহাশয়! আমার এ হাতখানি একেবারেই নষ্ট ক'রে দিয়েচে।"

পথিক বলিল—"তা বাপু এসব যদি সত্যি হয় তবে সে অন্য চেহারা ধ'রে কোথাও লুকিয়ে আছে। তোমরা আর তাকে ধ'রতে পাচ্চ না। সে রাত্রে নিশ্চয় বাড়ী ফিরে যাবে। তোমরা সেইখানে গিয়ে তার জন্যে ব'সে থাকগে। ডাইনীরা কখনও বেশীক্ষণ ছদ্মবেশে থাকতে পারে না।"

"যতক্ষণ না একেবারে অন্ধকার হ'য়ে যায় ততক্ষণ আমরা তাকে এইখানেই খুঁজব।"

"তবে তাই কর" বলিয়া পথিক আবার ঘোড়া ছুটাইয়া দিল। তারপর মনে মনে বলিল—"ঈশ্বর ওদের প্রার্থনা পূর্ণ করুন!" পথিক যুবক—তাহার যৌবনসুলভ চাঞ্চল্যের পূর্ণ উদ্যমে গাহিতে গাহিতে চলিল।

ক্রমে সূর্য্যদেব পশ্চিমদিকে আরও একটু ঢলিয়া পড়িল। শীতল সান্ধ্যবায়ু ধীরে ধীরে বহিতে লাগিল। পক্ষীরা দিনান্তে আপন আপন গৃহমুখী হইল। তখনও লণ্ডন

পাঁচ মাইল দূরে। যুবক ঘোড়ার বেগ আরো একটু বাড়াইয়া দিল। ঘোড়াটী বেশ বলিষ্ঠ এবং সুগঠিত। পথিকের ইচ্ছামত আর একটু জোরে ছুটিয়া হঠাৎ চারিপদ একত্র করিয়া কি যেন একটা ভীতির ভাব দেখাইয়া পিছাইয়া গেল। তাহার সেই বড় বড় নাসাবিবর দুটী লাল হইয়া উঠিল এবং ঘন ঘন শ্বাসত্যাগ করিতে লাগিল। আরোহী তাহার গলা ধরিয়া পড়িতে পড়িতে রহিয়া গেল।

যুবক কিঞ্চিৎ উদ্ধতভাবে ঘোড়াকে বলিল—"ওদিকে নয়, ওদিকে নয়; এগোও এখনও অনেক পথ যেতে হ'বে।" তাহার পর একবার কষাঘাত করিল কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন ফল ফলিল না; ঘোড়া আবার পিছাইয়া গেল তাহার পর একপাক ঘুরিয়া দাঁড়াইল। অশ্বারোহী ততক্ষণে তাহাকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া ফেলিয়া বলিল—"তোকে কি ভূতে পেয়েচে? সামনে চল।"

তখন দক্ষিণ পার্শ্বের ঝোপ একটু নড়িয়া উঠিল, একটু ফাঁক হইয়া গেল। ঘোড়াটী তাহার সেই বড় বড় চোখ দুইটী স্থির রাখিয়া কাণ খাড়া করিয়া রহিল, এক পাও অগ্রসর হইল না। হঠাৎ পথিকের কাণে একটা কাতর অস্পষ্ট স্বর পৌঁছিল।

"প্রভু!"

"কে তুমি?

একটা গভীর দীর্ঘ শ্বাসের মত অস্পষ্ট ভাবে আবার শব্দ হইল—"প্রভু! আমি একজন রমণী। আমি বড়ই বিপদে প'ড়েচি—শরীর ও মন দুইই বিপদগ্রস্ত। আমি আপনার সাহায্য প্রার্থনা করচি।"

"কে তুমি? বেরিয়ে এস আমি দেখি

তোমার কি বিপদ এবং তার কারণই বা কি আমায় খুলে বল।"

"আমার বড় ভয় হ'চ্চে।"

"এখানে আমি ছাড়া আর কেহ নাই এবং আমি বলচি আমা হ'তে তোমার কোন ভয় নাই। তুমি বেরিয়ে এস।"

"আপনি শপথ ক'রে ব'লচেন?"

"আমি হামফ্রে, সেলিনকোর্টের লর্ড, নরম্যান্‌ডির ব্যারণ হ'য়ে তোমার কাছে শপথ ক'রে বলচি আমা হ'তে তোমার কোন ভয় নাই। আমি আমার তলোয়ার ছুঁয়ে আমার রাজার নামে, দেবতার নামে শপথ ক'রচি এখন আর তোমার কোন ভয় নাই। বেরিয়ে এস।"

তখন সেই ঘাসগুলি ফাঁক হইয়া গেল—আর তাহার ভিতর হইতে একটী রমণী মূর্ত্তি বাহির হইয়া আসিল। ঘোড়ার কাছে আসিয়া সে মূর্ত্তি স্থির হইয়া দাঁড়াইল। ভয়ে তাহার সমস্ত শরীরখানি কাঁপিতেছিল। তাহার আপাদমস্তক একখানি মলিন বস্ত্রে ঢাকা। কাঁটায় তাহা টুকরা টুকরা হইয়া গিয়াছিল। ভয়ে তাহার সমস্ত শরীরের রক্তটুকু যেন জল হইয়া গিয়াছিল মুখের রঙ ফেকাসে হইয়া গিয়াছিল। সোনার রঙের চুলগুলি একেবারে এলোমেলো হইয়া গিয়াছিল। চোখে যেন কি একটা মৃত্যুবিভীষিকা মাখান ছিল। হামফ্রে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল—তুমিই কি সেই অভিশপ্তা ডাকিনী?"

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কেহ কোন কথা কহিল না। যুবক রমণীর প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া

কতক্ষণ পরে রমণী বলিয়া উঠিল—'প্রভু!' তাহার পর কাছে আসিয়া পথিকের জুতার উপর মাথা রাখিয়া জানু পাতিয়া বসিল; তাহার সেই সোনার রঙের কেশগুলি মৃদু সান্ধ্য বাতাসে উড়িয়া উড়িয়া ব্যারণের পায়ে পড়িতে লাগিল।

"ওকি তুমি উঠে দাঁড়াও।"

"প্রভু! আপনি শপথ ক'রে আমায় অভয় দিয়াছেন। আমি বাস্তবিকই ডাইনী নই। লোকের অনিষ্ট করবার ক্ষমতাও নেই। আমি হতভাগিনী কুমারী, বিনা দোষে উইনবাসীর বিরাগ ভাজন হ'য়েচি। তাদের সকল অত্যাচার নীরবে বুক পেতে স'য়েচি। আর—আর আজ মৃত্যু ভয়ে ভীত হ'য়ে এতটা পথ ছুটে এসেচি।

"রমণি! তুমি উঠ।

কিছুক্ষণ পরে রমণী উঠিয়া নতমুখে দাঁড়াইল। তাহার মুখখানি যেন শবের মুখ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

"বোধ হয় তুমি মিথ্যা কথা ব'লচ।"

রমণী ধীরে ধীরে চোখ দুইটী তুলিল। যেন দুইটী মণি সন্ধ্যার সেই মৃদু আলোকে জ্বল জ্বল করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সে স্থির অথচ কোমল দৃষ্টিতে হ্যামফ্রের দিকে চাহিয়া বলিল—"প্রভু। আমি মিথ্যা বলি নাই।"

হ্যামফ্রে ভাবিতে লাগিল "এখন কি করা কর্ত্তব্য। রমণীকে বিশ্বাস করিব—না করিব না? এ'কে এইখানে ফেলে রেখে চ'লে যাব—না সঙ্গে নিয়ে যাব? যদি সঙ্গেই নিয়ে যেতে হয় তবে কি ব'লে কোথায় নিয়ে যাব?"

যখন হ্যামফ্রে এইরূপ ভাবিতেছিল তখন দূরে—অনুসরণকারীদিগের কোলাহল শব্দ শোনা গেল;—তাহাদের কুকুরের বিকট চীৎকার মৃদু সান্ধ্য বাতাসে ভাসিয়া আসিয়া তাহাদের কাণে পৌঁছিল।

ভয়বিহ্বলা রমণী হ্যামফ্রের পাখানি জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"ঐ দেখুন তারা আসচে।" রমণী ভয়ে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল কিন্তু ব্যারণের প্রতি ভক্তি দেখাইতে তাহার বিন্দুমাত্রও ত্রুটি হয় নাই। তাহার জুতাঢাকা পাখানি চুম্বন করিয়া তাহার উপর নয়ন জল ফেলিতে লাগিল। যুবক একবার কি একটা ভাবনা ভাবিয়া লইল তাহার পর একখানি হাত বাড়াইয়া দিল। রমণী চকিতার ন্যায় সেই বাহুর আশ্রয়ে যুবকের সম্মুখে ঘোড়ার উপর উঠিয়া বসিল। যুবক অশ্বকে একবার কশাঘাত করিল। অশ্ব অমনি বায়ুবেগে ছুটিয়া চলিল। আর ততক্ষণ রমণী তাহার বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া কাঁপিতে লাগিল।

প্রায় একঘণ্টা সেইরূপ বেগে ঘোড়া চালাইয়া যুবক একটু মন্থরগতিতে যাইতে লাগিল। তাহার পর রমণীকে বলিল—"দেখ আমি তোমার শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা ক'রে লণ্ডনে নিয়ে যাচ্চি। কিন্তু সেখানে গিয়ে তোমায় ছেড়ে দেব না। আমার বিশ্বাস তুমি বাস্তবিকই ডাকিনী। তা যদি সত্য হয়......"

তাহার পর রমণীকে একটু নাড়া দিয়া আবার বলিতে লাগিল—"তা যদি সত্য হয় তবে তোমায় তার শাস্তি নিতে হবে। তুমি তোমার সব মন্ত্র তন্ত্র দিয়েও আমায় বশ ক'র্ত্তে পারবে না।"

"আমি সে রকম দুষ্ট নই প্রভু!"

"সে আমি দেখব এখন। এখন তোমায় আমার পরিচিত এক ইহুদীর বাড়ী নিয়ে গিয়ে রাখব। তার এক মেয়ে আছে সে তোমায় যত্ন ক'রবে। অল্প সময়ের মধ্যেই তোমার দোষগুণ সব বেরিয়ে প'ড়বে।"

(২)

হামফ্রে বৃদ্ধ ইহুদীকে বলিল -"দেখ আইসাক এই কুমারীটীকে তোমার বাড়ী রেখে যাচ্চি; তোমার মেয়ে যেন এ'কে একটু দেখে শোনে, একটু যত্ন করে। আর এর খাওয়া দাওয়ার এবং শোবার যেন কোন অসুবিধা না হয়। আজ আর কাল এই দুটো দিন এ তোমার বাড়ী থাকবে। এর পরে কি ক'রবো তা এখনও ঠিক ক'র্ত্তে পারিনি। যা হউক কাল এসে একবার দেখে যাব। কেমন আইসাক পার্ব্বে ত?"

কুমারী এতক্ষণ সেই ছেঁড়া কাপড়ে কোন রকমে দেহ ঢাকিয়া দাঁড়াইয়াছিল। হামফ্রে একবার সেই কারুণ্যের ছবিখানির দিকে চাহিয়া আবার বলিতে লাগিল—"দেখ এ'কে একটু সান্ত্বনা দিয়ো। তোমার মেয়েকে একটা ভাল পোষাক দিতে বোলো। আর ঘর বিছানা যেন বেশ পরিষ্কার হয়—খাওয়া দাওয়ার যেন কোন কষ্ট না হয় এটা ভাল ক'রে দেখো। কি বল আইসাক রাজি আছ ত? ঘর দোর যেন আমার মনের মত হয়।"

তখন আইসাক একটা সিঁড়ি দিয়া তাহাদিগকে দ্বিতলের একটা পরিষ্কার পাথরের ঘরে রাখিয়া কন্যার উদ্দেশে চলিয়া গেল।

হামফ্রে জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার নাম কি?

"উইনে সকলে আমায় ইলা ব'লে ডাকৃত, কিন্তু আমি যে প্রকৃত কে তা কেহ জানে না।"

"তার মানে কি?"

"নরম্যাণ্ডীর একখানি জাহাজে আমরা দেশান্তরে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ জাহাজখানি ভেঙ্গে গেল। আর সকলেই ডুবে ম'রলেন বেঁচে রইলাম কেবল আমি হতভাগিনী! সমুদ্রের শীতল কোলেও আমার ঠাঁই হ'ল না। নিষ্ঠুর ঢেউ আমায় তীরে ফেলে দিলে। আমায় তীরে প'ড়ে থাকতে দেখে কতকগুলি কৃষক উইন নগরে নিয়ে এল। তারাই যত্ন ক'রে আমায় মানুষ ক'র্ত্তে লাগল। কিন্তু হায় দুরদৃষ্ট বশতঃ আমি নগরবাসীদের বিষ নয়নে প'ড়লাম।" এই বলিয়া কুমারী ইলা দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া বালিকার মত কাঁদিতে লাগিল। ব্যারণের মনে দয়া হইল; সে সহানুভূতিপূর্ণ স্বরে বলিল—"আহা! কেঁদনা! কেঁদে আর কি ক'রবে বল।"

"কিন্তু কাঁদবার জন্যই আমার জন্ম। আমি না কেঁদে কি ক'রব? হাসবার ত আমার কিছুই নাই প্রভু!"

"এখানে তুমি খেতে প'রতে পাবে। আর —আর যদি আমি তোমার ব্যবহারে সন্তুষ্ট হই—যদি বুঝতে পারি যে তুমি সত্যই ডাইনী নও তবে......"

ইলা তখনও মুখে হাত দিয়া তেমনি ভাবে কাঁদিতেছিল।

"কিন্তু আমার এখনও সে বিশ্বাস যাচ্চে না।"

"না প্রভু! আমি বাস্তবিকই ডাইনী নই।"

"আচ্ছা আমি যদি বুঝতে পারি যে তুমি বাস্তবিকই ডাইনী নও তবে—তবে আমি তোমায় সুখী ক'র্ত্তে চেষ্টা ক'রব। আজ তুমি বড় শ্রান্ত হ'য়েচ এখন একটু ঘুমোওগে।"

তাহার পর ব্যারণ নামিবার জন্য দ্বারের নিকট আসিল; কি ভাবিয়া একবার ইলার দিকে চাহিয়া দেখিল। দেখিয়া একটু কোমল স্বরে, একটু স্নেহ মাখান স্বরে বলিল—"তোমার ক্ষতস্থান গুলি ধুয়ে ফেলো। শরীরের একটু যত্ন কর।" এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

(৩)

সমস্ত দিনটা শিকারে কাটাইয়া পরদিন অপরাহ্ণে হ্যামক্রে পুনরায় আইসাকের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। সেদিন তাহার পোষাকের পারিপাট্যটা কিছু ভিন্ন রকমের—গায়ে একটী বহুমূল্য নীল কোট, তাহার বোতামের ফাঁক দিয়া সোনার কোমরবন্ধটা চক্‌চক্‌ করিতেছিল। আইসাক সাদরে তাহাকে গৃহমধ্যে লইয়া গেল।

"আইসাক! আমি তোমার নবীনা অতিথিকে দেখতে এসেছি।"

"প্রভু! কাল সে ক্লান্তিভরে অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছে এখন বেশ সুস্থ হ'য়েছে। আমি কি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব?"

"না আমি একলাই যাচ্ছি; তুমি একটা আলো ধর; সিঁড়িটা বড় অন্ধকার!"

হ্যামক্রে ধীরে ধীরে উঠিতে লাগিল। তাহার মনে কি যেন একটা ভয়ের ছায়া ঘনাইয়া আসিতেছিল। ইলা যে ঘরের মধ্যে ছিল তাহা তখন আলোক অন্ধকারের মধুর মিলনালোকে উদ্ভাসিত। পশ্চিম দিকের জানালা দিয়া অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের একটা লোহিত রশ্মি—জানালার ধারে উপবিষ্ট ইলার যৌবন মাধুরীযুক্ত মুখে যেন আবির মাখাইয়া দিয়াছিল। যখন হ্যামক্রে উপরে আসিল তখন একবার সেই সৌন্দর্য্য প্রতিমার প্রতি স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল; যদি তাহার 'ডাইনী' অপবাদ না থাকিত তবে বোধ হয় তাহাকে নবীনা সন্ন্যাসিনী মনে হইত। কি শান্ত সুন্দর মুখশ্রী! ধীরে ধীরে হ্যামক্রে তাহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল; যেন তাহার ডাইনী বিদ্যা হইতে আত্ম-রক্ষার্থই এই মৃদু গতি! ইলা তখন ইহুদীকন্যার একটী মূল্যবান পরিচ্ছদ পরিয়াছিল। তাহার সুবর্ণবর্ণ কুন্তলরাশি এলায়িত, পরিষ্কৃত, তাহার উপর তন্তুপক্ষযুক্ত একটী টুপী! তাহাকে সেই নব পরিচ্ছদে দেখিয়া হ্যামক্রের মনে হইল এমন সুন্দরী বুঝি সে জন্মে কখন দেখে নাই। ইলা ধীরমন্থর-গতিতে তাহার দিকে অগ্রসর হইল।

হ্যামক্রে গম্ভীর ভাবে বলিল—"সুপ্রভাত ইলা!" "সুপ্রভাত প্রভু!"

হ্যামক্রে বেঞ্চের উপর বসিয়া ইলার উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। আর ইলা ধীরে ধীরে সহজভাবে তাহার কথার উত্তর দিতে লাগিল। তাহার সেই সরলতা পূর্ণ কথাগুলি শুনিয়া হ্যামক্রে বুঝিল ইলা সত্য বলিতেছে। সে ইলাকে তাহার প্রতি ইহুদী এবং তাহার কন্যার ব্যবহারের কথা জিজ্ঞাসা করিলে ইলা বলিল—"তাহারা আমার সহিত বেশ সদ্ব্যবহার করিয়াছে।"

"হাঁ তা ত ক'রবেই; এই ইহুদী আমাদের ভৃত্য—অবশ্য আমার—তোমার নয়। আমি

তাকে তোমায় যত্ন ক'রতে ব'লেছিলাম। সে আমার আদেশ নিশ্চয় পালন ক'রবে তা আমি জানতাম। আজ তোমার মুখে একটু রক্তের চিহ্ন দেখা দিয়েছে তাতে তোমায় বেশ সুন্দরী দেখাচ্ছে। তোমার ভয় ভেঙ্গেচে ?"

"আপনি যখন প্রতিজ্ঞা ক'রেচেন তখন আর আমার ভাবনা কি ?"

হঠাৎ প্রতিজ্ঞার কথা মনে হওয়ায় হ্যামক্রের বিস্মৃতপ্রায় ঘটনাটী আবার নূতন করিয়া মনে জাগিয়া উঠিল।

"আমার প্রতিজ্ঞা! হাঁ তুমি যদি বাস্তবিকই নিরপরাধ হও তবেই সে প্রতিজ্ঞা তোমার পক্ষে মঙ্গলকর। কিন্তু তোমার নামে যে অপবাদ আছে তার যদি একটু মাত্রও সত্য হয় তবে...............।"
হ্যামক্রে তাহার দিকে একবার চাহিয়া দেখিল। ইলা বলিল—"তবে কি ক'রবেন ?"

"ঘোড়ায় ক'রে ফের উইনে রেখে আসব।"

"না না অমন কাজ ক'রবেন না; তার চেয়ে বরং আমায় আপনি স্বহস্তে কেটে ফেলবেন। তা হ'লেও আমি সুখে ম'রতে পারব।"

হ্যামক্রে কতক্ষণ নীরবে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল—"তবে তাই ক'রব। যদি আমি দেখি বা শুনি যে তুমি সেই সব ঘৃণ্য মন্ত্র আবৃত্তি ক'রছ......" তাহার পর ইলার দিকে একটু অগ্রসর হইল। তাহার হাত তখন তলোয়ারের বাঁটে! ইলা নড়িল না; সে আবার বলিল—"তবে এই তলোয়ার দিয়ে আমি নিজেই তোমায় কেটে ফেলব।"

ইলা তাহার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—"প্রভু! আমি কিন্তু সম্পূর্ণ নিরপরাধ!"

তাহার পর উভয়ে উভয়ের পানে কতক্ষণ চাহিয়া রহিল। বোধ হইল যেন উভয়ের চোখে কি একটা বিদ্যুৎ খেলিতেছে; চোখে চোখে কি যেন একটা সাগ্রহ কাহিনী বলাবলি করিতেছে. ক্রমে ঘরটী পূর্ণ অন্ধকার হইয়া উঠিল,—তখন আর দৃষ্টি চলে না কাজেই হ্যামক্রে ধীরে ধীরে কক্ষ ত্যাগ করিয়া গেল।

হ্যামক্রে চলিয়া গেল বটে কিন্তু ইহুদীর বাটী ছাড়িয়া গেল না। নিম্নে ইহুদীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। তখন তাহার মনে হইল—"ইলার এই যে সাগ্রহ সলজ্জ দৃষ্টি, এই যে বিনয়নম্র কথা এ সকলই তাহার ছলনা, চাতুরী। সে যে সাধারণ মানুষের চেয়ে ঢের চতুর সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ডাকিনীর উপযোগী দোষ বা গুণ তাহাতে নিশ্চয়ই আছে। এখন আমায় চ'লে যেতে দেখে বোধ হয় সে মনে মনে খুবই খুসী হ'য়েচে। আর হয়ত এতক্ষণ তার মন্ত্র তন্ত্র পড়ে পিশাচের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিয়েছে। এখন যদি আমি নিঃশব্দে যাই তাহ'লে তার কার্য্যকলাপ সব বেরিয়ে প'ড়বে.........আর .....আর আমি এই তলোয়ার দিয়ে তার পাপ প্রাণ বিনষ্ট ক'রব!"

অবশেষে অতি সন্তর্পণে হ্যামক্রে আবার সিঁড়িতে উঠিতে লাগিল। যখন অর্দ্ধ পথ উঠিল তখন একটা উপাসনার মত স্বর তাহার কর্ণে পৌছিল।........."তবে ....তবে ত সে নিশ্চয়ই দোষী!......... এইবার সুযোগ পেয়ে সন্ধ্যা উপাসনা সেরে নিচ্ছে! ঐ, ঐ তার স্বর, একবার স্পষ্ট

হ'য়ে উঠ্‌চে আবার অস্পষ্ট হ'য়ে যাচ্চে।" অকস্মাৎ হ্যামফ্রের শরীরে একটা তড়িত প্রবাহ ছুটিয়া গেল। সর্ব্বাঙ্গ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। হৃদয়ে কি যেন একটা বেদনা অনুভূত হইল। সে দন্তে ওষ্ঠ চাপিয়া ধরিয়া উন্মুক্ত তরবারি হস্তে উপরে উঠিতে লাগিল। তাহার চক্ষু তারকা দুইটী যেন জ্বলন্ত ভাঁটার মত সেই অন্ধকার সিঁড়ির মধ্যে জ্বলিতে লাগিল। এতক্ষণে সে গৃহদ্বারে পৌঁছিল—এইবার—এইবার বুঝি অভিশপ্তা ডাকিনীর ইহলীলা শেষ হয়!

হ্যামফ্রে ভাল করিয়া তাহাকে দেখিতে লাগিল। দেখিল সেই অস্পষ্ট চন্দ্রালোক-পূরিত গৃহে সে নতজানু হইয়া পরমারাধ্য যিশু এবং ভার্জিন দেবীর উপাসনায় তন্ময়!

(৪)

তাহার পরদিন বৈকালে হ্যামফ্রে অশ্বারোহণে আবার ইহুদীর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার কটিতে দীর্ঘ অসি আধারে আবদ্ধ, অশ্বপৃষ্ঠে সুবৃহৎ ধনু লম্বমান্ এবং তীর পূর্ণ তুণ জীনে আবদ্ধ। সেই তীর-ধনুসহ অশ্বটীকে ইহুদীর অশ্বশালায় রাখিয়া হ্যামফ্রে ইহুদীর দ্বারে করাঘাত করিল। ক্ষণকাল মধ্যে দ্বার খুলিয়া গেল। হ্যামফ্রে ভিতরে প্রবেশ করিয়া আইসাককে বলিল—"আইসাক আমি তোমার নবাগতা অতিথিটীকে দেখিতে আসিয়াছি।"

"প্রভু! আজ আমার মেয়ে বলছিল এখন তাকে দেখলে মনে হয় তার পূর্ণ লাবণ্য পূর্ণ সামর্থ্য সকলি যেন একে একে ফিরে আসচে। আচ্ছা প্রভু! আর কতদিন ও এখানে থাকবে?"

"তা এখন ঠিক বলা যায় না। আমার যবে ইচ্ছা হবে আমি ওকে নিয়ে যাব। এখন এই নাও তার খরচপত্র।"

হ্যামফ্রে যখন বৃদ্ধ আইসাকের হস্তে টাকার থলিটী দিল তখন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে একবার চাহিয়া দেখিল। তাহার মনে হইল বৃদ্ধ যেন কিছু বলিবে। তাহার ধারণা মিথ্যা নহে। তখনই আইসাক বলিল—"প্রভু! সকালে দুইজন লোক একটা ডাইনীর সন্ধানে এসেছিল। তারা বলে দুএকদিন আগে সেই ডাইনীটা উইন নগর থেকে বনের পূর্ব্বদিকে পালিয়ে এসেছে। উত্তর দিকের দ্বারীরা ব'লেচে যে সে এই বাটীতেই আছে। যদিও এতে কিছু ভয়ের কারণ নাই তবুও আমার মত বুড়ার সর্ব্বদাই একটু সাবধানে থাকাই উচিত।"

হ্যামফ্রে সম্মুখে বিপদের একটা স্পষ্ট ছায়া দেখিতে পাইল। কিন্তু তাহাতে তাহার ভয় কি? সে একজন নাইট্ এবং যোদ্ধা! আসন্ন বিপদ বুঝিয়া তাহার হৃদয় কন্দরে বীরশোণিত নৃত্য করিয়া উঠিল।

"দেখ আইসাক! তুমি কারো কথা শুনোনা। যেমন আমার কার্য্য করছ তেমনি করে যাও। আচ্ছা তুমি সেই উইনের লোক দুটোকে কি ব'ললে?"

"আমি বল্লুম না মহাশয় এখানে কেহ আসে নাই। কিন্তু তারা কি ছাড়তে চায়। বলে আমাদের কুকুর এইখানে তার গন্ধ পেয়েছে। কত কষ্টে তবে তাদের তাড়িয়েছি।"

হ্যামফ্রে তলোয়ারখানি ভাল করিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তাহ'লে তারা

একজন ডাইনীকে মারতে এসেছিল কি বল আইসাক ?”

হঠাৎ ডাইনীর কথা বলিতে গিয়া তাহার ওষ্ঠ এবং জিহ্বা শুষ্ক হইয়া গেল। কত প্রাণঘাতী ভীষণ দর্শন, পিশাচের তাণ্ডব নৃত্য নিকেতন যুদ্ধভূমে দর্শন করিয়া যে ওষ্ঠ কখনও শুষ্ক হয় নাই আজি তাহা ‘ডাইনী’ বলিতে গিয়া শুষ্ক হইয়া গেল !

“হাঁ প্রভু ! তাদের কথা শুনে ত বোধহয় যেন তারা তাকে মারতেই এসেছিল।”

“কিন্তু আইসাক ! এমন ত হতে পারে যে তারা যাকে ডাইনী বলে মারতে এসেছিল সে বাস্তবিকই ডাইনী নয়।” এই কথাগুলি বলিবার সময় হ্যামফ্রের মানস চক্ষুর সম্মুখে গত সান্ধ্য দৃশ্যপট উন্মুক্ত হইয়া গেল। মৃদু জ্যোৎস্নালোকে সেই পূত সরল মুখচ্ছবি, সেই কোমল অথচ মিষ্টস্বরে পরমারাধ্য যিশুর ভজনা !

“তা বোধহয় তারা পরে বুঝতে পারবে।”

“যাহোক আইসাক ! তা হ’লে তারা তাকে খুঁজে পায়নি, কেমন ?”

“তারা সমস্ত নগরী খুঁজেছে। তাদের তখনকার অবস্থা দেখলে মনে হয় যেন তারা বড় রেগে উঠেছে, বড় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হ’য়ে উঠেছে।”

হ্যামফ্রে ধীরে ধীরে সোপান অতিক্রম করিতে লাগিল আর বৃদ্ধ আইসাক কি যেন একটা ভয়বিজড়িত ভক্তির সহিত তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। হ্যামফ্রে একবার তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল—“আইসাক। আমি এখন তোমার অতিথির কাছে যাচ্ছি। যদি তারা-কেহ এসে গোলমাল করে তবে তখনি তাড়িয়ে দিয়ো। কেমন আমার কথাটা ঠিক বুঝতে পেরেছ ত ?”

আইসাক একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল —“কিন্তু আমি কি আপনার আদেশ পালন ক’রতে পারব ? আমি যে ক্ষীণ বৃদ্ধ !”

হ্যামফ্রে ধীর পাদবিক্ষেপে শেষ সোপান যখন অতিক্রম করিয়া দ্বারের নিকট উপস্থিত হইল তখন ইলা সম্ভ্রমে তাহাকে বলিল— “আসুন ভিতরে আসুন।” হ্যামফ্রে দেখিল গতকল্যকার মত সে জানালার ধারে দাঁড়াইয়া তাহারই দিকে চাহিয়া আছে। তাহার স্বর্ণ-কেশজাল এলায়িত ; মুখের উপর কি একটা পবিত্রতার ছায়া বিরাজিত।

হ্যামফ্রে তাহার নিকটে গিয়া বলিল— “আমি যে আসচি তা তুমি কি ক’রে টের পেলে ?”

“তা—তা আমি জানি না। বোধহয় কাল থেকে আমি আপনার পদশব্দ চিনেছি।”

হ্যামফ্রে একখানি বেঞ্চে বসিল। “ইলা আমার কাছে ব’স।” ইলা ধীরে ধীরে স্পন্দিত পদে অগ্রসর হইল।

“তোমার ভয় কচ্চে নাকি ?”

“কাকে ? আপনাকে ? না না আপ-নাকে আর আমার ভয় করে না।”

ইলা তার পার্শ্বে অতি সন্নিকটে বসিল ; তাহার জামা প্রায় হ্যামফ্রের সেই নীল জামার সহিত ঠেকিল। হ্যামফ্রে গম্ভীর ভাবে বলিল —“আমি আজ তোমায় একটা কথা বলতে এসেছি।”

ইলা নীরবে অবনতমস্তকে শুনিতে লাগিল।

হ্যামফ্রে বলিল—“প্রথমতঃ আমি বুঝতে পেরেছি যে তুমি ডাইনী নও।”

ইলার নীলোৎপলনয়নে অবিরামবেগে বারিধারা ছুটিল।

“ওকি তুমি কাঁদচ কেন ?”

তাহার সেই অশ্রুবিধৌত বদনে একটা হাস্যের ক্ষীণ রেখা ছুটিয়া গেল সে বলিল—“এ অশ্রু আনন্দের। আনন্দেও ত লোকে কাঁদে !”

“তাহার পর শুন ; কাল যখন তোমার নিকট থেকে চলে গেলাম তখন একেবারে বাড়ী ছেড়ে যাই নি। নীচে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে তুমি কি করেছ দেখবার জন্য ধীরে ধীরে উপরে এসেছিলাম। তখন থেকেই বুঝলাম যে তুমি নির্দ্দোষ।”

কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব। হেমন্তের অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্য গবাক্ষপথে তাহাদিগের প্রতি স্থিরনয়নে চাহিয়াছিলেন। ইলার দৃষ্টি ভূসংলগ্ন আর হামফ্রে তাহার সেই যৌবনতরঙ্গায়িত রূপোন্মেষ, সেই স্বর্ণচ্ছটার মত কেশরাশি, নিস্পন্দনয়নে দেখিতেছিল। পলকহীন নেত্রে কতক্ষণ চাহিয়া থাকিবার পর ধীরে ধীরে একটী দীর্ঘশ্বাস তাহার অজ্ঞাতে বাহির হইয়া কোন দিগন্তে মিশিয়া গেল। তাহার সেই বীরত্বপূর্ণ কর্ম্মজীবন, সেই ক্রীড়ানুরাগী-প্রাণ, সেই কলহাস্যমুখরিত ধরা মুহূর্ত্ত মধ্যে যেন কি একটা অজ্ঞাত রাজ্যে হারাইয়া গেল। জীবনের কি একটা মহা পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইল। কতক্ষণ পরে আপনার একখানি হস্ত বহুমূল্য দস্তানার মধ্য হইতে বাহির করিয়া ইলার হস্তখানি ধরিল। তাহার পর আবেগকম্পিত কণ্ঠে ডাকিল—“ইলা ! ইলা !”

ইলা কোন উত্তর দিল না। তাহার সুনীল আঁখি তারকা আনন্দ-অশ্রুতে ভাসিয়া উঠিল। গৃহখানি আবার নীরবতায় পূর্ণ হইল।

অকস্মাৎ বাহিরে বহুলোকের একত্র কণ্ঠস্বরে, তাহাদিগের পাদবিক্ষেপে, গৃহের সে নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া গেল। হঠাৎ নিম্নতলে যেন একত্রে অনেক লোক প্রবেশ করিল। তাহাদিগের অস্ত্রের ঝন্ ঝনা শব্দে কর্ণ কুহর ব্যথিত হইল। ভয়ে উৎকণ্ঠায় ইলার মুখখানি শুখাইয়া গেল। তাহার সেই রক্তাভ বদন শবের মত দেখাইতে লাগিল। ইলা উৎকণ্ঠিত ভাবে হামফ্রের হাত দুখানি জড়াইয়া ধরিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিল—“উইনের লোক ! ঐ ঐ তারা আবার এখানে এসেচে ! হায় প্রভু ! এবার আমি নিশ্চয় মরব ! আর রক্ষা নাই। না না ঐ দেখুন ! হায় ভার্জ্জিন দেবী ! একবার আপনার অভাগিনী ইলার দশা দেখে যান।”

চকিতের মত হামফ্রে দাঁড়াইয়া উঠিল। তাহার হৃদয় হইতে সমস্ত কোমল বৃত্তি যেন স্বপ্নের ছবির মত মিলাইয়া পড়িল।

হামফ্রে কিঞ্চিৎ কর্কশ স্বরে বলিল—“চুপ কর কুমারী !” তাহার পর দ্বারে মুখ বাড়াইয়া নিম্নের ব্যাপার দেখিতে লাগিল। দেখিল বৃদ্ধ আইসাক অতি মৃদু স্বরে তাহাদিগকে ভিতরে ঢুকিতে নিষেধ করিতেছে কিন্তু তাহারা শুনিতেছে না। অকস্মাৎ ভীষণ শব্দে দ্বার খুলিয়া গেল। তাহারা সকলে বেগে গৃহে প্রবেশ করিল। তাহারা তখন যুদ্ধোন্মাদে মত্ত হইয়া “ডাইনী ! ডাইনী !” বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

ইলা ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে পশ্চাতের দেওয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইল। মুহূর্ত্তের জন্য পশ্চাতে ফিরিয়া হ্যামক্রে বলিল—"আমার কাছে এস।" কুমারী বাত্যাহত কদলী পত্রের ন্যায় কম্পিতচরণে দুই পদ অগ্রসর হইল। তাহার পর বলিল—"প্রভু! আমার সে সাহস নাই আমি সিঁড়ির কাছে যাইতে পারিব না।"

"আমার কাছে এস।"

ইলা তাহার আদেশ আর অমান্য করিতে পারিল না। স্পন্দিত চরণে তাহার নিকট উপস্থিত হইল। হ্যামক্রে সাগ্রহে তাহাকে বক্ষের উপর টানিয়া লইয়া তাহার ফুল্ল অধরে প্রথম প্রণয় চিহ্ন মুদ্রিত করিয়া দিল। তাহার পর বলিল—"এই জন্যই আমি তোমায় ডাকিতে ছিলাম এখন কোণে গিয়া লুকাইয়া থাক যেন উহারা তোমায় দেখিতে না পায়। শত শত্রুর বিরুদ্ধেও এখন আমি এ পথ রুদ্ধ করিতে পারিব। কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় আজ আমার নিকট এই উন্মুক্ত তরবারি ভিন্ন অন্য অস্ত্র নাই। অবশেষে যদি তোমায় একান্তই রক্ষা করিতে না পারি, তখন আমার কাছে আসিও আমি নিজেই তোমায় হত্যা করিব।"

ক্রমে উন্মত্ত নগরবাসীগণ সিঁড়ির উপর উঠিতে লাগিল। তাহারা অধিকাংশই যষ্টি লইয়া আসিয়াছিল কেবল দুই একজনের নিকট বর্শা ছিল। হ্যামক্রেকে দেখিয়া তাহারা উন্মত্তের মত চীৎকার করিয়া বলিল—"ঐ ঐ কুক্কুরটাকে আগে মার।"

যখন তাহারা সকলে সিঁড়িতে উঠিল তখন হ্যামক্রে উন্মুক্ত তরবারি হস্তে দ্বার আগুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সিঁড়িপথ অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ; দুই জনের অধিক লোক একত্রে উঠিতে পারে না। কাজেই সকলে একত্রে সিঁড়িতে উঠিতে পারিল না। কিন্তু হ্যামক্রের উন্মুক্ত তরবারির মুখে কে অগ্রে প্রাণ দিবে? কাহার এত সাহস? সকলেই কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

"ডাইনীটাকে আমাদের দিয়ে দাও আমরা এখনি চ'লে যাব। দাও দাও আমাদের আর দেরী সইছে না।" তখন তাহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল—"এই দেখ এখানে একজন লোক ডাইনীর জন্য প্রাণ দিতে দাঁড়িয়েচে। নিশ্চয়ই ডাইনীটা একে বশ ক'রেছে। এগোও এগোও!" "তুমি আগে যাও।" "না তুমি যাও।" "না না ঈশ্বরের দিব্য তুমি আগে যাও।" "যেওনা এখনি তলোয়ারের মুখে দুখানা হ'য়ে প'ড়বে।" "তার আগে বর্শা মার।"

তাহার পর একজন বর্শাধারী বীর পুরুষ ভিড় ঠেলিয়া সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে হ্যামক্রের স্কন্ধ লক্ষ্য করিয়া বর্শা ত্যাগ করিল। দৈব তাহার সহায় হইলেন। সে বর্শা তাহার বিশেষ কোন ক্ষতি করিতে পারিল না—মাত্র তাহাতে স্কন্ধদেশ কিঞ্চিৎ ক্ষত হইল। সে ক্ষত গুরুতর না হইলেও প্রবল বেগে শোণিত ধারা নির্গত হইতে লাগিল। ইলা সেই রক্ত দেখিয়া ভয়ব্যাকুল স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল।

"ঐ যে ডাইনীটা লুকচ্চে। "তার চেঁচানি শুনতে পাসনি?"

তখন হ্যামক্রে তলোয়ারে ভর দিয়া দাঁড়াইল। তাহার আহত স্কন্ধ দিয়া

তখনও প্রবলবেগে রক্ত বাহির হইতেছিল। সে আজ্ঞাকারী স্বরে বলিল—"চুপ কর কুকুর।"

আগন্তুকগণের অধিকাংশই পল্লীকৃষক। তাহার সেই প্রভুত্বব্যঞ্জক স্বর শুনিয়া মুহূর্ত্তের জন্য সকলেই নিস্তব্ধ হইয়া পড়িল। হ্যামফ্রে বলিতে লাগিল—"একটা মিথ্যা ডাইনীর ওজর ক'রে কার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধ'রেছিস জানিস? আমি লর্ড হ্যামফ্রে, নরম্যাণ্ডীর ব্যারণ, আর যাকে তোরা ডাইনী ব'লচিস সে আমার ভাবী পত্নী। এখন তোদের এখানে কি দরকার বল্।"

তাহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি চাহিতে লাগিল ধনীদিগকে তাহারা কি একটা ভয় মিশ্রিত ভক্তির সহিত দেখিত। লর্ড হ্যামফ্রের সুন্দর এবং বহুমূল্য শিকার পরিচ্ছদ দেখিয়া তাহাদের আর সন্দেহ রহিল না।

"যাও—এখনই সকলে আস্তে আস্তে চ'লে যাও।"

"আপনি কি সত্যই সেলিনকোর্টের ব্যারণ?"

"বিশ্বাস না হয় নীচে গিয়া ইহুদিকে জিজ্ঞাসা কর।"

"যদি রমণীটী বাস্তবিকই আপনার ভাবী পত্নী হন তবে আমরা তাঁর বিষয় আনু-পূর্ব্বিক শুনতে চাই।"

"তা যদি শুনবার ইচ্ছা থাকে তবে যুদ্ধ ছেড়ে নগরপালের কাছে যাও। তিনি লোক পাঠিয়ে আমাদের নিয়ে যাবেন সেই খানে সকল কথা শুনতে পাবে।"

"তাই ভাল আমরা এখনি নগরপালের কাছে যাই।"

তাহারা চলিয়া গেল। মুহূর্ত্ত মধ্যে সোপান জনশূন্য হইল, কেবল এই কলহের চিহ্ন স্বরূপ স্থান রক্তাক্ত হইয়া রহিল।

কতক্ষণ পরে হ্যামফ্রে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া মৃদু হাস্যসহকারে বলিল—"ইলা! বাস্তবিকই তুমি আমায় তোমার মোহিনীমন্ত্রে মুগ্ধ করেছ, তুমি কুহকিনী আমার প্রেয়সী, নরম্যাণ্ডি-ব্যারণের ভাবী পত্নী।"

লজ্জাভয়বিহ্বলা ইলা হ্যামফ্রের বক্ষে মস্তক লুকাইল।

শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সুবর্ণচিত্র

[অবদান কল্পলতা (৬৩শ পল্লব) এবং F. A. Vol Schiefner W. R. S. Ralston কর্তৃক অনুদিত Tibetan Tales নামক পুস্তকের একটি গল্প অবলম্বনে]

তখন ভগবন্ত তুষিত রাজ্যে অবস্থান করিতেছিলেন।

নিগ্রোধিকা নগরী। নগরীর বক্ষোপরি বিশাল নিগ্রোধিকা পাদক, নগরীর নামও তাই নিগ্রোধিকা। নিগ্রোধি পাদপদেবতার আশীর্ব্বাদে জন্ম, তাই সেই ব্রাহ্মণের নাম ছিল নিগ্রোধ। নিগ্রোধ মহাকুলোদ্ভব। কুলের নাম মহাশাল(১)। অমিত ধনসম্পত্তিশালী—

অধিকারে ১৬ খানি দাসপল্লী, ৯০৯ জোড়া বলিবর্দ্দ, ৩০ কৃষকপল্লী, ৬০ বাগানপল্লী, ৬০ কোটি স্বর্ণকন্দুক, ৮০টি স্বর্ণকর্ণাঙ্গুরীয়।

এত ঐশ্বর্য্য নৃপতি মহাপদ্মের রাজশ্রীকে যেন লাঞ্ছিত করিবার জন্যই। বিপুল সম্পত্তি কিন্তু নিগ্রোধ অপত্যহীন! বহু দেবতা পূজিয়াও ব্রাহ্মণের বাসনা পূর্ণ হইল না। অতঃপর নিগ্রোধজননী নিগ্রোধপাদপদেবতার শরণ লইতে পুত্রকে নিদেশ করিলেন। পুত্র পাদপদেবতার পূজা করিলেন। অভিলাষ যদি পূর্ণ না হয়, তবে তরুবর সমূল উৎপাটিত হইবেন, ভীতি প্রদর্শিত হইল। পাদপ দেবতা প্রমাদ গণিলেন। ক্ষুদ্রশক্তি সে, সে কি করিতে পারে? দেবতা নৃপতি রাষ্ট্রপাল সকাশে উপনীত হইলেন।

"পূর্ব্ব কর্ম্মফলে পুত্র লাভ হয়।" এই বলিয়া রাষ্ট্রকূট অক্ষমতা জ্ঞাপন করিলেন।

বিরুদ্ধক, বিরূপাক্ষ, বৈশ্রবন রাজন্যবর্গ একই কথা বলিলেন।

অতঃপর নৃপতিবৃন্দ দেবরাজ শক্র সমীপে গমন করিলেন।

"পূর্ব্বকর্ম্মফলে সন্তান লাভ হয়।" এই বলিয়া দেবরাজ দুঃখ প্রকাশ করিলেন।

শক্র মহাব্রহ্মের শরণাগত হইলেন। মহাব্রহ্ম সকলের দর্শনীয় নহেন। শক্রহৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া রাজন্যবর্গকে বলিলেন,

"জগৎ আমাকে সৃষ্টি করে নাই, আমিও জগৎকে সৃষ্টি করি নাই। হে নৃপতিবৃন্দ আমি অক্ষম।"

মহাব্রহ্ম প্রস্থান করিলেন।

নিগ্রোধদেব অতিশয় কাতর হইয়া পড়িলেন। মহাব্রহ্ম তাঁহার ব্যাকুলতায় বিচলিত হইলেন।

'হে বন্ধো, একান্তই যদি প্রিয় বাসস্থান ত্যাগ করিতে অসমর্থ হও, তবে তুমি স্বয়ং নিগ্রোধপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ কর।'

নিগ্রোধদেব সংসারের অধীনতাপাশে বদ্ধ হইতে অস্বীকৃত হইলেন। অতঃপর উপায়ান্তর না দেখিয়া মহাব্রহ্মের আদেশ শিরোধার্য্য করিলেন। নিগ্রোধপত্নী সুরূপা অনিন্দ্যসুন্দর পুত্র প্রসব করিলেন। নগরী উৎসবে মাতিয়া উঠিল। নিগ্রোধদেবের প্রসাদে জন্ম,—পৌরজনবর্গ দেবতার নামে শিশুর নামকরণ করিলেন। আর শিশুর পিতা নিজ কুলের নামানুযায়ী তাহার নাম রাখিলেন কাশ্যপ।

কাশ্যপ যৌবনে পদার্পণ করিল। কাশ্যপ দেবতা। দেবতা বিবেকনির্ম্মল, সংসারবিমুখ। অতঃপর নিগ্রোধ পুত্রকে পাণিগ্রহণে অনুরোধ করিলেন। সংসারবিমুখ কাশ্যপ স্বাভিপ্রায় জ্ঞাপন করিল। পিতাপুত্রে বাক্যে ম্রিয়মাণ হইলেন, পিতার মলিন বদন পুত্রের হৃদয়ে আঘাত করিল, উভয় দিক যাহাতে বজায় থাকে, পুত্র এমনি কোন উপায় খুঁজিতে লাগিল।

"পিতঃ, জম্বুনদী (২) সুবর্ণের আধার, আমায় কিছু সুবর্ণ প্রদান করুন।"

পিতা পুত্রের অভিলাষ পূর্ণ করিলেন।

কাশ্যপ সেই সুবর্ণে শিল্পীর সাহায্যে এক অনিন্দ্যসুন্দর নারীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিলেন।

"পিতঃ এমনি, যদি লাবণ্যময়ী কাঞ্চনাভা কন্যা থাকে, তাঁহাকেই বিবাহ করিব, নতুবা নয়।"

(২) "Jambu : "Name of a fabulous river, said to flow from the mountain Nerve and to be formed by the Juice of the fruits of an inmense Jambu tree on that mountain !!

—Tibetan Tales P.P. 191

পুত্রের বাক্যে পিতা নিরাশ হইলেন।

ব্রাহ্মণ চতুরক নিগ্রোধের পরম সুহৃৎ।

"বন্ধু, তুমি নিশ্চিন্ত হও, আমি স্বর্ণ স্বপ্নের সন্ধানে বাহির হইলাম। কুমারকে নিশ্চয়ই সেই স্বপ্নে বাঁধিব।"

কাশ্যপের সুবর্ণপ্রতিমার মতন আরো তিন খানি প্রতিমা রচিত হইল। দুই খানি অপর অন্বেষণকারীরা লইল। চতুরক শেষ খানি লইলেন। নগর নগরী, দেশ দেশান্তর চতুরক ভ্রমণ করিলেন। জীবন্ত প্রতিমা মিলিল না। গৃহে গৃহে অন্বেষণ অসম্ভব। চতুরক প্রত্যেক নগরীর মাঝখানে বাসা লইতেন। বার্ত্তা প্রচারিত হইল, যে কুমারী এই প্রতিমার অর্চ্চনা করিবেন, দেবী তাঁহাকে পাঁচটি বর প্রদান করিবেন—পবিত্র কুলে জন্ম, পবিত্র কুলে পরিণয়, পতির দেবদুর্ল্লভ প্রেমলাভ, এবং সুপুত্র লাভ।

দলে দলে কুমারীকুল অর্ঘ্য লইয়া দেবীর চরণ বন্দিতেন। চতুরক জীবন্ত প্রতিমা খুঁজিতেন। প্রতিমা মিলিল না। চতুরক হতাশ হইলেন। "অবশেষে কুমারেরই জয় হইল।" বাকী কেবল বৈশালী নগরী। চতুরক ভগ্নহৃদয়ে বৈশালীতে পদার্পণ করিলেন। কত না কুমারী আসিতেন, কামনা করিয়া ঘরে ফিরিতেন।

ঐশ্বর্য্যবান্ দ্বিজবর কপিল বৈশালীর অধিবাসী। কুমারী কন্যা ভদ্রা ব্রাহ্মণের নয়নমণি। ব্রাহ্মণ ভাবিতেন,

"মা, তুমি কোন দেবী, আমার এই আঁধার ঘর উজ্জ্বল করিলে!"

ব্রাহ্মণের নয়নবারি উথলিয়া উঠিত।

জননী তনয়াকে বলিলেন,

"মা, নগরীর সকলেই দেবী পূজিয়া বর মাগিয়া লইল, তুমিই বাকী।"

"মা, আমার জীবন সবার হইতে পৃথক, আমি বর মাগিয়া কি করিব?"

"কেন মা?"

"আমার ত সবই আছে, যা নাই তা ত আমি চাই না! আমার পবিত্র কুলে জন্ম, তুমি বল আমি দেবীপ্রতিমা। মা, আমি বিবাহ করিব না। আমি ধর্ম্ম জীবন যাপন করিব, আমি সন্ন্যাসিনী হইব, তবে আমার বরে কাজ কি?"

জননী সাশ্রু নয়নে কন্যার মুখে চাহিলেন।

"মা, মা, আমায় কি যাইতেই হইবে? গেলে কি তুমি সুখী হও? আমি আজই যা'ব, মা, তুমি অমন করিয়া চোখের জল ফেলিও না, আমার বড় ব্যথা বাজে!"

কপিলভদ্রা অর্ঘ্যের ডালি রচিলেন।

চতুরক দেখিলেন রাজপথ আলো করিয়া দেবী যেন অর্ঘ্য বহিয়া দেবীর মন্দিরে আসিতেছেন। চতুরক দেবীকে অভ্যর্থনা করিলেন।

ভদ্রা পূজায় বসিলেন। চতুরক অনিমেষ লোচনে পূজারিণীকে নিরীক্ষণ করিলেন। আশা মুকুলিত হইল। প্রতিমার দিকে ফিরিলেন। সে স্বর্ণ বর্ণ ত আর নাই, সে ঔজ্জ্বল্য ত আর নাই, সে লাবণ্য কোথায়?

চতুরক আনন্দে বিহ্বল হইলেন। প্রতিমার বিসর্জ্জন হইয়াছে, দেবী ফিরিয়া আসিয়াছেন। কপিল ভদ্রা পূজাসমাপনান্তে গৃহে ফিরিলেন। সন্ধ্যায় নহবত বাজিয়া উঠিল। গৃহে গৃহে গৃহদীপ জ্বলিল।

রজনী প্রভাত হইল। গগনের কোলে কোলে উষাসমীর—শান্ত মধুর, ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিল। কুঞ্জে কুঞ্জে প্রভাত পাখী

জাগরণী গাহিল। মৌমাছিরা-ব্যস্তত্রস্তে ফুলের আলয় মুখর করিয়া তুলিল। বিশ্ব জাগিল।

চতুরক জাগিলেন। কপিল মন্দিরদ্বারে উপনীত হইলেন। কপিল অতিথিকে বরণ করিয়া লইলেন।

"দ্বিজবর, আপনার আগমনে আমার এ কুটীর পবিত্র হইল।"

"আপনার এই পবিত্র কুটীরে আমার একটি প্রার্থনা আছে।"

"মানুষে যাহা পারে করিব।"

"মানুষেই করিয়া থাকে। নিগ্রোধ নগরীর বিপুল ঐশ্বর্য্যপতি দ্বিজরাজ নিগ্রোধ আমার পরম সুহৃৎ। কাশ্যপ তাঁহারই পুত্র। কাশ্যপকুমার স্বর্ণেরই কুমার। আমি কুমারেরই জন্য আপনার কন্যা কুমারীকে প্রার্থনা করি।"

প্রার্থনা শুনিয়া কপিল নীরব হইলেন। চতুরক চঞ্চল হইলেন।

"দ্বিজবর, ব্রাহ্মণের প্রার্থনা তবে পূর্ণ হইবে না?"

"কিছু সময় দিন্।"

"আমি এখনি ত চাহি না।"

অতঃপর যথাবিহিত সৎকার লাভের পর চতুরক নিগ্রোধিকা মুখে প্রস্থান করিলেন। কাশ্যপ সকল অবগত হইয়া ম্রিয়মাণ হইলেন।

"পিতঃ, আমি তাঁহাকে একবার দেখিতে চাই।"

পর দিন প্রত্যূষে নিগ্রোধতনয় কাশ্যপ নিঃসঙ্গ বৈশালী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। মন্দির প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

"আমি অতিথি।"

"স্বাগত।"

"আপনি কে?"

"আমি কপিলদুহিতা কপিলভদ্রা।"

"আপনি কুমারী?"

ভদ্রা সলজ্জনীরবে নয়ন নত করিলেন।

"শুনিয়াছি, পিতা নিগ্রোধ নগরবাসী দেব নিগ্রোধ-তনয় কাশ্যপের হস্তে আমায় সমর্পণ করিবেন।"

"দেবি, সে স্বামী লইয়া কি করিবে? তিনি বিষয়বিমুখ। অমন স্বামীকে—সন্ন্যাসী স্বামীকে কি তোমার ভাল লাগিবে?"

"বুঝিতে পারিলাম না।"

"এখনই বুঝিয়া লউন।"

"উত্তম। আমিও সংসারবিমুখ, আমিও সন্ন্যাসিনী হইব। পরিণয়ে স্পৃহা নাই। আপনার এই সংবাদ আমায় জীবন দান করিল।"

"আমিও বলি উত্তম। ভদ্রা, আমিই সেই নিগ্রোধ তনয়। তুমি আমায় রক্ষা কর।"

"স্বামিন্, নিজেই তুমি আমায় লইতে আসিয়াছ।"

"দেবি, আমাদের এই পরিণয় শুধু মনের পরিণয় হউক। তুমি আমায় রক্ষা কর, দেবী।"

"তুমি আমায় রক্ষা করিলে, প্রভু।"

কাশ্যপ ভদ্রার দিকে আপন দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিলেন। দেবীর বৈরাগ্যপূর্ণ হস্ত স্বামীর বৈরাগ্য পূর্ণ হস্তে স্থাপিত হইল।

অতঃপর মহাসমারোহে উভয়ের উদ্বাহ ক্রিয়া সমাপন হইল। দম্পতি যুগল সংসারে প্রবেশ করিলেন। সে সংসার ত্যাগের, বৈরাগ্যের, ব্রহ্মচর্য্যের। নিশাযাপন একই প্রকোষ্ঠে, একই শয্যায়। কেহ কাহাকেও স্পর্শ করিবেন না।

রাত্রির প্রথমযাম। উভয়ে উভয়ের মুখে চাহিয়া বারেক মৃদু হাসিতেন। ভদ্রা নিদ্রা যাইতেন, কাশ্যপ জাগিয়া থাকিতেন। কাশ্যপ নিদ্রা যাইতেন, ভদ্রা জাগিয়া থাকিতেন।

উষার কুঞ্জে পাখী ডাকিলে, উভয়ে উভয়ের মুখোমুখি বসিতেন। বাতায়নে অরুণালোকে আর একবার উভয়ে উভয়ের মুখে চাহিয়া হাসিতেন।

সে দিন পূর্ণিমা নিশি। বাতায়ন পথে পথে ফুল্ল কৌমুদী মায়াজাল রচিয়া তুলিল। সমস্ত নিখিল বিহ্বল, পাগল। তেমনি হাসি হাসিয়া ভদ্রা নিদ্রিতা হইলেন।

রজনী নিশীথিনী, তৃতীয় যাম।

বাতায়নপথে নিশ্চল জ্যোৎস্না লম্বমান্, নিদ্রিতার সুপ্ত শিথিল কবরীর পুলক স্পর্শে বিভোর। কাশ্যপ অনিমেষ সেই গোপন অভিসার নিরীক্ষণ করিলেন, অলক্ষ্যে রাত্রি শেষে শীতল বাতাস বাতায়নপথে পশিল। কবরী স্পর্শ করিল। স্পর্শে কবরী শিহরিল। কুঞ্চিত অলকগুচ্ছ কাশ্যপকে ব্যাকুল করিল। কাশ্যপ সভয়ে শিহরিয়া উঠিলেন।

"হায়, কি করি! এ কাল সর্প এখনই ত দেবীর সুপ্ত কপোল স্পর্শ করিল! হায় কি করি, কি করি!"

কাশ্যপ জ্ঞান হারাইল।

দেবীর জীবন রক্ষা একমাত্র তাহার চৈতন্যকে আগুলিয়া লইল।

কাশ্যপ যন্ত্রচালিতের ন্যায় দেবীর কোমল কপোল স্পর্শ করিলেন। দংশন করে ত তাহারই হস্তে করিবে। স্পর্শে দেবী শিহরিয়া উঠিলেন। সর্ব্বাঙ্গে পুলক খেলিয়া গেল। হায় দেবী! দেবী নারী। তবে নারী সন্ন্যাসিনী।

"স্বামিন্, স্বামিন্, কি করিলে?"

কাশ্যপ সচেতন হইলেন। বুঝিলেন কি করিয়াছেন।

"বল স্বামিন্, স্বামিন্, না—না। তবে কি হইয়াছে, বল?"(৩)

অশ্রুহারা কাশ্যপ অধোবদনে গম্ভীর স্বরে সকল নিবেদিলেন। ভদ্রা প্রীতা হইলেন। উভয়ে অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিলেন। রাত্রি প্রভাত হইল! ম্রিয়মাণ কাশ্যপ একেবারে প্রিয়তমার বক্ষের দ্বারে দাঁড়াইলেন,—হৃদয় উন্মুক্ত হইল।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত।

পশুর বাক্‌শক্তি

মনুষ্য ও পশুর মধ্যে ভাষার দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর বর্ত্তমান ইহাই এযাবৎ দর্শন ও বিজ্ঞানের একমাত্র সিদ্ধান্ত বলিয়া আমরা জানিয়াছি—কিন্তু সম্প্রতি প্রকাশ পাইয়াছে যে শিক্ষা দ্বারা পশুও মনুষ্যেরই ন্যায় জ্ঞান লাভ করিতে পারে এবং স্বাভাবিক অনুকরণ বৃত্তির পরিচালনা দ্বারা পশুতেও মনুষ্য ভাষার বিকাশ হওয়া সম্ভবপর।

আধুনিক যুগে পশুশিক্ষা লইয়া পাশ্চাত্যজগতে প্রবল আন্দোলন চলিতেছে। পশুর মনস্তত্ত্ব আবিষ্কার, তাহাকে বাক্‌শক্তিপ্রয়োগ ও মানবীয় কার্য্যকলাপ শিক্ষাদানে যাঁহারা আপনাদিগের অমূল্য সময় ক্ষেপণে নিরত তন্মধ্যে অধ্যাপক বেল্, কিনেম্যান; কার্ণেস, গার্ণার প্রভৃতি মহাত্মার নাম প্রাণিজগতে অভিনব

(৩) "আর্য্যপুত্র কথং নাম সময় সত্য বাদিনঃ।
বিস্মৃত স্তবসঞ্জাতো যদয়ং চিত্ত বিপ্লবঃ॥৪২॥
লজ্জাবহা বিকারস্ত কেয়মাপত্তিতা তব।
ত্যজন্তি ধৃতিমর্য্যাদাং ভূধরা নতু সাধবঃ॥৪৩॥

অধ্যায়ের আবিষ্কর্ত্তার উচ্চস্থানে স্থান পাইবে সন্দেহ নাই। এই মহাপুরুষ চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রোফেসার গার্ণার বনমানুষ শিম্পাঞ্জী সম্বন্ধে একরূপ শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন বলা যায়। ইঁহাদের মধ্যে প্রাণীতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক বেল্ সাহেব নিজের জীবনী-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—
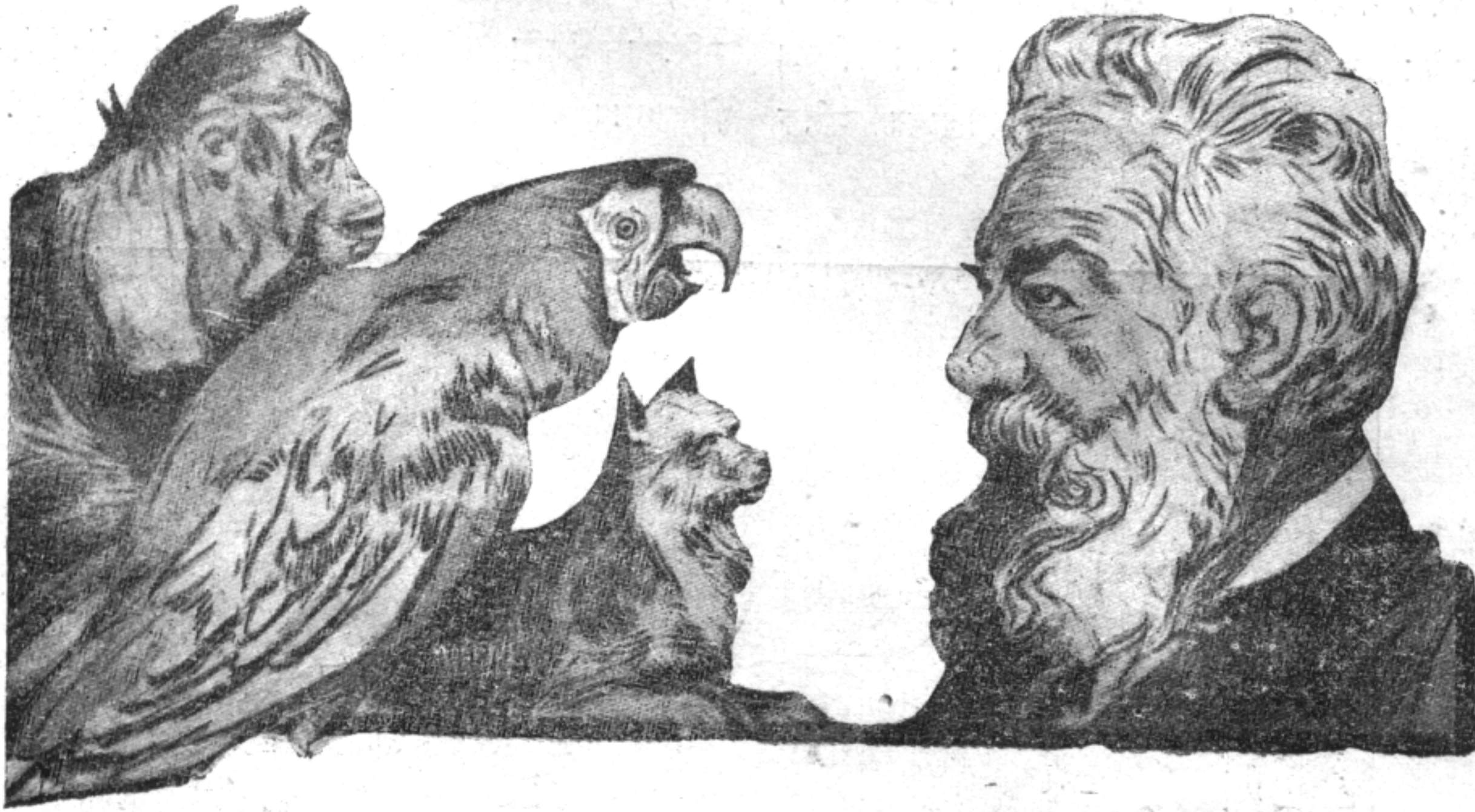
পশুশালায় বেল সাহেব।

তাঁহার পিতার তোৎলা চিকিৎসার একটি স্কুল ছিল। সেখানে তোৎলাদিগের মুখের আকারের ও গঠনের প্রভেদ লক্ষ্য করিতে করিতেই তাঁহার মনে হয় যে, কুকুরের মুখ হইতে কোন কথা বাহির করিতে পারা যায় কি না? এই কৌতুহলের বশবর্ত্তী হইয়া বহুকাল পরিশ্রমের পর তিনি একটী ক্ষুদ্রকায় কুকুরকে 'mamma' (মা) এই কথাটী দ্বিতীয় অংশের উপর পুনঃ পুনঃ জোর দিয়া উচ্চারণ করিতে শিক্ষা দেন। ইহার কিছুকাল পরে 'Grand mamma' এই কথাটীও কুকুরের মুখে Ga, ma, ma.' অস্পষ্টরূপে বাহির হইয়াছিল।

এইরূপে প্রোফেসার বেল্ আপনার অদ্ভুত কৌশল-ক্রমে তাহার মুখ হইতে 'ঠাকুর্দ্দা কেমন আছেন? (How are yon grand mamma) এই কথাটীর বিকৃত আকারে 'Oh ah oo,' 'ga ma ma'?' এই উত্তর পাইয়া বিশেষ আশান্বিত হইয়াছেন। তাঁহার পশুশালায়' বানর, টিয়া ও কুকুরের বিশেষ আদর। ইহারা নাকি দু'একটী অক্ষরও লিখিতে পারে। পিটার নামক একটী বানর সম্বন্ধে এরূপ শুনা যায় যে সে রীতিমত কয়েকটী অক্ষর চক্‌দ্বারা শ্লেটে স্পষ্টরূপে
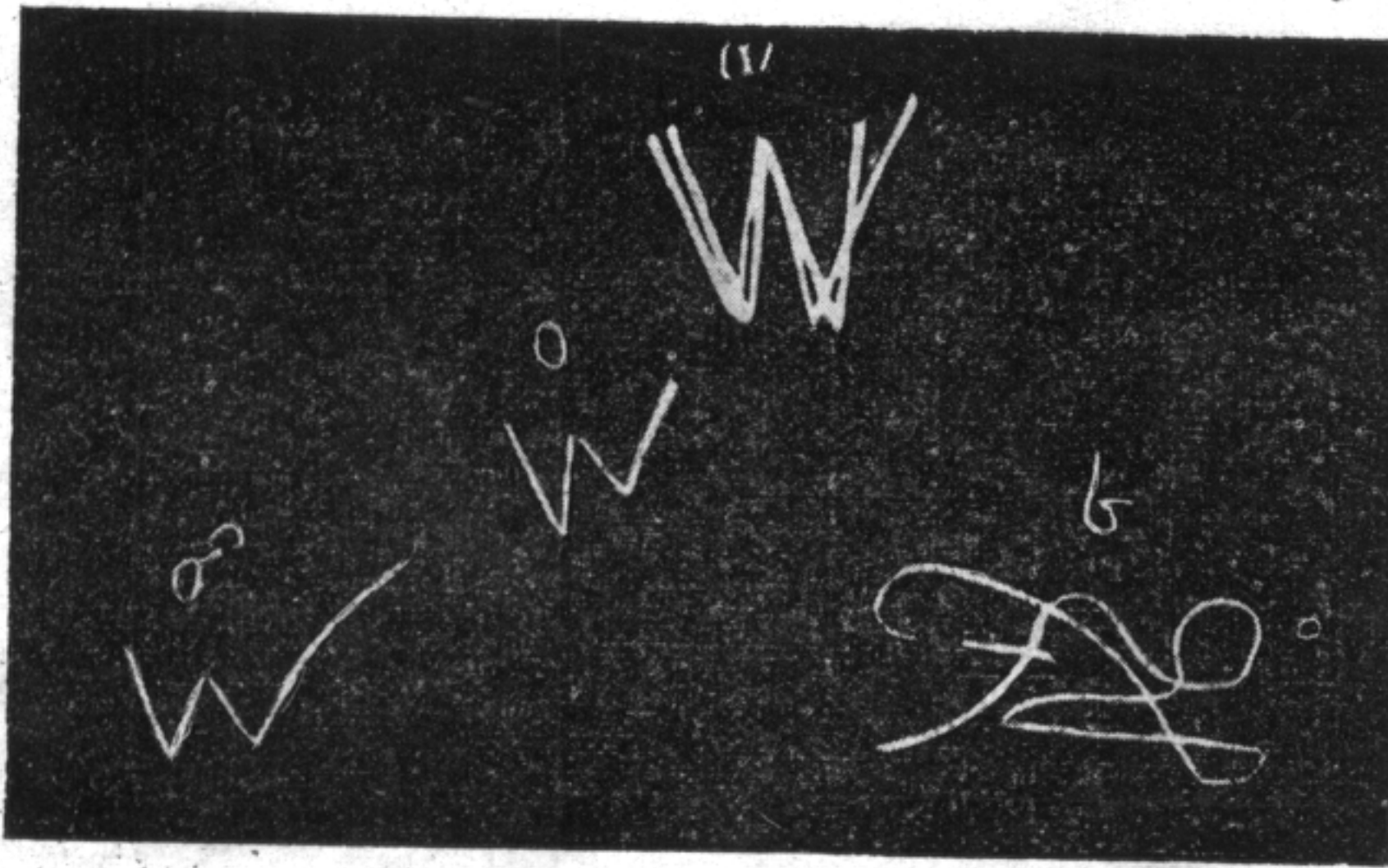
পিটারের লেখা।

লিখিতে পারে। টিয়াতে বাক্‌শক্তি প্রয়োগের জন্য সচেষ্ট থাকিলেও বেল্‌ সাহেব, ইহা অপেক্ষা বানরে মনুষ্যোচিত ভাষা বিকাশের বিশেষ সুবিধা দেখিতে পাইয়াছেন। কুকুর সম্বন্ধে তিনি বলেন, ইহাদের কণ্ঠের গঠনশৃঙ্খলা কোন কোন বিষয়ে মনুষ্যকণ্ঠের গঠন অপেক্ষাও শব্দোৎপাদনের অধিক উপযোগী।

এই স্থানে আর একটী পশুশালার উল্লেখ একান্ত প্রয়োজন। প্রায় বৎসর ছয় পূর্ব্বে এই পশুশালা আমেরিকা যুক্তপ্রদেশের রাজধানীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সম্প্রতি প্রোফেসার ক্রোঞ্জের আয়ত্তাধীনে ইহার সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। ইহাতে মিঃ কিনেম্যান্‌ শিক্ষাদানে বানরের নরলীলার দ্বিতীয় অধ্যায় অভিনয় করিতেছেন। তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া
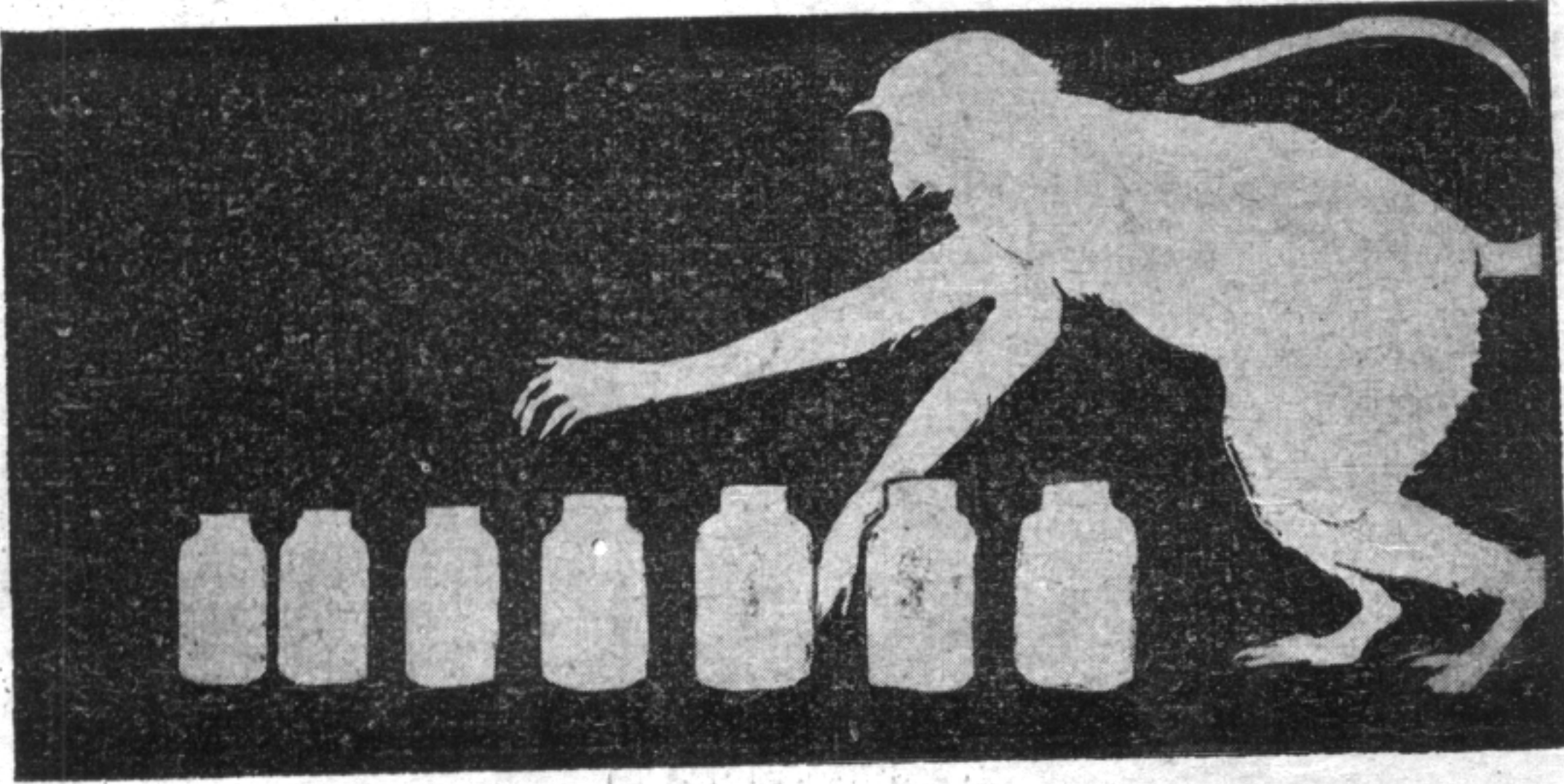
বানরের গুণন শক্তি।

শিক্ষিত বানরসমাজ বিবিধ বর্ণের বহুসংখ্যক পানপাত্র অঙ্গুলি সঙ্কেত দ্বারা গণিতে পারে—প্রায় ত্রয়োদশটী বাক্সের মধ্যে একে একে নির্দ্দেশানুসারে বিভিন্ন ধরণের ডালা টানিয়া খুলিতেও ইহারা খুব মজবুত।

কিনেম্যান্‌ সাহেব ইহা ছাড়া পশুশালার একটী নিভৃতকক্ষে কতকগুলি ক্ষুদ্রবৃক্ষ রোপণ করিয়াছেন। সময় সময় ইহাদের বুদ্ধিশক্তির প্রাথর্য্য পরীক্ষা মানসে আপেল সংযুক্ত একটী সুতীক্ষ্ণ যষ্টির অগ্রভাগ সেই
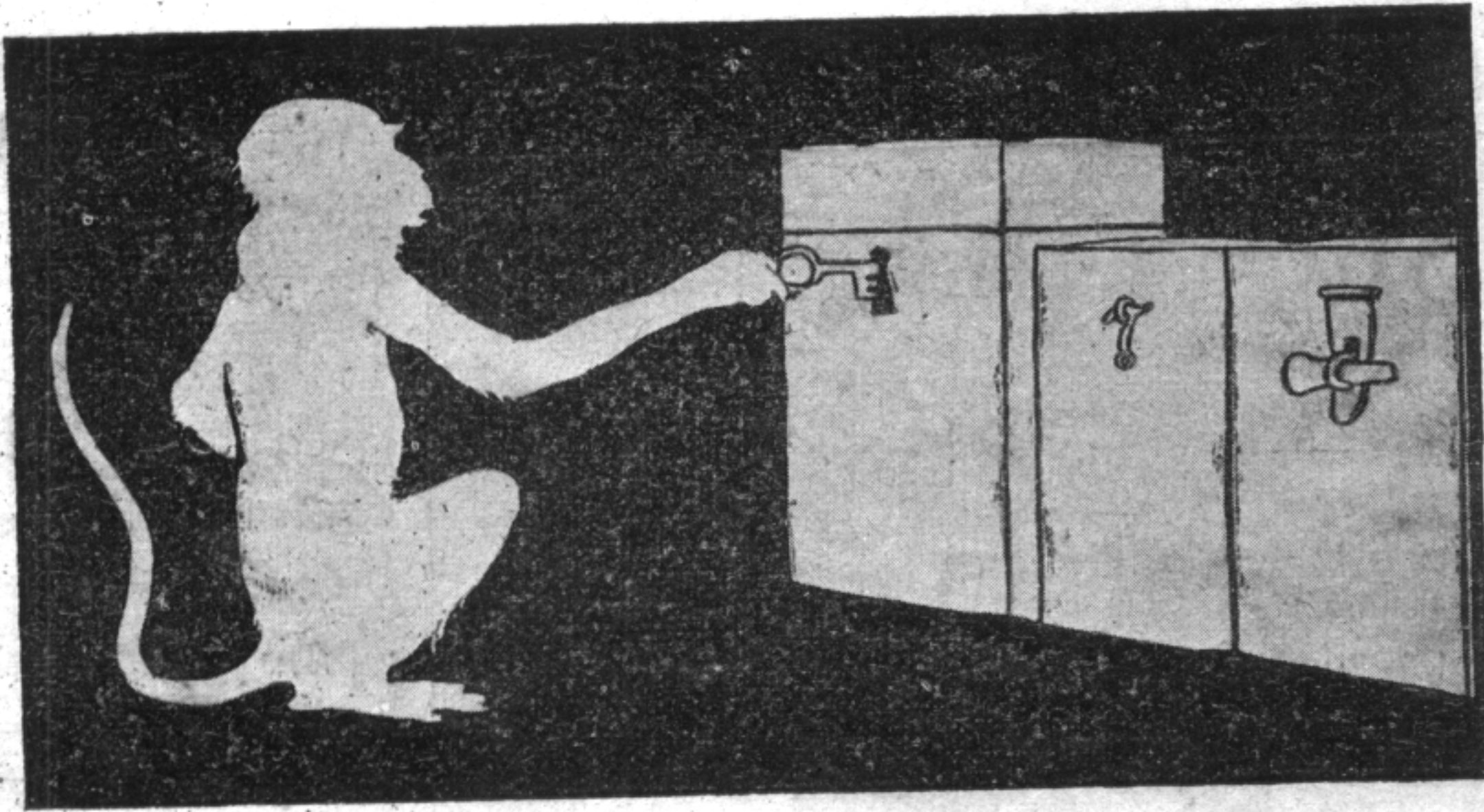
বানর বাক্স খুলিতেছে।

সকল বৃক্ষের অতি সরু ডালে সংলগ্ন করিয়া ধরিয়া থাকেন, বানর মৃত্তিকা হইতে লম্ফঝম্পে নিষ্ফল প্রয়াস পাইয়া, অবশেষে বৃক্ষে চড়িয়া ধীরে ধীরে আপন শরীর ঈষৎ হেলাইয়া আপেলের উপর সবেগে পতিত হয়। মিঃ কিনেম্যানও গার্ণারের ন্যায় বানরে বাক্‌শক্তি প্রয়োগের নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টান্বিত আছেন। এবিষয়ে কার্ণেস মহাশয়ই অধিকতর কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতাপন্ন "শিশি"
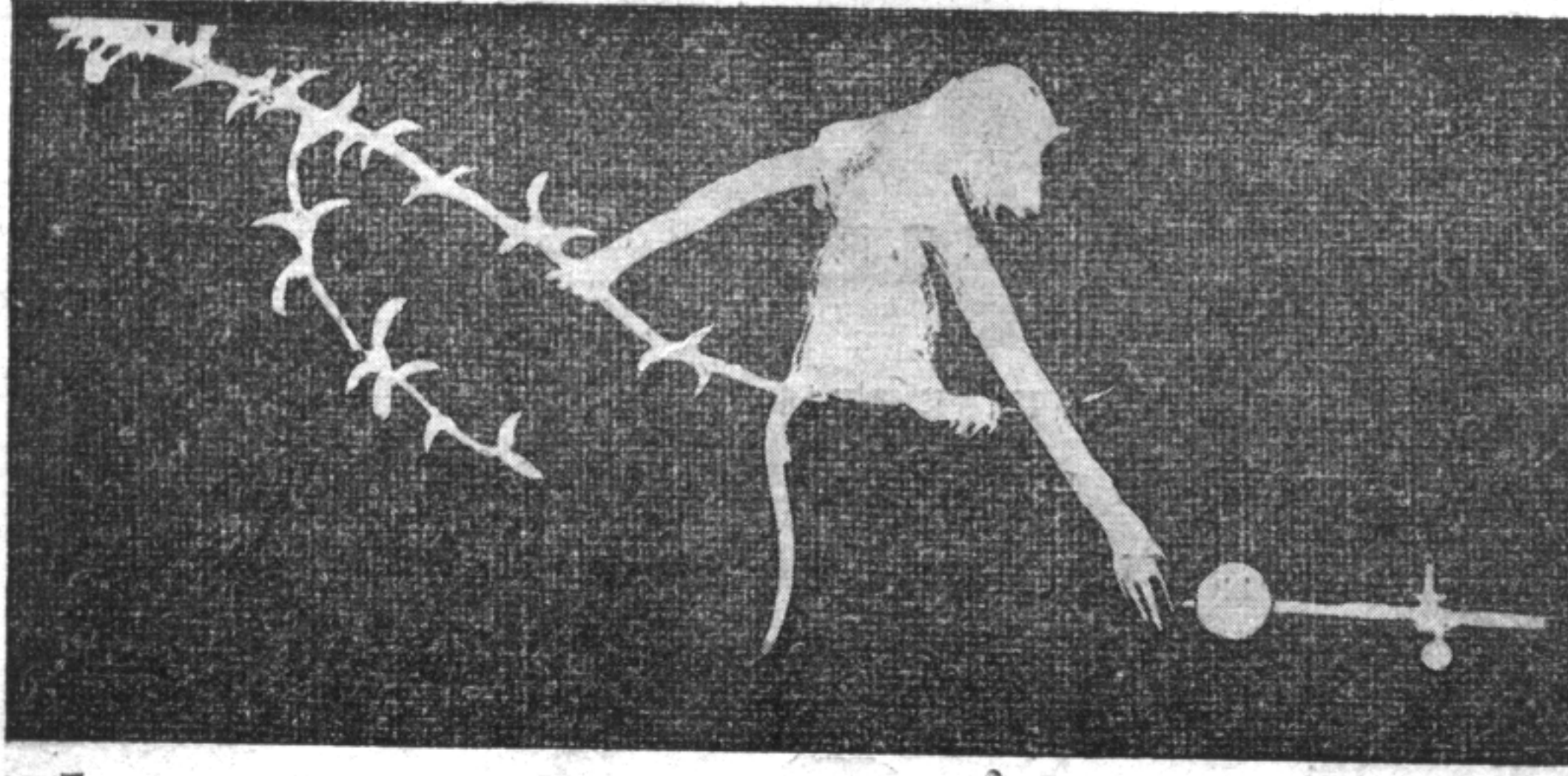
বানরের আপেল লাভ।

নামক বানরটী প্রভুর সুদীর্ঘকাল শিক্ষকতার ফলস্বরূপ আভিধানিক তিনটী শব্দ আয়ত্ত করিতে পারিয়াছে ও স্বাভাবিক সুন্দরভাবে "mamma" "pappa" ও "aeh" এই কথাগুলি উচ্চারণ করিয়া তাঁহার কার্য্যাবলী সফলতামণ্ডিত ও গৌরবগাথায় সমুজ্জল করিয়া তুলিয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত বর্ণনা প্রসঙ্গে ইহাই প্রকাশ পাইয়াছে যে, কুকুর ও বানর সাধারণতঃ শিক্ষা পাইলে মানুষের ন্যায় স্পষ্ট কথা কহিতে পারে প্রাণীজগতে খ্যাতনামা পুরুষ অধ্যাপক বেল্‌, কার্ণেস্‌, গার্ণার, কিনেম্যান্‌ প্রভৃতির মত এইরূপ। কিন্তু অধুনা প্রাণীজগতে প্রসিদ্ধিপ্রাপ্ত এক অদ্ভুত কুকুরের কার্য্যকলাপ দেখিয়া জার্ম্মেণীর বৈজ্ঞানিকসমাজ স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছেন। ইহা স্পষ্ট মনুষ্যভাষায় কথা কহিতে পারে। ইহার গম্ভীর ভাবব্যঞ্জক ভাষা কেবল অনুকরণের ফল নহে বা তোতাপাখীর শিখান বুলি নহে; আন্তরিক আবেগেরই স্বাভাবিক অভিব্যক্তি মাত্র,—সংক্ষেপে ইহাকে তাহার স্বাভাবিক মানসিক বিকাশেরই ফল বলা যাইতে পারে। ইহার নাম ডন্‌। ডন্‌ সম্বন্ধে ডাক্তার আল্‌ফ্রেড গ্রেডেন ওউজ্‌ স্বয়ং অনুসন্ধান পূর্ব্বক লিখিয়াছেন যে ইহার বিবরণ অদ্ভুত হইলেও প্রামাণ্য।

ডন্‌ অতি শৈশবেই অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিত। ইহার শৈশব সময়ের বহু আশ্চর্য্য কার্য্যকলাপ বর্ণিত হইয়াছে। শিকারার্থ শিক্ষা ব্যতীত ডন্‌ কখনও আর কোন শিক্ষা প্রাপ্ত হয় নাই। ভাষা তাহার অপরাপর গুণগ্রামের ন্যায় স্বতঃই বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। ফলতঃ এই অদ্ভুত কুকুরের প্রত্যেক বিষয়ই স্বতঃসিদ্ধ। যখন তাহার মন ভাল থাকে—তখন সে আপনাআপনি কথা বলিতে আরম্ভ করে—কিন্তু নিরানন্দের যৎসামান্যও কারণ থাকিলে সে একটী শব্দও উচ্চারণ করিবে না এবং অন্য কিছুতেই তাহাকে কথা বলাইতে পারা যায় না।

তাহার বয়স যখন ছয় মাস তখনই সে অর্থযুক্ত শব্দ উচ্চারণ করিয়া তাহার অনন্যসাধারণ শক্তির পরিচয় প্রদান করিত। সে একদা টেবিলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রভুর দিকে এরূপভাবে চাহিল যে, তাহাতে সে কিছু চাহিতেছে ইহা স্পষ্ট বুঝা গেল, তখন তাহার প্রভু জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কিছু চাও?"

সে পরিষ্কার উত্তর দিল 'চাই' (Haben 'Have') এই অদ্ভুত কাণ্ডের পর সে অপূর্ব্ব মনোযোগের বিষয় হইল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মনুষ্যের অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক অনুকরণবৃত্তির প্রভাব অনুসারে 'Haben' (চই) এই শব্দটী জার্ম্মণ শিশুগণ প্রথম শিক্ষা করিয়া থাকে। এই সহজ সংস্কারভাবের বশবর্ত্তী হইয়া ডন্‌ও ক্রমশ অদ্ভুত বিষয় সকল শিক্ষা করিয়াছে—সময়ে সময়ে, মাত্র মনুষ্যশিক্ষার সাহায্য পাইয়াছে।

তাহার চাল চলনে আশ্চর্য্য স্বাধীনতা বর্ত্তমান। থারহটে (Therhutte) তাহার প্রভুর বাড়ীতে, রাজকীয় শিকারভূমির মধ্যে সে একরূপ স্বাধীন জীবনই যাপন করিত। যে কিছু অধীনতা তাহা কেবল শিকারের সময় নিজের ব্যবসায়ের কর্ত্তব্য পালন। প্রতিদিনই সে একাকী প্রাতঃকালে ভ্রমণের জন্য বাহির হইত, জঙ্গলের মধ্যে বেড়াইত; এবং সময়ে সময়ে তাহার প্রভুর বন্ধুদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিত। সেখানে উপস্থিত হইয়া মানুষেরই ধরণে হুড়কা টানিয়া সরাইয়া নিজে নিজেই দরজা খুলিয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া যাইত, তথায় আগুন পোহাইবার স্থানের নিকটে সুখে শুইয়া থাকিত এবং মনে স্ফূর্ত্তি থাকিলে গৃহের লোক দিগের সহিতও কিছু আলাপ করিত।

পথে স্কুলের শিশু ছাত্রদিগকে দেখিলে তাহাদিগের

হস্তধারণে ডনের অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্য।

প্রাতরাশের অংশ পাওয়ার জন্য "ক্ষুধা" (hunger), "পিঠা যাই" (Kitchen haben have cake) বলিয়া তাহাদের সহিত আলাপ করিত। তাহার সম্বন্ধে এরূপ কথিত আছে যে একবার যখন নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে একটী বৃদ্ধা স্ত্রী বাজারে যাইতেছিল তখন সে তাহাকে দেখিয়া শান্তভাবে তাহার নিকট অগ্রসর হইয়া স্পষ্ট এই কয়টী কথা বলিল,—ডন্ ক্ষুধা, 'পিঠা চাই' অর্থাৎ ডনের ক্ষুধা হইয়াছে —পিঠা চাই—(Don hunger, Kitchen haben)। সেই বৃদ্ধা বেচারী ইহাতে এরূপ ভীত হইয়াছিল যে কুকুরটী ভূতগ্রস্ত এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া সে তাহার ঝুড়িটী ফেলিয়াই দ্রুতপদে পলায়ন করিল।

তাহার সম্বন্ধে বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সে তাহার প্রভুর সহিত যেরূপ স্বাধীন ভাবে আলাপ করে অপরিচিত লোকের সহিতও তদ্রূপ সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে আলাপ করে। এই জন্যই পশুদিগের মনোবিজ্ঞানবিশারদ প্রথিতনামা ডাক্তার কাঙ্গষ্ট, স্বোর্গ এবং পশুশালার প্রধানাধ্যক্ষ ডাক্তার ভুস্‌লার (Dr. Vooseler) যখন ডনকে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার অধীন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন তখন তাহাকে শব্দ ভাণ্ডারের প্রত্যেক শব্দ উচ্চারণ করাইয়া লইতে তাঁহাদিগকে কোন বেগ পাইতে হয় নাই। এতদুপলক্ষে ফনোগ্রাফে ইহার যে কথা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে তাহাতে মনুষ্য কথার সহিত ডনের কথার অভেদ প্রতিপন্ন হয়। ইহা সত্য বটে যে, মনুষ্য ও কুকুরের কণ্ঠগঠনের বৈষম্য বশতঃ কুকুরের উচ্চারণে কিঞ্চিৎ বৈষম্য লক্ষিত হয়—কিন্তু তাহাতে শব্দ সকলের স্পষ্টতার কোনও হানিই হয় না।

ডাক্তার ভুস্‌লার ডনকে মূল করিয়া সম্প্রতি একটী কৌতুকাবহ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। ইহাতে সাধারণতঃ পশুদিগের এবং বিশেষতঃ কুকুরের মনুষ্য ভাষা ব্যবহারসমস্যা বৈজ্ঞানিক ভাবে আলোচিত হইয়াছে। তাহাতে তিনি বলেন যে, বাগেন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণ পার্থক্য সত্বেও কোন কোন পক্ষীর পক্ষে—মনুষ্যের কথা ও সঙ্গীত অনুকরণ করিবার যেরূপ আশ্চর্য্য শক্তি আছে, সেইরূপ কুকুরের ও বানরের কণ্ঠের গঠনশৃঙ্খলা মনুষ্য হইতে পৃথক্ হইলেও মনুষ্য কণ্ঠের গঠন অপেক্ষাও তাহা শব্দোৎপাদনের অধিক উপযোগী।

প্রকৃত বিষয় এই যে ডন্ পূর্ণমাত্রাতেই অদ্ভুত। কুকুর যে কেবল মনুষ্যের শব্দোচ্চারণই করিতে পারে তাহা নহে কিন্তু তাহার সহিত অর্থেরও যোগ করিতে পারে এবং তাহার শক্তির পুনঃ পুনঃ প্রয়োগের দ্বারা তাহার দৈনিক অভাব পূরণ করিতে পারে—ডনই তাহার প্রথম ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত। অবস্থা ভেদে সে কখনও বেশী কখনও বা কম কথা কয়। যদি তাহার মন বিষণ্ণ থাকে—তাহা হইলে সে কথা বলিতে চায় না—শারীরিক অসুস্থতার সময়েও এইরূপ হইয়া থাকে। সুদিন অপেক্ষা দুর্দ্দিনে তাহার কথা বলার প্রবৃত্তি কম হয়। বিশেষতঃ ইহাও প্রত্যক্ষ করা যায় যে, কথা বলাতে কুকুরটীর যথেষ্ট ক্লান্তি হয়। কারণ ভাষা মানসিক ব্যাপার সেইজন্য পশু বলিয়া ইহার পক্ষে এই মানসিকশ্রম বিশেষরূপ ক্লান্তিজনক হইয়া থাকে।

ডন্ বেগুনে রঙের সুন্দর শিকারী কুকুর। ইহার গঠন ও চক্ষু আশ্চর্য্যরূপ প্রতিভাব্যঞ্জক। বস্তুতঃ তাহার চক্ষুতে মানবীয় ভাব আছে এবং তাহার গতি ও আচরণের কতকাংশ কুকুর ও মনুষ্যের মধ্যবর্ত্তী বলিয়া স্পষ্টতঃ মনে হয়। যখন ডাক্তার ভুস্‌লার বক্তৃতা শেষ করিলেন—তখন সমাগত সকলেই এতক্ষণ যে অভিনয় দর্শনে সোৎসুক ছিল তাহা আরম্ভ হইল। একটী রেকাবীতে কিছু মাংস রাখিয়া তথায় উপস্থিত করা হইল। ইহার স্বাদযুক্ত মাংস টুক্‌রা ডনের পিঠা (Kitchen 'Cake')। প্রথমে তাহাকে তাহার নাম জিজ্ঞাসা করা হইল সে তৎক্ষণাৎ পরিষ্কার গম্ভীরস্বরে এবং বিশিষ্ট উচ্চারণের সহিত উত্তর করিল "ডন্!" দ্বিতীয় প্রশ্ন হইল "তুমি কি বোধ করিতেছ?" কুকুর বলিল, "ক্ষুধা„—"তুমি কি চাও?"—সে আগ্রহের সহিত চেঁচাইয়া বলিল "চাই" "চাই" (haben haben)। কোন কোন মানুষের ন্যায় অপর শব্দ অপেক্ষা এই শব্দটীই সে বেশী ভালবাসে। তাহাকে এক টুক্‌রা মাংস দেখাইবা মাত্র "কুচেন" (Kuchen 'পিঠা') শব্দটী সে উচ্চারণ করিল, ইহার 'ক' ও 'চ' এই তালব্য দুইটী বর্ণ স্পষ্টই শ্রুত হইল। কতকগুলি প্রশ্নের সে হাঁ ও না বলিয়া উত্তর দিল। সম্প্রতিমাত্র যে শব্দটী শিখিয়া সে নিজেকে বিশেষ গর্ব্বিত বলিয়া মনে করে তাহা তাহার প্রভুরই বাগ্‌দত্তা প্রনয়িনী। ত্রিমাত্রক (tri-syllabic) নাম Haberland (হে-বার-লেণ্ড)।

ডনের অভিধানের শব্দসংখ্যা এ পর্য্যন্ত মাত্র নয়টি। অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা ১৫০টি মাত্র শব্দ শিক্ষা করে এবং সুসভ্যদেশের সাধারণ শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিও ২০০ শব্দের অধিক শব্দ ব্যবহার করে না। এই তুলনায় ডনের শব্দদৈন্যের জন্য আক্ষেপ করিবার তেমন কারণ দেখা যায় না।

শ্রীভুপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

মাতৃঋণ

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কাহাকে?

একদিন সন্ধ্যায় গৃহে ফিরিয়া জ্যাক লক্ষ্য করিল, ইদার চিত্ত অত্যন্ত অধীর চঞ্চল, মুখে-চোখেও কেমন একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে! প্রতিদিনকার সে ম্লান বিমর্ষ ভাব কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে! জ্যাককে দেখিয়া ইদা ক্ষিপ্র স্বরে কহিল, "আর্জেন্তঁ আমাকে চিঠি লিখেছে, জ্যাক!" পরে সজোরে একটা নিশ্বাস টানিয়া ইদা আবার কহিল, "সত্যই শেষে চিঠি লিখেছে! চারমাস কোন খবর-বার্ত্তা না পেয়ে আর চুপ করে থাকতে পারলে না—দেখলে, কৈ, আমি ত আকারে ইঙ্গিতেও একটা সাড়া দিলাম না! পারবে কেন, সে থাকতে? আমি ত তাকে চিনি। আমার কাছে লুকোবে কি? কি লিখেছে, জান, জ্যাক? লিখেছে, সে খুব খানিক বেড়িয়ে-চেড়িয়ে পারিতে ফিরেছে, আমার ইচ্ছা হলে আমি এখন তার ওখানে যেতে পারি!"

শঙ্কিত চিত্তে জ্যাক প্রশ্ন করিল, "তা তুমি কি ঠিক করলে? যাবে?"

"যাব? আমি? বল কি, জ্যাক? আমার কিসের দুঃখ, এখানে? কিসের অভাব? কষ্ট বরং তারই! অত্যন্ত বেহুঁস, সে,—আপনা-ভোলা লোক। একটী কাজ নিজের করবার ক্ষমতা নাই—একলা থাকতে পারবে কেন? ভারী এলোমেলো লোক। কিন্তু জ্যাক একজন আর্টিষ্ট বটে!"

"তুমি তার চিঠির কি জবাব দেবে?"

"জবাব দেব? যে অসভ্য আমার গায় হাত তুলেছিল, তার চিঠির আবার আমি জবাব দেব? তুমি তাহলে আমাকে আজও চেন নি! আমার একটা মান আছে, ইজ্জৎ আছে, তা খোয়াব? কখনও না! আমি তার চিঠির সবটা পড়িও নি—ঐ অবধি পড়েই ছিঁড়ে ফেলেছি—একেবারে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি, এমন মেয়ে আমি নই! তবে একবার বড় দেখতে ইচ্ছা হয়, কি রকম তার কাজকর্ম্ম চলছে, কেমন করে সে ঘর-গৃহস্থালী করছে! সব একেবারে জঘন্য একাকার করে তুলেছে! তবে—না, তাই বা কি করে হবে? আমি আর এ জীবনে সে জায়গা মাড়াচ্ছি না। এই ত সে এত ঘুরেছে, কি দেশটায় ভালো—" বলিতে বলিতে ইদা অন্যমনস্কভাবে পকেট হইতে আর্জেন্তঁর পত্র বাহির করিল। সেই পত্র, যে পত্র সে কিছু পূর্ব্বেই টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে, বলিল! পত্র দেখিয়া ইদা কহিল, "এই যে, রয়াতে গেছল! দেখ একবার বুদ্ধিখানা! সেখানকার জল সইবে কেন? যাই হোক, না—তার যা ইচ্ছা হয়, তাই সে করুক—আমার অত মাথাব্যথায় কাজ কি?"

মাতাকে নির্লজ্জভাবে এই অকারণ মিথ্যা বলিতে শুনিয়া জ্যাক যেন লজ্জায় মরিয়া গেল। এ অসরলতার, এ ভাণ আচরণের প্রয়োজন কি?

এই কথাটাই সেদিন সারা সন্ধ্যা

ধরিয়া জ্যাকের মনকে বিপন্ন পীড়িত করিয়া তুলিল। ইদা আজ আবার পূর্ব্বের মত প্রফুল্ল হইয়াছে, গৃহের ছোটখাট কাজকর্ম্মগুলায় হাত দিয়াছে! তাহার গতি, ভঙ্গীও আজ বেশ সহজ লঘু হইয়া উঠিয়াছে! জ্যাক যখন বহির পৃষ্ঠা খুলিয়া মাতার কথাই ভাবিতেছিল, পাঠে বিন্দুমাত্রও মনোনিবেশ করিতে পারিতেছিল না, সহসা তখন ইদা আসিয়া তাহার ললাটে চুম্বন করিয়া কহিল, "বেশ জ্যাক—ধন্য তোমার সাহস, আর মন কিন্তু! পড়াশুনায় কি চাড়!"

কিন্তু ইদানীং জ্যাকের সে অনুরাগ শিথিল হইয়া আসিয়াছিল, একাগ্রতায় নিষ্ঠুর বাধা লাগিয়াছিল। এই সহজ প্রফুল্লতার মধ্য দিয়া ইদার সমগ্র অন্তরখানি আজ দিব্য ধরা পড়িয়াছিল—জ্যাকের চক্ষু ছিল, সে তাহা লক্ষ্যও করিল!

জ্যাক ভাবিল, এ চুম্বন কাহাকে? কেন? ইহার অর্থ কি? যাহার স্মৃতি ক্ষীণ হইয়া মিলাইয়া যাইতেছিল, সেই সমস্ত অতীত আজ আবার নিমেষে প্রবল ভাবে সাড়া দিয়া উঠিয়াছে! পূর্ব্বপ্রেম আবার পরিপূর্ণ আবেগে জ্বলিয়া উঠিয়াছে—নারীর দুর্ব্বল হৃদয় আবার সে কুহকে ধরা দিয়াছে! গুণ গুণ করিয়া ইদা আর্জেন্তঁর রচিত একটা গানের ছত্র সুর করিয়া গাহিতেছিল,—

> "নাচ রে নাচ, বনের লতা,
> নাচ রে নাচ গাছের পাতা—"

জ্যাক স্তম্ভিত হইল! এ কি নির্লজ্জতা! সে এখানে বসিয়া রহিয়াছে, ইদার তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই? সঙ্কোচও নাই? আশ্চর্য্য! জ্যাকের চক্ষে জল আসিল! যে ভগ্নতরী সে অসীম বলে, অপূর্ব্ব কৌশলে তীরের দিকে টানিয়া আনিতেছিল, সহসা তাহা একটা দমকা বাতাসের ঘায় এমনই ভাবে, কূলের নিকট আসিয়াও ডুবিতে চলিয়াছে—আর রক্ষা নাই, উদ্ধার নাই! বিলাসের তুচ্ছ একটা উপকরণের মত, আজন্ম ইদা বিলাসীর মুহূর্ত্তের খেয়াল-নিবৃত্তির জন্যই জীবনভার বহিয়া বেড়াইবে? যতক্ষণ খেয়াল, ততক্ষণ আদর,—সে খেয়াল নিবৃত্ত হইলেই দূরে যাও—তবুও ইদা সেই বিলাসীর পশ্চাতে ফিরিবে? কোনদিনই কি তাহার জ্ঞান হইবে না? রঙিন ফানুসের মত সাজিয়া বেড়ানোতেই কি নারীজন্মের চরম সার্থকতা? হা রে মূর্খ অন্ধ নারী!

আবার পরক্ষণেই জ্যাকের মনে পড়িল, মূর্খ অবোধ হইলেও এই নারী, তাহার মা! মাকে শ্রদ্ধা করিয়া সম্মান করিয়া সে তাহার অন্তরে শ্রদ্ধা-সম্মান জাগাইবে। মায়ের দুর্ব্বলতার সমালোচনা করিবার অধিকার তাহার নাই! মাকে এ বিপদ হইতে উদ্ধার করিতেই হইবে! ভাগ্য-গগনের এক কোণে কৃষ্ণ মেঘের একটি বিন্দু দেখা দিয়াছে। সে মেঘকে জমিতে দিলে ঝটিকা আসন্ন হইয়া উঠিবে! সহানুভূতি ও স্নেহের স্নিগ্ধ মৃদু পবনে সে মেঘবিন্দুটুকু সরাইয়া দিতে হইবে, শ্রদ্ধার কিরণে সে কালিমা ঘুচাইতে হইবে, নহিলে ঝড় উঠিলে সকলই ধ্বংস হইয়া যাইবে! জ্যাক স্থির করিল, সতর্কভাবে সে মাতার ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করিবে! দুর্ব্বল-হৃদয়া নারীর দল আপনাদিগের অলস কর্ম্মহীন

জীবনগুলাকে প্রায়ই একটা মিথ্যা আদর্শের সৃষ্টি করিয়া তাহারই পূজায় নিক্ষেপ কর। ইদাও অলস, কাজকর্ম্মে তাহার তিলমাত্র রুচি নাই, নির্জ্জনে বসিয়া কি অন্ধ মায়ার রাজ্য সে গড়িতে থাকে, তাহা সে-ই জানে। আর্জ্জেন্তঁর কবি-প্রতিভার প্রতি এক অদ্ভুত শ্রদ্ধা যে ইদার হৃদয়কে এখনও সবলে আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছে, তাহাতে জ্যাকের এতটুকু সন্দেহ ছিল না। তাই প্রতি মুহূর্ত্তেই তাহার আশঙ্কা হইত, কখন তাহার প্রতি মমতার ক্ষীণ আভাষটুকু বা চকিতে মিলাইয়া যায়। মনের এ আশঙ্কা খুলিয়াও কাহারও নিকট বলা যায় না—ইদা তাহার মা! মার দুর্ব্বলতার কথা সে কাহাকে বলিবে? ইহাই ছিল, জ্যাকের আরও দুঃখ! কাহারও কাছে এ দুঃখের কথা বলিতে পারিলে বুঝি, তাহার বক্ষের ভার অনেকটা লাঘব হইবার সম্ভাবনা ছিল! কিন্তু এ কথা বলা চলে না—তাই জ্যাক এ বিপুল দুঃখের ভার আপনার বুকে পুরিয়া মনে মনে গুমরিতে থাকিত!

আর্জে্ন্তঁর পত্র পাইয়া ইদাকে সহসা আজ কাজ-কর্ম্মে অতিরিক্ত অনুরাগ প্রদর্শন করিতে দেখিয়া জ্যাক ঈষৎ আশান্বিত হইল—সে ভাবিল, ইদা আপনার দুর্ব্বল হৃদয়ের এ বিপুল উত্তেজনা, এ চাঞ্চল্যের উচ্ছ্বাসটুকু বুঝিয়াছে, বুঝিয়া রোধ করিতেছে! এটুকু যে দুর্ব্বলতা, তাহা সে বুঝিয়াছে এবং বুঝিয়াছে বলিয়াই তাহা রোধ করিবার জন্য ইদার এত আয়াস! কত গল্পে জ্যাক বহু হতভাগ্য স্বামীর করুণ কাহিনী পড়িয়াছে,—যাহারা চপলা পত্নীর হৃদয় সংশোধনে অহরহ সতর্ক চেষ্টা করিয়াও কিরূপ ব্যর্থকাম হইয়াছে! নিপুণ উপন্যাসকারগণের ইঙ্গিতে জ্যাক তাহা দিব্য বুঝিত! এই যে ইদা আর্জে্ন্তঁর প্রসঙ্গ ভুলিয়াও তাহার সমক্ষে উত্থাপন করে না, এই যে কাজ-কর্ম্মে নিবিষ্ট থাকিবার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেছে—কেন? জ্যাক ভাবিত, ইহার অর্থ, শুধু তাহাকে ভুলাইবার প্রয়াস! পাছে পুত্রের মনে এতটুকু সন্দেহ হয়! আর্জে্ন্তঁকে ইদা যে এখনও ভুলিতে পারে নাই, জ্যাক তাহা বুঝিল। সে স্থির করিল, এ বিষয় লইয়া মনের মধ্যে আর সে দ্বন্দ্ব বিরোধ জাগাইবে না, অদৃষ্টে যাহা আছে ঘটুক—ভবিতব্য রোধ করিবার চেষ্টায় আর সে ভাবিয়া মরিবে না।

একদিন কর্ম্মস্থল হইতে ফিরিবার সময় সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে জ্যাক দেখিল, ডাক্তার হারজ্ ও লাবাস্যঁাদ্র তাহাদিগের গলির মোড় বাঁকিয়া সহসা অদৃশ্য হইয়া গেল! এদিকে তাহারা কোথায় আসিয়াছিল? কি কাজে?

গৃহে ফিরিয়াই জ্যাক মাকে জিজ্ঞাসা করিল, কেহ আসিয়াছিল কি না! উত্তরে সে যাহা শুনিল, তাহাতে সে স্পষ্ট বুঝিল, তাহার বিরুদ্ধে একটা যেন গভীর ষড়যন্ত্র চলিতেছে—পাছে তাহার নিকট কিছু প্রকাশ হইয়া পড়ে, এ জন্য গৃহে একটা সতর্ক আয়োজন আপনা হইতে যেন গড়িয়া উঠিয়াছে! চারিধারে গোপনতা! সে আজ ইহাও নূতন করিয়া লক্ষ্য করিল।

রবিবার এতিয়োঁ হইতে গৃহে ফিরিয়া জ্যাক দেখিল, ইদা নিবিষ্ট চিত্তে কি একটা পাঠ করিতেছে! সে যে আসিয়া ইদার পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছে, ইদা তাহা জানিতেও পারে নাই। অসার উপন্যাস-পাঠে মাতার অসাধারণ

অনুরাগের কথা জ্যাকের অবিদিত ছিল না—তাই সেদিকে জ্যাকের কৌতূহল মোটেই উদ্রিক্ত হইল না। কিন্তু সহসা যখন ইদা জ্যাককে দেখিয়া বহিখানা লুকাইবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "ওঃ, জ্যাক, তুমি! আমি এমন ভয় পেয়েছিলাম!"

জ্যাক কহিল, "ওটা কি পড়ছিলে, তুমি?"

"ও কিছু না, কিছু না—একখানা বাজে বই! ভাল কথা—ওদের সব খবর কি, বল। ডাক্তার রিভাল কেমন আছেন? আর সিসিল? তুমি সিসিলকে আমার ভালবাসা জানিয়েছিলে ত?"

কথাটা বলিবার সময় ইদার মুখে সঙ্কোচের যে একটা কালিমা ফুটিয়া উঠিতেছিল, তাহা জ্যাকের দৃষ্টি এড়াইতে পারিল না। সে বুঝিল, জ্যাকের চক্ষে এখন ধূলি দিবার চেষ্টা করায় লাভ নাই। জ্যাকের মনে একটা সন্দেহের সৃষ্টি হইয়াছে, নিশ্চয়! তাহা অপেক্ষা ব্যাপারটা প্রকাশ করিয়া বলাই সঙ্গত বুঝিয়া ইদা কহিল, "ও, এ বইখানা কি, তুমি জিজ্ঞাসা করছ! দেখ না—"

ইদা বইখানি জ্যাকের সম্মুখে টেবিলের উপর ফেলিয়া দিল। চকচকে মলাট দেখিয়া জ্যাক নিমেষেই বহিখানা চিনিল! এ সেই মাসিকপত্র, যাহার প্রথম খণ্ডের সহিত সিডনাস জাহাজে তাহার পরিচয় লাভ ঘটিয়াছিল। এখন মাসিকখানির কলেবর অনেকটা ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে—পত্র-সংখ্যায় প্রথম খণ্ডের অর্দ্ধেক! ভিতরের কাগজও অত্যন্ত পাৎলা ও মলিন। যে সকল মাসিক পত্রের গ্রাহক জুটে না, অথচ প্রচারিত হইতে যাহাদিগের বিন্দুমাত্র লজ্জা বা সঙ্কোচ হয় না, এখানি অবিকল তাহাদিগেরই দোসর! প্রবন্ধগুলিও উদ্ভট বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ—হাস্যরসের উদ্রেক করে! গুরু-গম্ভীর নামের আবরণে দাম্ভিক লেখকগণের অক্ষম লেখনী-নিঃসৃত উচ্ছ্বাস-গদ্‌গদ, যুক্তিহীন, অসার সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভে, এবং ছন্দ ও ভাবহীন কবিতায় পত্রিকার শীর্ণ কলেবর ভরানো হইয়াছে! হাস্যরসের এই অপূর্ব্ব ভাণ্ডে হস্তার্পণ করিবার জন্য জ্যাক এতটুকু ব্যগ্র হয় নাই, কিন্তু সহসা তাহার দৃষ্টি সূচী-সন্নিবিষ্ট একটা বিষয়ে আকৃষ্ট হইল। বিষয় একটি কবিতা, নাম, "প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ"—তাহার লেখক, কবি সম্পাদক আর্জেন্ত স্বয়ং। কবিতাটি এই,—

"কি! বলিল না হায়, একটি বাণীও
বিদায়-ক্ষণে—
পিছনে বারেক চাহিলও না সে
নয়ন-কোণে!

হারায়ে হৃদয়"—ইত্যাদি।

এমনই ভাবে দুই শত ছত্র ব্যাপিয়া প্রাণহীন ছন্দের মালা দীর্ঘ অজগরের মত পড়িয়া আছে! পাছে সালটি কবিতার মর্ম্মগ্রহণ করিতে না পারে, এ জন্য প্রতি চারিছত্রের শেষে সার্লটির নাম উল্লিখিত হইয়াছে! জ্যাক রোষে জ্বলিয়া কাগজখানা সজোরে দূরে নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "কি স্পর্দ্ধা! তোমাকে এ কাগজ পাঠাতে সঙ্কোচ হল না, তার!" ইদার বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। একটা ঢোক গিলিয়া সে কহিল, "না, সে পাঠায় নি ত! নীচেকার ঘরে আজ

দু তিন দিন ধরে কাগজখানা পড়েছিল। কে ফেলে গেছে. জানি না।"

মুহূর্ত্তের জন্য কক্ষ নিস্তব্ধ হইল। কাগজ খানা কুড়াইয়া লইবার জন্য ইদা কাতর ব্যগ্র হইয়া উঠিল, কিন্তু লইতে তাহার সাহসে কুলাইতে ছিল না। অবশেষে সে অন্যমনস্ক-ভাবে কাগজখানার নিকট ঈষৎ অগ্রসর হইল। জ্যাক তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিল, "কাগজখানা তুমি পড়ছ! ফেলে দাও, রেখো না। ঐ পদ্যটা অত্যন্ত কদর্য্য, বীভৎস।"

ইদা কহিল, "কৈ, আমার ত তা মনে হয় না।"

"বল কি! এর কোথাও না আছে ভাব, না আছে অর্থ! একে কবিতা বল? এ পুড়িয়ে ফেলা উচিত।"

"জ্যাক—"ইদার স্বর কাঁপিয়া উঠিল। ইদা কহিল, "অন্যায় তর্ক করো না, জ্যাক। আর্জেন্তঁ কেমন লোক, তার দোষ গুণ কি, তা আমি যেমন জানি, এমন আর কেউ না। আমায় সে অনেক কষ্ট, অনেক যন্ত্রণা দিয়েছে। মানুষটার সম্বন্ধে আমি কিছু বলছি না, তবে মানুষ এক, আর তার কবি-প্রতিভা সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। আর্জেন্তঁ মানুষ হিসাবে যেমনই হোক না, তার কবিত্ব যে অসাধারণ, তাতে সন্দেহ নাই! তার কবিতায় এমন একটা আবেগ আছে, তেজ আছে, যা ফ্রান্সে আর কারও কবিতায় নাই! যথার্থই একটা আবেগ-কম্পন! এই আবেগ-কম্পন, মুসের লেখায় ছিল, কিন্তু মুসের কবিতায় এমন মাধুর্য্য ছিল না। আর্জেন্তঁর "প্রেম-বিজ্ঞানে"র মত কবিতার বই ফরাসী ভাষায় আর নাই, যদিও ছাপা হয়নি! কেন, এই "প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ" কবিতাটাও ত চমৎকার! আহা, নারী চলে গেল! তার প্রিয়তমের সমস্ত প্রেম উপেক্ষা করে, তার পানে না চেয়ে নিষ্ঠুর ভাবে চলে গেল! সুন্দর ভাবটি!"

জ্যাক তীব্র স্বরে কহিল, "কিন্তু এই নারী যে তুমি! তাও জান না! তুমি যে ভাব চলে এসেছ, তা ভুলে গেলে?"

ইদা কহিল, "জ্যাক, এ কথা বলে আমার অপমান করো না। কবিতা কারো নিজের কথা নয়—এ আর্টের ব্যাপার! এ বিষয়ে তোমার চেয়ে আমি চর্চ্চাও করেছি, বিস্তর! আর্জেন্তঁ আমার উপর যতই অত্যাচার করুক, সে যে একজন খুব বড়দরের কবি, সে সম্বন্ধে আমার মনে কোনদিন এতটুকু সন্দেহ উঠবে না—আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের মধ্যে আর্জেন্তঁও একজন! আজ দেশের লোক তাকে বুঝছে না—কিন্তু একদিন এমন সময় আসবে, যখন তার পরিচিত বন্ধুর দল গর্ব্ব করে বলতে পারবে যে আমি কবি আর্জেন্তঁকে জানতাম, তার সঙ্গে এক টেবিলে বসে খেয়েছি।"

কথাটা বলিয়া ইদা বাহিরে চলিয়া গেল। মাদাম লেবিদারের কাছে যাইয়া দুইটা গল্প করিয়া প্রাণের ভার লঘু করিবে, ইহাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। জ্যাক কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া জানালার ধারে দাঁড়াইয়া রহিল; পরে একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া টেবিলের ধারে আসিয়া বহি খুলিয়া বসিল। পাঠে মন লাগিতেছিল না—নানা চিন্তা, নানা কথা তাহার মাথার ভিতর রণোন্মত্ত সৈন্যদলের মতই চলা-ফেরা করিতেছিল। সহসা একটা পদশব্দ তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। জ্যাক অধীর আগ্রহে দ্বারের

পানে চাহিয়া রহিল। সম্মুখে একটা ছায়া পড়িল। জ্যাক উঠিয়া দ্বারের নিকট আসিল। এ কি—স্বপ্ন? না—এ যে শত্রু স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত! আর্জেন্ত! জ্যাকের আপাদমস্তক একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় শিহরিয়া উঠিল। সে কম্পিত স্বরে কহিল, "কে?"

"আশ্চর্য্য হয়ো না জ্যাক—চম্‌কে যেয়ো না—আমি আর্জেন্ত, কবি আর্জেন্ত।"

নির্ম্মম আঘাত! ক্রূর পরিহাস! অদৃষ্টের এ কি বক্র ইঙ্গিত! জ্যাক ভাবিয়াছিল, ইদা বুঝি ফিরিয়া আসিল! কিন্তু তাহা না হইয়া এ কি—কে আসিল?

শীকারকে আয়ত্তের মধ্যে অতর্কিত ভাবে দেখিলে প্রথম মুহূর্ত্তেই বাঘ যেমন একটা উত্তেজনায় সহসা চঞ্চল হইয়া উঠে, জ্যাক ঠিক তেমনই চঞ্চল হইয়া উঠিল। আজ তাহার চিরশত্রু তাহারই দ্বারে আসিয়া উপস্থিত। আজ জ্যাক উচ্চে, আর্জেন্ত নিম্নে! আর্জেন্ত জ্যাকের আয়ত্তের মধ্যে! দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া জ্যাক স্পষ্ট দৃঢ় স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "এখানে কেন, তুমি? কি চাও?"

কবি আর্জেন্তর মুখখানা রক্তিম হইয়া উঠিল—মুখের কথা বাহির হইতে গিয়া কেমন বাধিয়া গেল। কষ্টে বল সংগ্রহ করিয়া সে বলিল, "আমি ভেবেছিলাম, তোমার মা এখানে আছেন।"

"হাঁ আছেন, এখানেই আছেন। আমি এখন তাঁর অভিভাবক—তোমার সঙ্গে তাঁর দেখা সাক্ষাৎ আমি ঘটতে দেব না।"

বলিবার ভঙ্গীতে কথাটায় এমন ঘৃণা ও অবজ্ঞা ঝঙ্কারিত হইয়া উঠিল যে আর্জেন্ত তাহা লক্ষ্য করিয়া সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। সে কহিল, "জ্যাক, আমাদের দুজনের মধ্যে একটা মস্ত ভুল চলেছে! বরাবর চলে আসছে। এখন তুমি মানুষ হয়েছ, জীবনের গভীর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছ, সুতরাং এখন আর এ ভুলটুকু চলতে দেওয়া ঠিক নয়। এস, আমি তোমার হাতে হাত রেখে বলছি, আজ থেকে আর আমাদের মধ্যে কোন ব্যবধান থাকবে না, আমরা দুজনে বন্ধু হব, সরল, আন্তরিক, অকপট বন্ধু—"

আর্জেন্তকে কথা শেষ করিতে না দিয়া জ্যাক কঠিন পরুষ স্বরে কহিল, "এ প্রহসন অভিনয়ের কোন প্রয়োজন বুঝছি না, আমি। তুমি আমায় ঘৃণা কর? আমিও তোমায় ততোধিক ঘৃণা করি।"

"—কিন্তু কতদিন ধরে আমাদের মধ্যে এ ভাব চলে আসছে, জ্যাক?"

"কতদিন? বোধ হয় প্রথম যে দিন তোমায় দেখি, সে দিন থেকেই। যাই হোক, সে সব কথার আলোচনা করায় কোন লাভ নাই। আমার এ ঘৃণা কখনই দূর হবে না! তুমি আমার শত্রু, চিরদিন শত্রুই থাকবে। তোমায় আমায় বন্ধুত্ব অসম্ভব! আমার সারা জীবনের অভিশাপ, সুখের কণ্টক তুমি—আজ এসেছ বন্ধুত্ব স্থাপন করতে! আমার লজ্জা, আমার ঘৃণা, আমার সকল দুর্দ্দশা সকল দুর্ভাগ্যের মূল, তুমি—"

"কিন্তু শোন, জ্যাক—এতদিন যথার্থই আমরা পরস্পরের প্রতি মিথ্যা আচরণ করে এসেছি। এখন একটা সুযোগ দাও, বন্ধুত্বের। জানই ত, কবি বলে গেছেন, এ জীবন নহেক স্বপন। আমরা একটা ভাব নিয়ে ত বাস করতে পারি না—"

জ্যাক আবার বাধা দিয়া কহিল, "ঠিক বলেছ তুমি, এ জীবন নহেক স্বপন। সত্যই তাই। জীবন একটা ভীষণ কঠোর সত্য। আমার সময়ের দাম আছে। তোমার সঙ্গে বাজে তর্ক গল্প করে তা নষ্ট করতে পারব না। সংক্ষেপে আমার বক্তব্য শেষ করি, শোন। দশবৎসর ধরে আমার মা তোমার বাঁদীগিরি করে এসেছে—বাঁদী কি—বাঁদীরও নিজের একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, আমার মার তাও ছিল না—তিনি ছিলেন, যেন তোমার তৈজস পত্রের মত। এ দশ বৎসর আমি যে কষ্ট সহ্য করেছি, তা আমিই জানি, থাক সে কথা! তোমার কাছে এখন কাঁদুনি গাইতে চাই না। এখন আমার মাকে আবার আমি ফিরে পেয়েছি—তাঁর উপর এখন আমার সম্পূর্ণ অধিকার। যেমন করে পারি, এ অধিকার বজায় রাখব। আমি তাঁকে আর তোমার কাছে যেতে দেব না—কিছুতেই দেব না। কেনই বা দেব? তোমারই বা আর তাঁকে কিসের প্রয়োজন? তাঁর মাথার চুল আজ শাদা হয়ে গেছে—চোখের জল মুখে কালির ছাপ টেনে দিয়েছে, যৌবনের সে লাবণ্য সব লোপ পেয়েছে—এখন তাঁকে তোমার মনে ধরবে না আর। আজ তাঁর কেউ নাই—শুধু আমি আছি—তিনি আমার মা—শুধু মা, আর কিছু না—আমার সেই মাকে আমি কাছে কাছে রাখব—ছাড়ব না, কিছুতেই ছাড়ব না।"

আর্জেন্ত জ্যাকের ভাব সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলেও বলিল, "বেশ, তা তিনি তোমার কাছেই থাকুন। আমি শুধু একজন পুরানো বন্ধুর মত দেখা করতে এসেছি—যদি আমার দ্বারা কোন উপকার হয়—"

"কিছু না—কিছু না—কোন প্রয়োজন নাই। আমার একলার পরিশ্রমই চূড়ান্ত। সব অভাব মিটে যায়—কিছু বাকী থাকে না।"

"তোমার কিছু অহঙ্কার হয়েছে দেখছি, জ্যাক। আগে ত কৈ তুমি এত কড়া কথা বলতে পারতে না।"

"ঠিক বলেছ, কবি আর্জেন্ত। যদি বুঝে থাক, তবে এটুকু আরও জেনে রাখ যে আমার বাড়ীতে তোমাকে অনেকক্ষণ বরদাস্ত করেছি, আর করব না। এখন শোন তুমি, সহজভাবে যদি বিদায় না নাও, তাহলে মানে মানে তা পাবে বলে আমার মনে হয় না। কারণ তোমার এখানে উপস্থিত হওয়াটা আমার সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছে, বুঝলে?"

জ্যাকের কণ্ঠস্বরে এমন একটা অমানুষিক তীব্রতা, দৃষ্টিতে এমন তেজ বিকীর্ণ হইতেছিল যে তাহার কথার উত্তর দিতেও আর্জেন্তর সাহস হইল না। সে দ্বিতীয় বাক্য ব্যয় না করিয়া ধীর পদে নীচে নামিয়া গেল। যতক্ষণ তাহার জুতার শব্দ শুনা গেল, জ্যাক উৎকর্ণ ভাবে তথায় দাঁড়াইয়া তাহা শুনিল। শব্দ মিলাইয়া গেলে জ্যাক আপনার কক্ষে আসিয়া বসিল। আসিয়া সে দেখে, ইদা তাহার চেয়ারে বসিয়া,—কেশরাশি বিস্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, চক্ষু অস্বাভাবিক রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। ইদা কাঁদিতেছিল।

জ্যাককে দেখিয়া চক্ষু মুছিয়া ইদা কহিল, "আমি এখানে বসে সব কথা শুনেছি, জ্যাক, সব কথা,—যে আমি বুড়ো হয়ে গেছি, যে আমি—" জ্যাক মাতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহার

হাত আপনার হাতে তুলিয়া লইল। পরে মাতার পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া সে বলিল, "এখনও সে বেশী দূর যায়নি—ডাকব তাকে?"

হাত ছিনাইয়া লইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া জ্যাকের স্কন্ধে মাথা রাখিয়া ইদা কহিল, "না, না, জ্যাক—তুমি ঠিক বলেছ। আমি তোমার মা; শুধু মা, আর কারও কেউ নই আমি, হতেও চাইনে।"

এই ঘটনার কয়েক দিন পরে এক রাত্রে ডাক্তার রিভালকে জ্যাক এক দীর্ঘ পত্র লিখিতে বসিল। সে লিখিল,

"আমার বন্ধু, আমার পিতা, আমার গুরু, আমার সব কর্ত্তব্য শেষ হইয়া গিয়াছে। মা চলিয়া গিয়াছে, তাহারই কাছে গিয়াছে। সে যেন একটা ভীষণ চক্রান্ত। কিন্তু না, সে জন্য তার কোন দোষ দিই না—কুৎসার আশ্রয় লইতে সেইজন্যই আমি এত নারাজ। কাহারই বা দোষ দিব? ছেলেবেলায় এক কাফ্রীর ছেলে স্কুলে আমার সঙ্গী ছিল। সে বলিত, "গরিব হতভাগার দল যদি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতেও না পেত ত দম বন্ধ হয়েই তারা মরে যেত।" কথাটার অর্থ আজ যেমন বুঝিতেছি, পূর্ব্বে কোনদিন এমনটি বুঝি নাই। আজ যদি আপনার কাছে এ তপ্ত শ্বাস ফেলিতে না পাইতাম, সব কথা খুলিয়া বলিতে না পারিতাম তাহা হইলে বুকের এ অসহ্য ভারে আমি মরিয়া যাইতাম! দুর্ব্বহ এ ভার! রবিবার পর্য্যন্ত আমি অপেক্ষা করিতে পারিব না—সে এখনও বহু বিলম্ব আছে। কিন্তু সিসিলের সহিত কোন্ মুখেই বা এখন আমি দেখা করি? আপনাকে বলিয়াছিলাম ত, আর্জেন্তঁর সহিত আমার দেখা হইয়াছিল—তাহার সহিত স্পষ্ট সব বুঝাপড়া করিয়াছিলাম। সেদিন হইতে মার মুখে আর হাসি দেখি নাই, বুঝিয়াছিলাম, তাহার মনে এতটুকু সুখ নাই, স্বাচ্ছন্দ্য নাই। মন অহর্নিশি সেখানেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—দুর্ব্বল নারী কি করিয়া মন বাঁধিবে—তথাপি মনকে বাঁধিবার জন্য যে সে রীতিমত একটা চেষ্টা করিতেছিল, তাহাও আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম। এইজন্যই আমি বাসাটা পরিবর্ত্তন করিবার চেষ্টায় ছিলাম, যদি স্থান পরিবর্ত্তনে মন কিছু শান্ত হয়। মার উপর দৃষ্টিও বেশ সতর্ক রাখিয়াছিলাম, বাসাও ঠিক হইয়াছিল। এ বাসা মার পছন্দ ছিল না। চারিধারে ছোটলোক ও কারিকরের বাস—নূতন বাসার কথা মাকে জানাই নাই। গোপনে সব ঠিক করিয়াছিলাম। বাসা নূতনভাবে সৌখীন রকমেই সাজাইতেছিলাম। সব ঠিক হইয়াছিল, ভাবিয়াছিলাম, একেবারে মাকে সেখানে বেড়াইবার ছলে লইয়া গিয়া সমস্ত ব্যাপার খুলিয়া বলিব। আকস্মিকতার জন্য মার মনটা হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে—তাহারও একটা ফল মন্দ হইবে না। রুডিকদের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম—আমি নূতন বাসাতে থাকিয়া বেলিসারকে পাঠাইয়াছিলাম, মাকে লইয়া আসিতে। সন্ধ্যার পরও মা আসিল না, বেলিসার ফিরিল না। আমি অস্থির হইয়া উঠিলাম। শেষে অধীরভাবে নিজেই সন্ধান লইতে যাইব স্থির করিয়াছি, এমন সময় বেলিসার ফিরিয়া আসিল—একাকী, সঙ্গে মা নাই। বেলিসার আসিয়া আমার হাতে মার পত্র দিল।

ছোট চিঠিখানি—শুধু লেখা আছে, আর্জেন্তঁর অত্যন্ত অসুখ, এ সময় তাহাকে না দেখিলে ধর্ম্ম থাকিবে না, এইজন্যই মাকে হঠাৎ প্যারিতে যাইতে হইতেছে। আর্জেন্তঁ সারিলেই মা ফিরিয়া আসিবে। অসুখের কথাটা আমার খেয়ালেই আসে নাই, নহিলে আমিও নিজে অসুখের ভাণ করিয়া বিছানায় পড়িয়া থাকিতাম। তখন দুইজনকে লইয়া মার মনের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব চলিত। সে পাপিষ্ঠ খুব ফন্দী বাহির করিয়াছে। যথার্থই কি তাহার অসুখ? কখনই নহে—এ শুধু সে একটা ফাঁদ পাতিয়াছে। যদি অসুখ সত্যই হয়ত পূর্ব্বকার মত, আপনি যেমন এতিয়েঁতে দেখিতেন, তেমনই! তবু মা এ কথা বিশ্বাস করিল। আমার অসুখ হইলে কি মা এতটা করিত? আমার সন্দেহ হয়। আর্জেন্তঁর সহিত আমার যুদ্ধ চলিয়াছিল—আজ সে জয়ী হইয়াছে, আমার সব কৌশল সে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে!

"আর সেই নারী—আমার মা! কি নিষ্ঠুর তার হৃদয়, কি পাষাণে সে আপনার প্রাণখানা গড়িয়াছে! আমার কথা একবারও ভাবিল না! আমার এ নীরব নির্জ্জন সাধনার মর্ম্ম তাহার মনে একবার স্থান পাইল না? আশ্চর্য্য! অথচ এই নারী, আমার মা—এই নারীর গর্ভে আমি জন্ম লইয়াছি! আমি এখানে একদণ্ড আর থাকিতে পারিতেছি না। চারিধারের বাতাস অবধি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে, সুস্থির হইয়া নিশ্বাস লওয়া যায় না। আমি আপনার কাছে যাইতে চাই—আমায় সান্ত্বনা দিন, আশ্বাস দিন, নহিলে আমি পাগল হইয়া যাইব! আমার এত সাধ, এত কল্পনা সব ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া গেল—ধূলায় লুটাইল।

"এখন আমার শুধু একটি অনুরোধ আছে, এ চিঠি আপনি পড়িয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবেন—সিসিলকে দেখাইবেন না। সে দেখিলে আমার লজ্জার অবধি থাকিবে না। সে এ কথা শুনিলে আমার ভালবাসাতেও সন্দেহ করিতে পারে। হয়ত সে আর আমায় ভাল না বাসিতেও পারে! যদি এমন দুর্দ্দিন আসে, আমার ভয় হয়, তাহা হইলে আমার দশা কি হইবে? সিসিল ছাড়া এখন আর আমার কেহ নাই। তার প্রেমে, তার স্নেহে আমার সকল দুঃখ দূর হইবে। আজ এ শূন্য ঘরে বসিয়া শুধু ভাবিতেছি, "সিসিল! আমার সিসিল!" এই সিসিল যদি আমায় ত্যাগ করে! সে কথা ভাবিতেও পারি না! জগতে আসিয়া কেবলই প্রতারিত হইতেছি—সকলের উপর বিশ্বাস হারাইয়াছি, একমাত্র শুধু সিসিলের উপর বিশ্বাস আছে—সেই সিসিল আমাকে ত্যাগ করিবে? না। তাহা কখনও হইতে পারে না। সে নিজে আমাকে আশ্বাস দিয়াছে—সে আশ্বাস কখনও সে ভাঙ্গিবে না! সিসিল দেবী—জগতের জীব নহে—সিসিল আমাকে কখনও ত্যাগ করিবে না, ইহা আমি ধ্রুব জানি। আমার এ বিশ্বাস চিরদিন অটুট থাকিবে, সন্দেহ নাই!" (ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

শারীর স্বাস্থ্য-বিধান

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

১১

বাঙ্গালীর পরিচ্ছদ সম্বন্ধে দুই একটী কথা।

ভারতবর্ষের জলবায়ু এবং ভারতবাসী-দিগের সামাজিক আচার ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য করিলে এদেশীয় রমণীদিগের মধ্যে যে সাড়ী পরিবার প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা যে সর্ব্বতোভাবে উপযোগী, সে বিষয়ে কাহারো অণুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। তবে আমাদিগের বাঙ্গালী স্ত্রীলোকেরা যেভাবে সাড়ী পরিধান করিয়া থাকেন, তাহা প্রশংসনীয় নহে। ইহা কি লজ্জা রক্ষা, কি স্বাস্থ্যরক্ষা, কোনটীরই পক্ষে অনুকূল নহে। এ সম্বন্ধে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশবাসিনী রমণীদিগের নিকট হইতে আমাদিগের শিক্ষা লাভ করিবার যথেষ্ট অবসর আছে।

সাধারণতঃ বাঙ্গালী স্ত্রীলোকেরা * যে-ভাবে সাড়ী পড়িয়া থাকেন, তাহাতে নিতান্ত সাবধানে না থাকিলে উহা দ্বারা তাঁহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি সম্পূর্ণভাবে আবৃত থাকা কঠিন হইয়া উঠে। কায কর্ম্ম করিবার সময়ে পরিধেয় বসন শরীরের অনেক অংশ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে। তবে সর্ব্বদা অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ থাকেন বলিয়া ইহার অনৌচিত্য তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। কিন্তু তীর্থদর্শন, গঙ্গাস্নান, রেলপথে ভ্রমণ বা অপর কার্য্যোপলক্ষে যদি তাঁহাদিগের রাস্তা-ঘাটে চলিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে দুষ্ট লোকের কুটিল দৃষ্টি হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য পরিধেয় বসন লইয়া তাঁহারা কিরূপ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন, তাহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। বিশেষতঃ ছোট ছেলে কোলে থাকিলে তাঁহারা অনেক সময়ে বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়েন। যখন আমরা আমাদিগের জননী, ভগিনী, স্ত্রী ও কন্যাদিগকে দেবস্থান, রেলপথ, পশুশালা, যাদুঘর প্রভৃতি প্রকাশ্য স্থানে সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিতে কুণ্ঠিত হই না, তখন যাহাতে তাঁহাদের লজ্জাশীলতা যথাবিধি রক্ষিত হয়, তাহার উপায় অবলম্বন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে তাঁহারা কেমন সুন্দরভাবে আঁটিয়া সাঁটিয়া সাড়ী পরিয়া লজ্জা রক্ষা করিয়া থাকেন। কোল, সাঁওতাল প্রভৃতি অনার্য্য জাতির কথা ছাড়িয়া দিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে বাঙ্গালী ভিন্ন অপর সকল ভারতবাসী যতই হীনাবস্থাপন্ন হউক না, নিজ পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগের লজ্জা রক্ষার জন্য এক একটী জামার বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। সামান্য কুলী রমণীরা (এমন কি যাহারা ছাদ পিটিতে আসে, তাহারা পর্য্যন্ত) শতগ্রন্থিযুক্ত বস্ত্র ও মলিন একটী "আংরাখা" দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া রমণীজাতির সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া থাকে। বোম্বাই, মান্দ্রাজ, পঞ্জাব ও

* বাঙ্গালী ব্রাহ্ম মহিলাদিগের সম্বন্ধে এ মন্তব্য প্রযুজ্য নহে। এস্থলে ইহাও বলা কর্ত্তব্য যে পূর্ব্ব-বাঙ্গালার স্ত্রীলোকদিগের সাড়ী পরিবার প্রথা পশ্চিম বাঙ্গালা অপেক্ষা ভাল।

উত্তরপশ্চিম দেশবাসিনী রমণীরা সাড়ী পরিয়া থাকেন, আর আমাদের বাঙ্গালীর মেয়েরাও সাড়ী পরেন, কিন্তু সাড়ী পড়িবার প্রভেদে একজন কাপড় পরিয়াও অর্দ্ধনগ্নাবস্থায় রহেন, আর অপর রমণী কার্য্যোপলক্ষে রাজপথে বাহির হইয়াও লোকের অসংযত দৃষ্টি হইতে আপনাকে সুচারুরূপে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। আমাদিগের হিন্দু-সমাজের রমণীগণের পরিচ্ছদ-পরিধান-প্রথার সংস্কারের আবশ্যকতা হইয়াছে।

এস্থলে বলা উচিত যে অধিকাংশ বাঙ্গালীই সামান্য অবস্থার লোক। যদি আমাদিগের মহিলাকুলের মধ্যে বিলাতী রমণীদিগের ন্যায় পরিচ্ছদের আড়ম্বর প্রবেশ করে, তাহা হইলে আমাদের সংসারে বিষম অনর্থ ও বিপত্তি ঘটিবার সম্ভাবনা। বুদ্ধিমতী নারীমাত্রেই এ বিষয়ে সবিশেষ সাবধান হইবেন। তাহা না হইলে দর্জ্জির দোকানের দেনা মিটাইতেই গৃহস্বামীর প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হইয়া উঠিবে এবং ভবিষ্যতের জন্য কিছু সঞ্চয় করা দূরে থাকুক, বালকবালিকাদিগের শিক্ষা ও তাহাদিগের জন্য পুষ্টিকর আহারের ব্যবস্থা করা সুকঠিন হইয়া উঠিবে। পরিচ্ছদ সম্বন্ধে আড়ম্বর কাহারও পক্ষে ভাল নহে; সামান্য অবস্থার লোকের পক্ষে উহা বিষম অনর্থমূলক। মোটা চালচলনের উপর লক্ষ্য রাখিয়া আমাদের অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাদিগের পক্ষে কিরূপ পরিচ্ছদ সময়োপযোগী ও কার্য্যের পক্ষে সুবিধাজনক হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে এস্থলে দুই চারিটী কথার অবতারণা করিলাম। এ সম্বন্ধে নূতন কিছু বলিবার নাই। যে প্রথা আমাদের অবরোধবাসিনী মহিলাদিগের মধ্যে শনৈঃ শনৈঃ প্রসারলাভ করিতেছে, তাহারই উপযোগিতা সম্বন্ধে এ স্থলে সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

আজকাল কলিকাতা সহরে এবং মফস্বলের অনেক ভদ্র পরিবারের তরুণীদিগের মধ্যে সেমিজের উপর সাড়ী পরিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু এই প্রথা বয়স্থা রমণীদিগের কৃপাদৃষ্টি সম্পূর্ণরূপে লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। বলা বাহুল্য যে বাঙ্গালী স্ত্রীলোকদিগের সাড়ী পরিবার যেরূপ পদ্ধতি, তাহাতে কি বালিকা, কি যুবতী, কি প্রৌঢ়া, সকলেরই পক্ষে সেমিজ্ (Chemise) বা তৎসদৃশ গাত্রাবরণ যে একটী অপরিহার্য্য পরিচ্ছদ, বিবেচক ব্যক্তি মাত্রেই তাহা অস্বীকার করিবেন না। সম্ভ্রান্ত ভদ্র পরিবারের অনেক রমণী তাঁতের মিহি কাপড় ব্যবহার করিয়া থাকেন। আমরা কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক, কাহারো মিহি কাপড় পরিধান করিবার পক্ষপাতী নহি। তবে মিহি তাঁতের কাপড় বাঙ্গালার একটী উৎকৃষ্ট অননুকরণীয় শিল্প—কোন স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তিই ইহার উচ্ছেদসাধন কামনা করিবেন না। কিন্তু এরূপ বস্ত্র পরিধান করিলে বর্ত্তমান রুচি-হিসাবে কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক, সকলকেই যে সমাজে লজ্জা পাইতে হয়, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। স্ত্রীলোকেরা যদি সেমিজের উপর পাতলা কাপড় ব্যবহার করেন, তাহা হইলে উহা তত দোষের হয় না।

অনেকে নিমন্ত্রণাদি রক্ষা করিবার সময়ে সেমিজ্ ব্যবহার করিয়া থাকেন, নিজ গৃহ মধ্যে সেমিজ্ ব্যবহার করা আবশ্যক মনে করেন না। কিন্তু বাটীর ভিতরেও স্বপরিবার-

ভুক্ত এবং পাচক ও ভৃত্যাদি অনেকানেক পুরুষের সম্মুখে তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা বাহির হইতে হয়, সুতরাং সেমিজের উপর কাপড় পরিলে লজ্জারক্ষা সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে কখনই সঙ্কুচিত হইতে হয় না। লংক্লথ্ কাপড়ের ৪টী সেমিজ্ তৈয়ার করিতে ৪৲ টাকার অধিক খরচ হয় না, অথচ যত্নপূর্ব্বক ব্যবহার করিলে সেগুলি এক বৎসরের অধিককাল চলিতে পারে। সেমিজ্ সর্ব্বদা ধোপার বাড়ী পাঠাইবার আবশ্যক হয় না; ২।১ দিন অন্তর গরম জলে সাবান দিয়া কাচিয়া দিলেই উহা পরিষ্কৃত হয় এবং ধোবার আছড়ান হইতে রক্ষা পাইয়া অনেকদিন টিঁকিয়া যায়। বেশী খরচ হইবে বলিয়া যে আমাদের স্ত্রীলোকেরা সেমিজ্ ব্যবহার করেন না, তাহা নহে; প্রাচীন প্রথার বিচারহীন পক্ষপাতিত্বই এরূপ ঔদাসীন্যের কারণ বলিয়া প্রতীত হয়। যাহা চিরকাল চলিয়া আসিতেছে তাহাই ভাল, আবার একটা নূতন জিনিস জড়াইয়া ব্যতিব্যস্ত হইবার কি প্রয়োজন, অনেকে ইহা মনে করিয়াই সেমিজ্ ব্যবহার করিতে পরাঙ্মুখ হয়েন। আজকাল আমাদের সমাজে অনেক সামাজিক প্রথার পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। এখন আমাদের পুরবাসিনী মহিলারা পূর্ব্বের ন্যায় অসূর্য্যম্পশ্যা নাই; এখন তাঁহাদিগকে নানা কারণে সাধারণের সমক্ষে বাহির হইতে হয় এবং তাঁহারা নিজেরাও পাঁচ জনে মিলিত হইয়া সাধারণের হিতোদ্দেশে বিবিধ শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। সুতরাং পূর্ব্বে কেবল গৃহমধ্যে আবদ্ধ থাকিবার জন্য যে পরিচ্ছদ যথেষ্ট বলিয়া আমরা মনে করিতাম, এখন আর তাহা বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী নহে, অতএব উহার সংস্কারের প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে।

যদি কাহারো সেমিজ্ পরিতে একান্ত আপত্তি থাকে, তাহা হইলে দশ হাতের অধিক লম্বা মোটা সাড়ী হিন্দুস্থানী পদ্ধতি অনুসারে পরিধান করিলে লজ্জারক্ষা বা সৌন্দর্য্য বিধান, কোন বিষয়েরই ত্রুটি হয় না। হিন্দুস্থানী ধরণে সাড়ী পরিবার পদ্ধতি অতীব প্রশংসনীয়; তবে উহাদের মত কোমর হইতে অত নীচু করিয়া সাড়ী পরা ভাল নহে। আমাদের কোমরের কাপড়ে যে কসি দেওয়া হয়, তাহা বড় আল্‌গা। হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকদিগের মত গাঁইট বাঁধিয়া কসি দেওয়া উচিত। যদি কসিটী ডান কাঁকালে থাকে এবং খানিকটা সাড়ী চুনট করিয়া সম্মুখে গুঁজিয়া অঞ্চল খানি বাঁদিক দিয়া ঘুরাইয়া শরীরের উর্দ্ধভাগ আবৃত করতঃ বামদিকের কাঁকালে পুনরায় গুঁজিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে সাড়ী দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ সুচারু আবৃত হইতে পারে। বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের সাড়ী পরা বড় আল্গা রকমের; অল্পায়াসেই শরীর হইতে বস্ত্র বিচ্যুত হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। স্ত্রীলোকের পরিধেয় বস্ত্র এরূপ আল্গা ধরণের হওয়া কখনই উচিত নহে। হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোক হাতাহাতি করিলেও তাহার পরিধেয় বসন দেহ হইতে বিস্রস্ত হইয়া পড়ে না। এই ধরণের কাপড় পরা বাঙ্গলা দেশে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত হইলে ভাল হয়।

সেমিজের সঙ্গে সঙ্গে একটী মোটা কাপড়ের জ্যাকেট্ ব্যবহার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। গৃহের মধ্যে অবস্থিতি করিবার সময় শীতকাল

ব্যতীত অন্য ঋতুতে জ্যাকেট্ না ব্যবহার করিলেও চলিতে পারে, তবে এরূপ স্থলে গলা পর্য্যন্ত বন্ধ এবং হাফ্ হাত সেমিজ্ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। কিন্তু কোন কার্য্য উপলক্ষে কোন স্থানে যাইতে হইলে একটী জ্যাকেট্ না পরিয়া যাওয়া উচিত নহে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যে সকল মজুর-রমণীরা ছাদ পিটিতে আসে, তাহাদিগকেও কখন শুধু গায়ে দেখিতে পাওয়া যায় না, আর আমরা আমাদিগের কুলমহিলাদিগের লজ্জারক্ষা সম্বন্ধে এতই উদাসীন যে তাঁহাদিগকে খালি-গায়ে পাঁচজনের বাটীতে পাঠাইতে লজ্জা বোধ করি না। আমরা শিক্ষিত বলিয়া অভিমান করিয়া থাকি, কিন্তু বোধ হয় সামান্য কুলী মজুরেরা পর্য্যন্ত আমাদিগকে এ বিষয়ে শিক্ষা-দান করিতে সমর্থ। আমি আশা করি আমাদের বাঙ্গালী স্ত্রীলোক মাত্রেই বাটী হইতে অন্যত্র গমন করিবার সময় একটি করিয়া জ্যাকেট্ ব্যবহার করিবেন।

আজকাল অনেক ভদ্রপরিবারের অবরোধ-বাসিনী মহিলারা দার্জ্জিলিং, পুরী, মধুপুর, দেবঘর, সিমুলতলা প্রভৃতি নানা স্থানে আত্মীয়-স্বজনের সহিত বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য গমন করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেককেই প্রাতে ও সন্ধ্যার সময়ে পথে ও মাঠে বায়ু সেবনার্থ পদব্রজে ভ্রমণ করিতে দেখা যায়। বলা বাহুল্য যে এই সকল স্থানের বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিয়া তাঁহাদের স্বাস্থ্য সবিশেষ উন্নতি-লাভ করে। এই সকল স্থানে যাঁহারা অব-রোধ-প্রথার পক্ষপাতী হইয়া পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগকে বাটীর বাহিরে যাইতে আপত্তি করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে আমি আর অধিক কি বলিব, তাঁহারা বাস্তবিকই কৃপার পাত্র। তাঁহারা এতই স্বার্থপর যে, বায়ু পরি-বর্ত্তনের সুফলটুকু কেবল নিজেরাই উপভোগ করিতে চাহেন, আর যাঁহারা চিরদিন বায়ু-প্রবাহ-বিরহিত কলিকাতার অন্তঃপুর মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া রুগ্নদেহে অর্দ্ধাশনে প্রাণপণে তাঁহাদের সেবা করিয়া আসিতেছেন, সমাজের গণ্ডীর বাহিরে আসিলেও তাঁহাদের যে ঈশ্বর-দত্ত, বিনাব্যয়লব্ধ জীবনীশক্তি-প্রদায়ক আলোক ও মুক্ত বায়ু সেবনের অধিকার আছে, তাহা তাঁহারা বোধ হয় স্বীকার করেন না। যাহা হউক, যে সকল ভাগ্যবতী স্ত্রীলোকেরা এই সকল স্থানে পদব্রজে ভ্রমণ করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হয়েন, আমার বিবেচনায় তাঁহাদের জুতা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। এই কথা শুনিয়া প্রাচীনমতাবলম্বী অনেক বাঙ্গালী ভদ্রলোকই হয়ত আমার প্রতি বিরক্ত হইবেন। এ স্থলে আমার বক্তব্য এই, আমিও সমাজ-রক্ষা সম্বন্ধে অনেক বিষয়েই প্রাচীনমতাবলম্বী। তবে যে সকল দেশাচারের সংরক্ষণে প্রকৃত ধর্ম্ম ও নীতির অবনতি সাধিত হইতেছে, তাহা-দিগের সংস্কার সমাজ রক্ষার জন্য অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি এবং যে সকল নূতন আচারের প্রবর্ত্তনে সামাজিক ও ব্যক্তিগত সুখস্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা, তাহাদিগের অবলম্বন শ্রেয়স্কর বলিয়া বিবেচনা করি। যাঁহারা ভারতবর্ষের নানাস্থান পর্য্যটন করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্য লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, বাঙ্গালা ভিন্ন অন্যান্য প্রদেশে কি হিন্দু, কি মুসলমান, সকল সম্প্রদায়ের নারীগণ বিনামা ব্যবহার করিয়া থাকেন; কেবল আমাদের বাঙ্গালাদেশের স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে জুতার

ব্যবহার প্রচলিত নাই। অন্তঃপুরমধ্যে আবদ্ধ থাকিলে জুতার প্রয়োজন হয় না, সুতরাং যখন তাঁহারা বাড়ীর ভিতর থাকেন তখন তাঁহাদের জুতা পরিবার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। কিন্তু দার্জ্জিলিংএর ন্যায় শীত-প্রধান দেশে অথবা মধুপুর প্রভৃতির ন্যায় কঙ্করময় স্থানের ভূমিতে খালি-পায়ে ভ্রমণ করিতে হইলে যে বিশেষ কষ্ট হইবার কথা, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। পশ্চিমে দুরন্ত শীতের সময়ে খালি পায়ে থাকিলে আঙ্গুল গুলি ফুলিয়া উঠে এবং অত্যন্ত বেদনা-গ্রস্ত হয়, এরূপ স্থলে গরম মোজা বা জুতা পায়ে না দিলে নিতান্ত ক্লেশ উপস্থিত হইয়া নানা রোগ উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা। বিশেষতঃ পশ্চিমের সর্ব্বত্রই আজ কাল প্লেগ্ দেখা দিয়াছে এবং এক প্রকার ক্ষুদ্র পোকার দংশন দ্বারাই যে প্লেগ্ রোগ উৎপন্ন হয়, ইহাও এক প্রকার স্থিরীকৃত হইয়াছে। ঐ সকল পোকা ইন্দুরের দেহ হইতে জমিতে বিক্ষিপ্ত এবং সচরাচর পদদ্বয়ই উহাদিগের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। মোজা ও জুতা পায়ে দিলে এই বিষম রোগের আক্রমণ হইতে কতক পরিমাণে অব্যাহতি লাভ করা যায়। কিন্তু বৃথা লজ্জা বা দেশাচারের বশবর্ত্তী হইয়া আমাদের স্ত্রীলোকেরা সাতিশয় কষ্ট ভোগ করিয়া থাকেন এবং স্থল-বিশেষে নিজ জীবনকে সঙ্কটাপন্ন করিয়া তোলেন; আমরাও লোকে কি বলিবে এই আশঙ্কায় তাঁহাদিগকে কষ্ট দিয়া থাকি। আমি পুনরায় বলিতেছি যে স্ত্রীলোকের জুতা পরিধান বাঙ্গালায় প্রচলিত না থাকিলেও ইহা বিদেশী প্রথা নহে, ভারতবর্ষের সকল স্থানের সকল সমাজের সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে ইহা প্রচলিত আছে। যদি কেহ দেশাচারের পক্ষপাতী হইয়া নিজ পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগের জুতা পরিধান সম্বন্ধে আপত্তি করেন, তাহাতে আমার কিছু বলিবার নাই, তবে তাঁহাদিগের নিকট আমার অনুরোধ এই যে যাঁহারা আবশ্যক মত অথবা সুবিধার জন্য জুতা পরিধান করেন, তাঁহাদের প্রতি তাঁহারা যেন কোনরূপ দোষারোপ বা তাঁহাদের নিন্দাবাদ না করেন। যাঁহারা চর্ম্মনির্ম্মিত পাদুকা ব্যবহার করা আপত্তিজনক মনে করেন, তাঁহারা কম্বলের (Felt) জুতা স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করিতে পারেন। কম্বলের আসন আমরা পূজার নিমিত্ত ব্যবহার করিয়া থাকি, সুতরাং কম্বলের জুতা ভাণ্ডার গৃহ, রন্ধন গৃহ, এমন কি পূজাগৃহ মধ্যেও দারুণ শীতের সময় ব্যবহার করিলে কোন দোষ হয় না।

আমাদিগের পুরুষ-সমাজে অনেক স্থলেই দুই প্রকার পরিচ্ছদের ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে। যখন আমরা বাড়ীতে থাকি, তখন ধুতি ও জামা ব্যবহার করি; ইহা আমাদিগের স্বাস্থ্য, গৃহকার্য্য ও আরাম, সকল বিষয়েরই পক্ষে উপযোগী। কিন্তু বাহিরের অনেক কাযকর্ম্ম করিবার সময়ে এরূপ পোষাক সর্ব্বথা সুবিধাজনক বা অনুমোদনীয় নহে। ধুতি পরিয়া কেহ এজ্‌লাসে বসিয়া বিচার করিতে পারেন না অথবা উকীল ব্যারিষ্টারের ব্যবসা করিতেও অনুমতিপ্রাপ্ত হন না। যাঁহারা একস্থানে বসিয়া খাতাপত্র লেখেন, ধুতি পরিলে তাঁহাদের কাজের কোন ক্ষতি না হইতে পারে, কিন্তু যাঁহাদের সর্ব্বদা

চলিবার ফিরিবার আবশ্যক হয়, তাঁহাদের পক্ষে ধুতি চাদর ব্যবহার করা অনেক সময়ে সুবিধাজনক হয় না। যাঁহারা মেডিকাল্ কলেজে পড়েন, কাজের অসুবিধা হয় বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে চাদর বা অপর দোছুটের ব্যবহার একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। এঞ্জিনিয়ারিং কালেজের ছাত্রদিগের ধুতি চাদর লইয়া কাজকর্ম্ম করা বড়ই অসুবিধা-জনক। বেলগাছিয়া পশু-চিকিৎসালয়ের ছাত্রদিগের মধ্যে ধুতি ও চাদরের ব্যবহার একেবারেই প্রচলিত নাই। বাহিরের কায কর্ম্ম করিবার পক্ষে ধুতি চাদর অনেক স্থলেই উপযোগী নহে; পেণ্টুলেন্ ও চাপকান্ বা পেণ্টুলেন্ ও কোট, ধুতি অপেক্ষা অধিক উপ-যোগী। অনেক স্থলে ধুতি চাদর পরিলে রাজ-পুরুষদিগের অশ্রদ্ধাভাজন হইতে হয়; ইহাও তাচ্ছল্যের বিষয় নহে। যাঁহাদিগের সহিত একত্র মিলিত হইয়া কাজকর্ম্ম না করিলে আমাদের চলিবে না, এমন কি অন্নসংস্থান সম্বন্ধেও ক্ষতি হইতে পারে, সেস্থানে তাঁহা-দের অনুরাগ বিরাগ সম্বন্ধে দৃষ্টি না রাখা বুদ্ধি-মানের কার্য্য নহে।

কার্য্যক্ষেত্রে পেণ্টলেন্ ও চাপ্‌কানের ব্যবহার অনেকদিন হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। পেণ্টলেন্, চাপকান্ ও চোগা অতি সম্ভ্রান্ত পরিচ্ছদ। রাজদরবারে ইহাই ভারতবাসীর সম্মানের পরিচ্ছদ, সুতরাং ইহাই আমাদের সরকারী পোষাক হওয়া উচিত। তবে কাজকর্ম্ম করিবার সময় চোগা বড় সুবিধাজনক নহে এবং চাপকান্‌ও পরিবার বা খুলিবার পক্ষে তত সহজ নহে বর্ত্তে কোট্ ব্যবহার করিতেছেন। কোট্ পরিয়া কাজকর্ম্ম করিতে অসুবিধা হয় না; সুতরাং যদি একটু লম্বা কোট্ ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে উহার ব্যবহার প্রচলিত হইলে লাভ ব্যতীত কোন ক্ষতি হয় না। তবে ঠিক ইংরাজের মত আমাদের পোষাক হইবার কোন আবশ্যক নাই। উহা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ এবং অনেক স্থলে উহা দ্বারা পরিচ্ছদধারীর জাতি-নির্ণয় করা কঠিন হইয়া উঠে। আমাদিগের বিদ্যালয়ের বালক-দিগের মধ্যে পেণ্টুলেন্ ও কোটের ব্যবহার সর্ব্বত্র প্রচলিত হইলে দেখিতেও বেশ হয় এবং তাহাদিগের ড্রিল্, ব্যায়াম, ক্রীড়া প্রভৃতি সকল বিষয়েরই সুবিধা হইবার সম্ভাবনা। এ বিষয়ে আমি ছাত্র মাত্রেরই অভিভাবকের এবং বিদ্যালয় সমূহের কর্ত্তৃপক্ষদিগের মনো-যোগ আকর্ষণ করিতেছি।

অবশ্য আমাদিগের সামাজিক উৎসবাদিতে ধুতির ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে এবং বরাবর চলিবে। আমাদিগের গৃহে ভোজন, উপবেশন প্রভৃতি দৈনন্দিন কার্য্যের যেরূপ ব্যবস্থা চিরদিন প্রচলিত হইয়া আসি-তেছে, তাহা যে এখনো বহুকাল পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ রহিবে, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এরূপ প্রথার অনুসরণ করিতে হইলে ধুতি ও সাড়ীর ব্যবহার অবশ্য প্রয়োজনীয়। তবে ধুতির ভিতর একটী ড্রয়ার (Drawer) ব্যবহার করা সর্ব্বথা সঙ্গত। ইহাতে ধুতিও পরিষ্কার থাকে এবং যাঁহারা মিহি কাপড় ব্যবহার করেন, তাঁহাদিগকেও ভদ্র সমাজে লজ্জা পাইতে হয় না। সুখের বিষয় এই যে

নীচে ড্রয়ার্ পরা ক্রমশঃ প্রচলিত হইতেছে। সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ইহার ব্যবহার দেখিতে পাইলে আমরা সুখী হইব। ধুতির কোঁচা সম্মুখে না ঝুলাইয়া যদি উহাকে পিছনে গুঁজিয়া মালকোঁচা ধরণের কাপড় পরা যায়, তাহা হইলে বোধ হয় ধুতিপরা সম্বন্ধে একটু উন্নতি হইবার সম্ভাবনা। আমাদের সমাজে ইহা প্রচলিত হইলে মন্দ হয় না।

বাঙ্গালী ভিন্ন বোধ হয় পৃথিবীর অপর সকল জাতিই মাথার কোন না কোনরূপ আবরণ ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু বাঙ্গালীর মাথার আবরণ নাই বলিয়া আমি দুঃখিত নহি, কারণ মাথা সর্ব্বদা আবরণের মধ্যে থাকা স্বাস্থ্যসঙ্গত নহে। ইহাতে মাথায় বাতাস না লাগিয়া মাথা শীঘ্র গরম হইয়া উঠে, মাথায় ঘামের দুর্গন্ধ হয় এবং অনেক স্থলে মাথার চুল পাতলা হইয়া টাকের সূত্রপাত হয়। মাথায় যদি কোন আবরণ দিতে হয়, তাহা হইলে উহা যত হাল্কা হয় এবং উহার মধ্য দিয়া বায়ু যাহাতে সহজে সঞ্চালিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। টুপি, ক্যাপ্ বা পাগ্ড়ি যদি মাথার চতুর্দ্দিকে চাপিয়া বসে, তাহা হইলে শিরোদেশে রক্ত-সঞ্চালনের ব্যাঘাত হইয়া শিরঃপীড়া, চক্ষু ও মস্তিষ্কের রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা। হিন্দুস্থানীরা যে খুব হাল্কা পাতলা কাপড়ের টুপি ব্যবহার করিয়া থাকেন, মাথায় পরিবার পক্ষে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী। সার্জ্জন্-জেনেরাল্ সার সি পি লিউকিস্ তাঁহার ট্রপিকাল্ হাইজিন্ (Tropical Hygiene) নামক পুস্তকে সাহেব-দের টুপি ব্যবহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে আলোক এবং বিশুদ্ধ বাতাস মাথার চুলের বৃদ্ধির প্রধান সহায়, সুতরাং বালকবালিকাদিগের শিরোদেশ নিতান্ত আবশ্যক না হইলে কখনই ঢাকিয়া রাখিবে না। একটা ইংরাজি কথা আছে যে মাথা সর্ব্বদা ঠাণ্ডা রাখিবে (Keep the head cool), এ কথার সত্যতা তিনি আবাল-বৃদ্ধ, সকলের পক্ষেই সমান উপযোগী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তবে রৌদ্রে বাহির হইবার সময় টুপি ব্যবহার করা অবশ্য কর্ত্তব্য, নহিলে এদেশে সাহেবদের সর্দ্দিগর্ম্মি হইবার সম্ভাবনা। আমরা যখন সকলেই রৌদ্র নিবারণের জন্য ছাতা ব্যবহার করিয়া থাকি, তখন ইহার জন্য আমাদের টুপি ব্যবহার করিবার কোন আবশ্যক নাই। অবশ্য অধিক শীতের সময় টুপী বা পাগ্ড়ী দ্বারা মাথা ঢাকিবার আবশ্যক হইয়া থাকে।

আমরা বালকবালিকাদিগের পরিচ্ছদ সম্বন্ধে যথোচিত মনোযোগ প্রদান করি না। অধিকাংশ বাঙ্গালীর বাড়ীর ছোট ছেলে মেয়েদের প্রায়ই নগ্ন বা অর্দ্ধ নগ্নাবস্থায় থাকিতে দেখা যায়। যদি বা শরীরের উপরার্দ্ধ জামা দ্বারা আবৃত থাকে, তবে নীচের ভাগ নগ্ন, অথবা কোমরে কাপড় জড়ান থাকিলে উপর অঙ্গ প্রায়ই অনাবৃত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায় এই জন্য আমাদের বাড়ীর ছোট ছেলেমেয়েদের সর্দ্দি কাশি প্রায়ই লাগিয়া থাকে। একটী স্বাস্থ্যতত্ত্বের কথা যদি আমরা মনে রাখি, তাহা হইলে আমরা অনেক অসুবিধা, অনেক খরচের হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে পারি। তত্ত্বটী এই যে, বালকবালিকাদিগের শরীরে তাপ যুবা বয়সের অপেক্ষা অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং শরীরের আয়তন হিসাবে তাহাদের শরীর

বাহিরের ঠাণ্ডা দ্বারা তাহারা সহজেই অভিভূত হইয়া পড়ে। এই জন্য বালকবালিকাদিগের শরীর গরম কাপড় দ্বারা সর্ব্বদা ঢাকিয়া রাখা উচিত, নহিলে তাহাদের সর্দ্দি, কাশি, জ্বর প্রভৃতি রোগে নিয়ত কষ্ট পাইবার সম্ভাবনা। যাঁহারা মনে করেন যে বালকবালিকাদিগকে খালি-গায়ে রাখিয়া তাহাদিগকে "শক্ত" ও কষ্টসহ করিতেছেন, তাঁহাদের বিশ্বাস নিতান্ত ভ্রমসঙ্কুল। তাঁহারা এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া সন্তান-সন্ততিগণকে আজীবন দুর্ব্বল ও তাহাদের দেহ রোগ-প্রবণ করিয়া থাকেন। বালকবালিকাগণের ঐ বয়সে শরীরের বৃদ্ধি সাধিত হয় এবং এই বৃদ্ধি সাধনের জন্য বিস্তর তাপের প্রয়োজন হয়। দেহ অনাবৃত থাকিলে দেহতাপ যথেষ্ট পরিমাণে দেহ হইতে বহির্গত হইয়া যায়। সুতরাং তাপের অভাবে তাহাদিগের শরীর সমুচিত বৃদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হয় না। এই জন্য তাহাদিগের পক্ষে রিক্ত গায়ের উপরে ফ্লানেল্ বা পশমনির্ম্মিত অন্য বস্ত্র ব্যবহার করা সঙ্গত। খালি-পায়ে খালি-গায়ে শীত বা বর্ষার সময়ে ছোট ছেলেদের কখনই খেলিতে বা দৌড়াদৌড়ি করিতে দেওয়া উচিত নহে। গ্রীষ্মকালে বয়স্থ লোকে যেরূপ সুতার কাপড় জামা ব্যবহার করিয়া থাকেন, বালকবালিকা-দিগের সম্বন্ধেও সেইরূপ ব্যবস্থা করা উচিত। ছেলেদের পক্ষে ঢিলা হাফ্ ইজার্ ও কোট্ সর্ব্বপ্রকারে বিশেষ উপযোগী।

এক বৎসর বয়স না হইলে ছেলের পায়ে জুতা দেওয়া উচিত নহে। জুতা চওড়া মুখ, নরম ও আল্‌গা-বাঁধা হওয়া উচিত, নহিলে পা বাড়িবার পক্ষে ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। ছেলেরা চটি জুতা যত অধিক ব্যবহার করে, ততই ভাল। চটি জুতা পদদ্বয়ের স্বাভাবিক বৃদ্ধির ব্যাঘাত করে না।

যে জুতা বা বুট পা আঁটিয়া ধরে, তাহা কখনই ব্যবহার করা উচিত নহে। যে জুতা পরিলে আমাদের পায়ের অঙ্গুলিগুলি স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে, তাহাই ব্যবহার করা সঙ্গত। ইহাতে পায়ের স্বাভাবিক গঠন নষ্ট হয় না। অধিকাংশ ইংরাজ যেরূপ জুতা পরিয়া থাকেন, তাহা নিতান্ত দোষাবহ। এই কারণে অতি অল্পসংখ্যক ইংরাজের পায়ের অঙ্গুলিগুলি স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিতে দেখা যায়। সচরাচর উহাদিগের বুড়া আঙ্গুলটী কড়ে আঙ্গুলের দিকে ধনুকের ন্যায় বক্রভাবে অবস্থিতি করে এবং কড়ে আঙ্গুলটী তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী অঙ্গুলির স্কন্ধে আরোহণ করিয়া বিশ্রামসুখ লাভ করে! আমি হস্পিটালে কত সাহেবের পা যে এইরূপ বিকৃত ভাবাপন্ন দেখিয়াছি তাহার সংখ্যা নাই ইহা কেবল জুতার দোষেই ঘটিয়া থাকে। এমন জুতা পরা উচিত যাহার মধ্যে আঙ্গুলগুলি অল্প নাড়াচাড়া করিতে পারা যায়। সকল সময়ে চওড়া-মুখ (Broad toe) জুতার ব্যবহার প্রশস্ত। তবে যে জুতা পায়ে ঢিলা হয়, তাহা ব্যবহার করিলে পাও আরামে থাকে না এবং চলিবার পক্ষেও সুবিধা হয় না।

বৃষ্টি বাদলের সময় "ওয়াটার্ প্রুফ্" ব্যবহার করিবার আবশ্যক হয়। অল্প খরচে শাদা কাপড়কে সহজেই ব্যবহারোপযোগী "ওয়াটার প্রুফ্" করিয়া লওয়া যাইতে পারে। দুই সের আন্দাজ পেট্রল্ (Petrol) নামক তরল পদার্থের সহিত আড়াই

ছটাক ল্যানোলিন্ (Lanolin) মিশ্রিত করিয়া উহা কাপড়ে উত্তমরূপে লাগাইয়া নিংড়াইয়া লইতে হইবে; পরে ঐ কাপড় বাতাসে শীঘ্র শুষ্ক করিয়া লইলেই উহা "ওয়াটার্ প্রুফে"র কার্য্য করিবে। ম্যাকিণ্টস্ প্রভৃতি যে সকল "ওয়াটার্ প্রুফ্" সচরাচর বাজারে বিক্রীত হয়, ঘরে গড়া এই "ওয়াটার্ প্রুফ্" তদপেক্ষা অনেক ভাল। ইহা দ্বারা গায়ের ঘাম শুকাইবার ব্যাঘাত হয় না, ইহার মধ্যে বাতাস সহজে প্রবেশ করিতে পারে, ইহা জলবাষ্প অধিক পরিমাণে শোষণ করে না, সাবধানে কাচিলে নষ্ট হয় না অথচ একটী সুট (Suit) এইরূপে ওয়াটার্ প্রুফ্ করিতে ২ টাকার অধিক খরচ হয় না (Tropical Hygiene)।

ল্যাপ্ল্যাণ্ড প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশের অধিবাসীগণ ভল্লুক, সীল্ প্রভৃতি লোমশ পশু-চর্ম্ম নির্ম্মিত পরিচ্ছদ ব্যবহার করিয়া থাকে। শীত নিবারণের পক্ষে উহা বিশেষ উপযোগী। এ সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার আবশ্যক নাই।

অবশেষে বক্তব্য এই যে, পরিচ্ছদ যে উপাদান দ্বারাই নির্ম্মিত হউক না কেন, উহাকে সর্ব্বদা পরিস্কৃত পরিচ্ছন্ন রাখার বিশেষ প্রয়োজন। মূল্যবান পরিচ্ছদ পরিধান সকলের অবস্থায় ঘটিয়া উঠে না এবং উহা না হইলেও কাহারো মান সম্ভ্রমের কোন ক্ষতি হয় না; কিন্তু পরিধেয় বসন পরিস্কৃত রাখা কাহারো সাধ্যাতীত নহে—ইহা সামান্য আয়াস ও যৎসামান্য ব্যয় সাপেক্ষ। মলিন রেসমী চাদর ব্যবহার করা অপেক্ষা পরিস্কৃত বোম্বাই চাদর ব্যবহার করা সর্ব্বতোভাবে কল্যাণকর। মলিন বসন পরিধান করিলে শুদ্ধ যে স্বাস্থ্যের হানি হয় তাহা নহে, ইহা দ্বারা মন সর্ব্বদা অপ্রসন্ন থাকে এবং কার্য্য-স্থলে সকলেরই বিরাগভাজন হইতে হয়। কাপড় যদি ফর্সা হয়, তাহা হইলে তাহা মোটা বা সেলাই করা হইলে কোন ক্ষতি নাই—উহা পরিধান করিতে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি লজ্জা বোধ করিবেন না, কিন্তু ময়লা কাপড় পড়িলে আত্মগ্লানি উপস্থিত হয় এবং মলিনতার প্রতি স্বাভাবিক বিরাগ ক্রমে লোপ প্রাপ্ত হয়, সুতরাং ইহা একেবারেই বাঞ্ছনীয় নহে। এই জন্য পণ্ডিতগণ পরিষ্কার পরি-চ্ছন্নতার উপর দেবত্ব আরোপণ করিয়াছেন (Clean-liness is next to Godliness)।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচুনীলাল বসু।

হ্যাঁচ্যাতঙ্ক

১

তুলসী চাটুয্যে রিবড়ার ষ্টেশন-মাষ্টার। বেঁটেখাটো মানুষটি। বয়স চল্লিশের ঘেঁসাঘেঁসি কিন্তু ইহারই মধ্যে বেচারার মুখ এমন তোবড়াইয়া গিয়াছে যে কাবুলীর দোকানের বেদানা তাহার নিকট হার মানে। মাথার সম্মুখভাগে এত বড় টাক যে, সীমানা লইয়া মস্তক ও ললাটের বিরোধটি কোনকালে মিটিবার নয়! সেই ললাটপ্রদেশে 'অন্নচিন্তার' পদাঙ্ক-রেখা সতত পরিস্ফুট। ...

বিনিন্দিত মোটা ভ্রূর নীচে চক্ষুদুটি কোটরগত যেন ক্রমশঃ পিছু হটিতেছে! অনুন্নত নাসিকার ডগার উপর দড়িবাঁধা চষমা চির-বিরাজমান। গোঁফজোড়া অর্দ্ধপক্ক অবস্থায় মুখের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে—ভাগ্যে 'মাষ্টার মশাই'কে দুগ্ধ খাইতে হয় না! দাড়ী কামানো। তুলসী মাষ্টারের বাকীটুকু আলপাকার চাপ-কানে ও 'রেলীর উনপঞ্চাশে' ঢাকা। পদযুগল তালিসংযুক্ত 'প্যানেলা শু'মণ্ডিত।

এখন, তুলসী চাটুয্যের একটি মজার মুদ্রাদোষ ছিল!—সেটির নাম 'হাঁচি-ফোবিয়া' বা বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় 'হাঁচ্যাতঙ্ক' রাখা যাইতে পারে! কি জানি কেমন করিয়া মাষ্টার-মশায়ের এই বিশেষত্বটুকু সে লাইনের প্রায় সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইতে বেশী বিলম্ব হয় নাই। ইহার ফলে, কোন ট্রেন ষ্টেশনে আসিয়া থামিতে না থামিতে সারা গাড়ীতে হাঁচির ধূম পড়িয়া যাইত। তুলসী মাষ্টারও রাগে জ্ঞান-গোচর হারাইয়া তাহাদের ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষের সদ্গতি করিতে ছাড়িত না! নিষ্কর্ম্মা প্যাসেঞ্জারের দল কিন্তু তাহাতে দ্বিগুণ উৎসাহে হাঁচিতে থাকিত। কেহ কেহ আবার রসিকতার মাত্রা চড়াইয়া কাগজে মোটা মোটা অক্ষরে "মাষ্টার মশাই হাঁচিব কি?" লিখিয়া গাড়ীর বাহিরে আঁটিয়া দিতে লাগিল! সৌভাগ্যের বিষয় গাড়ী ষ্টেশনে বেশীক্ষণ দাঁড়ায় না!

এইরূপ অশান্তিতেই তুলসী চাটুয্যের দিন যায়! নয়টা ছাব্বিশ মিনিটের ট্রেণখানা প্রায় আগাগোড়া 'ডেলি প্যাসেঞ্জারে' ভরা! সেই ট্রেণখানাই তুলসীকে বেশী জ্বালাতন

একদিন সেই ট্রেণে একটি ভদ্রলোক যাইতেছিলেন। দেখিবামাত্র লোকটিকে ধীরগম্ভীর বলিয়া মনে হয় বটে কিন্তু তাঁর চক্ষুদুটিকে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে গাম্ভীর্য্য ও ধীরতার আবরণে একখানি বেশ রসিকপ্রাণ সতত টলটল করিতেছে!

এখন, কি কারণে সে ট্রেণখানিকে সেই ষ্টেশনে মিনিট পনেরো দাঁড়াইতে হয়। এই 'স্বর্ণসুযোগ' পাইয়া গাড়ীময় হাঁচির 'কলরব' পড়িয়া গেল!...মাষ্টার ম'শায়ের কাণদুটা তো রাগে লাল হইয়া উঠিল... তিনিও অজস্রধারে গালির 'হরির লুট' ছড়াইতে লাগিলেন! এমন সময় সেই ভদ্রলোকটি মাষ্টার মশাইকে নিকটে ডাকিলেন। তুলসী তো প্রথমটা তাঁর নিকট যাইতেই চাহিল না কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার ধীরগম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া তুলসীর প্রাণে কেমন একটু ভরসা হইল। তখন সে অর্দ্ধ বিরক্তি অর্দ্ধ আশ্বাসের সহিত ভদ্রলোকটির নিকটে গিয়া বলিল—"কি ডাকৃচেন—কেন?" ঠিক সেই সময় পাশের একটি প্যাসেঞ্জার নস্য সাহায্যে হাঁচিয়া উঠিল! তুলসী ভাবিল এইজন্য তাহাকে কৌশল করিয়া ডাকা হইয়াছে! সে, সেই ভদ্রলোকটির পানে মর্ম্মান্তিক কোপদৃষ্টিতে চাহিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। সেই সময় ভদ্রলোকটি আন্তরিক দুঃখে ও বিরক্তির সহিত পাশের ব্যঙ্গপ্রিয় সহযাত্রীকে বলিয়া উঠিলেন—"আঃ!—কি করেন!"

ভদ্রলোকটির সহৃদয়তায় বেচারা তুলসী

ডেভিলরা আমায় এম্‌নি করে রোজ জ্বালাতন করে দেখ্‌চি চাকরী ছাড়তে হবে।"

ভদ্রলোকটি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"তা আপনি ট্রান্সফারের চেষ্টা দেখেন না কেন?"

তুলসী হতাশভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল "হুঁ—ট্রান্সফার নেব...এ ডেভিলরা থাকতে কোথাও আমার সোয়াস্তি নেই।"

"তা আপনি আর এক কাজ করেন না কেন?—তাহলে ত সব আপদ যায়!"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া তুলসী বলিল, "কি বলুন?"

"ওঁরা যত পারেন হাঁচুন—আপনি কিছুতেই চট্‌বেন না!"

তুলসী ঘাড় নীচু করিয়া কথাটা একটু ভাবিতে যাইবে এমন সময় পাশের কামরা হইতে দুইজনে পর পর হাঁচিয়া উঠিল!

তুলসী ক্ষুব্ধ নয়নে ভদ্রলোকটির পানে চাহিয়া বলিল -"দেখলেন মশাই...!"

"আঃ!...আবার চটেন কেন!...ওঁরা হাঁচুন না!"

তুলসী গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল—"হুঁ...ঠিক বলেচেন!...আর চোট্‌বো না!"

তুলসী ভদ্রলোকটিকে নমস্কার করিয়া আর কোনদিকে না চাহিয়া সটান ষ্টেশনে রুমের দিকে চলিয়া গেল। মাষ্টারমশায় পিছন ফিরিতেই ভদ্রলোকটি সহযাত্রীদের বলিলেন—"মশাইরা থাম্‌লন কেন?...মাষ্টার মশায়কে একটু আধটু পরীক্ষা করে দেখুন!"—

"আমরা ভাবলুম আপনি সত্যি সত্যি [illegible]ছিলেন...আপনি ওকে নিয়ে মজা করছিলেন!" সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তুলসী মাষ্টার যাইতে যাইতে একবার পিছন ফিরিয়া দেখিল।

গাড়ী ছাড়িবার কিছু পূর্ব্বে তুলসী আবার কি জন্য প্ল্যাটফর্ম্মে দেখা দিল। তাহার আবির্ভাবেই হাঁচির শব্দ সুরু হইল! প্রথম দুই তিনটা হাঁচিতে তুলসী টলিল না। তারপর গোটাকতক হাঁচিতে তাহার কানের পাশ দুটা লাল হইয়া উঠিল কিন্তু তখনো রাগের রাশ ঠিক রাখিয়াছে কিন্তু ক্রমে যখন হাঁচির সংখ্যা বাড়িয়াই যাইতে লাগিল, তখন তুলসী আর স্থির থাকিতে পারিল না... সে প্যাসেঞ্জারদের দিকে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া, বিকৃত মুখে দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া তীব্রস্বরে বলিল—"ও—রে ডে-ভিল-রা—আর—আ-মি চটি—না—রে—!"

গাড়ীশুদ্ধ লোক তো হাসিয়া খুন!

২

আবার যে-কে-সেই!

সোমবার বিকালে ট্রেণ ঘন ঘন আসা যাওয়া করে। এ দিনে তুলসীর মেজাজ বড়ই খারাপ থাকে! তিনটার 'ডাউন' ট্রেণের হাঁচির জ্বালা জুড়াইতে না জুড়াইতে আবার সাড়ে চারিটার 'আপ্' ট্রেনে হাচির আতঙ্ক!

তখন বেলা পড়িয়াছে—একখানা ট্রেণ তুলসীকে চটাইয়া তাহার নিকট হইতে সুমিষ্ট গালি বক্‌শিশ্ পাইয়া 'ভপ্-ভপ্' করিতে করিতে ধোঁয়ার পতাকা তুলিয়া চলিয়া গেল। প্ল্যাটফর্ম্মের অদূরে গাছের ছায়ায় একখানা বেঞ্চের উপর জিনের কোট-প্যাণ্ট-পরা সামান্য ধরণের এক ইংরাজ অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় থাকিয়া এই 'তুলসী-

প্যাসেঞ্জার' অভিনয় দেখিতেছিল আর মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছিল!

ট্রেন চলিয়া গেলে তুলসী যখন ষ্টেশন-ঘরের দিকে যাইতেছিল, সাহেবটি তাহাকে ডাকিল। তুলসী নিকটে গেলে সাহেব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু তুমিতো এখানকার ষ্টেশন-মাষ্টার?"

S. M. অক্ষর-বসান টুপিটা তুলসী মাথায় ভাল করিয়া স্থাপন করিয়া বলিল—"হাঁ—সাহেব।"

"তা, তুমি প্যাসেঞ্জারদের অমন করে গাল দিচ্ছিলে কেন?"

তুলসী বলিল, "সাহেব, ও ডেভিলরা আমায় জ্বালিয়ে তুলেছে...আমায় আর চাকরী করতে দেবে না দেখচি!"

সাহেব তখন তুলসীর নিকট হইতে তাহার অমন চটিবার কারণটা কি জানিয়া লইয়া একটু হাসিয়া বলিল, "তা বাবু তুমি ট্রান্সফারের চেষ্টা কর না কেন?"

তুলসী তাহার অদৃষ্টকে দোষ দিয়া জানাইল যে কোথাও ট্রান্সফার হইয়া তাহার শান্তি নাই বরং এখানে জিনিসপত্র একটু সস্তা, অন্যত্র গেলে সে সুবিধাটি পর্য্যন্ত ঘুচিয়া যাইবে।

সাহেব তখন তুলসীর মাহিনার কথা জিজ্ঞাসা করিল।

তুলসী কপালে হাত দিয়া বলিল—"সাহেব সে কথা আর জিজ্ঞাসা করো না—মোটে পঁয়ত্রিশটী টাকা!...অথচ ঘরে ছেলে-পুলে খেতে দশ বারো জন!"

"তুমি কত দিন চাকরী করছ?"

"চাকরী করচি আজ বিশ বছরের ওপর—"

"এর ভিতর আর মাহিনা বাড়ে নি?"

"মাহিনা বাড়বে?—এই এজেণ্ট থাকৃতে?"—

"কেন, এজেণ্ট খুব খারাপ লোক বুঝি?"

তুলসী ললাট কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "না, এ দিকে লোক মন্দ নয়, তবে পয়সা কড়ি সম্বন্ধে—ওয়ান্ পাইস্ ফাদার মাদার!—তা হবে না বা কেন—জাতে যে "সাইলক্!"

সাহেব রুমালে মুখখানা মুছিয়া বলিল—"তা হলে এ চাকরীতে তোমার মোটেই সুখ নেই, বল!"

তুলসী হাত নাড়িয়া বলিল—"নাঃ!—এ অভাগা এজেণ্ট থাকৃতে আর সুখ নেই!"

ইহার কিছুক্ষণ পরে একখানা ডাউন ট্রেণ আসিল। সেই ট্রেণের সঙ্গে এজেণ্টের 'সেলুন' দেখিয়া তুলসী শশব্যস্তে ষ্টেশনঘরে ঢুকিয়া বুকিং ক্লার্ক প্রভৃতি সকলকে বলিতে লাগিল—"ওহে, এজেণ্ট এসেচেন—এজেণ্ট এসেচেন!"

সেখানে তখন গার্ড উপস্থিত ছিল—শুনিয়া বলিল—"এজেণ্ট তো অনেক আগে এসেচেন—তাঁকে নিতে সেলুন এসেচে।"

"এঁ্যা...এঁ্যা...এজেণ্ট অনেক আগে এসেচেন!"

এমন সময় অদূরে পূর্ব্ব পরিচিত সেই জিনের কোট প্যাণ্ট পরা সাহেবকে আসিতে দেখিয়া গার্ড বলিয়া উঠিল, "ঐ—তো এজেণ্ট!"

"এঁ্যা—ঐ এজেণ্ট!" তুলসীর সমস্ত মুখখানা নীল হইয়া গেল—সে কাঁপিতে কাঁপিতে সেইখানে বসিয়া পড়িল—পর ক্ষণেই ঊর্দ্ধশ্বাসে সেলুনের দিকে ছুটিল! ষ্টেশনের সকলে তো অবাক!

তুলসী তো সেলুনের ভিতর গিয়া এজেণ্টের দুই পা জড়াইয়া ধরিল—"সাহেব—চিন্‌তে পারি নি—কসুর হয়েচে!"

সাহেব তুলসীর কাতরোক্তিতে কর্ণপাত না করিয়া সেলুন পরিত্যাগ করিয়া গম্ভীর ভাবে আদেশ করিলেন মাত্র! বেচারা তুলসী বধ্যভূমি-নীত অসহায় ছাগ শিশুর মত কাঁপিতে কাঁপিতে এজেণ্টের আদেশ পালন করিল।

পর মুহূর্ত্তেই ট্রেণ ছাড়িয়া দিল।

৩

পরদিন প্রাতেই তারযোগে তুলসীর প্রতি আদেশ আসিল—"রিলিভিং ম্যান পৌঁছিবা মাত্র তাহাকে সমস্ত 'চার্জ' বুঝাইয়া দিয়া তুমি অবিলম্বে এজেণ্টের সহিত সাক্ষাৎ করিবে।"

'রিলিভিং ম্যান' আসার অর্থ তুলসী বুঝিল—চাকরী যাওয়া! বেচারা তুলসী চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিল। হায় হায় সে এতগুলি ছেলে পুলে লইয়া কি করিবে?—কোথায় দাঁড়াইবে!

টেলিগ্রাম পৌঁছিবার অনতিবিলম্বেই রিলিভিং ম্যানকে লইয়া একখানি অপট্রেন উপস্থিত!

* * *

এজেণ্ট অফিসের যাহারা তুলসীকে চিনিত তাহারা সকলেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—ব্যাপার কি?

ঘটনা শুনিয়া সকলেই বুঝিল এ যাত্রা তুলসীর আর নিস্তার নাই! ট্র্যাফিক সুপারিনটেণ্ডেণ্ট তো তুলসীকে খুব এক চোট ভৎর্সনাই করিয়া লইলেন—শেষে বলিলেন—"চাকরী তো গিয়েছেই—শেষে প্রসিকিউট্‌ করে কি না দেখ!"

তুলসী বেচারা তো আরো দমিয়া গেল! চাকরী ত যাবেই আবার তার উপর প্রসিকিউশন্‌?—সে মনে করিল, এজেণ্টের সঙ্গে আর দেখা করে কাজ নেই—পালাই! আবার ভাবিল, অই চলন্ত এঞ্জিনখানার সামনে গিয়া পড়ি—সব ভয় দূর হইবে!

এমন সময় এজেণ্টের ঘরে তুলসীর ডাক পড়িল! চাকরী-নির্ভর তুলসীর আর পালানো বা এঞ্জিনের মুখে ঝাঁপ দেওয়া হইল না। তুলসী এজেণ্টের কামরায় প্রবেশ করিতেই এজেণ্ট জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি রিষড়ার ষ্টেশন মাষ্টার?"

"হাঁ—হুজুর!"

"আচ্ছা,—তুমি যখন কাল আমার কাছে আমার নিন্দা করছিলে, তখন নিশ্চয়ই তুমি আমাকে অন্য লোক ভেবেছিলে।—কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি আর একজনের কাছে আমার নিন্দা কর্‌লে সে আমার কিছু করতে পারে?"

তুলসী ভীতি-জড়িত কণ্ঠে বলিল—"না—হুজুর!"

"সে তোমার মাহিনা বাড়াতে পারে?"

তুলসী সভয়ে ঘাড় নাড়িল।

সাহেব তাঁহার অর্দ্ধ দগ্ধ সিগারেটের ছাই "অ্যাশট্রে'তে ঝাড়িয়া তুলসীর মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—"আচ্ছা, যে আমারও কিছু করতে পারে না এবং তোমারও মাহিনা বাড়াতে যার ক্ষমতা নেই এমন লোকের কাছে কম্‌প্লেন্‌ করার অর্থ—শুধু নিন্দা করা নয় কি?"

তুলসী দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছিল।

"দেখ, কেবল গ্লানি করবার উদ্দেশ্যে

কখনো কারো নিন্দে করতে নেই! যেখানে প্রতিকারের আশা থাকে সেখানকার কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। সাবধান! ভবিষ্যতে আর যেন ও রকম না হয়!”

তুলসী সাহেবকে সেলাম করিয়া বাহির হইতে পারিলে বাঁচে! সাহেব বলিলেন—“দাঁড়াও!”

“তুমি এখন কত মাহিনা পাও?”

“হুজুর!—পঁয়ত্রিশ টাকা।”

“আচ্ছা, যাও, তুমি তোমার পোষ্ট জয়েন কর গে!”

তৎক্ষণাৎ তুলসীর স্থানে যে ব্যক্তি গিয়াছিল তাহাকে তারে আদেশ করা হইল—তুলসী পৌঁছিলে তাহার হাতে চার্জ্জ দিয়া সে যেন চলিয়া আসে।

সেই মাসের মাহিনা ‘পে’ করিবার সময় ‘পে-ক্লার্ক’ তুলসীকে ৩৫৲ স্থলে ৫০৲ দেওয়ায় তুলসী বিস্মিত হইয়া বলিল—“এ—কি?”

“ও—হো ভুল হয়েচে” বলিয়া পে-মাষ্টার তুলসীকে আরো ২০৲ টাকা বেশী দিল। তুলসী বলিল—“আপনি আজ হয়েচেন কি?—একি করচেন!”

পে-ক্লার্ক তখন হাসিতে হাসিতে তুলসীকে এজেন্টের অর্ডার দেখাইল।—তাহাতে লেখা আছে—তুলসী চাটুয্যে—ষ্টেশনমাষ্টার রিষড়া, পঞ্চাশ টাকা বেতনে উন্নীত হইল এবং এই পঞ্চাশ টাকা হিসাবে বিগত চারি মাসের দরুণ সে আরও ষাট টাকা অধিক পাইবে।

বিস্ময়ে আনন্দে তুলসীর ক্ষণকাল বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না!

এই সুসংবাদের পর দিবস ডেলিপ্যাসেঞ্জারের দল পূর্ব্বের মত তুলসীকে চটাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। তুলসী এবার কিন্তু তাহাদের চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল “যত পারো হাঁচো দাদা!—ঐ হাঁচির দৌলতেই মাইনে বেড়ে গেচে”!

শ্রীপাঁচুলাল ঘোষ।

ভুবনরাণী

মানস সরসী জলে হৃদয় কমলদলে
রাখিয়া কমল পাদুখানি!
চাহিয়া পুরব পানে জাগায় মধুর তানে
অমলা বালিকা বীণাপাণি!
ঝন্ ঝন্ রণ্ রণ্ বীণার মধুর স্বন্
দিক্ ছাপি আকাশেতে ছুটে,
ঘন মেঘ ভাঙা ভাঙা আবেগ আভাষে রাঙা
দিক্‌বালা চমকিয়া উঠে!
উছলিত কল কল মানস সরসী জল
কালো জলে রাঙা আলো খেলে,
ঢেউ গুলি ঢুলে ঢুলে পড়ে রাঙা পদ মূলে
কমল কলিকা আঁখি মেলে।

অধীর পবন এসে দুলে খেলে এলো কেশে
চুমে পদ মরালী মরালে।
রিনিক্ ঝিনিক্ ঝিন্ মধুরে মধুর বীণ
মোহিনী মোহিনী ধারা ঢালে।
উথলিত নবরাগে জীবনে জীবনী জাগে
নব সুর বাজে নব ছন্দে!
চেয়ে ওই হাসি মুখে ভুবন অবশ বুকে
রাঙা পদ তলে লুটি বন্দে।
হেরি সে অতুল ছবি নব রাগে জাগে রবি
শত করে পূজে পাদুখানি!
উজলি মানস জলে ভুবন হৃদয় দলে
হাসে মোর হৃদয়ের রাণী!

শ্রীনিরুপমা দেবী।

তর্জ্জমা

আমরা ইংরাজ জাতিকে কতকটা জানি, এবং আমাদের বিশ্বাস যে, প্রাচীন হিন্দু জাতিকে তার চাইতেও বেশি জানি; আমরা চিনিনে শুধু নিজেদের।

আমরা নিজেদের চেন্‌বার কোন চেষ্টাও করিনে, কারণ আমাদের বিশ্বাস যে, সে জানার কোন ফল নেই; তা ছাড়া নিজেদের ভিতর জানবার মত কোন পদার্থ আছে কিনা সে বিষয়েও অনেকের সন্দেহ আছে।

বাঙ্গালীর নিজস্ব বলে' মনে কিম্বা চরিত্রে যদি কোন পদার্থ থাকে, তাকে আমরা ডরাই, তাই চোখের আড়াল করে' রাখতে চাই। আমাদের ধারণা যে, বাঙ্গালী তার বাঙ্গালিত্ব না হারালে আর মানুষ হয় না। অবশ্য অপরের কাছে তিরস্কৃত হ'লে আমরা রাগ করে' ঘরের ভাত, (যদি থাকে ত) বেশি করে' খাই; কিন্তু উপেক্ষিত হ'লেই আমরা বিশেষ ক্ষুণ্ণ হই। মান এবং অভিমান এক জিনিষ নয়। প্রথমটির অভাব হতেই দ্বিতীয়টি জন্ম-লাভ করে।

আমরা যে নিজেদের মান্য করিনে, তার স্পষ্ট প্রমাণ এই যে, আমরা উন্নতি অর্থে বুঝি, হয় বর্ত্তমান ইউরোপের দিকে এগোনো, নয় অতীত ভারতবর্ষের দিকে পিছোনো। আমরা নিজের পথ জানিনে বলে' আজও মনঃস্থির করে' উঠতে পারিনি যে, পূর্ব্ব এবং পশ্চিম এই দুটির মধ্যে কোন্ দিক অবলম্বন করলে আমরা ঠিক গন্তব্য স্থানে গিয়ে পৌঁছব। কাজেই আমরা ইউরোপীয় সভ্যতার দিকে তিন পা এগিয়ে আবার ভারতবর্ষের দিকে দু'পা পিছিয়ে আসি—আবার অগ্রসর হই, আবার পিছু হটি। এই কুর্নিস করাটাই আমাদের নব-সভ্যতার ধর্ম্ম ও কর্ম্ম।

উক্ত ক্রিয়াটি আমাদের পক্ষে বিশেষ গৌরব-সূচক না হলেও, মেনে নিতে হবে। যা মনে সত্য বলে' জানি, সে সম্বন্ধে মনকে চোখ ঠেরে কোন লাভ নেই। আমরা দো-টানার ভিতর পড়েছি—এই সত্যটি সহজে স্বীকার ক'রে নিলে আমাদের উন্নতির পথ পরিষ্কার হয়ে আস্‌বে। যা আজ উভয়-সঙ্কট বলে' মনে হচ্ছে, তাই আমাদের উন্নতির স্রোতকে একটি নির্দ্দিষ্ট পথে বদ্ধ রাখবার উভয় কূল বলে বুঝতে পারব। আমরা যদি চল্‌তে চাই ত আমাদের একূল ওকূল দুকূল রক্ষা করেই চলতে হবে।

আমরা স্পষ্ট জানি আর না জানি, আমরা এই উভয় কূল অবলম্বন করেই চলবার চেষ্টা কর্‌ছি। সকল দেশেরই সকল যুগের একটি বিশেষ ধর্ম্ম আছে। সেই যুগধর্ম্ম অনুসারে চল্‌তে পারলেই মানুষ সার্থকতা লাভ করে। আমাদের এ যুগ সত্যযুগও নয়, কলিযুগও নয়,—শুধু তর্জ্জমার যুগ। আমরা শুধু কথায় নয়, কাজেও, একেলে বিদেশী এবং সেকেলে স্বদেশী সভ্যতার অনুবাদ করেই দিন কাটাই। আমাদের মুখের প্রতিবাদও ঐ একই লক্ষণাক্রান্ত। আমরা সংস্কৃতের অনুবাদ করে' নূতনের প্রতিবাদ করি, এবং ইংরেজির অনুবাদ করে' পুরাতনের প্রতিবাদ করি। আসলে রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্ম, শিক্ষা, সাহিত্য,—সকল ক্ষেত্রেই তর্জ্জমা করা ছাড়া

আমাদের উপায়ান্তর নেই। সুতরাং আমাদের বর্ত্তমান যুগটি তর্জ্জমার যুগ বলে' গ্রাহ্য করে' নিয়ে, ঐ অনুবাদ কার্য্যটি ষোলআনা ভাল রকম করার উপর আমাদের পুরুষার্থ এবং কৃতীত্ব নির্ভর করছে।

পরের জিনিষকে আপনার করে' নেবার নামই তর্জ্জমা। সুতরাং ও কার্য্য করাতে আমাদের কোন ক্ষতি নেই, এবং নিজেদের দৈন্যের পরিচয় দেওয়া হয় মনে করেও লজ্জিত হবার কারণ নেই। কেন না নিজের ঐশ্বর্য্য না থাক্‌লে লোকে যেমন দান করতে পারে না, তেমনি, নেবার যথেষ্ট ক্ষমতা না থাক্‌লে লোকে গ্রহণও কর্‌তে পারে না। স্মৃতির মতে দাতা এবং গ্রহীতার পরস্পর যোগ না হলে দানক্রিয়া সম্পন্ন হয় না। এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। মৃত ব্যক্তি দাতাও হতে পারে না, গ্রহীতাও হতে পারে না; কারণ দান এবং গ্রহণ উভয়ই জীবনের ধর্ম্ম। বুদ্ধদেব, যিশুখৃষ্ট, মহম্মদ প্রভৃতি মহাপুরুষদের নিকট কোটি কোটি মানব ধর্ম্মের জন্য ঋণী। কিন্তু তাঁদের দত্ত অমূল্য রত্ন তাঁদের হাত থেকে গ্রহণ কর্‌বার ক্ষমতা কেবলমাত্র তাঁদের সমকালবর্ত্তী জনকতক মহাপুরুষেরই ছিল। এবং শিষ্যপরম্পরায় তাঁদের মত আজ লক্ষ লক্ষ লোকের ঘরের সামগ্রী হয়ে উঠেছে। পৃথিবীতে গুরু হওয়া বেশি শক্ত কিম্বা শিষ্য হওয়া বেশি শক্ত, বলা কঠিন। যাঁদের বেদান্ত শাস্ত্রের সঙ্গে স্বল্পমাত্রও পরিচয় আছে তাঁরাই জানেন যে, পুরাকালে গুরুরা কাউকে ব্রহ্মবিদ্যা দান করবার পূর্ব্বে, শিষ্যের সে বিদ্যা গ্রহণ করবার উপযোগিতা সম্বন্ধে কিরূপ কঠিন পরীক্ষা করতেন। উপনিষদকে গুহ্যশাস্ত্র করে' রাখবার এই উদ্দেশ্যই যে, যাদের শিষ্য হবার সামর্থ্য নেই, এমন লোকেরা ব্রহ্মবিদ্যা নিয়ে বিপ্তে ফলাতে না পারে। এ কথা সম্পূর্ণ সত্য যে শক্তিমান গুরু হবার একমাত্র উপায়— পূর্ব্বে ভক্তিমান শিষ্য হওয়া। বর্ত্তমান যুগে আমরা ভক্তি পদার্থটি ভুলে গেছি, আমাদের মনে আছে শুধু অভক্তি ও অতিভক্তি। এ দুয়ের একটিও সাধুতার লক্ষণ নয়, তাই ইংরাজি-শিক্ষিত লোকের পক্ষে অপর কাউকে শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব।

আমরা কথায় বলি, জ্ঞানলাভ করি, কিন্তু আসলে জ্ঞান উত্তরাধিকারী সত্ত্বে কিম্বা প্রসাদ স্বরূপে লাভ কর্‌বার পদার্থ নয়। আমরা সজ্ঞানে জন্মলাভ করিনে, কেবল জ্ঞান অর্জ্জন কর্‌বার ক্ষমতামাত্র নিয়ে ভূমিষ্ঠ হই। জানা ব্যাপারটি মানসিক চেষ্টার অধীন, জ্ঞান একটি মানসিক ক্রিয়া মাত্র, এবং সে ক্রিয়া ইচ্ছাশক্তির একটি বিশেষ বিকাশ। মন পদার্থটি একটি বেওয়ারিশ শ্লেট নয় যার উপর বাহ্যজগৎরূপ পেন্‌সিল শুধু হিজিবিজি কেটে যায়; অথবা ফোটোগ্রাফিক প্লেটও নয়, যা কোনরূপ অন্তর্গূঢ় রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা বাহ্যজগতের ছায়া ধরে' রাখে। যে প্রক্রিয়ার বলে আমরা, জ্ঞাতব্য বিষয়কে নিজের ইচ্ছা এবং ক্ষমতা অনুসারে নিজের অন্তর্ভূত করে নিতে পারি, তারই নাম জ্ঞান। আমরা মনে মনে যা তর্জ্জমা করে' নিতে পারি, তাই আমরা যথার্থ জানি; যা পারিনে, তার শুধু নামমাত্রের সঙ্গে আমাদের পরিচয়। ঐ তর্জ্জমা করার শক্তির উপরই মানুষের মনুষ্যত্ব নির্ভর করে। সুতরাং একাগ্রভাবে তর্জ্জমা কার্য্যে ব্রতী

হওয়াতে আমাদের পুরুষকার বৃদ্ধি পাবে বই ক্ষীণ হবে না।

আমি পূর্ব্বে বলেছি যে, আমরা সকলে মিলে জীবনের সকল ক্ষেত্রেই, হয় ইউরোপীয় নয় আর্য্য সভ্যতার তর্জ্জমা কর্‌বার চেষ্টা করছি, কিন্তু ফলে আমরা তর্জ্জমা না করে' শুধু নকলই করছি। নকল করার মধ্যে কোনরূপ গৌরব বা মনুস্যত্ব নেই। মানসিক শক্তির অভাববশতঃই মানুষে যখন কোনও জিনিষ রূপান্তরিত করে' নিজের জীবনের উপযোগী করে' নিতে পারে না, অথচ লোভবশতঃ লাভ কর্‌তে চায়, তখন তার নকল করে। নকলে বাইরের পদার্থ বাইরেই থাকে, আমাদের অন্তর্ভূত হয় না, তার দ্বারা আমাদের মনের এবং চরিত্রের কান্তি পুষ্ট হয় না, ফলে মানসিক শক্তির যথেষ্ট চর্চ্চার অভাববশতঃ দিন দিন সে শক্তি হ্রাস হতে থাকে। ইউরোপীয় সভ্যতা আমরা নিজেদের চারিপাশে জড় করে'ও সেটিকে অন্তরঙ্গ কর্‌তে পারিনি, তার স্পষ্ট প্রমাণ এই যে, আমরা মাঝে মাঝে সেটিকে ঝেড়ে ফেলবার জন্য ছট্‌ফট্‌ করি। মানুষে যা আত্মসাৎ করতে পারে না তাই ভস্মসাৎ কর্‌তে চায়। আমরা মুখে যাই বলিনে কেন, কাজে, পূর্ব্ব সভ্যতা নয়, পশ্চিম সভ্যতারই নকল করি; তার কারণ ইউরোপীয় সভ্যতা আমাদের চোখের সুমুখে সশরীরে বর্ত্তমান, অপর পক্ষে আর্য্য-সভ্যতার প্রেতাত্মা মাত্র অবশিষ্ট। প্রেতাত্মাকে আয়ত্ত কর্‌তে হ'লে বহু সাধনার আবশ্যক। তা ছাড়া প্রেতাত্মা নিয়ে যাঁরা কারবার করেন তাঁরা সকলেই জানেন যে, দেহমুক্ত আত্মার সম্পর্কে আস্‌তে হ'লে অপর একটি দেহতে তাকে আশ্রয় দেওয়া চাই; একটি প্রাণীর মধ্যস্থতা ব্যতীত, প্রেতাত্মা আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন না। আমাদের সমাজের প্রাচীন দেহ আছে বটে, কিন্তু প্রাণ নেই। শব প্রেতাত্মা কর্ত্তৃক আবিষ্ট হ'লে মানুষ হয় না, বেতাল হয়। বেতাল-সিদ্ধ হবার দুরাশা খুব কম লোকেই রাখে, কাজেই শুধু মন নয়, পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা গ্রাহ্য যে ইউরোপীয় সভ্যতা আমাদের প্রত্যক্ষ রয়েছে, সাধারণতঃ লোকে তারই অনুকরণ করে। অনুকরণ ত্যাগ করে' যদি আমরা এই নব-সভ্যতার অনুবাদ কর্‌তে পারি, তাহলেই সে সভ্যতা নিজস্ব হ'য়ে উঠবে, এবং ঐ ক্রিয়ার সাহায্যেই আমরা নিজেদের প্রাণের পরিচয় পাব, এবং বাঙ্গালীর বাঙ্গালিত্ব ফুটিয়ে তুলব।

তর্জ্জমার আবশ্যকত্ব স্থাপনা করে', এখন কি উপায়ে আমরা সে বিষয়ে কৃতকার্য্য হব সে সম্বন্ধে আমার দু'চারটি কথা বল্‌বার আছে।

সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস যে, কথার চাইতে কাজ শ্রেষ্ঠ। এ বিশ্বাস বৈষয়িক হিসাবে সত্য, এবং আধ্যাত্মিক হিসাবে মিথ্যা। মানুষমাত্রেই নৈসর্গিক প্রবৃত্তির বলে সংসার যাত্রার উপযোগী সকল কার্য্য করতে পারে; কিন্তু তার অতিরিক্ত কর্ম্ম, যার ফল একে নয়, দশে লাভ করে, তা' কর্‌বার জন্য মনোবল আবশ্যক। সমাজে সাহিত্যে যা কিছু মহৎকার্য্য অনুষ্ঠিত হয়েছে, তার মূলে মন পদার্থটি বিদ্যমান। যা মনে ধরা পড়ে তাই প্রথমে কথায় প্রকাশ পায়, সেই কথা অবশেষে কার্য্যরূপে পরিণত হয়;

কথার সূক্ষ্মশরীর কার্য্যরূপ স্থূলদেহ ধারণ করে। আগে দেহটি গড়ে' নিয়ে, পরে তার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টাটি একেবারেই বৃথা। কিন্তু আমরা রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্ম, সাহিত্য, সকল ক্ষেত্রেই ইউরোপীয় সভ্যতার প্রাণের সন্ধান না করে' শুধু তার দেহটি আয়ত্ত করবার চেষ্টা করায় নিত্যই ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্ট হচ্ছি। প্রাণ নিজের দেহ নিজের রূপ নিজেই গড়ে' নেয়। নিজের অন্তর্নিহিত প্রাণ-শক্তির বলেই বীজ ক্রমে বৃক্ষরূপ ধারণ করে। সুতরাং আমরা যদি ইউরোপীয় সভ্যতার প্রাণে প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে পারি, তাহলেই আমাদের সমাজ নব কলেবর ধারণ করবে। এই নবসভ্যতাকে মনে সম্পূর্ণরূপ পরিপাক করতে পারলেই আমাদের কান্তি পুষ্ট হবে। কিন্তু যতদিন সে সভ্যতা আমাদের মুখস্থ থাক্‌বে কিন্তু উদরস্থ হবে না, ততদিন তার কোন অংশই আমরা জীর্ণ করতে পারব না। আমরা যে, ইউরোপীয় সভ্যতা কথাতেও তর্জ্জমা করতে পারিনি, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই যে, আমাদের নূতন শিক্ষালব্ধ মনোভাবসকল, শিক্ষিত লোকদেরই রসনা আশ্রয় করে' রয়েছে, সমগ্র জাতির মনে স্থান পায় নি। আমরা ইংরেজিভাব ভাষায় তর্জ্জমা করতে পারিনে বলেই, আমাদের কথা দেশের লোকে বোঝে না,—বোঝে শুধু ইংরেজি-শিক্ষিত লোকে। এ দেশের জনসাধারণের নেবার ক্ষমতা কিছু কম নয়, কিন্তু আমাদের কাছ থেকে তারা যে কিছু পায় না, তার একমাত্র কারণ আমাদের অন্যকে দেবার মত কিছু নেই— ... নিজস্ব বল্‌তে কোন পদার্থ নেই—

আমরা পরের সোনা কানে দিয়ে অহঙ্কারে মাটিতে পা দিইনে। অপরপক্ষে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের দেবার মত ধন ছিল, তাই তাঁদের মনোভাব নিয়ে আজও সমগ্র জাতি ধনী হয়ে আছে। ঋষিবাক্যসকল লোক-মুখে এমনি সুন্দর ভাবে তর্জ্জমা হয়ে গেছে, যে তা আর তর্জ্জমা বলে' কেউ বুঝতে পারেন না। এদেশের অশিক্ষিত লোকের রচিত বাউলের গান কাউকে আর উপনিষদের ভাষায় অনুবাদ করে' বোঝাতে হয় না, অথচ একই মনোভাব ভাষান্তরে বাউলের গানে এবং উপনিষদে দেখা দেয়। আত্মা যেমন এক দেহ ত্যাগ করে' অপর দেহ গ্রহণ করলে, পূর্ব্বদেহের স্মৃতিমাত্রও রক্ষা করে না, মনোভাবও যদি তেমনি এক ভাষার দেহত্যাগ করে' অপর একটি ভাষার দেহ অবলম্বন করে, তাহলেই সেটি যথার্থ অনূদিত হয়।

উপযুক্ত তর্জ্জমার গুণেই বৈদান্তিক মনোভাবসকল হিন্দুসন্তানমাত্রেরই মনে অল্পবিস্তর জড়িয়ে আছে। এদেশে এমন লোক বোধ হয় নেই, যার মনটিকে নিংড়ে নিলে অন্ততঃ এক ফোঁটাও গৈরিক রস না পাওয়া যায়। আর্য্য সভ্যতার প্রেতাত্মা উদ্ধার করবার চেষ্টাটা একেবারেই অনর্থক, কারণ তার আত্মাটি আমাদের দেহাভ্যন্তরে সুষুপ্ত অবস্থায় রয়েছে—যদি আবশ্যক হয় ত সেটিকে সহজেই জাগিয়ে নেওয়া যেতে পারে। ঠিক কথাটি বল্‌তে পারলে অপরের মনের দ্বার, আরব্য উপন্যাসের দস্যুদের ধন-ভাণ্ডারের দ্বারের মত, আপনি খুলে যায়। আমরা ইংরেজি-শিক্ষিত লোকেরা জন-

সাধারণের মনের দ্বার খোলবার সঙ্কেত জানিনে, কারণ আমরা জানবার চেষ্টাও করিনে। যে সকল কথা আমাদের মুখের উপর আলগা হয়ে রয়েছে, কিন্তু মনে প্রবেশ করেনি, সেগুলি আমাদের মুখ থেকে খসে' পড়লেই যে অপরের অন্তরে প্রবেশ লাভ করবে—এ আশা বৃথা।

আমরা যে আমাদের শিক্ষালব্ধ ভাবগুলি তর্জ্জমা করতে অকৃতকার্য্য হয়েছি, তার প্রমাণ ত সাহিত্যে এবং রাজনীতিতে দুবেলাই পাওয়া যায়। যেমন সংস্কৃত নাটকের প্রাকৃত, সংস্কৃত "ছায়ার" সাহায্য ব্যতীত বুঝ্‌তে পারা যায় না, তেমনি আমাদের নব-সাহিত্যের কৃত্রিম প্রাকৃত, ইংরাজি ছায়ার সাহায্য ব্যতীত বোঝা যায় না। সমাজে না হোক্, সাহিত্যে "চুরি বিদ্যে বড় বিদ্যে যদি না পড়ে ধরা।" কিন্তু আমাদের নব-সাহিত্যের বস্তু যে চোরাই মাল, তা ইংরাজি-সাহিত্যের পাঠকমাত্রেরই কাছে ধরা পড়ে। আমরা ইংরাজি সাহিত্যের সোনা রূপো যা চুরি করি, তা গলিয়ে নিতেও শিখিনি। এইত গেল সাহিত্যের কথা। রাজনীতি বিষয়ে আমাদের সকল ব্যাপার যে আগাগোড়াই নকল, এ বিষয়ে বোধ হয় আর দু'মত নেই, সুতরাং সে সম্বন্ধে বেশি কিছু বলা নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন।

আমাদের মনে মনে বিশ্বাস যে, ধর্ম্ম এবং দর্শন এই দুটি জিনিষ আমাদের একচেটে, এবং অন্য কোন বিষয়ে না হোক্, এই দুই বিষয়ে আমাদের সহজ কৃতীত্ব কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। ইংরেজি-শিক্ষিত ভারত-বাসীদের এ বিশ্বাস যে সম্পূর্ণ অমূলক, তার প্রমাণস্বরূপ দেখান যেতে পারে যে, ঐ শ্রেণীর লোকের হাতে মনুর ধর্ম্ম religion হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ ভুল তর্জ্জমার বলে ব্যবহার-শাস্ত্র আধ্যাত্মিক ব্যাপার হয়ে উঠেছে। ধর্ম্মশাস্ত্র এবং মোক্ষশাস্ত্রের ভেদ-জ্ঞান আমাদের লুপ্ত হয়েছে। ধর্ম্মের অর্থ ধরে' রাখা, এবং মোক্ষের অর্থ ছেড়ে দেওয়া, সুতরাং এ দু'য়ের কাজ যে এক নয়, তা শুধু ইংরেজিনবিশ আর্য্য-সন্তানরাই বুঝতে পারেন না।

গীতা আমাদের হাতে পড়্‌বামাত্র তার হরিভক্তি উড়ে যায়। সেই কারণে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত "গীতায় ঈশ্বরবাদের" প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে নব্য পণ্ডিতসমাজে শুধু বিবাদ-বিসম্বাদের সৃষ্টি করেছিলেন। তারপর গীতার কর্ম্ম ইংরাজি work রূপ ধারণ করে' আমাদের কাছে গ্রাহ্য হয়েছে; অর্থাৎ কর্ম্ম কাণ্ডের কর্ম্ম কাণ্ডহীন হয়েই আমাদের কাছে উচ্চ বলে গণ্য হয়েছে। এই ভুল তর্জ্জমার প্রসাদেই, যে কর্ম্মের উদ্দেশ্য পরের হিত এবং নিজের আত্মার উন্নতি সাধন—পরলোকের অভ্যুদয়ও নয়—সেই কর্ম্ম আজকাল ইহলোকের অভ্যুদয়ের জন্য ধর্ম্ম বলে' গ্রাহ্য হয়েছে। যে কাজ মানুষে পেটের দায়ে নিত্য করে' থাকে, তা করা কর্ত্তব্য এইটুকু শেখাবার জন্য, ভগবানের যে ভোগায়াতন দেহ ধারণ করে' পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবার আবশ্যকতা ছিল না,—এ সোজা কথাটাও আমরা বুঝতে পারিনে। ফলে আমাদের কৃত গীতার অনুবাদ বক্তৃতাতেই চলে, জীবনে কোন কাজে লাগে না।

একদিকে আমরা এ দেশের প্রাচীন মত-গুলিকে যেমন ইংরেজি পোষাক পরিয়ে তার চেহারা বিলকুল বদ্‌লে দিই, তেমনি অপর দিকে, ইউরোপীয় দর্শন বিজ্ঞানকেও আমরা সংস্কৃত ভাষার ছদ্মবেশ পরিয়ে লোকসমাজে বার করি।

নিত্যই দেখ্‌তে পাই যে, খাঁটি জর্ম্মান মাল স্বদেশী বলে' পাঁচজনে সাহিত্যের বাজারে কাটাতে চেষ্টা কর্‌ছে। হেগেলের দর্শন শঙ্করের নামে বেনামি করে' অনেকে কতক পরিমাণে অজ্ঞ লোকদের কাছে চালিয়েও দিয়েছেন। আমাদের মুক্তির জন্য হেগেলেরও আবশ্যক আছে, শঙ্করেরও আবশ্যক আছে; কিন্তু তাই বলে' হেগেলের মস্তক মুণ্ডন করে' তাঁকে আমাদের স্বহস্তরচিত শতগ্রন্থিময় কন্থা পরিয়ে শঙ্কর বলে' সাহিত্য-সমাজে পরিচিত করে' দেওয়াতে কোন লাভ নেই। হেগেলকে ফকির না করে' যদি শঙ্করকে গৃহস্থ কর্‌তে পারি, তা'তে আমাদের উপকার বেশী।

বিজ্ঞান সম্বন্ধেও ঐরূপ ভুল তর্জ্জমা অনেক অনর্থ ঘটিয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ Evolutionএর কথাটা ধরা যাক্‌। ইভলিউসানের দোহাই না দিয়ে আমরা আজকাল কথাই কইতে পারিনে। আমরা উন্নতিশীল হই আর স্থিতিশীলই হই, আমাদের সকলপ্রকার শীলই ঐ ইভলিউসন আশ্রয় করে' রয়েছে। সুতরাং ইভলিউসানের যদি আমরা ভুল অর্থ বুঝি তাহলে, আমাদের সকল কার্য্যই যে আরম্ভেতে পর্য্যবসিত হবে সেত ধরা কথা। বাঙ্গলায় আমরা ইভলিউ-সান "ক্রম-বিকাশবাদ" "ক্রমোন্নতিবাদ" ইত্যাদি শব্দে তর্জ্জমা করে' থাকি। ঐরূপ তর্জ্জমার ফলে, আমাদের মনে এই ধারণা জন্মে গেছে যে, মাসিক পত্রের গল্পের মত, জগৎ পদার্থটি ক্রমশঃ প্রকাশ্য। সৃষ্টির বই-খানি আদ্যোপান্ত লেখা হয়ে গেছে, শুধু প্রকৃতির ছাপাখানা থেকে অল্প অল্প করে' বেরচ্চে, এবং যে অংশটুকু বেরিয়েছে তার থেকেই তার রচনাপ্রণালীর ধরণ আমরা জান্‌তে পেরেছি। সে প্রণালী হচ্ছে ক্রমোন্নতি; অর্থাৎ যত দিন যাবে, তত সমস্ত জগতের, এবং তার অন্তর্ভূত জীবজগতের, এবং তার অন্তর্ভূত মানবসমাজের, এবং তার অন্তর্ভূত প্রতি মানবের, উন্নতি অনিবার্য্য। প্রকৃতির ধর্ম্মই হচ্ছে আমাদের উন্নতি সাধন করা। সুতরাং আমাদের তার জন্য নিজের কোনও চেষ্টার আবশ্যক নেই। আমরা শুয়েই থাকি আর ঘুমিয়েই থাকি, জাগতিক নিয়মের বলে আমাদের উন্নতি হবেই। এই কারণেই এই ক্রমোন্নতিবাদ আকারে ইভলিউসান আমাদের স্বাভাবিক জড়তা এবং নিশ্চেষ্টতার অনুকূল মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। তা ছাড়া এই "ক্রম" শব্দটি আমাদের মনের উপর এমনি আধিপত্য স্থাপন করেছে যে, সেটিকে অতিক্রম করা পাপের মধ্যে গণ্য হয়ে পড়েছে। তাই আমরা নানা কাজের উপক্রমণিকা করেই সন্তুষ্ট থাকি, কোন বিষয়েরই উপসংহার করাটা কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য করিনে; প্রস্তাবনাতেই আমাদের জীবন-নাটকের অভিনয় শেষ হয়ে যায়। কিন্তু আসলে ইভলিউসান, ক্রম-বিকাশও নয়, ক্রমোন্নতিও নয়। কোনও পদার্থকে প্রকাশ করবার

শক্তি জড়প্রকৃতির নেই, এবং তার প্রধান কাজই হচ্ছে সকল উন্নতির পথে বাধা দেওয়া। ইভলিউসান জড়জগতের নিয়ম নয়, জীবজগতের ধর্ম্ম। ইভলিউসানের মধ্যে শুধু ইচ্ছাশক্তিরই বিকাশ পরিস্ফুট। ইভলিউসান অর্থে দৈব নয়,—পুরুষকার। তাই ইভলিউসানের জ্ঞান মানুষকে অলস হতে শিক্ষা দেয় না, সচেষ্ট হতে শিক্ষা দেয়। আমরা ভুল তর্জ্জমা করে' ইভলিউসানকে আমাদের চরিত্রহীনতার সহায় করে' এনেছি।

ইউরোপীয় সভ্যতার হয় আমরা তর্জ্জমা কর্তে কৃতকার্য্য হচ্ছিনে, নয় ভুল তর্জ্জমা কর্ছি. তাই আমাদের সামাজিক জীবনে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না, বরং অপচয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। অথচ আমাদের বিশ্বাস যে আমরা দু'পাত ইংরাজী পড়ে' নব্যব্রাহ্মণ সম্প্রদায় হয়ে উঠেছি। তাই আমরা নিজেদের শিক্ষার দৌড় কত সে বিষয়ে লক্ষ্য না করে', জনসাধারণকে শিক্ষা দিবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছি। এ সত্য আমরা ভুলে যাই যে, ইউরোপীয় সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান থেকে যদি আমরা নতুন প্রাণ লাভ করে' থাকতুম, তাহলে জনসাধারণের মধ্যে আমরা নব প্রাণের সঞ্চারও করতে পারতুম। আমরা অধ্যয়ন করে' যা লাভ করেছি, তা অধ্যাপনার দ্বারা দেশশুদ্ধ লোককে দিতে পারতুম। আমরা আমাদের Cultureকে nationalise কর্তে পারিনি বলেই, গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিচ্ছি যে আইনের দ্বারা বাধ্য করে' জনসাধারণকে শিক্ষা গোখ্‌লে যে হুজুগটির মুখপাত্র হয়েছেন, তার মূলে ইউরোপের নকল ছাড়া আর কোনও মনোভাব নেই। তাই গবর্ণমেণ্টকে ভজাবার জন্য, দিবারাত্রি খালি বিলেতি নজিরই দেখান হচ্ছে। শিক্ষা শব্দের অর্থ শুধু লিখ্‌তে ও পড়্‌তে শেখা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। গবর্ণমেণ্টই স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা করে' আমাদের লিখতে পড়্‌তে শিখিয়েছেন। সুতরাং গবর্ণমেণ্টকেই গ্রামে গ্রামে স্কুল স্থাপনা করে' রাজ্যিশুদ্ধ ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাতেই হবে, এই হচ্ছে আমাদের হাল রাজনৈতিক আবদার। যতদিন পর্য্যন্ত আমরা আমাদের নব-শিক্ষা মজ্জাগত কর্‌তে না পার্‌ব, ততদিন জনসাধারণকে পড়্‌তে শিখিয়ে তাদের যে কি বিশেষ উপকার করা হবে তা ঠিক বোঝা যায় না। আমরা আজ পর্য্যন্ত ছোট ছেলেদের উপযুক্ত একখানিও পাঠ্য পুস্তক রচনা কর্‌তে পারিনি। পড়তে শিখ্‌লে, এবং পড়বার অবসর থাকলে, এবং বই কেন্‌বার সঙ্গতি থাকলে, প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত চাষার ছেলেরা সেই রামায়ণ মহাভারতই পড়্‌বে,—আমাদের নব-শিক্ষার ভাগ তারা কিছু পাবে না। রামায়ণ মহাভারতের কথা যে ব'য়ে পড়ার চাইতে মুখে শোনা অনেক বেশি শিক্ষাপ্রদ, তা নব্য-শিক্ষিত ভারতবাসী ছাড়া আর কেউ অস্বীকার কর্‌বেন না। মুখের বাক্যে প্রাণ আছে, লেখার ধ্বনিহীন বাক্য আধমরা। সে যাই হোক্, আমাদের দেশের লৌকিক শিক্ষার জ্ঞান যদি আমাদের থাকৃত, এবং সেই শিক্ষার প্রতি অযথা অবজ্ঞা যদি আমাদের মনে না স্থান পেত, তাহলে না জেনে

চিরাগত লৌকিক শিক্ষা নষ্ট করতে আমরা উদ্যত হতুম না। সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে তিনিই জানেন যে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা লোকাচার, লৌকিক ধর্ম্ম, লৌকিক ন্যায়, এবং লৌকিক বিদ্যাকে কিরূপ মান্য করতেন। কেবলমাত্র বর্ণপরিচয় হলেই লোকে শিক্ষিত হয় না; কিন্তু ঐ পরিচয় লাভ করতে গিয়ে যে বর্ণধর্ম্ম হারানো অসম্ভব নয়, তা সকলেই জানেন। মাসিক পাঁচটাকা বেতনের গুরু নামক গরুর দ্বারা তাড়িত হওয়া অপেক্ষা চাষার ছেলের পক্ষে গরু তাড়ানো শ্রেয়। "ক" অক্ষর যে কোন লোকের পক্ষেই গোমাংস হওয়া উচিত নয়, এ কথা আমরা সকলেই মানি, কিন্তু "ক" অক্ষর যে আমাদের রক্তমাংস হওয়া উচিত, এ ধারণা সকলের নেই। কেবল স্বাক্ষর করতে শেখার চাইতে নিরক্ষর থাকাও ভাল, কারণ পৃথিবীতে আঙ্গুলের ছাপ রেখে যাওয়াতেই মানবজীবনের সার্থকতা। আমাদের আহার, পরিচ্ছদ, গৃহ, মন্দির, সব জিনিষেই আমাদের নিরক্ষর লোকদের আঙ্গুলের ছাপ রয়েছে। শুধু আমরা শিক্ষিত সম্প্রদায়ই ভারতমাতাকে পরিষ্কার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে যাচ্ছি। পতিতের উদ্ধার কার্য্যটি খুব ভাল; ওর একমাত্র দোষ এই যে, যাঁরা পরকে উদ্ধার করবার জন্য ব্যস্ত, তাঁরা নিজেদের উদ্ধার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। আমরা যতদিন শুধু ইংরাজির নীচে স্বাক্ষর দিয়েই ক্ষান্ত থাকব, কিন্তু সাহিত্যে আমাদের আঙ্গুলের ছাপ ফুটবে না, তত দিন আমরা নিজেরাই যথার্থ শিক্ষিত হব না, পরকে শিক্ষা দেওয়া ত দূরের কথা। আমি জানি যে আমাদের জাতিকে খাড়া করবার জন্য অসংখ্য সংস্কারের দরকার আছে। কিন্তু আর যে কোন সংস্করণের আবশ্যক থাক্ না কেন, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হাজার হাজার বটতলার সংস্করণের আবশ্যক নেই।

বীরবল।

পূর্ণিমার খেয়াল

(১)

আজি সখি জেলো'নাকো বিজুলির বাতি।
খুলে দাও সব দ্বার ঘর আজ হো'ক বার,
বিলায় আলোক মেলা পূর্ণিমার রাতি॥

(২)

ঝুলিছে আকাশে দেখ চাঁদের লণ্ঠন।
চারি পাশে তারে ঘিরি তারার দেয়ালগিরি,
গগনের গায়ে করে কিরণ বণ্টন॥

(৩)

ফোটে যেন লক্ষ ফুল স্বর্গ-বাগিচায়।
অথবা জরির বুটা সব সাচ্চা নয় ঝুঁটা,
চন্দ্রের সভায় পাতা নীল গালিচায়॥

(৪)

নানা রূপ ধরে আজি বহুরূপী ইন্দু।
কখনো মন্দির শিরে নেমে এসে ধীরে ধীরে,
বসে যেন আকারের শিরে চন্দ্রবিন্দু॥

(৫)

যামিনীর গণ্ড চুমি মহা অহঙ্কার !
আলো ফেলে তার চুলে কভু থাকে যেন ঝুলে,
কামিনীর কর্ণভূষা স্বর্ণ অলঙ্কার ॥

(৬)

সোনার কমল কভু, লুপ্ত যার বোঁটা।
উদাস আকাশ ভালে রচে কভু স্ব-খেয়ালে,
চন্দনের পঙ্কে লিপ্ত কেশরের ফোঁটা ॥

(৭)

চন্দ্রের রমণী যত কৃত্তিকা ভরণী,
শীধু পানে হেসে হেসে বিধু পানে আসে ভেসে,
জ্যোৎস্না-সাগরে বেয়ে সোনার তরণী ॥

(৮)

শশি পশি সুরাপাত্রে হয়ে প্রতিবিম্ব,
লাল হয়ে মদ-রাগে অধীর চুম্বন মাগে
সুরাসিক্ত তব সখি অধরের বিম্ব ॥

(৯)

আজিকার এ পর্ব্বের নায়ক শশাঙ্ক,
অভিনয় সারারাত করে' যাবে প্রতি পাত,
আনন্দের নাটকের সম্পূর্ণ দশাঙ্ক ॥

(১০)

আমি আছি, তুমি আছ, আর আছে চন্দ্র।
পাত্রে ঢালো পোখরাজ কোলে তুলে এসরাজ,
সুরা আর সুরে মিশ্র গাও গীত মন্দ্র ॥

(১১)

এ রাতে কে কা'র মনে শাসন বারণ ?
তুমি আমি নিশি ভোর থাকিব নেশায় ভোর,
বারোমাস উপবাস, আজিকে পারণ ॥

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

সাময়িক প্রসঙ্গ

কংগ্রেস ও অন্যান্য সভা

এই বৎসরে সপ্তবিংশ জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন নির্ব্বিঘ্নে মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গেল।

বড়লাট-কৌন্সিলের সদস্য মাননীয় মিঃ মজরুল হক অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে, উপস্থিত প্রতিনিধি-বর্গকে সাদরে অভ্যর্থনাকল্পে যে বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহা বড় উপাদেয়।

বেহারের প্রাচীনত্বের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে "সমগ্র বেহার প্রদেশ প্রত্নতত্ত্বের আবাসভূমি। পাটনা সহরে পৃথিবী-খ্যাত রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের রাজধানী ছিল। পাটলিপুত্রে যে সকল রাজবংশ ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করিয়াছেন, সে ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে বিস্ময়াভিভূত হইতে হয়। পৌরাণিককালের কথা দূরে থাকুক, ঐতিহাসিকগণ যে সময় হইতে ইতিহাস আরম্ভ হইয়াছে বলেন সে সময়ের কথা ধরিলে দেখা যায় যে মগধ, অঙ্গ ও বৈশালী আজি পাটনা, ভাগলপুর এবং ত্রিহুত নামে খ্যাত, তৎপরে বিম্বিসার ও তৎপুত্র অজাতশত্রু মগধের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়া মগধের প্রাধান্যের পথ প্রশস্ত করেন। অজাতশত্রুই পাটলির দুর্গ নির্ম্মাণ করেন এবং এই পাটলিপুত্রেই চন্দ্রগুপ্ত ও তৎপুত্র অশোক রাজত্ব করেন। এই স্থান হইতেই অশোকের জগদ্ব্যাপী অনুশাসনাবলী প্রচারিত হইয়াছিল এবং এই বেহার প্রদেশেই জৈনধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা মহাবীর জন্মগ্রহণ করেন। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা গৌতমও বেহারেরই অন্তর্গত গয়ায় বুদ্ধত্বলাভ করেন এবং বেহারই তাঁহার লীলাক্ষেত্র। পাটলিপুত্রেই নন্দ, মৌর্য্য, শুঙ্গ ও গুপ্তবংশ

ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন। পরে, বহুকাল পরে মুসলমান নরপতি সেরসাহ ও পরে ঔরংজেবের পুত্র রাজকুমার আজিমুশন এই স্থানের উন্নতি সাধন করেন। শেষোক্ত ব্যক্তিই পাটনার নিজ নামানুসারে আজিমাবাদ নাম প্রদান করেন।"

মাননীয় হকের পরে সপ্তবিংশ জাতীয় মহাসমিতির সভাপতি মাননীয় মধোলকার মহোদয় তাঁহার বক্তৃতা পাঠ করেন। মুদ্রিত পুস্তকের ৬০ পৃষ্ঠাব্যাপী দীর্ঘ এই বক্তৃতার ভাষা, ভাব, বিষয়, জাতীয় মহাসমিতির সভাপতিরই উপযুক্ত।

জাতীয় মহাসমিতির সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেকগুলি সভাসমিতির রীতিমত বাৎসরিক অনুষ্ঠান এই সময়ে বাঁকিপুরে হইয়া গিয়াছে।

সামাজিক সমিতির অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত রামাবতার শর্ম্মা এম্, এ। ইনি এখন পাটনা গবর্ণমেণ্ট কলেজের প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক। পণ্ডিত মহাশয়ের ন্যায় শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন, বাল্যবিবাহের দোষ, বিধবাবিবাহের আবশ্যকতা, পর্দ্দাপরিহার প্রভৃতি বিষয়ে যে উৎকৃষ্ট বক্তৃতা পাঠ করেন, আশা করি, তাহা পাঠ করিয়া যাঁহারা শাস্ত্রের বিশেষ ধার ধারেন না অথচ শাস্ত্রাভিমানী, তাঁহাদের দিব্যচক্ষু উন্মীলিত হইয়া দেশের ও দশের উপকার হইবে।

লাহোরের ব্যারিষ্টার লালা হরকিষণ লাল বি, এ মহাশয় শিল্পোন্নতি সমিতির আসনে অধিষ্ঠান করিয়া বর্ত্তমান ভারতে শিল্পোন্নতির আবশ্যকতা ও আনুষঙ্গিক অনেক বিষয় আলোচনা করেন। তাঁহার বক্তৃতা অত্যন্ত সারগর্ভ হইয়াছিল। এই সমিতির বিশেষত্ব এই যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের ব্যক্তিবর্গ এই সভায় ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন। এ বৎসর মান্দ্রাজের লাল পাটন, বেহার প্রদেশের চৌথ মহাজনী সমিতির সহকারী মৌলবি মহিউদ্দিন, পাটনা কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপক মিঃ রাসেল, বহরমপুর কলেজের অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, পাটনা কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার প্রভৃতি নানাবিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন।

বাঁকিপুরে এবার মাদক নিবারণী সভারও অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর পূর্ণেন্দু-নারায়ণ সিংহ মহাশয় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ছিলেন এবং কলিকাতার মাননীয় ডাক্তার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় সভাপতি হইয়াছিলেন। এই বৈঠকে মান্দ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি অনেক প্রদেশের বক্তাগণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

২৬শে, ২৭শে, ২৮শে, অর্থাৎ যে তিন তারিখে কংগ্রেসের অধিবেশন হয় সেই কয়দিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের সুপ্রতিষ্ঠিত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডি, এন্, মল্লিক মহোদয় এই সভায় সভাপতির আসনে বৃত হইয়া একটী চমৎকার বক্তৃতা প্রদান করেন।

২৯শে তারিখে ভারতীয় স্ত্রীধর্ম্মমণ্ডলীর এক অধিবেশন হয়। মিসেস মধোলকার মহোদয়া ইহাতে সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। লাহোরের শ্রীযুক্তা সরলা দেবী, লক্ষ্ণৌর শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষ, মান্দ্রাজের শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী বাই, বাঁকিপুরের শ্রীমতী শকুন্তলা দেবী, চেরাপুঞ্জীর শ্রীমতী ইন্দুবালা চৌধুরী প্রভৃতি এস্থলে বক্তৃতা করেন। হিন্দু, মুসলমান বেহারী লইয়া প্রায় তিন শতাধিক মহিলা এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমতী অকিঞ্চন বালা পাল, বি, এ কে সেক্রেটারী রূপে এস্থানে একটি শাখা সমিতি স্থাপিত হইয়াছে।

২৯শে তারিখে Depressed Classes Missionএর এক সভা হয়। এই সভায় রায় বাহাদুর পূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ সভাপতির আসন সুশোভিত করিয়া ছিলেন এবং পণ্ডিত রামভজ দত্ত চৌধুরী, লাহোরের অবিনাশচন্দ্র মজুমদার, করাচির ডাক্তার হাসারাম প্রভৃতি সভার কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন।

এতদ্ব্যতীত এই সময় সনাতন ধর্ম্মসভা, আর্য্যসভা প্রভৃতি আরও কয়েকটি সভা সমিতির অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

এই সকল জাতীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে প্রবাসী বাঙ্গালিগণ তাঁহাদের মাতৃভাষার আলোচনার সুযোগ অন্বেষণেও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। বাঁকিপুরে বাঙ্গালী

(৫) অধ্যাপক বিনয়কুমার.সরকার
(১) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (২) শ্রীমতী সরলা দেবী (৩) পণ্ডিত রামভুজ দত্ত চৌধুরী (৪) অধ্যাপক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় (১০) উকীল বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র (১১) উকীল
(৬) ব্যারিষ্টার নলিনীকান্ত ব্যানার্জ্জী (৭) অধ্যাপক যদুনাথ সরকার (৮) অধ্যাপক যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার (৯) উকীল মথুরানাথ সিংহ (১৫) অধ্যাপক ললিতচন্দ্র গুহ।
মিহিরনাথ রায় (১২) উকীল রামলাল সিংহ (১৩) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বসু—সুহৃৎ-পরিষদের সম্পাদক (১৪) শ্রীযুক্ত বিহারীলাল ভট্টাচার্য্য

ছাত্রদের সুহৃদসমিতি বলিয়া একটী সমিতি ও পাঠাগার আছে। বাঙ্গালী ছাত্রগণ দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ, ও শ্রীমতী সরলা দেবী প্রভৃতিকে সেখানে আমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনা করেন।

দিল্লির দরবারে বোমা

কংগ্রেস বসিবার কিছু পূর্ব্বে দিল্লির দরবার দিনে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা সকলেই জানেন। লর্ড হার্ডিং আমাদের পরমহিতকারী বন্ধু,—তিনিই ভঙ্গ বঙ্গ এক করিয়া এবং নানারূপে আমাদের প্রতি সহৃদয়তা দেখাইয়া আমাদের চিরকৃতজ্ঞাভাজন হইয়াছেন। এই উপকারী সহৃদয় বন্ধুর প্রতি যদি ভারতবাসী কেহ বোমা নিক্ষেপ করিয়া থাকে তবে তাহার মত পাতকী সংসারে নাই। নরকও তাহার পাপের শাস্তি দিতে অক্ষম। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদে লর্ড হার্ডিং আরোগ্য লাভ করিয়াছেন ইহাই আমাদের পরম সৌভাগ্য। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

কাজের বোঝা

হিমের মতন হাতখানা তোর
ঠাণ্ডা তুহিন জমা,
পর্ব্বত-আকার কাজের বোঝা
এবার দেরে ক্ষমা!
কণ্ঠ আমার রুধিসনে রে
গান গাওয়া মোর পেশা,
গানের অন্নে প্রাণ ভরে মোর
গানের তরেই নেশা!
গানের ক্ষুধায় হৃদয় জ্বলে
গানের তৃষায় বুক
গানের কড়ায় বেচাকেনা
ভবের দুখসুখ।

পাঁচ আঙ্গুলে ঘু্টিস্ গলা
করিস্ শ্বাস রোধ,
গান গাওয়া মোর ফুরিয়ে আসে
এ জন্মেরই শোধ।
কাজের শানে ভাবের রূপটি
ফুটিয়ে তুল্‌তে নারি
ছট্‌ফটিয়ে তড়্‌পি যেন
মীন—বিনে বারি।
বিরস হাতের পরশ লেগে
অশ্রুও কঠিন হয়
চল্‌তে চল্‌তে বুকে বেধে
অচলসম রয়!

পাষাণ লোকে পাষাণ সবই
নীরস মরু ঠাঁই
রসের ফুল না ফুটে কভু
গানের উৎস নাই।
পাথর 'পরে পাথর গেঁথে
তুলি ইমারৎ
আজনমের নীরসতার
লিখি দাসখৎ!
দোহাই কাজ! রেহাই কর্,
যশের থলি নে;
হৃদি বৃন্দাবনের মম
বাঁশী ফিরে দে!

শ্রীসরলা দেবী।

সমালোচনা

এষা। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল প্রণীত। কলিকাতা। শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। কালিকা যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। এখানি কাব্য-গ্রন্থ, সুকবি অক্ষয়কুমারের বিলাপের গান। 'এষা' অর্থে 'বাঞ্ছিতা', কাহারও মতে বা 'স্মরণীয়া', 'অন্বেষণ-যোগ্যা'। গ্রন্থের নামকরণেই একটি অপূর্ব্ব মধুর বিশেষত্ব আছে। এ বিশেষত্ব কাব্যখানির প্রতি ছত্রের মধ্য দিয়া বহিয়া গিয়াছে। মধুরে-গম্ভীরে অপূর্ব্ব সংমিশ্রন। অক্ষয়কুমারের কাব্যে চটুলতার লেশমাত্র নাই, ভাব ও ভাষা গভীর, বিচিত্র রশ্মিচ্ছটার মতই উজ্জ্বল, উদ্ভাসিত। পত্নীবিয়োগ-বিধুর কবি এ গ্রন্থে বিলাপের গান গাহিয়াছেন, সে গান বিশ্বের চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে; নিখিলের ক্রন্দনে, সান্ত্বনায় ও আশ্বাসে তাহা মিশিয়া গিয়াছে। এ বিলাপ কবির আর নিজস্ব নাই, তাহা যেন সার্ব্বজনীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এইখানেই কবির অনন্য-সাধারণ শক্তি দেখিতে পাই। সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ছাড়িয়া যে গান বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, সেই গানেই প্রতিভার ব্যঞ্জনা প্রকাশ পায়। নিবেদন কবিতায় কবির সসঙ্কোচ কৈফিয়ৎ, 'সে নহে সাবিত্রী সীতা, দময়ন্তী সতী * * * * ক্ষুদ্র এক বঙ্গনারী দরিদ্র-কুটীরে।" কি করুণ, কি মর্ম্মস্পর্শী!

'এষায়' ভাবের একটি বেশ ধারাবাহিক অভিব্যক্তি দেখিতে পাই। প্রথমেই আঘাতের বেদনায় হৃদয়ের বাঁধ কাটিয়া গিয়াছে—শোকের তরল স্রোত কূল ছাপিয়া বহিয়া গিয়াছে—অসত্য, কাতরতা, ক্রমেই হৃদয়ের সহিত বাদানুবাদ,—"মরণে কি মরে প্রেম! অনলে কি পোড়ে প্রাণ?" "এ কি শুধু প্রহেলিকা?" "নগণ্য জীবন?" হৃদি-হীন বিধির কি দুর্ব্বোধ সৃজন?" * * উন্মত্ত কবির মত গড়ে ভাঙ্গে অবিরত, লয়ে এক অন্ধ শক্তি কল্পনা ভীষণ।" তাহার পর সান্ত্বনা-লাভের ব্যর্থ প্রয়াস,—পরে জড়বাদ, গীতাবাদ ও বৈজ্ঞানিকবাদের জাল কাটিয়া কবি শান্তিজলের জন্য ব্যগ্র হইলেন,—অবশেষে সান্ত্বনা মিলিল—সে যে ভগবানেরই ছায়া ছিল—তাহারই 'প্রেমের মায়া' 'তার স্মৃতি আনে আজ তাঁহারই 'আস্বাদ!'

কবি বলিতেছেন, "এখানে সে যুক্ত করে, মাগিছে আমার তরে, তোমার করুণা স্নেহ শুভ আশীর্ব্বাদ।"

গ্রন্থখানি বিলাপময় খণ্ড কাব্যের সমষ্টি—তথাপি পড়িয়া মনে হয়, যেন একখানি অখণ্ড বিলাপ কাব্য পাঠ করিলাম। এষার করুণ সুরটি হৃদয়ে এমন গাঢ় মুদ্রিত হইয়া যায় যে পাঠ শেষে বহি বন্ধ করিলেও মনে হয় সেই সুর চারিদিকে ধ্বনিয়া ফিরিতেছে। 'এষা' কেবল বঙ্গসাহিত্যের গৌরব নহে, বিশ্বসাহিত্যেরও; In Memoriam প্রভৃতির পার্শ্বে স্থান পাইবার উপযুক্ত। গ্রন্থের ছাপা কাগজ প্রভৃতি পরিপাটি হইয়াছে।

মোহিনী বিদ্যা। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ, প্রণীত। ২য় সংস্করণ। কলিকাতা শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। সিদ্ধেশ্বর মেসিন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দশ আনা। গ্রন্থখানিতে হিপ্‌নটিজম্ সম্বন্ধে আলোচনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এ বিদ্যা পাশ্চাত্য দেশ হইতে আমদানী নহে; ভারতেও সম্মোহন বিদ্যার প্রচলন ছিল। পাশ্চাত্য হিপ্‌নটিজম বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত; আর আমাদের দেশের জলপড়া, তেলপড়া, বাটি চালা, নল চালা প্রভৃতির মূলেও এই একই বৈজ্ঞানিক সত্য নিহিত আছে। সেগুলিকে সভ্যতাভিমানী ব্যক্তি একেবারে উড়াইয়া দিতে পারেন না। হিপ্‌নটিজমের সাহায্যে বহু দুরারোগ্য রোগ বিনাশ পাইয়াছে, পাইতেছেও। দুই চারিজন চিকিৎসক এ বিদ্যায় সমধিক পারদর্শী। বেশী দিনের কথা নহে, একজন সিভিল সার্জ্জন এই বিদ্যাপ্রভাবে এক দুর্দ্দম মাতালকে মদের নেশা হইতে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন। কি করিয়া হিপ্‌নটিজম্ শিক্ষা করিতে হয়, এই গ্রন্থে লেখক তাহা বিবৃত করিয়াছেন,—বহু গল্পে হিপ্‌নটিজমের শক্তির পরিচয় দিতেও অবহেলা করেন নাই। দুষ্ট লোকের হাতে পড়িলে হিপ্‌নটিজম্ বিদ্যা যে প্রভূত অমঙ্গলের সৃষ্টি করিতে পারে, গল্পগুলি হইতে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

কুহকিনী। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সমাদ্দার, বি, এ, প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী,

ক্ষীরতলা হাওড়া। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ছয় আনা মাত্র। গ্রন্থকার মুখবন্ধে লিখিয়াছেন,—"বঙ্গদেশে free love এর কথা আর বোধ হয় কেহ বলেন নাই, আমিও না বলিলে বোধ হয় ভালই করিতাম, কিন্তু কতদিন আর মুখ বন্ধ করিয়া রাখা যাইবে?" এমন সৃষ্টিছাড়া উচ্ছ্বাস ও বিকৃত রুচি পূর্ব্বে কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। অথচ লেখক শিক্ষিত—শিক্ষার গর্ব্ব রাখেন। ইহা অপেক্ষা বিস্ময় ও পরিতাপের বিষয় আর কি আছে? রচনাটুকু আগাগোড়া হেঁয়ালিতে আচ্ছন্ন, যেখানে অর্থ বোধ হয়, সেখানে বহিখানি বন্ধ করিয়া অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিবার বাসনা জন্মে। বিশ্ববিদ্যালয় মানুষকে উপাধিতে দাগিয়া দিতে পারে মাত্র, শীলতা বা রুচি দিতে পারে না, এ গ্রন্থ পাঠ করিয়া এই নিষ্ঠুর সত্যের সহিত আমাদিগের আর নূতন পরিচয় ঘটিল।

বিচিত্রা। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। নিউ আর্টিষ্টিক প্রেসে মুদ্রিত। শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দশ আনা। এখানি গল্পের বহি—তেরটি ছোট গল্পের সমষ্টি। গল্পগুলিতে ছোটো গল্পের আর্টের বিশেষ কৌশল না থাকিলেও রচনার একটি সহজ ভঙ্গী আছে। লেখকের ভাষা ভাল, তবে অধিকাংশ গল্প অনাবশ্যক বর্ণনায় ফাঁপানো হইয়াছে বলিয়া গল্পের আসল জিনিষটি ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। রচনার সংযম বলিয়া একটা জিনিস আছে, বিচিত্রায় সেই সংযমের অভাব দেখিলাম। 'নিয়তি' ও 'ছলনা' গল্পে অর্থের লোভে অর্থহীন ব্যক্তির মর্ম্ম-ভেদী নৈরাশ্যটুকু সুন্দর ফুটিয়াছে। গল্প দুইটি সর্ব্বতোভাবে উপভোগ্য। সাধনা করিলে লেখকের হাত খুলিবে এইজন্যই আমরা ত্রুটিগুলি বিশদভাবে দেখাইয়া দিলাম। 'নিয়তি' ও 'ছলনা' গল্প দুইটির সহিত অপর গল্পগুলি মিলাইয়া দেখিলে লেখক নিজেই আমাদিগের কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিবেন। বহিখানিতে কয়েকটি চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে; তন্মধ্যে দুইখানি রঙ্গিণ—সে দুইটি শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ লাহার পরিকল্পনা;—পরিকল্পনা মন্দ নহে। গ্রন্থের ছাপা কাগজ ও বাঁধাই উৎকৃষ্ট।

শ্রীমহাভারতের বৃহৎ সূচী। শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ সঙ্কলিত। কাশীধাম, শ্রীভারত ধর্ম্মমহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। মহামণ্ডল শাস্ত্রপ্রকাশকসমিতি প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। মহাভারত পৃথিবীর একখানি অসাধারণ গ্রন্থ। "যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই ভারতে" বলিয়া যে প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহার যাথার্থ্য সম্বন্ধে আজ কাহারও মনে এতটুকু সংশয় নাই। সুপণ্ডিত সঙ্কলয়িতা মহাশয় বিপুল পরিশ্রমে সেই মহাভারতের সূচী রচনা করিয়াছেন। সূচী বর্ণানুক্রমে সজ্জিত। অধ্যায়ানুক্রমও বাদ পড়ে নাই। তাহার সহিত টীকাসম্মত প্রয়োজনীয় অধ্যায়ের তাৎপর্য্য, অধ্যায় ও ন্যূনাধিক্যাদি, শ্লোকের প্রমাণ প্রয়োগসহ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সঙ্কলনকারের সুগভীর গবেষণা ও পরিশ্রমের ফলে গ্রন্থখানি সাধারণের পক্ষে অত্যন্ত উপাদেয় হইয়াছে। Referenceএর পক্ষে কোথাও এতটুকু ত্রুটি নাই। এ অমূল্য গ্রন্থ বঙ্গ সাহিত্যের একটি গুরুতর অভাব মোচন করিয়াছে। বাঙ্গালা লাইব্রেরী এ গ্রন্থকে সাদরে আপনার কোণৈকদেশে স্থান দান করিয়া গৌরবান্বিত হইবে, সন্দেহ নাই।

উৎসব। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। শ্রীবিপিনবিহারী দাসগুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। বরিশাল ন্যাশনাল মেশিন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য চারি আনা মাত্র। এখানি নাটিকাচ্ছলে রচিত, রূপক কাব্য। রচনার পরিপূর্ণতা নাই, বক্তব্য বিষয়ও ভাল ফুটে নাই, তথাপি ইহা পাঠ করিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। লেখকের ভাণ্ডারে ভাব ও শব্দৈশ্বর্য্য আছে। কবিত্বের পরিচয়ও বহু স্থলে প্রস্ফুট দেখিলাম। ভাষা সরল ও সতেজ। গানগুলি স্বচ্ছ, লঘু। নবীন কবির সাধনা সফল হউক, ইহাই আমাদিগের কামনা।

ময়না কোথায়! শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ভিক্টোরিয়া প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। এখানি ঠিক সামাজিক উপন্যাস নহে, সমাজের নক্সা, অনেকটা Satireএর ধরণে রচিত। Satire রচনায় অতিশয়োক্তির আশ্রয়গ্রহণ দূষণীয় নহে,

তবে তাহারও একটি মাত্রা আছে। গ্রন্থকারের লেখনী সেই মাত্রাটি সর্ব্বত্র বজায় রাখিতে পারে নাই। গ্রন্থের ভাষা সুন্দর, সরল ও স্বচ্ছ—বর্ণনার ভঙ্গীও সরস। আতিশয্য-দোষ না থাকিলে গ্রন্থখানি Satiric উপন্যাস বিভাগে উচ্চস্থান অধিকার করিতে পারিত বলিয়া আমাদিগের বিশ্বাস। এই আতিশয্য-দোষে গ্রন্থের স্থানবিশেষ কদর্য্য ও বীভৎসরসের উদ্রেক করে। করুণ ঘটনাগুলিও ততদূর মর্ম্মস্পর্শ করে না। আশা করি গ্রন্থকার ভবিষ্যতে এ বিষয়ে একটু মনোযোগ দান করিবেন। গ্রন্থে কয়েকখানি চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। চিত্রগুলির ছাপা ভাল, পরিকল্পনায় বিশেষ শিল্পচাতুর্য্য নাই। গ্রন্থের ছাপা ও কাগজ প্রভৃতি বেশ হইয়াছে।

আমার খাতা। শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রণীত। আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য বার আনা। এই গ্রন্থে একটি বঙ্গরমণীর বাল্যজীবনের কথা ও কয়েকটি প্রবন্ধ ও গান সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বাল্যজীবনের কথাটুকু বেশ একটি অনাড়ম্বর সারল্যে মণ্ডিত, করুণরসে স্নিগ্ধ। ভাষাটুকুও কোমল।

সার্ব্বধর্ম্ম। প্রকাশক, কুমার শ্রীদেবেন্দ্র-প্রসাদ জৈন, মন্ত্রী—সার্ব্বধর্ম্ম-পরিষৎ, কাশী। মহালক্ষ্মী যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি জৈনসিদ্ধান্তে সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপালদাস বরৈয়া স্যাদ্বাদ বারিধি বাদগজকেশরী মহাশয়ের মূল হিন্দী পুস্তিকার অনুবাদ। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে সার্ব্বধর্ম্মের দার্শনিক ভিত্তির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। অনুবাদের ভাষা সরল হইয়াছে। পুস্তকখানি বিনামূল্যে বিতরিত হইতেছে।

নীলাম্বরী। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়। কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য বার আনা। এখানি গল্পের বহি। আটটি গল্প ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। লেখার অত্যন্ত অনাবশ্যক বাহুল্য আছে, তাহার ফলে গল্পগুলি মোটেই স্ফূর্ত্তিলাভ করিতে পারে নাই। অথচ অনেকগুলি গল্পেই ছোট গল্পের উপাদান যথেষ্ট ছিল। "নীলাম্বরী" গল্পে নায়কের রূপ-ব্যাধির বিস্তারিত বর্ণনা অত্যন্ত একঘেয়ে হইয়া পড়ায় তাহা বিরক্তি উৎপাদন করে। বহু স্থলেই পাঠকের চিত্ত স্রোতহীন বিলে নৌকার মতই, মন্থর হইয়া পড়ে, অগ্রসর হইতে চাহে না। ছোট গল্প রচনায় অত্যন্ত সতর্কতার প্রয়োজন। ভাষায় বর্ণনায় ভঙ্গীতে এমন একটা প্রবাহ থাকিবে যে পাঠকের চিত্ত তাহারই বেগে ছুটিয়া চলিবে—গদাই-লস্করী ভাবে নহে। যাহা বলিবার আছে, তাহা ত্বরিত বলিয়া ফেলিতে হইবে—একটা বাজে কথা এখানে শুনিবার অবসর নাই,—তবেই ছোট গল্প সার্থক হইবে, পাঠকের মর্ম্ম স্পর্শ করিবে। উপন্যাসে অবান্তর পাঁচটা কথা বরং শুনা যাইতে পারে, কিন্তু ছোট গল্পে তাহার স্থান নাই সময়ও নাই। "প্রেমে প্রতিদ্বন্দ্বী" গল্প শেষ করিয়া দিলুয়া, মুন্না বা নাইমুর হৃদয়ের কথা আমাদিগের ততটা মনে পড়ে না, যতটা পড়ে সেই ঘোষণাপত্র পড়িয়া দুই বন্ধুর অশ্বপৃষ্ঠে চড়িয়া উদ্দাম যাত্রা ও দার্শনিক বক্তৃতার রাশি। দার্শনিক আলোচনা ও ছোট গল্প এক নহে, উভয়ে প্রভেদ আছে। ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া গল্পে বক্তব্য কিছুই ফুটে নাই। লেখক সুশিক্ষিত, আমাদিগের কথাগুলির মর্ম্ম কাজেই তিনি ভাবিয়া দেখিবেন, এমন আশা করিয়াই এত কথা বলিলাম নহিলে কোন প্রয়োজনই ছিল না। গ্রন্থের ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই নিখুঁত হইয়াছে।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৪৪, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।
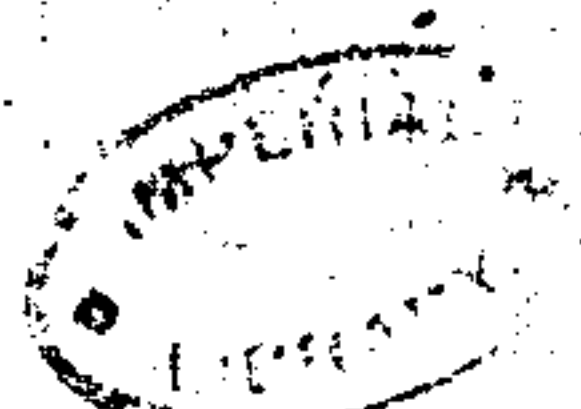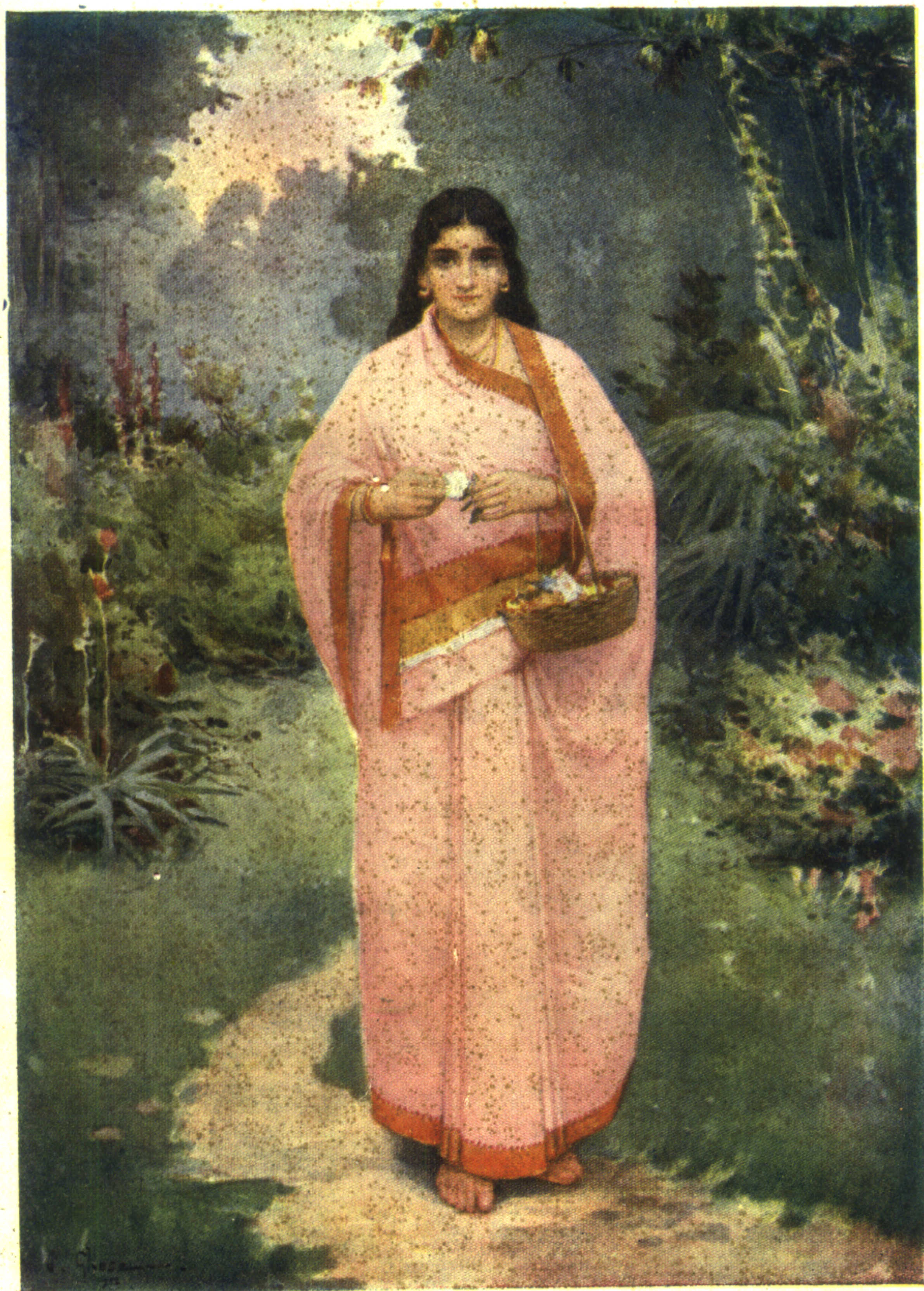
পুষ্প চয়ন

ভারতী

৩৬শ বর্ষ] ফাল্গুন, ১৩১৯ [১১শ সংখ্যা

বাগ্‌দত্তা

(২২)

শচীকান্ত এখন বেশ আছে। পড়াশোনার চাপ নাই, অভাব অভিযোগের জুলুম নাই, স্বচ্ছন্দ পানভোজন, সানন্দ বিচরণ, এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে ভবিষ্যকাব্যের কল্পনা করা এখন তাহার প্রাত্যহিক কার্য্য! এ ভিন্ন মাসিমার নিকট হইতে সে সম্প্রতি একটা ক্যামেরা কিনিবার পয়সা আদায় করিয়াছে, জিনিষটা এদেশে এখনও অনেকটা নূতন; বিশেষতঃ পল্লীগ্রামে। কাজেই ইহার কাচের মধ্যে মসিমলিন মুখগুলার অধিকাংশই বিস্ময়-বিহ্বলভাব লইয়া প্রত্যক্ষ হইতেছিল। কিন্তু এমন করিয়া মানুষের খুব বেশিদিন চলিতে পারে না। এবার কাশী গিয়া সে যে নূতন স্বাদ পাইয়া আসিয়াছে তাহার মোহন প্রলোভন তাহার চিত্তকে গৃহকোটরে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। পূজার পূর্ব্বে একবার দেশ ভ্রমণ করিয়া আসিবার লোভে সে অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। গিরিজাসুন্দরী শুনিয়া গম্ভীরমুখে ঘাড় নাড়িলেন, "না, রে বাপু না, ঘরের ছেলে ঘরে থাক্, কোথায় যাবি!"

কিন্তু গোপনে একটা পরামর্শ চলিতেছিল এ খবরটা সহসা একদিন গিরিজাসুন্দরী নায়েব হরচন্দ্রের প্রমুখাৎ অবগত হইয়া বহির্বাটীতে আসিয়া বামালশুদ্ধ চোর পাকড়াও করিলেন। শচী বলিল 'কি করি মাসিমা জান্‌লে তো তুমি যেতে দেবে না তাই শিশির ও আমি দুজনে এই ফন্দি এঁটেছিলুম।" শিশির কল্যাণীর স্বামী। মাসি কহিলেন "তা যাবিইতো আমার মুখ চাইবি কেন বল; আমি তোর কে! পূজোর সময় বাড়ী ছেড়ে যাবি কাকে নিয়ে থাকি বল দেখিন্?"

শচীকান্ত হাসিয়া কহিল "কেন কলীকে আন্‌লেই ত হয়! পাঠাবে না বই কি খুব পাঠাবে, কেউতো তাকে বেচে খায়নি। সে সব আমাদের ঠিক্ হয়ে গ্যাছে পঞ্চমীর দিন সে আসবে। তুমি ভেতরে যাও মা এখুনি কেউ এসে পড়ে নিন্দে করবে।"

"গিরিজা বাম্‌নির নিন্দে করবে এমন লোক এখনও এ মুলুকে জন্মায়নি" এই বলিয়া সগর্ব্ব পদবিক্ষেপে কর্ত্রীঠাকুরাণী নায়েবখানার পিছনে পর্দ্দার অন্তরালে বৈষয়িক তদারকে চলিয়া গেলেন। কোথাও এতটুক বিশৃঙ্খলা

নাই, অপব্যয় নাই, অবিচার নাই, এই নারীসাম্রাজ্যের ক্ষুদ্রসংখ্যক প্রাণী সুখেই এ রাজ্যে বাস করে, কিন্তু তাই বলিয়া কেহ তাঁহার মুখপানে চাহিয়া কথা কহিতে সাহস পায় না।

শচীকান্তের সঙ্গে কিছুদিন এখান সেখানে ঘুরিয়া শেষে শিশির কাশী গমনের প্রস্তাব করিল। কাশীতে পিতা আছেন, শচীকান্ত প্রথমটা সেখানে যাইতে ইচ্ছুক ছিল না শেষে নাছোড়বন্দা শিশির নিতান্ত না ছাড়ায় যাইতে বাধ্য হইল। উমাকান্ত এখনও তেমনি। সেই স্বল্প কয়ঘণ্টা নিদ্রার পর মুক্ত আকাশের তলায় প্রকৃতির বিশ্রামাবসরে নীরব উপাসনা, নির্ব্বাক্ পূজামন্ত্রে বিশ্বনাথের আরাধনা, শিশিরঝরা ভোরের আলোয় জাহ্নবী তরঙ্গের সুপ্তিভঙ্গে তেমনি অলিগলি ঘুরিয়া আর্ত্তকে সাহায্য ও ব্যথিতকে শান্তিদান, সন্ধ্যার ঝিকৃঝিকে আলো নৈশান্ধকারে ডুবিতে আরম্ভ করিলে দিবারাত্রির সন্ধিস্থলের সাম্যভাব জন্মমরণের সন্ধিরূপে স্বীয় অন্তরাত্মায় অনুভব করা—এ সকলি তাঁহার সমান আছে।

শিশির বিস্ময়ের সহিত তাঁহাকে পর্য্যবেক্ষণ করিল। কত বালক, যুবা, প্রৌঢ় শিক্ষার্থী বিভিন্ন বিষয়ে পঠনা করিতে আসিতেছে, কত বৃদ্ধ অপরাহ্নে শ্রান্তপদে ক্লান্তচিত্ত বহন করিয়া আনিতেছে, অর্থার্থী, আরোগ্যার্থীর শেষ নাই। কি সৌম্যমুখ! অক্লান্ত জীবন! শিশির কহিল "তুমি যাওতো যাও, আমি এখন যাবো না।"

উমাকান্ত একদিন শচীকে আপনা হইতে ডাকিয়া কহিলেন "তোমার মাসি যখন তোমায় নিয়ে যান, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল তাঁর স্বামীর বিষয়ের অর্দ্ধাংশের অধিকারিণী দেবরকন্যার সঙ্গে তোমার বিবাহ দিবেন, এখন মেয়েটি বয়ঃপ্রাপ্তা হয়েচে আমার অনুমতি চেয়েছেন, আমার আপত্তি নাই লিখেছি।"

শচীকান্ত কিছু বলিল না কিন্তু মনটা একটু অপ্রসন্ন হইল, এ বিবাহপ্রস্তাব সেও শুনিয়াছে, কিন্তু ইহা তাহার প্রেয় নহে। অবশ্য ইহাকে বিবাহ করিলে একপক্ষে ভালই হয় কিন্তু বিবাহসম্বন্ধে সে যে নিজেকে এক জায়গায় মনে মনে মস্ত বড় দায়ী করিয়া রাখিয়াছে, অন্যত্রে তাহার বিবাহ কিরূপে সম্ভব!

কর্ম্মচঞ্চল শরতের প্রভাতে সদ্যজাগ্রত পল্লীপথ ধরিয়া শচীকান্ত যখন তাহার মাসিমার গৃহে ফিরিয়া আসিল তখন তাঁহার উদ্যানের শিউলিতলায় ঝুরোফুলের শয্যা পল্লীবালিকাগণের বলয়ঝঙ্কৃত হস্তের আলোড়নে বিত্রস্ত হইয়া পড়ে নাই, এবং শিশিরশিক্ত দূর্ব্বাদলের মস্তক তাহাদের আল্‌তামাখা পদস্পর্শে নুইয়া পড়িতেও তখন বিলম্ব ছিল। ফটকের পাশের কুটীরি হইতে দ্বারবান ছোটু সিংয়ের মৃদুস্বরে "হে গোবিন্দ রাথ অধম অবতু জীবন হারে" ইত্যাদি ভজনগান শোনা যাইতেছিল। তাহাকে দেখিয়া খাটিয়া হইতে শশব্যস্তে উঠিয়া মাথা নত করিয়া বলিল "পরণাম বাবু।" সে একটু খানি হাসিয়া উদ্যানপথ বাহিতে লাগিল। ক্রমে পথের উপরে পশারী পশারিণীর প্রকাণ্ড ঝাঁকা ও ব্যস্তগতি দৃষ্ট হইল, কৃষাণ গরু বাছুর তাড়াইয়া মাঠের পানে চলিতে চলিতে

বাঁশের বাঁশীতে ফুঁ দিয়া গেল। গোয়ালা গোগৃহের অঙ্গনে গাই দুহিবার জন্য বাছুর বাঁধিতেছিল, কিন্তু চঞ্চল গোবৎস সারারাত্রের পর মাতৃদর্শন পাওয়ার এই মুহূর্ত্তে মাতৃস্তন্য ত্যাগে অনিচ্ছুক হইয়া সজলনয়না মাতার পানে ফিরিয়া ফিরিয়া ডাকিতেছিল "হ্বাঃ" সে বুঝে না যে তাহার মা কত নিরুপায়, কত দুর্ব্বল!

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতেই কল্যাণী আসিয়া পায়ের কাছে টিপ করিয়া একটা প্রণাম করিয়া বলিয়া উঠিল "এতকালে ফেরা হলো? এসে পর্য্যন্ত তোমায় দেখবার জন্যে ছটফট করে মরচি, তোমার আর বারই হয় না।"

শচীকান্ত সংসারের মধ্যে বোধহয় মনীশ ও কল্যাণীকেই সব চেয়ে ভালবাসিত। তাহার জীবনের অনেকদিনের স্মৃতির সুখে এই স্নেহময়ী বোনটির হাসিমুখের ছায়া মেশানো আছে, তাহার এই স্নেহতিরস্কারে তাই সে অপ্রতিভ হইল। একটু হাসিয়া লজ্জাটা ঢাকা দিবার চেষ্টায় কহিল "সেইজন্যেই তো এলুম রে, দেখচিস্ না শিশির এখন আসবে না বল্লে—তাই একাই পালিয়ে এসেছি। রাগ করচিস কেন? মাসিমা কোথা?"

"মা ঘাটে গেছেন। সেই জন্যেই এলে, নইলে আরও দেরি হতো? তাই তো বলি বাপু বউ আনো নৈলে ঘরে মন টিকবে না।"

শচীকান্ত কৃত্রিম কোপে বলিল "বাড়ীতে পা না দিতেই আবার ছান্‌লা তলায় বিদেয় করতে চাস।"

কল্যাণী তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল "না না এসো ভাই, ওসব কথা পরে হবে, কিন্তু এবার আর ভাজের মুখ না দেখে যাচ্চি নে তা বলে রাখলুম, ঝাপটা গড়িয়ে এনেছি বউ দেখব বলে।"

"বেশ করেছিস যত্ন করে রেখে দিস্ চুরি না যায়।" শচী হাসিতে হাসিতে নিজের ঘরের দিকে চলিয়া গেল। কল্যাণী ভ্রুকুটি করিয়া হাসিয়া বলিল "যা-ও তোমার সকল তাতেই ঠাট্টা!"

গিরিজাসুন্দরী আসিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পুত্রের আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া অপ্রসন্ন মুখে কহিলেন "কইরে পশ্চিম বেড়িয়ে গায় সারলি কই?"

"উঃ সারিনি আবার! এই দেখ না—" বলিয়া শচীকান্ত কামিজের আস্তিন গুটাইয়া বাহু প্রদর্শন করিল। মাসিমা অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া কহিলেন "এবার ত সখ মিটেচে? বাছা, এইবারে বে থা করে সংসারী হও—তারাও ব্যস্ত হচ্চে আমিও আর দেরি করতে পারিনে।"

দ্বিপ্রহরে দিব্য একটি ফুটফুটে ছেলে কোলে কল্যাণী আসিয়া দাদার খাটের প্রান্ত দখল করিল। শিশু অপরিচিত মামার আহ্বান উপেক্ষা করিয়া মাতাকে আঁকড়িয়া রহিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া তাহাকে দেখিতে লাগিল। কল্যাণী কহিল "তোমাদের বেড়ানর গল্প কর।"

শচীকান্ত বলিতে লাগিল—আর নাট্যশালার অভিনীত নাটকের এক একটা অঙ্কের মত সেই বিচিত্র দেশের বিচিত্র স্মৃতি কবির

উঠিতে লাগিল। চিরগৃহবদ্ধা মুগ্ধা কল্যাণী শুনিতে শুনিতে পুলকে বিস্ময়ে শতবার স্তম্ভিত হইল।

শচীকান্ত এবার কাব্যকলা সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়াছে। মঞ্জু গুঞ্জন, ক্ষণিকের দেখা পাতায় পাতায় পূর্ণ, এবার শরৎকালের স্বর্ণরেণু মাথান রাঙ্গা আলোয় সে শারদার প্রতিষ্ঠা পত্রের ছত্রে ছত্রে অঙ্কিত! যথা,

আজও কি গাহিছে পাখী তোমারি শিখানো গান?
চাহিয়া তোমার মুখে জগত পেতেছে প্রাণ;
বসন্তের রাণী তুমি, শরৎ (ও) তোমারই পায়,
নিমেষে সঁপিয়া তনু. আপনা বিকাতে চায়!

* * *

আমি কতদিনে সখি! পাব তব দরশন?
ইত্যাদি।

ঠুন্ করিয়া চাবির শব্দে চমকিয়া কবি মুখ তুলিলেন, হায়রে ভ্রান্ত কল্পনা! একমুখ হাসি লইয়া কল্যাণী প্রবেশ করিল, শচীকান্ত বলিল "কিরে? শিশিরের চিঠি এসেচে বুঝি? সে আসচে?"

"সেই ভাবনায় তো ঘুম হচ্চে না" বলিয়া সে তাহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল, "মা তোমায় ডাকচেন, কাকাবাবুর শ্বশুর তোমাকে দেখতে এসেচেন যে।"

শচীকান্ত বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিয়া উঠিল "কেন; বল দেখি আমি এমন দর্শনীয় হয়ে উঠলুম? পশ্চিমে বেড়িয়ে এসে আমার কি আজকাল হাতিটাতি বলে ভ্রম হচ্চে নাকি?" কল্যাণী সকৌতুকে হাসিয়া উঠিল,—"এমন কথাতো কক্ষণো শুনিনি, দাদা তুমি যেন কি হচ্চো। এই বলিয়া সে পুনঃপুনঃ মারা গেলে তাঁর শ্বশুরই তো বাসন্তীকে নিয়ে যান, তা তিনি বিয়ের আগে তোমায় একবার না দেখে কেমন করে বিয়ে দেবেন?"

"তা নয় দয়া করে নাই দিলেন?"

"ও-কি কথা দাদা, গুরুজনকে কি অমন করে বলতে আছে? এসো, উঠে এসে কাপড় টাপড় ছেড়ে নাও, তিনি ব্যস্ত হচ্চেন, বলচেন আজই আশীর্ব্বাদ করে যাবেন।"

শচীকান্তের মুখ এবার গম্ভীর হইয়া আসিল। সে ভাবিতে লাগিল এ বিবাহ লোভনীয় সন্দেহ নাই, মাসিমাদের বিষয়ের অর্দ্ধাংশ তা ভিন্ন মেয়ের মাতামহও একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সেখানেও আদর আপ্যায়নের আশা রাখা যায়, মেয়েটী বাসন্তী? দিব্য নাম সহসা এমন একটি নামও শুনিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু—সেই যে বসন্তের প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি সে একদিন নেত্র দ্বারা দর্শন করিয়া ছ—তার কাছে—ধনমান, নাম সবই তুচ্ছ—সে মুখ ভুলিবার নয়। কল্যাণী তাহাকে নীরব দেখিয়া পুনশ্চ কহিল "বাসন্তীকে দেখতেও বেশ এখন সেতো সবে আট ন বছরের—বড় হলে খুব সুশ্রী হবে! ছোট বোনটিকে চতুর্দ্দোলে বেশ মানাবে।"

শুনিয়া একটু চুপ করিয়া থাকিয়া পরে শচীকান্ত হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, "বউ তো আর চতুর্দ্দোলা থেকে নামবে না! তার চেয়ে এক কাজ করনা, একটা মাটির সখীকে সাজিয়ে তাকের উপর তুলে রাখ, মনে করবি ওই তোদের বউ। যা যা বলগে যা আমি বিয়ে করবোনা।"

আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। ভদ্রলোক বাড়ীতে—এমন সময় বিবাহের বর বলে বিবাহ করিব না!

কথাটা শুনিয়া গিরিজাসুন্দরী হাড়ে জ্বলিয়া গেলেন। নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারে এমন আহাম্মক আজকালকার দিনেও জন্মায়! আসামীকে ডাকাইয়া কঠিন স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "মেয়ের কত বিষয় জানো? "উত্তর হইল "জানি।"

"তোমারই জন্য এই সব আজ সাত বছর ধরে নিজে তদারক করে আসছি, ছোট বউএর বাপের হাতে কিছুতে দিইনি তা জানো?" অপরাধীকে নীরব দেখিয়া তাঁহার মুখ ক্রোধে কালী হইয়া উঠিল "এমন সুযোগ ত্যাগ করলে চিরকাল পস্তাতে হবে এ জেনো। বসন্ত এমন কিছু মন্দ নয় যাতে তাকে মনে না ধরে, সব্বাই কি আর পরী হয়ে জন্মায়। কি বল?"

শচীকান্ত তথাপি উত্তর করিল না, সে নিজের মনের কাছে যে উত্তর পাইয়াছে তাহা মাসিমার প্রশ্নের অনুকূল নয়। গিরিজা কঠিন নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছেন, মানুষের মুখে তাহার অন্তরের সমাচার সুস্পষ্টই লেখা থাকে, অভিজ্ঞ পাঠকের ইহা পাঠ করিতে বেশি বিলম্ব হয় না। তীব্র হতাশা দারুণ বিরক্তির আকারে তাঁহার চিত্তকে একান্ত পীড়িত করিয়া তুলিতে লাগিল। এই বোনাপার্টিকে অত্যন্ত স্নেহ করিয়া ইহার জন্য প্রাণান্ত খাটুনি খাটিলেন, সে কিনা অবহেলায় এই দারুণ পরিশ্রমলব্ধ ফল ছুঁড়িয়া ফেলিতে উদ্যত, আহাম্মক কোথাকার! একটু সামলাইয়া লইয়া পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন "কি মত হ'ল সেটা বল্লে হতোনা—ভদ্রলোক অনর্থক বসে আছেন।"

শচীকান্ত এবার কথা কহিল, নতমুখে সে বলিল "আমি জানি তুমি আমার জন্য অনেক করেচ মাসিমা, আর এতে আমারই পূরা মঙ্গল তাও জানি, কিন্তু আমার এ বিয়ে কর্ব্বার উপায় নেই; কি করবো।"

গিরিজাসুন্দরীর ক্রোধ ঘোর বিস্ময়ে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিল, তাঁহার মুখ দিয়া সাশ্চর্য্যে বাহির হইয়া গেল। "কেন?" "আমি অনেক দিন হতে অন্যত্র বাক্‌দত্ত।" "কই একথাটা এতদিন শুনিনি ত!" মাসিমার পাংশু মুখ স্বাভাবিক বর্ণ ধারণ করিল। শচী নত নেত্রে কহিল "আমি লজ্জায় কারুকে বল্‌তে পারিনি মাসিমা কিন্তু তুমি যদি রাগ কর তাহলে নয়—"

একথা তাহার মনের কথা নয় নিজের জেদে কাজ করাই তাহার স্বভাব, মাসিমাকে পরীক্ষার জন্যই সে আপাততঃ তাঁহার মন-যোগান কথাটা বলিয়া ফেলিল।

গিরিজা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন "তা হয় না তুমিও যেমন আমার বাসন্তীও তেমনি। তোমার নিজের মত যখন নেই তখন—সে কাজ নেই।"

বাসন্তীর মাতামহকে গিয়া কহিলেন "ভেবে দেখ্‌চি শচী ও বসন্তে বয়সের তফাৎটা বড্ডই হয়। মেয়েও যখন তেমন বাড়নসই গড়ন নয়—না হয় কাজ নেই।"

মাতামহ ইতিপূর্ব্বেই নিজের ইচ্ছামত একটি পাত্রকে ঘরে আনিয়া রাখিবার চেষ্টায় ছিলেন, গিরিজাসুন্দরীর ভয়েই পারেন নাই,

খুসী হইয়া বলিলেন ছেলেটিকে বারান্দা দিয়ে দেখলাম আমারও তাই মনে হলো।”

(২৩)

ব্যাপার চুকিল বটে কিন্তু অনেকটা বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়া গেল। যে মুহূর্ত্তে শচীকান্ত এবাড়ীর কনিষ্ঠ জামাতার পদ গ্রহণে অসম্মতি জানাইল সেই সময় হইতেই যে তাহার আসন এখানের জমি হইতে বহু হাত নীচে নামিয়া পড়িল এ কথাটা শচীকান্ত মন হইতে বিদায় করিতে পারিতেছিল না। বাসন্তীর বিষয় নিতান্ত অল্প নয় আর বিষয়ও নিখরচা,—মাসিমার সুশৃঙ্খল বন্দোবস্তে তাহা ছোট খাট জমিদারীতে পরিণত হইতে বসিয়াছে। মেয়েটিকে গ্রহণ করিলে লক্ষ্মীকে ঘরে আনা হইত সন্দেহ নাই। মনের মধ্যে একটা দ্বিধার যুদ্ধ চলিতেছিল। মাসিমা প্রথম হইতেই তাহাকে এ আভাষ দিয়া আসিয়াছেন এ পক্ষে তাঁহার কিছুমাত্র ত্রুটি নাই। সেও অনেকবার সেই ক্ষুদ্র বাসন্তীকেই নিজের ভবিষৎ প্রিয়ার পদে অভিষেক কল্পনা করিতে চাহিয়াছে, কিন্তু হায় সমস্ত কবিতা সমুদয় কল্পনা যে সেই একখানা চকিতে দেখা মুখ অধিকার করিয়া লইয়াছিল,—সে কেমন করিয়া তাহার হারাণো চিত্ত খুঁজিয়া আনিয়া অন্যকে দান করিবে?

জগতে যত অদ্ভুত বস্তু আছে তাহার মধ্যে কবিচিত্তই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর। ক্রুদ্ধ সমুদ্রতরঙ্গের উন্মাদ, তাণ্ডব, ভীষণ ঝটিকার সৃষ্টিসংহারিণী মূর্ত্তি যাহাদের চক্ষে পুঞ্জ পুঞ্জ সৌন্দর্য্যের সমাবেশ করে, তাহাদের চিত্তে সহজ সরলের চেয়ে দুর্ল্লভ দুষ্প্রাপ্য বস্তুই উচ্চাসন প্রাপ্ত হইবে ইহা এমন বিস্ময়ের মালা গাঁথা, সাগর ছেঁচিয়া রত্ন আহরণ করার মত একটা অসম্ভব কল্পনার উপরে নিজের সমুদয় ভবিষ্যৎটাকে এক কথায় নিঃসার করিয়া নিঙড়াইয়া ফেলিতে এই স্বপ্নপরায়ণ কবি ভিন্ন অপর কোন জাগতিক লোকে পারে না। কবি যেখানে মধুমক্ষিকার গুঞ্জনগানে ভাববিভোর, সাংসারিক সেখানে মধুচক্রের মধু আহরণে রত। কবি শচীকান্ত তাহার নিরুদ্দিষ্টা প্রিয়ার স্মৃতিকেই বড় করিয়া দেখিল, কেন না তাহা না হইলে কল্পনার সহিত বাস্তবের দ্বন্দ্ব বাধে না, জীবনটা গদ্যময় হইয়া উঠে।

সন্ধ্যালোক বিস্তৃত বারান্দায় স্বহস্তসজ্জিত ফুলগাছের টবগুলার নিকট একখানা চৌকিতে বসিয়া শচীকান্ত ভাবিতে লাগিল। আকাশ ভরিয়া নক্ষত্র উঠিয়াছে, তাহারা তাহার চিন্তা-ভারাকুল মস্তকের উপরে নীরব উপহাস হাসি হাসিয়া জ্বলিতে লাগিল। সর্ব্বজ্ঞ পবন তাহার মনের বার্ত্তা বহন করিয়া কচি কিশলয়গুলির কানের কাছে ফিস্ ফিস্ করিতেছিল। অদূরে গাছের ডালে “পিউ পিউ কাঁহা” রবে পাপিয়া সুরগান সাধনা করিতেছে। কল্যাণী আসিয়া পশ্চাতে দাঁড়াইল। আজিকার ব্যাপারে সে একান্ত মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া নিজের ঘরে আসিয়া যখন খোকার জন্য তুকাটির গলাবন্ধ বুনিতে বসিয়াছে এমন সময় গিরিজাসুন্দরী আসিয়া তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন “সবতো শুনলে এখন শচীর মনের কথা জেনে যা হয় একটা বিহিত করে ফ্যালো। এতদিন বল্লেই চুকে যেত, এখনকার ছেলেপিলেরা গুরুজনের কাছে থেকে সব কথা লুকতেই

কল্যাণী মাকে চিনিত, সে বুঝিল তিনি যখন যেদিকে মন দেন তাহার একটা পূরাপূরি ব্যবস্থা না করিয়া কোনমতেই ক্ষান্ত হইতে পারেন না, তবু সাহস করিয়া বলিল "দাদাকে ভাল করে বুঝিয়ে মত করালেই ভাল হয় না? বাসন্তীকে বিয়ে করলেই ওঁর পক্ষে ভাল হত।" মাতা ঈষৎ বিরক্তির সহিত কহিলেন "সে কথা আমিও জানি, সেও জানে, কিন্তু যখন আগে থেকে অন্য লোককে কথা দিয়েচে তখন সে কথার কি দাম নেই! মানুষের কথা নড়ে না। তুমি ওকে জিজ্ঞেস পড়া কর। তোমার থেকে কিছু ওকে দিতে হবে আর কি। তা হোক ঈশ্বরের কৃপায় তোমার অভাব নেই।"

কল্যাণী আসিয়া ডাকিল "দাদা?"

"কল্যাণ, আয়।" নিকটে আসিয়া চৌকি একখানা টানিয়া লইয়া শচীর পাশে সে বসিল। উভয়ে কিছুক্ষণ নীরব-হইয়া রহিল, শচীকান্ত আজিকার ব্যাপারের পর এখানকার সকলের নিকটেই একটু কুণ্ঠা বোধ করিতেছিল; কল্যাণীও একটা বাধার হাত ছাড়াইতে পারিতেছে না, কি বলিয়া কথাটা আরম্ভ করিবে! দাদা তাহাকে তো কিছু বলে নাই। ভাবিয়া শেষে বলিল "তবে কি ভাজের মুখ না দেখেই যেতে হবে দাদা? জানো তো আমি গেলে আর সহজে আসা ঘটবে না।"

কল্যাণীর স্বরে শচীকান্ত ব্যথা পাইল, অল্প লজ্জার সহিত সে তাহার দিকে চাহিয়া ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কহিল "কি করি কল্যাণী উপায় কই?" কল্যাণী সূত্র পাইল, "বেশ তবে সেই মেয়েকেই বিয়ে করো, মার আর অমত তো নেই, কে সে?" শচীকান্ত চুপ করিয়া রহিল। তাহার মনের ভিতরে বন্যার মত স্মৃতির তরঙ্গ গভীর আবেগে হৃদয়তটে আঘাত করিতেছিল। ব্যাকুল চিত্ত স্ফীতবক্ষ সমুদ্রের মত আর্ত্তস্বরে কহিতেছিল কোথা সে? সে কোথায়?"

কল্যাণীর সহসা একটা কথা স্মরণ হইয়া গেল, সে তাড়াতাড়ি কহিয়া উঠিল "তাঁর নাম কি দাদা রাণী?"

"কে বল্লে?" শচী ঈষৎ চকিত হইয়া উঠিল।

"তোমার অনেক কবিতায় দেখছিলুম 'রাণি' আছে,—

বজ্রানল লিখে যায় পাষাণে যে রেখা রাণি!

মুছিতে কি পারে তাহা শত বরষার ধারা?"

আয় রাণি, দে যা দেখা ভাঙ্গিস্‌নে ভুল,
ক্ষণিক মিলন হোক্ চিরঅনুকূল।

এমনি কতক গুলো কবিতা পড়েছি।"

শচীকান্ত ফুটন্ত জ্যোৎস্নায় মুখ তুলিয়া চারি দিকে চাহিল, চাঁদের আলো সে দিনের প্রভাতরৌদ্রের কথা মনে পড়াইয়া দিল, অস্ফুট স্বরে সে প্রীতিবিহ্বল কণ্ঠে উচ্চারণ করিল "তার নাম কমলা" বলিতে সর্ব্বশরীর যেন তড়িৎ স্পর্শে শিহরিয়া উঠিল।

"কমলা! বেশ নামটি তো! কাদের মেয়ে সে দাদা? খুব সুন্দর বোধ হয়?"

"সুন্দর বলে থামলে তাকে অপমান করা হয়। সে রূপ কল্পনার অতীত।"

কল্যাণী চমৎকৃত হইল "তবে দেরি কেন করছো দাদা, শীঘ্র শীঘ্র বিয়ে করে তাকে আনো না লক্ষ্মীটি। আমার তাকে বড়ড

দেখতে ইচ্ছে করচে নিশ্চয় তার সঙ্গে আমার খুব মিল হবে।"

"সে কোথায় কল্যাণী? তাকে কোথায় পাবো? অভিশপ্তা কমলার মত সে কোন অতলসমুদ্রে তলিয়ে গ্যাছে কে বলে দেবে?"

কল্যাণী এ হেঁয়ালির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না, সে সভয়ে বলিয়া উঠিল "সে কি বেঁচে নেই?"

"না, না সে বেঁচে আছে বই কি, সে কথা বলিনি।"

"হাঁফ ছাড়িয়া কল্যাণী কহিল "আহা তাই বলো, তবে কি হয়েচে?"

তখন শচীকান্ত সকল কথাই তাহাকে খুলিয়া বলিল—কেবল মাত্র তাহারা রাঢ়ী শ্রেণী সেইটুকুই বলিতে পারিল না। সব কথা শুনিয়া শ্রোত্রী একটা নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল, "তবে তো তাকে খুঁজে পাবার কোনই আশা দেখিনে ছোড়দা, কতদিন হয়ে গ্যাল, কোথায় তারা গ্যাছে কে জানে এতদিনে তার বিয়ে হয়েচে কিনা তাই বা কে জানে—"

কল্যাণী সহসা একটা অস্ফুট বেদনার ধ্বনি শুনিতে পাইল—"ওকথা বলিসনে কল্যাণী! আমি নিশ্চয় তাকে পাবো। আমার মন বলে সে আমার প্রতীক্ষা করচে।" কল্যাণী মুখ তুলিয়া ভ্রাতার মুখের দিকে চাহিল, প্রস্ফুট জ্যোৎস্নায় দুই স্নেহপূর্ণ নেত্র দাদার মুখের উপর স্থাপন করিয়া স্নেহতিরস্কারে কহিল "না ছোড়দা অমন ক্ষ্যাপামী করো না, কোথায় কমলা তার ঠিক নেই,—তুমি

প্রায় পনর যোল বছর বয়েস হলো সে কক্ষণো এতদিন আইবড়ও নেই।"

শচীকান্ত নীরবে উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে আকাশ পানে তাকাইয়া রহিল, কল্যাণীর কথা গুলায় অখণ্ডনীয় সত্যের সুর বাজিয়া উঠিয়াছিল, ইহাকে যুক্তিদিয়া কাটান যায় না, তাই ঔদাস্যের দ্বারায় উড়াইতে চেষ্টা করিল! কিন্তু কল্যাণী তাহার মৌনকে সম্মতির চিহ্ন ভাবিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে উঠিয়া গেল।

গিরিজাসুন্দরীর প্রকৃতি সাধারণের চেয়ে কতকটা বিভিন্ন। কল্যাণী যখন আসিয়া জানাইল শচীকান্ত বাসন্তীকে বিবাহ করিতে সম্মত, তখন তাঁহার চিত্ত হইতে এই ঈপ্সিত বিবাহ সম্বন্ধে সমুদয় আকর্ষণ ফুরাইয়া গিয়াছে। দৃঢ় ভাবে ঘাড় নাড়িয়া তিনি কহিলেন "আর হয় না।" সবিস্ময়ে কল্যাণী জিজ্ঞাসা করিল "কেন মা?"

ভদ্রলোককে না বলে যখন ফিরিয়ে দিয়েছি আবার কোন মুখ নিয়ে আমি তাঁকে ডাকতে যাবো? ওর পছন্দ হয়ে না পাওয়া যায় অন্যত্র বিয়ে হোক, কথা আমি বদলাবো না।"

গিরিজাসুন্দরীর দেবরকন্যাকে প্রত্যাখ্যান করার দিন হইতেই শচীকান্ত নিজের জন্য কতকটা চিন্তিত হইয়া পড়িল। বসিয়া থাকিলেও চিরদিন চলিতে পারে এমন উপায় সে যখন ত্যাগ করিল, তখন কিছু তো একটা উপায় করা চাই। 'ক্ষণিকের দেখা' যন্ত্রস্থ,—বিপুল উদ্যমে সাময়িক পত্রে বিজ্ঞাপনের আয়োজন করা হইতেছে কিন্তু

লোকে কবিকে চিনিবে, আদর করিবে, তবে কি উপায়? চাকরী? অধীনতা? এই শান্ত পল্লীভবনের বাধাবিহীন বিশ্রাম ভঙ্গ করিয়া কর্ম্মকোলাহল ক্লান্ত সংরের বদ্ধগৃহে আত্মনির্ব্বাসন! বড় কঠিন ত্যাগ— তবু দিনের পর দিন বিদায় কালে বলিয়া যাইতেছিল—পথ খুঁজিয়া লও, আর কতদিন?

শেষকালে একদিন মাসিমার কাছে কোন অছি·ায় বিদায় লইয়া কলিকাতা যাত্রা করিল। কলেজে থাকিতে কয়েকটি ছেলের সহিত আলাপ হইয়াছিল, দুএকজনের সঙ্গে চিঠি পত্রও চলিত, তাহাদের মধ্যে একটি যুবক সম্প্রতি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটশিপ্ একজামিনের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, বন্ধুকে সাদরে গ্রহণ করিল। এই ঘটনা সহসা শচীকান্তকে যেন চমকিয়া জাগরিত করিয়া দিল। মনে পড়িল কাশীর সেই জ্যোতিষী বলিয়াছিল "তুমি হাকিম হইবে।" এই না পথ? কর্ত্তব্য স্থির করিতে বিলম্ব হইল না। মনের সহিত যখন মিলিয়া যায় অতি ক্ষুদ্রতমের উপদেশ বা আদেশ আমরা গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত মাত্র হই না, কিন্তু মন যখন নিষেধ করে বেদবাক্য, দেবাদেশও তখন পরিত্যজ্য হয়।

সিয়ালদহ রেলওয়ে ষ্টেশনে সহসা এক ব্যক্তি আসিয়া তাহার হাত ধরিল, নারী হস্তের মত কোমল স্পর্শে শচীকান্ত চকিত হইয়া চাহিতেই একখানা অত্যন্ত পরিচিত সানন্দমুখ তাহার দুই চোখের বিস্মিত দৃষ্টিতে আবদ্ধ হইয়া পড়িল। সে মনীশ।

মনীশকে গ্যাসালোকে কি সুন্দর দেখাইতেছিল, তাহার হাস্যময় চক্ষু প্রীতি-বিকশিত,—পূর্ব্বাপেক্ষা যেন মুখের উদারতা অধিকতর বর্দ্ধিত হইয়াছিল, যৌবনের পূর্ণ তেজ একটি সলজ্জ শ্রীতে মণ্ডিত হইয়া তাহার উপরে যেন একটা স্নিগ্ধ গোলাপি আলো ফেলিয়াছিল। শচীকান্ত আজ তাহার চিরদিনের বন্ধুকে যেন নূতন করিয়া দেখিল।

বন্ধু কহিল "বাড়ী চলো আজ ছাড়ছিনে, কতদিন পরে এখন কি ছেড়ে দেওয়া যায়!"

শচীকান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ইহাতে অসম্মত হইতে পারিল না। মায়ের মৃত্যুর পর যখন কাশীর ফেরৎ বাড়ীতে উঠিয়াছিল বড়বধূর ব্যবহার তাহার ভাল লাগে নাই। মা হারাইয়া সে বুঝিয়াছে সেই দরিদ্র গৃহে মা তাহার জন্য কতখানি যোগাইয়া দিয়াছেন। যথার্থ কথা বলিতে গেলে এ বিষয়ে বড়বধূর দোষ দেওয়া চলে না, গরীবের ঘরে মা তাঁহার ছেলেটির সুখের জন্য যাহা পারেন সাধারণে সাধারণ ভাবে অন্যকে সেটুকু যোগাইব কিরূপে? গাড়ীতে উঠিয়া শচীকান্ত কহিল,

"তোমার হিন্দু-বিজ্ঞান' বইটার তো খুব নাম হয়ে গ্যাছে দেখলুম, মস্ত বড় সব পণ্ডিতের দল প্রশংসাপত্র দিয়েচেন! ও কিন্তু তুমি বৃথা সময় নষ্ট করেচ মনীশ! সাধারণের কাছে নাম করতে চাও তো কবিতা লেখ, গল্প লেখ, পার নাটক লিখে অভিনয় করতে দাও, দু দশটা পণ্ডিত ভট্টাচার্য্যির সীমায় যে যশ বদ্ধ রইল সে পেঁটরায় পোরা জহরতের মতই শুধু নিজস্ব!"

মনীশ ব্যথা পাইল। অনেক শ্রম সে এই পুস্তকখানির জন্য করিয়াছে, সার্ব্বভৌম মহাশয় স্বয়ং ও তাহার খুল্লতাত ইহার সাহায্যকারী। শচীকান্ত এত কঠোর হইয়া

ইহার সমালোচনা করিল! সে কহিল "সাধারণের নিকট যশ পাওয়াই কি লেখার এক মাত্র উদ্দেশ্য ?"

"তা বই আর কি ? এক আত্মবিনোদন, অপর খ্যাতি। সে কথা এখন থাক— তারপর মনীষার খবর কি ? না না বড় অন্যায় হচ্চে কিন্তু, আর দেরি না।" মনীশ রঞ্জিত মুখে দৃষ্টি নত করিল, কোন মতে লজ্জা ঠেলিয়া কহিল "আমিও তো সেই কথাই বলচি আর দেরি করা মানায় না, কবিকুঞ্জ শূন্য থাকা কি সাজে ?"

"কবিকুঞ্জ শূন্য নয় মনীশ, তা পূর্ণই আছে, এ অসম্পূর্ণতায় পরিপূর্ণ, বিচ্ছেদে মিলন এ রতনের স্মৃতির মন্দির কমলার কমলাসন।" "কার ?" "কমলার।"

"কমলার ?"

মনীশ চমকিয়া উঠিল। "কে কে ?" তাহার স্বর সন্দেহপূর্ণ।"

শচীকান্ত কহিল "কেন তোমায় কি আমি তার নাম বলিনি।"

(২৩)

বাড়ী ফিরিয়া মনীশ দেখিল সকলি গোল যোগ হইয়া গিয়াছে, খুড়িমা বাড়ী নাই। ত্রিবেণিতে করুণাময়ীর পিত্রালয়, বহুদিন সেখানে যাতায়াত ছিল না, মা বাপ কেহ বর্ত্তমানও নহেন, এমন সময় হঠাৎ একদিন সংবাদ আসিল তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্ম্মস্থান হইতে কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইয়া আসিয়াছেন, জীবন সংশয়, একবার ভগিনীকে দেখিতে চাহেন। শিবনারায়ণ তৎক্ষণাৎ স্ত্রীপুত্র সঙ্গে শ্বশুর গৃহে যাত্রা করিলেন, কমলাকে অকস্মাৎ কোথায় লইয়া যাইবেন—যদিও সেইখানে কমলারও মাতুলালয় তথাপি কেহ সেখানে আছে কি না আছে জানা নাই, অগত্যা বিন্ধ্যবাসিনীর হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন। মনীশ তাঁহাদের অবর্ত্তমানে শূন্যগৃহে বসিয়া থাকা অপ্রয়োজন বোধে শীঘ্র ফিরিবার উদ্যোগ করিয়া স্বপ্রতিষ্ঠিত নৈশবিদ্যালয় প্রভৃতি দেখিতে বাহির হইল। শ্রীপতি বাবু তাহার অবিদ্যমানে ইহার তদারক ভার গ্রহণ করিয়াছেন; শিবনারায়ণ ও ভক্তিনাথ উভয়েই মনীশের কার্য্যভার অংশতঃ বহন করিতে পরাঙ্মুখ ছিলেন না।

দ্বিপ্রহরে শচীকান্ত মধ্যাহ্ন নিদ্রাব্যতীত দিন কাটাইবার উপায়ান্তর না পাইয়া ইহারই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। এখন শয্যাত্যাগ করিয়া নিদ্রালসদৃষ্টি সম্মুখের মুক্ত জানালা দিয়া ইতস্তত প্রেরণ করিল। হেমন্ত প্রকৃতি ইতি মধ্যে শীতজড়ভাব ধারণ করিয়াছেন। দ্বিপ্রহরের হাওয়া রুক্ষ কিন্তু তপ্ত নহে, অলস চিত্তে জড়তা বহাইয়া দিয়া মন্দ গতিতে বায়ু বহিতেছিল। পাশের চালা-ঘরের অধিবাসীদের অঙ্গনে একটি পরিপুষ্ট গাভী আলস্যে শয়ন করিয়া মুদ্রিত নেত্রে রোমন্থন করিতেছে। কোথায় একটা অদৃশ্য চক্রের স্থিতিবারতা মধুমক্ষিকাদলের দূর হইতে ভাসিয়া আসা গুণগুণানি বহন করিতেছিল। শচীকান্ত জানালার নিকট আসিয়া পরিষ্কার নীল আকাশের দিকে চাহিল, বীচিবিক্ষেপহীন স্থির সমুদ্রের মত অনন্ত নীল, স্বর্ণাভ রৌদ্রে বৃহৎ নীলকান্ত মণিখণ্ডের মত জ্বলিতেছিল। একটি পিপাসাতুর পক্ষী দূর হইতে উড়িয়া আসিতেছে দু একটি বন্যকপোত বৃক্ষশাখায় ক্লান্ত পক্ষ ছড়াইয়া বিশ্রাম করিতেছিল।

হইতে না পারিয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া গেলেন। সকল যুদ্ধের শেষ হইলে যামিনীর প্রথম প্রহরে গৌতম ভূতকালবিষয়ক জ্ঞান লাভ করিলেন। এবং তৃতীয় প্রহরে কি কি কারণে মন্দের উৎপত্তি হয় তাহা জ্ঞাত হইয়া মহানন্দে গাহিতে লাগিলেন ;—

"বহুজন্ম ধরিয়া আমি এই মর্ত্ত্য আবাসের নির্ম্মাণকর্ত্তার অন্বেষণ করিয়াছি কিন্তু তবুও পুনঃ পুনঃ জন্ম ও জরার হাত হইতে অব্যাহতি পাই নাই। এক্ষণে আমার এই গৃহনির্ম্মাতার সন্ধান পাইলাম, আর তোমাকে আমার জন্য গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইবে না। কড়ি ও বরগা পড়িয়া গিয়াছে, এবং বাসনার নিবৃত্তি হওয়াতে পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণের হাত হইতে মুক্তি লাভ করিলাম।"

প্রথম উপদেশ দানকালে বহুলোকের সমাগম হইল। তিনি মগধী ভাষায় কহিলেও শ্রোতামাত্রেই মনে করিতে লাগিল তিনি তাহার ভাষায় কথা কহিতেছেন। মারের সহিত যুদ্ধের পাঁচ মাস পরে বুদ্ধের শিষ্যসংখ্যা ৬০জন হইয়াছিল। বুদ্ধ কহিলেন, "হে শিষ্যগণ যাও তোমরা লোকের মঙ্গলার্থ ও আনন্দবর্দ্ধনার্থ জগতের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া এই পরমধর্ম্মের তত্ত্ব জ্ঞাপন কর।'

বর্ষাকাল ব্যতীত বৎসরের প্রায় অধিকাংশ কাল গৌতম ভ্রমণ করিয়া স্বীয় ধর্ম্মমত জনসাধারণের নিকট ব্যাখ্যা করিতেন। গৌতম জাতিভেদ প্রথা মানিতেন না, এবং সকল জাতীয় লোককেই শিষ্য করিতেন। উপযুক্ত বিবেচনায় তাহাদিগকে যাজকের পদেও নিযুক্ত করিতেন। গৌতম, শিষ্যদিগকে আর কাহারও উপর নির্ভর না করিতে পরামর্শ দিতেন। তিনি বলিলেন "হে আনন্দ, তোমরা আপনারা বর্ত্তিকাস্বরূপ হইও ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্বটী প্রদীপের ন্যায় ধরিয়া থাক। আপনাদিগের উপর নির্ভর কর। অন্যের আশ্রয় লইও না।"

অনন্তর গৌতম বৈশালী নগরের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে শিষ্যগণকে সমবেত করিয়া বলিলেন, "অনতি বিলম্বেই তথাগতের মহানির্ব্বাণ লাভ হইবে। অদ্য হইতে তিন মাস গত হইলেই তথাগতের মৃত্যু হইবে।"

তাঁহার শেষ কথা এই।—ভ্রাতৃগণ, দেখ সমস্ত সৃষ্ট বস্তুরই পতন আছে। অতএব যথাসাধ্য আপন আপন সিদ্ধি লাভের যত্ন কর। এ সংসারে আমাদিগের যে সকল প্রিয়জন আছে, সে সকলকে ছাড়িয়া যাওয়াই স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। অতএব মন দিয়া সকল কার্য্য কর, একদিন সকলকেই এই দুর্ব্বিষহ যাতনা হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইবে।" কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন এবং এই অচৈতন্যাবস্থাতেই গৌতমের মানবলীলা সংবরণ হইল।

খ্রীঃ পূঃ ১৭৬ সালে চীনবাসীগণ প্রথমে বৌদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারকদের মুখে বৌদ্ধধর্ম্মের কথা শুনিতে পায়। ৬০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট মাঙ্গতি ভারতবর্ষে কতিপয় লোক পাঠাইয়া দেন। তাঁহারা একাদশবর্ষ ভারতবর্ষে অবস্থান করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যান। প্রত্যাবর্ত্তনকালে তাঁহারা বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি ও কতকগুলি বৌদ্ধগ্রন্থ সঙ্গে লইয়া চীনদেশে গিয়া পিটকাদিগ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছেন। পঞ্চমশতাব্দীতে ফা-হিয়ান নামক একজন বিখ্যাত চীনপর্য্যটক

বৌদ্ধগ্রন্থ সংগ্রহ করিবার অভিলাষে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। চতুর্দ্দশ বৎসর ভারতে থাকিয়া তিনি বহু জনপদ ও বৌদ্ধমন্দিরে গমন করিয়া, বিস্তর বৌদ্ধগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া সিংহল হইতে জলপথে স্বদেশে গমন করেন। তিনি বুদ্ধের অস্থিও সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। চীনেরা ঐ সকলের যথেষ্ট সমাদর করিয়াছিল। ফা হিয়ান স্বদেশে গেলে পর তথায় বৌদ্ধধর্ম্মের অতিশয় প্রভাব বিস্তার হইয়াছিল। এমন কি পর পর কয়েকজন সম্রাটও বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ ও শ্রমণ বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। কমফুসীয় মতাবলম্বী অনেকে বৌদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেও ইহার কোন অনিষ্ট করিতে সমর্থ হন নাই। নানা প্রকারে বাধা প্রদান সত্ত্বেও বিস্তর বৌদ্ধমন্দির নগরে নগরে নির্ম্মিত হইয়া তন্মধ্যে বৌদ্ধের অস্থি স্থাপিত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে দক্ষিণ রাজধানী নানকিনস্থ পাগদাই সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। এই মন্দির নয় তালা, চীনে মাটি দ্বারা প্রস্তুত।

চীনের বুদ্ধ ঠিক চীনামান্দারিণের অনুরূপ। কারণ নিজ নিজ আকৃতি অনুযায়ী আপন আপন উপাস্যদেবকে প্রস্তুত করিয়া লওয়াই স্বাভাবিক, ইহাতে মনের তৃপ্তি এবং সন্তোষ সাধন হয় সন্দেহ নাই। তজ্জন্য মান্দ্রাজ প্রদেশের দেবদেবীর ছবি তদ্দেশের লোকের আকৃতির অনুরূপ। উড়িষ্যার দেবদেবী উড়িয়াদিগের অনুরূপ। বঙ্গদেশের দেবদেবী বাঙ্গালীদের অনুরূপ,—ইহা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন। চীনের বর্ত্তমান ধর্ম্ম পূর্ব্বোক্ত তিন ধর্ম্মের সংমিশ্রণের ফল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহাদিগকে খাঁটি বৌদ্ধ বা

উল্লিখিত ধর্ম্মত্রয় ব্যতীত চীনবাসীগণ পিতৃগণের আরাধনাও করিয়া থাকে। তাহাদের মতে পিতামাতার সম্পূর্ণ আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চলিলে সমস্ত কর্ত্তব্য পালন করা হইল। প্রত্যেক গৃহস্থের বাটীতে এক হাত দীর্ঘ ও পাঁচ অঙ্গুলি প্রশস্ত এক একখানি তক্তি থাকে। উক্ত তক্তিতে পিতৃগণের নাম, পদ, জন্ম ও মৃত্যু তারিখ লিখিত থাকে। প্রাতঃকালে ও বৈকালে চীনেরা ঐ তক্তিকে ভক্তিভাবে প্রণাম করে। গুরুজনকে ভক্তি প্রদর্শনই ইহার উদ্দেশ্য। চীনবাসীদিগকে পরলোকগত পিতৃগণের অশন, বসন, টাকাকড়ি এমন কি চাকর চাকরাণী পর্য্যন্ত যোগাইতে হয়। জীবিতাবস্থায় যিনি যাহা ভালবাসিতেন বৎসরের তৃতীয় মাসে তাঁহাকে তাহাই উৎসর্গ করিতে হয়। মুরগী, হাঁস, সিদ্ধ শূকরমাংস, চা এই গুলি প্রধান উপকরণ। পিতৃগণের উদ্দেশে উক্ত উপকরণগুলি উৎসর্গ করিয়া তাহারা সপরিবারে ঐগুলির কতক নিজেরা উদরস্থ করে, কতক, দরিদ্রগণকে বিতরণ করে। ইহা ছাড়া জামা, কাপড়, টেবিল, চৌকি, টাকাকড়ি প্রভৃতি যাহা দেওয়া হয় তাহা সমস্তই কাগজের প্রস্তুত। উৎসর্গের পর ঐ গুলি পুড়াইয়া ফেলা হয়। এমন কি দাসদাসী পর্য্যন্তও কাগজ দিয়া প্রস্তুত করিয়া দাহ করা হয়। উহাদের দৃঢ় বিশ্বাস, পিতৃগণ ঐ সকল জিনিস পরকালে যথাযথ ভোগ করিয়া সুখী ও সন্তুষ্ট হন। অন্যথা তাঁহারা অসন্তুষ্ট হইয়া সন্তানগণকে শাস্তি প্রদান করেন। বিদেশে মৃত্যু হওয়া চীনাদের মধ্যে

পিতৃগণের অন্নবস্ত্র যোগাইতে কোন প্রকার ত্রুটি করিলে পরিবারের মধ্যে নানা প্রকার পীড়া ও বিপদ ঘটিয়া থাকে। চীনবাসীরা মৃত আত্মীয়গণের কবর সাজাইয়া রাখা ও মেরামত করাকে পুণ্য কর্ম্ম বলিয়া মনে করে। গ্রামের নিকটে পাহাড় থাকিলে সাধারণতঃ সেখানেই কবর দেওয়া হয়। প্রত্যেক পরিবারের জন্য একখণ্ড জমি কবর দিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকে।

কন্যিন নামে একজন বৌদ্ধ তপস্বিনী ছিলেন। লোকের বিশ্বাস দেহান্তে তিনি দেবত্ব পাইয়াছিলেন। এই দেবতা চীনদেশের ষষ্ঠী। ইঁহার কৃপায় না কি সন্তান লাভ হয়। তথাকার রমণী সমাজে এই দেবতার ভারি আদর, বুদ্ধদেব অপেক্ষাও বেশী বলিলে অসঙ্গত হয় না। আমাদের বঙ্গদেশেও এই দেবীর আদর বড় কম নয়। ইঁহার কৃপা বাঙ্গালার উপরও অসীম।

আমাদের ধনদেবী লক্ষ্মী। কিন্তু চীনাদের ধনদেবতা 'যুয়েন-তন-পুং'। এই নামে একজন খুব দুর্দ্দান্ত লোক ছিল। তাহার বাহন ছিল একটা বাঘ। তাহার হাতে একটা মুক্তা থাকিত সেটাকে মাটিতে ফেলিয়া দিলে কামানের মত শব্দ হইত। মৃত্যুর পর ইনিই ধনদেব পদে বরিত হন। এই দেবতার আবার দুই জন মন্ত্রী আছে। চীনে গৃহস্থের রান্নাঘরে এক কাগজের দেবমূর্ত্তি থাকে, ইনি পাকঘরের দেবতা। পরিবারস্থ সকলে কে কি পাপ করে এই দেবতা তাহার হিসাব রাখে। স্বর্গস্থ সম্রাট ও উক্ত পরিবারের মধ্যে মধ্যস্থতা করাই উঁহার কাজ। সুতরাং সকলে এই দেবতাকে বিশেষ ভয় ও মান্য করে।

দ্বাররক্ষক দেবতা।—চীনে প্রায় প্রত্যেক গৃহের দ্বারে এই দেবতার ছবি অঙ্কিত থাকে। নববর্ষের প্রথম দিনে পুরাতন ছবি মুছিয়া ফেলিয়া নূতন ছবি আঁকিয়া দেওয়া হয়।

শ্রীআশুতোষ রায়।

আমার শ্রোতা

শব্দ অর্থ জ্ঞান নেই তার
জানে নাক্ তানমান লয়,
একটি আলোর কণিকা সে,
বয়স শুধু বছর ছয়!
মায়ের মুখে ছন্দে কথা
শুনে কিন্তু আকুল তিনি,
কবিতার সে খাতাখানির
খবর রাখেন নিশিদিনই!
নাইক কোনই পরিচয়
বর্ণমালার সাথে তাঁর,
পাত উল্‌টিয়ে আঙ্গুল ঠেরে
ফরমাস তবু বারেবার—

"এইটে পড়," "ঐটে শোনাও"
"আহা এটি চমৎকার!"
বল্‌তে বল্‌তে র'সে ম'জে
ঘাড় নাড়ামর কি বাহার!
হাততালি ও পায়ের তালি
তালুতালি—টুটুক্ টাক্—
লয়ে লয়ে আর সমে ফাঁকে
সঙ্গত চলে ঠিক ঠাক!
গুণীজনের সভায় যেন
কতই গুণজ্ঞের হাট,
অভাব আমার নেইক কিছু
বজায় আছে পূরা ঠাট!

গিলগিটবাসীদিগের আমোদ প্রমোদ

(৩)

খুরান বা মাজারি উৎসব

'চিলাসে' এবং তন্নিকটবর্ত্তী 'জালকোট,' পলাস্, কোলি, দারেল, টানগীর, গর, হরবর্ণ এবং সাজিন উপত্যকায় এই খুরান বা মাজারি উৎসব সম্পন্ন হয়। দুই ব্যক্তি বা দুই দলের মধ্যে প্রাধান্য লইয়া বিবাদ বাধিলে এই অপূর্ব্ব উৎসব দ্বারা গোলযোগের মীমাংসা হইয়া থাকে। এই উৎসব 'সিনাকি' নামক স্থানে 'খুরান' এবং 'কোহি স্থানে' মাজারি' বলিয়া অভিহিত হয়। উভয় পক্ষ প্রচুর পরিমাণে ভোজনের ব্যবস্থা করে এবং প্রত্যেক পক্ষই প্রতি পক্ষকে ভোজে পরাস্ত করিয়া স্বীয় ধন সম্পত্তির শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপন করিতে চেষ্টিত থাকে। ভোজের দিবস বহু লোক উদর দেবের সেবা করিয়া উভয় পক্ষের ভোজ সম্বন্ধে মতামত প্রদান করে, এবং কোন পক্ষ অধিকতর ধনবান ও ক্ষমতাশালী ইহা এই এক ভোজেই প্রতিপন্ন হইয়া যায়। পরাজিত ব্যক্তি বা দলকে অপর পক্ষের নিকট মাথা নোয়াইয়া থাকিতে হয়।

দানিয়াল বা ফকিরগণের কেরামত

গিলগিটে আর এক শ্রেণীর লোক আছে —তাহাদিগকে দানিয়াল বলে। এই সম্প্রদায়ের স্ত্রীপুরুষগণ মন্ত্রবলে ভূত প্রেত জিন ও অন্যান্য অপদেবতা আনয়ন করিয়া কোন ব্যক্তির ভূত ভবিষ্যৎ জানিয়া লইতে পারে। কোন মণ্ডল বা প্রধান স্বীয় ভবিষ্যৎ জীবনের ঘটনাবলী কিংবা দেশের সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তিকে এবং স্থানীয় বাদকদলকে আহ্বান করিয়া লইয়া আইসে। কতকগুলি সতেজ শ্যামল 'চিলি' পত্র ঘৃত-সিক্ত করিয়া অগ্নির উপর স্থাপন করে এবং একখানি সরা বা অন্য প্রকারের ঢাকনি দ্বারা ঢাকিয়া রাখে। অগ্নি হইতে ধূম নির্গত হইবা মাত্র একজন কি দুই জন 'দানিয়াল' দ্রুতগতিতে সেই দিকে ধাবিত হয় এবং উত্থিত ধূম্রের আঘ্রাণ লইতে থাকে। এই রূপে আঘ্রাণ লইতে লইতে তাহারা জ্ঞান হারা হইয়া উন্মত্তের ন্যায় বাজনার তালে তালে নৃত্য করিতে থাকে। এই নৃত্য সময়ে তাহারা চিলি পত্র চর্ব্বণ করে। ক্রমে ঢাক্ অতি প্রচণ্ড ভাবে দ্রুত বাজিয়া উঠে এবং দর্শকবৃন্দ ঘন ঘন আনন্দধ্বনি করিয়া তাহা-দিগকে উৎসাহিত করে। দানিয়ালগণ মধ্যে মধ্যে নিকটবর্ত্তী বৃক্ষসমূহের দিকে সতৃষ্ণ নেত্রে চাহিয়া দেখে যে তাহাতে দানব, দৈত্য বা জিনের অধিষ্ঠান হইয়াছে কিনা। কিছুক্ষণ নৃত্যের পর দানিয়ালগণ বাদ্যকরদিগের স্কন্ধে হস্ত স্থাপন করিয়া ঢাকের উপর কর্ণ রক্ষা করে, যেন ঢাক কি বলিতেছে তাহা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিতেছে। তৎপরে পুনরায় প্রচণ্ড ভাবে বাদ্যের তালে তালে নৃত্য করিয়া ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ঢাকের উক্তি গান করিয়া প্রকাশ করে। দানিয়ালগণের নৃত্য বাসরে যদি কেহ রক্ত বস্ত্র পরিধান করিয়া আসে তাহা হইলে তাহারা বিরক্তভাবে

দ্রুত ধাবিত হয়। এই নিমিত্ত রক্ত বস্ত্রপরিহিত কোন ব্যক্তিকে নৃত্যাবসরে উপস্থিত হইতে দেওয়া হয় না। এই প্রকারে এক ঘণ্টা নৃত্যের পর উৎসব শেষ হইলে কতিপয় বলিষ্ঠ ব্যক্তি সেই স্থানে আগমন পূর্ব্বক দানিয়ালগণকে পৃষ্ঠে করিয়া অপর একটী গৃহে লইয়া যায় এবং কিয়ৎকাল বিশ্রামের পর তাহারা অপদেবতার আক্রমণ হইতে মুক্ত হয়। এই দানিয়াল সম্প্রদায়ের প্রত্যেকেরই দানিয়ালত্ব প্রাপ্তি সম্বন্ধে এক একটী অদ্ভুত গল্প আছে।

একটী স্ত্রী-দানিয়াল তাহার দানিয়ালত্ব প্রাপ্তি সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় বলিয়াছিল যে—"আমি ৭।৮ বৎসর বয়সের সময় গরু লইয়া পাহাড়ে যাইতাম। একদিন হঠাৎ দেখিলাম যে একটী পরী চিলি বৃক্ষের শাখায় বসিয়া শ্যামলপত্র ভক্ষণ করিতেছে। পরীর চক্ষু দুইটী আগুনের মত উজ্জ্বল এবং তাহার নিবিড় ঘনকৃষ্ণ ভ্রূযুগল চক্ষু হইতে অনেক উর্দ্ধে—প্রায় চুলের কাছাকাছি শোভা পাইতেছে। আমাকে দেখিয়া পরী আমার নিকটে আসিয়া বলিল—"আয় আমার সঙ্গে আয়! আমি সোনার বাড়ীতে থাকি। সেখানে গেলে খুব ভাল ভাল জিনিস খেতে দিব।"

পরীর কথা শুনিয়া আমি সংজ্ঞালুপ্ত হইয়া নিকটবর্ত্তী নদীগর্ভে পতিত হইলাম এবং দক্ষিণ উরুতে সাতিশয় আঘাত প্রাপ্ত হইলাম। কতকগুলি কৃষ্ণবালক দূরে গরু চরাইতেছিল, তাহারা আমাকে পড়িতে দেখিয়া নদীগর্ভ হইতে উঠাইয়া নিকটবর্ত্তী গ্রামে লইয়া গেল। আমি পরী বা জিন দ্বারা আবিষ্ট হইয়াছি

পিতা একটী ছাগ হত্যা করিল। আমি সেই সমস্ত রক্ত পান করিয়া ফেলিলাম এবং অজ্ঞানাবস্থায় এই সকল ব্যাপারের বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারিলাম না। এই প্রকারে অনাহারে প্রায় ১০ দিন সংজ্ঞালুপ্ত অবস্থায় কাটিয়া গেল। এই সময় যে সকল দানব, দৈত্য, জিন্, পরী আমার নিকট আসিয়াছিল তাহারা সংখ্যায় ১৪টীর কম হইবে না। তন্মধ্যে ৭ জন মুসলমান এবং ৭ জন হিন্দু, এই দুই দল পৃথক পৃথক স্থানে থাকিত। ইহাদের রাণী হিন্দু এবং তাহার পোষাক ফকীরের মত এবং মস্তকে কেশকলাপ চূড়া করিয়া বাঁধা ও তাহার উপর একটী টুপী। তাহারা আমার নয়ন সমক্ষে নানা প্রকার খাদ্যদ্রব্য রাখিয়াছিল কিন্তু একটীও খাইতে দেয় নাই, এই কয় দিবস তাহারা আমাকে নৃত্য ও নানা প্রকার ইন্দ্রজাল বিদ্যা এবং 'গানো' ও "উইও" মন্ত্রদ্বয় শিক্ষা দিয়াছিল।

গানোমন্ত্র—আমি বাঁধ্‌ব—বাঁধ্‌ব—বাঁধ্‌ব। আমি 'ত্রাখানের' পরীকে বাঁধ্‌ব। আমি 'জুলির' মেয়ে হাজুলিকে বাঁধ্‌ব। আমি 'গামুলির' মেয়েকে বাঁধ্‌ব। এই প্রকারে —পায়ের তলা, ভিও রাক্ষস, পোকামাকড়, দানব দৈত্য, বন্যজন্তু, ঘোড়া, গাধার বাচ্চা, মেষশাবক, ছাগ, বন্দুকের গোলা, বন্য হরিণ, ছাগাদিচারণের ভূমি, পরীদের বাসস্থান, দৈত্যের চাতুরী, গর্ভবতী স্ত্রীলোক, যোদ্ধ্ পুরুষ, আকাশের নক্ষত্র, বসুন্ধরা, সাত শত পরী, সমুদ্র, ঝরণা, পাহাড় পর্ব্বত, ভগবানের সৃষ্টি, ঢাকের শব্দ, চিলিগাছ, সাপ, বাঁশীর শব্দ, গরুবাছুর প্রভৃতি বস্তু, ব্যক্তি [illegible]

'গানো' মন্ত্রে তাহারা বান্ধিয়া ফেলে এবং 'উইও' মন্ত্রে আবার সকলে মুক্ত হয়।

'উইও মন্ত্র'

আমি খুল্‌ব খুল্‌ব খুল্‌ব। আমি এখানের পরীকে খুল্‌ব। আমি 'জুলির' মেয়ে 'হাজুলিকে' খুলব—ইত্যাদি ইত্যাদি।

কোন ব্যক্তিকে জিনাবিষ্ঠ বা ভূতাবিষ্ট করিতে হইলে বা তাহার মানসিক চিন্তা, বা ইচ্ছাকে বিভিন্ন পথে পরিচালিত করিতে হইলে একখানি ক্ষুদ্র পাথর 'গানো' মন্ত্র দ্বারা মন্ত্রপূত করিয়া নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতি চালনা করিয়া দেয়। আবার এই রূপে মন্ত্রাবিষ্ট কোন ব্যক্তিকে মুক্ত করিতে হইলে উইও মন্ত্রপূত পাথর পূর্ব্ববৎ নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতি চালনা করা হয়।

জটিনী দেবী

গিলগিটের ৩ মাইল পশ্চিমে 'কারঘা' এবং 'নওপুর' নালার মধ্যবর্ত্তী একটী পর্ব্বত শৃঙ্গে এই দেবতা অবস্থিত। পর্ব্বত গাত্রে সুবৃহৎ বৌদ্ধমূর্ত্তি দণ্ডায়মান। এই মূর্ত্তিটী ভূমি হইতে প্রায় ৩০ ফিট উচ্চে স্থাপিত। এই মূর্ত্তির গঠন প্রণালী এবং অবস্থান দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে এই স্থান এক সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদিগের বসতি ছিল এবং মূর্ত্তিটিও তৎসাময়িক। স্থানীয় অধিবাসীগণ এই মূর্ত্তিকে জটিনী অর্থাৎ রাক্ষসী আখ্যা প্রদান পূর্ব্বক এতদ্ সম্বন্ধে একটী অতি কৌতুহলপ্রদ গল্পের সৃষ্টি করিয়াছে। তাহারা বলে যে গিলগিটের রাজা অর্থাৎ 'রা' শ্রীবাদৎ রাক্ষসবংশীয় ছিল এবং তাহার জটিনী ভগিনী উভয়েই মনুষ্যের মাংস খাইতে ভাল বাসিত ও যতলোক এই পথ দিয়া গমনাগমন করিত তন্মধ্যে অর্দ্ধেক লোককে ছাড়িয়া দিয়া অপরার্দ্ধ বিনাশ করিত। বহুদিন পর্য্যন্ত রাক্ষস রাজপুত্র অনেক লোকের প্রাণ সংহার করায় গ্রামবাসিগণ অত্যন্ত ভীত ও দুঃখিত চিত্তে কালযাপন করিতেছিল। অবশেষে "শোগ্নিও" নামক একজন ওস্তাদ ফকীর এই প্রকার নরহত্যার বিষয় অবগত হইয়া দানবীকে হত্যা করিবার এক উপায় উদ্ভাবন করিল এবং এই উপায়ে শত শত লোক রাক্ষসীর করাল কবল হইতে রক্ষা পাইল। ফকীর একদল সাহসী লোকের সহিত একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করতঃ উল্লিখিত পর্ব্বতের পাদদেশে একটী ক্ষুদ্র অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করিয়া অগ্নিকুণ্ডের চতুর্দ্দিকে মণ্ডলাকারে বসিল, বসিয়া অগ্নিকুণ্ডে চিলিপত্র নিক্ষেপ করিয়া তাহার আঘ্রাণ লইতে লইতে জিনাবিষ্ট হইয়া নাচিতে নাচিতে নানা প্রকার মন্ত্র গান করিতে লাগিল এবং তাহার সঙ্গীগণও সঙ্গীতে যোগদান করিল। এদিকে জটিনী প্রচুর আহার লাভ হইবে মনে করিয়া যেমন তাহাদের নিকট আসিল, অমনি ফকীর গান করিয়া বলিল—"ওগো রাজার রূপসী কন্যা! তুমি কি জাননা যে আজ তোমার পিতা মরিয়াছে!"

ইহা শুনিয়া রাক্ষসী তাহার দক্ষিণ হস্তদ্বারা বুকে আঘাত করিতে লাগিল। এই সময় ফকীর তাহার হস্তস্থিত লোহার লম্বা পেরেক গুলির মধ্যে একটী লইয়া এমন সবলে নিক্ষেপ করিল যে সেইটী তাহার দক্ষিণ

বহুদূর ভেদ করিয়া ফেলিল। তৎপর "শোগ্নিও" অপর একটি গান গাহিয়া বলিল —"ওগো সুন্দরী রাজকন্যা! তুমি কি জান না যে তোমার ভ্রাতাও আজ মরিয়াছে।" ইহা শুনিয়া জটিনী অপর হস্তে তাহার উরুতে আঘাত করিতে লাগিল। ফকীরও ক্ষিপ্র হস্তে অন্য একটী লৌহশলাকা দ্বারা সেই হস্তখানি উরুর সহিত পর্ব্বত গাত্রে বিদ্ধ করিয়া দিল। এই প্রকারে পর্ব্বতগাত্রে দৃঢ়বদ্ধ হওয়ায় জটিনী কোন প্রকারে প্রতিশোধ লইতে পারিল না। অধিকন্তু ফকীর অন্য একটী মন্ত্রদ্বারা দানবীকে প্রস্তরে পরিণত করিয়া ফেলিল, এই শুভ সংবাদে গ্রামবাসীগণ যারপর নাই আহ্লাদিত হইল।

এই ঘটনার পর হতভাগ্য ফকীর তাহার সঙ্গীগণকে বলিয়াছিল যে—"আমার মৃত্যুর পর এই জটিনীর নিকট আমার দেহ কবর দিস্ নচেৎ এই দানবী পুনরায় জীবিত হইয়া সকলকে খাইতে থাকিবে।"

ফকীরের কথা শুনিয়া গ্রামবাসীগণ ভীত হইল এবং গুপ্ত সভা করিয়া এই স্থির করিল যে "শোগ্নিও" ফকীর কোথায় কখন মরিবে তাহা কে বলিতে পারে; আর যদি সে কোন দূরদেশে মরে বা যদি নদীতে ডুবিয়া প্রাণ হারায় তাহা হইলেত আর তাহার মৃতদেহ পাইবার উপায় থাকিবে না। সুতরাং অনেক তর্কবিতর্কের পর ফকীরকে হত্যা করাই স্থির হইল এবং সেই ভয়ানক কার্য্য সাধন করিবার নিমিত্ত একজন লোক নিযুক্ত হইল ও ফকীরকে হত্যা করিয়া জটিনীর পার্শ্বে কবর দিয়া ফেলিল।

একটী বৌদ্ধমূর্ত্তির উপরে গিলগিটবাসীগণ এত বড় একটা কাহিনী সৃষ্টি করিয়াছে—সুতরাং তাহাদের উর্ব্বর মস্তিষ্কের প্রশংসা নিঃসন্দেহে করিতে হইবে। এ মূর্ত্তিটী স্ত্রী কি পুরুষ তাহাও তাহারা ভাবিয়া দেখিবার অবসর পায় নাই।

অশুভ দর্শন

পুনঃপুনঃ পারিপার্শ্বিক প্রধানগণ কর্ত্তৃক গিলগিটবাসীগণ আক্রান্ত ও উৎপীড়িত হওয়ায় বোধ হয় তাহারা প্রকৃতির নানা বৈষম্য হইতে নিজেদের অমঙ্গলের চিহ্ন ধারণা করিয়া লয়। যেমন—

(১) যদি কোন কোন সময়ে অতিবৃষ্টি হয় তবে তাহারা মনে করে যে 'ইয়াসীনে'র প্রধানমহাশয় গিলগিট অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে।

(২) যদি আকাশে একসময়ে বহুসংখ্যক চিল উড়িতে দেখা যায় তবে তাহারা মনে করে যে 'নাগার'বাসীগণ শীঘ্রই গিলগিট আক্রমণ করিবে।

(৩) যদি গিলগিটে ঘন ঘন ব্যাঘ্রের উৎপাত হয় এবং পশ্বাদির গুরুতর অনিষ্ট সাধন করে তবে 'হুনজার' প্রধান মহাশয় গিলগিট আক্রমণ এবং লুণ্ঠন করিতে অগ্রসর হইতেছে ইহা স্থির করে।

(৪) যদি কোন বৎসর প্রচুর পরিমাণে শস্যোৎপন্ন হয় তবে 'পুনিয়ানের' প্রধান শীঘ্রই গিলগিট আক্রমণ করিবেন ইহা সিদ্ধান্ত করে।

চন্দ্রগ্রহণ

চন্দ্রগ্রহণ সম্বন্ধে তাহাদের ধারণা অতি অদ্ভুত। তাহারা বলে যে গ্রহণ নামে

একটা রাক্ষস আছে, সে চন্দ্রকে অতিশয় ভালবাসে। ১৪শ মাসে গ্রহণের সময় চন্দ্র যখন ষোলকলায় পূর্ণ হয় অর্থাৎ পূর্ণ সৌন্দর্য্য প্রাপ্ত হয় তখন গ্রহণ রাক্ষস তাহার নিজের ইচ্ছা মত চন্দ্রকে একদিন আলিঙ্গন করে। চন্দ্রের যে অংশে ডুমুর গাছ আছে সেই অংশটা নাকি কেবল স্পর্শ করে না। গ্রহণ সময়ে গিলগিটবাসীগণ তাহাদের রুটি প্রস্তুতের তাওয়া ঢাকের মত করিয়া পিটিতে থাকে এবং সমস্বরে চীৎকার করিয়া বলে—"ওহে গ্রহণ রাক্ষস! আমরা সকলেই ঢাক বাজাইয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিতেছি। শীঘ্র চন্দ্রকে ছাড়িয়া দাও। নচেৎ তোমাকে এখনই আমরা আক্রমণ করিব।" এইরূপে গ্রহণ শেষ হইয়া যায় এবং তাহারা গ্রহণ রাক্ষসকে পরাস্ত করিয়াছে মনে করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে।

সূর্য্যগ্রহণ

সূর্য্যগ্রহণ সম্বন্ধে তাহাদের মত এই যে যখন কোন প্রজাবৎসল রাজার মৃত্যু হয়, কিম্বা তাঁহাকে যদি কোন কারণে নির্ব্বাসিত করা হয়, তাহা হইলে গ্রহণ-রাক্ষস সূর্য্যের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয় এবং সূর্য্যদেবের মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া সমস্ত পৃথিবীকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করতঃ মৃত বা নির্ব্বাসিত রাজার জন্য বেদনা প্রকাশ করে।

পৃথিবীর উৎপত্তি

পৃথিবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে তাহাদের এই ধারণা যে, প্রথমতঃ পৃথিবী জলময় ছিল। তবে স্থানে স্থানে সেই জল জমিয়া বরফাকারে ছিল। সেই বরফের উপর রাক্ষসরাজ 'জামলোহল সিং' তাঁহার রাক্ষস অনুচরবর্গের সহিত রাজ্য শাসন করিত। একদিন তাহারা একটি সভা করিয়া জলতল হইতে পৃথিবীটাকে উদ্ধার করিতে সংকল্প করিল। রাক্ষসরাজ বলিলেন যে এইকার্য্য আমাদের ক্ষমতার অতীত হইলেও আমি একটী ব্যাঘ্রকে জানি তাহার নাম "বোজেরশাল"—সে "মিলগামক" নামক স্থানে বরফের উপর বাস করে,—সে তাহার অপূর্ব্ব গুণগ্রাম ও কৌশল দ্বারা এই কার্য্য সাধন করিতে পারে। তদনুসারে রাক্ষসগণ "সৌভাগ্যকে" দূত স্বরূপ ব্যাঘ্রের নিকট পাঠাইল, কিন্তু ব্যাঘ্র এই বলিয়া আসিতে অস্বীকৃত হইল যে—"সৌভাগ্য" সকলেরই গোলাম—সুতরাং বিশ্বাস করিয়া আমি তাহার সহিত যাইতে পারি না। তৎপর রাক্ষসগণ বিশ্বাসকে দূত স্বরূপ ব্যাঘ্রের নিকট প্রেরণ করিল এবং তাহার সহিত ব্যাঘ্র রাক্ষসরাজের নিকট উপস্থিত হইল। রাক্ষসরাজের নিকট সকল বিবরণ শুনিয়া ব্যাঘ্র কহিল যে "গরইপাট্টান" নামে একটী পক্ষী "কক্সাস্" (coxus) পর্ব্বতে বরফের উপর বাস করে। তাহাকে অনতিবিলম্বে আনাইবার ব্যবস্থা করুন। রাক্ষসরাজ 'সৌভাগ্য'কে দূত স্বরূপ প্রেরণ করিলেন—কিন্তু পক্ষীরাজ তাহার সহিত আসিলেন না। সুতরাং পুনরায় বিশ্বাসকে প্রেরণ করা হইল; পক্ষীরাজ আসিয়া রাক্ষসরাজের নিকট উপস্থিত হইলেন। রাক্ষসরাজ নিকটবর্ত্তী একটী ইন্দুরকে খবর পাঠাইলেন এবং ইন্দুরও খবর পাইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। সমস্ত ঠিক হইলে

পর ব্যাঘ্র হুকুম দিল যে—হে রাক্ষসরাজ তুমি জলের উপর স্তম্ভের স্থায় দণ্ডায়মান হও। হে "গড়াই পাট্টান" বিহঙ্গরাজ তাহার উপর পক্ষবিস্তার করিয়া উপবেশন কর এবং ইঁদুর তুমি বরফে ছিদ্র ক'রয়া নিম্ন হইতে মাটী আনিয়া পক্ষীরাজের পাথার উপর মৃন্ময়ী পৃথিবীর সৃষ্টি কর।

ব্যাঘ্রের আজ্ঞানুসারে তৎক্ষণাৎ কার্য্য আরম্ভ হইল এবং এইরূপে পৃথিবীর উৎপত্তি হইল।

নীলু বাট (নীল রঙের প্রস্তর পীঠ)

বর্ত্তমান টেলিগ্রাফ আফিসের নিকট একখানি প্রায় ১ গজ লম্বা প্রস্তর আছে তাহাকে "নীলু বাট" বলে। এই প্রস্তর বেদীর নিকট প্রত্যেক রাজাকে ভূমি চুম্বন করিয়া প্রণাম করিতে হয় এবং প্রথম অভিষেকের সময় এই বেদীর নিকট রাজাকে রাজমুকুটে বিভূষিত করা হয়। এই স্থানে সকলে—রাজার অনুগত হইয়া সর্ব্বদা আজ্ঞা পালন করিব এবং রাজার সহায়তা করিব এই বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। এই দিন গ্রামবাসী সকলে নূতন রাজাকে (রা) দর্শন মানসে সমবেত হয় এবং অভিষেকোপযোগী ক্রিয়াদির অনুষ্ঠান করে। মনোনীত রা অর্থাৎ রাজার হস্তে গ্রামবাসীগণ আপনাদের সুখদুঃখ, বিপদ আপদ আবেদন সকলই চিরদিনের জন্য অর্পণ করিয়া দেয় এবং তাহাদের ভাগ্যবিধাতা স্থির হইয়া যায়। তৎপর সমবেত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কয়েকজন বহন করিয়া লইয়া আইসে এবং অভিষেক বার্ত্তা চতুর্দ্দিকে প্রচার করিয়া দেয়।

অভিষেক উৎসব সম্পন্ন হইলে—রাজার আশীর্ব্বাদভাজন হইবার নিমিত্ত সকলে ধীরে ধীরে রাজার হস্ত চুম্বন করে এবং প্রাণ খুলিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া যায়,—তৎপরে সকলে ঢাকের বাজনার সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করিয়া রাজার কিম্বা তাহার পূর্ব্বপুরুষগণের অথবা গ্রামের প্রধান ব্যক্তিগণের সৎকার্য্যাবলী কীর্ত্তন করিতে থাকে। দানিয়াল বা ফকীরগণ এই উৎসবে একটী বিশেষ অভিনয় করে। তাহারা রাজার এবং রাজ্যের ভবিষ্যৎ সুখ দুঃখ, মঙ্গলামঙ্গল প্রকাশ করে এবং কি প্রকারে ভূতাবিষ্ট হইয়া শুভাশুভ ব্যক্ত করিতে হয় তাহা রাজার সম্মুখে অভিনয় করে। রাত্রিতে সভাভঙ্গের পূর্ব্বে একটী ভোজের আয়োজন হয় এবং যোগ্যব্যক্তিগণ উপাধিভূষণে ভূষিত ও অপরাপর সকলে যোগ্যতা অনুসারে নানাবিধ সম্মান প্রাপ্ত হইয়া চরিতার্থ হয়।

শ্রীবাই উৎসব

আসতর জেলার 'নানগাম' পর্ব্বতে এই দেবী অধিষ্ঠিত আছেন। এই পাহাড়কে শ্রীবাই পাহাড়ও বলে। পর্ব্বতটি চিরশ্যামল জুনিপার বৃক্ষে আচ্ছাদিত। যে ব্যক্তি এই স্থানে দেবীর রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত আছে তাহাকে "বো-বিন্" বলে, সে এই পর্ব্বতেই বাস করে। বন্ধ্যা বা অপুত্রক স্ত্রীলোকগণ পুত্র বা সন্তান লাভাশায় এই দেবীর নিকট ছাগ উৎসর্গ করিয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে

থাকে তখন স্থানীয় স্ত্রীলোকগণ তাহাদের উৎকৃষ্ট পোষাকে সজ্জিত হইয়া এই দেবীর নিকট উপস্থিত হয়। তাহারা সমস্ত পথ কেবল গান গাহিতে গাহিতে আসে এবং দেবীর নিকট উপস্থিত হইয়া একটী ছাগ উৎসর্গের নিমিত্ত 'বো-বিন্'কে প্রদান করে। 'বো-বিন্' কতকগুলি 'জুনিপার' বৃক্ষের শাখা ছেদন করিয়া ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিতে থাকে এবং সমবেত স্ত্রীলোকগণ শাখাগুলি ভূপতিত হইবার পূর্ব্বে ধরিবার চেষ্টা করে। তাহাদের বিশ্বাস যে, যে স্ত্রীলোক যত বেশী শাখা ধরিতে পারিবে সে ততগুলি সন্তানের জননী হইবে। 'বো-বিনে'র বংশধরগণ আজও পর্য্যন্ত এই কার্য্য করিয়া আসিতেছে—কিন্তু বেশী লোকে এখন আর এই উৎসব পালন করেনা।

এই প্রকার একখণ্ড প্রস্তর গিলগিটের নিকটবর্ত্তী "বারমা নামক স্থানে লক্ষিত হয়। এই স্থানেও পূর্ব্বে শ্রীবাই পর্ব্বতের ন্যায় উৎসব সম্পন্ন হইত। এই স্থানের লোকেরা এই উৎসবকে 'মালকুম' আখ্যা প্রদান করিয়াছিল।

রাতো বা চিলি

'বাগরট' উপত্যকার 'ফারফু' গ্রামে একটি পর্ব্বতসানুদেশে চৌতুরাতো, শিলো রাতো, সুরগন রাতো, চিলকো রাতো, এবং থোকো রাতো এই পাঁচটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থান আছে। এই সকল স্থানে সুবৃহৎ পাঁচটী এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাঁচটী এই ১০টী প্রস্তরখণ্ড আছে। প্রথম পাঁচ খণ্ডকে "দেব-আই-মারন" এবং দ্বিতীয় পাঁচ খণ্ডকে "মস্-নমরন-কেন" (মাংস বিতরণের প্রস্তর) বলে। এই স্থানে রাতো বা চিলি উৎসব নির্ব্বাহিত হয়।

এই উৎসব ৭ দিন ব্যাপী। প্রথম ৬ দিবস সকলে নববস্ত্র পরিধান করে এবং স্ত্রী ও পুরুষগণ বিভিন্ন গৃহে বাস করে। ৭ম দিবসে বিভিন্ন শ্রেণীর বা বিভিন্ন পরিবারের লোকেরা পৃথক পৃথক ভাবে এক একটী ছাগ এবং কতকগুলি চিলি বৃক্ষের শাখা লইয়া আপন আপন "রাতো"তে গমন করে। এই শাখাগুলি 'দেব-আই-মারন' প্রস্তরগুলির উপর রাখে এবং উৎসর্গীকৃত ছাগশোণিত ইহার উপর নিক্ষেপ করে। মাংসগুলি "মস্-সমরন-কেন" পাথর গুলির উপর রাখা হয় এবং সমবেত ব্যক্তিগণের মধ্যে বিতরণ করা হয়। তাহারা সেই মাংস সেই স্থানেই দগ্ধ করিয়া উদরস্থ করিয়া ফেলে। 'রাতো' পরিবারের লোক ভিন্ন অন্য কোন স্ত্রী বা পুরুষকে এই মাংস প্রদান করার নিয়ম নাই। ছাগমুণ্ডগুলি একখানি উচ্চ প্রস্তরখণ্ডের উপর স্থাপন করিয়া হননকারীগণ অগ্নি সংযোগ করিয়া দেয়। এদিকে সমবেত লোক সকল বিকট স্বরে উল্লাসধ্বনি করিতে করিতে এই পবিত্র উৎসবের সম্মানরক্ষার্থ তাণ্ডবনৃত্য আরম্ভ করিয়া দেয়। এই অধ্যায় সমাপ্ত হইলে পর সকলে "দেব-আইমারন" প্রস্তরের চতুর্দ্দিক বেরিয়া দাঁড়ায় এবং উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে গ্রামের বৃদ্ধ ব্যক্তিরা প্রধান প্রস্তরখণ্ডের অতি নিকটে বসিয়া নিম্নলিখিতরূপে বলিতে থাকে—"হে লৌহকঠিন 'রাতো'! হে শ্রীভাগের ধাম! আমরা তোমার নিকট আমাদের অভাব জানাইতে আসিয়াছি। আমাদের পুত্র কন্যা নাই—আমাদিগকে তাহা দান কর। আমাদের ধনসম্পত্তি নাই, অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে

ধনদৌলত দান কর। আমাদের শস্যাদির অভাব—আমাদিগকে প্রচুর পরিমাণে শস্য দান কর।" এই প্রকারে তাহাদের সমস্ত অভাব জ্ঞাপন করিয়া বর চাহে এবং অপরাপর সকলে সমস্বরে সম্মতি প্রকাশ করিয়া "তাহাই হউক—""ইহাই হউক" বলিয়া চীৎকার করে।

স্ত্রীলোকগণ এই সময় উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া কতকগুলি ভাজা গম এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রুটী লইয়া উপস্থিত হয়। তাহারা চিলি-গাছের পাতাগুলির উপর আটা ছড়াইয়া দেয় এবং উল্লিখিত রূপে স্বীয় অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য বর প্রার্থনা করে। তৎপরে সেই রুটীগুলি সমবেত লোকগণের মধ্যে বিতরিত হয় এবং তাহারা খাইতে খাইতে আনন্দ প্রকাশ করে। কোন কোন স্থানে স্ত্রীলোকগণকে "রাতোর" নিকট যাইতে দেওয়া হয় না।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা।

জাপানের রেল ও ট্রাম

জাপানে মোটারগাড়ী দূরের কথা ঘোড়ার গাড়ীর সংখ্যাই অতি অল্প। রাজধানী তোকিও সহর কলিকাতার চেয়ে আয়তনে এবং লোকসংখ্যায় অতি প্রকাণ্ড হইলেও তথায় যে কয়েকখানা ঘোড়ার গাড়ী আছে তাহা হাতের অঙ্গুলিতেই গণিতে পারা যায়, তুলনায় আমাদের চেয়ে জাপানীদের স্বচ্ছল অবস্থা হইলেও নিম্নলিখিত কয়েকটি কারণে সে দেশে গাড়ী ঘোড়ার প্রচলন কম। (১) দেশ অত্যন্ত পর্ব্বতাকীর্ণ; এমন কি সহরের মধ্যেই এখানে ওখানে কত ছোট ছোট পাহাড় রহিয়াছে। (২) কলিকাতার বড়বাজার এবং চিৎপুর রোডের ন্যায় জাপানের বড় বড় সহরের সকল রাস্তাতেই জনতা বড় বেশী। (৩) সহরে ট্রামগাড়ীর লাইন এবং ট্রামগাড়ীর সংখ্যা অতি বেশী। লোকজন সহরের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে অতি অল্প ব্যয়ে এবং অল্প সময়ে অতি সহজে গতায়াত করিতে পারে। (৪) জাপানে ধনী দরিদ্রকে কিম্বা ভদ্র ইতরকে ঘৃণা করে না; সকলেই সমান। ট্রামের বেঞ্চে হয়ত সর্ব্বোচ্চ লর্ডবংশোদ্ভব পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার জনৈক সভ্য বসিয়া আছেন; তাঁহাকে ঘেঁসিয়াই হয়তো একজন রাস্তার মুটে বসিয়া রহিয়াছে। (৫) হাওয়া খাওয়া কিম্বা বাবুগিরির জন্য জাপানীরা ঘোড়াগাড়ী মোটার প্রভৃতিতে রাশি রাশি অর্থ আবদ্ধ রাখিতে চাহে না। উহারা বরং ঐ অর্থ দ্বারা ছোট খাট কারবার চালাইতে প্রস্তুত। (৬) জাপানে ঘোড়াগরুর সংখ্যা অতি অল্প। জাপানীরা অষ্ট্রেলিয়া এবং ইউরোপ হইতে ঘোড়া এবং গরু আমদানি করিয়া থাকে।

জাপানের সহরে এবং গ্রামে জিন্‌রিকিশার অতিশয় প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। জিন্‌রিকিশা শব্দের অর্থ মনুষ্যের শক্তিতে পরিচালিত গাড়ী (জিন্ = ব্যক্তি; রি = শক্তি; কিশা = গাড়ী)। অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন এই গাড়ী সুন্দর একখানা কেদারার ন্যায়

স্প্রিং আঁটা মকমলে মোড়ান দ্বিচক্র শকট। রৌদ্র বৃষ্টি নিবারণের জন্য ইহাতে তৈলবস্ত্রের আবরণের বন্দবস্ত আছে। বড় লোকের রিকশার চক্র রবারে মোড়ান; রাস্তার লোককে সতর্ক করিতে বেল (ঘণ্টা) লাগানও থাকে। একজন লোক একজন আরোহীকে এবং স্থলবিশেষে দুইজন আরোহীকেও রিকশায় বসাইয়া টানিয়া লইয়া যায়। বড়লোকের রিকশা একজনের পরিবর্ত্তে দুইজনে টানিয়া লইয়া যায়। সঙ্কীর্ণ রাস্তায় কিম্বা গ্রামের ভিতরে রিকশায় যাতায়াতে বিশেষ সুবিধা। সাধারণ রকমের একখানা রিকশার মূল্য ৬০৲ টাকা হইতে ১৫০৲ টাকা।

বৈদ্যুতিক ট্রাম জাপানে সর্ব্বপ্রথম ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে কোজু হইতে হাকোনে পর্য্যন্ত ৮ মাইল রাস্তায় খোলা হয়। কিন্তু তাহার পর আর কয়েক বৎসর ট্রামলাইনের কোন প্রসারণ দেখিতে পাওয়া যায় নাই। ১৯০২ খ্রীঃ পর্য্যন্ত অধিকাংশ সহরেই ঘোড়ার ট্রামের প্রচলন ছিল। গত ৮।১০ বৎসরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বড় সহর মাত্রেই বৈদ্যুতিক ট্রামের ছড়াছড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। কলিকাতায় ৫।৭টা বৈদ্যুতিক ট্রামের লাইন দেখিয়াই অবাক হইতাম, তারপর তোকিও সহরের ট্রাম লাইনের জালে বা গোলক ধাঁধাঁয় পড়িয়া একেবারে স্তম্ভিত।
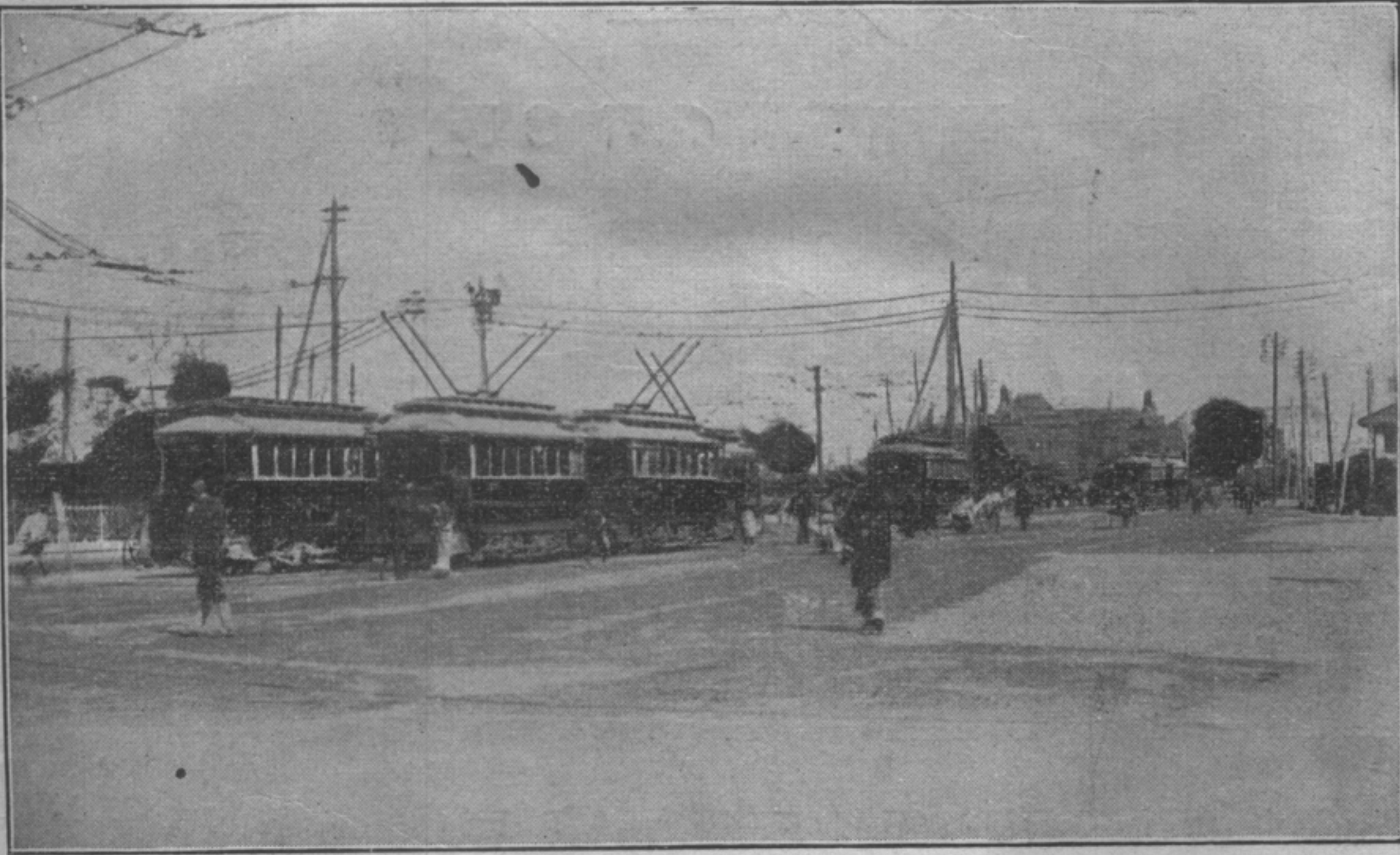
তোকিও—সিবিয়া পার্কের বৈদ্যুতিক ট্রামগাড়ী।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে জাপানে ১১টি কোম্পানী বৈদ্যুতিক ট্রামের কাজ চালাইতে থাকে। তন্মধ্যে তিনটি কোম্পানী তোকিও সহরে ছিল। পরস্পর প্রতিযোগিতায় প্রত্যেকের সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা থাকায় ১০০৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনটি কোম্পানী মিলিত হইয়া বড় একটি কোম্পানী গঠন করে এবং মূলধন পাঁচকোটী ইয়েন অর্থাৎ প্রায় আট কোটী টাকা ধার্য্য

হয়। জাপানের সমব্যবসায়ীদের ভিতর ব্যবসার উন্নতিকল্পে যেরূপ একতা দৃষ্ট হয় এরূপ আর কুত্রাপি দেখা যায় না। আমরা দশজন অংশী হইয়া কোন একটা কারবার আরম্ভ করিতেই ঠেলাঠেলিতে তাহার পতন যেন অবশ্যম্ভাবী মনে করিয়া লই। আর উহাদের কারবারের কৃতকার্য্যতার মূলে পরস্পরের সমবায়। তোকিওর ন্যায় বিস্তৃত সহরের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যাইতে টিকিটের মূল্য কেবলমাত্র এক আনা। নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইতে ৪।৫ কিম্বা ততোধিক জায়গায় ট্রাম বদল করিলেও আর কোন খরচের দরকার করে না। কেবল নূতন ট্রামে উঠিয়া পুরাতন টিকিটের পরিবর্ত্তে বিনামূল্যে একখানা নূতন টিকিট লইতে হয় মাত্র। প্রান্ত সীমা হইতে প্রতি মিনিটে একখানা গাড়ী খুলিয়া থাকে। অথচ প্রাতে ৫টা হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত গাড়ীতে সর্ব্বদাই লোকারণ্য। সাধারণ লোকের আর্থিক অবস্থাও আমাদের চেয়ে স্বচ্ছল, তাছাড়া প্রত্যেকেই সময়ের মূল্য জানে বলিয়া ট্রামে যথেষ্ট লোক যাতায়াত করিয়া থাকে। শীতকালে প্রাতঃকাল ৮টার পূর্ব্বে এবং অন্যান্য ঋতুতে ৭টার পূর্ব্বে কুলি, মজুর, অফিসবাবু, ছাত্র শিক্ষক প্রভৃতি সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য অর্দ্ধমূল্যে ফেরৎ টিকেট (রিটার্ণ টিকেট) দেওয়া হয়। ট্রাম গাড়ীতে একটি মাত্র শ্রেণী। গাড়ী অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, মকমল আঁটা। ইতর, ভদ্র, ধনী, দরিদ্র, লর্ড, মজুর সকলেই এক আসনে উপবেশন করিয়া সানন্দে যাতায়াত করে। জাপানে ট্রামের সম্মুখে এবং পশ্চাতে উভয় দিকেই কল সংযোজিত আছে। গাড়ীকে ইচ্ছানুরূপ সম্মুখে এবং পশ্চাতে চালান যাইতে পারে। আমাদের কলিকাতার ট্রাম উপরের একটি যষ্টি বা রড দ্বারা তারের সংস্পর্শে সঞ্চালিত কিন্তু জাপানে ঐরূপ দুইটি রড্। লোক গাড়ীর নীচে পড়িয়া আহত হইতে বা প্রাণ হারাইতে পারে এই নিমিত্ত গাড়ীর সম্মুখে একটি লৌহতারের জাল সংযুক্ত আছে। চালক এবং টিকেট বিক্রেতাদের শিক্ষার জন্য ট্রাম কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত স্কুল রহিয়াছে। সেই স্কুলে বিজ্ঞানের তাড়িৎ, আলো, তাপ প্রভৃতি আবশ্যকীয় বিষয় এবং সহরের রাস্তা ঘাটের নাম এবং যাবতীয় বিবরণ শিক্ষা দেওয়া হয়। তথায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর যে কেহ কার্য্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারে।

ছোট বড় সকল আরোহীর নিকটই চালক এবং টিকেটবিক্রেতার ব্যবহার এতই সুন্দর যে তাহাদের শিষ্টাচার ও ভদ্রতা ভারতবাসীর মনোযোগ আকর্ষণ না করিয়া পারে না! আমি চারি বৎসরে একদিনের জন্যও ট্রামের গাড়ীতে স্থানের জন্য কিম্বা টিকেটের জন্য অথবা অন্য কোন কারণে ঝগড়া কলহ দূরের কথা তর্ক-বিতর্ক টুকু পর্য্যন্ত হইতে দেখি নাই।

দরজার সামনে দাঁড়াইয়া টিকেটবিক্রেতা সময় সময় বলিয়া থাকেন—কিপ্প নাই কাতা গোজাইমাছেনকা? অর্থাৎ টিকেট নাই এমন কোন মহোদয় গাড়ীতে বিরাজ করেন কি না? কাহারও টিকেট না থাকিলে তাহার নিকট গিয়া অভিবাদন করার পর টিকেট দিয়া থাকেন; তারপর মূল্য হাতে লইয়া

অভিবাদন সহ ধন্যবাদ দিয়া স্বস্থানে গিয়া দাঁড়ান। একটু দূরে দূরে এক এক ষ্টেশন। ষ্টেশনে গাড়ী দাঁড়াইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই আরোহীদিগকে সতর্ক করিবার জন্য টিকেট বিক্রেতা চেঁচাইয়া বলিয়া থাকেন অমুক ষ্টেশনে কোন মহোদয় অবতরণ করিবেন কি না? এতদ্ব্যতীত কোন ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে ছেলে, বুড়ো কিম্বা বিকলাঙ্গ আরোহীদিগকে উঠাইতে নামাইতে সাহায্য করা টিকেটবিক্রেতা অনেকটা তাঁহার নিজের কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন। আমাদের ন্যায় নবাগন্তুক বৈদেশিকদের প্রতি তাঁহাদের কর্ত্তব্য যেন আরো একটু বেশী দেখিতাম, যেহেতু রাস্তা ঘাট আমাদের তেমন জানা ছিল না। মাঝে মাঝে টিকেটবিক্রেতা আমাদিগকে বলিয়া যাইতেন আপনাদের ষ্টেশন এখনও দূরে, যখন সে ষ্টেশন আসিবে তখন আপনাদিগকে জানাইব। ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলে কোন্ দিক দিয়া কোন্ রাস্তায় আমাদের গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে হইবে তাহা বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া দিয়া তিনি বিদায় লইতেন।

যে সময়ে রুষজাপান যুদ্ধ চলিতেছিল যে সময় পর্য্যন্তও ভারতবাসীদের প্রতি উহাদের বেশ ভক্তি ছিল; সে সময়ে আমরা জাপানের সর্ব্বত্রই সমাদর পাইতাম। প্রথম অবস্থায় সহরের কোন স্থলে যাইতে কোন্ ষ্টেশনে উঠিয়া কোন্ ষ্টেশনে নামিতে হয় জানিতাম না। অথবা কোন ষ্টেশনের নাম জানিলেও সে স্থান চিনিতাম না। ঐ সময়ে আজকালকার ন্যায় এক টিকেটে সহরের বিভিন্ন লাইনের ট্রামে ঘুরিতে পারা যাইত না। জংসনে জংসনে নূতন টিকেট ক্রয় করিতে হইত। রাস্তায় চলিতে কোন ষ্টেশনে ট্রাম থামিতে দেখিয়া দৌড়িয়া গিয়া ট্রামচালককে আমাদের গন্তব্য ষ্টেশন কোথায় এবং তথায় যাইতে কোন্ ট্রামে যাইতে হয় ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিতাম। তিনি আমাদিগকে উঠাইয়া লইয়া কোন জংসনের নিকট গিয়া বলিতেন এই লাইনের গাড়ী আপনাদিগকে লইতে হইবে; কিছুতেই আমাদিগকে তাঁহার গাড়ীতে টিকেট ক্রয় করিতে দিতেন না; বলিতেন আপনারা রাস্তা জানেন না তাই আপনাদিগকে রাস্তা দেখাইয়া দিলাম। যখন কিছুতেই টিকেটের মূল্য লইতেন না তখন অগত্যা তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়াই বিদায় হইতাম। কখন কখন লোকের বিশেষ ভিড় হওয়ায় ট্রামের সম্মুখে বা পশ্চাতে দাঁড়াইয়া যাইতে হইত। টিকেটবিক্রেতা দামও লইতেন না টিকেটও দিতেন না, গন্তব্য ষ্টেশনে পৌঁছাইয়া দিতেন এবং বলিতেন আপনারা আমাদের দেশে আগন্তুক আপনাদিগকে এত কষ্ট স্বীকার করিয়া আমাদের গাড়ীতে আসিতে হইল সেইজন্যই লজ্জিত।

একদা আমাদের একজন ভারতীয় ছাত্র ট্রামে যাইতেছিলেন। হঠাৎ টিকেট বিক্রেতা টিকেটের মূল্য চাহিলে পকেটে হাত দিয়া দেখিলেন পকেটে পয়সা নাই; একখানা পাঁচ ইয়েনের অর্থাৎ সাড়ে সাত টাকার নোট রহিয়াছে মাত্র। টিকেটবিক্রেতার নিকট নোটের উপযুক্ত টাকা পয়সা না থাকায় অগত্যা কিছু সময়ের জন্য টিকেট দেওয়া স্থগিত রহিল। এদিকে গাড়ীর অপর প্রান্তে বসিয়া একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র

কলেজে যাইতেছিলেন, তিনি দুখানা টিকেট ক্রয় করিয়া ধীরে ধীরে ভারতীয় ছাত্রের পাশে গিয়া বসিলেন এবং অনেক রকম অনুনয় বিনয় করিয়া টিকেট একখানা তাঁহাকে দিলেন। যে সময়ের কয়েকটি উদাহরণ উপরে উল্লেখ করিলাম সে সময়ে যেখানে সেখানেই জাপানীদের সৌজন্যে আমরা মুগ্ধ হইতাম।

১৫।২০ মাইল লম্বা অনেক ছোট ছোট রেলের লাইনে আজকাল বৈদ্যুতিক গাড়ীই চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। তোকিও হইতে ওসাকা পর্য্যন্ত তিনশত মাইল লম্বা লাইনের উপরও বৈদ্যুতিক গাড়ী চালাইবার কথা চলিতেছে।

দেখিতে দেখিতে রেলগাড়ীও জাপানকে ছাইয়া ফেলিতে আরম্ভ করিয়াছে। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে জাপানে সর্ব্বপ্রথম তোকিও ইয়োকোহামা লাইন গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক খোলা হয়। ঐ লাইন মাত্র ১৮ মাইল লম্বা। দুচারি মাইল করিয়া ক্রমশঃ বাড়াইতে বাড়াইতে দশবছরে কেবল মাত্র ১১৪ মাইল রাস্তায় রেলপথ খোলা হয়। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে একটি প্রাইভেট কোম্পানী রেলপথ বসাইতে আরম্ভ করে। ক্রমে ক্রমে কোম্পানীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে; এমন কি কোম্পানীর সংখ্যা চব্বিশ হইয়া দাঁড়ায়। পাঠকগণ হয়তো অনেকেই জানেন যে আমাদের ভারতে প্রাচীনকালে সেই যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সময় কাচের ব্যবহারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আর জাপানে কাচের প্রচলন সেদিনকার কথা। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে পল্লীগ্রামের লোকে অনেকে খোলা জানালা ভ্রমে রেলগাড়ীর কাচের জানালা দিয়া মাথা প্রবেশ করাইয়া দিতে গিয়া আহত হইত।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্টের ৮৩২ মাইল এবং প্রাইভেট ২৮০৬ মাইল রেল ছিল। পাঁচ বৎসরে অর্থাৎ ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্টের ১৬৬০ মাইল এবং প্রাইভেট ৪৮৮৯ মাইল রাস্তায় রেল হয়। প্রতিদিনই যেন কিছু না কিছু বাড়িতেছে। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট অনেক গুলি প্রাইভেট কোম্পানীর লাইন ষ্টেট্‌রেলওয়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন।

জাপানে রেলে তিনটি মাত্র শ্রেণী—প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয়। মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরা সাধারণতঃ দ্বিতীয় শ্রেণীতেই চলিয়া থাকে। আমরাও তাহাই করিতাম। জাপান পর্ব্বতাকীর্ণ; প্রশস্ত লাইন একটিও নাই। আমাদের দার্জ্জিলিং লাইনের মত। প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর বেঞ্চ স্প্রিংআঁটা ও কার্পেটে মোড়ান। তৃতীয় শ্রেণীর বেঞ্চগুলি মাদুরে মোড়ান। ট্রেনে শয়নাগার স্বতন্ত্র; তথায় ঘুমাইতে গেলে স্বতন্ত্র ভাড়া দিতে হয়। ট্রেনে একটি ভোজনাগার আছে; বলা বাহুল্য প্রত্যেক গাড়ীতেই পায়খানা আছে। এবং কয়েকটি করিয়া থুথু ফেলিবার কিম্বা আবর্জ্জনাদি নিক্ষেপ করিবার জন্য ধাতব পাত্র রাখা হয়।

জাপানীদের মেজাজ ইউরোপীয়ানদের মতন নহে। ভারতে কখন কখন কোন কোন ইউরোপীয়ানের সহিত চারিশত মাইলের উপরও একই গাড়ীতে গিয়া দেখিয়াছি একটি মাত্র কথাও হয় নাই। আর জাপানের গাড়ীতে উঠিতে না উঠিতেই পার্শ্ববর্ত্তী সকলেই আলাপ করিতে

হইয়া উঠেন—অল্প সময়ের মধ্যেই অনেক দিনের পরিচিত বন্ধুর মত ব্যবহার করেন। কখন কখন দেখিয়াছি কাহার সহিত ভাল খাবার থাকিলে তখনই বাহির করিয়া খাইতে দেন।

আমি একবারের একটি দীর্ঘভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠকবর্গের গোচর করিয়াই অন্য এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

ভারত হইতে গিয়া তোকিও সহরে প্রায় ছয়মাস কাল অবস্থানের পর তথা হইতে সাড়ে সাত শত মাইল দূরবর্ত্তী সাগালিয়েন দ্বীপের নিকটবর্ত্তী হোক্কাইদো দ্বীপের ছাপ্পোরো সহরের ইম্পিরিয়াল কৃষিকলেজে অধ্যয়নের জন্য যাত্রা করি। বাড়ীতে পড়িলেও ছয়মাসে জাপানী ভাষায় ততদূর ব্যুৎপত্তিলাভ হয় নাই। কষ্টস্পষ্টে কোন রকমে মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারিতাম মাত্র। আসামের জনৈক বন্ধু আমার সহযাত্রী ছিলেন। আমাদের সঙ্গে পোষাক পরিচ্ছদ, বিছানা-পত্র পুস্তকাদি অনেক জিনিস ছিল। প্রাতে সাড়ে দশটার গাড়ীতে উঠি। গাড়ী ছাড়িবার পাঁচ মিনিট পূর্ব্বে প্রথম ঘণ্টা পড়িল। এই সময় একজন লোক আসিয়া খবর দিল যে সবচেয়ে বড় বাক্সটি খোলা —আপনারা কেহ আসিয়া বাক্সটি বন্ধ করিয়া দিন। বন্ধুটি দৌড়িয়া তাঁহার বাক্স বন্ধ করিতে গেলেন। অর্দ্ধ পথ যাইতে না যাইতেই ট্রেন ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িল। বন্ধু হতবুদ্ধি হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। শুনিতে পাইলাম বাক্সটি খোলা অবস্থাতেই ব্রেকে দেওয়া হইয়াছে। বন্ধুর যথাসর্ব্বস্ব সেই বাক্সে থাকায় তিনি মহা উদ্বেগে বসিয়া পড়িলেন। তাঁহাকে নানাভাবে বুঝাইতে লাগিলাম। বড় বড় ষ্টেশনে নামিয়া বাক্সটি দেখিয়া আসিব বলিয়া বন্ধুকে আশ্বাস দিলাম। গাড়ী ষ্টেশনের পর ষ্টেশন অতিক্রম করিতে লাগিল কিন্তু কোন ষ্টেশনেই বাক্সের কোন অনুসন্ধান পাইলাম না।

জাপানে রেলপথে যেরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ভোগ করা যায় এরূপ অন্য কোথাও আছে কিনা জানি না। আমাদের ট্রেন কোথাও প্রশান্ত মহাসাগরের ধার দিয়া, কোথাও মহাসাগরের সিকি মাইল বা অর্দ্ধ মাইল জলের উপর দিয়া, কোথাও পাহাড় শ্রেণী ভেদ করিয়া, কোথাও বা পাহাড়ের তলবর্ত্তী সুরঙ্গ পথের ভিতর দিয়া আবার কোথাও বা প্রান্তরের মধ্য দিয়া যাইতে লাগিল। আমি আগ্রহের সহিত স্বভাবের সে বিচিত্রতা সন্দর্শন করিতে লাগিলাম। প্রকৃতির এই মনোরম দৃশ্যই বন্ধুর মনের অশান্তি ও উদ্বেগের অনেকটা লাঘব করিয়া দিল।

তোকিও সহর হইতে গাড়ী ছাড়িবার পরই একজন অল্প বয়স্ক যুবক অভিবাদন করিয়া আমাদিগের পাশে বসিল। যুবকটি কিছু কিছু ইংরাজী জানিত। তাহার পকেটে একখানা নোটবুক ও একখানা ছোট ইংরাজী জাপানী অভিধান ছিল, তাহাতে আমাদের সহিত আলাপ করিতে তাহার অনেকটা সুবিধা হইয়াছিল। কোন বিষয়ে আমাদের কিঞ্চিৎ অসুবিধা হইলে তাহাকে জানাইবার জন্য সে অনুরোধ করিল। কথায় বার্ত্তায় জানিতে পারিলাম যে সে যুবক আমাদের ঐ গাড়ীর 'বয়'। সেই গাড়ীখানার আরোহীদের সব

বিষয়ে সুবিধার বন্দোবস্ত করাই তাহার কার্য্য। আমাদিগকে নানাভাবে সন্তুষ্ট রাখিতে সে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিল। রাস্তা পাহাড়, পর্ব্বত, নদী, হ্রদ, সাগর, উপসাগর, সহর গ্রাম, মন্দির আরো কত কিছু দেখাইয়া উহার ঐতিহাসিক বিবরণ পর্য্যন্ত বলিতে লাগিল। আবার দুই তিন ঘণ্টা পর পর এক একবার আসন ছাড়িয়া ব্রস হাতে লইয়া আমাদের হ্যাট্ কোট বুট প্রভৃতি পরিষ্কার করিয়া দিতে লাগিল। সময় সময় খাওয়া দাওয়ারও বন্দোবস্ত করিতে লাগিল।

এইরূপে প্রায় ২৪ ঘণ্টার পর, পরদিন ঐ ট্রেনের সীমান্ত ষ্টেশন আওমোরি নামক এক সমুদ্রতীরস্থ বন্দরে পৌছিলাম। রাজধানী তোকিও সহর হইতে আওমোরি সহর ৪২৮ মাইল দূরে। গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়াই আমরা মালের অনুসন্ধানে ছুটিলাম। ষ্টেশনে সারি সারি হোটেলের এজেণ্টগণ আরোহীদের অভ্যর্থনার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এদিকে যে কেরাণী মালের চার্য্যে ছিলেন তিনিও আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া গিয়া খোলা বাক্সের মাল বুঝিয়া লইতে অনুরোধ করিলেন। যেমন মাল তেমন অবস্থায় পাওয়ায় বন্ধুর আর আনন্দের সীমা রহিল না। শুনিতে পাইলাম ঐ মাল সত্বাধিকারীকে সাবধানে বুঝাইয়া দিতে উক্ত কেরাণী নাকি তারযোগে উপর ওয়ালার আদেশ পাইয়াছিলেন।

আমরা গাড়ির 'বয়ের' পরামর্শ মত মালের রসিদ এক হোটেল এজেণ্টের হাতে দিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া জাহাজের ম্যানেজারের নিকট গেলাম। 'বয়' আমাদিগকে তাহার নিকট পরিচয় করিয়া দিল। পরিচিত হওয়ার জন্য ম্যানেজারের নামে আমাদের নিকট একখানা চিঠিও ছিল। বয়কে বিদায় দিতে বেশ একটু দুঃখ অনুভব করিলাম। আমাদের নামের টিকেট, সামান্য কিঞ্চিৎ পুরস্কার, এবং ধন্যবাদ পাইয়া সে যেন হাতে স্বর্গ পাইল বলিয়া মনে হইল।

এদিকে হোটেলে গিয়া এক ঘণ্টার মধ্যেই খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া জাহাজের জন্য প্রস্তুত হইলাম। হোটেলওয়ালা আমাদিগকে জানাইলেন যে আমাদের জিনিসপত্র সমস্তই জাহাজে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহারাই একটা তালা ক্রয় করিয়া খোলা বাক্স বন্ধ করিয়া দিয়াছে। নূতন চাবি এবং জাহাজের দুখানা টিকেটসহ বিল আমাদের হাতে দিল। খরচপত্র চুকাইয়া নৌকার সাহায্যে জাহাজে গিয়া উঠিলাম। দেখিলাম সেখানে আমাদের ক্যাবিনে হোটেলের একজন ব্যক্তি সমস্ত ঠিকঠাক করিতেছে। বলাবাহুল্য টিকেট ক্রয়, মুটেভাড়া, নৌকাভাড়া, হোটেল খরচ প্রভৃতি বিষয়ে আমাদিগকে একটুকুও ভাবিতে হয় নাই। ১০টার সময় জাহাজ খুলিল, ৪টার সময় হোক্কাইদো দ্বীপের প্রধান বন্দর হাকোদাতে নামক স্থানে পৌছিল; কিন্তু আমরা তথায় না নামিয়া পরদিন ভোরে ৪৷৷০টার সময় মুরোরান নামক দ্বিতীয় বন্দরে নামিলাম এবং রেলে গন্তব্য সহর ছাপ্পোরেতে ১২টার সময় পৌছিলাম। দুতিন দিনের ভিতর বাক্স খুলিয়া কিছুই বাহির করিবার আবশ্যক হয় নাই। ছাপ্পোরেতে পৌছিয়া বাক্স খুলিবার জন্য চাবিগুচ্ছ

খুঁজিতে লাগিলাম। না পাইয়া অগত্যা লৌহশলাকার সাহায্যে একটি বাক্সমাত্র খুলিয়া সেদিনকার কায চালাইয়া লইলাম। দ্বিতীয় দিবস প্রাতে হঠাৎ আমার নামে একখানা চিঠি ও একটি পার্শেল আসিয়া উপস্থিত, চিঠি এবং পার্শেল উভয়ই জাহাজের বিছানার উপরই ফেলিয়া আসিয়াছিলাম। প্রাতে কেবিন-বয় তাহা দেখিতে পাইয়া আমাকে লিখিয়াছে—"মহাশয়, আমার ত্রুটিতে আপনি বিশেষ অসুবিধায় আছেন; হয়তো বাক্স খুলিতে পারিতেছেন না। আপনি জাহাজ হইতে অবতরণকালে আমি তন্ন তন্ন করিয়া আপনার জিনিসপত্র দেখিয়া না দেওয়ায় চাবির গোচ্ছা বিছানায় পড়িয়া রহিয়াছে; অদ্য ডাকযোগে পাঠাইলাম। অনুগ্রহ করিয়া ত্রুটি মাপ করিতে এবং প্রাপ্তি সংবাদ লিখিয়া আমাকে নিশ্চিন্ত করিতে আজ্ঞা হয়।"

আমি ক্যাবিনবয়ের সৌজন্য দেখিয়া অবাক হইলাম। সেইদিন তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া প্রাপ্তিসংবাদ জানাইলাম এবং চিঠির ভিতরই পার্শেল খরচের ডাকটিকেট পাঠাইয়া দিলাম। প্রায় এক বৎসর পরে তোকিও ফিরিবার বেলায় ঘটনাক্রমে আবার ঠিক সেই জাহাজেই আসিতে হইল! তখন আবার সেই কেবিনবয়ের ত্রুটি স্বীকার ও ভদ্রতায় মুগ্ধ হইলাম।

একদিন গাড়ী হইতে নামিবার সময় একজন মুটে আমার ব্যাগটা ষ্টেশনের বাহিরে আনিয়া একখানা রিকশায় উঠাইয়া দিল। আমি রিকশায় উঠিয়া মুটেকে পাঁচ পয়সার একটি নিকেল মুদ্রা দিয়াই রিকশাওয়ালাকে চালাইতে বলিলাম। মুটে দৌড়িয়া আসিয়া রিকশার সামনে দাঁড়াইল এবং বলিল মহাশয় এই আপনার তিন পয়সা ফেরৎ নিন যেহেতু দুই পয়সা মাত্র আমাদের লইবার নিয়ম। মুটেকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলাম এ তিন পয়সা মোট বহন করার জন্য নহে, উহা বক্‌শিশ্‌। তখন মুটে মস্তক অবনত করিয়া পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ দিতে দিতে চলিয়া গেল।

জাপানের প্রতি ষ্টেশনেই প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর আরোহীদের বসিবার বন্দোবস্ত আছে। এবং আরোহীদের সুবিধার জন্য টেবিলের উপর কয়েকরকম সংবাদপত্র রাখিয়া দেওয়া হয়। প্রধান প্রধান ষ্টেশনে জাপানী ভাষার কাগজ ছাড়া ইংরাজীভাষার সংবাদপত্রও রাখা হয়। অধিকাংশ ষ্টেশনেই বেশ খাবার মিলে। সকালবেলায় যে বড় ষ্টেশনেই গাড়ী দাঁড়ায় সেখানে সকল আরোহীর মুখ হাত ধুইবার জন্যই গরম জল, সাবান এবং ছোট ছোট গামলা প্রস্তুত থাকে। অধিকাংশ লম্বা লাইনের ষ্টেশনে এক গাড়ী হইতে অন্য গাড়ীতে যাওয়া যায়। শীতকালে উত্তর প্রদেশের ট্রেণের গাড়ীগুলি গরম জলের বাষ্পোত্তাপ সাহায্যে গরম রাখা হয়।

শ্রীযদুনাথ সরকার।

রক্তের শ্বেত কণিকা ও তাহার কার্য্য

নিয়ত সর্ব্বাঙ্গপূর্ণ স্বাস্থ্য মানবের দুষ্প্রাপ্য। দুষ্প্রাপ্য কেন, একেবারেই অসম্ভব। যিনি যতই সুস্থকায় হউক না কেন, সেই সুস্থতা উপভোগ করিতে হইলেই তাঁহাকে অসুস্থতার দিকে চলিতে হইবে। শ্বাস ক্রিয়ার জন্য বক্ষঃ এবং উদরের মাংসপেশীর স্পন্দন, কর্ম্মনিবন্ধন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিচালনা, এমন কি নিমেষপাতনের জন্য অক্ষিপক্ষের অপরিহার্য্য ক্রিয়া, এই সকল কার্য্যে প্রতিনিয়ত আমাদের কিছু না কিছু ক্ষয় হইতেই থাকে। গতির সৃষ্টি করিতে হইলে কোন না কোন প্রকার তেজের আবশ্যক। আমাদের শরীরের আভ্যন্তরীণ তেজ তাপ। সেই তাপ রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা উদ্ভূত ও পরিরক্ষিত হয়। নিশ্বাসের সহিত আমরা যে বায়ু পরিগ্রহণ করি তন্মধ্যস্থ অম্লজনের সহিত আমাদের মাংসপেশীস্থ অঙ্গার (corbon) এবং উদ্‌জন (Hydrogen) এই দুই মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক সংযোগ হয়। রক্তের দ্বারা এই অম্লজন (Oxygen) আমাদের শরীরের সকল স্থানে পরিচালিত হয়, এবং শরীরের সর্ব্বত্রই এরূপ রাসায়নিক ক্রিয়া অনবরত সংঘটিত হইতে থাকে। এই রাসায়নিক ক্রিয়াই আমাদের শরীরস্থ তাপ ও তৎসম্ভূত সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের চালনারূপ গতি ও আভ্যন্তরীণ যন্ত্রাদির ক্রিয়ার অবান্তর কারণ। আমাদের মাংসস্থ দুইটি প্রধান উপাদান, অঙ্গার ও উদ্‌জন প্রতিনিয়তই অম্লজনের সহিত সংযুক্ত হইয়া বিষাক্ত ও অনিষ্টকর যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করিতেছে—একটি অঙ্গারাম্ল বাষ্প (corbonic acid gas) এবং অপরটি জল। এইরূপে, মাংসের প্রধান উপাদান ক্ষয় হইতেছে এই এক, এবং অনিষ্টকর অনাবশ্যকীয় দুইটি বস্তু জন্মিতেছে—এই দুইটি বিষয়ে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত। স্বাস্থ্যরক্ষার যত উপায় আছে তাহা পরিণামে কেবল এই দুইটি ক্ষতি নিরাকরণেরই চেষ্টা মাত্র। ক্ষয় অনিবার্য্য—ক্ষয় না হইলে তাপ হইবে না। উত্তাপ রক্ষার আর কোন উপায় নাই। বাহ্যতঃ অগ্নি প্রভৃতি অনেক উপায়ে তাপের সৃষ্টি করা যাইতে পারে, কিন্তু শরীরের প্রত্যেক শিরায় ও প্রত্যেক যন্ত্রের অভ্যন্তরে তাপ অন্য কোনরূপে জন্মিতে পারে না। উদ্ভূত অঙ্গারাম্ল বাষ্প এবং জল রক্ত দ্বারাই ফুস্‌ফুসে আনীত হয় এবং প্রশ্বাসের সময় শরীর হইতে দূরীভূত হয়। এই দুই মলস্বরূপ পদার্থ বিদূরিত না হইলে রক্ষা নাই।

উক্ত হইয়াছে যে অঙ্গার ও উদ্‌জন এই দুই পদার্থের ক্ষয় পূরণ করাই স্বাস্থ্যরক্ষার চরম উদ্দেশ্য। এই ক্ষতি পুরণ আমরা অন্ন ও পানীয়ের সাহায্যে করিয়া থাকি। আমাদের ভোজ্য বস্তুতে প্রচুর অঙ্গার ও উদ্‌জান থাকে। শর্করা, শ্বেতসার (starch) প্রভৃতি দ্রব্যে শতকরা প্রায় ৪২ ভাগ অঙ্গার থাকে। চাউল, গোধূমচূর্ণ (ময়দা, আটা ইত্যাদি) বার্লি, এরারুট, সাগু প্রভৃতি আমাদের প্রধান প্রধান খাদ্য দ্রব্য প্রায় বিশুদ্ধ শ্বেতসার। প্রত্যেক ফলের রসে অল্প বিস্তর শর্করা থাকে। সুতরাং অঙ্গার আমাদের অত্যন্ত সহজ লভ্য পদার্থ। উদ্‌জন প্রধানতঃ আমরা জল হইতে পাই। জলের প্রায় এক নবমাংশ উদ্‌জন। দুগ্ধে আমাদের শরীরের ক্ষয় পূরণ করিবার উপযোগী সকল পদার্থ এমন ভাবে আছে যে উহাতে আমাদের ক্ষতিপূরণ অতি সত্বর এবং সুচারুরূপে হইয়া থাকে। শরীরস্থ যাহা কিছু ক্রমাগত বিদূরিত হইতেছে তৎস্থানে সেই সেই দ্রব্য পুনঃ স্থাপনের যথেষ্ট উপায় আছে। ইহা সত্ত্বেও ক্ষয় সম্পূর্ণরূপে পূরিত হয় না। যেমনটি যায় ঠিক তেমনটি আর আসে না। যদিও অবিকল সেই অঙ্গার ও সেই উদ্‌জন একই পরিমাণে আসে, তথাপি এই যাওয়া আসাতে একটু ক্ষতি থাকিয়াই যায়। আমরা প্রকৃষ্ট উপায়ে সেই রক্ষিত পরিমাণ কমাইতে পারি মাত্র, কিন্তু একেবারে সম্পূর্ণরূপে ক্ষতি নিবারণ করিতে পারি না। ফলে আমাদের শরীরস্থ সকল যন্ত্রেরই খাটুনি বাড়ে মাত্র—উহারা অল্পে অল্পে হীনবল হইতে থাকে। শীঘ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক অবশেষে আমাদের কার্য্যকারী শক্তি বিনষ্ট হইয়া যায়, বিন্দু বিন্দু জলপাতে

নিঃশেষিত হইয়া পড়ে—বার্দ্ধক্য, জরা ও শেষে মৃত্যু ঘটে।

মানবের শরীর নানাপ্রকার যন্ত্রাদির জটিল সমষ্টি। হৃৎপিণ্ড, ফুস্‌ফুস্‌, যকৃৎ, প্লীহা যন্ত্রগুলি ত সর্ব্বদাই কার্য্য করিতেছে। এক একটির জন্য এক একটা কার্য্য নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাই করিতে করিতে উহারা বৃদ্ধ হইয়া পড়ে। উপায় বিশেষে উহাদের বার্দ্ধক্যের কাল হ্রাস বা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু কোনও উপায়ে উহাদিকে চিরযৌবন দান করা যায় না। তাহা হইলে কখনও শরীরের ধ্বংস হইত না। মস্তিষ্ক একটি ভয়ানক জটিল যন্ত্র, উহার কার্য্য ও গতি অত্যন্ত জটিল। মনোরথ কখন যে কোনদিকে দৌড়ায় তাহা স্বয়ং বিধাতাও বলিতে অক্ষম। প্রায় দেখা যায় যে অপর সকল যন্ত্র ও অবয়ব যখন আপন কর্ম্মে অশক্ত হইয়া পড়িয়াছে তখনও মস্তিষ্ক পূর্ণ বলশালী রহিয়াছে। বহিরিন্দ্রিয়নিচয়ের ভবলীলা যখন 'সাঙ্গ' হইবার উপক্রম হইয়াছে, তখনও অন্তরিন্দ্রিয় সমভাবে কার্য্য করিতেছে—ইহা প্রায় সকল প্রকার ক্ষয়কারক ব্যাধিতেই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সুতরাং যে উপায়ে শরীরের অপরাপর যন্ত্রাদির স্বাস্থ্যরক্ষা হইতে পারে ঠিক সেই উপায়ে যে মস্তিষ্কের (বা মনের) সুস্থতা সাধিত হইবে তাহার কোন স্থিরতা নাই। বলিষ্ঠ সুস্থ অনেক যুবা পাগল হইয়া আছে দেখা যায়। দুশ্চিন্তাতে তাবৎ শরীরের অযত্নসম্ভূত রোগ আসে ইহা ত সর্ব্বদাই দেখিতে পাই। সুতরাং যে লোক অক্লেশে পাঁচ মাইল দৌড়িয়াও হাঁপায় না, অথবা বিসূচিকাদি নানা প্রকার সংক্রামক রোগের মধ্যে থাকিয়াও যাহার শরীর নীরোগ থাকে সেই যে সম্পূর্ণরূপে সুস্থশরীরী তাহা কিরূপে বলা যায়। কিম্বা যে লোক বহুক্ষণ একাগ্রচিত্তে অক্লান্ত মস্তিষ্কে কোন জটিল বিষয়ের গবেষণায় ব্যাপৃত থাকিতে পারে, অথবা যে দুঃখ কষ্ট ও শোকে অনুদ্বিগ্নমনা, বা ভোগলালসা দমন করিতে পারিয়াছে সেই যে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ তাহাও না হইতে পারে। যে সৌভাগ্যবান মহাপুরুষ উপরি উক্ত সমস্ত গুণই একাধারে শরীরে রাখিতে পারেন, বাহ্য ও আভ্যন্তরিক শারীরিক ও মানসিক সকল প্রকার দোষ হইতে যিনি দূরে রহিয়াছেন, তিনিই ধন্য, তিনিই আদর্শ পূর্ণসুস্থ পুরুষ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, আমরা সকলেই রোগী। অনেকেই চিররোগী। কবি যথার্থই বলিয়াছেন "কুতঃ কুশলমস্মাকমায়ুর্যাতি দিনে দিনে।"—যাহার প্রতিক্ষণেই আয়ুঃক্ষয় হইতেছে তাহার আবার শারীরিক কুশলতা কি?

আধুনিক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাশ্চাত্য দার্শনিক হার্বার্ট্‌ স্পেন্সরের মতে অন্তর্জগতের সহিত বাহ্যজগতের নিয়ত সামঞ্জস্য রক্ষার চেষ্টাই "জীবন"। সুতরাং আমাদের এই পাশ্চাত্য জ্ঞানে আলোকিত (অথবা অর্দ্ধতমসাবৃত) জীবনে বাহ্যজগৎটা যে নিতান্ত হেয় নয় তাহা ধ্রুব সত্য। অতএব আমাদের জীবনে বাহ্যজগতের কতটার সঙ্গে অন্তর্জগতের কতটার সামঞ্জস্য রাখিবার প্রয়াস করা উচিত তাহা দেখিতে হইবে। তাহা হইলে সেই সামঞ্জস্যটা কতদূর বজায় রাখা যাইতে পারে, আমরা বাঙ্গালী কতদূর স্বাস্থ্যবান্‌ হইতে পারি, তাহা বুঝিতে পারিব। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে আমাদের পক্ষে বাহ্যজগৎটা এত বড়, কূপকারাবদ্ধ মণ্ডুক ক্ষুদ্র বাঙ্গালী তাহার ইয়ত্তা করিতেই অনেক সময় অসমর্থ হইয়া পড়ে। সাগর পার হইবার বহু আড়ম্বর ও মহান্‌ উদ্যোগ করিয়া তীরে উপস্থিত হইয়াই দেখি ক্ষুদ্র ভেলা উলটি পালটি খাইতেছে। এ জাতির আবার আদর্শ স্বাস্থ্য!

তবুও আশা রাখিতে হইবে। সারাটা বাহ্যজগৎ লইয়া আমাদের কাজ নাই। একটা গণ্ডির ভিতর আসিতে পারিলেই যথেষ্ট। এই হিসাবে উক্ত দার্শনিক মহাত্মা বলিয়াছেন যে, স্বাস্থ্যের বিষয় আলোচনা করিয়া উপকার পাইতে হইলে আমরা প্রায়ই বাহ্যজগতের কোন একরূপ অবস্থা অথবা উহার কোন একটা অংশ ধরিয়া লই। সেই হিসাবে যে লোকটা ভগ্নপদ হইয়া শয্যাগত আছে সেও বেশ সুস্থ।

স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের বাধা ও অন্তরায় রোগের বীজাণু (microbos)। আমরা চারিদিকে নানারোগের অসংখ্য বীজাণু দ্বারা পরিবেষ্টিত। রোগবীজস্বরূপ লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি জীবাণু সর্ব্বদা বায়ুমণ্ডলে ভাসিয়া বেড়ায় ও জলে স্থলে

আমাদের শরীরের অভ্যন্তরে সকল স্থানেই বাস করে। নিশ্বাসের সহিত আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে অসংখ্য জীবাণু উদরস্থ করি। শরীরত্বচের কোথাও আঁচড় লাগিলে কখন কখন উহা "পাকিয়া উঠে।" এই অস্বাভাবিক ঘটনা একপ্রকার জীবাণু দ্বারা সংঘটিত হয়। জীবাণু সর্ব্বত্র আছে। দুগ্ধে ক্ষয়কাশ ও যক্ষ্মার বীজাণু থাকে; ফুটাইলে তবে উহারা মরিয়া যায়। সেইজন্য দুগ্ধ জ্বাল না দিয়া অথবা শীতল অবস্থায় পান করা অনিষ্টকর। জলে বিসূচিকা প্রভৃতি অনেক রোগের বীজাণু থাকে। ভূতলে যে ধুলা জমে তাহাতে অসংখ্য জীবাণু আশ্রয় গ্রহণ করে। প্লেগ, বিসূচিকা, মসূরিকা, (বসন্ত) প্রভৃতি ভয়ঙ্কর ব্যাধির বীজ আমাদের ঘরে অহরহঃ বিদ্যমান।

এই সকল জীবাণু আমাদের মুখে, গলনালীর অভ্যন্তরে, অন্ত্র প্রভৃতি স্থানে প্রচুর সংখ্যায় আছে। উহারা এত ক্ষুদ্র যে চর্ম্ম ও শিরা প্রভৃতির আবরণ ভেদ করিয়া রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়। রক্তই জীবাণুর সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য, এবং রক্তেই উহাদের বংশবৃদ্ধি সমধিক তেজে হইয়া থাকে। এত শত্রুর কবল হইতে কোন্ মন্ত্রবলে শরীর রক্ষা হয়? আমাদের সকল সময় ত পীড়া হয় না। আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে মরিয়া যাই না কেন? কি উপায়ে এই ভয়ঙ্কর রোগবীজ ধ্বংস হয়? সুস্থ শরীর যে বহুপরিমাণে সকল জীবাণুর আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিবার ক্ষমতা রাখে তাহা উপরি উক্ত বর্ণনা হইতেই বেশ বুঝা যায়। আবার ইহাও দেখা যায় যে বেশ হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ যুবা হঠাৎ একটা সংক্রামক রোগে মারা গেল। এক বাড়ীতে দশজনের মধ্যে চারিজন বসন্তরোগে আক্রান্ত হইল, তন্মধ্যে একজন মরিল অথচ সকলেই সমান বলিষ্ঠ, হৃষ্টপুষ্ট ও কর্ম্মঠ। এরূপ ঘটনা বিরল নহে—ইহার কারণ কি? এই প্রবন্ধে ইহারই উত্তর [illegible] চেষ্টা করা যাইতেছে।

রক্ত দেখিতে লাল [illegible] বস্তু—যেন একরূপ দ্রব্য। কিন্তু অনুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা দেখিলে জানা যায় যে উহা তিনটি ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর সমাহার। ঈষৎ পীতাভ একটি তরল বস্তু, যাহাকে ইংরাজীতে serum কহে, উহাই রক্তের তরল ভিত্তিস্বরূপ। আমরা উহাকে রক্তরস বলিব। কতক রক্ত বাতাসে কিছুক্ষণ রাখিয়া দিলে ঐ রক্তরস পৃথক হইয়া পড়ে। এক বিন্দু রক্ত ব্লটিং কাগজে রাখিলে কিয়ৎক্ষণ পরে serum কাগজে শোষিত হইয়া পৃথক হইয়া যায়। এই তরল রক্তরসে দুই প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূক্ষ্মকোষ (cell) ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করে দেখা যায়। একের বর্ণ উজ্জ্বল লাল, অপরগুলি সাদা। সূচ্যগ্রে যতটুকু রক্তবিন্দু তুলিতে পারে তাহাতে প্রায় ৪০ হইতে ৫০ লক্ষ রক্তবর্ণ কোষ এবং ১৫ হইতে ২২ সহস্র শ্বেতকোষ থাকে। লাল সূক্ষ্মকোষগুলির জন্যই রক্তের বর্ণ লাল হয়। বাতাসে রক্তরস পৃথক হইয়া পড়িলে এই দুই প্রকার রক্তকোষ একত্রীভূত হইয়া একটা চাপড়া বাঁধিয়া যায়। এই কোষগুলি এত ক্ষুদ্র যে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে নগ্ন চক্ষে দেখা যায় না।

রক্তকোষগুলি দেখিতে সমপৃষ্ঠ ক্ষুদ্র চাকতির ন্যায়। ময়রাদের খাস্তা কচুরীর "নেচির" ন্যায় গোল, চেপ্টা ও মধ্যস্থলে একটু টেপা। উহারা শরীরের সর্ব্বত্র অম্লজনের বাহক। রক্তস্রোতের বেগে ও তাহাদের নিজ গতিবশে উহারা শিরায় শিরায় সর্ব্বত্র চালিত হয় এবং পূর্ব্বোক্ত রাসায়নিক ক্রিয়া ও তৎসম্ভূত তাপের সৃষ্টি করিয়া অনিষ্টকারী অঙ্গারাম্লবাষ্প বহন করিয়া ধমনীপথে হৃদয় ও ফুস্ফুসে আনিয়া শরীর হইতে বাহির করিয়া দেয়। এই সকল রক্তবর্ণ সূক্ষ্মকোষের প্রধান উপাদান অঙ্গার, অম্লজান ও লৌহ—এই তিন মৌলিক পদার্থের সংযোগগঠিত hœmoglobin নামক এক যৌগিক পদার্থ এবং সেই আদিম protoplasm। শরীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে শ্বেতকোষ হইতে রক্তকোষের উদ্ভব। শ্বেতকোষের উৎপত্তিস্থান ভ্রূণাবস্থায় মানবের যকৃৎ (liver); যে মুহূর্ত্তে শিশু ভূমিষ্ঠ হয় তখন হইতে প্লীহা (spleen) ও শ্লৈষ্মিক গুটিকাপুঞ্জ (lymphatic glands) এই দুই স্থানেই শ্বেতকোষের উৎপত্তি হয় এবং শ্লৈষ্মিক রসের সহিত উহারা রক্তে আসিয়া পড়ে।

চিত্র-১। রক্তের শ্বেতকোষ দ্বারা বীজাণু বিনাশ

(১) শ্বেতকোষ। (৪) রোগের বীজস্বরূপ বীজাণু।

(২) ও (৩) রক্তকোষ। (৫) রক্তবিন্দুর সীমা।
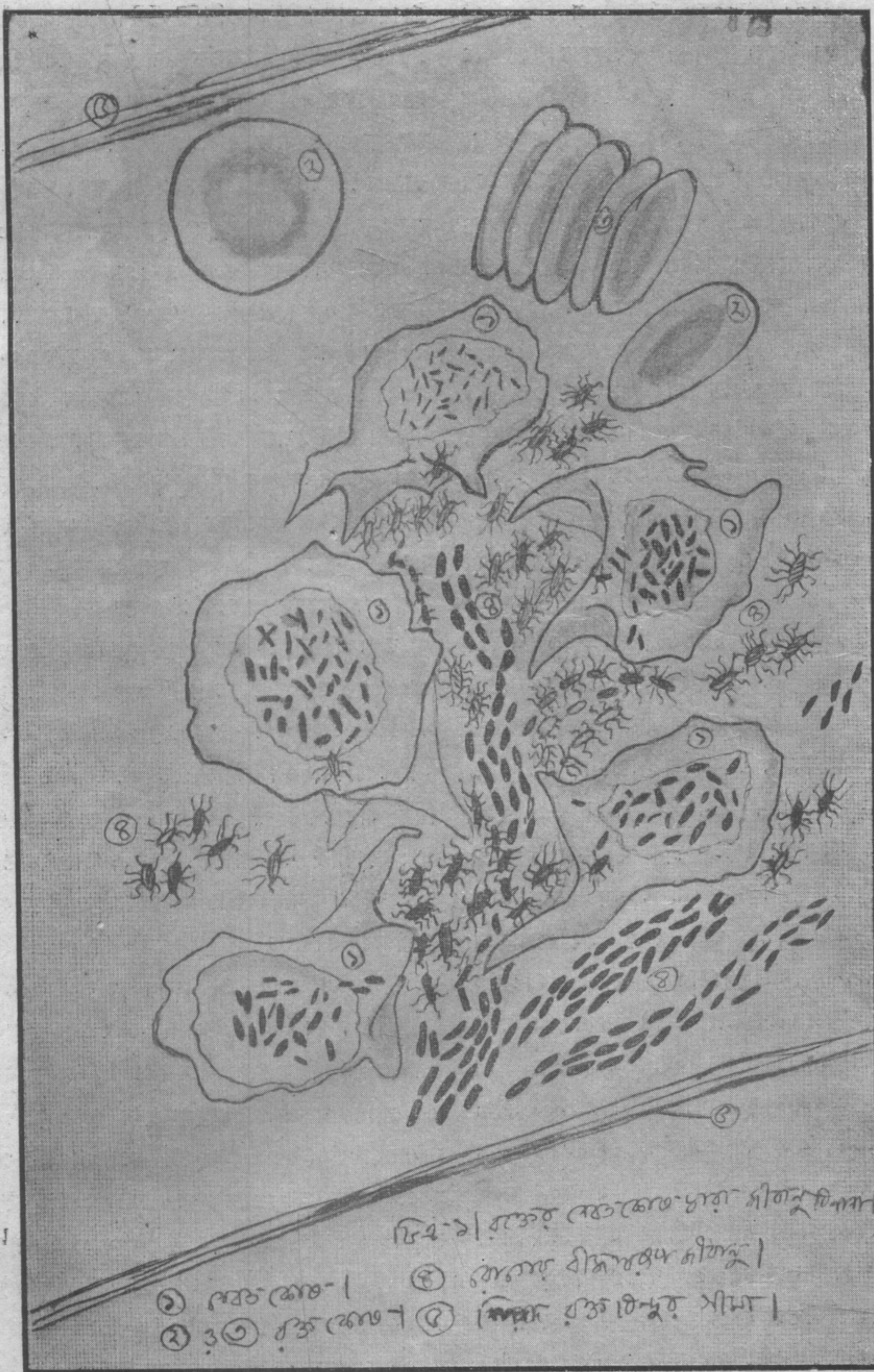
প্রায় ৩৩৫গুণ বেশি। সূচ্যগ্রে যতটুকু রক্তবিন্দু তুলিতে পারে (প্রায় এক ঘন মিলিমিটার) সেই পরিমাণ রক্তে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ রক্তকোষ এবং অল্পাধিক ১৫০০ পনর হাজার মাত্র শ্বেতকোষ থাকে। জ্বর হইলে অথবা কোন রূপে রক্ত দুষ্ট হইলে শ্বেতকোষের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ বাড়ে। গর্ভবতী স্ত্রীর শরীরে শ্বেতকোষের সংখ্যা বেশী হইয়া থাকে।

শ্বেতকোষের আকৃতির স্থিরতা নাই। উহারা সচল; অণুবীক্ষণে উহাদের এক প্রকার গতি লক্ষিত হয় তাহাকে Amœboid movement বলে। উহারা ইচ্ছামত স্বদেহের যে কোন অংশকেই লম্বিত, কুঞ্চিত ও ভাঁজ করিতে পারে। রুষ বৈজ্ঞানিক মেচ্‌নিকফ্ (Metchnikoff) প্রথমে শ্বেতকোষের কার্য্যকারিতা পরিদর্শন করেন এবং উহাদের উপকারিতা ও অন্যান্য বিশেষ তথ্য আবিষ্কার করেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে সমস্ত রোগের বীজস্বরূপ অসংখ্য জীবাণু রক্তের মধ্যে পরিপুষ্ট ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। রক্তস্থ শ্বেতকোষগুলি ঐ জীবাণুগুলিকে নিজ দেহ মধ্যে টানিয়া লয়। বাহ্য অবয়বের যে কোন অংশই হউক উহারা মুখগহ্বর রূপে ব্যবহার করিতে পারে। জীবাণু ঐ শ্বেতকোষ দ্বারা একবার স্পৃষ্ট হইলে আর রক্ষা নাই। কোষ মধ্যে উহারা প্রবেশ লাভ করিয়া অচিরে বিনষ্ট হয়। এইরূপে শ্বেতকোষগুলি রোগবীজের বিনাশসাধন করিয়া রক্তদুষ্টতা নিবারণ করে। নিম্নে যে চিত্র দেওয়া গেল উহা Typhoid জ্বরাক্রান্ত রোগীর একবিন্দু রক্তের প্রতিকৃতি— অণুবীক্ষণ সাহায্যে দশলক্ষ গুণ বৰ্দ্ধিতপরিসর। ১৯০৮ সালে আগ্রায় আমি ঐ রক্ত পরীক্ষা করি। রোগী ১২ দিন জ্বর ভোগের পর মারা যায়। জ্বর আরম্ভ হইবার ৫ দিন পরে রক্ত পরীক্ষিত হয়। চিত্রের সৌকর্য্যার্থে অনেকগুলি জীবাণু পরিত্যক্ত হইল এবং শ্বেতকোষের ও রক্তকোষের সংখ্যাও কমাইতে হইয়াছে।

চিত্র দেখিলে বুঝা যাইবে যে সূক্ষ্ম রোমের ন্যায় পদ (Cilia) বিশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহুসংখ্যক জীবাণু এক এক স্থানে সমধিক বৰ্দ্ধিত হইয়াছে। উহারা Typhoid জ্বরের বীজ, সর্ব্বদা বায়ুমণ্ডলে ভাসিয়া বেড়ায় ও অহর্নিশ উহারা অত্যধিক সংখ্যায় বৃদ্ধি পায়—রোগের প্রকোপও প্রবল হইয়া উঠে। কিন্তু বিধাতার কি অপূর্ব্ব লীলা, যে স্থলে ঐ জীবাণু বেশী বাড়ে সেই স্থলেই বহুসংখ্যক শ্বেতকোষও আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন জীবাণুপুঞ্জ ও শ্বেতকোষগুলির মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়া যায়। প্রত্যেক শ্বেতকোষের শরীরের চারিদিকেই ওষ্ঠের ন্যায় একটা পিণ্ড লম্বিত হয় এবং ক্ষিপ্রগতিতে বহুসংখ্যক জীবাণু ঐ মুখগহ্বরে শোষিত ও বিনষ্ট হয়। শরীর ততক্ষণই সুস্থ বোধ হয় যতক্ষণ এই যুদ্ধে শ্বেতকোষের জয় হইতে থাকে। আমাদের শরীরে অহরহঃ এই ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছে। যদি জীবাণুর বৃদ্ধির হার এত অধিক হয় যে শ্বেতকোষগুলি উহাদের বিনষ্ট করিতে অক্ষম হইয়া পড়ে, তখনই রোগ প্রকাশ পাইয়া ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। জীবাণু রক্তে মিশ্রিত হওয়া মাত্র যে রোগ প্রকাশ পায় তাহা নহে। কিছু কাল ধরিয়া (period of incubation) শ্বেতকোষের সহিত উহাদের যুদ্ধ চলিতে থাকে এবং প্রায়শঃ উহারা পরাজিত হয়—রোগ হয় না। তবে কখন কখন আমাদেরই অত্যাচারে ও অযত্নে রক্ত (বস্তুতঃ রক্তস্থ শ্বেতকোষ) দূষিত হইয়া পড়ে তখনই ঐ জীবাণুগণ সুবিধা পাইয়া দুর্গ আক্রমণ করে ও সতেজে দখল করিয়া বসে।

যথার্থ চিকিৎসার উদ্দেশ্য এই যে, অণুকোষের সংখ্যা ও কার্য্যকারিতার সাহায্য ও পুষ্টিসাধন করা। প্রকৃতি দেবীই কেবল তাহা সম্পন্ন করিতে পারেন। আমরা কেবল সেই অদ্বিতীয় চিকিৎসকের পরিচর্য্যা করিয়া তাঁহার কার্য্যের সহায়তা করিতে পারি মাত্র। রক্ত সংগ্রামে সূক্ষ্মকোষের জয়সাধন করানই প্রকৃতির কাজ। শিশুদের হাম প্রভৃতি বহুবিধ সংক্রামক ব্যাধি হয়। তাহাদের জীবনী শক্তি অনেক বেশী। তাহাদের রক্তে সূক্ষ্মকোষের অনুপাত তাই অত্যন্ত অধিক। অনেক ব্যাধি হইতে তাহারা কেবল সেবা ও যত্নে আরাম হয়—ঔষধ খাওয়াইবার দরকারই থাকে না। অসুস্থতা আমরা নিজের দোষেই আনিয়া থাকি। যদি আমরা প্রকৃতির আহ্বান অবহেলা না করি যখন যাহা হুকুম হয় তাহাই যথাসাধ্য তামিল করি তাহা হইলে

আমরা এতদিন স্বাস্থ্য ও ব্যাধির প্রকৃতি কেবল মাত্র শুনিয়া বা পড়িয়াই উপলব্ধি করিতাম। কিন্তু বিজ্ঞানের কল্যাণে আজি সমস্ত প্রত্যক্ষ হইতেছে। যিনি অণুবীক্ষণে রোগবীজাণু ও শ্বেতকোষের সংগ্রাম দেখিয়াছেন তিনি একাধারে অস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য উভয়েরই সত্তা নয়নগোচর করিয়াছেন। শ্বেতকোষ গুলিকে মহাত্মা মেচ্‌নিকফ্‌ "ভক্ষক কোষ" (phagocytes) এই অভিধা দিয়াছেন, কারণ উহারা জীবাণুগুলিকে অনবরত খাইয়া ফেলিতেছে। অবস্থানুসারে আমরা একদিন না খাইতে পাইলে ক্ষতি হয় না, কিন্তু শ্বেত কোষের মন্দাগ্নি হইলেই সর্ব্বনাশ।

সুতরাং বুঝা গেল যে শরীর যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন—হাত পা ভাঙ্গা, মাথা ফাটা ইত্যাদি যাহা কিছু অপঘাতই হউক না কেন, প্রকৃত স্বাস্থ্য কেবল রক্তস্থ শ্বেত কোষের উপরই নির্ভর করে। নিয়মিত ব্যায়ামশীল যুবার অস্থি ও পেশী সুন্দর, দৃঢ় ও পুষ্ট হয় বটে কিন্তু তাহাতেই কি তাহার সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য? দৃঢ় ও পুষ্ট পেশীর বহুলতা এবং স্বাস্থ্য এই দুইয়ের মধ্যে কোন সম্পর্ক নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অস্থিচর্ম্মসার, অন্ধ, বধির, দরিদ্র ভিক্ষোপজীবী ব্যক্তিগণ যে সকল জঘন্য স্থানে ও যেরূপ অপরিষ্কৃত ও ঘৃণিত অবস্থায় বাস করে তাহাতে যে তাহারা কত রোগের বীজাণু উদরস্থ করিয়া "হজম" করে তাহা দেখিলে যত্নপালিত, ব্যায়ামপুষ্ট, বলবান্‌ ধনীপুত্র হয়ত ভয়েই অর্দ্ধমৃত হইবেন। সে অবস্থায় পড়িলে ত রক্ষাই নাই। সেই সব জীবাণুর আক্রমণ তিনি আদৌ সহ্য করিতে পারিবেন না। তাঁহার রক্তে সেরূপ সতেজ শ্বেতকোষ নাই। এই হিসাবে কে বেশী স্বাস্থ্যবান্‌? শত্রুমধ্যে বাস করিয়া সম্মুখ যুদ্ধে যে সেই শত্রুকে দমন করিতে পারে তাহাতে ক্ষমতা অধিক না যে শত্রুর আক্রমণ নিবারণ কল্পে দুর্ভেদ্য দুর্গে, নানা অস্ত্রশস্ত্র পরিবেষ্টিত হইয়া, তাহাদের ভয়ে সর্ব্বদা সশঙ্ক হইয়া বসিয়া থাকে সে বেশী ক্ষমতাবান্‌? প্রায় দেখা যায় যে স্ত্রীলোকের শারীরিক বল পুরুষ অপেক্ষা কম। অথচ যে সকল সংক্রামক রোগের ভয়ে বীর হৃদয় কাঁপে সেই রোগের মধ্যে মা লক্ষ্মীরা কেমন অকুতোভয়ে রোগীর সেবা ও পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। সকল দেশেই রোগী-সেবার ভার স্ত্রীলোকদের উপর—তাঁহারাই সেবা শুশ্রূষায় সমধিক যত্নবতী। তাঁহারা "অবলা" বটে কিন্তু দীর্ঘায়ুঃ ভোগ করেন কে? বলবান পুরুষ না অবলা? কেন এমন হয়? ইহার উত্তর এই যে, আমাদের একটা মস্ত ভুল ধারণা আছে যে বলবান হইলেই স্বাস্থ্যবানও হওয়া যায়। শারীরিক পুষ্টি, বল, দৃঢ়তা, পেশীবহুলতা ইত্যাদি যাহার সমষ্টিকে আমরা স্বাস্থ্য বলি তাহাই প্রকৃত জীবনী শক্তি নহে। সুপ্রসিদ্ধ বলী রামমূর্ত্তি মহাশয় হয়ত একটা ফোড়া কাটাইবার সময় কাতর হইবেন, একবেলা নিয়মিত রাবড়িটুকু না পাইলে দশদিক অন্ধকার দেখিবেন—কিন্তু ক্ষীণকায় "অবলা" অনেক শারীরিক কষ্ট অকাতরে সহ্য করেন।

সকল প্রাণীর জন্ম, শরীরের গঠন, বৃদ্ধি ইত্যাদি পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন যে প্রাকৃতিক সুনিয়মে হইয়াছে ও হইতেছে সেই প্রকৃতির এমন ক্ষমতা আছে যাহাতে তৎপ্রণীত খেলাঘর ভাঙ্গিলে মেরামত করিতে পারেন। মেরামতের দ্রব্যসম্ভার ঘরের অতি নিকটেই সংগৃহীত আছে, এবং যখনই আবশ্যক হয় সেই মুহূর্ত্তে অসংখ্য সুদক্ষ পূর্ত্তকার তাঁহার আহ্বানে উপস্থিত হয়। অনেক সময়ে মানব বরঞ্চ নিজ অহঙ্কারপ্রসূত অজ্ঞতায় ও নিকৃষ্ট শিক্ষার গুণে কতকগুলা কটু, ভীষণ ঔষধি গলাধঃকরণ করিয়া প্রকৃতির কার্য্য দ্বিগুণ বিপন্ন করিয়া তোলে। সেদিন একটা কাগজে আমেরিকায় যুক্তপ্রদেশের (United Stats) জন্মদাতা George Washington-এর মৃত্যু কি অবস্থায় হইয়াছিল পাঠ করিয়া মনে বড় কষ্ট হইল। পাঠক, তোমারও একটু কষ্ট হউক ও চক্ষু "ফুটুক" এই আশায় এস্থলে গল্পটা উদ্ধৃত করিলাম।

যে সময় Washington রোগশয্যায় যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন সেই সময়ের ডাক্তার মহাত্মাদের এই মত ছিল যে, যখন ঔষধে কোন ফললাভ হয় না, রোগীর অবস্থা সমান থাকে, তখন ধমনী চিরিয়া কতকটা রক্ত বাহির করিয়া ফেলিলে রোগের বীজ অনেকটা

নির্গত হইয়া যায় ও রোগ আরাম হয়। সে সময়ের উহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসা ছিল। আমরা একালে ঐরূপ চিকিৎসাকে অত্যন্ত ভীতিপ্রদ ও অনিষ্টকর মনে করি, এবং তৎপরিবর্ত্তে কতকগুলা তিক্ত, কটু, উগ্রবীর্য্য ঔষধ ভক্ষণ করানই চরম চিকিৎসা জ্ঞান করি। হয়ত নিকট ভবিষ্যতে আমাদের এই চিকিৎসাপদ্ধতি ও রক্তমোক্ষণের ন্যায় অনিষ্টকর বলিয়া বিবেচিত হইবে। তখন হয়ত আমরা কোন সুনিয়ন্ত্রিত, প্রকৃতিসঙ্গত, স্বভাবসিদ্ধ চিকিৎসাপ্রণালী পাইব যাহা হউক ডাক্তারেরা ওয়াশিংটনের একটা ধমনী কাটিয়া একবার নহে, উপর্য্যুপরি সাত বার অনেক রক্ত বাহির করিয়া ফেলেন। রোগী সুতরাং ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে থাকেন। অবশেষে যখন জীবনবাহিনী খরস্রোতা শুষ্ক হইয়া গেল, রোগী অকালে প্রাণ হারাইলেন। শেষমুহূর্ত্তেও ডাক্তারেরা জেদ ছাড়েন নাই। আর এক-বার—শেষবার ধমণী ছেদ হইল—ক্ষীণ দুই এক বিন্দু জীবন তখনও ছিল। সেই সময় রোগীর মুখে ক্ষীণস্বরে শুনা গেল "জল, একটু জল, একটু জল"। আহা নিঃশেষে নীরসীকৃত অসহায় জীব তাহার শেষ আশ্রয়, প্রকৃতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্নেহরস জল, একবার কাতরকণ্ঠে চাহিয়াছিল। কুসংস্কারান্ধ বৃথাগর্ব্বিত চিকিৎসকেরা তাঁহাকে এক বিন্দু জল দিল না। জগতের একটি শ্রেষ্ঠ রত্ন চিরদিনের মত নিষ্প্রভ হইয়া অনন্তে বিলীন হইয়া গেল! ইহা চিকিৎসা না হত্যা!

মার্কিনের জন্ উইলসন্ নামক জনৈক লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য এই কয়টি নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি জল, বায়ু, সাবান, ও গ্লিসিরীন্ এই কয় দ্রব্য ভিন্ন অন্য কোন ঔষধ ব্যবহার করিতেন না, এবং এইরূপ প্রাকৃতিক চিকিৎসাবলে একটিও রোগী তাঁহার চিকিৎসাধীনে মরে নাই।

১ম। রোগের আক্রমণে ভয় পাইও না। মৃত্যু একদিন অবশ্যম্ভাবী। যদি রোগ সংক্রামক হয় তথাপি রোগীর পরির্য্যা ও সেবা হইতে বিমুখ ও পশ্চাৎপদ হইও না—ভয় পাইও না। যদি শৈশবে তোমার পিতামাতা রীতিমত তোমায় প্রতিপালন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তোমার শরীরেই তোমার সাহায্যকারী মিত্রসেনা অসংখ্য আছে, তাহারা তোমাকে সকল রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবে।

২য়। প্রাকৃতিক চিকিৎসানুযায়ী নিয়মিত তোমার অন্ত্র ও পাকস্থলী বিশুদ্ধ জল দ্বারা ধৌত করিবে। (See Flushing of colon and stomach) এ বিষয়ে একজন দক্ষ চিকিৎসকের সাহায্য লইবে।

৩য়। শিশুকে প্রচুর খেলিবার সময় দাও। উহার সহিত সর্ব্বদা আনন্দে থাক; যতদূর পার কষ্ট, শোক, দুঃখ উহাকে জানিতে দিও না। স্বেচ্ছায় উহাকে আহার, পান ও নিদ্রা উপভোগ করিতে দাও। আমিষ বা মাদক দ্রব্য খাইতে দিও না। বিশুদ্ধ বায়ু ও জল যথেষ্ট দাও। যদি লেখা পড়ায় তাহার স্পৃহা থাকে বা অনায়াসে জন্মাইতে পার তবে পড়াও, নচেৎ মারপিট করিও না। প্রবাদ আছে সকলের ছেলে জজ হয় না। তুমি সুপুত্র লাভ করিবে।

৪র্থ। প্রকৃতি যখন যাহা চায় তৎক্ষণাৎ তাহা দিবে; যখন যাহা করিতে বলে তৎক্ষণাৎ তাহা করিবে। তোমার শরীর রক্ষার জন্য যাহা আবশ্যক হইবে ভিতর হইতে তাহার জন্য ডাক পড়িবে, তাহাই শুনিতে শিখ। অনেক সময় বুঝিতে পারা যায় না বটে, কিন্তু যতক্ষণ না বুঝিতে পারিবে প্রকৃতির ডাক থামিবে না। তাহাতেই বুঝিয়া লইবে। ক্রমশঃ এমন অবস্থা হইবে যে ডাক পড়িবার আগেই তুমি প্রস্তুত থাকিবে। নির্ম্মল অন্তঃকরণে যাহা বিরূপ বোধ হয় তাহা ঘোর অনিষ্টকারী বলিয়া পরিত্যাগ করিবে।

আমি এই কয়টির উপর আর একটি তথ্য সংযুক্ত করিতে চাই:—

৫ম। চিন্তা ভয়ানক রোগ। এ রোগের চিকিৎসা নিজের হাতে। উহার কোনই ঔষধ নাই। পাঠক, যদি তুমি বাস্তবিক নিশ্চিন্ত থাক, এস, তোমার পূজা করি। এ রোগের একটি মাত্র পথ্য (ঔষধ নহে) আমি জানি, তাহা এই:—

"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন।
যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি॥"

শ্রীশরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

মুকুল ও পুষ্প

আমার এ জননীর স্নেহাতুর অঞ্চল আড়ালে
ওরে শিশু, ওরে বাছা, থাক্ আরো—আরো কিছুক্ষণ।
রৌদ্র শুধু জাগিতেছে গগনের সীমান্তের ভালে,
ধীরে শুধু একবার ব'য়ে গেছে প্রভাত পবন।

জনমের ভোর হ'তে চেয়ে আছি তোরি মুখপানে,—
চেয়ে আছি নির্নিমেষ প্রতি পল, চির রাত্রি দিন,
সমস্ত হৃদয় মোর দৃষ্টি হ'য়ে ফুটেছে নয়নে;
মিটেনি পিপাসা তবু, তৃষা তবু হয়নি বিলীন।

শিশু মাতা মুকুলের অনিবার বুকের স্পন্দন,
কম্পিত চকিত ভাব অনর্থক শত আশঙ্কার,
হৃদয়ে চাপিয়া ধরা, আচম্বিতে অজস্র চুম্বন,—
তুই তার কি বুঝিবি ওরে মোর কিশোর কুমার?

বসন্তের এক বৃন্তে জেগেছিনু আমরা মুকুল;
নিদাঘের খর তাপে, প্রাবৃটের সঘন বর্ষণে
আর সব ঝ'রে গেছে,—সৃজনের একমাত্র ভুল
আমি শুধু জেগে আছি তোরে ল'য়ে পল্লব শয়নে।

দীপ্ত রৌদ্রে তেতে গেছে সর্ব্ব-সহা ধরণীর ধূলি,
পুষ্পের মুকুল আমি তখনও স্তব্ধ অচঞ্চল।
লক্ষ ঝঞ্ঝা গর্জ্জিয়াছে ক্রোধে ক্ষোভে লক্ষ ফণা তুলি',
ক্ষুব্ধ বিশ্ব,—আমি শুধু পুষ্প মাতা হইনি বিহ্বল।

বিন্দু—এক বিন্দু করি' দিনে দিনে লভেছ বিকাশ
কোন দিন কোন বর্ণে;—দলে তার কতটুকু লেখা,
কবে পেয়েছিস্ কোথা কি গন্ধের অস্ফুট আভাস,
পরিপুষ্ট চিত্র সম চিত্তে মোর রেখে গেছে রেখা।

শিশির শীতল জলে প্রতিদিন করায়েছি স্নান,
হৃদয়ের রক্ত দিয়া দলে দলে তুলেছি বাড়ায়ে,
সূর্য্য হ'তে রশ্মি টানি সৌন্দর্য্যের করায়েছি পান,
স্ফুট ক'রে তুলিতেছি বসন্তের বিলসিত বায়ে।

চেয়ে আছি রাত্রি দিন তৃষা তবু মিটে না ত হায়!
পূর্ণ হ'য়ে উঠিতেছে উৎস সম জননীর স্তন,
বাহিরে ডাকিছে বিশ্ব,—ওরে বাছা, আয় বুকে আয়
জননীর তপ্ত বক্ষে থাক্ আরো আরো কিছু ক্ষণ।

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়।

সন্ধ্যায়

সাঁঝের আলো ঝিকিমিকি
তরুর শাখে শাখে—
পড়্‌ল এসে গভীর ঘন
আঁধার ফাঁকে ফাঁকে!
দিনের আলো নিভে এল,
সারা গগন ঘিরে—
শেষের প্রভা সন্ধ্যা ছায়ে
পড়্‌ল ধীরে ধীরে!
আঁধার-করা সন্ধ্যা তবু
আঁধার এ ত নয়!

আলোর কথা বলা এ যে
আলোর পরিচয়!
দিনের শোভা মৃদু আভা
সাঁঝের আঁধার আঁকে!
চাঁদের শোভা রজনীতে
কাল মেঘের ফাঁকে!
শোকের পরে দুঃখ সে যে
আছেই সবার সাথে,
সুখের কথা বড়ই ভাল
দুখের অশ্রুপাতে।

শ্রীঅসিতকুমার হালদার।

আমার বোম্বাই প্রবাস

(২)

বোম্বাই সহর

বোম্বাই নাম কোথা হইতে হইল? এ নামের উৎপত্তি বিষয়ে মতভেদ দৃষ্ট হয়। য়ুরোপীয়দের মধ্যে অনেকের মত এই যে, পোর্ত্তুগীসেরা বোম্বায়ের সুন্দর উপসাগর (Bon-Bay) দেখিয়া এই দ্বীপের নামকরণ করে। কেহ কেহ বলেন যে মুম্বাদেবীর মন্দির হইতে এই নামের সৃষ্টি হইয়াছে। এই মন্দির আজ্ঞাপি নগরীর মধ্যে বিদ্যমান। ইহা এক পুরাতন মন্দির। প্রবাদ এই যে ৪০০,৫০০ বৎসর পূর্ব্বে এই মন্দিরে দেবীপ্রতিষ্ঠা হয়। ইহা প্রথমে ধোবিতলাও (যেখানে ধোপারা কাপড় কাচে) সেইখানে প্রতিষ্ঠিত ছিল,—শতাধিক বৎসর হইল স্থানান্তরিত হইয়াছে। দেবীর নাম পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কুলীদের উপাস্যদেবতা "মুঙ্গা" ব্রাহ্মণহস্তে পড়িয়া 'মুম্বা' নাম ধারণ করিলেন। সে যাহা হউক সকল জিনিসের 'কেন' বের করা সহজ নয়। আর উহার আবিষ্কারও সকল সময়ে সন্তোষজনক হয় না। কলিকাতা নামের ব্যুৎপত্তি কি? ভাবিতে গেলে তাহা বেশ বোঝা যায়। 'সুন্দর বন্দর' যদি বোম্বাই নামের অর্থ হয় তাহাই যথার্থ নাম বলা যাইতে পারে ও তাহা জানিয়াই আপাতত আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

বোম্বাই দ্বীপ ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে বা কিছু পরে পোর্ত্তুগীসদের হস্তে পতিত হয়। ১৪৯৮ সালে নাবিকশ্রেষ্ঠ ভাস্কো ডি গামা কালিকটে পদার্পণ করেন। যে য়ুরোপীয়জাতির বিদ্যা, বুদ্ধি ও ভাগ্যবলে উত্তমাশা অন্তরীপ হইতে ভারতের প্রবেশ-পথ উন্মুক্ত হইল তাহাদের প্রতাপ সেই অবধি ভারতসাগরে ক্রমিকই বিস্তারিত হইতে চলিল। সর্ব্বপ্রথমে পোর্ত্তুগীসদের লক্ষ্য বোম্বাইয়ের দক্ষিণ মালাবার তীরবর্ত্তী প্রদেশেই বদ্ধ ছিল; কালিকট, কানানোর, গোওয়া প্রভৃতি স্থানেই তাঁহারা উপনিবেশ পত্তন করেন। ১৫৩০ সালের দুই চারি বৎসর পরে বোম্বাই পোর্ত্তুগীসদের হস্তগত হয় কিন্তু তাহাদের সমস্পর্দ্ধী আর এক য়ুরোপীয় জাতি বাণিজ্যচ্ছলে ভারতবর্ষে অবতীর্ণ হইল। ষোড়শ শতাব্দীর অন্তে ইংরাজেরা এদেশে প্রবেশ করে—আসিয়া অবধি তাহাদের লোভদৃষ্ট বোম্বায়ের উপরে নিপতিত হয়। দুই একবার বোম্বাই দখল করিবার চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই; অবশেষে দ্বিতীয় চার্লসের বিবাহযৌতুক স্বরূপে বোম্বাই ইংরাজের হস্তাধীন হইল। ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিষ ও পোর্ত্তুগীস রাজার মধ্যে যে বিবাহ-সন্ধি সম্বন্ধ হয় তাহা হইতেই বোম্বায়ে ব্রিটিষ অধিকারের সূত্রপাত, যদিও এই দ্বীপ ইংরাজদের হাতে আসিতে আরো ৪, ৫ বৎসর বিলম্ব লাগে। তখন বোম্বাই দ্বীপ এমন হতাদরের বস্তু ছিল যে ইংলণ্ডের রাজা ১০ পৌণ্ড বার্ষিক করের বিনিময়ে ইহা অকাতরে কোম্পানি বাহাদুরের করে সমর্পণ করিলেন।

রাজা যে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিয়া এই দ্বীপকে হস্তান্তর করিলেন তাহা আশ্চর্য্য নহে। যখন ইংরাজেরা প্রথম বোম্বাই অধিকার

করিল তখন তাহা কি অকিঞ্চিৎকর বস্তু! যে সম্পত্তি তাহাদের হস্তগত হইল তাহা একটি পাকাবাড়ী (ভবিষ্যতে গবর্ণমেণ্ট হাউস)—তাহার চারিদিকে বাগান—দু চারিটি তোপ, নারিকেল বনের মধ্যে বিক্ষিপ্ত কতকগুলি ঘর—কতকগুলি জেলের কুটীর ও প্রচুর পরিমাণে জীয়ন্ত ও পচা মাছ—এই যা ইংরাজদের ভোগে আসিয়াছিল। তথাকার জনসংখ্যা পলাতক ও তস্কর মিলিয়া বড় জোর দশ হাজার। আবহাওয়া মারাত্মক—তাহার কারণ স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের অভাব, যে বিজ্ঞানের প্রভাবে এখন সহরের আশ্চর্য্য রূপান্তর ঘটিয়াছে। অনেক কষ্টে ৩০,০০০ টাকা বার্ষিক কর আদায় হইত। জমি এমন সস্তা যে সমুদায় মালাবার হিলের ইজারা দিয়া তখন যে টাকা লাভ হইত এক্ষণে তাহাতে অর্দ্ধ কাঠা ভূমিখণ্ড পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। ইংরাজদের অধীনে আসিয়া শীঘ্রই তাহার শ্রী ফিরিল। দুর্গ ও গৃহ নির্ম্মাণ, বন্দর স্থাপন, বাণিজ্য ব্যবসায়ে উৎসাহ বর্দ্ধন এই সকল কার্য্যানুষ্ঠানে ইংরাজরাজ্যের সুফল ফলিতে লাগিল। ইংরাজরাজব্যবস্থার এক প্রধান গুণ এই যে তাহা কাহারো ধর্ম্মানুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করে না। যাহার যে ধর্ম্ম সে তাহা অকাতরে পালন করিতে পারে, মতভেদের জন্য কাহাকেও যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। সেকালে অঙ্গিয়ার (Aungier) নামে একজন প্রতিভাশালী সুচতুর গবর্ণর ছিলেন। তাঁহার সময়ে দিউ হইতে বণিকেরা বোম্বায়ে আসিয়া বাণিজ্য করিতে চাহে। তাহাদিগকে উৎসাহদানার্থ গবর্ণর সাহেব তাহাদের সঙ্গে যে কড়ার বন্ধন করেন তাহা হইতে তাঁহার বুদ্ধিমত্তায় বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার মর্ম্ম এই যে বণিকেরা স্বাধীনভাবে তাহাদের শবদাহন ও ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারিবে। সে কোন ধর্ম্মাবলম্বী হউক না কেন—তাহার জাতি ও অবস্থা যাহাই হউক, বলপূর্ব্বক কাহাকেও খৃষ্টান করা যাইবে না। এই কড়ার পত্রের তারিখ ২২ মার্চ্চ ১৬৭৭। বণিকেরা সেই অবধি এ পর্য্যন্ত 'ব্যাকবে'র তীরে অবাধে তাহাদের শবদাহন করিয়া আসিতেছে ও ইচ্ছানুরূপ নিজ নিজ ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতেছে।

পোর্ত্তুগীসদের শাসন অন্যরূপ ছিল—। তাহাদের একহাতে তলবার একহাতে বাইবেল—হয় প্রাণ দেও নয় খৃষ্টান হও। তাহারা বলে, আমার রাজ্যে বাস করিতে চাও ত আমার ধর্ম্ম গ্রহণ কর। ফলে কি হইল—ইংরাজের জয় পোর্ত্তুগীসদের পতন। ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে যে জাতি ধন মান বৈভবে সর্ব্বাগ্রগণ্য ছিল—যাহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে ভারতের দক্ষিণ প্রদেশ কম্পমান তাহার নাম পর্য্যন্ত এক্ষণে শ্রুতিগোচর হয় না। আর ইংরাজসুশাসনে এইক্ষণে বোম্বায়ের অবস্থা দেখ। সাগরগর্ভ হইতে এই চিরবসন্ত সুন্দর পুরী সমুত্থিত হইল। বিশাল সুরম্য সৌধমালায় পরিপূর্ণ; শ্রমের জয়স্তম্ভ সূতা ও কাপড়ের কল ও অন্যান্য কারখানা চতুর্দ্দিকে বিরাজমান; নানাজাতির আবাসস্থান এই বোম্বাই পুরী সমুদ্রের উপরে রত্নদ্বীপ তুল্য শোভা পাইতেছে।

যখন ইংরাজেরা বোম্বাই অধিকার করিয়া প্রথমে ভারতবর্ষে প্রবেশ লাভ করে তখন নিরাপদে রাজ্য ভোগের সময় নহে—চতুর্দ্দিকে

বিভীষিকা, পদে পদে বিঘ্ন বাধা; উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম জলে স্থলে চারিদিকেই শত্রু। বোম্বায়ের শৈশবকাল কত ঝড় তুফান, কত প্রকার বিপদের মধ্য দিয়া অতিবাহিত হইয়াছে—সে সময়ে এই দ্বীপ অন্য এক প্রবল জাতির গ্রাসে কেন যে পতিত হয় নাই সে কেবল ইংরাজভাগ্যলক্ষ্মীর প্রসাদে। ইংরাজের এমনি ভাগ্যবল যে এই বিপদরাশি অতিক্রম করিয়া—এই কঠোর অগ্নিপরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া বোম্বাই সহর ক্রমে পশ্চিম ভারতবর্ষের রাজধানী হইয়া ইংরাজ রাজমুকুটের অত্যুজ্জ্বল মণিরূপে শোভা পাইতে লাগিল—সকল শত্রু একে একে পরাস্ত হইল—সমুদ্র জলদস্যু হইতে মুক্ত হইয়া বাণিজ্যের পথ নিষ্কণ্টক হইল—পরস্পর বিরোধী যোদ্ধৃদলের মৃত দেহের উপর দিয়া ইংরাজ আধিপত্য ভারত ভূমিতে বদ্ধমূল হইল।

তখনকার কালে ঐ অঞ্চলে ইংরাজদের তিন শত্রু ছিল, পোর্ত্তুগীস, মোগল ও মারাঠী। প্রথম হইতেই ভারতক্ষেত্রে এই দুই য়ুরোপীয় জাতির মধ্যে রেষারেষি—কে কাহার উপর প্রাধান্য লাভ করে স্থিরতা নাই। ঠানা, বান্দরা, সালসেট প্রভৃতি বোম্বায়ের নিকটস্থ প্রদেশ সকল তখন পোর্ত্তুগীসদের অধীন সুতরাং তাহারা নানাপ্রকারে বোম্বাইবাসীদিগের উৎপীড়নে সক্ষম ছিল।

এইরূপ কলহে কিছুকাল গত হইলে জিঞ্জিরার কাফ্রী নবাব পোর্ত্তুগীসদের পক্ষ ধরিয়া ইংরাজ বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলেন। নবাব মোগল সম্রাটের পোতাধ্যক্ষ। সেকালে স্থলে যেমন ইংরাজ বণিকের প্রতাপ জলেও তেমনি ইংবাজ জলদস্যুদের উপদ্রব। সেই সকল দস্যুদের শাসন করিবার উদ্দেশে ১৬৮৮ অব্দে কাফ্রী নবাব ঔরঙ্গজীব বাদসাহের আদেশ ক্রমে বোম্বাই দুর্গ আক্রমণ করেন। ইংরাজেরা তখন অতি দুর্ব্বল, নবাবের সঙ্গে যুদ্ধে পারিয়া উঠেন না, কৌশলক্রমে সম্রাটের প্রসন্নতা লাভ করিয়া তাঁহার প্রত্যাদেশে এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইলেন। বোম্বায়ের উপর দিয়া সেই এক ভয়ানক ধাক্কা গিয়াছিল। নবাবের আক্রমণ নিষ্ফল দেখিয়া পোর্ত্তুগীসেরা ইংরাজদের উপর আরো জ্বলিয়া উঠিল, সাধ্যমত বৈরনির্য্যাতনে বিরত হইল না কিন্তু তাহাদের জোরজার মন্ত্র তন্ত্র সকলি ব্যর্থ হইল। পোর্ত্তুগীস রাজ্য এদেশে আর অধিককাল টিঁকিতে পারে নাই। দিন দিন বর্দ্ধনশীল মহারাষ্ট্রীয় প্রতাপের নিকট ফিরিঙ্গিদিগকে শীঘ্রই নতশির হইতে হইল। তাহাদের অধীনস্থ স্থান সকল একে একে মারাঠীদের হস্তগত হইল। পাণিপত যুদ্ধের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে—১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে,—মারাঠীদের মহোন্নতি কাল। তাহারা হিন্দুস্থানের আর আর সকল জাতিকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে—দক্ষিণে কর্ণাটক হইতে উত্তরে আগ্রা দিল্লী পর্য্যন্ত তাহারা রাজ্য বিস্তার করিয়াছে—হোলকর সিন্দে গাইকওয়াড় ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ অধিকার করিয়া বসিয়াছে—আশা হইতেছে হিন্দুরাজা কর্ত্তৃক ম্লেচ্ছগণ বহিষ্কৃত হইয়া স্বাধীন পতাকা ভারতে পুনরুড্ডীন হইবে। এই সময়ে পোর্ত্তুগীসদিগকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া তাহাদের অধিকারবর্ত্তী সালসেট বাসীন, ঠানা, কারাঞ্জা প্রভৃতি স্থান কাড়িয়া লইয়া মারাঠীগণ শীঘ্রই তাহাদের বিষদন্ত

উৎপাটন করিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর অর্দ্ধভাগ গত হইতে না হইতেই ইংরাজেরা তাহাদের ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বীর উৎপাত হইতে বিনা ক্লেশে নিষ্কৃতি পাইলেন। অনন্তর মারাঠীদের উপর ক্রমে জয়লাভ করিয়া তাঁহারা পশ্চিম ভারতের অধীশ্বর হইলেন। বোম্বাই তাহার রাজধানী। বোম্বাই যে কি অমূল্য রত্ন তাহা তাঁহারা আগে হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। যখন মোগল মারাঠী পোর্ত্তুগীস লোকেরা পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহে রত থাকিয়া আপনাদের অধঃপাতের সোপান প্রস্তুত করিতেছিল তখন হইতে ঐ রত্ন তাঁহারা অতি যত্নের সহিত রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। পরিশেষে তাঁহাদেরই জিৎ, আর সকলের হার।

১৮১৯ সালে মারাঠীসমরে লব্ধপ্রতিষ্ঠ মহাত্মা এল্‌ফিনিষ্টন সাহেব বোম্বাই গবর্ণরের পদে অভিষিক্ত হইয়া এ দেশে ফিরিয়া আসেন। তাঁহার সময় হইতে বোম্বায়ের সৌভাগ্যসূর্য্যের উদয়। পথ ঘাট গৃহনির্ম্মাণ, শিল্পবাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধন, বিদ্যাশিক্ষার নবপ্রণালী উদ্ভাবন, আইন সংস্করণ প্রভৃতি কার্য্যের অনুষ্ঠানহেতু তাঁহার শাসন বোম্বাইবাসীদিগের বিশেষ আদরণীয়। তিনিই নব্য বোম্বাই প্রতিষ্ঠা করিয়া যান, সর বার্টল ফ্রেরারের আমলে বোম্বাই সহর উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ করে।

নরনারীর মেলা

বোম্বায়ে গিয়ে প্রথমেই যা আমাদের চক্ষে নূতন ঠ্যাকে তাহা মেয়ে পুরুষের একত্রে মেলা মেশা। এই বিষয়ে কলিকাতা ও বোম্বায়ের মধ্যে ভয়ানক প্রভেদ। কলিকাতায় ভদ্রমহিলাগণ সকলেই অন্তঃপুরবাসিনী, বাহিরে কোথাও একটি কুলস্ত্রীর মুখ দেখিবার যো নাই। বোম্বায়ে পথে ঘাটে যেখানে যাও ভদ্রমহিলা চোখের সামনে পড়ে, গবর্ণমেণ্ট হৌসের অভ্যাগতের মধ্যে, বিদ্যালয়ের ছাত্র পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে, দেশীয় স্ত্রী পুরুষ সম্মিলিত দেখিবে। বাগান, বন্দর, ব্যাণ্ড বাজিবার স্থান প্রভৃতি নগরের প্রকাশ্য স্থানে সন্ধ্যাবায়ু সেবনের জন্য দেশী ও ইংরাজ স্ত্রীপুরুষ সম্মিলিত হয়। পারসীদের মধ্যে অবরোধ প্রথা নামমাত্র। হিন্দু রমণীরাও লোক সমাজে অপেক্ষাকৃত স্বাধীন ভাবে বিচরণ করে। আমাদের মেয়েদের মত কুলস্ত্রীদের তেমন সঙ্কোচভাব দৃষ্ট হয় না। গৃহিণী অভ্যাগত পুরুষকে অন্ন পরিবেশন করিতে লজ্জা বোধ করেন না। নরনারীর সম্মিলনই বোম্বাই সহরের বিশেষত্ব। বাঙ্গলাদেশে নারীবর্জ্জিত জনতা কেমন অপ্রিয়দর্শন! বোম্বায়ে নরনারীর মেলা দেখিয়া বিদেশী পথিকের মন মোহিত হয়। যেমন আমাদের একজন কবি ইংলণ্ডযাত্রা মুখে বোম্বাই হইতে লিখিতেছেন :—

"সবচেয়ে যা দেখিয়া আমার হৃদয় জুড়াইয়া যায় তাহা এখানকার নরনারীর মেলা। নারীবর্জ্জিত কলিকাতার দৈন্যটা যে কতখানি তাহা এখানে আসিলেই দেখা যায়। কলিকাতায় আমরা মানুষকে আধখানা করিয়া দেখি এইজন্য তাহার আনন্দরূপ দেখি না। নিশ্চয়ই সে না দেখার একটা দণ্ড আছে। নিশ্চয়ই তাহা মানুষের মনকে সঙ্কীর্ণ করিতেছে, তাহার স্বাভাবিক বিকাশ হইতে বঞ্চিত করিতেছে। ঘরের কোণের মধ্যে আমরা নরনারী মিলিয়া থাকি কিন্তু সে মিলন কি সম্পূর্ণ? বাহিরে মিলিবার যে উদার বিশ্ব রহিয়াছে

সেখানে কি সরল আনন্দে একদিনও আমাদের পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ হইবে না?"

বোম্বাই সহর বর্ণনা করিয়া রবীন্দ্রনাথ পরে লিখিতেছেন :—

"আমাদের গাড়ী (১) ম্যাথেরান পাহাড়ের উপরে একটা বাগানের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ছোট্ট বাগানটিকে বেষ্টন করিয়া চারিদিকে বেঞ্চ পাতা। সেখানেও দেশী কুলস্ত্রীরা আত্মীয়দের সঙ্গে বসিয়া বায়ুসেবন করিতেছেন। কেবল পারসী রমণী নহে, কপালে সিন্দুরের ফোঁটা মারাঠী মেয়েরাও বসিয়া আছেন—মুখে কেমন প্রশান্ত প্রসন্নতা! মনে মনে ভাবিলাম, সমস্ত দেশের মাথার উপর হইতে কতবড় একটা সঙ্কোচের বোঝা নামিয়া গিয়াছে, এবং তাহাতে এখানকার জীবনযাত্রা আমাদের চেয়ে কত দিকে কত সহজ ও সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। পৃথিবীর মুক্ত বায়ু ও আলোকে সঞ্চরণ করিবার সহজ অধিকারটি লোপ করিয়া দিলে মানুষ নিজেই নিজের পক্ষে কিরূপ একটা অস্বাভাবিক বিঘ্ন হইয়া উঠে তাহা আমাদের দেশের মেয়েদের সর্ব্বদা সসঙ্কোচ অসহায়তা দেখিলে বুঝিতে পারা যায়। ম্যাথেরাণের এই বাগানে ঘুরিতে ঘুরিতে আমাদের বীডনপার্ক ও গোলদীঘিকে মনে করিয়া দেখিলাম—তাহার সে কি লক্ষ্মীছাড়া কৃপণতা!"
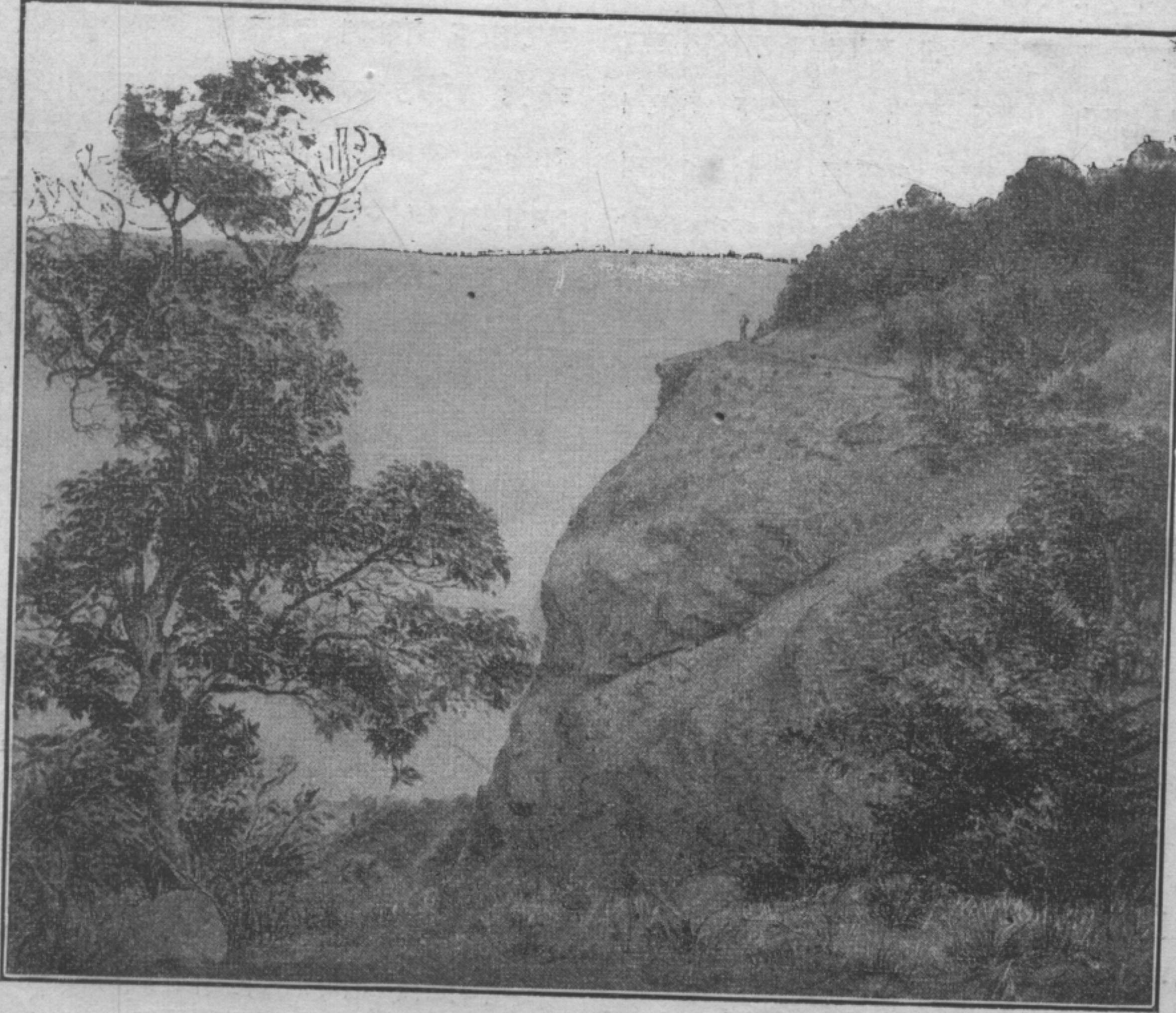
ম্যাথেরান।

বোম্বায়ে স্ত্রী স্বাধীনতার চিত্র যেমন

(১) বোম্বায়ের নিকটবর্ত্তী একটি শৈলনিবাস—মহাবলেশ্বর পাহাড়ের ছোট ভাই। গাছপালা বন উপবন পাহাড়ের দৃশ্যে পরিশোভিত।—মুনিঋষির আশ্রম তুল্য মনোরম স্থান। মহাবলেশ্বরের চেয়ে নীচু কিন্তু অপেক্ষাকৃত সুগম বলিয়া বোম্বাইবাসীদের স্পৃহণীয়।

তৃপ্তিজনক, বাঙ্গালাদেশে অবরোধ প্রথা তেমনি আমার কষ্টকর। আমাদের দেশে এই প্রথা বদ্ধমূল হইবার কারণ কি? ভারতের প্রাচীন ইতিহাস ত ইহার পক্ষে সাক্ষ্যদান করে না; আমার মনে হয় যে মুসলমান আমল থেকেই খুব সম্ভব এই কঠোর নিয়মের সূত্রপাত, যে সময়ে অত্যাচার ভয়ে কুলস্ত্রীদের গৃহরুদ্ধ রাখা আবশ্যক হইত। কিন্তু এখন ত আর সেকাল নাই, এখনো যাঁহারা ঐ কারণে অবরোধ প্রথার পক্ষপাতী আমি তাঁহাদের বলি, এ ত আর মোগলাই নয়, এ ইংরাজরাজ্য স্ত্রীজাতির সম্মাননা যাহার মূলমন্ত্র, তোমাদের ওরূপ ভয়ের কোন কারণ নাই। ওরূপ আশঙ্কা যে অমূলক একবার বোম্বাই গিয়া সেখানকার নরনারীর সম্মিলন দেখিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। আমার নিজের দৃষ্টান্ত হইতেও আমি তার প্রমাণ দিতে পারি। প্রথমে যখন আমি বোম্বায়ে আমার স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া যাই, তখন কতলোকে কত প্রকার বিভীষিকা দেখাইয়াছিল কিন্তু পরীক্ষায় দেখিলাম, সে মিথ্যা জুজুর ভয় বই আর কিছুই নয়। আমরা স্বামীস্ত্রীতে প্রকাশ্যভাবে এতদিন বিদেশে ঘুরিয়া ব্যাড়াইলাম, কই আমাদের ত ওরূপ কোন বিপদ ঘটে নাই। এ বিষয়ে আমাদের শাস্ত্রে যে বচন আছে তাহাই ঠিক—

অরক্ষিতা গৃহেরুদ্ধাঃ পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ
আত্মানমাত্মনা যাস্তু রক্ষেয়ুস্তাঃ সুরক্ষিতাঃ।

স্ত্রীরা আপ্তপুরুষ কর্ত্তৃক গৃহরুদ্ধ থাকিলেও অরক্ষিতা, যাহারা আপনারা আপনাদের রক্ষা করিতে পারে তাহারাই সুরক্ষিতা। এই আত্মরক্ষার শক্তি ঘরে বন্দ থাকিলে হয় না, বাহিরে গিয়াই উপার্জ্জন করা যায়।

ভারত মহিলা বল, বিদ্যা ও স্বাধীনতা লাভ করিয়া উন্নত হইলে পুরুষেরাও যে সেই উন্নতির ফলভাগী হইবে ইহা কে না স্বীকার করিবে? তেমনি আবার "মুক্তবায়ু ও আলোকে সঞ্চরণ করিবার সহজ অধিকার" হইতে বঞ্চিত করিয়া নারীকে সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিলে তাহার কুফলেও সমগ্র সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। কেননা স্ত্রী পুরুষ উভয়ে মিলিয়াই সমাজ। স্ত্রীদের উন্নতিতে জাতীয় উন্নতি, স্ত্রীদের অবনতিতে জাতীয় দুর্গতি, এটি বেদবাক্য।

পুরশ্রী

বোম্বাই সহরের পুরশ্রী বর্ণনা করিতে নানাজাতির সম্মিশ্রণ তাহার প্রধান লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয়। কত বিভিন্ন জাতি একত্রিত হইয়াছে তার পরিচয় তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন ভজনালয়েই অনেকটা পাওয়া যায়। সহরের এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত দুই তিন ক্রোশ চলিয়া গেলে নানাজাতীয় মন্দির—চিত্রবিচিত্র হিন্দুমন্দির, মুসলমানদের মস্‌জিদ, পারসীদের অগ্নিগৃহ, ইহুদিদের সিনাগোগ—ইংরাজ-চর্চ্চ—এই সকল একে একে দৃষ্টিপথে পতিত হয়। ময়দানে দেখিবে মুসলমান সান্ধ্য নামাজের জন্য কার্পেট বিছাইতেছে, তাহার পার্শ্বে হয়ত একজন পারসী অস্তোন্মুখ সূর্য্যের দিকে চাহিয়া স্তুতিমন্ত্র পাঠ করিতেছে। পুরবাসীদের কোন এক বড় উৎসবের দিন এই মিশ্রজাতির মেলা দেখিতে হয়—সে এক অতুলনীয়

শোভনদৃশ্য। বোম্বাইবাসীরা বাঙ্গালীদের মত স্বল্পবস্ত্র 'লজ্জশির' নহে। বাহিরে পথেঘাটে সর্ব্বত্রই পাগড়ীওয়ালা মাথা। বাঙ্গলা ও ভারতের অন্যস্থানে প্রথম দর্শনেই এই এক পার্থক্য ধরা পড়ে, বিদেশীগণ ইহা সহজে লক্ষ্য করিয়া থাকে। কেহ বলে খোলা মাথা অসভ্যতার লক্ষণ কিন্তু তাহাদের প্রাচীন রোমকদের দৃষ্টান্ত দেখান যাইতে পারে। টোগাধারী মুক্তশির রোমকের পরিচ্ছদ বাঙ্গালীর বেশ হইতে বিশেষ ভিন্ন নহে। বাঙ্গালীর যেমন খোলা মাথা, বোম্বাইবাসীর তেমনি পাগড়ীই ভূষণ। পাগড়ীর গঠন ও আকৃতি অনুসারে জাতি ও বর্ণ লক্ষিত হয়। মুসলমানদের জরির মোড়াশা পাগড়ী, মারাঠীর শ্বেত বিম্বা লোহিত রথচক্র, গুজরাটীর লাল রঙের গজমুণ্ড, পারসীদের ত্রিকোণ লম্বা টুপী (কতকটা পারসিক টুপীর অনুরূপ), সিন্ধিদের বিপর্য্যস্ত ইংরাজি হ্যাট--এইরূপ লম্বা গোল, কোণবিশিষ্ট নানাধরণের পাগড়ী দেখা যায়। এই সকল চিত্রবিচিত্র শিরোভূষণ নাগরিক পথিকদের মধ্যে বৈচিত্র্য সম্পাদন করে। বোম্বাই ও কলিকাতা, এই দুই সহরের বাহ্য আকৃতিতে প্রভেদ দুকথায় নির্দ্দেশ করিতে হইলে বলা যাইতে পারে— কলিকাতা আটপৌরে, বোম্বাই পোষাকী সহর।

শোভা সৌন্দর্য্য

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের হিসাবে কোন্ সহর প্রাইজ পাইবার যোগ্য ? ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে ইডন্ পার্ক কিম্বা কোম্পানীর বাগানের মত বাগান বোম্বায়ে নাই, আর গঙ্গার মত নদীও নাই। বোম্বায়ের প্রধান নগরোদ্যান যে ভিক্টোরিয়া উদ্যান তাহা যৎসামান্য। তাহার ভিতরে একটি যাদুঘর আছে। তাহাও কোন কার্য্যের নহে। ভিক্টোরিয়া গার্ডেনে হরিণ ব্যাঘ্র বানর ভল্লুক প্রভৃতি কতকগুলি পশু ধরিয়া রাখা হইয়াছে কিন্তু সে পশুশালার নামমাত্র। আলিপুরের পশুশালার মত স্থান বোম্বায়ে নাই। সে যাহা হউক, বোম্বাই সহরের প্রাকৃতিক শোভা ব্যাখ্যাযোগ্য। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের যে দুই প্রধান উপকরণ পাহাড় ও সমুদ্র, তাহা বোম্বায়ের নিজস্ব সম্পত্তি। একদিকে মালাবার শৈল, অন্যদিকে সমুদ্রতীরবর্ত্তী বন্দরনিকর। সমুদ্রতটাস্থিত যে সকল স্থান কিছুকাল পূর্ব্বে ময়লার খনি ও দুর্গন্ধ দূষিত বায়ুর আবাস ছিল তাহা পরিষ্কৃত, প্রশস্ত, সুন্দর ভ্রমণপথে পরিণত হইয়াছে। কলিকাতার ধূলি দুর্গন্ধময় সঙ্কীর্ণ পথঘাট ছাড়িয়া একবার এই সমুদ্র-তীরের বিশুদ্ধ বায়ু সেবন কর—এ দুয়ের প্রভেদ বুঝিতে পারিবে। যদি বোম্বাই দ্বীপ ও বন্দরের নৈসর্গিক শোভা সন্দর্শন করিবার ইচ্ছা হয়, তবে সমুদ্রধারের রাস্তা দিয়া মালাবার শৈলে আরোহণ কর—তথাকার গিরিকানন, বন্দরের জাহাজশ্রেণী, নগরের গৃহাবলী মিলিত শোভনদৃশ্য তোমার সম্মুখে প্রসারিত। যখন অস্তোন্মুখ দিনকর-কিরণে এই দৃশ্য সমুজ্জ্বলিত হয় তখন তাহার শোভা অতি চমৎকার। পশ্চিমের আকাশ চিত্র-বিচিত্র মেঘজালে রঞ্জিত, নীচে উপসাগরের শাখাদ্বয় সূর্য্যের কনকবিম্বে ঝক ঝক করিতেছে, তাহার ক্রোড়ে মুম্বাপুরী শয়ান;

সাগরবক্ষে দ্বীপপুঞ্জ ভাসমান; বন্দরে নোঙরবদ্ধ নানাজাতীয় তরণী, কখনও বা একএকটি নৌকা পালভরে চলিয়াছে। স্থলে নারিকেল বৃক্ষরাজি, মধ্যভাগে তরুরাজির অভ্যন্তরে বিরাজিত সুরাগরঞ্জিত হর্ম্ম্যাবলী, দূর হইতে একাকারে এক অপূর্ব্ব শোভা প্রকাশিত; প্রান্তভাগে কোঙ্কনের পর্ব্বতশ্রেণী, সর্ব্বোপরি স্বচ্ছ নীলাকাশ। এখন মনে কর দিনমণি সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া ডুবিয়া গেলেন—সে পর্ব্বত জাহাজশ্রেণী ছায়ায় বিলীন হইল! সে পীতলোহিত স্বর্ণবর্ণের দৃশ্য আর নাই! কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! আর এক নূতন জগৎ, নূতন রাজ্যের আবিষ্কার! নিশানাথ তাঁহার শুভ্রকিরণজাল বিস্তার পূর্ব্বক গগনমণ্ডলে উদিত হইয়াছেন। জলস্থল ক্রমে রজতবর্ণে রঞ্জিত হইল। এই সুস্নিগ্ধ বিমলজ্যোৎস্নাতে সমুদ্রভ্রমণে কি আরাম! আইস, বন্দরে গিয়া আমরা এক নৌকা করিয়া মাঝিদের গান শুনিতে শুনিতে খানিকদূর ব্যাড়াইয়া আসি, আর তুমিও তান ছাড়িয়া দিবে
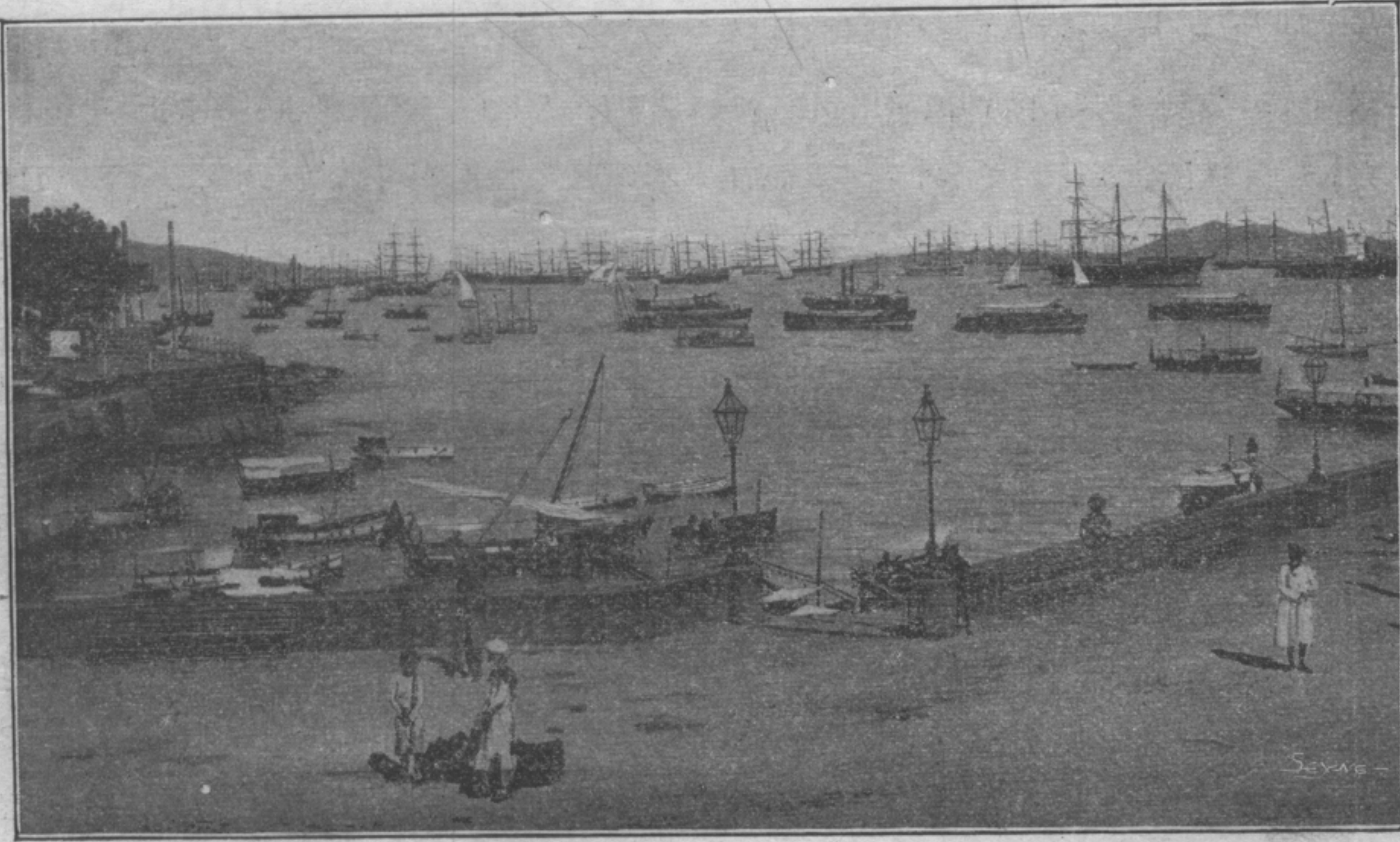
আপলো বন্দর।

ভাসিয়ে দে তরী সুনীল সাগর'পরি,
বহিছে মৃদুলবায়, নাচিছে মৃদুলহরী।

সৌধপুরী

ইংরাজিগ্রন্থে কলিকাতা সচরাচর "সৌধপুরী" "City of Palaces" বলিয়া বর্ণিত দেখা যায়। কিন্তু এ নাম কলিকাতা যে কেন একচেটিয়া করিয়া বসিয়াছে আমি তাহা ভাবিয়া পাই না। কলিকাতা ও বোম্বাই এই দুই সহরের ইমারতশ্রেণীর পরস্পর তুলনা করিলে ত বোধ হয় না যে বোম্বাই কলিকাতার কাছে হার মানে। বুড়ীবন্দর ষ্টেশনে নামিয়া একবার বম্বের ময়দান প্রদক্ষিণ করিয়া আসিলে কত প্রকাণ্ড

সুন্দর হর্ম্ম্যরাজি নেত্রপথে পতিত হইবে তাহার সংখ্যা নাই। সেক্রেতার আফিস, হাইকোর্ট, ইউনিবর্সিটি হলের রাজাবাই স্তম্ভ ও সাস্থন শিল্পালয়, সর সমসদ জি শিল্প বিদ্যালয়, এলফিনিষ্টন হাইস্কুল, সেণ্টজেবিয়র কালেজ, পারসী দাতব্য বিদ্যালয়, অ্যালেকজান্দ্রা স্ত্রী-বিদ্যালয় প্রভৃতি বিদ্যালয়নিচয়, টেলিগ্রাফ ও পোষ্ট আফিস, হাঁসপাতাল, নাবিকাশ্রম, হোটেল, কার্য্যালয়, বিপণিশ্রেণী এই সকল দেখিয়া বোম্বাই কাহার মনে না সুরূপা সৌধপুরী বলিয়া প্রতীয়মান হয়? বম্বের নগরশালা কলিকাতার Town Hall অপেক্ষা কোন অংশেই খাটো নয়। ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিবে মধ্যে প্রকাণ্ড সভাগৃহ, বম্বে এসিয়াটিক সোসাইটির পাঠশালা ও পুস্তকালয়, দরবারশালা প্রভৃতি গৃহ দোতালা অধিকার করিয়া আছে। প্রবেশপথে সোপানের উপরে ও নিম্নদেশে কতকগুলি বিখ্যাত লোকের পাষাণমূর্ত্তি স্থাপিত; তন্মধ্যে এক পারসী ও একটি হিন্দু প্রতিমূর্ত্তি নেত্র আকর্ষণ করে। পারসী সুবিখ্যাত ব্যারনেট সর জমসদজি জিজিভাই বাটলীওয়ালা। "সর" ও "বাটলিওয়ালা" এই পদবীদ্বয়ের মধ্যে তাঁহার জীবনের ইতিহাস অভিব্যক্ত; ইহারা বলিয়া দিতেছে কিরূপে তিনি সামান্য বোতল বিক্রী ব্যবসায় হইতে স্বীয় বুদ্ধির প্রাখর্য্য ও ব্যবহার চাতুর্য্যে প্রভূত ধনসম্পত্তি উপার্জ্জন করিয়া অবশেষে ব্রিটিশ নাইট শ্রেণীভুক্ত হইয়া সমাজের উর্দ্ধশিখরে আরোহণ করিলেন। হিন্দু প্রতিমূর্ত্তি জগন্নাথ শঙ্কর শেটের। ইনি জাতিতে স্বর্ণবণিক, কিন্তু বুদ্ধি ও চরিত্র বলে জীবদ্দশায় হিন্দু জাতির প্রতিনিধিরূপে গণ্য ছিলেন। উপরি ভাগে বোম্বায়ের ভূতপূর্ব্ব কতিপয় গবর্ণরের প্রতিমূর্ত্তি অধিষ্ঠিত, তন্মধ্যে ভারতের ইতিহাসলেখক মহনীয় কীর্ত্তি এলফিনিষ্টন, ইহার মূর্ত্তি সকলের শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়া আছে। ইনিই এ প্রদেশে পাশ্চাত্য সাহিত্যবিজ্ঞানশিক্ষা-প্রণালী উদ্ভাবন করেন। যে দুই বিদ্যালয় ইহার নাম ধারণ করিতেছে তাহারা প্রত্যেকে নিজ নিজ শ্রেণীর অগ্রগণ্য।

নগরশালা হইতে বাহির হইয়া উদ্যানগর্ভ এলফিনিষ্টন চক্রের ইমারত শ্রেণী দেখিতে পাইবে। আচ্ছাদিত বারান্দার মধ্য দিয়া চক্র পথ গিয়াছে। এই সকল ইমারত "সেয়র মেনিয়া" কালের স্মরণ চিহ্ণ। সেই সুখ সৌভাগ্যের মধ্যাহ্নকালে Sir Bartle Frere গবর্ণরের আমলে এই সৌধচক্রের প্রতিষ্ঠা হয়। এই স্থান তখন শূন্যময়দান, মধ্যে কপোতকুলের আবাসস্থান একটি পুরাতন ভগ্ন মন্দির মিটমিট করিত, এক্ষণে তাহার কি আশ্চর্য্য রূপান্তর।

এই সমস্ত সৌধাবলির মধ্যে হাইকোর্ট আদালত সর্ব্বাপেক্ষা বিশাল ও গৌরবশালী। য়ুনিবর্সিটি গৃহ একটি শিল্পরত্ন; কি তাহার নির্ম্মাণকৌশল কি তাহার কার্য্যকারিতা অন্তবার্হ্য উভয়ই ব্যাখ্যাযোগ্য। য়ুনিবার্সিটি ঘটিকাস্তম্ভ গগনভেদ করিয়া আর সকলকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। ইহা আট স্তরে বিভক্ত ও ২৬০ ফুট উচ্চ—দিল্লীর কুতবমিনার অপেক্ষাও ৮ ফুট বেশী। এই স্তম্ভের ঘটিকাযন্ত্র হইতে সময়ে সময়ে তানলয় সমন্বিত সুমধুর ঘণ্টাধ্বনি বিনির্গত
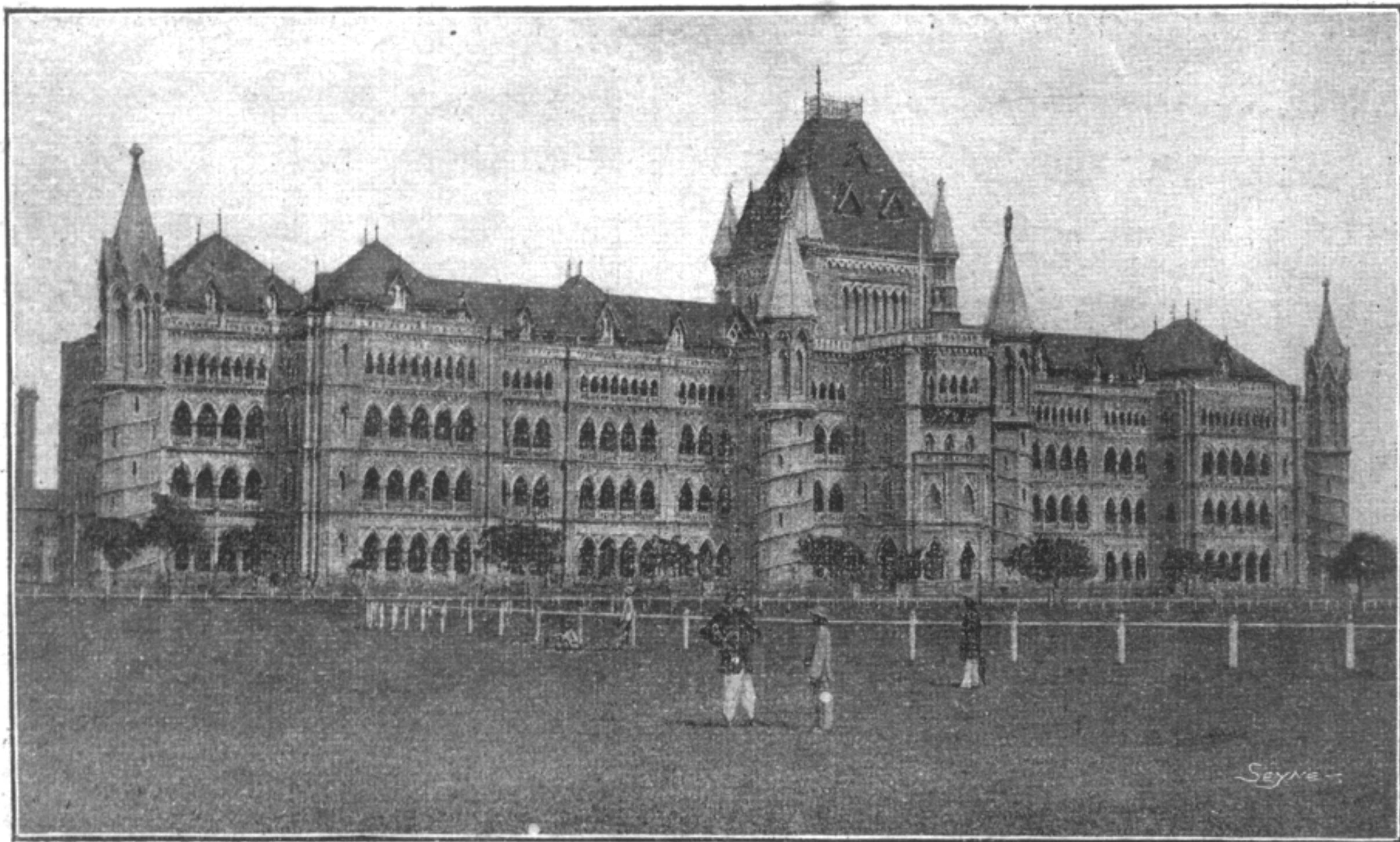
হাইকোর্ট—বোম্বাই।
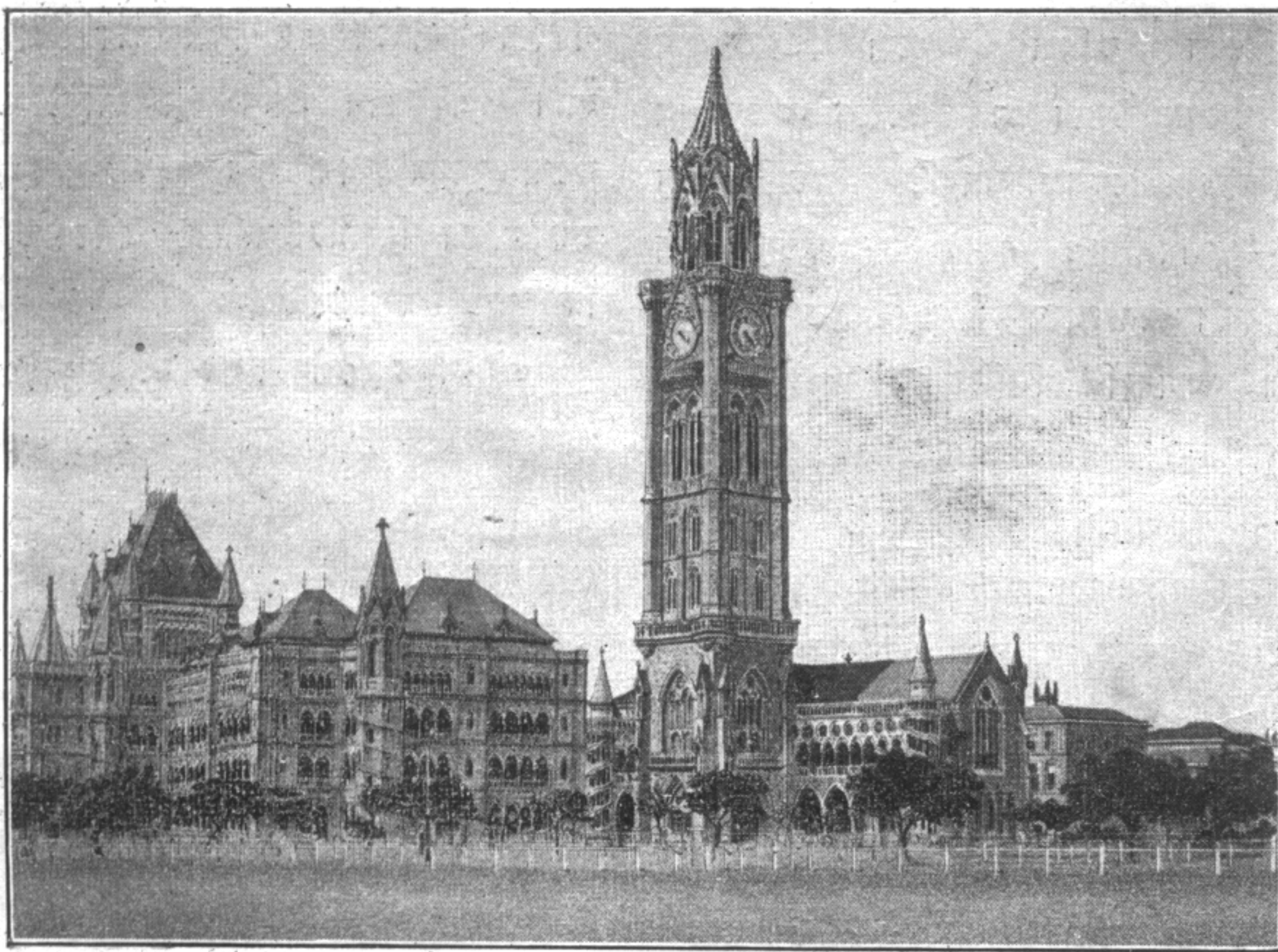
রাজাবাই স্তম্ভ।

হয়। ইহার শিখরদেশ হইতে বন্দর ও সহরের সর্ব্বাঙ্গীন শোভা এক কটাক্ষে দর্শন করা যায়। এই স্তম্ভ ও পুস্তকালয়ের জন্য স্বর্গীয় প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ তাঁহার সেয়র ব্যবসা সংজাত অগাধ রত্ন ভাণ্ডার হইতে চতুর্লক্ষ মুদ্রা দান করেন। এই স্তম্ভের নামে তাঁহার মাতার নাম "রাজাবাই" চিরস্মরণীয় হইয়াছে।

এই সমস্ত বিশাল সুন্দর অট্টালিকা মুম্বাপুরীর গৌরব বর্দ্ধন করিতেছে। ইহাদের বিশেষ মাহাত্ম্য এই যে, এই সকল ইমারত গবর্ণমেণ্টেরই সর্ব্বাঙ্গীন দান নহে। পুরবাসী-গণের বদান্যতাগুণে ইহাদের অনেকের জন্মলাভ। যে কোটি কোটি মুদ্রা গৃহাদি নির্ম্মাণ কার্য্যে ব্যয় হইয়াছে তাহার মোটামুটি চতুর্থাংশ পৌরজনেরা তাহাদের নিজস্ব ধনকোষ হইতে দান করিয়াছিলেন। বোম্বাই সহর কত শীঘ্র কি আশ্চর্য্যরূপে বাড়িয়া
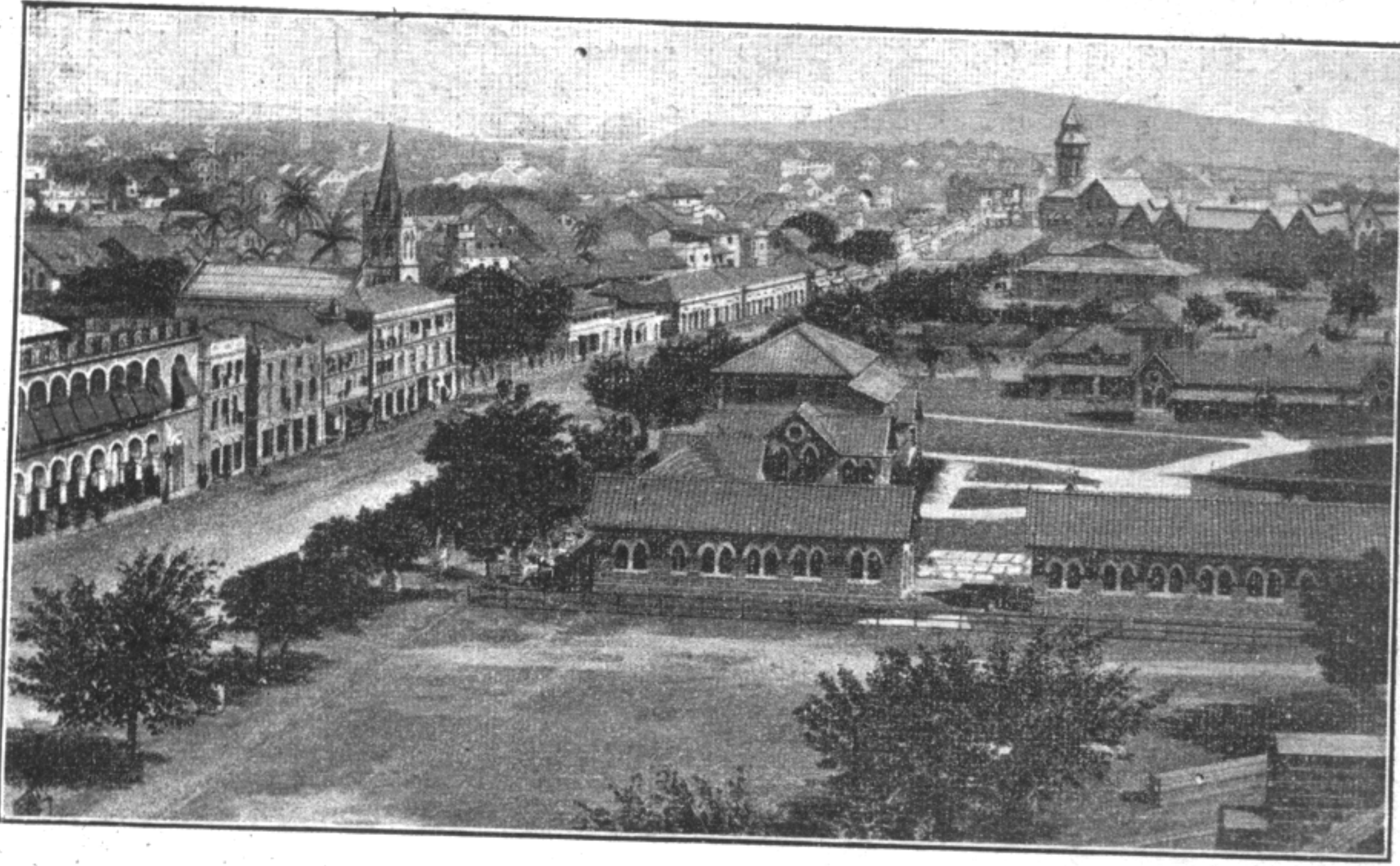
ক্রফোর্ড মার্কেট ও দিশী পাড়া।

উঠিয়াছে তাহার প্রমাণ এই যে, ১৮৬০ হইতে বিংশতি বৎসরের মধ্যে আবাদ রাস্তা সরকারী ইমারত লইয়া সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ৬ ক্রোড় টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে ও তৎকালের মধ্যে স্বাস্থ্য রক্ষা কার্য্যে মুনিসিপালিটী প্রায় চার কোটি টাকা ব্যয় করেন।

কেল্লা ও ময়দানের প্রবেশ পথে ক্রাফোর্ড মার্কেট। ইহা কলিকাতার নূতন ম্যুনিসিপাল মার্কেটের সমস্পর্দ্ধী। যিনি এই হাটের রূপগুণ ভাল করিয়া দেখিতে ইচ্ছা করেন তিনি প্রাতঃকালে ৬।৭ ঘণ্টা বেলায় দেখিলে ফল ফুল তরকারীর প্রাচুর্য্যে বিস্মিত হইবেন। নবেম্বর হইতে মে মাস পর্য্যন্ত ফলের আমদানী। উৎকৃষ্ট লালকদলী, চাঁপাকলা, বাতাবীনেবু, তরমুজ, খরমুজ, নাগপুরী কমলানেবু,

ঔরঙ্গাবাদী ও কাবুলী আঙ্গুর, বঙ্গলোরের পীচ, মহাবলেশ্বরের ষ্ট্রবেরি, মস্কটের তাজা ও শুষ্ক খর্জ্জুর, নারিকেল, আনার, আঞ্জীর (Fig) আনারস, আতা, পাঁপিয়া, পেয়ারা ইত্যাদি ইত্যাদি ফলভারে তথাকার ভাণ্ডার তখন পূর্ণ। আঙ্গুর ও আঞ্জীর দক্ষিণের এই দুটি ফল অতি উপাদেয় আর ফলের রাজা আমের জন্যও বোম্বায়ের বিশেষ খ্যাতি। মাজাগামের আফুস এ দেশের আর সকল আমের সেরা।

ক্রাফোর্ড মার্কেটের পর বম্বের তুলার বাজার উল্লেখ যোগ্য। বোম্বায়ের বাণিজ্য ঘটা দেখিতে হইলে এই বাজার অবশ্য দর্শনীয়। এই স্থান হইতে লক্ষ লক্ষ তুলার বস্তা ভিন্ন ভিন্ন দেশে বার্ষিক রপ্তানি হয়। আমেরিকার New Orleansএর নীচেই ইহা গণনীয়। নানা জাতীয় লোক, নানাবর্ণের পরিচ্ছদ, কেনাব্যাচার কোলাহল মিলিয়া তুলার বাজারে বোম্বায়ের বাণিজ্য-শ্রী মূর্ত্তিমতী।

বোম্বাইযাত্রী এই সকল ইমারত দেখিয়াই যেন সন্তুষ্ট না থাকেন—দিশী পাড়াটা একবার তন্নতন্ন করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। ইহার মধ্যে অনেক কৌতূহলজনক নূতন জিনিস দেখিবার আছে—ম্যুনিসিপাল বন্দবস্ত এইভাগেই বিশেষ দ্রষ্টব্য। দোকান হাটের ক্রয় বিক্রয়, ট্রাম, ঘোড়া ও গরুর গাড়ীর চলাচল ও নানাজাতীয় লোকজনের সমাগমে এই স্থানেই সহরের জীবন্ত চলন্ত ভাব প্রতিবিম্বিত। কলিকাতার দিশী পাড়ার তুলনায় ইহা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও শ্রীসম্পন্ন মনে হয়।

বোম্বাই সহর সামান্যত তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; প্রথম এই দিশী পাড়া যাহা সহরের হৃদয়। দ্বিতীয়, কেল্লা যাহা সহরের মাথা যেখানে ধনাগমের যন্ত্র সকল পরিচালিত। তৃতীয়, মালাবার শৈল যাহা ইংরাজ কর্ম্মচারী এবং শ্রীমন্ত সওদাগরদের বাস ও আয়েসের স্থান।

এই যে কেল্লা অঞ্চল, ইহার শিরোভূষণ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পাষাণ প্রতিমূর্ত্তি। কেল্লা ও আফিসাঞ্চলের দিকে রাজমার্গ দ্বিধা হইয়া গিয়াছে তাহার মুখে মহারাণীর শ্বেত পাষাণ প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। রাজ্ঞী উচ্চ সিংহাসনে সমাসীনা. সিংহাসন বিতান মণ্ডপীত, বিতানের মধ্যভাগে ভারতনক্ষত্র, তদুপরি ইংলণ্ডের গোলাপ ও ভারত নলিনী, রাণীর পরিচ্ছদ ও আর সব মিলিয়া প্রতিমূর্ত্তিখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর প্রতিভাত হয়। কলিকাতার ভিক্টোরিয়া প্রতিমূর্ত্তি ইহার নিকট নগণ্য।

মন্দির

মুম্বাতলাও এর সম্মুখস্থ কাংস্যবাজার হইতে গিরগাম পর্য্যন্ত হিন্দু ও জৈনমন্দিরে সমাকীর্ণ। বোম্বায়ে যে সকল হিন্দুমন্দির দৃষ্ট হয় তন্মধ্যে বালুকেশ্বর, মহালক্ষ্মী, মুম্বাদেবী, নাগদেব ও শ্রীব্যঙ্কটেশ অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। তাহাদের বয়ঃক্রম ন্যূনাধিক দুইশত বৎসর। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের হিন্দুবসতি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের উৎপত্তি। সেকালে এই অল্প সংখ্যক মন্দিরগুলি হিন্দুদিগের পূজার্চ্চনার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। কালক্রমে হিন্দুসংখ্যার বৃদ্ধিসহকারে নবনব মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়া নগরীর ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ অধিকার করিয়া লয়। সুরাট হইতে ইংরাজ রাজধানী

বোম্বায়ে উঠিয়া আসিবার পর অবধি ক্রমে বোম্বায়ের প্রজাপুঞ্জ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ১৮৩৭ অব্দে মহা অগ্ন্যুৎপাতে সুরাট নগরী ভস্মসাৎ হওয়াতে অনেকানেক বাসচ্যুত নিঃস্ব হিন্দুসন্তান উপজীবিকা অর্জ্জনাশয়ে সপরিবারে বোম্বাই আসিয়া বাস করে। অনেকে বাণিজ্য ব্যবসা সূত্রে বোম্বায়ে আকৃষ্ট হয়। পেশওয়া রাজ্য বিনষ্ট হইবার পর পুণা, সাতারা, ও দক্ষিণের অন্যান্য প্রদেশ হইতে মারাঠাদলের আগমন; কচ্ছ, মারওয়াড় ও দেশীয় রাজসংস্থানের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বণিক ও শ্রমজীবী লোকের সমাগম ইত্যাদি কারণে বোম্বায়ে হিন্দুসংখ্যা বহুগুণ বিস্তৃত হইয়া সেই সঙ্গে নানা সম্প্রদায়ের আরাধ্য দেবদেবীর মন্দির চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। বৈষ্ণব, ভাটিয়া ও বণিকদের ব্যয়ে জীবন লালের বল্লভাচার্য্য মন্দির, মারওয়াড়ীদের বালাজী ও জগন্নাথ মন্দির, স্বামীনারায়ণ সম্প্রদায়ের মন্দির, নানকপন্থী, কবীরপন্থী, রাধাবল্লভী, রামানুজ প্রভৃতি প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ ভজনালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া ভজন পূজনাদি অনুষ্ঠান করিয়া থাকে।

বালুকেশ্বর।

বালুকেশ্বর

প্রাচীন মন্দিরের মধ্যে বালুকেশ্বর অগ্রগণ্য। প্রবাদ এই যে রামচন্দ্র সীতান্বেষণে নিষ্ক্রান্ত হইয়া এই স্থানে একরাত্রি যাপন করেন। তাঁহার শিবপূজার জন্য ভাই লক্ষ্মণ প্রত্যহ বারাণসী হইতে নূতন শিবলিঙ্গ আহরণ করিয়া আনিতেন। এক রাত্রে তিনি যথা নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইতে না পারাতে রাম অধৈর্য্য হইয়া বালুকা হইতে লিঙ্গ গড়িয়া পূজার্চ্চনা সমাধা করেন। এই ঘটনা হইতে মন্দিরের নাম বালুকেশ্বর। এক্ষণে তাহাতে যে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে তাহা

বারাণসী হইতে সমানীত। এইস্থানে একটা সুন্দর ঘাটবাঁধানো পুষ্করিণী আছে তাহার নাম বাণতীর্থ। রামচন্দ্র তৃষ্ণাতুর হইয়া ভূমধ্যে বাণক্ষেপ করেন আর অমনি জলস্রোত উথলিয়া উঠে তাহা হইতেই এই জলাশয়ের জন্ম ও নামকরণ। এই পুষ্করিণীর চারিধারে বড় বড় ছায়াতরু, আর কতকগুলি মন্দির, ধর্ম্মশালা ও ব্রাহ্মণের বাসগৃহ দৃষ্ট হয়। সমুদ্র-তীরস্থিত পাহাড়ে একটা ছিদ্র আছে তাহার মধ্য দিয়া গলিয়া যাইতে পারিলে হিন্দুর পাপক্ষয় হয় ও জনশ্রুতি এই যে শিবাজী রাজা এই উপায়ে পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তিনি কৃশাঙ্গ ছিলেন। তাঁহাকে এজন্য অধিক কষ্ট ভোগ করিতে হয় নাই।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বরপণ

প্রবন্ধলেখক এই প্রবন্ধে বরের পণ গ্রহণের পক্ষপাতী। তাঁহার যুক্তিগুলি ফুৎকারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। তবে তিনি একদিক দেখাইয়াছেন,—ইহার বিপক্ষে বলিবারও অনেক কথা আছে। আমরা প্রতিপক্ষকে ইহার উত্তর দানে আহ্বান করিতেছি।

তর্ক বিতর্ক দ্বারা এইরূপ সমাজ সমস্যাসমূহের মীমাংসা হওয়া প্রার্থনীয়—মীমাংসা না হইলেও ইহার আলোচনা যে সুফলপ্রদ তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভাঃ সম্পাদিকা

ন্যূনাধিক চল্লিশ বৎসর হইল বিবাহে কন্যা পক্ষের নিকট হইতে টাকা লইবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে বরং কোন্ কোন স্থানে এবং কোন কোন সমাজে বর পক্ষেরই কন্যাপক্ষকে টাকা দিতে হইত। অনেক পুরুষের অর্থাভাব বশত বিবাহ হয় নাই এরূপও ঘটিয়াছে। কন্যাপণ প্রথার বিরুদ্ধে দেশমধ্যে আন্দোলনও খুব হইয়াছিল। তখনকার এডুকেশন গেজেটে ও সোমপ্রকাশে কন্যাপণ গ্রহণ সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক চলিত। কেহ কেহ মহাভারতের দোহাই দিয়া বলিতেন যে, বহু পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে কন্যাপণ গ্রহণ প্রথা প্রচলিত ছিল। বিরুদ্ধবাদীরা নানা শাস্ত্রের বচন উদ্ধৃত করিয়া এবং বহু যুক্তি [illegible] গ্রহণ মাংস বিক্রয় অপেক্ষাও নিন্দনীয় পাপ। প্যারিচরণ সরকার, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ এবং আরও অনেক স্বদেশপ্রেমিক পণ্ডিত কন্যাপণের বিরুদ্ধে অতি তীব্রভাবে লিখিতেন। তখনকার এডুকেশন গেজেট ও সোমপ্রকাশে তাঁহাদের যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ বাহির হইত। ইহার কয়েক বৎসর পরেই এমন প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হইল যে কলিকাতায় কন্যাকর্ত্তা বরকে টাকা না দিলে বিবাহ হয় না। সকল অনুষ্ঠানেই যেরূপ অনুকরণ হইয়া থাকে এক্ষেত্রেও তাহাই হইল; দেখিতে দেখিতে বরপণপ্রথা কলিকাতার বাহিরে সমস্ত দেশে বিস্তৃত হইল। কত সম্ভ্রান্ত লোক কন্যার বিবাহ দিতে গিয়া সর্ব্বস্বান্ত এমন কি ভিক্ষাজীবী হইলেন। কন্যার নয় বৎসর

বয়সের মধ্যে বিবাহ দিতেই হইবে, অথচ এই দরিদ্র দেশে প্রায় সকলেরই অর্থাভাব। সুতরাং কন্যার বিবাহোপযোগী অর্থ সংগ্রহের জন্য বাড়ী ঘর ভূমি প্রভৃতি পৈত্রিক সম্পত্তি বিক্রীত হইতে লাগিল--দেশ মধ্যে একটা হাহাকার উঠিল। প্রায় ২৮ বৎসর হইল প্রথমে ভবানীপুরের অম্বষ্ঠ সভা হইতে বরপণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ প্রকাশিত হইল। তাহার বহু বৎসর পরে কায়স্থ সভা হইতেও ইহার প্রতিবাদ হইল। কিন্তু বরপণ অবাধেই চলিতে লাগিল। কয়েক বৎসর পরে পণের পরিমাণের লাঘব হইল বটে কিন্তু পণ গ্রহণ একেবারে উঠিয়া গেল না। কয়েকজন দেশমান্য ধনশালী ব্যক্তি স্ব স্ব পুত্রের বিবাহে যৌতুক স্বরূপ নগদ টাকা গ্রহণ করেন নাই বটে কিন্তু এই দরিদ্র দেশে সকলেই তাঁহাদের অনুকরণ করিয়া পুত্রের বিবাহ কালে অনায়াসপ্রাপ্য অর্থ পাইবার সুযোগ ছাড়িতে পারে নাই। বরপণের বিরুদ্ধে যে সমস্ত প্রতিবাদ হইয়াছে তাহাও তেমন প্রবল নহে। একবার এক মাসিক পত্রিকার সম্পাদক লিখিয়াছিলেন যে, যে সকল যুবক বরপণের পক্ষপাতী তাঁহাদের লিখিত কবিতা সেই পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে না। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মধ্যে মধ্যে বরপণের বিরুদ্ধে বেঙ্গলিতে প্রতিবাদ করিয়া থাকেন। ফরিদপুর ও চট্টগ্রামের প্রাদেশিক সমিতিতেও সেইরূপ প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। এই সকল প্রতিবাদের কোনটাতেও কোন বিশেষ যুক্তি প্রদর্শিত হয় নাই। কেবল বরপণের প্রথা যে নীচতা, অর্থলোলুপতা, পরপীড়কতা ইহাই বলা হইয়াছে। কিন্তু কেবল গালাগালি বা কটু বিশেষণ প্রয়োগে কোন অনিষ্টই নিরাকৃত হয় না। প্রত্যেক অনিষ্টেরই প্রথমে কারণ নির্ণয় করিয়া সেই কারণ নির্ম্মূলিত করিতে চেষ্টা করা উচিত।

সুতরাং আমাদের দেখা উচিত যে পূর্ব্বেই বা কেন কন্যাপণ প্রথা প্রচলিত ছিল আর এখনই বা কেন তাহার পরিবর্ত্তে বরপণ প্রথা প্রচলিত হইল। সমস্ত জীবের মধ্যেই স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের শারীরিক ও মানসিক বল অধিক। সমস্ত জীবেরই বংশপরম্পরায় বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছা স্বাভাবিক ও অতি প্রবল। এই সম্বন্ধে স্ত্রীপুরুষে কোন ভেদ নাই। বংশ রক্ষা করিবার ইচ্ছা অথবা (বৈজ্ঞানিক ভাষায়) বংশ পরম্পরায় বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছা পুরুষেরও যেমন স্ত্রীরও সেইরূপ। এবং এই ইচ্ছা পূর্ণ করিতে হইলে স্ত্রী ও পুরুষের সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন। সুতরাং স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পরের লোভনীয় পদার্থ। কিন্তু যাহার শরীর ও মনে বল অধিক সকল কার্য্যের ভার প্রধানত তাহার উপরে পড়াই স্বাভাবিক ও উচিত। এই স্বাভাবিক নিয়মানুসারে যৌন নির্ব্বাচনের ভার প্রধানত পুরুষের উপরই বর্ত্তে। এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া সমস্ত জীবের মধ্যে পুরুষেরাই স্ত্রী নির্ব্বাচন করে। মনুষ্য সমাজের প্রাকৃতিকঅবস্থাতেও তাহাই হইত। এই নির্ব্বাচনে বাধা প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ স্ত্রী এই নির্ব্বাচনে অনিচ্ছুক হইলে বা তাহার আত্মীয় বর্গের অভিপ্রায় না থাকিলে অথবা অন্য প্রতিদ্বন্দ্বী উপস্থিত হইলে স্ত্রীকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করা হইত এবং প্রয়োজন হইলে তাহার আত্মীয়বর্গের সহিত বা প্রতিদ্বন্দ্বীর

সহিত যুদ্ধ করিতে হইত। সুতরাং অন্য জীবদিগের মত মনুষ্য সমাজের প্রাকৃতিক অবস্থায় শারীরিক বলই স্ত্রী লাভের একমাত্র উপায় ছিল। তখন নারীজাতি বীর্য্যশুল্কা ছিল। কোন কোন স্থানে এই প্রথার কিছু পরিবর্ত্তন হইয়া যুদ্ধ-বিগ্রহের পরিবর্ত্তে অন্য প্রকারে বরের বল পরীক্ষা হইত। রামায়ণ ও মহাভারতে আমরা মৎস্যচক্র ভেদ ও ধনুর্ভঙ্গ পণে তাহার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। স্কটের Anne of Gierstein নামক নভেল পড়িলে মনে হয় ইউরোপেও ধনুর্ভঙ্গ পণ ছিল।

সমাজ যখন প্রাকৃতিক অবস্থা অতিক্রম করিয়া সভ্যতার সোপানে আরোহণ করে, যখন সমাজে ধন ও বিদ্যা প্রবেশ করিয়া শারীরিক বলের স্থান অধিকার করিতে থাকে তখন কন্যাপক্ষকে ধন বা বিদ্যা দ্বারা তুষ্ট করিয়া বিবাহের প্রথা প্রচলিত হয়। আসামে এখনও কন্যার জন্য পণ দিতে হয়। বল-পূর্ব্বক কন্যাকে হরণ করিয়া বিবাহ করিলে অথবা কন্যার সম্মতিতে গোপনে বিবাহ হইলেও বিবাহের পর কন্যার অভিভাবককে টাকা দিতে হয়। আসামে বলে যে কন্যা বহুমূল্য রত্নস্বরূপ,—যাহার নিকট হইতে সেই রত্ন গ্রহণ করা হয় তাহাকে মূল্য স্বরূপ কিছু দেওয়া কর্ত্তব্য। আসামীরা বলেন যে এইরূপ পণ দিলে নারীজাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়—আর না দিলে নারীজাতির প্রতি অসম্মান হয়। স্ত্রী যে রত্ন এ কথাটা বঙ্গ দেশেও আছে। সুতরাং বঙ্গদেশেও যে কন্যা-পণ ছিল তাহাতে আশ্চর্য্য নাই। কিন্তু কি আসামে কি বঙ্গ দেশে "স্ত্রী রত্ন" কেবল কথা মাত্রই ছিল। গো হিন্দুজাতির পূজ্য-দেবতা স্বরূপ, মাতা স্বরূপ ইত্যাদি কথা শুনিতে পাওয়া যায়, অথচ বঙ্গ ও আসামে কার্য্যত গরুর প্রতি যেরূপ অনাদর ও নির্ম্মমতা প্রদর্শন করা হয় ও নানা রূপ কষ্ট দিয়া গৌণ ভাবে হিন্দুরা যত গোহত্যা করেন মহারাজ রন্তিদেবও তত গোহত্যা করেন নাই এবং গোখাদক দেশেও তেমন গোহত্যা হয় না। ঠিক সেই রূপে মুখে তাঁহারা স্ত্রীকে রত্ন বলিতেন বটে কিন্তু রত্ন রূপে যত্ন করিবার জন্য অথবা বাস্তবিক সহধর্ম্মিণী করিবার জন্য স্ত্রীলাভের চেষ্টা করিতেন তাহা নহে। স্ত্রী দাস দাসীর মত খাটিবে, নিজে না খাইয়া এবং সহস্র কষ্ট স্বীকার করিয়া পুরুষের সেবা করিবে এবং সংসারের স্থিতি সাধন করিবে এই জন্যই স্ত্রীর প্রয়োজন হইত। সুতরাং গরু ঘোড়া ছাগ মহিষ যেমন ধন দিয়া কিনিতে হয় স্ত্রীকেও তেমনই কিনিতে হইত। তখন বিবাহে যে একটা দায়িত্ব আছে তাহা লোকে বুঝিত না—কন্যার অভিভাবক গৌরী বা রোহিণী দানের পুণ্যলাভ করিবার জন্য যত ব্যগ্র হইতেন, বরপক্ষ গৃহকার্য্যের জন্য, সংসার স্থাপনের জন্য, বংশ বৃদ্ধির জন্য তাহা অপেক্ষাও অধিক ব্যগ্র হইতেন। সুতরাং তখন যে কন্যার জন্য পণ দিতে হইত তাহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই।

কিন্তু এখন দেশ মধ্যে সভ্যতার বিস্তারে জীবনযাত্রার উচ্চতর আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। লোকের বিবাহিত জীবনের দায়িত্ব জ্ঞান জন্মিতেছে, নারীজাতির প্রতি সম্মান বর্দ্ধিত হইতেছে, নারীজাতিকে সুশিক্ষিত করা হইতেছে, সুতরাং এখনকার

শিক্ষিত পুরুষ এরূপ ইচ্ছা করেন না যে তাঁহার স্ত্রী দাসদাসীর মত খাটিয়া কষ্ট পায়। বিবাহে তাঁহার হয়ত অনিচ্ছা নাই কিন্তু তাঁহার মনে বিবাহিত জীবন যাত্রার যে আদর্শ আছে তদনুরূপ অর্থ নাই বলিয়া তিনি বিবাহ করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহার অভিভাবকদিগের মতও সেইরূপ। ইহা জানিতে পারিয়া এক ধনী তাঁহাকে যৌতুক স্বরূপ অনেক টাকা দিবার প্রস্তাব করিলেন। তখন তিনি বিবাহ করিলেন। একটী যুবক এল্ এ পাস করিয়াছে কিন্তু তাহার অর্থাভাব জন্য বি এ পর্য্যন্ত পড়ার সাধ্য নাই। কিন্তু সে যৌতুক স্বরূপে পড়ার খরচ পাইয়া বিবাহ করিল। এরূপ করার কি কোন দোষ আছে? একজন সম্পত্তিশালী ব্যক্তির ইচ্ছা যে তাঁহার সম্পত্তি আরও বিশ হাজার টাকা অধিক না হইলে তিনি পুত্রের বিবাহ দিবেন না। আর একজন ঠিক বিশ হাজার টাকাই যৌতুক দিতে চাহিলেন, সুতরাং বিবাহ হইয়া গেল। প্রথমোক্ত ব্যক্তির নিন্দা হয়ত অনেকেই করিবেন। কিন্তু তাঁহার দোষ কি তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত। তিনি ধনশালী হইয়াও আরও ধনলাভের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন ইহা যদি দোষ হয় তাহা হইলে যে সকল ধনকুবের ধনবৃদ্ধির জন্য এখনও বাণিজ্যব্যবসায় করিতেছেন তাঁহারা ত বড়ই পাপী। তবে কি বিবাহরূপ কার্য্যে ধনাভিলাষ দূষণীয়? এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে প্রথমেই আমাদের স্মরণ করা উচিত যে বর্ত্তমান সময়ে পুরুষের পক্ষে বিবাহ একটা অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া শিক্ষিত সমাজ বিবেচনা করেন না। বিবাহ যখন অবশ্য কর্ত্তব্য নহে অথচ তাহাতে যখন পৌনঃপুনিক ব্যয়সঙ্কুল দায়িত্ব আছে, তখন সেই ব্যয়সম্পাদনযোগ্য অর্থ সংগ্রহ না করিয়া বিবাহ করা এক প্রকার পাপ ভিন্ন আর কিছুই নহে। সংসারে এমন ধনবান্ অল্পই আছেন যাঁহাদের আরও কিছু টাকা হইলে সুখ স্বচ্ছন্দতার বৃদ্ধি না হইতে পারে। সুতরাং কোন ধনবান্ ব্যক্তি যদি অধিকতর সুখস্বাচ্ছন্দ্যে বিবাহিত জীবন যাপন করিবার অভিপ্রায়ে বিনা যৌতুকে বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক হন তাহা হইলে কি তাঁহাকে দোষ দেওয়া যাইতে পারে?

বরপক্ষ কখনই কন্যাপক্ষের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক টাকা লইতে পারে না। যতরূপ বাস্তব এবং কাল্পনিক দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করা যাইতে পারে তাহার একটীতেও এরূপ ডাকাতী দেখা যাইবে না। কন্যাপক্ষ যদি বরকে টাকা দেওয়া অন্যায় মনে করেন তাহা হইলে তাঁহার তদনুরূপ পুরুষোচিত সাহস অবলম্বন করা উচিত। তিনি নিজে কাপুরুষের মত টাকা দেন আর বরকে বা বরের পিতাকে নীচমনা বলিয়া গালাগালি দেন। বরপক্ষ কখনই কন্যাপক্ষকে টাকা ও কন্যা দান করিতে বাধ্য করিতে পারে না। কন্যার বিবাহ কন্যাকর্ত্তার সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। বরপক্ষ হইতে যত টাকা চাওয়া হয় কন্যাপক্ষ যদি তত দিতে না পারেন অথবা মোটেই টাকা দিতে অক্ষম বা অনিচ্ছুক হন তাহা হইলে সেই বরকে কন্যাসম্প্রদান না করিলেই ত পারেন। বঙ্গদেশে এখনও অনেক

লোক আছেন যাঁহারা অল্প টাকা লইয়া অথবা বিনা টাকায় বিবাহ করিতে প্রস্তুত। কিন্তু যে বরটী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পছন্দ হইয়াছে সেই বর ভিন্ন অন্য কাহাকেও কন্যা দান করিব না এরূপ সংকল্প থাকিলে সেই বরের ইচ্ছামত পণ দিতেই হইবে। কেহ বিনামূল্যে বা নিজের ইচ্ছামত অল্পমূল্যে অভীপ্সিত একটা অঙ্গুরীয়ক বা অট্টালিকাটা দান করিতে পারেন বটে কিন্তু তিনি যদি তাহা না করেন অথবা অল্পমূল্যে সেই অট্টালিকা না ছাড়েন তাহা হইলে কি কেহ তাঁহাকে দোষ দিতে পারে? কখন কখন কন্যাপক্ষকে আটকাইয়া টাকা লইবার চেষ্টা হয় বটে কিন্তু তখনও টাকা দেওয়া না দেওয়ার ক্ষমতা কন্যাপক্ষের হাতেই থাকে। পনর বৎসর পূর্ব্বে এই প্রবন্ধ-লেখকের এক কন্যার সহিত একটী ভদ্রলোকের পুত্রের বিবাহের কথাবার্ত্তা হয়। স্থির হইল যে কন্যাকর্ত্তা নগদ টাকা কিছুই দিবেন না এবং সামান্য কিছু অলঙ্কার দিবেন। ভদ্রলোকটী তাহাতেই সম্মত হইলেন এবং বিবাহের দিন স্থির হইল। কিন্তু সেই দিনের একপক্ষ পূর্ব্বে ভদ্রলোকটী নগদ টাকা এবং বহুমূল্যের অলঙ্কার চাহিয়া পত্র লিখিলেন। কন্যাকর্ত্তা সে পত্রের আর উত্তর দিলেন না। ভদ্রলোকটী তাহার পর দুইখানা পত্র রেজিষ্টারি করিয়া পাঠাইলেন এবং কয়েকখানা টেলিগ্রাফও করিলেন কিন্তু কন্যাকর্ত্তা কিছুরই উত্তর দিলেন না। বলা বাহুল্য সে বিবাহ হইল না। গত বৎসর একটী প্রধান উকীলের কন্যার বিবাহের প্রাক্কালে বরের গুরুদেব বলিলেন যে, তিনি পাঁচশত টাকা না পাইলে বিবাহে অনুমতি দিবেন না। উকিলটীর যদি সৎসাহস থাকিত তাহা হইলে তিনি অনায়াসেই বরপক্ষকে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া বিদায় করিতে পারিতেন এবং তাহাই করা তাঁহার উচিত ছিল। কিন্তু তিনি কাপুরুষের ন্যায় আড়াই শত টাকা দিয়া গুরুর অনুমতি ক্রয় করিলেন। বরপক্ষের এইরূপ ব্যবহার অতিশয় নীচতার কার্য্য সন্দেহ নাই। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী এক গ্রামের লোক এইরূপ এক বরপক্ষকে বিলক্ষণ শিক্ষা দিয়াছিলেন। বিবাহ করিতে কন্যার বাটীতে উপস্থিত হইয়া লগ্নের কয়েক মিনিট পূর্ব্বে বরের পিতা বন্দোবস্তের অতিরিক্ত টাকা চাহিয়া বসিলেন। তখন গ্রামিকেরা সমবেত হইয়া বরপক্ষকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। বরপক্ষের এইরূপ নীচতার দণ্ড এইরূপই হওয়া উচিত। কিন্তু এরূপ আচরণ এককথা, আর সরল ভাবে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে বরপণ নির্দ্ধারিত হওয়া অন্যকথা। এই শেষোক্ত প্রথায় দোষ ধরিবার কাহারও অধিকার নাই। যাঁহারা এরূপ বরপণ প্রথারও বিরোধী তাঁহারা যেন এই প্রথার কারণ উন্মূলিত করিতে চেষ্টা করেন। অর্থাৎ যাহাতে দেশ হইতে সুশিক্ষা ও নারীর প্রতি সম্মান দূর করিয়া দেওয়া যায় এমন আন্দোলন করেন। কেহ কেহ বরপণ প্রথার প্রতিবাদ বিষয়ে চরমপন্থী। কন্যার পিতা অযাচিত ভাবে এবং আহ্লাদ সহকারে টাকা দিলেও তাঁহাদের মতে সেই টাকা গ্রহণ করা উচিত নহে। গত ১০ই মের বেঙ্গলিতে এই শ্রেণীর এক ব্যক্তির এক পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল।

কিন্তু তাঁহাদের মনে করা উচিত যে পৃথিবীতে কাহারও আর্থিক অবস্থা পরাকাষ্ঠা লাভ করে নাই। সুতরাং যিনি যত বড়ই ধনী হউন না কেন আর কিছু অধিক টাকা হইলে তাঁহার সুখ স্বচ্ছন্দতার অবশ্যই বৃদ্ধি হইবে। সুতরাং যদি কেহ কন্যা ও জামাতার সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে টাকা দেন তাহা হইলে তাহাতে কাহারও আপত্তি করিবার কথা থাকিতে পারে না। এরূপ টাকা লইতে আপত্তি করিবার অধিকার বরেরও নাই, তাঁহার পিতারও নাই। প্রকৃত পক্ষে এরূপ দানকে পণই বলা যাইতে পারে না। যাঁহারা এরূপ দানের বিরোধী তাঁহারা কোন ব্যক্তির মাতামহের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবার পক্ষেও নিশ্চয়ই বিরোধী।

বঙ্গের উত্তরাধিকারের যেরূপ অন্যায় বা পক্ষপাত-পূর্ণ ব্যবস্থা আছে তাহার প্রতিবাদ স্বরূপেও বরপণ প্রচলিত হওয়া উচিত। পুত্র ও কন্যা উভয়েই পিতার সন্তান। কিন্তু পুত্রেরা সমভাগে পৈত্রিক সম্পত্তি পাইবেন কন্যারা কিছুই পাইবেন না কেন? কন্যার পিতা যদি সম্পত্তিশালী হন তাহা হইলে কন্যাদিগকে পুত্রদের সহিত সমান সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিতে বাধ্য করা উচিত। বরপণ দ্বারাই ইহা কিয়ৎ পরিমাণে সাধিত হইতে পারে।

এখন বরপণের দ্বারা দেশে আর কি উপকার বা অপকার হইয়াছে ও হইতে পারে তাহা দেখা যাউক।

১। বরপণ দ্বারা বিবাহিত জীবনযাত্রার উন্নতি হইতেছে। ইহা জাতীয় মঙ্গলের বিষয়।

২। বিবাহের বয়স বাড়িয়াছে। কন্যার নয় বৎসর বয়সের মধ্যে অনেকেই বরপণ সংগ্রহ করিতে পারে না। সুতরাং অনেক সময়ে তাহার দ্বিগুণ বয়সে কন্যার বিবাহ হয়। যে জাতি সহমরণ বন্ধ করার বাধা দিয়াছিলেন, যে জাতি সম্মতি আইনে বাধা দিয়াছিলেন সে জাতি কন্যাবিবাহের অব্যাহত সুযোগ থাকিলে অবশ্যই গৌরীদানরূপ ধনসঞ্চয় করিতেন।

৩। প্রত্যেক জাতির মধ্যে যে বহুংখ্যক শ্রেণীবিভাগ আছে, বরপণ থাকায় সেই শ্রেণীবিভাগের বলবত্তা কমিয়া যাইতেছে।

৪। কালে হয় ত এই বরপণের জন্যই জাতিভেদও উঠিয়া যাইবে।

৫। বরপণ কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্রব্যক্তিদিগকে বিলক্ষণ শিক্ষা দিতেছে যে তাঁহাদের মত অবস্থাপন্ন লোকের বিবাহ করা উচিত হয় নাই। তাঁহাদের দুর্দশা দেখিয়া তাঁহাদের সদৃশ অবস্থার লোকে বিবাহে ইতস্ততঃ করিবে।

৬। বরপণের জন্য কৌলিন্যপ্রথা উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। এখন কুলীনেরাও টাকা দিয়া অকুলীনকে কন্যা সম্প্রদান করিতেছেন।

৭। বরপণ দ্বারা বিবাহে, শ্রাদ্ধে, দোলে, দুর্গোৎসবে এবং আরও নানাকার্য্যে অপব্যয়ের পরিমাণ কমিয়া যাইতেছে।

এই সকল আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে বরপণ দ্বারা দেশের কল্যাণ বই অকল্যাণ সাধিত হয় নাই। ইউরোপ হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া যে সকল যুবক দেশে ফিরিয়া আসিতেছেন তাঁহারা বিবাহে অধিক পণ চাহিয়া থাকেন বলিয়া তাঁহাদের বড় নিন্দা শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাতে নিন্দার বিষয় কিছুই নাই। তাঁহারা নারীজাতিকে সমুচিত সম্মান করিতে শিখিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের শিক্ষিত জীবনের জন্য অধিক টাকার প্রয়োজন।

অন্য পক্ষে যে বালিকা যত সুশিক্ষিতা, যত সুন্দরী এবং যত গুণবতী সে তত সুখস্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার অধিকারিণী। সুতরাং তাহার বিবাহেই অন্যের অপেক্ষা অধিক বরপণের প্রয়োজন।

বাধ্য করিয়া টাকা লওয়া, বলপূর্ব্বক টাকা লওয়া, প্রভৃতি কথা কখনই বরপণের প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না। দেবদত্ত যদি যজ্ঞদত্তকে এমন কথা বলিতে পারিতেন যে "তোমার কন্যার সহিত আমার বিবাহ দিতেই হইবে এবং সেজন্য তুমি আমাকে দশ হাজার টাকা দিতে বাধ্য" তাহা হইলে এই সকল শব্দের সার্থকতা থাকিত। কিন্তু কোন ব্যক্তিই অপরকে এরূপে বাধ্য করিতে পারেন না। সুতরাং এই সকল গালাগালির ভিত্তি নাই।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে "যদি কন্যার সহিত কতকগুলা টাকাই দিতে হইল তাহা হইলে নারীজাতির সম্মান রহিল কোথায়? যে বস্তুর কোন আদর বা মূল্য নাই তাহাই চালাইতে হইলে ভাল বস্তুর সহিত গোঁজামিলন দিয়া চালাইতে হয়। সমাজ যদি নারীকে সম্মান করিত তাহা হইলে বরপক্ষ ধন্যবাদ সহকারে কন্যামাত্র দান গ্রহণ করিত—তাহার সঙ্গে টাকা চাহিত না। কন্যার মূল্য নাই বলিয়াই টাকা চাহে।" ইহা ভাবুকতার ভাষা এবং ইহার উত্তরও সেই ভাষায় দেওয়া যাইতে পারে। একখণ্ড হীরক যদি দান করিতে হয়, তাহা অকর্ত্তিত, অসজ্জিতভাবে দিলে, দাতা গৃহীতা ও দর্শক কাহারও ভাল লাগে না। হীরকখণ্ডকে মাজিয়া ঘসিয়া স্বর্ণারূঢ় করাইয়া তাহার চতুর্দ্দিকে পদ্মরাগ ও অন্যান্য মণি সাজাইয়া দিলেই হীরক দান শোভা পায়। কন্যা হীরক সদৃশ।

কিন্তু ভাবুকতা ছাড়িয়া দিয়া এই বিষয়ের অন্য দিক্ দেখা যাউক। দেবদত্ত বিবাহ করা জীবনের কর্ত্তব্য মনে করেন না এবং স্বচ্ছন্দে থাকিতে চাহেন। কিন্তু কন্যার পিতা যজ্ঞদত্ত কন্যার বিবাহ দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য মনে করেন—কন্যা তাঁহার পক্ষে অতি কষ্টদায়ক গুরুভার বস্তু। তিনি যাহা কষ্টদায়ক গুরুভার মনে করেন তাহা স্বীয় স্কন্ধ হইতে নামাইয়া দেবদত্তের স্কন্ধে আরোপ করিতে চাহেন। এরূপ স্থলে যজ্ঞদত্ত টাকা দিতে বাধ্য কিনা তাহা সকলেই বলুন। রেলগাড়ী হইতে নামিয়া ঘোড়ার গাড়ী পর্য্যন্ত আধ মিনিটের পথও যজ্ঞদত্ত নিজের গাঁঠরিটা বহন করিতে পারে না বলিয়া তাহা বহন করাইবার জন্য দুই পয়সা দিয়া একজন মুটিয়া ভাড়া করেন অথচ সেই গাঁঠরি অপেক্ষা অনন্তগুণ অধিক ভারী বস্তু চিরকাল আর একজনকে দিয়া বিনামূল্যে বহাইবেন এরূপ ইচ্ছা করা কোন ক্রমেই সঙ্গত নহে।

একটা কথা এই যে, বরপণ প্রচলিত থাকিলে এই দরিদ্র দেশে কন্যার অভিভাবকের অতিশয় কষ্ট হয়। কিন্তু বিনা বরপণে বিবাহ করিলে এই দরিদ্র দেশের দারিদ্র্য আরও ঘোরতররূপে পরিবর্দ্ধিত হইবে। এতদ্ভিন্ন, সংসারে এমন কোন্ শুভ সংস্কার আছে যাহা সংসাধিত হইলে প্রথম কিছুদিন লোকবিশেষের বা শ্রেণীবিশেষের কষ্ট না হয়? জাতিভেদ ও

পৌত্তলিকতা নির্ম্মূলিত হইলে ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতদিগের কিছুদিন দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না।

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, কোন ব্যক্তি যদি কৃষ্ণাঙ্গী, কুরূপা, মুখরা অশিক্ষিতা বা বিকলাঙ্গী কন্যাকে বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক হন তাহা হইলে তাঁহাকে গালাগালি দেওয়া যেরূপ সঙ্গত, কেহ যৌতুকবিহীনা কন্যাকে বিবাহ করিতে অস্বীকার করিলে তাঁহাকে গালাগালি দেওয়াও সেইরূপ সঙ্গত অর্থাৎ সম্পূর্ণ অসঙ্গত ও অনুচিত। বস্তুতঃ ইয়োরোপ প্রভৃতি দেশে বিবাহে কন্যার সহিত অর্থযৌতুকদান একটি স্বতঃসিদ্ধ প্রথা, যে কন্যার অর্থ নাই বিবাহসুখ তাঁহার অদৃষ্টে সহজে ঘটে না। তবু ত সে দেশে বিবাহে পূর্ব্বানুরাগ প্রথা বিদ্যমান।

শ্রীবীরেশ্বর সেন।

উৎকণ্ঠিতা

মনে হয় শুনি চরণ শব্দ,
অই বুঝি শ্যাম আসে।
সে বর তনুর অগুরু গন্ধ
অতনু মলয়ে ভাসে।
ওলো দে তুলিয়া মাথার উপরে
সুনীল আঁচল মোর,
অলকে মালতী, বাহুতে কাঁকণ,
গলায় ফুলের ডোর।
কটিতে যূথিকা মেখলা পরা গো,
অপরাজিতার হার,
ব্যর্থ নহে এ সাধনা আমার
জানিয়াছি এইবার!

অই শোনা যায় মর মর গান
মাধব আসিছে জানি,
ওঠে শিহরিয়া, তুষ্টা কোমল
তরুণ উরষখানি,
চ্যুত শাখা হতে পীত উত্তরী
লুটায়ে পড়িছে ভূমে,
গুঞ্জরি কথা কহিছে মধুপ
পুষ্প অধর চুমে,
কুঞ্জ তোরণে বাঁধ, আজি তোরা
রাঙা অশোকের ফুল,
সারিকা আমার সাড়া পেয়ে তার
হরষে পুলকাকুল।

ওই দেখা যায় মূরতি তাহার
নয়নে পড়িছে ছায়া,
এ নহে সুদূর নীলিমার লেখা,
এ নহে স্বপন মায়া।
কায়া নিয়ে আজ এসেছে দয়িত,
এসেছে বড় সে কাছে,
অধর হইতে বাঁশরী নামায়ে
হাসিয়া চাহিয়া আছে;
কুঞ্জ দুয়ার খুলে দে খুলে দে
অঞ্জলি দেব পায়ে,
আলোকে নয়ন ভরিয়া দেখিব
যে ছিল পরাণ ছায়ে।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

চয়ন

কালিদাস

(সিল্‌ভ্যাঁ-লেভির ফরাসী হইতে)

ভারতীয় কাব্য-সাহিত্যে কালিদাসের নাম একাধিপত্য করিতেছে, উহার উজ্জ্বল প্রভায় ভারত-গগন উদ্ভাসিত। কি নাটক, কি মহাকাব্য, কি বিলাপ-গীতি,—সমস্তই সেই মহতী প্রতিভার সাক্ষ্য দিতেছে;—সেই প্রতিভার অন্তর্নিহিত শক্তিমত্তা ও নমনীয়তার সাক্ষ্য দিতেছে। সরস্বতীর সমস্ত শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে, একমাত্র কালিদাসের সৌভাগ্য যে তাঁহার লেখনী হইতে এমন-এক উৎকৃষ্ট রচনা প্রসূত হইয়াছে যাহাকে প্রকৃতপক্ষে "ক্লাসিক" বা আদর্শরচনা বলা যাইতে পারে,—যাহার জন্য ভারত শ্লাঘা করিতে পারে, এবং যাহার মধ্যে বিশ্বমানব আপনাকে চিনিতে পারে। উজ্জয়িনীতে "শকুন্তলা" ভূমিষ্ঠ হইলে সেই নবজাত শিশু যেরূপ হুলুধ্বনি সহকারে গৃহীত হইয়াছিল, তাহার পর, বহুশতাব্দী পরে যখন সার উইলিয়ম জোন্‌স্ উহাকে পাশ্চাত্যের গোচরে আনিলেন তখন আবার পৃথিবীর একসীমা হইতে সীমান্তরে ঐ আনন্দধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইল। যেখানে প্রত্যেক মহাত্মার নাম, মানব-বুদ্ধির একএকটা বিশেষ যুগ-অধিকার করিয়া আছে, সেই উজ্জ্বল নক্ষত্র মণ্ডলীর মধ্যে কালিদাস স্বকীয় স্থান চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছেন। এই নাম-মালা হইতেই ইতিহাস গঠিত হয়, অথবা ঐ নাম-মালাই ইতিহাস।

কিন্তু হিন্দুরা কালনিরূপণ সম্বন্ধে এরূপ উদাসীন যে উহারা কবিবরের আবির্ভাব-কালের সন-তারিখ লিখিয়া রাখে নাই। কিন্তু য়ুরোপীয় বিজ্ঞান, খুব ঠিক্ ঠাক্ বিবরণ লিখিবার জন্য লালায়িত,—তাই কতকগুলি বিক্ষিপ্ত, অস্পষ্ট ও সঙ্কীর্ণ তথ্যের সাহায্যেও এই সমস্যা সমাধান করিবার জন্য অনেক সময় য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা চেষ্টা পাইয়াছেন। হিন্দু লোকপ্রবাদ, কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন বিক্রমাদিত্যের যুগে কালিদাসকে স্থাপন করিয়াছে। যে রাজার স্মৃতি এখনও পর্য্যন্ত ভারতের লোক-প্রিয় কাহিনীসমূহের মধ্যে বিদ্যমান এবং যাঁহাতে ভারতের সমস্ত অতীত গৌরব মূর্ত্তিমান হইয়া রহিয়াছে, সেই প্রখ্যাত রাজা তাঁহার রাজসভায় নয় জন প্রসিদ্ধ সাহিত্যোপাসককে একত্র সম্মিলিত করিয়াছিলেন; ধন্বন্তরী, ক্ষপণক, অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, বরাহমিহির, বররুচি ও কালিদাস। উঁহারা বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। প্রথম প্রথম প্রাচ্যবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা বিক্রমাদিত্যের কালনিরূপণে কোন প্রকার সঙ্কোচ অনুভব করেন নাই। বিক্রমাদিত্যের নামে এখনও ভারতে একটি অব্দ প্রচলিত রহিয়াছে।

যেদিন ম্লেচ্ছেরা বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক ভারত হইতে বিদূরিত হয়, পণ্ডিতদিগের মতে, সেই দিন হইতে এই অব্দের গণনা আরম্ভ হইয়াছিল, —খৃষ্টাব্দ ৫৭। খৃষ্টাব্দের প্রথম শতাব্দীতে

বিক্রমাদিত্যকে ও সেই সঙ্গে কালিদাসকে স্থাপন করাই সহজ ও যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া পণ্ডিতদিগের মনে হইয়াছিল। কিন্তু উৎকীর্ণ লিপি, প্রচলিত মুদ্রা, ও সাহিত্যের অনুশীলন, ক্রমশ এই দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাসটিকে টলাইয়া দিল। উক্ত অব্দ যে বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব-কাল—কোন প্রকার প্রমাণ-লেখ্যে তাহার উল্লেখ নাই; প্রত্যুত, পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় তথ্য সকল যখন আরও সঠিকরূপে জানা গেল তখন ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, সেই সময়টা খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি কিংবা তাহার বহু পরবর্তী কোন সময়—যখন ভারত বিদেশীয় শাসনের অধীন ছিল, যখন ভারতের বহির্দ্দেশ হইতে কোন জাতি আসিয়া ভারতের উপর আধিপত্য স্থাপন করে। অতীব বিজ্ঞতা সহকারে Holzman পূর্ব্বেই এই কথা বলিয়াছিলেন যে, গ্রেগোরীয় পঞ্জিকার আরম্ভেই ত্রয়োদশ গ্রেগরীকে স্থাপন করা কিংবা জুলিয়েন যুগের আরম্ভে অর্থাৎ ৪৭১৩ খৃষ্টাব্দে জুলিয়াস সিজারকে স্থাপন করা যেরূপ অসঙ্গত—বিক্রমাব্দের প্রথম বৎসরেই বিক্রমাদিত্যকে স্থাপন করাও তেমনি অসঙ্গত ও হাস্যজনক। এই "বিক্রমাদিত্য" উপাধি (বিক্রমের আদিত্য) ভারতীয় রাজবংশাবলীর একটি সাধারণ উপাধি। কিন্তু উজ্জয়িনীর রাজাদিগের বংশাবলীর মধ্যে এই উপাধিটি এখনও পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

একটা কোন বিশেষ সময়-নির্দ্দেশের প্রয়োজন বশত, এবং প্রতিক্রিয়ার দিকে মানব-স্বভাবের প্রবণতা নিবন্ধন, প্রাচ্যতত্ত্ববিৎ অনেকগুলি পণ্ডিত, ভোজ-প্রবন্ধ নামক এক সাহিত্যিক আখ্যায়িকার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, সময়টা পিছাইয়া দিলেন, এবং ভোজের রাজত্বকাল একদাশ শতাব্দীতে কালিদাসকে আনিয়া ফেলিলেন। কিন্তু এই অসঙ্গত অনুমানটি বেশী দিন টিকিল না—স্বতই চূর্ণ হইয়া গেল।

তদনন্তর, অনুশীলন-প্রণালীর পরিবর্ত্তন হইল; যে সকল তথ্য কালনির্ণয়পক্ষে অনুকূল, কালিদাসের প্রামাণিক গ্রন্থসমূহ হইতে সেই সকল তথ্য সংগ্রহ করা হইতে লাগিল। গ্রীকদিগের হইতে গৃহীত জ্যোতিষিক তত্ত্ব ও সংজ্ঞাদি (ভারতে যাহার ইতিহাস অনুসরণ করা সম্ভব) কালিদাসকে চতুর্থ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে স্থাপনের প্রতিকূলে দাঁড় করান হইল। মেঘদূতে, নিকুল ও দিঙনাগ সম্বন্ধে যে সকল দ্ব্যর্থ উল্লেখ আছে (যদি ভাষ্যকার মল্লিনাথের ব্যাখ্যা অনুসরণ করিতে হয়) ঐ উল্লেখগুলি কবিবরকে ষষ্ঠ শতাব্দীতে লইয়া যায়। অন্যান্য নিদর্শনও সুস্পষ্টরূপে এই মতটির পোষকতা করে। ৫৫৬ শকের (খৃষ্টাব্দ ৬৩৭) একটি উৎকীর্ণ-লিপি, কালিদাসের ঐ সময়কার খ্যাতি সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেয়। গ্রন্থকার, গৌরবে কালিদাস ও ভবভূতির সমকক্ষ—এইরূপ স্পর্দ্ধা করিয়াছেন। বাণ যিনি কনৌজের হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকালে লেখনী ধারণ করেন,—অর্থাৎ যে সময়ে এই উৎকীর্ণ লিপি লিখিত হয় সেই সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে—সেই বাণ-কবি হর্ষ-চরিতের আরম্ভভাগে কালিদাসের প্রসাদগুণ ও কারুণ্যরসকে খুব বাড়াইয়া তুলিয়াছেন। সিংহলদ্বীপের কিংবদন্তী, যাহা নানা কারণে ইতিহাসের ন্যায় বিশ্বাসযোগ্য, সেই কিংবদন্তীতে, ৫২২ খৃষ্টাব্দে কুমারদাসের রাজত্ব

কালে, কালিদাসের সিংহলভ্রমণ ও মৃত্যুর বিবরণ পাওয়া যায়। সাহিত্যবন্ধু ও জানকীহরণ নামক এক মহাকাব্যের গ্রন্থকার ঐ কুমারদাস তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কালিদাসকে আগ্রহাতিশয়সহকারে নিমন্ত্রণ করেন। পক্ষান্তরে, ষষ্ঠ শতাব্দীর আরম্ভভাগে বিক্রমাদিত্যের যুগ—এইরূপ Fergusson যে অনুমান করিয়াছিলেন, সেই অনুমানের সহিত কালিদাস সম্বন্ধীয় উক্ত তথ্যগুলির বেশ একটু ঐক্য হয়। আরও এক কথা, জ্যোতিষী বরাহ-মিহির,—কিংবদন্তী যাঁহাকে কালিদাসের সহিত একত্র নবরত্নের মধ্যে স্থাপন করিয়াছে,—সেই বরাহমিহির যে ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ৫০৫ অব্দের পরে তিনি লেখনী ধারণ করেন এবং ৫৮৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। অতএব, প্রত্যক্ষ প্রমাণাদি না থাকিলেও ন্যায্য অনুমানযুক্তির বলে, সপ্ত শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে কালিদাসের সময় নির্দ্ধারণে আমাদের অধিকার আছে।

কালিদাস ঠিক্ যে সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহার স্মৃতিটুকু রক্ষা করা পণ্ডিতদিগের যদিও আবশ্যক বলিয়া মনে হয় নাই; কিন্তু তাঁহারা কালিদাসসম্বন্ধে কতকগুলি অকিঞ্চিৎকর অসার গল্প লিপিবদ্ধ করিতে ত্রুটি করেন নাই। ভোজ-প্রবন্ধে, কালিদাস একজন সৌখীন সূক্ষ্মরুচি লম্পট, সুনিপুণ সুরসিক প্রতিভাশালী পুরুষ—এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। তিব্বতীয় তারানাথ, তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে, (পৃ-৭৫) দাক্ষিণাত্যের মূল-উৎস হইতে বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া, কালিদাসের ইতিহাস লিখিয়াছেন। দক্ষিণভারতে,—মহিশূরে এখনও যে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, তাহার সহিত উক্ত বর্ণনার আশ্চর্য্য মিল দেখিতে পাওয়া যায়। রাওজি বসুদেব তাহার একটা সারসংগ্রহ দিয়াছেন (Indian Antiquity. VII. 115)—ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া কালিদাস ছয় মাস বয়ঃক্রমকালে পিতৃমাতৃহীন হইয়া পড়েন। একজন রাখাল তাহাকে প্রতিপালন করে। এইরূপে নীচ সংসর্গে বর্দ্ধিত হইয়াও, তাঁহার স্বাভাবিক বিশিষ্টতা অক্ষুণ্ণ ছিল, কিন্তু শিক্ষা তাঁহার একেবারেই হয় নাই।

এই সময়ে ভীমশুক্ল বারাণসীতে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার দুহিতা রাজকুমারী বসন্তী, শিল্পবিজ্ঞানে পারদর্শী কোন পুরুষকে পতিত্বে বরণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। অনেকেই তাঁহার হস্তপ্রার্থী ছিল, কিন্তু কেহই সফলমনোরথ হইল না। মন্ত্রি বররুচি, বিরক্ত হইয়া, প্রতিশোধ লইবার জন্য একটা মৎলব ঠাওরাইলেন। দেখিলেন কালিদাস রাস্তা দিয়া যাইতেছে; রাখালের বেশ, কিন্তু সুন্দর চেহারা। তাহাকে আনাইয়া ভট্টাচার্য্যের পরিচ্ছদ পরিধান করাইলেন, এবং শিষ্যরূপে অনেকগুলি পণ্ডিত তাঁহার সঙ্গে দিয়া, রাজকুমারীর সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। একেবারে নীরব থাকিতে পূর্ব্ব হইতেই মন্ত্রী তাহাকে শিখাইয়া রাখিয়াছিলেন; রাজকুমারীকেও বুঝাইয়া দিলেন, এইরূপ নীরবতা পাণ্ডিত্যাভিমানের নিদর্শন ব্যতীত আর কিছুই নহে। মন্ত্রীর এই চাতুর্য্যে প্রতারিত হইয়া রাজকুমারী বসন্তী ঐ রাখাল-যুবককে পতিত্বে বরণ করিলেন। কিন্তু বিবাহ-অনুষ্ঠানের পরেই, মন্দিরস্থ বৃষমূর্ত্তির সম্মুখে কালিদাসের রাখাল-স্বভাব প্রকাশ হইয়া পড়িল। বসন্তী ক্রোধান্ধ হইয়া কালিদাসকে শাস্তি দিতে

উদ্যত হইলেন। যুবক তাহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিল; রাজকুমারীর দয়া হইল। বিদ্যা-বুদ্ধি লাভের জন্য কালীকে পূজা করিতে তিনি যুবককে উপদেশ করিলেন। যুবক দেবীর নিকট বিদ্যাবুদ্ধির বিনিময়ে আপনার মস্তক দিতে চাহিল। কালী পরিতুষ্ট হইয়া যুবককে বিজ্ঞান ও কবিত্ব প্রদান করিলেন। তখন হইতে যুবক, "কালিদাস" এই উপাধি গ্রহণ করিল। পরে কালিদাস স্বীয় পত্নীকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিলেন; কেননা, তাঁহার পত্নী হইতেই এই সমস্ত কবিত্বসম্পদ তিনি লাভ করেন। এই গুরু সম্বোধনের ফলে, পতি-সহবাসে বঞ্চিত হইয়া রাজকুমারী নিতান্ত মর্ম্মাহত হইলেন, এবং এইরূপ অভিশাপ দিলেন, যেন কালিদাস একজন রমণীর হস্তে নিহত হয়। ফলেও তাহাই ঘটিল, কালিদাস তাঁহার এক উপপত্নীকর্ত্তৃক নিহত হইলেন:—রাজা ("তুলু"-গ্রন্থে "ভোজ" ও সিংহলী-কিংবদন্তীতে "কুমার দাস") শ্লোকের একটি অর্দ্ধ চরণ লিখিয়াছিলেন, দ্বিতীয় চরণটি যে পূরণ করিয়া দিতে পারিবে তাহাকে বহুমূল্য পুরস্কার দিবেন বলিয়া তিনি অঙ্গীকার করিলেন। কালিদাস তৎক্ষণাৎ শেষ চরণটি রচনা করিলেন; তাঁহার উপপত্নী এই রচনাটি অবগত হইয়া পুরস্কারের লোভে, কবিকে নিহত করিল।

এই প্রকার মৃত্যুসম্বন্ধে বিবিধ কিংবদন্তীর মধ্যে একটা মিল দেখিতে পাওয়া যায়। মহিশূরের পণ্ডিতেরা আরও এই কথা বলেন, ভবভূতি ও দণ্ডীর সমভিব্যাহারে, ত্রিচিনাপুলির নিকটস্থ শ্রীরঙ্গপুরীর বিষ্ণুমন্দিরে কালিদাস তীর্থ ভ্রমণে গমন করিয়াছিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মাতৃঋণ

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পরিবর্ত্তন

মা ফিরিয়া আসিবে, এ আশা জ্যাক সহজে ত্যাগ করিতে পারিল না। কত দিন সকালে, সন্ধ্যায় ও নিস্তব্ধ নিশীথে গ্রন্থের পৃষ্ঠায় অতিরিক্ত মনঃসংযোগ করিয়াও সহসা সে চমকিয়া উঠিত, ঐ বুঝি মা আসিয়াছে! ঐ না তাহার পায়ের মৃদু ধ্বনি, পোষাকের সতর্ক খস্‌খস্ শব্দ শুনা যাইতেছে! অধীর আগ্রহে সে প্রতীক্ষা করিত, কখন্ আসিয়া মা ডাকিবে, "জ্যাক!" কিন্তু কোথায় মা?

রুডিকদের গৃহ হইতে ফিরিবার সময় সে ভাবিত, আজ নিশ্চয় আপনার কক্ষে ফিরিয়া মার দেখা সে পাইবেই! রবিবার রাত্রে এতিয়োল হইতে ফিরিবার পথে তাহার চিত্ত অস্থির হইয়া উঠিত, গাড়ী যেন অত্যন্ত ধীরে চলিতেছে! কতক্ষণে বাটী পৌঁছিয়া সে মার মুখের কথা শুনিতে পাইবে! কিন্তু এ আশা নিত্যই তাহার ব্যর্থ হইত। মা আসিল না, আসিবার লক্ষণও কিছু দেখা গেল না।

মাকে সে পত্র লিখিয়াছিল, "তোমার এখানে থাকিতে কষ্ট হয় বলিয়া আমি নূতন বাড়ী ভাড়া লইয়াছি। বাড়ীখানি একেবারে সহরের প্রান্তে – পল্লীটিও বেশ শান্ত, নীরব।

ঘরগুলিও তোমার মনের মত সুন্দর ভাবে সাজাইয়া রাখিয়াছি। তোমার যখন ইচ্ছা হইবে, তখনই তুমি ফিরিয়া আসিয়ো।” কিন্তু এ পত্রের কোন উত্তর আসে নাই। শুধু উত্তর কেন, ইদা জ্যাককে একখানিও পত্র লিখে নাই। এ বিচ্ছেদ তবে চিরদিনের জন্যই! কি দারুণ নিষ্ঠুর এ বিচ্ছেদ!

জ্যাকের বেদনার সীমা ছিল না। মাতার হস্ত যে বেদনা দান করে, তাহা নিষ্ঠুর বিধাতার অবিচারের মতই আসিয়া বক্ষে বাজে—নিতান্তই তাহা অনৈসর্গিক বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সিসিলের যেন দৈব শক্তি ছিল! এ দারুণ বেদনা-উপশমের মন্ত্র যেন সে জানিত, তাহারই অমোঘ স্পর্শে সকল কষ্ট জ্যাক নিমেষে ভুলিয়া যাইত। তাহার মিষ্ট কথা হইতে কি আশ্বাস, দৃষ্টি হইতে কি অমৃত ক্ষরিত হইত, যাহাতে ভাগ্যদেবীর নিষ্ঠুর হস্ত-নিক্ষিপ্ত অনলবর্ষী শরগুলা নিতান্তই ব্যর্থ হইয়া ফিরিত! ইহার উপর আবার জ্যাকের ছিল, কাজ, অজস্র অবিরাম কাজ, যাহার কঠিন দণ্ডে ঠেকিয়া বিশ্বের সমস্ত কঠোর দুঃখ গভীর বেদনা ঠিকরিয়া চূর্ণ হইয়া যায়! এই কাজই দুর্ভাগা জ্যাককে দারুণ দুর্দ্দিনে আপনার বিরাট দেহাবরণের মধ্যে আশ্রয় দিয়া তাহার দুঃখ ভুলাইতে সক্ষম হইয়াছিল।

যতদিন মা নিকটে ছিল, সম্পূর্ণ অনিচ্ছা ও সতর্কতা সত্ত্বেও কত দিন সে জ্যাকের পাঠে অকারণ ব্যাঘাতের সৃষ্টি করিয়া তুলিত। তাহার অপূর্ব্ব খেয়াল, বিচিত্র সখ জ্যাকের গ্রন্থনিবিষ্ট চিত্তকে কত বার আসিয়া দোল দিয়া যাইত! বিঘ্ন নিবারণ করিতে গিয়াও কত দিন ইদা বিবিধ বিঘ্ন ঘটাইয়া তুলিয়াছে! এখন সেই মা কাছে নাই,—জ্যাক তাই গ্রন্থের দিকে আবার অতিরিক্ত মনঃসংযোগ করিয়া সমস্ত অতীত অবহেলা-ত্রুটি সারিয়া লইতে উদ্যোগী হইল। প্রতি রবিবার যখন সে এতিয়োলে আসিত, ডাক্তার রিভাল তাহার পাঠের পরীক্ষা গ্রহণ করিতেন। পরীক্ষা লইয়া তিনি সহজেই বুঝিতেন, জ্যাকের জ্ঞান বেশ পরিপক্কতা লাভ করিতেছে! আর একটি বৎসর মাত্র—তাহার পরই কলেজের গণ্ডী কাটাইয়া জ্যাক উপাধি লাভ করিতে সমর্থ হইবে, চিকিৎসার ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া দিবে—তাহার সকল দুঃখের শেষ হইবে।

উপাধি লাভের সম্ভাবনা! জ্যাকের প্রাণের ভিতর হইতে একটা অসহ্য উল্লাস যেন সাড়া দিয়া উঠিল! উপাধি! লোহার হাতুড়ি পিটিয়া নীচ জঘন্য কারিকরগুলার সাহচর্য্যেই যাহার জীবনের দিনগুলা কাটিয়া যাইতেছে, সেই জ্যাক ডাক্তার হইবে! সম্ভ্রান্ত সমাজে তাহার জন্য আবার আসন মিলিবে! আশ্চর্য্য বটে!

বাসায় ফিরিয়া বেলিসারের নিকট জ্যাক যখন ডাক্তার রিভালের আশার কথা খুলিয়া বলিল—বলিল যে আর এক বৎসর পরেই সে ডাক্তার হইবে, তখন সেই নিরীহ টুপিওয়ালার বুকখানা অপূর্ব্ব গর্ব্বে নাচিয়া উঠিল। জ্যাক ডাক্তার এবং বেলিসার তাহার বন্ধু!

গাড়ী চড়িয়া জ্যাক পাড়ায় পাড়ায় রোগী দেখিয়া বেড়াইবে—অসংখ্য আতুর নরনারী তাহাদিগের স্বাস্থ্য ও প্রাণের জন্য জ্যাকের করুণার ভিখারী হইয়া তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইবে—কি সুন্দর স্বর্গীয় সে দৃশ্য!

বেলিসার এক মুহূর্ত্তের জন্য কল্পনা-নেত্রে যেন ভবিষ্যতের সে সুমধুর চিত্রখানা দেখিতে পাইল! জ্যাকের প্রতি তাহার শ্রদ্ধাও সেদিন হইতে বহু পরিমাণে বাড়িয়া গেল।

ডাক্তার রিভাল ছাত্রের জ্ঞানবৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া আনন্দিত হইলেও তাহার শরীরের অবস্থা দেখিয়া কিন্তু শিহরিয়া উঠিলেন। কয়েক মাসের অতিরিক্ত পরিশ্রমে জ্যাকের দেহ যেন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। তাহার সেই পুরাতন কাশি আবার দেখা দিয়াছে, চোখে সে দীপ্তি নাই, চক্ষু কোটরে ঢুকিয়াছে, কণ্ঠের নিম্নের হাড় ঠেলিয়া উঠিয়াছে, মুখে যে একটু লাবণ্য মধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছিল, তাহা আবার কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে! সারা দেহ কেমন কাগজের মত সাদা হইয়া গিয়াছে।

ডাক্তারের মনে একটা চিন্তার রেখা পড়িল। জ্যাকের তপ্ত হস্ত আপনার হস্তে ধরিয়া তিনি কহিলেন, "এ তুমি ভাল কচ্ছ না, জ্যাক। শরীরটার দিকে আদবে মন দিচ্ছ না। খাটুনি খুব পড়েছে, তার উপর তোমার মনের অবস্থাও এখন ভাল নয়। পড়ার ঝোঁকটা কিছু কমাও—না হয় আর এক বছর বেশী সময় লাগবে, তাতে কি? শরীরটাকে আগে রাখা চাই ত। সিসিলও কিছু কোথাও পালিয়ে যাচ্ছে না।"

না। সিসিল যে পলাইবে না, এ কথা সত্য! জ্যাক তাহা ভাল করিয়াই জানে। বরং তাহার প্রতি সিসিলের মনোযোগ-যত্ন ইদানীং বাড়িয়াছে। ইহার পূর্ব্বে কখনও সিসিল জ্যাকের সম্মুখে স্নেহ, প্রেম, করুণা ও সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ হৃদয়-পাত্রটি এমন ভাবে কানায় কানায় ভরিয়া ধরে নাই! সে পাত্রের স্নিগ্ধ মধুর রস জ্যাক এখন প্রচুর পরিমাণেই আস্বাদ করিতে পায়! সে কখনও ধারণা করিতে পারে নাই—যে তাহার মত উপেক্ষিত দুর্ভাগার জন্য পৃথিবীতে এত সুখ সঞ্চিত থাকিতে পারে! সিসিলের এই অযাচিত করুণার অজস্র ধারায় স্নাত হইয়া সে যেন অপূর্ব্ব বলে বলীয়ান হইয়া উঠিল। কোন পরিশ্রমই তাহার নিকট অতিরিক্ত বা অসহ্য বলিয়া বোধ হইত না। অনর্গল খাটিয়াও এতটুকু ক্লান্তি সে কোনদিন অনুভব করে নাই। আরাম, নিদ্রা, এ সব কথা সে ভুলিয়াই গিয়াছিল। সারা দিন-রাত্রির মধ্যে সতেরো ঘণ্টা কাজ ও পড়াশুনা লইয়াই সে ব্যতিব্যস্ত থাকিত—তাহার জন্য এতটুকু অস্বাচ্ছন্দ্য নাই! এসিনডেকের সেই তপ্ত কারখানায় সারাদিন যে লোহার মুগুর তাহাকে পিটিতে হইত, তাহাও তাহার নিকট লেখনীর মত নিতান্তই লঘু বলিয়া মনে হইত।

মানুষের দেহে এত শক্তি থাকিতে পারে—জ্যাক তাহা জানিত না। বুদ্ধেরই মত সে যেন কঠোর সাধনায় রত ছিল। ইষ্টলাভের জন্য তেমনই অক্লান্ত তপ! দেহের কষ্ট? সে কথা ভাবিবার অবসরও জ্যাকের ছিল না। দীর্ণ গৃহের জীর্ণ দ্বার-জানালা—তাহার মধ্য দিয়া অজস্রধারে হিম আসিতেছে—সে হিমে আগুন জ্বালাইয়া লইবারও তাহার অবসর নাই—শুধু পড়া, পড়া, পড়া! তাহার পর দিনের আলো দীপ্তভাবে ফুটিয়া উঠিলে কোন মতে মুখের মধ্যে কিছু আহার গুঁজিয়া কারখানায় যাইতে হয়! সেখানে শুধুই কাজ, কাজ, কাজ—তাহার পর

ছুটি হইলে দ্রুত গৃহে ফিরিয়া আবার সেই বই লইয়া বসা। এতটুকু বিলাস নাই, আমোদ নাই—দুইটা খোসগল্প? না, তাহারও সময় নাই! কবে এই এক বৎসর পূর্ণ হইবে—উপাধি মিলিবে—তপস্যার বিরাট ফল করায়ত্ত হইবে! তখন আরাম, তখন বিলাস, তখন গল্প—সবই হইবে। কিন্তু এখন নয়। বাহিরে কখন শীতের শেষে বসন্ত আসিল—বসন্তকে ঠেলিয়া আবার গ্রীষ্ম দেখা দিল, এ সকলেরও সন্ধান রাখিবার জ্যাকের মুহূর্ত্ত অবকাশ ছিল না! এ যেন সেই প্রাচীন কালের আর্য্য ঋষির একনিষ্ঠ সাধনা! অমিত-তেজা বিশ্বামিত্রের বিরাট উগ্র তপস্যা!

এমনই ভাবে যখন জ্যাকের দিন কাটিতেছিল—রিভালের পুনঃ পুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও এ সনাতন নিয়মে এতটুকু ত্রুটি ঘটিল না, সহসা তখন একদিন কারখানা হইতে বাসায় ফিরিয়া সে রিভালের এক পত্র পাইল। তাহার বুকটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল। দারুণ উদ্বেগে সে পত্র খুলিল। তাহার মাথাটাও দপ্ দপ্ করিতেছিল। পত্রে শুধু একটিমাত্র ছত্র। লেখা আছে,—

"কাল এখানে আসিয়ো না। এক সপ্তাহ আমরা এখানে থাকিব না। রিভাল।"

সেদিন শনিবার। এতিয়েঁাতে যাইবে বলিয়া জ্যাকের সর্ব্বোৎকৃষ্ট জামাটি ইস্ত্রি করিয়া মাদাম বেলিসার সবেমাত্র তখন জ্যাকের কক্ষে প্রসন্ন মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আসিয়া জ্যাকের মুখের ভাব দেখিয়া তাহার সে প্রসন্ন ভাব অন্তর্হিত হইল। হাতের জামা হাতে রাখিয়া চমকিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল।

জ্যাকের বুকের মধ্যে দারুণ ঝড় উঠিয়াছিল। কেন এ পত্র? ডাক্তার কোথায় যাইতেছেন? সিসিল সব কথা খুলিয়া লিখিল না, কেন? সে কেমন আছে, তাই বা কে জানে! হঠাৎ এ সঙ্কল্প কেন? শুধু একটি মাত্র ছত্র! আর কিছু খুলিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই? কেন? কেন? সহস্র আকুল প্রশ্ন তাহার অন্তরের মধ্যে হু হু করিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল।

জ্যাক ভাবিল, কাল বোধ হয় সিসিলের পত্র আসিবে, তাহা হইতে সকল রহস্যই জানা যাইবে। কিন্তু পরদিন কোন পত্র আসিল না। সিসিল বা ডাক্তার, কাহারও নহে। সারা সপ্তাহ ধরিয়া জ্যাক পত্রের প্রতীক্ষায় অধীর ভাবে পথ চাহিয়া রহিল, তথাপি কোনও পত্র আসিল না। ভয়ে ও ভাবনায় তাহার চেতনা-লোপের উপক্রম হইল। কেন পত্র আসে না? কি হইয়াছে? কি? কি? মনকে বারবার প্রশ্ন করিয়াও জ্যাক এ সমস্যার এতটুকু মীমাংসা করিতে পারিল না। বেচারা, বেচারা জ্যাক! সহসা তাহার জীবন-আকাশে আবার যেন কালো মেঘের উদয় হইয়াছে, তাহার অন্তরালে বেচারার এত সাধের এত আশার সদ্যোত্থিত আলোক-রেখাটুকু বুঝি ঢাকিয়া যায়! এক করুণ আশঙ্কায় তাহার অন্তর মথিত করিয়া দারুণ হাহাকার উৎসারিত হইয়া উঠিল!

ডাক্তার রিভাল বা সিসিল সেদিন গৃহেই ছিলেন। হঠাৎ সম্প্রতি সিসিলের মুখ হইতে বজ্রের মত যে নিষ্ঠুর কথা বাহির হইয়াছে, তাহার আকস্মিক আঘাতে জ্যাক পাছে একান্ত অভিভূত হইয়া পড়ে, এই

ভয়েই ডাক্তার তাহাকে কিঞ্চিৎ অবসর দিবার কল্পনা করিয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনে এমন একটু আশাও ছিল যে, ইতিমধ্যে সিসিলের এ মত আবার পরিবর্ত্তিত হইতে পারে! এ যে একেবারে অপ্রত্যাশিত! ডাক্তারও ইহার জন্য এতটুকু প্রস্তুত ছিলেন না। ইহা কি সম্ভব হইতে পারে যে সিসিল জ্যাককে পরিত্যাগ করিবে—তাহাকে বিবাহ করিবে না—? বিশেষ জ্যাককে এত দিন ধরিয়া এতখানি আশা দিবার পরও?

সিসিলের মুখখানা সেদিন অত্যন্ত বিষণ্ণ দেখিয়া ডাক্তার কারণ-অনুসন্ধানে ব্যস্ত হইলে সিসিল কহিল, "জ্যাক রবিবার এখানে আসবে?" ডাক্তার কহিলেন, "তা ত আসবে —কিন্তু সে কথা হঠাৎ যে!" সিসিল কহিল, "কারণ আছে। আমার ইচ্ছা নয়, সে আর আসে!" ডাক্তার স্তম্ভিত হইলেন। এ কি আবার নূতন ভাব! অদ্ভুত খেয়াল! তাঁহার মুখে সহসা কোন কথা যোগাইল না। সিসিল আবার কহিল —তাহার স্বর কাঁপিতেছিল – সে কহিল, "এখানে যেন আর কখনও সে না আসে!"

ডাক্তার স্তম্ভিতভাবে কহিলেন, "কেন? কি হয়েছে, সিসিল?"

"না আমার ইচ্ছা নয়!"

"তোমার ইচ্ছা নয়? কেন, কি হয়েছে? ঝগড়া? অভিমান?"

"না দাদামশায়, ঝগড়া বা অভিমানের মত ছোট কথা নয়।"

"কি তবে কারণ? শুনি!"

"গুরুতর কারণ আছে, খুব গুরুতর কারণ! আমাদের এ বিয়ে হতেই পারে না—"

"কোন্ বিয়ে?"

"এই আমার সঙ্গে জ্যাকের বিয়ে।"

"সে কি!"

"হাঁ! এ বিয়ে হতেই পারে না, দাদামশায়। তা একেবারে অসম্ভব!"

"কেন?"

"আমার ভুল হয়েছিল—এ বিয়ে—আমি বুঝতে পারিনি আগে। আমি জ্যাককে ভাল বাসি না।"

"ভাল বাস না? সে কি কথা, সিসিল? বুঝেছি—দুজনে ঝগড়া হয়েছে,—নিশ্চয়! না? আমাকে খুলে বল্ দেখি, ভাই—বুড়ো হলেও তোদের এ ঝগড়াটুকু যে মিটিয়ে দেবার সামর্থ্য শুদ্ধ আমি হারিয়ে ফেলিছি, তা ভাবিসনে দিদি। লক্ষ্মীটি, কি হয়েছে, বল্। আমি আমি সব মিটমাট করে দিচ্ছি! দেখ্।"

"না দাদামশায়, এ তা নয়। সত্যি বলছি, আমি তামাসা করছি না। ছেলে-মানুষি ঝগড়া-ঝাঁটির কথা নয় এ। জ্যাককে আমি বোনের মত ভাল বাসি—অন্য ভাবে নয়! এখন তা বেশ বুঝতে পেরেছি। অবশ্য অন্য রকম বাসবার চেষ্টা কচ্ছিলাম, কিন্তু পারলাম না—আমি। জ্যাক আমার ভাই, আমি তার বোন। তাকে অন্য রকম ভাবা আমার পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়, দাদামশায়।"

সহসা পথে সর্প দেখিলে পথিক যেমন চমকিয়া উঠে, ডাক্তার সেইরূপ চমকিয়া উঠিলেন। কন্যা মাদেলিনের কথা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল—সিসিলের মার কথা! তিনি সিসিলকে কহিলেন, "এ সবের মানে কি? তুমি তবে আর কাউকে ভাল বেসেছ বুঝি?"

লজ্জায় সিসিলের মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল। ঘাড় না তুলিয়া কম্পিত অথচ দৃঢ়স্বরে সে কহিল, "না, না, তা নয়। আর কাউকে আমি ভাল বাসি না—বাসবও না কখনো! আমি বিয়ে করব না দাদামশায়, এই শুধু আমার এক কথা।"

ডাক্তার সিসিলকে বহু প্রশ্ন করিলেন —কিন্তু তাহার শুধু সেই এক উত্তর, "আমি বিয়ে করব না দাদামশায়, বিয়ে করবই না।" এবার স্বর যেমনই দৃঢ়, তেমনই স্থির, অকম্পিত!

তখন সিসিলের সম্মানের প্রতি ডাক্তার ইঙ্গিত করিলেন। পাড়ার লোকে কি বলিবে? এই নিরীহ শান্ত যুবকের সহিত তাহার বিবাহের সম্বন্ধ যে পাকা হইয়া গিয়াছে! এ কথা যে পাড়ায় কাহারও অবিদিত নাই! এখন সিসিলের এ আকস্মিক নূতন সঙ্কল্পে নিন্দুকের রসনায় লক্ষ কুৎসা যে নিমেষেই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে! বৃদ্ধ বয়সে তাঁহারও যে গ্লানির সীমা থাকিবে না! আর বেচারা জ্যাক! এ সংবাদ বজ্রের মত যে তাহার হৃদয়ে আঘাত করিবে। তাহার জীবন যে দগ্ধ ভস্ম হইয়া যাইবে—তাহার শেষ সম্বল, শেষ আশাটুকু এমন নিষ্ঠুর ভাবে সিসিল চূর্ণ করিয়া দিবে! কেন? কেন? কি তাহার দোষ?

সিসিলের অন্তরে কে যেন তীক্ষ্ণ ছুরির আঁচড় টানিতেছিল। মনের ভাব সে আর সামলাইতে পারিল না। তাহার দুই চক্ষে অশ্রু দেখা দিল। ডাক্তার তাহা লক্ষ্য করিয়া সিসিলের হাত আপনার হাতের মধ্যে চাপিয়া

"দাদামশায়—" সিসিল বৃদ্ধের বুকে মুখ ঢাকিল। সস্নেহে সিসিলের মুখ তুলিয়া রিভাল কহিলেন, "সিসিল দিদি, শোন—চট্ করে এমন একটা সঙ্কল্প করে ফেলো না। আরও কিছু দিন না হয় ভেবে দেখ—জ্যাককে না হয় আমি তা বলি। তার পর—"

"না দাদামশায়, তা অসম্ভব, একেবারেই অসম্ভব! আমি ভেবেছি, এ বিষয়ে অনেক ভেবে দেখেছি। এ কথা জ্যাককে এখনই জানানো উচিত, একটুও দেরী করা হবে না। আমি জানি, এ কথা শুনলে তার বুক ভেঙ্গে যাবে—তার—" সিসিলের স্বর বাধিয়া যাইতেছিল। নিশ্বাস ফেলিয়া সিসিল বলিল, "সে বড় কষ্ট পাবে—সত্যিই তার শেষ আশা নির্ম্মূল হয়ে যাবে, দাদামশায়, সে হয়ত সহ্য করতে না পেরে পাগল হয়ে যাবে, মরে যাবে।"—সিসিল ফোঁপাইতে লাগিল।

ডাক্তার আপনার বুকের মধ্যে আবার তাহার মুখ চাপিয়া ধরিলেন। তাঁহারও চক্ষে জল আসিয়াছিল। তিনি ডাকিলেন, "সিসিল—"

মুখ তুলিয়া সিসিল কহিল, "কিন্তু যতদিন সে এই আশা নিয়ে বসে থাকবে, ততই তার কষ্ট বাড়বে বই আর কিছু হবে না। আমারও ইচ্ছা নয়, সে মিথ্যা আশা নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। তাকে আমি মিথ্যা আশায় ভুলিয়ে রাখতে চাই নে, দাদামশায়, তাহলে তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে—"

ডাক্তার রিভালের রাগ হইল। তিনি রুষ্ট স্বরেই কহিলেন, "তবে কি এখনই তাকে

যে, জ্যাক, তুমি অন্যত্র যাও—সিসিল তোমাকে চায় না—কোনদিন চায়ও নি—তুমি ভুল বুঝেছিলে? বেশ—তাই হোক! কিন্তু উঃ, ভগবান, এরা কী—কি দিয়ে তুমি এদের গড়েছ—এই সব দুর্ব্বল স্বার্থপর স্ত্রীলোকের মন—”

সিসিল ডাক্তারের পানে চাহিল—কি করুণ বিষণ্ণ ম্লান, সে দৃষ্টি! তাহার চোখের পাতা ভিজিয়া রহিয়াছে! রিভাল তাহা লক্ষ্য করিলেন। অমনই তাঁহার সমস্ত রাগ নিমেষে অন্তর্হিত হইল। তিনি কহিলেন, “না দিদি, রাগ করিনে আমি! একবার শুধু অভিমান হয়েছিল, তোমার কোন দোষ নেই, আমারই দোষ! তুমি ছেলেমানুষ, কি জান? কিন্তু আমার উচিত ছিল—! ওঃ, নির্ব্বোধ, মূর্খ আমি—জীবনে কতবার এ রকম ভুল করব!”

কিন্তু জ্যাককে এ সংবাদ দিতেই হইবে ত! উপায় নাই! দুই তিনবার কাগজ ছিঁড়িয়া লিখিবার চেষ্টা করিয়া অবশেষে চতুর্থবারে ডাক্তার সংক্ষেপে শুধু লিখিলেন, “জ্যাক, যাদু আমার, সিসিল তার মত বদলাইয়াছে।” আর একটি কথাও লেখনীর মুখে বাহির হইল না। সিসিল তার মত বদলাইয়াছে! লিখিয়া তিনি ভাবিলেন, না, মুখেই তাহাকে সব কথা খুলিয়া বলা ভাল! লিখিয়া কাজ নাই! কাগজখানা আবার তিনি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। পরে আর একটু সময় লইবার আশায় এবং জ্যাককে এ নিদারুণ সংবাদ-গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করিবার অভিপ্রায়ে এক সপ্তাহ জ্যাকের এখানে আসা স্থগিত রাখাই তিনি সঙ্গত স্থির করিলেন। এই সাত দিনে সিসিল যদি ভাবিয়া আবার প্রকৃতিস্থ হইতে পারে! তাই তিনি জ্যাককে শুধু একটা রবিবার এখানে আসিতে নিষেধ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন।

এই সাতটা দিনের মধ্যে ডাক্তার ও সিসিলের মধ্যে এ প্রসঙ্গ একবারও উত্থাপিত হইল না। আবার শনিবার আসিল। ডাক্তার তখন সিসিলকে ডাকিয়া কহিলেন, “সিসিল—কাল ত রবিবার। জ্যাক এখানে আসবে। তোমার মত সম্বন্ধে তুমি আর ভেবে দেখেছ কি? মত বদলেছে?”

সিসিল দৃঢ় স্বরে কহিল, “না।”

“তোমার সঙ্কল্প তবে অটল, স্থির?”

“হাঁ।”

সেদিন এ বিষয় লইয়া উভয়ের মধ্যে আর কোন কথা হইল না। পরদিন রবিবার। জ্যাক তাহার চিরপ্রথামত প্রভাতেই রিভাল-গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেদিন সে সারা পথ দারুণ উদ্বেগ বক্ষে লইয়া অতিক্রম করিয়াছে! রিভাল-গৃহের দ্বারে পৌঁছিতেই তাহার বুকের স্পন্দন কেমন অস্বাভাবিক বাড়িয়া উঠিল। নিশ্বাসরোধ হইবার উপক্রম করিল। পা কাঁপিতে লাগিল।

দ্বার-সম্মুখে দাসীর সহিত জ্যাকের সাক্ষাৎ হইল। দাসী সংবাদ দিল, ডাক্তার জ্যাকের জন্য বাড়ীর পশ্চাতে বাগানে অপেক্ষা করিতেছেন। বাগানে? জ্যাক থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল। বাগানে কেন? বুঝি কি বিপদ ঘটিয়াছে! চারিধারের সে প্রফুল্ল

ভাবই বা কোথায় গেল? সে চিন্তিত হইল—কোনমতে আপনার কম্পিত দেহটাকে টানিয়া ডাক্তারের সম্মুখে সে উপস্থিত করিল। তাহাকে দেখিয়া ডাক্তার রিভাল বিচলিত হইলেন। চল্লিশ বৎসর রোগীর শয্যার পার্শ্বে বসিয়াও যে হৃদয় এতটুকু কাঁপে নাই—সে হৃদয় আজ কাঁপিয়া উঠিল। জ্যাক কহিল, "দাদামশায়, সিসিল কি এখানে নেই?"

"না ভাই—তাকে সেখানেই রেখে এসেছি, যেখানে গেছলাম।"

"কিছুদিন সেখানে থাকুক সে। কোথাও ত যায় না কখনও।"

"অনেক দিন কি সে সেখানে থাকবে?"

"হাঁ—আপাতত কিছুদিন এখন থাকবে, এমনই ত স্থির করেছি।"

"আমার কাছে আর আসবে না সে, দাদামশায়—কখনও আর আসবে না?"

ডাক্তার কোন উত্তর দিলেন না। তাঁহার স্বর ফুটল না। জ্যাক শরীরটাকে আর খাড়া রাখিতে পারিল না। মাথা ঝিম ঝিম করিয়া উঠিল। দেহে এতটুকু বল নাই। নিকটে একটা বেঞ্চ ছিল। সে তাহাতে থপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল।

শীতের কুয়াশার মধ্য দিয়া দিনের সূচনা তখন অপূর্ব্ব রাগে দেখা দিয়াছে! অদূরে সম্মুখস্থ জমিতে কলাইয়ের ক্ষেত, হরিদ্রাবর্ণের অজস্র ছোট ফুলে আলো হইয়া রহিয়াছে! বড় গাছের পাতার ফাঁকে কুয়াশার আড়ালে অগ্নিচক্রের মত লালসূর্য্য উঁকি দিতেছে! জ্যাক সকলই দেখিল। এক বৎসর পূর্ব্বকার কথা তাহার মনে পড়িল! সে ও সিসিল যখন পাহাড়ের ধারে নদীর তীরে বেড়াইতে যাইত, প্রকৃতি তখন কি অপূর্ব্ব শোভায় ঝলমল করিত! সেই অজস্র শোভা ও সৌন্দর্য্যের মধ্যে তাহার চিত্ত সিসিলের প্রতি কি অসহ্য ভাবে আকৃষ্ট হইল, তাহার পর সিসিলের সুমধুর আশ্বাসে সে আকর্ষণ আজ একান্তই নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে! দিনে দিনে সে আকর্ষণের বেগ কি গভীর বাড়িয়া উঠিতেছিল—কিন্তু সহসা এ কি—! কোন্ বিপরীত শক্তির সংঘর্ষে সে আকর্ষণ আজ চকিতে এমন ভাবে স্তম্ভিত রুদ্ধ হইয়া গেল!

ডাক্তার জ্যাকের স্কন্ধে হাত রাখিয়া কোমল স্বরে কহিলেন, "জ্যাক, হতাশ হয়ো না। এখনও তার মত বদলাতে পারে। ছেলেমানুষ—কি রকম একটা খেয়াল এ শুধু, না হয় কৌতুক!"

"না দাদামশায়, আপনি তাহলে সিসিলকে জানেন না। খেয়াল বা কৌতুক কাকে বলে, সিসিল তা জানেও না! শুধু খেয়ালের ঝোঁকে একটা বুক সে ভেঙ্গে চূরমার করে দেবে? না, না, তা হতেই পারে না। এ সঙ্কল্প জানাবার আগে এ বিষয়ে রীতিমত সে ভেবেছে, জানবেন। সে জানত, জানেও যে তার ভালবাসা,—আমার কাছে কি তার মূল্য! আমার জীবনের উপর কি তার শক্তি! সেই ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হলে, আমার জীবনটা যে একেবারেই চলে যাবে! তবু সে যদি তাই ঠিক করে থাকে, তাহলে সে কর্ত্তব্য ভেবেই তা করেছে। আমারও এটা আগে বোঝা উচিত ছিল। এত সুখের অধিকারী আমি হব—এ কি সম্ভব, দাদা

মশায় ? আপনি জানেন না, আমার নিজেরই সব সময় এটা ঠিক বিশ্বাস হত না ! এত সুখ আমার অদৃষ্টে সইবে কেন ? চিরকাল যার দুঃখে কষ্টে, দারুণ দুর্দ্দশায় দিন কেটেছে, এমন স্বর্গসুখ তার কপালে ঘটবে। পথের ভিখারী রাজসিংহাসনে বসবে ! তা কি হতে পারে, দাদামশায় ?”

জ্যাকের চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইবার উপক্রম করিল। সবলে তাহা রোধ করিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। ডাক্তার রিভাল তাহার দুই হাত আপনার হাতে চাপিয়া ধরিলেন, কহিলেন, “জ্যাক, আমায় ক্ষমা কর, তুমি। এ আঘাতের জন্য আমিই দায়ী ! কিন্তু আমি ভেবেছিলাম, তোমরা দুজনেই এতে সুখী হবে। ভুল, ভুল ভেবেছিলাম, আমি।”

“না দাদামশায়, আপনি তার জন্য দুঃখ করবেন না। যা অদৃষ্টে ছিল, তাই ঘটেছে। সিসিল—সে স্বর্গের দেবী—আমার ভালবাসা অত উর্দ্ধে তার কাছে পৌঁছুবে কেন ? আমার প্রতি তার অসাধারণ করুণা ছিল, তাই আমি ভুল করেছিলাম—ভুল বুঝেছিলাম। এখন আমি তার কাছ থেকে দূরে আছি—সিসিলও ভাল করে সমস্তটা বুঝে দেখবার অবকাশ পেয়েছিল—বুঝে সে দেখেছে, এ বিয়ে হতে পারে না। তার জন্য আপনি দুঃখ করবেন না, দাদামশায়। তবে হাঁ, একটা কথা—সিসিলকে বলবেন, যে এ আঘাত আমার বুকে যতই বাজুক, তার উপর আমার এতটুকু রাগ বা বিদ্বেষ নেই। চিরদিন আমি তার মঙ্গলই প্রার্থনা করব। সে আমার কাছে যেমন দেবী ছিল, আজীবন তেমনই দেবী থাকবে।”

পরে মাথার উপর আকাশ, পার্শ্বে ক্ষেত্র বন প্রভৃতির দিকে চাহিয়া জ্যাক আবার কহিল, “আর বছর ঠিক এমনই সময়ে আমি প্রথম সিসিলকে এক নূতন ভাবে ভালবাসতে আরম্ভ করে-ছিলাম—আমার মনে হয়েছিল, সিসিলও বুঝি আমাকে তেমনই ভালবাসে। তার পর থেকে
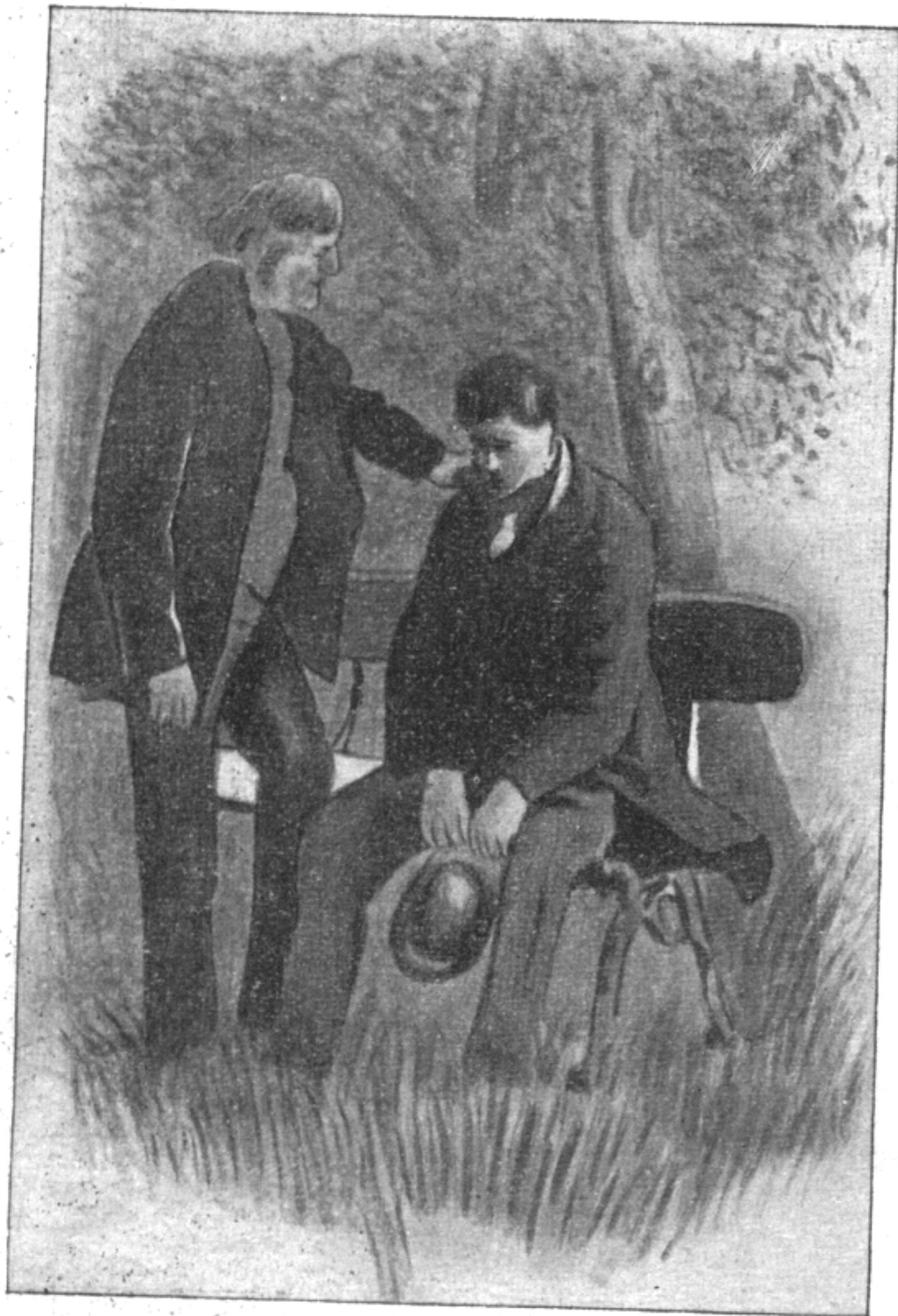
ডাক্তার কহিলেন, “জ্যাক, হতাশ হয়ো না।”

আমার এই বাকী দিনগুলা যে কি সুখে কেটেছে, তা আমিই জানি! তেমন সুখ পৃথিবীতে মিলতে পারে বলে আমার ধারণা ছিল না। সেদিন আমি যেন নূতন করে জন্ম নিলাম, আর আজ? আজ আমার মৃত্যু হল! এই এক বৎসর যে অতুল্য সুখ আমি পেয়েছি, তা শুধু আপনার আর সিসিলের দয়াতেই! জীবনে আমি এ দয়া কখনও ভুলব না!" ধীরে ধীরে জ্যাক রিভালের কম্পিত হস্তের বন্ধন খুলিয়া লইলে ডাক্তার কহিলেন, "তুমি চলে যাচ্ছ, জ্যাক? এখানে আমায় সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করবে না?"

"পারব না! আমায় ক্ষমা করবেন, দাদা-মশায়—আমার মনের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। আহারে মোটেই রুচি নেই! আমায় ক্ষমা করুন।"

জ্যাক চলিয়া গেল। কোন দিকে একবার সে ফিরিয়াও চাহিল না, নত দৃষ্টিতে চলিয়া গেল। যদি গাছের ফাঁক দিয়া ঘরের জানালার পানে সে একবার চাহিয়া দেখিত, তাহা হইলে সে দেখিত, সেই খোলা জানালার পার্শ্বে সিসিল দাঁড়াইয়াছিল। কি বিবর্ণ পাণ্ডু তাহার মুখ! চক্ষু অশ্রু-পরিপ্লুত। কম্পিত শীর্ণ দেহ! সিসিল জ্যাককে দেখিল—দেখিল, সে ধীর পদে নত দৃষ্টিতে চলিয়া যাইতেছে! যেন একটা প্রাণহীন দেহকে কোন্ অনৈসর্গিক শক্তি টানিয়া লইয়া চলিয়াছে।

পরের কয়টা দিন রিভাল-গৃহ যেন একটা নিরবচ্ছিন্ন শোকের রাগিণীতে পরিপূর্ণ রহিল। এমনই নিরানন্দ ভাবে দিন কাটিতে লাগিল। গত কয়েকমাস ধরিয়া যে আনন্দ-ধারা সারা গৃহে বহিয়া ছুটিত, সহসা যেন তাহার স্রোত রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সে ধারার শেষ স্রোতটির সহিত গৃহের প্রাণটুকুও যেন বিদায় লইয়া গিয়াছে!

রিভাল বিষণ্ণ চিত্তে সিসিলের ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করিতেন। এখন সে তাঁহার কাছে বড়-একটা আর আসে না, নির্জ্জনে থাকে, কখনও বা বাগানের প্রান্তে আপনার মনে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহার মাতার কক্ষ, এতদিন যাহা একরূপ বন্ধই ছিল, তাহা সে আবার খুলিয়াছে। সেই ঘরে অতীত দুঃখের যে সহস্র স্মৃতি নীরবে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, সিসিল আবার তাহাদিগকে জাগাইয়া তুলিয়াছে। যে জানালাটি খুলিয়া বাহিরে আকাশের পানে চাহিয়া মাদেলিন বসিয়া থাকিত—এবং তাহার অশ্রুরুদ্ধ নয়নের সম্মুখে চারিধার অস্পষ্ট ভাবে ক্রমশ মিলাইয়া যাইত, ঠিক সেই জানালাটির পাশেই সিসিল তেমনই ভাবে বসিয়া থাকে। রোগী দেখিয়া রিভাল গৃহে ফিরিলে দৈবাৎ যদি কোন দিন সাড়া পাইয়া সিসিল সে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসে ত দাদামহাশয়ের সহিত অত্যন্ত মৃদু কম্পিত স্বরে দুই চারিটা মাত্র কথা কহিয়াই সে ভোজের টেবিলে গিয়া বসে। যেদিন সাড়া না পায়, সেদিন তাহার হুঁসও থাকে না।

সিসিলকে খুঁজিয়া না পাইয়া ডাক্তার নীরব চরণে মাদেলিনের কক্ষের সম্মুখে আসিয়া ডাকিতেন, "সিসিল।" সিসিল ধড়মড়িয়া উঠিয়া পড়িত, নতমুখে দাদামহাশয়ের সম্মুখে আসিত! তাড়াতাড়িতে চোখের জল

মুছিবারও তাহার অবকাশ মিলিত না। তাহার সিক্ত পক্ষ্মই তাহাকে ডাক্তারের নিকট স্পষ্ট ধরাইয়া দিত। বৃদ্ধ রিভাল বলিবার মত একটি কথাও খুঁজিয়া পাইতেন না। কি বলিবেন? কিসের জন্য সান্ত্বনা দিবেন! কি জানি, যদি নাড়া পাইলে সিসিলের সারা চিত্ত সহসা আবার দারুণ শোকে ঝরিয়া পড়ে!

ডাক্তার অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। ব্যাপার কি? এ যে মাদেলিনের অবস্থার সহিত হুবহু সব মিলিয়া যাইতেছে। তেমনই বিশৃঙ্খলা! অশ্রুর নির্ঝর তেমনই উথলিয়া উঠিয়াছে! তবে কি সিসিলও বৃদ্ধকে ফাঁকি দিয়া পলাইবে? কেন? তাহার এ দুঃখ, কিসের জন্য? জ্যাককে যদি সে আর ভালই না বাসিবে, তবে কিসের এ বেদনা? নির্জ্জনে থাকিবার জন্য কেন এ প্রয়স? আর ভালই যদি বাসে, তবে কেন তাহাকে সে এ ভাবে বিদায় দিল? ডাক্তার ভাবিলেন, নিশ্চয় ইহার মধ্যে একটা গূঢ় রহস্য আছে! কিন্তু কি সে রহস্য—? কি সে? তাহা কি এমনই গোপনীয় যে দাদামহাশয়ের নিকট অসঙ্কোচে তাহা খুলিয়া বলা চলে না? কিন্তু সিসিলকে এ সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন করিতেও তাঁহার সাহস হইত না।

সিসিলের দুঃখে জ্যাকের কথা রিভাল একরূপ ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। রোগীর বাড়ী নাড়ী দেখিতে গিয়াও মাঝে মাঝে তাঁহার কেমন গোল বাধিত দুই-একটা ভুল হইয়া যাইত। তাঁহার সেই হাস্যময় প্রসন্ন ললাটে ইদানীং চিন্তার কাল রেখা পড়িয়াছিল! তবু এ রহস্য-মীমাংসার কোন সম্ভাবনাই দেখা যাইতেছিল না।

সহসা এক গভীর রাত্রে ডাক্তারের ঘণ্টায় সঘন রব উঠিল। কোন রোগীর গৃহে ডাক পড়িয়াছে! ডাক্তার উঠিয়া বাহিরে আসিলেন। বৃদ্ধা সেল-গৃহিণী ফটকের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল, ডাক্তারকে দেখিয়া সে কাঁদিয়া পড়িল, তাহার বৃদ্ধ স্বামীকে বুঝি আর বাঁচানো যায় না। মৃত্যুর সহিত কয়দিন ধরিয়া কঠিন সংগ্রাম চলিয়াছে—কিন্তু এবার বুঝি মৃত্যুরই জয় হইল। বৃদ্ধার অদৃষ্ট মন্দ, তাই সে গরিবের মা বাপ দয়াল রিভালের কাছে না আসিয়া অপরের উপর নির্ভর করিয়াছিল। এখন একবার তাঁহাকে যাইতেই হইবে, নহিলে বৃদ্ধা এখানে রিভালের পায় পড়িয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিবে।

বৃদ্ধের প্রাণ গলিয়া গেল। তিনি তখনই সেলগৃহিণীর সহিত বাহির হইয়া পড়িলেন। দারুণ শীতের রাত্রি—ঠাণ্ডা বাতাসের অত্যাচারের অভাব ছিল না—হাড় অবধি কন কন করিয়া উঠে, তবু আর্ত্তের আহ্বানে বৃদ্ধ অবিচলিত চিত্তে ছুটিয়া চলিলেন।

আরাম-কুঞ্জের পার্শ্বেই সেলের কুটির। সেখানে পৌছিয়া ডাক্তার দেখিলেন, শীতল ভূমির উপর ছিন্ন মলিন শয্যায় একখানা শীর্ণ কঙ্কাল পড়িয়া রহিয়াছে। ঘরে মৃদু আলো জ্বলিতেছিল—ঘরটাকে দারুণ শীতের হাত হইতে উদ্ধার করিবার ক্ষীণ চেষ্টায় এককোণে কয়েকখানা কাষ্ঠে আগুন জ্বালিয়া দেওয়া হইয়াছিল। তথাপি সে ক্ষুদ্র গৃহে মৃত্যুর হিমবায়ু হু-হু করিয়া বহিতেছিল। সহসা একটা উৎকট দুর্গন্ধ তাঁহার নাসারন্ধ্র জ্বালাইয়া দিল। ডাক্তার কহিলেন, "কিসের গন্ধ এ, মাদাম সেল?" একটা ঢোক গিলিয়া

সেল-গৃহিণী কহিল "ঐ ডাক্তার দিয়েছিল— কতকগুলো পাতা ঘরে জ্বালাবার জন্য—"

"ডাক্তার—? কোন্ ডাক্তার?"

"ঐ যে ও বাড়ীতে ছিলেন—হার্জ্ না কি নাম!"

রিভাল তাহাই অনুমান করিয়াছিলেন। হার্জ্‌কে সম্প্রতি পথে একদিন দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল বটে! সেই তবে এই নিরীহ বৃদ্ধ কৃষককে মৃত্যুর পথে নির্ভয়ে ঠেলিয়া আনিয়াছে! দুইবার পারির আদালতে জরিমানা দিয়াও তাহার এ দুষ্প্রবৃত্তি বাধা মানিল না। কর্বিলের কয়েকটি মূর্খ কৃষককে মৃত্যুর গ্রাসে ফেলিয়া একবার সে জেল খাটিয়াও আসিয়াছে, তবু নিবৃত্তি নাই? চৈতন্য ফিরিল না?

ডাক্তার বৃদ্ধ সেলের নিকট গিয়া ডাকিলেন, "সেল।"

"এই যে—এই যে আপনি এসেছেন। আমি আর বাঁচবো না—বেশী দেরী নেই—বেশ বুঝেছি, আমি। বুকের ভিতর জ্বলে জ্বলে যাচ্ছে। জিব খসে যাচ্ছে—"

রিভাল সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন, "ব্যস্ত হচ্ছ কেন? ভয় কি? কি কষ্ট হচ্ছে বল, আমি ব্যবস্থা কচ্ছি!"

"আর ব্যবস্থা! কিছু না—কিছু না! উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে। যেমন লোভ তেমনি শাস্তি!"

"কি হয়েছে-তোমার? এ রকম বকছ কেন?"

"কেন? কেন বকছি? শুনুন, শুনুন, আমার প্রায়শ্চিত্ত নেই। এমন দেবতার আমি সর্ব্বনাশ করেছি। কেন? কেন? শুধু দুটো টাকার লোভে" পরে পত্নীর দিকে চাহিয়া সেল কহিল, "বল্, বল্, সব কথা খুলে বল্ পাপ স্বীকার কর্—না হলে আমি মরেও নিশ্চিন্ত হব না। বল্, বল্ সব কথা খুলে বল্। কিছু লুকোস নে!"

তখন সেল-গৃহিণী চক্ষু মুদিয়া ক্রন্দন জড়িত স্বরে যাহা বলিল তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম,—বৃদ্ধ সেল বহুদিন হইতে রোগে শয্যাশ্রয়ী হইয়া পড়ায় সংসার অচল হইয়াছিল। এমন সময় দৈবাৎ একদিন ডাক্তার হার্জ্ এক প্রস্তাব লইয়া তাহাদিগের সম্মুখে আসিল। যদি একটা সংবাদ তাহারা ডাক্তার রিভালের নাতিনী সিসিলের কর্ণগোচর করিতে পারে, তাহা হইলে বৃদ্ধ সেলকে ত সে আরোগ্য করিয়া দিবেই, তাহার উপর বিশটি ফ্রাঙ্ক বখশিশ মিলিবে! এ প্রস্তাবে প্রথমে তাহারা সম্মত হয় নাই,—কিন্তু উদরে অন্ন নাই, দেহে বস্ত্র নাই,—রোগে, অনাহারে মতিরও তেমন স্থিরতা নাই—তদ্ভিন্ন দারিদ্র্যে পড়িলে বুদ্ধি একেবারেই লোপ পায়, কাজেই সে প্রস্তাবে সম্মত হওয়া ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। তাই তাহারা সিসিল ঠাকুরাণীকে সে নিষ্ঠুর সংবাদ দিয়া ফেলিয়াছে—কিন্তু সে অবধি মনে শান্তি নাই—রোগও রীতিমত বাড়িয়া উঠিয়াছে! বৃদ্ধ সদাশয় রিভালের উপর এ অত্যাচার ভগবান সহিবেন কেন? সে পাপের চূড়ান্ত শাস্তি ভোগ হইতেছে—তবু ডাক্তারকে ডাকিয়া এ পাপের কথা না শুনাইলে মরণেও জ্বালা জুড়াইবে না, তাই তাঁহাকে এ রাত্রে তাহারা কষ্ট দিয়াছে—সেলের চিকিৎসার জন্য নহে।

ডাক্তার স্তম্ভিত হইলেন। আগ্রহে কহিলেন, "কি? কি সে সংবাদ?"

"সেল-গৃহিণী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "সেই সর্ব্বনেশে কথা, সিসিল ঠাকুরুণের মা বাপের কথা !"

"পাষণ্ড সব—" দপ্ করিয়া রিভালের অন্তর দারুণ রোষে জ্বলিয়া উঠিল বৃদ্ধার শীর্ণ হাত দুইটা ধরিয়া প্রবল ভাবে তাহাকে নাড়া দিয়া কহিলেন, "এ কথা বলেছ তুমি ? তাকে বলেছ ? বল।" সে স্বরে যেন বিদ্যুৎ ঠিকরিয়া পড়িতেছিল।

"টাকার লোভে এ পাপ করেছি শুধু তুচ্ছ টাকার লোভে ইহকাল পরকাল হারিয়ে বসেছি। এ সব কথা আমরা কিছুই জানতাম না বাবা, সেই হতভাগা ডাক্তারই সব বলেছিল।"

"বুঝেছি সব।" বলিয়া ডাক্তার সেল-গৃহিণীর হাত ছাড়িয়া দিলেন। পরে অস্ফুট স্বরে কহিলেন, "এমনি করে সে শোধ নিলে ! কিন্তু এ সব কথা সে কার কাছ থেকে শুনলে! জানলে কোথা থেকে ?" রিভাল চিন্তা করিতে লাগিলেন। সারা রাত্রি বৃদ্ধ সেলের জন্য নানা ব্যবস্থা করিয়াও রিভাল সেলকে এ যাত্রা বাঁচাইতে পারিলেন না। ঊষার প্রাক্কালে বৃদ্ধ সেল যখন অনুতপ্ত হৃদয়ের সমস্ত বেদনা হইতে মুক্তিলাভ করিল, এবং বৃদ্ধা সেল শবের পার্শ্বে কাঁদিয়া লুটাইয়া পড়িল, ডাক্তার রিভাল তখন ধীরে ধীরে কুটির হইতে বিদায় লইলেন।

একটি রাত্রি তাঁহার দেহে ও মনে অদ্ভুত পরিবর্ত্তন আনিয়া দিয়াছিল! তাঁহার শুধু মনে হইতেছিল, এমন চক্রান্ত, এমন নিষ্ঠুর হীন ষড়যন্ত্রও মানুষের মাথায় উদয় হইতে পারে !

ডাক্তার গৃহে ফিরিলেন। পথে আরাম-কুঞ্জের দিকে একবার উঁকি দিতে ভুলিলেন না। তখনও তাঁহার সমস্ত শরীর জ্বলিতেছিল! ডাক্তার হার্জের সৌভাগ্য যে পূর্ব্বেই সে সরিয়া পড়িয়াছিল—নহিলে আজ বৃদ্ধের হস্তে পরিত্রাণ লাভের তাহার আর কোন সম্ভাবনাই ছিল না।

গৃহে ফিরিয়া তিনি প্রথমেই সিসিলের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সেখানে কেহ নাই! রাত্রে কেহ শয্যায় শয়ন করিয়াছিল বলিয়াও মনে হইল না। তিনি ডাকিলেন, সিসিল—" কেহ সাড়া দিল না। তাঁহার সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল। তিনি ডাক্তারখানায় গেলেন। কৈ সেখানেও ত সিসিল নাই! তবে কোথায় সে? কোথায়? ডাক্তার মাদ্‌লিনের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। অতীত শোকের স্মৃতি যেখানে জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে, সেই বিরাট সমাধির মধ্যে,—ঐ যে সিসিল। কৌচের উপর মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে! চোখের কোণে জলের দাগ শুকাইয়া গিয়াছে। তাহারই কালো ছাপ তখনও লাগিয়া রহিয়াছে, ডাক্তার ধীরে ধীরে সিসিলের মাথায় হাত রাখিলেন। সিসিল চমকিয়া জাগিয়া উঠিল, 'দাদামশায়—"

"বুঝেছি সিসিল—এই সব লক্ষ্মীছাড়া হতভাগার দল, এরাই তোমায় সব কথা বলে গেল, যে কথা এমন সতর্ক ভাবে আমরা তোমার কাছ থেকে গোপন করে রেখেছিলাম। ভগবান—এত চেষ্টা, সে মিথ্যা হল! এ বাজ সিসিলের বুকে পড়লই! সে বাজ আবার এই সব নারকীর হাত থেকে এল!"

সিসিল বৃদ্ধ মাতামহের বুকে আপনার মুখ লুকাইল। বলিল, "না দাদামশায়, বলো না, আমাকে কিছু বলো না। আমার নিজের মনে কি লজ্জা, কি ধিক্কার জমে রয়েছে!"

"তবু আমায় বলতেই হবে, সিসিল। আমি যদি আগে একটুও অনুমান করতে পারতাম—কেন তুমি জ্যাককে বিদায় দিলে! এই জন্যই শুধু—না?"

"হঁা।"

"কেন তবু শুনি। আমায় বল, দিদি।"

"মার এ কলঙ্কের কথা আমার মুখ থেকে বেরুবে না, কখনও না। তবু, যে আমায় বিয়ে করবে, আমি যার স্ত্রী হব, সে এ ঘটনার কিছুই জানে না। তাকে এত বড় কথা প্রকাশ করে না বলাও আমার অন্যায়—শুধু অন্যায় নয়, পাপ! কাজেই এক উপায় ছিল—সেই উপায় আমি স্থির করেছিলাম—"

"তবে এখনও তুমি তাকে ভালবাস? বল সিসিল।"

"বাসি, বাসি দাদামশায়—সারা প্রাণ দিয়ে ভালবাসি। জ্যাকও আমায় তেমনই ভালবাসে—এ বিয়ে যদি না হয় তবু সে আমায় ভুলবে না, কখনও দাদামশায়, আমিও ভুলতে পারব না! কখনও না। তবু এ ত্যাগ আমায় স্বীকার করতে হবেই। নামহীনা এক কলঙ্কিনীর মেয়েকে সাধ করে কে কবে ঘরের গৃহিণী করে, দাদামশায়?"

"তুমি ভুল করেছ, সিসিল, মস্ত ভুল করেছ। তোমায় বিয়ে করতে জ্যাকের কতখানি সাধ! এ বিয়েতে সে শুধু যে সুখী হত তা নয় গর্ব্বও বোধ করত—তবু সে এ সব কথা জানত। আমিও তাকে সব কথা খুলে বলেছিলাম।"

"তা কি সম্ভব, দাদামশায়?"

"সিসিল আমায় যদি তুমি সব কথা খুলে বলতে, তা হলে আজ তিনজনকে এ কষ্ট ভোগ করতে হত না।"

"জ্যাক জানে দাদামশায় যে, আমি কে,—আমার পরিচয়—"

"জানে। আমিই তাকে বলেছিলাম—সে আজ এক বৎসরের কথা। যেদিন প্রথম সে এসে আমাকে বলে যে, সে তোমাকে ভালবাসে, সেইদিনই আমি তার কাছে তোমার পরিচয় খুলে বলেছিলাম।"

"তবু সে আমায় বিয়ে করতে রাজি হয়েছিল?"

"সে যে তোমাকে বড্ড ভালবাসে, সিসিল। তা ছাড়া তারও অদৃষ্ট তোমার মত। তারও বাপ নাই, পরিচয় নাই। যখন তার জন্ম হয়, তখন ইদার এ বিয়েও হয় নি! তবে তফাৎ এই, যে তোমার মা ছিলেন দেবী, আর তার মা—"

ডাক্তার রিভাল তখন সিসিলের নিকট জ্যাকের ইতিহাস খুলিয়া বলিলেন। এই শান্ত নিরীহ বালকের জীবনের উপর দিয়া কি ঝড় বহিয়া গিয়াছে, কি গভীর দুঃখে কষ্টে সে আপনাকে গড়িয়া তুলিয়াছে,—শৈশবে দারুণ উপেক্ষা, যৌবনে নিষ্ঠুর নির্ব্বাসনের মধ্য দিয়া তাহার দিন কাটিয়াছে—সে সমস্ত কথা রিভাল সিসিলের নিকট খুলিয়া বলিলেন। বলিতে বলিতে অতীত-বর্ত্তমানে মিলিয়া কাহিনী পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সব কথা ডাক্তারের নূতন করিয়া যেন

মনে পড়িয়া গেল। তিনি বলিলেন, "এখন বুঝেছি, সিসিল, এ কথা কোথা থেকে প্রকাশ হল। এ তার কাজ, জ্যাকের মার—তাতে আর কোন সন্দেহ নাই। এই প্রগল্‌ভা নারীর রসনাই তোমাদের মধ্যে এ বিচ্ছেদ এনে দিয়েছে। যে কথা তোমাকে কখনো খুলে বলব না স্থির করে-ছিলাম, সে কথা তারই মুখ থেকে বেরিয়েছে! বেচারা, বেচারা জ্যাক! তার মা তাকে জীবনে কোন দিন সুখী হতে দিলে না দেখছি—চিরদিম তার সুখে ব্যাঘাত দিয়ে আসছে।"

সিসিলের প্রাণ অস্থির হইল। দারুণ নৈরাশ্যে সে সমস্ত ভবিষ্যৎ দারুণ অন্ধকারে আচ্ছন্ন দেখিল। কি করিলে এ আঁধার কাটে? সব যেমন ছিল, আবার তেমনই হয়? জ্যাক! বেচারা জ্যাক আমার! একবার তুমি ফিরিয়া এস। সিসিল তোমার পায় ধরিয়া ক্ষমা চাহিবে! তুমি ছাড়া সিসিলের আর কে আছে, জ্যাক! কেহ না,—আর কাহাকেও সে চাহে না! তুমি এস, এস জ্যাক—সিসিল তোমার দাসী, তাহাকে তোমার চরণ-প্রান্তে আশ্রয় দাও! সিসিল কাঁদিয়া ফেলিল।

রিভাল কহিলেন, "বেচারা জ্যাক তোমার কথায় বড় কষ্ট পেয়েছে—"

"সে আর কোন চিঠি লেখে নি দাদামশায়?"

"না। কিন্তু তোমার সঙ্গে সে কি মোটে দেখা করে নি সিসিল?"

"বোধ হয়, না। আর কখনও সে এখানে আসবে না, বোধ হয়, দাদামশায়।"

"তবে বল, সিসিল, আমরাই তার কাছে যাই। সে বেশ হবে। আজ রবিবার, তার ছুটি আছে—বাসাতেই তাকে পাব, নিশ্চয়। দুজনে গিয়ে তাকে সঙ্গে করে এখানে নিয়ে আসি, এস। যাবে দিদি?"

"যাব—এখনই চল, দাদামশায়।"

সিসিলকে লইয়া রিভাল অবিলম্বে পারি যাত্রা করিলেন।

ইহার ঠিক আধ ঘণ্টা পরেই একটি লোক আসিয়া রিভাল-গৃহের সম্মুখে দাঁড়াইল। তাহার কপাল দিয়া ঘাম ঝরিতেছে, সারা দেহও ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে—পৃষ্ঠে টুপীর প্রকাণ্ড বোঝা। টুপীর বোঝা নামাইয়া দ্বারের সম্মুখে আসিয়া চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া পিতলের পাতে খোদা লেখাটুকু সে অতি কষ্টে বানান করিয়া পড়িল,—"ডা—ক্তা—রের—ঘ—ণ্টা।"

"এই যে" বলিয়া সে দাঁড়াইয়া ললাটের ঘর্ম্ম মুছিল। পরে ঘণ্টায় ঘা দিল। একজন দাসী আসিয়া দ্বার খুলিয়া প্রশ্ন করিল, "কি চাই?"

"ডাক্তারকে—"

"তিনি বাড়ী নেই।"

"তাঁর একটি নাতনিও এখানে থাকেন, না?"

"তিনিও নেই।"

"কখন ফিরবেন?"

"জানি না।"

ভিতর হইতে দ্বার সশব্দে রুদ্ধ হইয়া গেল। লোকটি ফটকের সম্মুখে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। ভাবিল, এখন তবে উপায় কি? তাহার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইল।

চোখের জল মুছিয়া অস্ফুটস্বরে সে কহিল, "ভগবান! ভগবান! এমনি করেই কি সে বেচারা তবে বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে!"

একটা কাতর দীর্ঘনিশ্বাস তাহার মর্ম্ম ভেদ করিয়া উত্থিত হইয়া ধীরে ধীরে শান্ত বাতাসে মিলাইয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

রণে রমণী

ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল ক্রিমিয়ান্ যুদ্ধে রমণী-গণকর্ত্তৃক—সমরে আহত সৈন্যদিগের শুশ্রূষার প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। ইহার পর হইতে এই আদর্শে প্রত্যেক সভ্য দেশের রমণীগণ শুশ্রূষাকারিণীরূপে সৈনিকদিগের ন্যায় অদম্য উৎসাহ ও অপরিসীম সাহসের সহিত বিপৎ-সঙ্কুল যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া শত শত আহত ব্যক্তির জীবন দান করিতেছেন। সমরক্ষেত্রে ইহাদিগের এইরূপ সমাগম না হইলে নিশ্চয়ই যুদ্ধাহত ব্যক্তিগণের মৃত্যুসংখ্যার হার অনেকাংশে বর্দ্ধিত হইত। কিন্তু বল্কান্ যুদ্ধে তত্রত্য রমণীগণ রণক্ষেত্রে কেবলমাত্র শুশ্রূষা-কারিণী নহেন—রীতিমত যোদ্ধা!

সার্ভিয়া, মন্টেনেগ্রো ও বুল্‌গেরিয়ার অধিবাসিনীগণের স্বদেশপ্রেমের কিছু বিশেষত্ব আছে। ইহাদের মধ্যে অনেকেই বন্দুক ব্যবহারে অসাধারণ পারদর্শী। যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া ইহারা নানা বিষয়ে সৈন্যদের সাহায্য করিতেছেন। এই সকল বল্কান্-বাসিনী রণরঙ্গিনীদিগের যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ দেখিয়া সমরনিপুণ অনেক বীরবালার অতীত কাহিনী স্মৃতিপথে স্বতঃই উদয় হয়।

অধিক দিন নহে, মাত্র চারি বৎসর পূর্ব্বে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ২৯শে নভেম্বর পারস্য দেশের টেব্রিজ্ নগরের সন্নিকটে যে যুদ্ধ হয় সেই যুদ্ধে অসংখ্য পারস্যরমণী, পুরুষের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে মৃত্যুসংখ্যা দুই সহস্র,—তন্মধ্যে সাতষট্টিটী রমণী।

১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ফরাসী বিদ্রোহকালে বেষ্টাইল্ (Bastille) যুদ্ধের পরে তথায় য়্যামোজন্ (Amozon) নামে খ্যাত এক দল নারী সৈন্য গঠিত হয়। এই সমরনিপুণ বীরবালাগণ সাধারণ সৈনিকের ন্যায় যুদ্ধ করিতেন ও শত্রুকে দূরে রাখিবার এবং বাধা দিবার নিমিত্ত বৃহৎ বৃহৎ খাল কাটিয়া রাখিতেন। ইহারা সিটোইনি থারোইনি (Citoyenne Theroyne) নামা এক নারীকে সেনাপতি পদে বরণ করেন।

দাহোমি রাজ্যে একদল নারী সেনা ছিল,—এই দল সংখ্যায় পঞ্চদশ সহস্র। ফরাসী-গণ ইহাদিগকে তদ্দেশীয় পুরুষ সৈন্য অপেক্ষা অধিকতর সাহসী, সমরকুশল ও নিষ্ঠুর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই দল মাইনস্ নামে খ্যাত, এবং একজন সেনাপতি কর্ত্তৃক চালিত হইলেও "Elephants" ও "Alligators" নামক দুই দলে বিভক্ত ছিল।

এতদ্ব্যতীত যে সকল সমরনিপুণ রমণী

আত্মপরিচয় গোপন পূর্ব্বক সাধারণের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করতঃ পুরুষ-বেশে সজ্জিত হইয়া রণক্ষেত্রে অসীম সাহস প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপ অধিকতর বিস্ময়জনক।

এই শ্রেণীর রমণীগণের মধ্যে ইংলণ্ডের Dr. James Barryর নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ইনি ১৮১৩ সালের ৫ই জুলাই রাজসরকারের হাস্পাতালে সহকারী ডাক্তার রূপে প্রবেশ করেন। ক্রিমিয়ার ও ওয়াটারলুর যুদ্ধে অতীব প্রশংসার সহিত স্বীয় কার্য্য সম্পাদন করেন ও অবশেষে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে Inspector Generalএর পদ প্রাপ্ত হন।

হানা স্নেলের (Hannah Snell) বিষয় অনেকেই অবগত আছেন। ইনি জেনেরাল গাইজের (General Guise) কাভন্ট্রি রেজিমেণ্টে (Coventry Regiment) নিজেকে জেম্‌স্ গ্রে বলিয়া পরিচয় দেন। পরে ইনি নাবিক সেনাদলে প্রবেশ করিয়া মরিসস্ দ্বীপ আক্রমণ সময়ে যুদ্ধ করেন অবশেষে ভারতবর্ষে প্রেরিত হইয়া ১৭৮৯—৯০ খৃষ্টাব্দের অভিযানে গমন করেন ও পণ্ডিচারী অবরোধকালে সাঙ্ঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হন।

মেরী য্যানি জন্সন্ (Mary anne Jhonson) নিজেকে উইলিয়াম্ জন্সন্ বলিয়া অভিহিত করিয়া নেল্‌সনের অধীনে নাবিক সৈন্যরূপে কোপেন্‌হেগেনের যুদ্ধে যোগদান করেন। এই যুদ্ধে তিনি সাঙ্ঘাতিকরূপে আহত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি রমণী—ইহা তাঁহার আঘাত প্রাপ্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত গোপন রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ফিবি হেসেল্ (Phœbe Hessel) ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ষ্টিপ্‌নি নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি স্বেচ্ছাসৈনিকরূপে পদাতিক সেনাদলে প্রবেশ লাভ করিয়া ইউরোপের নানা স্থান পর্য্যটন করেন ও ডিউক্ অব কাম্বারল্যাণ্ডের অধীনে ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে ফঁতেনর (Foutenoy) যুদ্ধে আঘাত প্রাপ্ত হন। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে ১০৯ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়।

ডাব্‌লীন্‌বাসিনী মিসেস্ ওয়েলস্ (Mrs. Welsh) ক্রিষ্টফার ওয়েলস্ নামে নিজেকে অভিহিত করিয়া ১৬৮২—১৭০২, ও ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দের Flandersএর অভিযানে ডিউক্ অব মারল্‌বরোর (Duke of Marborough) অধিনায়কতায় যোগদান করেন। ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে র‍্যামিলিসের (Ramilles) যুদ্ধে সাঙ্ঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইলে সকলে ইঁহাকে রমণী বলিয়া জানিতে পারে।

গত বৎসর সেণ্ট্ নিকোলাস্ ডিউ পোর্টের (St. Nicholas Du' Port) হাস্পাতালে এক বৃদ্ধা মৃত্যুকালে ক্ষীণ্ হস্তে ধীরে ধীরে পার্শ্বস্থিত তরবারিখানি ধারণ করেন। ইনি ফ্রাঙ্কস্ টাইরিয়ার্‌সের (Franks Tireurs) বীর নারী—এ্যাণ্টোনিট্ লি (Antonette lia)। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে পোল্যাণ্ড্ বিদ্রোহে ইনি লেপ্টেনাণ্ট পদে নিয়োজিত হন। এই সময় ফরাসীদিগের সহিত জার্ম্মানদিগের যুদ্ধ বাধায় তিনি ফরাসী সেনাদলে যোগদান করেন। কিরূপে তিনি নিপুণ যোদ্ধার সুবর্ণ নিদর্শন লাভ করেন, কিরূপে তিনি শত্রু সমাচ্ছন্ন, বিপদ্‌সঙ্কুল স্থানে সর্ব্বদা সহাস্য ভাবে তাঁহার

সমভিব্যাহারীদিগের সহিত বিচরণ করিতেন, এবং কিরূপে তিনি শত্রুদিগের অগ্নিবৃষ্টির মধ্য হইতে, স্বীয় আহত সেনাপতির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সম্মান জ্ঞাপন পূর্ব্বক ও যদি কোনরূপে তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া থাকেন, তজ্জন্য বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করতঃ, তাঁহার (সেনাপতির) collar ধারণ করিয়া টানিয়া বাহিরে লইয়া আসেন—তাহা এখনও অনেক সেনাদলের ভিতর বিশ্রামকালে আলোচিত হইয়া থাকে।

য়্যানেট ড্রেডেন্ (Anette Dreden) একজন ব্যাভিরিয়ানকে গুলি করিয়া হত্যা করিবার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া বিচারে প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হন। ড্রেডেনের বক্ষে সমরকুশল সৈন্যাধ্যক্ষের সম্মানসূচক সুবর্ণনিদর্শন শোভা পাইতেছিল। ঐ ব্যাভিরিয়ান্ একজন রমণীর বক্ষে ঐরূপ নিদর্শন দেখিয়া উপহাস করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রিন্স্ চার্লস্ ফ্রেড্রিক্, ইঁহাকে ম্যাগ্নেটা যুদ্ধের বিজয়ী য়্যানেটী জানিতে পারিয়া দণ্ডাজ্ঞা রহিত করিয়া তাঁহার হস্তচুম্বন করেন।

জেনার (Jena) যুদ্ধক্ষেত্রে, মহাবীর, নেপোলিয়ন্ সমবেত যোদ্ধৃমণ্ডলীর ও সামরিক কর্ম্মচারীবর্গের সমক্ষে অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শনের নিমিত্ত স্বীয় বক্ষ হইতে ক্রশ্ উন্মোচন পূর্ব্বক সার্জ্জেণ্ট্ ডি জেমাপিস্ নামে খ্যাত—সেলিঙ্ক নামক এক যোদ্ধার বক্ষে পরাইয়া দেন। ইনি আর্কোলা ও অষ্টারলিজের যুদ্ধে অপূর্ব্ব বীরত্ব প্রদর্শন করেন। কিছুকাল পরে নেপোলিয়ন্ জানিতে পারেন যে এই বীর আগষ্টি সেলিঙ্ক (Auguste Schellinck) একজন রমণী।

ভার্জ্জিন্ ঘেস্কার (Virgenee Ghesquiere) তাঁহার ভ্রাতা অন্যত্র গমন করিলে যোদ্ধাবেশে সজ্জিত হইয়া সেই স্থান পূরণ করেন ও য়্যাল্জিরিয়ার অভিযানে যোগদান করিয়া নানাস্থানে যুদ্ধ করেন। ম্যাদাম্ মে ফ্র্যাঙ্কো প্রাসিয়ান্ যুদ্ধে যশস্বিনী হন। ম্যাদাম জ্যারিথট ফ্রাঙ্কো প্রুসিয়ান যুদ্ধের নাইটিঙ্গেল্। ইঁহারা—প্রত্যেকেই যুদ্ধক্ষেত্রে অতুল সাহসের জন্য সম্মান-নিদর্শন ক্রশ দ্বারা বিভূষিত হন।

আমেরিকার civil war রমণীগণেরবীরত্ব গাথায় পূর্ণ। এই সকল বীরবালা পতির সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিতেন ও নানা প্রকারে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতেন এবং আবশ্যক হইলে যথারীতি সৈনিকের কার্য্যও সম্পাদন করিতেন।

রুষজাপান যুদ্ধে রমণীগণ "Amazon of the Cossacks" দল গঠন করেন। ইতালীতে সিগ্নোরা মেরি গ্যারিবল্ডির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। ফ্রান্সের জোয়ান অব্আর্কের অপূর্ব্ব বীরত্ব কাহিনী জগতের ইতিহাসে জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণিত। আর বীরপ্রসবিনী ভারতভূমির,—রাণী দুর্গাবতী, চাঁদসুলতানা, ঝাঁসীর রাণী, লক্ষ্মী বাই—প্রভৃতি চিরস্মরণীয়।

শ্রীগৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

'লেকন্ত্ দে লিল্'এর কবিতা

পরীর মায়া

(ফরাসী হইতে)

ময়না-গাছের গোছা গোছা ফুল পরিয়া চুলে,
নিশাচরী যত পরী এ নিশীথে বেড়ায় বুলে।

বিজনের পথ—যা' শুধু বনের হরিণই জানে,—
এ রাতে সে পথে ঘোড়া কে ছুটায়? ভয় না মানে?
জুতায় সোনার আড়-কাঁটা আঁটা,—আঁধারে জ্বলে,
কাঁটার গুঁতায় কালো ঘোড়া তার ছুটিয়া চলে।
গহনে গহনে চলিতে যখনি জ্যোৎস্না মেলে,—
তাজের জলুস্ জ্বলে আব্লুস্ আঁধার ঠেলে।

ময়না ফুলের মোহনিয়া মালা জড়ায়ে মাথে
নিশাচরী যত পরী নাচে বনে বিজন রাতে।

দলে দলে তারা লঘু লীলাভরে নৃত্য করে,—
ঘুরিয়া ফিরিয়া মুরছিত মৃদু হাওয়ার 'পরে।
কহে পরীরাণী অশ্বারোহীরে "দুঃসাহসী!
কোথা যাও? পথ হারাতে কি চাও গহনে পশি'?
অপদেবতার পড়িলে নজরে যাবে যে মরি',
ফের! ফের! এস, এইখানে দোঁহে নৃত্য করি।"

ময়না ফুলের শোভন মালিকা পরিয়া চুলে
নিরালম্ব বনে আলয় রচিয়া পরীরা বুলে।

"না, না; পথ চেয়ে রয়েছে আমার একটি নারী;
কাল আমাদের বিবাহ;—আমি কি দাঁড়াতে পারি?
পথ ছাড়, ওগো! যেতে দাও মোরে রূপসী পরী!
মিমেষের তরে নাচের আওড় বন্ধ করি'।
আর দেরী ক'রে দিয়োনা গো, যাব প্রিয়ার পাশে,
হের দেখ এরি মধ্যে দিবার বিভা আকাশে।"

ময়না ফুলের আকুল মালিকা দোলায়ে চুলে
নিশুতি নিরালা নীরব নিশীথে পরীরা বুলে।

"হোক্—মাথা খাও,—দাঁড়াও ক্ষণেক, অশ্বারোহী!
তোমারি লাগিয়া পরশ পাথর এনেছি বহি';
পেতে দিব এই জ্যোৎস্না-আঁচল তোমার তরে,
সম্পদ আর সুখের যা' সেরা—সঁপিব করে।"
"উঁহুঁ" "তবে মর" কহি নিশাচরী হিম আঙলে
ছোঁয়াইল বীর অশ্বারোহীর হৃদয় মূলে।

ময়না ফুলের শিথিল মালিকা জড়ায়ে মাথে
নাচে নিশাচরী বিজনের পরী গহন রাতে।

জিন্-কসা কালো ঘোড়াটি মিলা'ল জিনের নীচে,
আড়-কাঁটা-আঁটা জুতার গুঁতা সে এখন মিছে;
কম্পিত দেহে অশ্বারোহী সে সহসা দেখে,—
পাংশু মুরতি মৃদু গতি কে গো?—আসিছে এ কে!
হাতে হাত নিতে দাঁড়াল সে পথে! "সরে যা, ওরে!
পরী! নিশাচরী! শয়তানী তুই—ছুঁস্‌নে মোরে।"

ময়না ফুলের অপরূপ মালা পরিয়া চুলে
ঘিরিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া পরীরা বুলে।

"ছুঁস্‌নে আমায়, পথ ছাড় পাপী—অপদেবতা,—
বধূ লয়ে আসি,—কালি যে আমার বিয়ের কথা।"
"হায় পতি!" কহে পাংশু মুরতি করুণ রবে
"এবারের মত শ্মশানই মোদের বাসর হবে;
আমি নাই আর।" শুনি' সমাচার অশ্বারোহী
ক্ষুব্ধ লালসে হতাশে পড়িল আঁকড়ি' মহী।

ময়না ফুলের লোভনীয় মালা জড়ায়ে মাথে
নিশাচরী যত পরী নাচে ম্লান জ্যোৎস্না রাতে।

সূর্য্যের মৃত্যু

শরতের সান্ধ্য হাওয়া, সাগরের কল্লোল সুদুর,—
অকারণে-সকরুণ বিদায়ের বিষাদের সুর
ভুবন ফেলিছে ছেয়ে; মসীচিহ্ন মৌন বেদনার
উঠিছে রক্তিম হ'য়ে রক্তরাগে অস্ত সবিতার।

শিথিল পল্লব রাশি আকাশের পটে মৃদু দোলে,—
সিন্দূর-সিন্ধুর মাঝে,—শান্তিহারা বাতাসের কোলে;
সন্ধ্যা আসে মন্দগতি,—সন্ধ্যা আসে তন্দ্রা লয়ে সাথে,
রিক্ত শাখে পাখী নীড় আসে ছেয়ে নীল ছায়াপাতে।

ডুবে যাও গ্রহরাজ! দিবসের হে দীপ্ত মশাল!
তোমার ক্ষতের রক্ত সে তোমার যশ-রশ্মি-জাল;
পরম পৌরুষ-বলে মর্ত্ত্য মোহ কর বিসর্জ্জন,
মরে যাও, মরে যাও; পাবে তুমি নূতন জীবন
কল্য প্রাতে; আছে আশা। কিন্তু যার হিয়া শত চূর,—
তারে কে ফিরায়ে দিবে প্রাণ, প্রেম, আশা, আলো, সুর?

বাঘের স্বপন

মেহগিনির ছায়ায় যেথা ফুলের মাছি জুটে,—
জড়ায় যেথা হাওয়ার ডানা লতার জটাজূটে,—
নাবাল্ ডালের নাম্‌না ধ'রে ঢুল্‌ছে কাকাতুয়া,—
হলুদ-পেটা বন্-মা'কোষার সূতায় ঝুলে শুঁয়া,—
ক্রুদ্ধ চোখে চায় গোরিলা,—হুকু যেথায় ডাকে,—
গরুর হন্তা ঘোড়ার শত্রু সেইখানেতেই থাকে।
বক্র মনে ক্লান্ত দেহে সেইখানে সে আসে,—
শ্যাওলা-ধরা শুক্‌নো মরা গাছের গুঁড়ির পাশে,—
চটা মনে চাট্‌তে লাঙল কাম্‌ড়ে ফেলে দাঁতে,
ঠোঁট কাঁপে তার অনেকক্ষণের অতৃপ্ত তৃষ্ণাতে।
তপ্ত হাওয়ায় তীব্র নিশাস!—শুঁঠের মত শিঠে,—
গিরগিটিটা শিউরে ওঠে চল্‌তে পাতার পিঠে।
গহন সে বন; যেখানটিতে দিনে দুইপ্রহরে
লতা পাতার নিবিড় ছাতা সূর্য্য আড়াল করে,—
লটপটিয়ে সেথায় বাঘা পড়ল নিয়ে মাটি;
জিব্ দিয়ে সাফ্ কর্‌লে বারেক সাম্‌নেরি থাবাটি;
তার পরে, হায়, তন্দ্রাভরে মিটির মিটির চোখ,—
সোনালি দুই চোখের তারায় লাগ্‌ল ঘুমের ঝোঁক।
চেষ্টা-হারা, চেতন-হারা; কেবল তন্দ্রাভরে
থেকে থেকে নড়ছে থাবা, লাঙুল কভু সরে।
স্বপন দেখে বনের পশু;—মনের খেলা চলে,—
কালো বরণ মেহগিনির গহন ছায়াতলে;
স্বপ্নে দেখে—নধর বলদ সবুজ মাঠে চরে,—
ঝাঁপিয়ে গিয়ে পড়ল বাঘা সেই বলদের 'পরে;
হক্‌চকিয়ে হাম্বা রবে বলদ শুধু ডাকে,
থাবার চড়ে রক্ত—বাঘার নখের ফাঁকে ফাঁকে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

পুষ্পের বর্ণ ও উহার উৎপত্তি-রহস্য

বিবিধবর্ণে রঞ্জিত কৃত্রিম চিত্র দর্শন করিয়া লোকে কতই না আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে! সূর্য্যাস্ত সময়ে যিনি আকাশ-পটে বিচিত্র বর্ণের লীলা একদিনের জন্যও অবলোকন করিয়াছেন তাঁহার নিকটে কিন্তু চিত্রকরের নকলচিত্র কতই হীন, কতই তুচ্ছ! বসন্তকালে যিনি পুষ্পোদ্যানে ভ্রমণ করিয়া বহুবিধ ঋতুপুষ্পের শোভা সন্দর্শন করিয়াছেন, তিনিই জানেন ফুলের কি মনোহারিণী শক্তি! আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই গোলাপের সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া থাকেন। যে অপূর্ব্ব রূপ দর্শনে কীটপতঙ্গাদিও বিমোহিত বিশ্বশিল্পী-বিরচিত সেই অতুলনীয় রূপের মোহিনী শক্তিতে মানুষ যে ভুলিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

প্রকৃতির কোন কার্য্যই ত নিরর্থক নহে। সুতরাং কোন্ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এবং কিরূপে পুষ্পের এই বিচিত্র বর্ণের উৎপত্তি হইয়া থাকে তাহা জানিবার জন্য বৈজ্ঞানিকের মনে স্বতঃই কৌতূহল জন্মে। সাধারণতঃ পুষ্পের ৪টি অঙ্গ থাকে—স্ত্রী বা গর্ভকেশর পুংকেশর, ফুল-দল ও কুণ্ড। পুং ও স্ত্রী কেশরই পুষ্পের প্রধান অঙ্গ। উহাদিগকে ঝড়, বৃষ্টি ও কীট-পতঙ্গাদির অত্যাচার হইতে রক্ষা করার প্রয়োজন। এই সুকুমার অঙ্গ দুইটিকে প্রথমে কোমল-দল (Corolla)

বা পাপ্‌ড়ী সমূহ ও পরে অপেক্ষাকৃত শক্ত কুণ্ড (Cayx) বা বৃতিসমষ্টি দ্বারা আবৃত রাখা হয়। সুতরাং পাপ্‌ড়ী ও বৃতি পুষ্পের প্রধান অঙ্গ দুইটীর আবরণমাত্র।

পুংকেশর ও স্ত্রীকেশর রক্ষা করা এক মাত্র উদ্দেশ্য হইলে পাপ্‌ড়ী এবং অনেক স্থলে বৃতিসমূহ বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত হয় কেন? পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বহুবিধ পরীক্ষা ও ভূয়োদর্শন দ্বারা এই প্রশ্নের মীমাংসা করিয়াছেন। তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে ফল উৎপাদনে সাহায্য করাই বর্ণের প্রধান অভিপ্রায়। স্ত্রী-পুরুষের মিলনে যেরূপ জীবের উৎপত্তি হয় উদ্ভিদ সমাজেও সেইরূপ হইয়া থাকে। পুংকেশরের মস্তকে যে থলি দেখা যায় তাহার মধ্যে ধূলিকণার ন্যায় অসংখ্য রেণুকণা বিদ্যমান থাকে। খেজুর বা অন্য কোন ফুলের একটি পরিপুষ্ট পুংকেশর স্পর্শ করিলে উহা বেশ দেখা যায়। স্ত্রীকেশরের (pistil) নিম্নস্থিত স্ফীতথলি বা গর্ভ (ovary) মধ্যে অপুষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ দেখা যায়। উহাদিগকে বীজাণু কহে। অতি সূক্ষ্ম হইলেও পুংকেশরের রেণুকণার মধ্যে ও স্ত্রীকেশরের বীজাণুর কোষ- cell) থলির অভ্যন্তরে পঙ্কবৎ একপ্রকার তরল পদার্থ থাকে। উহাকে কোষপঙ্ক(protoplasın বলা যাইতে পারে। রেণুকণার কোষপঙ্ক কোনও উপায়ে একটি বীজাণুর কোষপঙ্কের সহিত মিলিত হইতে পারিলে তবে বীজাণুটি ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া পরিপুষ্ট হয় ও বীজে পরিণত হইতে পারে। বীজাণু ও রেণুকণার এইরূপ মিলনকে সংক্ষেপে ফুলের নিষেক ক্রিয়া বলা হয়। আপন ভ্রাতা ভগিনীর মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন মনুষ্য সমাজে যেরূপ হেয় বলিয়া বিবেচিত, উদ্ভিদ সমাজেও সেইরূপ বংশলোপঙ্কর ঈদৃশ অস্বাভাবিক পরিণয়কে যথাসাধ্য পরিহার করিবার জন্য চেষ্টা হইয়া থাকে। একই পুষ্পের পুংকেশর সেই পুষ্পের স্ত্রীকেশরকে নিষিক্ত করে না; তবে নিরুপায় স্থলের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। এক ফুলের রেণু ঐ জাতীয় অপর ফুলের বীজাণুর সহিত মিলিত হইবার জন্য চেষ্টার ক্রটি না। কিন্তু গতিশক্তি বিহীন রেণুকণার পক্ষে স্বয়ং পুষ্পান্তরে গমন করা একান্ত অসম্ভব। সুতরাং রেণু কণা যাহাতে সহজে অথচ নিঃসন্দেহে অন্য পুষ্পের স্ত্রীকেশরের সহিত সংলগ্ন হইতে পারে এরূপ কোন উপায়ের বিশেষ প্রয়োজন। ধূলিকণা বায়ু-বেগে স্থানান্তরে নীত হইয়া থাকে। রেণুকণাও ঐ উপায়ে পুষ্পান্তরে গমন করে। কিন্তু ইহা প্রশস্ত উপায় নহে। কেন না বায়ু-চলিত রেণুকণা স্বজাতীয় পুষ্পের উপরে না পড়িয়া কর্দ্দম, জল, পত্র বা ঐরূপ অনুপযুক্ত স্থানে পড়িতে পারে। ভুট্টা, খেজুর, তাল প্রভৃতি উদ্ভিদের মধ্যে রেণুকণার এইরূপ অপব্যয় হয়। কোন কোন জলজ উদ্ভিদের রেণু স্রোতের সহিত অন্যত্র নীত হইয়া থাকে। অনেক পিপীলিকা রেণুকণা ভক্ষণ করে। সেইজন্য খাদ্য সংগ্রহের অভিপ্রায়ে উহাদিগকে নানাফুলে ভ্রমণ করিতে হয়। উহাদিগের পদ-সংলগ্ন রেণুকণা এই উপায়ে পুষ্পান্তরে গমন করিবার অবসর পায়। প্রজাপতি, ভ্রমর, মধুমক্ষিকা প্রভৃতি পতঙ্গেরা অত্যন্ত মধুপ্রিয়। এমন কি মধু না পাইলে উহাদের অনেকেরই

জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ হয় না। ফুল-দল বা পাপ্‌ড়ির মূলদেশে মধু সঞ্চিত থাকে বলিয়া অনেক পতঙ্গকে নানাফুলে মধু অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে হয়। এই সুযোগে এক পুষ্পের রেণু পতঙ্গের শুঁড় ও অন্যান্য অঙ্গকে আশ্রয় করিয়া পুষ্পান্তরে গমন করিয়া থাকে। অতএব পুষ্পের পক্ষে পতঙ্গের আগমন অত্যন্ত আবশ্যক। গরজ বড় বালাই। এইজন্যই অনেক পুষ্প মধুর ন্যায় উৎকৃষ্ট খাদ্য পতঙ্গদিগকে প্রদান পূর্ব্বক প্রলোভিত করিতে কাতর হয় না। এরূপ স্থলে দূর হইতে যাহাতে পতঙ্গের দৃষ্টি সহজে আকৃষ্ট হইতে পারে—যাহাতে উহারা সহজে জানিতে পারে যে ঐ স্থানে মধু লুক্কায়িত আছে—এইরূপ একটা উপায় থাকাই পুষ্পের পক্ষে বাঞ্ছনীয়। ফুল-দলের উজ্জ্বল ও বিচিত্র বর্ণ এইকার্য্য অতি উৎকৃষ্ট ভাবে সম্পন্ন করিয়া থাকে। অনেক কীট পতঙ্গ রাত্রিতে প্রদীপের নিকট দূর হইতে আসিয়া আত্ম-বিসর্জ্জন করে। দীপশিখার উজ্জ্বল বর্ণই এই আকর্ষণের কারণ। অতএব দেখা গেল বীজোৎপাদনের জন্য নিষেক-ক্রিয়ার সাহায্য করাই পুষ্পের বর্ণ বৈচিত্র্যের প্রধান উদ্দেশ্য।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, কিরূপে বর্ণের উৎপত্তি ও বিচিত্রতার পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে? কৃষ্ণ-কলির (সন্ধ্যামণির) একই গাছের ভিন্ন ভিন্ন শাখায় হলদে, শাদা, লাল অথবা ঐ তিন বর্ণের অল্পাধিক পরিমাণে মিশ্রিত রংবিশিষ্ট ফুল ফুটিতে দেখিয়া বর্ণের উৎপত্তি রহস্য জানিবার জন্য সহজেই কৌতূহল জন্মে। তবে এই বিষয়টি সম্যক অবগত হইতে হইলে উদ্ভিদ-বিষয়ক রসায়ন-শাস্ত্র অধ্যয়ন করা যে আবশ্যক তাহা বলাই বাহুল্য। জীবদেহের পুষ্টি বৃদ্ধি ও রক্ষার জন্য শরীরের অভ্যন্তরে সর্ব্বদাই নানাবিধ রাসায়নিক-ক্রিয়া হইয়া থাকে। একই দুগ্ধ হইতে শিশুদেহের অস্থি, মাংস, মেদ ও মজ্জা—ফলতঃ সর্ব্ববিধ পদার্থ উৎপন্ন হয়। যে উপায়ে খাদ্যদ্রব্য পাকনালীর অভ্যন্তরে রূপান্তরিত হইয়া রক্ত মাংস মেদ প্রভৃতিতে পরিণত হয় তাহাকে সংক্ষেপ শারীর কার্য্য (Physiological action) বলা যাইতে পারে। জীবদেহের ন্যায় উদ্ভিদ শরীরের অভ্যন্তরেও নানাবিধ রাসায়নিক ক্রিয়া ও শারীরকার্য্য চলিয়া থাকে। এইজন্যই ক্ষুদ্র বীজ বটবৃক্ষের ন্যায় মহীরূপে পরিণত হইতে পারে!

বংশরক্ষার জন্য সন্তানলাভ করা জীবের ন্যায় উদ্ভিদ সমাজেরও আকাঙ্ক্ষা। এইজন্য উদ্ভিদের কতকগুলি পত্র ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া বৃতি, দল, পুংকেশর ও স্ত্রীকেশরে পরিণত হইয়া থাকে। কদলীপত্র যে ক্রমে ক্ষুদ্র হইয়া পরিশেষে রঙিন "মোচার খোলার" আকার ধারণ করে তাহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। মোচার পুষ্টির যে পরিমাণ উপাদানের আবশ্যক কদলীপত্রে সেই পরিমাণ সামগ্রীর অভাব হয়। সেইজন্যই দেখা যায় যতই মোচা ক্রমে পুষ্ট হইয়া উঠে পাতাও সেই অনুপাতে ক্ষুদ্র হইতে থাকে। কেবলমাত্র কদলীবৃক্ষে যে এইরূপ ঘটে তাহা নহে। অন্যান্য উদ্ভিদের মধ্যেও এইরূপ লক্ষ্য করা যায়। রজনীগন্ধা পরীক্ষা করিলেও এই সত্যটি স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে। জীবজগতেও এই নিয়মের

ব্যত্যয় হয় না। গর্ভস্থ শিশু যতই পরিপুষ্ট হইতে থাকে মাতার দেহও পুষ্টিকর উপাদানের অভাববশতঃ ততই রুগ্ন ও দুর্ব্বল হইয়া যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ফুলের সম্যক বৃদ্ধির জন্য পত্রের কতকটা সামগ্রী ব্যয়িত হইয়া থাকে। ফুলের উদ্দেশ্য ফল উৎপাদনে সাহায্য করা। সুতরাং ফলের পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য যে ফুলের কতকটা সামগ্রী ব্যয়িত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

উদ্ভিদের দেহাভ্যন্তরস্থ নানাবিধ রাসায়নিক ও শারীরক্রিয়ার ফলেই পুষ্পের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে পত্র হইতেও পাপড়ীতে এই রাসায়নিক কার্য্য অধিকতর দ্রুতবেগে সম্পন্ন হইতে দেখা যায়। আমরা নিশ্বাসের সহিত বায়ু হইতে অক্সিজেন (অম্লজান) গ্যাস গ্রহণ করি। ঐ অক্সিজেন আমাদের রক্তের সহিত মিলিত হইয়া উহার বিশুদ্ধি রক্ষা করে ও এই রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে দেহের অভ্যন্তরে তাপ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ফুলদলেও এইরূপ অক্সিজেন গ্রহণকার্য্য প্রবলবেগে সম্পন্ন হয়। ঘর্ম্মের আকারে জলীয় বাষ্প আমাদের শরীর হইতে বহির্গত হইয়া যায়। পত্র অপেক্ষা ফুলদল হইতে এই বাষ্পোৎসেক কার্য্য সময়ে সময়ে দ্রুতবেগে চলিয়া থাকে। রস চলাচলের জন্য পত্রের মধ্যে যে পরিমাণ শিরা ও শাখাশিরা থাকে ফুলদলে তত থাকে না। ফুলদল বা পাপড়ীর পরিপাক শক্তি (assimilative power) সাধারণতঃ অনেক কম। এইজন্য কার্টেল (Curtel) নামক জনৈক ফরাসী পণ্ডিত অনুমান করিয়াছিলেন যে যথোপযুক্ত পুষ্টির অভাবেই ফুলদলের অভ্যন্তরে হরিৎকণা (chloaophyll) জন্মিতে পারে না ও বৃদ্ধি পায় না। অসংখ্য লোহিত কণিকা রক্তে বিদ্যমান থাকায় রক্ত যেরূপ লাল দেখায় ঐরূপ অগণ্য হরিৎ-কণা বর্ত্তমান থাকে বলিয়াই উদ্ভিদপত্রকে সবুজ মনে হয়। এই কণার অভাবেই অশোক, অশ্বত্থ প্রভৃতি উদ্ভিদের কচি কচি পাতা প্রথমে সবুজ থাকে না পরে উহারা যতই বড় হইতে থাকে ও হরিৎ-কণার সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ততই উহাদের বর্ণ সবুজ হইয়া উঠে। আবার এই কণার অভাবেই অনেক ফুলের পাপ্‌ড়ি শ্বেতবর্ণ ধারণ করে। কদলী পেঁপে প্রভৃতি উদ্ভিদের পক্বপত্র ঝরিয়া পড়িবার পূর্ব্বে ক্রমে হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করে। হরিৎ কণার অভাবই এই বর্ণ পরিবর্ত্তনের কারণ।

ফুলদলই প্রধানত বিবিধবর্ণে রঞ্জিত হইয়া থাকে। সুতরাং উহারই মধ্যে লাল, নীল প্রভৃতি বর্ণোৎপাদক মূল উপাদান অধিকতর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। উদ্ভিদের শিকড়, কাণ্ড বা পত্রে যে পরিমাণ মূলবর্ণ পাওয়া যায়, উহা ফুলদলস্থ বর্ণের সহিত তুলনায় অতি সামান্য মাত্র। পূর্ব্বেই বলিয়াছি উপযুক্ত পুষ্টির অভাবে পাপ্‌ড়ীর মধ্যে হরিৎ-কণা উৎপন্ন হইতে পারে না। কিন্তু কমলা বা গাঢ় হরিদ্রাবর্ণের মূল-উপাদান ক্যারোটিন (carotin) নামক পদার্থ উৎপন্ন হইবার অবসর পায়। অবশ্য মূল-উপাদানের ন্যূনাধিক্যবশতঃ কখন কমলা, কখন বা হরিদ্রাবর্ণের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

একজাতীয় জবা ও অন্যান্য অনেক ফুলের পাপ্‌ড়ীর বর্ণ লাল এবং অনেক অপরাজিতার

উৎপত্তি হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে পণ্ডিতেরা বলেন যে ফুলদলের পরিপাকশক্তি অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল হওয়ায় উহার কোষপঙ্কের বর্জ্জন ক্ষমতা অন্যান্য অঙ্গ অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক। পরিপাক যন্ত্র দুর্ব্বল হইলে মলের ভাগ অধিক হয় না কি? ফুলের সহিত দল, কাণ্ড ও মূলের রাসায়নিক উপাদানের তুলনা করিলেই পুষ্পের কোষপঙ্কের অত্যধিক বর্জ্জনশক্তি (de-assimilation) স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। এই বর্জ্জন-শক্তির আধিক্যই লাল ও নীলবর্ণ উৎপাদানের মূল কারণ।

বহুসংখ্যক পুষ্পের রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা কিগ্যান (Keegan) নামক জনৈক পণ্ডিত দেখাইয়াছেন যে কোন কোন জাতীয় ফুল স্বভাবতই বিশুদ্ধ উজ্জ্বলবর্ণে রঞ্জিত হইয়া থাকে। কিন্তু দল, কাণ্ড ও মূলে লাল এবং নীলবর্ণের মূল-উপাদান (tannin chromogen) মাত্রা সাধারণতঃ অত্যন্ত অধিক থাকে। এইজন্যই মনে হয় লাল ও নীলবর্ণের মূল উপাদান প্রধানতঃ পাপড়ীতেই উৎপন্ন হয় ও ঐ স্থানেই বৃদ্ধি পায়। বৃক্ষের অন্যান্য অঙ্গ এই কার্য্যে ফুলকে বিশেষ সাহায্য করে না। বাব্‌লা, গাব, হরিতকী, ভেলা প্রভৃতি বৃক্ষের ফলে ট্যানিন্ নামক পদার্থ যথেষ্ট দেখা যায়। ঐ সকল ফলের কষ যে ঈষৎ লাল দেখায় উহা এই ট্যানিন্ নামক পদার্থেরই গুণে। এই (ট্যানিন্) পদার্থ অত্যধিক রাসায়নিক বিশ্লেষণের (de-assimilation) ফলে উৎপন্ন হয়। সুতরাং গাছের অন্যান্য অঙ্গ অপেক্ষা পাপ্‌ড়ীর মধ্যেই অবশ্য এই বিশেষ প্রক্রিয়া অতি প্রবলবেগে চলিয়া থাকে,

জিজ্ঞাস্য এই যে, কোন্ প্রণালীতে এই কার্য্য চলে এবং এই বিশেষ শক্তির প্রকৃত কারণই বা কি?

ফুলদলের পরিপাক শক্তি দুর্ব্বল বলিয়াই উহার বর্জ্জন ক্ষমতা সেই অনুপাতে অধিক বটে কিন্তু কেবল ইহাই একমাত্র কারণ নহে। কোন কোন পাপ্‌ড়ীর কতকগুলি কোষের এই বর্জ্জন ক্ষমতা অত্যন্ত অধিক দেখা যায়। উহারাই কার্য্য করিয়া থাকে, আর নিকটস্থ অপরাপর কোষসকল উহাদের পরিশ্রমের ফল উপভোগ করে মাত্র। একজন খাটিয়া মরে, আর পাঁচজন বসিয়া খায়। পিপীলিকা ও মধুমক্ষিকাদিগের মধ্যেও এইরূপ নিয়ম দেখা যায়। পাপ্‌ড়ীর কোষ সমূহে যে সকল পদার্থ (albuminoids) উৎপন্ন হয় এই উপায়ে পুংকেশর ও স্ত্রী কেশরের অভাব পূরণের জন্যই উহাদের কতকটা ব্যয় হইয়া যায়। হংস ডিম্বের অভ্যন্তরস্থ শ্বেত দ্রব্য ও মসুর অরহর প্রভৃতি ডাল জাতির পুষ্টিকর সার পদার্থকেই (albuminoid) বলে। ঐ সকল দ্রব্যের মধ্যে নাইট্রোজেন নামক পদার্থ বিশেষের মাত্রা অধিক পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। ডিম্বের কুসুম বা ভ্রূণ ঐ শ্বেত দ্রব্য আহার করিয়া বৃদ্ধি পায় ও একটি পক্ষীশাবকে পরিণত হইয়া থাকে। অসহায় "উদ্ভিদশিশু" যাহাতে খাদ্যাভাবে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত না হয় তজ্জন্য বীজ মধ্যে ভ্রূণ বা অঙ্কুরের উভয় পার্শ্বে বীজ-দল বা ডালের আকারে পুষ্টিকর যথেষ্ট খাদ্য সঞ্চিত থাকে। বলা বাহুল্য বীজোৎপাদন করিতে হইলে ঐ খাদ্যসার

না রেণু ও বীজাণুর পুষ্টির জন্য ঐ দ্রব্যের যথেষ্ট আবশ্যক। সময়ে সময়ে পুং ও স্ত্রীকেশরের অত্যধিক অভাব পূরণের জন্য ফুলদলের অভ্যন্তরস্থ ঐ সকল পদার্থের অতিরিক্ত ব্যয় একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। তাহাতে ঐ সকল দ্রব্যের উপাদান পৃথক্ হইতে বাধ্য হয়। এই বিশ্লেষণের ফলে নাইট্রোজেনের অংশ পুংকেশর ও স্ত্রী কেশরের কোষ সমূহে আবশ্যক মত চলিয়া যায়। সুতরাং অধিকাংশ স্থলে লাল ও নীলবর্ণের মূল উপাদান দলের মধ্যেই পড়িয়া থাকে। বহুসংখ্যক পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়া গিয়াছে যে ভিন্ন ভিন্ন ফুলে এই ট্যানিন্ অল্পাধিক পরিমাণে রূপান্তরিত হইয়া লাল ও নীলবর্ণ উৎপাদন করে। মটরে এই রূপান্তরের মাত্রা অত্যন্ত অধিক। কোন কোন গোলাপেও প্রায় এই রূপই দেখিতে পাওয়া যায়। একই জাতীয় উদ্ভিদের মধ্যে কোন শ্রেণীর গাছে স্বভাবতই লাল, আবার অপর শ্রেণীর গাছে নীল বর্ণের ফুল জন্মিয়া থাকে। কিন্তু উভয় শ্রেণীর মধ্যেই মূল-বর্ণের (chromogen) উপাদানগত কোন পার্থক্য দেখা যায় না। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন ফুলে বর্ণোৎপাদনের শক্তি ন্যূনাধিক মাত্রায় থাকিবেই, ইহা স্বীকার করিতে হইবে; নতুবা বর্ণের পার্থক্য ঘটিতে পারে না। যে সকল উদ্ভিদের ফুল সাধারণতঃ নীল বা ঈষৎ লালের আভাযুক্ত নীল সেই সকল উদ্ভিদই এ বিষয়ে উন্নত বুঝিতে হইবে। এই সকল উদ্ভিদেরই জননশক্তি বিশেষ প্রবল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে জাতীয় উদ্ভিদের হল্‌দে ফুল হয় কোন কৃত্রিম উপায়েই সেই জাতির কোন শ্রেণীর গাছে নীল ফুল জন্মান যায় না; তবে লাল বা শাদা ফুল জন্মান যাইতে পারে। এইরূপে আবার নীল ফুলের বর্ণ কোন উপায়েই পরিবর্ত্তিত করিয়া হরিদ্রাভ করা যায় না। বলা বাহুল্য যে অনেক পুষ্পোদ্যানে গোলাপ জিনিয়া প্রভৃতি একই শ্রেণীর উদ্ভিদ হইতে বিভিন্ন বর্ণের পুষ্প উৎপাদন করতঃ পুষ্পজীবিগণ ক্রেতার মনোরঞ্জন করিয়া থাকে। শরীর কার্য্যের সুবিধার জন্য কলমী, অপরাজিতা প্রভৃতি অধিকাংশ উদ্ভিদের ফুলদল ও ভুঁইচাঁপা প্রভৃতি অনেক ফুলের বৃতি এবং পদ্মজাতীয় অনেক পুষ্পের আবরণ-পত্রের কোষ মধ্যে নাইট্রোজেন-সংশ্লিষ্ট পদার্থের যতই অভাব ঘটে, ঐ সকল পাপ্‌ড়ী, বৃতি প্রভৃতির বর্ণও ততই লাল অথবা নীল হইতে থাকে। ফলতঃ পূর্ব্বোক্ত পদার্থের (albuminoid) ন্যূনাধিক্যই বর্ণ বৈচিত্র্যের কারণ বলিয়া বুঝিতে হইবে।

অতএব দেখা গেল বংশরক্ষার জন্য অনেক উদ্ভিদেরই পক্ষে ফল বা বীজের প্রয়োজন এবং এই বীজোৎপাদন জন্যই পুংকেশর ও স্ত্রীকেশরের আবশ্যক। এই দুই অঙ্গের উৎপত্তি ও পুষ্টির জন্য যে সমুদায় উপাদানের প্রয়োজন হয় উহাদের অধিকাংশই পত্র হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকে। কাজেই পত্রের মধ্যে সারপদার্থের যতই অভাব হইতে থাকে পত্রও ততই ক্রমে ক্ষুদ্র ও রূপান্তরিত হইয়া বৃতি ও পাপ্‌ড়ীতে পরিণত হয় এবং নীল, পীত লোহিতাদি বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায়।

৬৬ বৎসর পূর্ব্বে বিবাহ ব্যয়

৬৬ বৎসর পূর্ব্বে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের কিরূপ মূল্য ছিল তাহা নিম্নলিখিত তালিকায় প্রকাশিত।

চাল—৪/০ মন	৫।০
কলাই—॥০ মন	॥১০
লবণ—/৫ সের	॥১০
ময়দা—॥০ মন	১।৶০
ঘৃত—/৫ সের	২৲
চিনি—/৮ সের	২৲
সন্দেশ—॥০ মন	৬৲
মোটা ঐ/২ সের	১।০
দধি—১॥০ মন	৪৲
দুধ—।০ সের	৶০
আলু /৪ সের	৶০

এই কয়েকটি দ্রব্যের মূল্য ১২৫৩ সালের একখানি শুভ-বিবাহের হাটখরচ ফর্দ্দ হইতে পাওয়া গিয়াছে। ইহাতেই বোঝা যায় তখন কিরূপ সস্তার দেশ ছিল। লোকেই বা তখন কেন অভাব অনুভব করিত না এবং পল্লীগ্রামে থাকিতে ভালবাসিত। এখনকার অভাবই সম্ভবতঃ দরিদ্র গৃহে ম্যালেরিয়ার একটা কারণ। এখন লোকের অভাব পূরণ না হওয়াতে শরীর দুর্ব্বল থাকে এবং সহজেই রোগ প্রবেশ করে। তখন প্রত্যেক পল্লীগৃহে একটী কিম্বা দুইটী করিয়া বিধবা বাস করিতেন, পুত্রকন্যা এবং আত্মীয় স্বজনে গৃহ সর্ব্বদাই পূর্ণ থাকিত। লোকে অতিথি সেবা করিতেও কুণ্ঠিত হইত না।

আমরা এখন উল্লিখিত ফর্দ্দে চাউল, ঘৃত, ময়দা, কলাই, সন্দেশ, দধি এবং দুধের দাম দেখিয়া অবাক হইয়া যাই,—বিশ্বাস করিতেও যেন কুণ্ঠা বোধ হয়। তখন কেবল লবণের দর কিছু বেশী ছিল এবং চিনির দাম প্রায় সমানই। অন্যান্য দ্রব্যের দাম এখন ছয় সাত গুণ মহার্ঘ হইয়াছে। তখনকার দিনে সাতচল্লিশ টাকা সতের পয়সায় বরযাত্রী সমেত একখানি গ্রাম খাওয়ান হইয়া গিয়াছিল। এখন ৪০০ শত টাকায় হয় কিনা সন্দেহ।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

শারীর স্বাস্থ্য-বিধান

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

১২

বাস-গৃহ

আমরা শারীরিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে সাবধান থাকিলেও কতিপয় বাহ্যিক কারণবশতঃ অনেক সময়ে আমাদিগের স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যায়। কোন সংক্রামক রোগের সংস্পর্শে আসিলে আমা-দিগের শরীরে ঐ রোগ প্রবেশ করিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু সর্ব্ববিষয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করিলে অনেক সময়ে ঐ সকল রোগের আক্রমণ হইতে আমরা অব্যাহতি লাভ করিতে পারি। কিন্তু যে গৃহে আমরা বাস করিয়া থাকি, তন্মধ্যে যদি যথেষ্ট পরিমাণ বিশুদ্ধ বায়ু ও সূর্য্যালোক প্রবেশ করিতে না পায়, যদি আর্দ্র ভূমির উপর তাহা সংস্থাপিত হয়, যদি তাহার নিকটে আবর্জ্জনাদি দুর্গন্ধময় পদার্থ সঞ্চিত থাকে, তাহা হইলে স্বাস্থ্য সত্বর ভঙ্গ হইয়া আমাদিগের

নানাবিধ দুঃসাধ্য রোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। যে বাটী স্যাঁৎসেঁতে, যাহার মধ্যে আলোক ও বিশুদ্ধ বায়ুর অভাব থাকে, তন্মধ্যে বাস করিলে অধিবাসীদিগের মধ্যে জ্বর, উদরাময়, ও শর্দ্দি কাশির প্রাদুর্ভাব সবিশেষ লক্ষিত হয়। এরূপ বাসগৃহে বহু-লোক একত্রে বাস করিলে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। অতএব বাসগৃহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবার জন্য যেরূপ যত্ন করিতে হইবে, উহার নির্ম্মাণপ্রণালী সম্বন্ধেও স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানানুমোদিত সমস্ত নিয়মই প্রতিপালন করিতে হইবে। কিরূপ নিয়ম অবলম্বন করিলে স্বাস্থ্যকর বাসগৃহ নির্ম্মিত হইতে পারে, তাহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধে সংক্ষেপে আলোচিত হইবে।

স্বাস্থ্যপ্রদ বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইলে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ের উপর সবিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে ঃ—

(১) স্থান নির্ব্বাচন।

(২) গৃহনির্ম্মাণোপযোগী উপাদান ও নির্ম্মাণ-প্রণালী।

(৩) আলোক প্রবেশের ব্যবস্থা।

(৪) বায়ু সঞ্চালন।

(৫) জল নিকাশের ব্যবস্থা।

(৬) আবর্জ্জনাদি স্থানান্তরিত করিবার ব্যবস্থা।

(৭) গোশালা ও অশ্বশালা নির্ম্মাণ।

(৮) শয়ন-গৃহে বায়ু-স্থানের পরিমাণ।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে ইহাদিগের মধ্যে কোন-টিরই বিশদভাবে আলোচনা করা অসম্ভব, এজন্য অতি সংক্ষেপে প্রত্যেক বিষয় সম্বন্ধে দুই চারিটি প্রয়োজনীয় কথা বলা হইতেছে।

(১) স্থান-নির্ব্বাচন—যে জমীর উপর বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইবে, তাহা যতদূর সম্ভব, শুষ্ক হওয়া উচিত। আর্দ্র ভূমিতে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিলে উহা সর্ব্বদা স্যাঁৎ-সেঁতে থাকে; যাহারা এরূপ বাটীতে বাস করে, তাহাদের সর্দ্দি, জ্বর, পেটের অসুখ সর্ব্বদা লাগিয়া থাকিতে দেখা যায়। কলি-কাতায় বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিবার সময় মনোমত স্থান নির্ব্বাচনের সুবিধা সর্ব্বদা ঘটিয়া উঠে না, কিন্তু পল্লীগ্রামে বাটী নির্ম্মাণ করিতে হইলে স্থান নির্ব্বাচনের পক্ষে বিশেষ অসুবিধা হয় না, এজন্য উহার উপর লক্ষ্য রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য। তবে কলিকাতার যে স্থান অন্যান্য স্থান অপেক্ষা নীচু, যে জমী পুষ্করিণী ভরাট (বিশেষতঃ আবর্জ্জনাদি দ্বারা) করিয়া প্রস্তুত হইয়াছে, যাহার চতুর্দ্দিক উচ্চ গৃহ দ্বারা আবদ্ধ সুতরাং যাহার মধ্যে বায়ু ও সূর্য্যালোক যথোচিত পরিমাণে প্রবেশ করিয়া উহাকে শুষ্ক রাখিতে পারে না, তাহার উপর বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিলে তাহা কখনই স্বাস্থ্যকর হইতে পারে না।

কাঁকর-জমীর উপর বাসগৃহ নির্ম্মাণ সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত, কারণ এরূপ জমীর উপর বৃষ্টির জল পড়িলে উহা জমীর মধ্য দিয়া সহজেই নির্গত হইয়া যাইতে পারে। "বেলে" মাটীর জমী হইলে জল নির্গত হইয়া যাইবার অসুবিধা হয় না, কিন্তু জমী "এঁটেল" মাটীর হইলে উহার মধ্য দিয়া জল সহজে নিকাশ হইয়া যাইতে পারে না, সুতরাং ঐ জমী সর্ব্বদা ভিজা থাকে।

জলা-ভূমি, শ্মশান, গোরস্থান, এবং মল প্রোথিত করিবার ও আবর্জ্জনা নিক্ষেপ

করিবার স্থান হইতে বহু দূরে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করা উচিত। এই সকল স্থানের জল ও বায়ু সর্ব্বদাই অল্পাধিক পরিমাণে দূষিত থাকে। বিশেষতঃ মল প্রোথিত করিবার স্থানের (Trenching ground) নিকট বাসগৃহ নির্ম্মিত হইলে অত্যন্ত মাছির উপদ্রব হইয়া থাকে এবং অনেক সময়ে মলনিহিত বিষাক্ত বীজাণু মক্ষিকার পদসংলগ্ন হইয়া বহুদূরে পরিবাহিত হয়। আমাদের গৃহ মধ্যে রক্ষিত খাদ্যাদি এই বীজাণুবাহী মক্ষিকা দ্বারা স্পৃষ্ট হইলে উহা বিষাক্ত হইয়া পড়ে এবং অনেক স্থলে কলেরা, টাইফয়েড্, জ্বর প্রভৃতি উৎকট রোগ এই রূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে। দুর্গন্ধের কথা ছাড়িয়া দিলেও শুদ্ধ এই কারণে ট্রেংচিং গ্রাউণ্ডের নিকট বাসগৃহ কখনই প্রস্তুত করা উচিত নহে।

জমী নির্ব্বাচন করিবার সুবিধা হইলে যাহা চতুর্দ্দিকস্থ ভূমি হইতে উচ্চ, যে জমীর একদিকে একটু ঢাল আছে, যাহার চতুর্দ্দিকে বড় গাছপালা থাকিয়া যথোচিত আলোক ও বায়ু প্রবেশের ব্যাঘাত করে না, যাহার কোন অংশ কখন আবর্জ্জনা দ্বারা ভরাট করা হয় নাই (কারণ এরূপ জমীর মধ্য হইতে আবর্জ্জনা পচিয়া নানারূপ দূষিত বাষ্প উঠিবার সম্ভাবনা), যাহার চতুর্দ্দিকে অধিক সংখ্যক পুষ্করিণী বা ডোবা নাই, এরূপ স্থান বাসগৃহের জন্য নির্ব্বাচন করা উচিত।

বাসগৃহের জমীর মধ্যে ডোবা বা গর্ত্ত থাকিলে উহা ভাল মাটীর দ্বারা ভরাট করিয়া দেওয়া উচিত, নচেৎ বর্ষাকালে তন্মধ্যে জল সঞ্চিত হইয়া গৃহকে আর্দ্র রাখিবে, উহা এবং তন্মধ্যে মশক জন্মিয়া বিষম উপদ্রবের কারণ হইবে। এক্ষণে ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে এক জাতীয় মশকের দংশন দ্বারাই ম্যালেরিয়া রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং যে স্থানে অগভীর মলিন জল সঞ্চিত থাকে, মশকীরা তথায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ডিম্ব প্রসব করে, অতএব বাসগৃহের চতুষ্পার্শ্বের কোন স্থানে যাহাতে মশক জন্মিতে না পারে, তৎসম্বন্ধে যথোচিত প্রতীকার করা কর্ত্তব্য।

বাটীর চতুর্দ্দিকে জঙ্গল থাকিলে উহা পরিষ্কার করা উচিত। জঙ্গল থাকিলে জমী সর্ব্বদা আর্দ্র থাকে এবং উহার মধ্যে মশক, বৃশ্চিক, সর্প প্রভৃতি অনিষ্টকর ও বিষাক্ত প্রাণীদিগের বাস করিবার সুবিধা হয়।

(২) গৃহনির্ম্মাণোপযোগী উপাদান—ইট, কাঠ, পাথর, চূণ, বালি, সুরকি, মাটী, সিমেণ্ট, বাঁশ, দড়ি, খোলা, পাতা, ঘাস, লোহার চাদর প্রভৃতি নানাবিধ উপাদান পাকা ও কাঁচা বাড়ী প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহাদিগের সম্বন্ধে বেশী কিছু বলিবার আবশ্যক নাই। পাকা বাড়ী প্রস্তুত করিবার জন্য এদেশে ইট ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইটগুলির পোড় যাহাতে খুব ভাল হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য করা উচিত, নহিলে উহারা জমী হইতে আর্দ্রতা শোষণ করিয়া গৃহের দেওয়াল সর্ব্বদা 'স্যাঁৎসেতে' রাখিবে, দেওয়ালের রং নষ্ট হইয়া যাইবে, লোণা ধরিয়া উহার বালি খসিয়া পড়িবে, এবং যাহা কিছু আসবাব বা পুস্তকাদি দেওয়ালের নিকট থাকিবে, তাহাই আর্দ্রতা (Damp) সংস্পর্শে নষ্ট হইয়া যাইবে। কলিকাতার প্রায় সকল

পক্ষে বড়ই অসুবিধাজনক হইয়া থাকে। জলের একটি ধর্ম্ম এই যে উহা কৈশিক আকর্ষণ গুণে (Capillary attraction) উহার আধার হইতে প্রায় ২২ হাত উর্দ্ধে উঠিতে পারে। ইট, সুর্‌কি প্রভৃতি পদার্থ জল শোষণ করে বলিয়া উহারা ভিজা জমী হইতে কৈশিক আকর্ষণ দ্বারা দেওয়াল বাহিয়া জলের উর্দ্ধদেশে উঠিবার পক্ষে সহায়তা করে। ভাল পোড়ের ইট ও সুর্‌কি হইলে এই অসুবিধা অনেক পরিমাণে নিবারিত হয়। তবে বাসগৃহ শুষ্ক রাখিতে হইলে তন্মধ্যস্থ সমস্ত ভূমি (উঠান প্রভৃতি) কাঁকর, সুর্‌কি ও চূণ দিয়া উত্তমরূপে পিটাইয়া তদুপরি পুরু করিয়া সিমেণ্ট্ লাগাইয়া দেওয়া উচিত, বাটীর মধ্যে কোন স্থানে খালি মাটী থাকিতে দেওয়া উচিত নহে। চতুর্দ্দিকস্থ ভূমি হইতে বাটীর মেঝে দুই হাত উচ্চ হইলে গৃহের আর্দ্রতা অনেক পরিমাণে কমিয়া যায় এবং জমীর সমতলে ভিত্তির উপর যে স্থানে দেওয়াল গাঁথা আরম্ভ হয়, তথায় পুরু করিয়া আর্দ্রতা-নিবারক কোনরূপ পদার্থ রক্ষা করিয়া তদুপরি দেওয়াল গাঁথিলে দেওয়ালের আর্দ্রতা যথেষ্ট পরিমাণে নিবারিত হয়। সিমেণ্ট্, কড়িকোটার ন্যায় মসৃণ আবরণ যুক্ত ইট বা টাইল্, স্লেট্ প্রভৃতি যে সকল পদার্থ জল শোষণ করে না, তাহারাই এই কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। আলকাতরা ফুটাইয়া তন্মধ্যে ইট ডুবাইয়া শুষ্ক বালি মাখাইয়া লইলে ঐ ইট আর জল শোষণ করে না, সুতরাং ভিত্তির উপর এইরূপ ৩।৪ খানা ইটের গাঁথনি করিয়া পরে অন্য ইটের গাঁথনি করিলে অল্প খরচে দেওয়ালের আর্দ্রতা নিবারিত হইতে পারে।

গৃহের ছাদ যত নীচু হইবে, ঐ গৃহ গ্রীষ্মকালে তত অধিক গরম ও শীতকালে অধিক শীতল হইবে—এই জন্য গৃহের ছাদ সর্ব্বথা বেশী উঁচু করিয়া প্রস্তুত করা উচিত। লোহার চাদরের ছাদ গৃহকে গ্রীষ্মকালে অত্যধিক উষ্ণ ও শীতকালে অতিশয় শীতল রাখে, তজ্জন্য এরূপ গৃহে বাস কোন সময়েই সুখের হয় না। তবে লোহার ছাদের নীচে তক্তার একটি আবরণ দিলে অথবা উহার নীচে পুরু করিয়া খড় বিছাইয়া রাখিলে গৃহ অধিক উষ্ণ বা শীতল হয় না। খড় বা পাতার "চাল" গৃহকে শীতকালে উষ্ণ এবং গ্রীষ্মকালে শীতল রাখে, কিন্তু ইহার মধ্যে ইঁদুর, সাপ, বিছা, কীটপতঙ্গাদি আশ্রয় গ্রহণ করিয়া গৃহস্থের অশান্তির কারণ হইয়া থাকে। বিশেষতঃ এখানে অগ্নি-দাহের আশঙ্কা প্রবল ভাবে বিদ্যমান থাকে। খোলার "চাল" বেশী উঁচু না হইলে গ্রীষ্মকালে অত্যন্ত গরম হয় এবং বৃষ্টির সময় উহার মধ্য দিয়া কোথাও না কোথাও জল পড়িতে দেখা যায়; বিশেষতঃ খোলার "চাল" হইতে ধূলা কুটা সর্ব্বদাই নীচে পড়ে এবং ক্ষুদ্র পক্ষী ও নানাবিধ কীট পতঙ্গাদি তন্মধ্যে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করে। পাকা ছাদের বাটী না হইলে উহার নিম্ন দেশে একটি একটি কাঠের বা পাতলা টাইলের কৃত্রিম ছাদ (Ciling) প্রস্তুত করা উচিত। মোটা কাপড়ের "সিলিং" দেখিতে পরিষ্কার হয় বটে, কিন্তু উহা অধিক দিন টিকে না এবং বর্ষার সময়ে জল পড়া একেবারে নিবারণ করিতে পারে না। "সিলিং" থাকিলে গৃহটী

পাকাবাড়ীর অপেক্ষা গ্রীষ্মকালে অধিক শীতল এবং শীতকালে উষ্ণ থাকে, কারণ দুইটী ছাদের মধ্যে যে বায়ু ব্যবধান থাকে, উহা তাপ-অপরিচালক বলিয়া বাহির হইতে অধিক তাপ বা শৈত্য গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিতে দেয় না।

জমীর চারিদিকেই কিছু জায়গা রাখিয়া বাসগৃহ নির্ম্মাণ করা কর্ত্তব্য। নিজের জমী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা নিজ আয়ত্তাধীন. কিন্তু পার্শ্বে অপরের জমী থাকিলে তাহা পরিষ্কার রাখান সকল সময়ে ঘটিয়া উঠে না। কাহারো দেওয়াল চাপিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করা বড়ই অস্বাস্থ্যকর প্রথা; ইহাতে নিজের ও প্রতিবাসীর উভয়েরই যথেষ্ট অনিষ্ট সংঘটিত হইয়া থাকে। ইহাতে উভয় বাটীর মধ্যে বায়ু সঞ্চালন ও আলোক প্রবেশের ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে এবং বৃষ্টির জল উভয় দেওয়ালের মধ্যবর্ত্তী স্থানে কতক পরিমাণে অবরুদ্ধ থাকিয়া উভয় বাটীর দেওয়ালকেই ভিজা রাখে। বাসগৃহের চতুঃপার্শ্বে যত অধিক মুক্ত স্থান রাখিতে পারা যায়, তাহা রাখা উচিত। নিজের জমী না থাকিলে বাসগৃহের চতুঃপার্শ্বে দরজা জানালা রাখিতে পারা যায় না, অথচ যদি বাসগৃহের চতুঃপার্শ্বে দরজা জানালা না থাকে, তাহা হইলে বাসগৃহমধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে আলোক ও ও বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর নিয়মানুসারে দুইটি বাটীর মধ্যস্থলে অন্ততঃ ৪ হাত পরিমাণ স্থান রাখিবার ব্যবস্থা আছে। উহা যথেষ্ট না হইলেও বায়ুসঞ্চালন ও আলোক প্রবেশের পক্ষে কথঞ্চিৎ সহায়তা করে। একজনের দেওয়াল চাপিয়া আর একজনের বাটী তুলিতে দেওয়া নিতান্ত অসঙ্গত ব্যবস্থা। বাটীর চতুর্দ্দিকে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ স্থান না রাখিলে কাহাকেও বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতে অনুমতি দেওয়া উচিত নহে। এ সম্বন্ধে কিছুদিন পূর্ব্বে মৎ প্রণীত "বায়ু" নামক পুস্তকে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

"বাটীর চতুর্দ্দিকে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ স্থান না রাখিলে, কোনও কারণেই বাটী প্রস্তুত করিবার অনুমতি প্রদান করা উচিত নহে। অনেকে বলিবেন যে এরূপ কঠিন আইন প্রচলিত হইলে লোকের কলিকাতায় বাস করা দুর্ঘট হইয়া উঠিবে। এস্থলে বক্তব্য এই যে কলিকাতায় অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যক লোক থাকিলে বিশেষ ক্ষতি নাই, কিন্তু সেই অল্প সংখ্যক লোক যাহাতে সর্ব্বদা সুস্থ শরীরে বাস করিতে পারে, তদ্বিষয়ে সবিশেষ চেষ্টা করা উচিত। স্বাস্থ্য-রক্ষার নিমিত্ত এইরূপ সুনিয়ম প্রচলিত হইলে যাঁহারা এই নগর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন, তাঁহাদের পক্ষে উহা আমি অসুবিধা বা অমঙ্গলজনক বলিয়া বিবেচনা করি না। তাঁহারা সহরের উপকণ্ঠে অথবা পল্লীগ্রামে গমন করিয়া প্রশস্ত স্থানে স্বাস্থ্যরক্ষার অনুকূল বাস-গৃহ অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে নির্ম্মাণ করিতে পারিবেন এবং অন্যান্য কার্য্যেও তাঁহাদের যথেষ্ট অর্থানুকূল্য ঘটিবে। এই রূপে অনেক ভদ্রলোক যদি পল্লীগ্রামে যাইয়া বাস করেন, তাহা হইলে সেই ভ্রষ্টশ্রী গ্রাম গুলির পুনরায় শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইবে; সেখানে বিদ্যালয়, সুচিকিৎসক এবং উত্তম ঔষধের অভাব হইবে

না ; তাঁহাদিগের সমবেত চেষ্টায় পানীয় জল ও জল নিকাশের (Drainnge) সুবন্দোবস্ত হইলে গ্রামে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কমিয়া যাইবে ; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামগুলি স্বাস্থ্য, স্বচ্ছন্দতা ও শান্তিপূর্ণ হইয়া পুনরায় হাসিতে থাকিবে—বাঙ্গালার পূর্ব্ব গৌরব আবার ফিরিয়া আসিবে। এ বিষয় চিন্তা করিতেও মনোমধ্যে যে আশা ও আনন্দের উদ্রেক হয়, তাহা লেখনীদ্বারা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীচুনীলাল বসু।

উদয়াস্ত

বৃদ্ধ কাশ্মীরপতি তাঁহার প্রিয়তম পুত্র সুকণ্ঠ এবং সুকবি হর্ষকে কবিত্বের পুরস্কারস্বরূপ রাজসিংহাসন দান করিতে অভিলাষী হইলেন। কিন্তু পিতাপুত্রের মাঝখানে কঠোর ব্যবধানের মত বর্ত্তমান ছিলেন হর্ষের বিমাতা, বৈমাত্রেয় ভ্রাতা এবং চক্রান্তপটু মন্ত্রিদল। পিতৃস্নেহের এমন শক্তি ছিল না যে সে বাঁধ ঠেলিয়া ফেলে সুতরাং স্নেহাতুর পিতা এবং গুণবান কুমারের মধ্যে কারা-প্রাচীর কঠোরতর এবং দৃঢ়তর হইয়া উঠিতে বিলম্ব হইল না।

মহৈশ্বর্য্যের সুতীক্ষ্ণ জ্যোতিঃপিঞ্জরাবদ্ধ অক্ষম রাজা পলে পলে বিলুপ্তির চিরান্ধকার কামনা করিয়া বাঁচিয়া রহিলেন আর নিরাশায় নিমগ্ন পদ্মকোরকের ন্যায় রাজকুমার হর্ষের তরুণ জীবন কারাগারের সূচীভেদ্য অন্ধকারে কোন্ সৌভাগ্যের অরুণালোকের প্রতীক্ষায় রহিল।

শেষে একদিন দেখা দিল বৃদ্ধ পিতার মনস্কামনা পূর্ণ করিয়া, স্নেহবঞ্চিতের চিরবাঞ্ছিত ক্লান্তির প্রশান্তি জীবনমরুর প্রখর আলোর উপরে অপরূপ কালো অসীম রাত্রি ; আর আসিল সমস্ত উৎসাহ উদ্যম জাগরিত করিয়া তরুণ রাজপুত্রের নিকটে অন্ধকারাগারের বন্ধ দুয়ার মুক্ত করিয়া কালোর পারে অপরূপ আলো !—উদয়াস্তের সন্ধিস্থলে পুত্রের দিকে পিতা, পিতার দিকে পুত্র চাহিয়া রহিলেন। হর্ষের বীণা দুইটিমাত্র জীবনতন্ত্রীতে ঝঙ্কার দিয়া বাজিতে থাকিল—

জয় জয় জয় জয় !

* * * *

তাহার পরে কতকাল চলিয়া গেছে ;—যে অপূর্ব্ব ঘনঘটা একদিন কালোর ওপারে বিদ্যুতের আলো এবং আলোর উপরে কালোর মাধুরী লইয়া দুই শুষ্ক জীবন-সরোবরের উপর করুণা বর্ষণ করিতে আসিয়াছিল তাহা রাজার চিতাভিষেক আর রাজকুমারের রাজ্যাভিষেক এই দুই অভিষেক সম্পূর্ণ করিয়া দিয়া চলিয়া গেছে। উত্তর ভারতের একমাত্র অধীশ্বর রাজগণরাজ শ্রীহর্ষ এখন অচল অটলভাবে কাশ্মীরের রাজসিংহাসনে বিরাজ করিতেছেন। দিগ দিগন্তপ্লাবী রাজ-ঐশ্বর্য্যের বিলাসবন্যা-জলে সম্পূর্ণ স্ফীতিলাভ করিয়া সরোবরের পূর্ব্ব শুষ্কতা মনে রাখিবার এখন আর অবকাশ

এখন প্রবল টানের মহানন্দে নৃত্য করিতে করিতে কালসাগরে মিলিতে চলিয়াছে;—আর সেই মহা কল্লোলের উপর রাজ-কবি হর্ষের সোনার বীণা চারিটা সোনার তারে নিষ্ক দীনারের ঝণৎকার তুলিয়া বাজিতেছে—

"গুপ্তধনের অধিকারী পৃথিবীর বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া সবলে ধনরাশি আহরণ করিতেছি। ধরিত্রীর শোণিতলিপ্ত অপর্য্যাপ্ত নিষ্ক দীনার ধৌত করিতে নিষ্কলুষ বিতস্তা-বারি বহুদূর পর্য্যন্ত কলুষিত হইয়া গিয়াছে! দান-রহিত ভোগ-রহিত সর্পের ন্যায় বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া আমার জন্য কতকাল ধরিয়া কত কৃপণ কত নিধিই রক্ষা করিয়া আসিয়াছে।"

হর্ষের দারিদ্র্য দূরীভূত হইয়াছে। সুমহৎ ঐশ্বর্য্যের চমৎকার দীপালী হার দিকে দিকে লম্বমান, অতি অপরূপ সুবর্ণদীপ্তি বেষ্টন করিয়া নানা ভোগ, নানা বিলাস, পতঙ্গের মত অবিশ্রান্ত ঘূর্ণমান হর্ষ-পূর্ণিমার এই দীপালী উৎসব জগতে অনুপম। দশদিক্‌পাল ও ইন্দ্র অপেক্ষা অধিক ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন মহীপাল হর্ষের এই নৈশ সভার বর্ণনা কোন্ কবি-বৃহস্পতি করিতে সক্ষম! চন্দ্রাতপ মেঘবৎ, দীপাবলী বিদ্যুৎপ্রাকারবৎ, স্বর্ণদণ্ড শ্বেতছত্র-পুষ্পিত মন্দারবৎ, গায়কবর্গ গন্ধর্ব্ববৎ, নর্ত্তকীরা অপ্সরোপমা, পণ্ডিতগণ ঋষিতুল্য, রাজন্যবর্গ নক্ষত্রের ন্যায়—ইহা যক্ষরাজ ও যমরাজের শুচির সঙ্গম, দান ও ভয়ের রুচির বিহার স্থল। এই ভূস্বর্গে কালচক্রের কঠোর ঘর্ঘর কামিনীকুলের কবরীস্থিত সেফালিকা কুসুমের ভঙ্গজনিত মর্ম্মর ধ্বনির ন্যায় শ্রুতি-গোচর হইতেছে কি না।

*   *   *

দীপালী নিভিল। রাজরাজহর্ষের দগ্ধ ললাটে দ্রোহ এবং দহনের দীপালী নিভিল। বীণার সব কটা সোনার তার সোনার স্বপ্নের সঙ্গে সঙ্গেই কাটিয়া গেল;—এখন কেবল অতি পুরাতন একটি মাত্র জীবনতন্ত্রী বক্ষপঞ্জরের পর্দ্দায় পর্দ্দায় ঘা দিয়া বাজিতে লাগিল—

"আমি কে! কে আমাকে পরাজিত করিয়াছে। আমি কোথায়! আমার অনুচর কে। আমি রাজ্যভ্রষ্ট; আমার পত্নিগণ দগ্ধ হইয়াছে; পুত্র নিরুদ্দেশ; একাকী বন্ধু-বিরহিত পাথেয়বিহীন রাজা আজ ভিক্ষুকের অঙ্গনে লুটিতেছি।"

নিরুদ্দেশ পুত্রের নিধন সংবাদের সঙ্গে সঙ্গেই পলাতক রাজার উদ্দেশে গুপ্ত ঘাতকের দল ভিক্ষুকের অঙ্গনে আসিয়া যখন পৌঁছিল তখন আর রাজা নাই,—একটিমাত্র আজন্ম সেবকের সম্মুখে বসিয়া এক উন্মাদ কর্কশকণ্ঠে গান ধরিয়াছে—

"আমি গগনে চিত্র রচনা করিব, মৃণাল-তন্তুতে বস্ত্র বয়ন করিব, স্বপ্নদৃষ্ট স্বর্ণ সংগ্রহ করিব, হিমের প্রাকার নির্ম্মাণ করিব।"

হর্ষের ছিন্নমুণ্ড লইয়া ঘাতুকের দল যখন রাজপথে নৃত্য করিতে করিতে চলিল তখন উদয় শিখর হইতে নীল আকাশ জুড়িয়া রক্তরেখার পরে রক্তরেখা আসিয়া পড়িয়াছে—অস্তশিখর পাংশু এবং ম্লান হইয়া গেছে।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সাময়িক প্রসঙ্গ

ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচন *

বহু দ্বন্দ, বহু সংগ্রামের পর বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত হইয়া গিয়াছে। এইরূপ দ্বন্দ চেষ্টায়, দেশে জাতিগত জাগরণের একটা আভাষ লক্ষিত হয়, রাজনৈতিক বিভাগে স্বাস্থ্যপূর্ণ প্রাণ স্পন্দনের একটা পরিচয় পাওয়া যায়। দেশের আবাল বৃদ্ধ সকলেরই পক্ষে ইহা একটা উৎসাহপূর্ণ উত্তেজনার কাল। রাজনৈতিক কার্য্যে শক্তিলাভের এই যে

নসিপুরের মহারাজা অনারেবল রণজিৎ সিংহ।

* এই প্রবন্ধের অন্তর্গত পাঁচখানি চিত্র বিখ্যাত সাপ্তাহিক হিন্দুপেট্রিয়ট পত্রের কর্ত্তৃপক্ষগণ আমাদের ব্যবহার করিতে দিয়া কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।
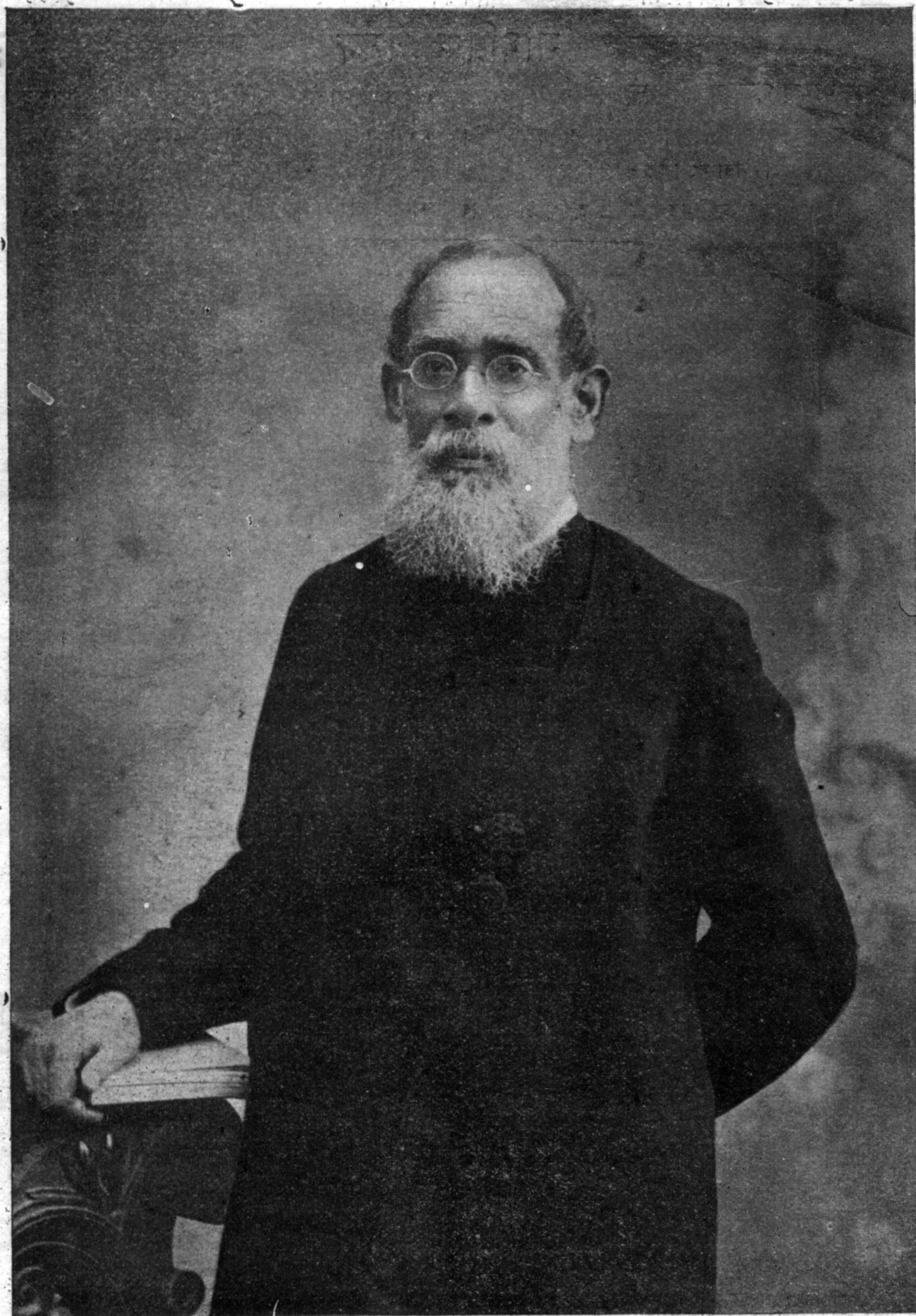
অনারেবল সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

উন্মাদনকর আস্বাদন—ইহা হইতে আগে আমরা সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত ছিলাম। প্রকৃতপক্ষে আমাদের ভূতপূর্ব্ব সহৃদয় ষ্টেট সেক্রেটারী লর্ড মর্লি ও গভর্ণর জেনেরল লর্ড মিণ্টোর চেষ্টাতেই আজ ভারতবাসী—ভারতের বিধিব্যবস্থাগারে প্রবেশ লাভের অধিকারী। এই নির্ব্বাচন উৎসবের সময় তাই তাঁহাদের উদারতার কথা সর্ব্বাগ্রে মনে পড়িয়া যায়, এবং হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইয়া উঠে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার মন্ত্রী নির্ব্বাচন শেষ হইয়া গেল,—এইবার বঙ্গের প্রতিনিধিরূপে যাঁহারা বড় লাটের

অনারেবল মহেন্দ্রনাথ রায়।

মন্ত্রণাসভায় প্রবেশ করিতে চাহেন—আগামী ১৪ই ফেব্রুয়ারি তারিখে তাঁহাদের নির্ব্বাচন হইবে। দেশপূজ্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ভূপেন্দ্রনাথ বসু এই সম্মানিত পদলাভের প্রার্থী। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাদের সফলতা কামনা করি।

সিভিল সার্ভিস কমিশন

এখন ইংলণ্ডেই সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষা হইয়া থাকে। ভারতবর্ষেও যদি এই পরীক্ষা গ্রহণের নিয়ম হয়—তবে ভারতবাসীর পক্ষে মহালাভ, কিছু দিন হইতে আমরা এইরূপ বলিতেছি। কিন্তু এ

অনারেবল সুরেন্দ্রনাথ রায়।

নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইলে, ভারত শাসনের পক্ষে উপকার বা অপকার মঙ্গল বা অমঙ্গল সেই সম্বন্ধে যোগ্যতর ব্যক্তিগণের মতামত গ্রহণ করাই এই কমিশনের উদ্দেশ্য।

এই কমিশনে বাঙ্গলা দেশে সর্ব্বসমেত ৩২ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছে—তন্মধ্যে ১৫ জন ইংরাজ, ১৭ জন ভারতবাসী। আমাদের দেশের সকলেই যে ভারতবর্ষে সিবিল সার্ভিস পরীক্ষার অনুকূলে মত দিয়াছেন ইহা বলা বাহুল্য। কেহ কেহ কেবল বলিয়াছেন এদেশে পরীক্ষা দানের পর ছাত্রদের বিলাত যাত্রা করা উচিত।
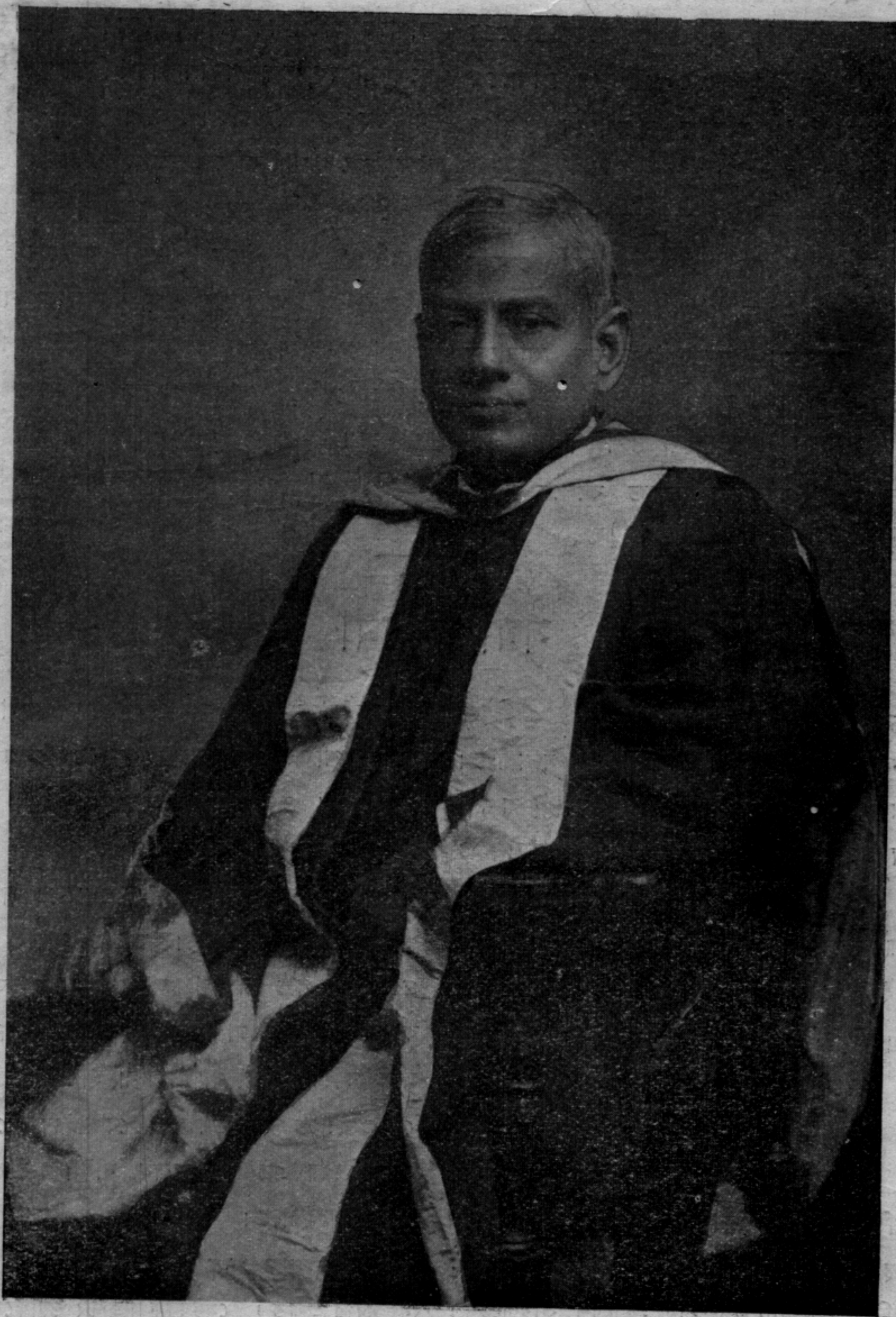
অনারেবল ডাক্তার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।

ইহা যে বুদ্ধিমানের কথা তাহাতে সন্দেহ নাই; বিলাত গিয়া সে দেশের লোকের সহিত মেলামেশা করিলে এদেশে ফিরিয়া শ্বেতাঙ্গদিগকে জুজু বলিয়া মনে হইবে না।

কোন কোন ইংরাজ প্রতিকূলে মত প্রদান কালে বলিয়াছিলেন যে ভারতবাসী সিভিল সার্ভিসের অনুপযুক্ত। এই কথা বলিবার পর প্রতিবাদের জ্বালায় তাঁহারা অস্থির হইয়া উঠেন। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তের জামাতা সিবিলিয়ান শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র গুপ্ত যেরূপ সতেজ যুক্তিপূর্ণ উত্তরে ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন তাহাতে বস্তুতই অন্ধেরও নয়ন ফুটে।

এইরূপ ঘোরতর অসন্তোষ ও বাদানুবাদের ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া— এবং শুনা যায় সদাশয় লর্ড কার্মাইকেলের ইচ্ছাতেই বিশেষতঃ—উক্ত মহাত্মাগণ তাঁহাদের বাক্য প্রত্যাহৃত করিয়াছেন। সুতরাং এক্ষেত্রে আমাদের যে জিৎ তাহাতে সন্দেহ নাই।

সংস্কৃত কলেজের উপাধি

বিগত ২৮শে জানুয়ারি—সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত পরীক্ষার উপাধি বিতরণ হইয়া গিয়াছে। অন্যান্য ছাত্রদিগের সহিত একটি ১৩ বৎসর বয়স্কা বালিকাও উপাধি ও প্রতিষ্ঠাপত্র লাভ করিয়াছে।

বালিকার পিতা শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ সেন, চট্টগ্রাম বিভাগের স্কুল ইন্‌স্পেক্টারের ক্লার্ক। বালিকাকে প্রতিষ্ঠা-পত্র প্রদানের সময় দর্শকবৃন্দ আনন্দসূচক করতালিতে তাহাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। আমরা ভারতীর ছত্রে নীরব আনন্দ প্রকাশ করিয়া পিতা পুত্রী উভয়কেই অভিনন্দন করিতেছি। আশা করি এই আনন্দ তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে সক্ষম হইবে।

যেদিন শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথের পন্থানুসরণ করিয়া অন্যান্য পিতৃগণও কন্যাদিগকে বিদুষী করিবার অভিলাষী হইবেন, একটি বালিকার স্থলে বহুসংখ্যক বালিকাকে যেদিন আমরা সংস্কৃত কলেজে উপাধি গ্রহণ করিতে দেখিব—সেদিন আমাদের কি পরমানন্দের দিন আসিবে।

সমালোচনা

চাণক্য-নীতিসার সংগ্রহ। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন সম্পাদিত। নিউ আর্য্যমিশন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দুই আনা। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে চাণক্যের অষ্টোত্তরশত শ্লোক বাঙ্গালা ও ইংরাজী অনুবাদ সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। চাণক্য শ্লোকের বাঙ্গলা অনুবাদের অভাব নাই, ইংরাজি অনুবাদই ইহার বিশেষত্ব।

জাতি-বিকাশ। শ্রীযুক্ত পীতাম্বর সরকার প্রণীত। কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা মাত্র। কৃষি, বাণিজ্য, পশুপালন ব্যবসায়ী হালদার, হলধর প্রভৃতি কৃষিবাচক নামধারী জাতিসমূহ যে বৈশ্যজাতির অন্তর্ভুক্ত তাহাই প্রমাণ করিবার জন্য এ গ্রন্থে লেখক শাস্ত্রাদির আদেশ ও বিবিধ সামাজিক রীতিনীতি ও ঐতিহাসিক তথ্যের সমাবেশ করিয়াছেন। বিষয় সন্নিবেশ ও আলোচনার পদ্ধতিটিও সুশৃঙ্খল, সুন্দর হইয়াছে; গ্রন্থে আগাগোড়া একটি ধারাবাহিকতা আছে। শাস্ত্রীয় এবং ঐতিহাসিক আলোচনায় লেখকের অনুসন্ধিৎসা ও গবেষণার পরিচয় সর্ব্বত্র। আপনার স্বাধীন মতও লেখক বহু প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, কল্পনার কুয়াশায় তথ্য কোথাও আবৃত করিবার চেষ্টা করেন নাই। ভাষাও প্রাঞ্জল হইয়াছে। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছি। শুধু জাতিতত্ত্ব বিভাগেই গ্রন্থখানি অমরত্ব লাভ করিয়া ক্ষান্ত থাকিবে না, ইতিহাস রচয়িতাকেও যে ভবিষ্যতে বহু উপকরণ যোগাইবে, সে বিষয়ে আমাদিগের এতটুকু সন্দেহ নাই। ছাপা কাগজ পরিপাটি হইয়াছে।

দেবেন্দ্র-মঙ্গল। শ্রীযুক্ত মোহিতমোহন মজুমদার প্রণীত। মেটকাফ্ প্রিন্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য এক আনা। এখানি কবিবর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ

সেনের কবিতাবলীর মাধুর্য্য-মুগ্ধ ভক্তের উচ্ছ্বাস-নিবেদন। রচনাটিতে কবিত্ব, শব্দৈশ্বর্য্য ও ভাবানুভূতির পরিচয় পাইলাম।

মর্ম্মভেদী। শ্রীমতী সুরেশ্বরী দেবী প্রণীত। 'বী' প্রেসে মুদ্রিত। শ্রীপ্রকাশচন্দ্র চত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য আট আনা। এখানি কবিতাগ্রন্থ, তরুণ পুত্রের অকালমৃত্যুতে শোকতপ্তা জননীর মর্ম্মোচ্ছ্বাস। পাঠে আমাদেরও মর্ম্ম বিদ্ধ হইল। ভগবান শোক-সন্তপ্তা জননীর চিত্তে শান্তি দান করুন, ইহাই আমাদিগের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

আদর্শ-ছাত্র-জীবন। শ্রীযুক্ত গৌরী-প্রসাদ মজুমদার প্রণীত। মূল্য ছয় আনা মাত্র। গ্রন্থকার প্রবীণ শিক্ষক—গ্রন্থখানি বাঙ্গালী ছাত্র-ছাত্রীগণের জীবন ও চরিত্র-গঠনকল্পে রচিত। গ্রন্থের বিষয় ভাল—তবে রচনায় রস নাই। ভাষা নিতান্তই কটমট। কবিতাগুলিও নীরস, নির্জীব।

রঙ্গমহাল। শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত। বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। সিদ্ধেশ্বর মেশিন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দেড় টাকা। গ্রন্থখানি গল্পপুস্তক, সচিত্র। ছয়টি গল্প ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থকার বিজ্ঞাপনে বলিয়াছেন, "ইতিহাস-পাঠে এদেশের লোকে বীতরাগ, কিন্তু ঐতিহাসিক গল্পপাঠে অনেকেরই অনুরাগ।" এগুলি "বাদসাহী রঙ্গমহালের সুখস্মৃতিজড়িত কয়েকটি আখ্যান।" তবে "গল্পগুলির মধ্যে ইচ্ছা করিয়া চরিত্রাঙ্কনের চেষ্টা" তিনি করেন নাই। "চিত্তরঞ্জন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য।" গল্পগুলির আখ্যানভাগে বেশ বৈচিত্র্য আছে, রোমান্স আছে। অথচ এই উপাদান-সত্ত্বেও গল্পগুলি হৃদয়ে একটা সুগভীর রেখাপাত করে না, ইহা প্রকৃত পক্ষেই পরিতাপের বিষয়। Mobকে তৃপ্তি দেওয়া ক্ষমতাপন্ন লেখকের কর্ত্তব্য নহে—তাঁহার কর্ত্তব্য, বৃহত্তর। গ্রন্থের ছাপা, কাগজ, বাঁধাই চমৎকার—ছবিগুলির অধিকাংশই সুন্দর।

সাবিত্রী-সত্যবান। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত। প্রকাশক শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়। এমারেল্ড প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য দেড় টাকা। (তৃতীয় সংস্করণ)। এই গ্রন্থলেখক উপন্যাসচ্ছলে সাবিত্রীর উপাখ্যান রচনা করিয়াছেন। ভাষার মধ্যে মধ্যে ব্যাকরণদুষ্ট পদ থাকিলেও রচনায় লেখক বেশ একটি সংযত সশ্রদ্ধ ভাব বজায় রাখিয়াছেন। সেটুকু এই সকল পবিত্র কাহিনীর বর্ণনায় প্রয়োজনীয় বলিয়া আমরা মনে করি। সত্যবানকে নিতান্তই রূপকথার রাজপুত্র ও সাবিত্রীকে নায়িকার ছাঁচে গড়িলে রসহানি হয়। লেখকের রচনাভঙ্গীতে আর্ট না থাকিলেও তাহা সরল, অনাড়ম্বর। "ভারতে সাবিত্রী একনিষ্ঠ মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেমের নামান্তর মাত্র"—সাবিত্রী আদর্শ সতী—"ভারতকল্পিত দাম্পত্যস্বর্গের অম্লান পারিজাত পুষ্প।" সেই সাবিত্রীর কাহিনী-বর্ণনায় সংযম ও ধর্ম্মের আদর্শ যে গ্রন্থকার বিস্মৃত হন নাই, ইহা যথার্থই আনন্দের কথা। গ্রন্থখানি আমাদিগের বালক-বালিকা ও অন্তঃপুরিকাবর্গের হস্তে অসঙ্কোচে উপহার দিবার মত হইয়াছে। গ্রন্থে অসংখ্য চিত্র আছে। চিত্রগুলি আর্টহিসাবে নিতান্তই ব্যর্থ হইয়াছে। গ্রন্থের বাঁধাইও উৎকৃষ্ট, ছাপা কাগজ সুন্দর।

শৈব্যা। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত। প্রকাশক শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়। ভিক্টোরিয়া প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দেড় টাকা। (দ্বিতীয় সংস্করণ)। ভারতের অন্যতমা আদর্শ মহিষী শৈব্যার কাহিনীটিও লেখক বেশ সহজ, প্রাঞ্জল ভাষায় উপন্যাসের ভঙ্গীতে বর্ণনা করিয়াছেন। এ গ্রন্থের রচনাতেও লেখকের সংযত সশ্রদ্ধ ভাবটুকু উপভোগ্য। এই ভাবটিই আমাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দ দান করিয়াছে। এ গ্রন্থখানিও অঙ্গসৌষ্ঠবে পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থের অনুরূপ এবং আমাদিগের বালকবালিকা ও অন্তঃপুরিকাবর্গের হস্তে উপহার দিবার পক্ষে উপযোগী হইয়াছে। কয়েকখানি চিত্র আছে—সেগুলি চলনসই।

রাক্ষস-রহস্য। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র মৈত্র প্রণীত। আতাইকুলা, রাজসাহী হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা, স্বর্ণ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ছয় আনা। গ্রন্থের নাম শুনিয়াই মনে যে কৌতূহলের সৃষ্টি হয়, গ্রন্থপাঠকালেও কোথাও তাহার এতটুক

ব্যতিক্রম ঘটে না। এই গ্রন্থে গ্রন্থকার বিশেষ নিপুণতার সহিত রাক্ষস যক্ষ প্রভৃতি ও রামায়ণের রূপক আগাগোড়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার মতের সহিত আমাদিগের মতের মিল না থাকিলেও, ব্যাখ্যাটুকু আগাগোড়া বেশ বিচিত্র ও কৌতূহলোদ্দীপক হইয়াছে। মহাভারত ও রামায়ণের সমস্ত কথাই কল্পিত; তাহাতে ঐতিহাসিক সত্য কিছুমাত্র নাই, সমস্তই রূপক, সমস্তই কল্পনা;—ইহাই গ্রন্থকারের প্রতিপাদ্য। একমাত্র রূপক ব্যাপার দোহাই দিলেই এ মত প্রতিষ্ঠিত হয় না, তাহার জন্য বিশেষ আলোচনা প্রয়োজন। গ্রন্থকারের ব্যাখ্যা ও যুক্তি স্থানে স্থানে কষ্ট-কল্পিত বোধ হইলেও তাঁহার অপূর্ব্ব কৌশল ও অনুসন্ধিৎসা দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। গ্রন্থকারের মতে রামায়ণ শুধু কৃষিকার্য্যের বর্ণনামাত্র! রাবণ অর্থাৎ যে মেঘ কেবল ঘোর গর্জ্জন করে, অথচ বারিবর্ষণ করে না। মেঘ গগনপথে বিচরণ করে বলিয়া রামায়ণে রাবণের গগনবিহারী পুষ্পক রথের উল্লেখ আছে। কুম্ভকর্ণ অর্থে অতিবর্ষণকারী মেঘ। বিভীষণ ভীষণ স্বভাবশূন্য সুবর্ষণকারী মেঘ। সূর্পণখা অর্থে ঝটিকা বাত্যা। সীতা কৃষি শ্রী। সীর অর্থে লাঙ্গল, সীর যাহার ধ্বজা, সে সীরধ্বজ (সীতার পিতা) হলধর কৃষক। হরধনু—হলধনু। সীতা অর্থে কৃষিলক্ষ্মী। যে হলধনু ভাঙ্গিতে সমর্থ, সেই সীতাকে পাইবে, সে নিশ্চয়ই বীর্য্যবান হইবে, তাহাকে অহল্যা অর্থাৎ কর্ষণের অযোগ্য ভূমির অপবাদ ঘুচাইতে হইবে। সীতাপতি বনে গেলেন, কৃষিশ্রী সীতাদেবীও তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। সীতাপতি মৃগয়াসক্ত হইয়া সীতাকে ছাড়িয়া যখন মায়ামৃগের অনুসরণ করিলেন, তখন আকর্ষণকারী ও অতিবর্ষণকারী মেঘস্বরূপ রাবণ কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি রাক্ষসগণের প্রভাবে সীতা অপহৃতা হইলেন ইত্যাদি। গ্রন্থের ভাষা ভাল।

ভগীরথ। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ঢাকা, ইষ্ট বেঙ্গল প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। ভগীরথ কর্তৃক মর্ত্ত্যে গঙ্গা-আনয়নের পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে গ্রন্থখানি রচিত। বইখানিতে বেশ একটি উপভোগ্য রচনা-কৌশলের অভাব। গ্রন্থের শেষে কৃত্তিবাস হইতে গঙ্গা-আনয়নের বর্ণনাটি উদ্ধৃত হইয়াছে। কয়েকখানি চিত্রও ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী। শ্রীমতী কুমুদিনী মিত্র বি,এ। প্রকাশক, শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী। নিউ আর্টিষ্টিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য একটাকা। মোগল বাদশাহ জাহাঙ্গীর রচিত রোজ-নামচা হইতে তদানীন্তন কালের বহু ঐতিহাসিক তথ্য অবগত হওয়া যায়। মূল গ্রন্থ পার্শীতে রচিত—মূলের ইংরাজী অনুবাদ হইতে এই গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছে। লেখিকার এই উদ্যম ও প্রয়াসের জন্য বঙ্গবাসীমাত্রেরই নিকট তিনি ধন্যবাদের পাত্রী। অনুবাদের ভাষা বেশ সরল ও সরস হইয়াছে, কোথাও তাহা আড়ষ্ট হয় নাই বা অনুবাদ বলিয়া মনে হয় না। ঘটনা পরম্পরার সন্নিবেশও সুশৃঙ্খল। গ্রন্থখানি বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাস-বিভাগের একটি কোণ যে সমুজ্জ্বল শ্রীতে উদ্ভাসিত করিয়াছে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। গ্রন্থখানি আগাগোড়া এমনই জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ যে পাঠে কৌতূহল উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে। গ্রন্থের ছাপা কাগজ ও বাঁধাই উৎকৃষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থে অনেকগুলি চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে বিবিধবর্ণমণ্ডিত স্বর্ণখচিত সাম্রাজ্ঞী নুরজাহানের চিত্রখানি উৎকৃষ্ট—বাঙ্গলা মুদ্রাযন্ত্রের পক্ষেও গৌরবের সামগ্রী হইয়াছে। বাঁধাইটিও অভিনব, মনোরম।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ১, সানি পার্ক বালিগঞ্জ হইতে, শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

Indian Press, Allahabad.

বিমান-চারিণী

৩৬শ বর্ষ]　　　　চৈত্র, ১৩১৯　　　　[১২শ সংখ্যা

ভারতী

বাগ্‌দত্তা

২৩

হেমন্তের শুভ্রজ্যোৎস্না ফুরাইয়া আসিয়াছে, আসন্ন শীতের আশঙ্কা জীবজগতের নিম্নোচ্চ সর্ব্বস্তরেই অল্প বিস্তর প্রকটিত। গৃহস্থ রমণীরা সম্বৎসরে সঞ্চিত বিচ্ছিন্নবস্ত্র বিছাইয়া রঙ্গিন সূত্রদ্বারা ত্বরিতহস্তে তাহার উপর বিচিত্র কারু কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। তখন পল্লীগ্রামে জার্ম্মাণীর সস্তা র‍্যাপারের বিপুল আমদানী হয় নাই; অল্প শীতের জন্য ঘরে ঘরে—বিশেষতঃ যে সকল ঘরে কচি ছেলে আছে সে বাড়ীতে নূতন কন্থার প্রচুর আয়োজন হইয়া থাকে।

শুক্লপক্ষ চলিয়া যায়, নূতন চালে নূতন গুড়ে নবান্ন ক্রিয়া সাঙ্গ হইয়া তখন ঘরে ঘরে বড়ি দিবার শঙ্খধ্বনি উঠিতেছে, প্রতি ছাদে শুভ্রবস্ত্রে দূর্ব্বাসিন্দূরসজ্জিত কুমড়া কোরার "বুড়াবুড়ি" দোদুল্যমান। পল্লী-বালকগণ এখানে সেখানে জড় হইয়া তালের ফল কাটিয়া খাইতেছে, কালীপূজার অবশিষ্ট দুএকটা তুবড়ি বা আছাড়ে-পটকার শব্দে সীতারাম, প্রতাপাদিত্যের আমল চকিত স্মরণ করাইয়া দিতেছিল।

গৌরীর বিবাহ আসন্ন,—ভট্টাচার্য্যগৃহে তাহার আয়োজন চলিতেছে। পাড়াপড়সীরা অবসর মত জুটিয়া বাড়ীর লোকের সহিত ডাল বাছিতেছে, সুপারিকর্ত্তন, সলিতাপাকান, মসলা ঝাড়া প্রভৃতি সমুদয় খুঁটিনাটি কাজ গুলা সারিতে সারিতে গল্পের মজলিস জাঁকাইয়া তুলিয়াছে। যে যেমন লোক সাধ্যমত সকলেই কিছুনা কিছু সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত ছিল না, পুরোহিতগৃহের কর্ম্মে সকলেরই হাত পড়া চাই!

বিন্ধ্যবাসিনীর আজকাল অবসর বড়ই সংক্ষেপ হইয়াছিল, ঘরের কাজও বিবাহের কাজ কোনটাই কম নহে। তথাপি তাঁহার মৌন হৃদয়ে কি যে একটা শতমন ভার চাপিয়া আছে সে পাষাণখানা যেন কোন মতেই নড়িতে সরিতে চাহে না, চোখের জলে ক্ষণে ক্ষণে জ্বলন্তচুল্লী হাঁড়ি কুঁড়ি সমেত ঝাপ্‌সা হইয়া ওঠে।

গৌরী নিজের বিবাহের বিরুদ্ধে যথেষ্ট বিদ্রোহিতা করিয়া এখন হাল ছাড়িয়া দিয়াছিল। উৎসবের আয়োজনটা তাহাকে হয়ত বিবাহ বস্তুটা সম্বন্ধে একটু কৌতুহলীও করিয়া থাকিবে।

যেদিন পাত্রকে আশীর্ব্বাদ করা হইবে সেই দিন হইতে চতুর্থ দিবসের প্রথম প্রহরে বিবাহ লগ্ন। গৌরীকে সে দিন কোন শাসনই আটক

করিতে পারিল না। এক সময়ে সে কাঁধের ছেলেটাকে ভূমে নামাইয়া কর্ম্মে ব্যস্ত অভিভাবিকাদের মাঝখান হইতে চুপি চুপি সরিয়া পড়িল, "না হয় একটু বকুনি খাব তা বলে বুঝি আমি চব্বিশ ঘণ্টা বন্ধ থাকব তা আমি পারব না।" নিজের মনে এই কথা বলিয়া সে পিছনের গলিটা ঘুরিয়া আঁদাড় পাঁদাড় ভাঙ্গিয়া খানিকদূরে তেমাথার পথে বড় রাস্তা ধরিল। দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে তখন চারিদিক ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, রাজপথ প্রায় জনহীন, কেবল একটা গৃহস্থ গৃহের দ্বারে দাঁড়াইয়া একজন ভিন্নগ্রামের ভিক্ষার্থী খঞ্জনী বাজাইয়া গাহিতেছিল --

"কোথায় ছিলি ও নীলমণি! আয়রে বুকে আয়, নয়নমণি হারিয়ে আমার নয়ন জলে বুক ভেসে যায়, সদা নয়ন জলে বুক ভেসে যায়।"

গৌরী সহসা তাহার পিছনে খুব নিকটে উচ্চারিত হইতে শুনিল, "উমাকান্ত সার্ব্বভৌম মহাশয়ের বাড়ী কোন্ দিকটায় বল্‌তে পার মা!" সে এই মাতৃসম্বোধনে নিজেকেই সম্বোধিত বোধে ফিরিল, কিন্তু পথে বাধা প্রাপ্ত হওয়ায় একটু ভীতও হইল, এখনি কেহ দেখিলে বাড়ীতে খবর দিয়া দিবে। কয়েদ-খালাসা দাগীচোরের উপর পুলিশ যেরূপ সন্দেহসতর্ক দৃষ্টি রাখে পাড়াশুদ্ধ লোকে আজকাল এই বিবাহপণবদ্ধা মেয়েটির উপর তেমনি করিয়া পর্য্যবেক্ষণ দৃষ্টি রাখিয়াছে। গ্রামের নিকটবর্ত্তী বর, পাড়ার মেয়ের নিন্দা উঠিয়া বিবাহ ভাঙ্গিলে সবার পক্ষে অপমান। তাই স্বেচ্ছাসেবকশ্রেণীভুক্ত নরনারীগণ বড়বধূর গুপ্তচরের কাজ লইয়াছেন। এক একজনের খবর গিয়া পৌঁছিতেছে একবার করিয়া তাহার উপর লাঞ্ছনার ঝড় বহিতেছে। যাহারা সর্ব্বদা তিরস্কার সহে তাহাদের ইহাতে অপমান বোধ কমিয়া যায়, গৌরীর পক্ষেও তাহাই হইয়াছিল। যত গঞ্জনা বৃদ্ধি পাইতেছিল ততই সে অধিকতর 'মরিয়া' হইয়া উঠিতেছিল।

যে ব্যক্তি পিছন হইতে তাহাকে সম্বোধন করিয়াছিলেন, তিনি একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক বেশভূষার সযতন পারিপাট্য না থাকিলেও প্রথম দৃষ্টিতে তাঁহাকে সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর লোক বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। ললাটে চিন্তার ছায়া রেখাকারে ফুটিয়া উঠিয়াছিল এবং উচ্চ হৃদয়বৃত্তির চিহ্নব্যাপ্ত উজ্জ্বল নেত্র তারকার মধ্যেও সেই সুগভীর চিন্তা বিষণ্ণতাকারে স্পষ্ট ব্যক্ত হওয়ায় একটি গাম্ভীর্য্যময় পবিত্রতায় দর্শককে একমুহূর্ত্তে ইঁহার প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ ও সহানুভূতিসম্পন্ন করিয়া তুলে। গৌরী দেখিল এ ব্যক্তি তাহার অপরিচিত! বোধ হয় ভিন্‌গাঁয়ের লোক হইবে, নহিলে তাহার অচেনা হইত না। নূতন লোক কে তাহার দাদামহাশয়ের নাম করিয়া বাড়ী খুঁজিতেছে? একবার ইচ্ছা হইল ভুল পথ দেখাইয়া দেয়; কিন্তু তখনি লজ্জা হইল; দাদামহাশয় মিথ্যা বলিতে কত নিষেধ করিয়াছেন, সে দক্ষিণ অঙ্গুলি প্রদর্শন করিয়া ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিল "এইদিকে।"

আগন্তুক প্রথমে মেয়েটির দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখেন নাই, এখন মাথা তুলিয়া কহিলেন "অনেক দিন আসি নি কি না, পথ ঠাহর করতে পারছিলাম না। তাঁরা এখানে আছেন তো?"

গৌরী পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসিত হওয়ায় বিরক্ত হইল, এখনি কে আসিয়া পড়িবে—আজ তাহার ভাগ্য নিতান্তই মন্দ। তথাপি মনে একটা কৌতূহল জাগিল এবং তাহার কেহ নয় বুঝিয়া প্রসন্ন চিত্তে কহিল "আপনি তাহলে অনেক দিন আগে এখানে আসতেন, দাদুতো এখন এখানে থাকেন না, শুধু বড় মামা থাকেন। তিনিও আজ বাড়ী নেই!"

আগন্তুক সেই অবধি স্থিরনেত্রে তাহার মুখের দিকেই চাহিয়া আছেন, গৌরী চোখ তুলিতেই তাঁহার দুইনেত্রতারকা ঈষৎ স্পন্দিত হইয়া উঠিল, চোখ নত করিয়া একটু দুঃখিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি—ভক্তিনাথ কোথা গ্যাছেন?"

"তিনি—"বলিয়া গৌরী একটু থামিল "সে একটা কাজে গেছেন।" বলিয়াই সে হঠাৎ হাসিয়া ফেলিল। শীঘ্রই আসবেন, আসুন না আমি বাড়ী দেখিয়ে দিচ্চি—বলিতে বলিতে গলিটার মধ্যে অগ্রসর হইল!

আগন্তুক আর কিছু বলিলেন না, নীরবে তাহার পশ্চাদনুসরণ করিয়া কি যেন একটা বহুদিনের স্মৃতিকে বিস্মরণ হইতে টানিয়া আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যেন কি একটা মনে পড়িতেছিল, অথচ সম্পূর্ণ স্মরণও হইতেছিল না।

সহসা গৌরী তাহার কাঁধের উপর কাহার মৃদুস্পর্শ অনুভব করিয়া ফিরিল।

আগন্তুক উৎসুকনেত্রে চাহিয়াছিলেন, সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি সেই বাড়ীর মেয়ে? কি বল্লে মা,—সার্ব্বভৌম মশাই তোমার কে হন?"

"দাদু? আমার দাদামশাই হন।"

"ভক্তিনাথ তোমার মামা বল্লে বুঝি?"

"হ্যাঁ।" বলিয়া গৌরী একটু দ্রুতপদে চলিল, দূর হইতে বাড়ীটা দেখাইয়া দিয়া সে সরিয়া পড়িতে পারিলে বাঁচে। আগন্তুকও তাহার দেখাদেখি নিজের মৃদুগতি একটু বর্দ্ধিত করিয়া তাহাকে অনুসরণ করিতে লাগিলেন, মধ্যে মধ্যে তিনি দু চারিবার চোখ তুলিয়া তার পানে চাহিতেছিলেন। কয় মুহূর্ত্ত পরেই এবার তিনি পুনশ্চ কহিলেন "তাহলে তুমি ভটচায্যি মশায়ের দৌহিত্রি?" "দৌহিত্রী" বলিতে কি বুঝায় সেকথা বালিকা জানিত না, সে নীরব রহিল—গতি একটু হ্রাস করিয়া ঈষৎ ঘাড় ফিরাইয়া প্রশ্নকর্ত্তার দিকে একবার কটাক্ষপাত করিল,—তাঁহার ব্যগ্রদৃষ্টির মধ্য হইতে একটা ব্যাকুল স্নেহের ক্ষুধা ব্যক্ত হইতেছিল। তিনি তাহাকে ফিরিতে দেখিয়া হঠাৎ গতি বন্ধ করিয়া তাহার একখানা ক্ষুদ্র হাত নিজের হস্তে ধারণ করিলেন "তোমার নাম কি?"

অপরিচিতের এ ব্যবহার গৌরী হেন মেয়েকেও বিস্মিত করিয়াছিল, সে আশ্চর্য্যে দুই চোখ তাঁহার মনোদ্বেগচঞ্চল মুখের উপর স্থাপন করিয়া উত্তর করিল "গৌরী।"

আগন্তুক তাহার সেই হাতটা চাপিয়া ধরিয়া একটা গভীর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া যেন আত্মগতই কহিয়া উঠিলেন "তাহলে বিন্ধ্যার মেয়ে!"

তাঁহার কণ্ঠস্বরের প্রচুর কম্পনে উদ্বেলিত হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া গেল। অপর কোন মেয়ে হইলে হয়ত এরূপ ব্যবহারে একটু ভীত হইত, কিন্তু গৌরীর মনে ভয়ের লেশ

ছিল না, সে তৎক্ষণাৎ কহিয়া উঠিল "নাতো, আমিতো বিন্ধ্যর মেয়ে নই, তিনি মাসিমা।"

আগন্তুক যেন একটা তাড়িতাঘাত প্রাপ্ত হইলেন, চমকিয়া বালিকার হাত ছাড়িয়া তিনি তাহার মুখের উপরে ব্যাকুলনেত্রে চাহিলেন, "তবে তোমার মা কে ?"

"মা! আমার মা নেই।" এই কথা অতি অগ্রাহ্যভাবে বলিয়াই গৌরী অপরিচিতের পুনঃ প্রশ্নের পূর্ব্বেই আবার কহিল "সব্বাই বলে,—আমি জন্মেই আমার মাকে খেয়ে ফেলেচি। দাদু বলেন "মানুষ কি মানুষকে কখনও খেতে পারে ? মা—স্বর্গে গ্যাছেন।"

আগন্তুকের সর্ব্বশরীর কে জানে কি অনির্দ্দেশ্য আবেগে থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল; তিনি নিজের উভয় হস্ত মর্দ্দন করিয়া যেন একটা দুরাশাপূর্ণ সুগভীর মানসিক আলোড়নকে সুস্থির রাখিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। একটু পরে আবার একবার তাহার রৌদ্রতপ্ত রক্তিম মুখখানির প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন "তোমার মা নেই—বাবা আছেন ?"

"উঁহু" বলিয়া গৌরী সবেগে ঘাড় নাড়িল, "আমার বাবা কক্ষণই ছিলেন না। বড় মামী বলেন, বাপ যে থেকেও নেই, তা নৈলে পরের আপদ আমরা কেন পোহাই! কে জানে বাপু, আমিতো জানিনা বাবা কোথায় আছেন, থাকলে বোধহয় ভাল হত। ঐ দেখুন বেল্‌তলার পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা গ্যাছে ওরই সাম্‌নে ওই বাড়ীটা।" এই বলিয়া যেমনি সে গমনোদ্যত হইয়া পিছন ফিরিতে গেল, অমনি দুইটি ব্যাকুল বাহুপাশ তাহাকে বেষ্টন করিয়া ফেলিয়া একটি অশ্রুমথিত রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে তাহার বিস্মিত কর্ণকুহর ধ্বনিত করিয়া কহিল "মা, মা আমার, আমিই তোর অভাগা বাপ।"

২৪

নন্দকিশোর লাহিড়ী উমাকান্ত সার্ব্বভৌম মহাশয়ের প্রথম জামাতা, দূরপশ্চিমে সরকারী ডাক্তার হইয়া প্রথম যাত্রাকালে বালিকা পত্নীকে সঙ্গে লইয়া যান নাই, কিন্তু দীর্ঘ দুই বৎসর পরে দেশে ফিরিয়া আত্মীয় বন্ধুদের অনেক নিন্দাতিরস্কার অগ্রাহ্য করিয়াই তিনি তাহাকে নিজের সমভিব্যাহারে লইয়া গেলেন, তখন সবেমাত্র সে চতুর্দ্দশ বৎসরের কিশোরী।

একে বালিকা তাহাতে পল্লীগ্রামের মেয়ে কাদম্বিনী তাহার নিঃসঙ্গ বাসাঘরে শঙ্কিত ম্রিয়মান হইয়া রহিল। স্বামী সর্ব্বদাই বাহিরে থাকেন, রাত্রেও হয়ত ধনাঢ্য রোগীর আত্মীয়জন চতুর্গুণ ফি হাঁকিয়া তাঁহাকে আটক করে,—বালিকা তাহার দাসীর বিছানার দিকে ক্রমেই সরিয়া সরিয়া আসে। ইহাতে কি কিছু সুখ আছে ? যে সকল দাসী চাকর লইয়া সারাদিন ও অধিকাংশ রাত্রি কাটাইতে সে বাধ্য হয় ইহাদের একটি কথাও সে বোঝে না। 'চিরুণি' আনিতে বলিলে ইহারা (চেটাই বুঝিয়া) মাদুর লইয়া আসে, 'নাউ' কিনিতে আদেশ দিলে' নাপিত ডাকিয়া আনে। সে হাসিবে কি কাঁদিবে স্থির করিতে পারে না। তখন সে সকল স্থানে বাঙ্গালী পরিবারের সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল। সঙ্গহীনতায় কাদম্বিনী ব্যাকুল হইয়া উঠিল। একটা বাংলা শব্দ,

পরিচিত একটা মুখ চাহিয়া তাহার প্রাণটা যেন হাহা করিয়া উঠিতেছিল। এমন সময় তাহার একটি সঙ্গী জুটিল। একটি নবপ্রসূতা কন্যা লইয়া এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পরিবার একটি সরকারী কর্ম্ম উপলক্ষ্যে তাহাদের প্রতিবেশী হইয়া আসিল, মেয়েটি সবে এক মাসের। এই সময় একটা অভাবনীয় ঘটনায় অকস্মাৎ অনেকখানি উলোট পালট হইয়া গেল,—কাবুলে তখন ইংরাজদের সহিত আফ্‌গানদের যুদ্ধ চলিতেছে, মিরাটেও সে যুদ্ধের অল্প বিস্তর ঢেউ আসিয়া পৌঁছিতেছিল, হঠাৎ সংবাদ আসিল অস্ত্র-চিকিৎসা-নিপুণ একজন চিকিৎসক অবিলম্বে চাহি। 'নন্দকিশোর' এদেশীয় লোক হইলেও তাঁহার অস্ত্রবিদ্যার যশ ইতিমধ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, তৎক্ষণাৎ যুদ্ধযাত্রী সৈন্যদলে যোগ দিবার আদেশ আসিল। এ নিয়োগ সমস্ত বাঙ্গালীর দিক হইতে গৌরবের সন্দেহ নাই, কিন্তু মানুষের অবস্থাই তাহার সবচেয়ে বড় শত্রু, উচ্চপদ সম্মান অভিজ্ঞতা অর্থ সবই তিনি পাইতে পারেন সত্য কিন্তু যে আজ তাঁহার এই সকল আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্র তাহাকে তিনি যে একেবারে ভাঙ্গিয়া যাইবেন! আসন্নসন্তান-সম্ভবা পত্নীকে কাহার নিকটই বা রাখিয়া যাইতেছেন! একটা মানুষের মত মানুষও এখানে নাই। প্রতিবেশিনী সেই ব্রাহ্মণ কন্যার মৃত্যুতে তাহার স্বামী শিশুটিকে লইয়া একান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। কাদম্বিনী শিশুকে লইলে তিনি ছুটি লইয়া চলিয়া গিয়াছেন। নন্দকিশোর ভাবিয়া দিশাহারা হইলেন।

কাদম্বিনী সব শুনিল, শুনিয়াই সে স্বামীকে দুই হস্তে জড়াইয়া ধরিল। একটি কথাও সে মুখে উচ্চারণ করিল না কেবল নীরব অশ্রু ধারায় তাহার বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কে যেন তাহাকে বলিয়া দিল এই শেষ!

উপায় নাই, উপায় নাই, এই নির্ভর বাহুপাশ ছিন্ন করিয়াই যাইতে হইবে। জীবন্ত শরীরে তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাত করা যাহার নৈমিত্তিক কার্য্য প্রেমপূর্ণ কোমল অন্তঃকরণে ব্যথাদান তাহার প্রাণে ল্যান্সেটের চেয়েও অধিক বিঁধিল। কিন্তু এখন কর্ম্মত্যাগ ছুটী কোন কিছুরই উপায় নাই! নন্দকিশোর নিজের দিক হইতে নিরাত্মীয়; শ্বশুরালয়ে তারের সংবাদ পাঠাইয়া আহতবক্ষে আহতের শিবিরোদ্দেশে যাত্রা করিলেন। কাদম্বিনীর অবস্থা বর্ণনার চেষ্টা না করাই ভাল।

নন্দকিশোরের প্রেরিত সংবাদ যখন ভট্টাচার্য্য গৃহে পৌঁছিল তখন ভক্তিনাথ ও ভট্টাচার্য্যমহাশয় তাঁহার কনিষ্ঠ জামাতার রোগশয্যার পার্শ্বে উপবিষ্ট। শিবনারায়ণ সে সময় কলিকাতায় নিজের কর্ম্মস্থানেই থাকিতেন। বিদ্যুৎ নিজ গতিতে বার্ত্তাবহন করিয়া আনিলেও তাহা সাধারণের গোচর হইল না এক পাশে ধূলা মাখা হইয়া কাগজখানা পড়িয়া রহিল।

সব চুকিয়া বুকিয়া গেলে সপুত্র সার্ব্বভৌম মহাশয় তেমনি শান্তভাবে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। ভিতরে উচ্চ ক্রন্দনের রোল উঠিল। ভক্তিনাথ উভয় জানুর মধ্যে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। উমাকান্ত নয়ন মুদ্রিত করিয়া কহিলেন "ব্রহ্মময়ি মা!" তারপ্রেরণের মাসাধিক পরে ভক্তিনাথ

ডাক্তার বাবুর শূন্য গৃহদ্বারে আসিয়া ডাকিলেন "কাদূ!" কে কোথায়! ভিতর হইতে রোরুদ্যমানাশিশুক্রোড়ে হিন্দুস্থানী দাই আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল,—তাহারাই এই মাতৃত্যক্তা অপগণ্ডটিকে পালন করিতেছিল। দুদিনের মধ্যে সেখানকার পাট উঠাইয়া ভক্তিনাথ ক্ষুদ্র শিশুবক্ষে ফিরিয়া আসিলেন। সংবাদ লইয়াছিলেন নন্দকিশোরের এখন ফিরিয়া আসা সম্ভব নয়। দুচারখানা পত্র ও টেলিগ্রাম পাঠানও হইয়াছিল কিন্তু কোনও প্রত্যুত্তর ফিরিয়া আসে নাই।

ইহার পর হইতে তাঁহাদের পক্ষ হইতে সকলেই গৌরীর পিতার আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন। সকলেই বুঝিয়াছিলেন ধনী নন্দকিশোর বন্ধন কাটাইয়া নূতন সুখে নবীন জীবন উপভোগ করিতেছেন, তাঁহার নাগাল পাওয়া যাইবে না। কিন্তু হায় বুঝিবার ভুল কত সময় এমনই সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়ায়!

আফগান যুদ্ধের কামান গর্জ্জন শুনিতে শুনিতে সে সময় নন্দকিশোর নিজের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া ভাবিতেছিলেন, এতদিনে হয়ত কাদম্বিনী তাহার নবপ্রসূত সন্তানের মুখে তাহারই ছায়া দর্শন করিয়া একটু শান্ত হইয়াছে। পিতা ভ্রাতা নিশ্চয় এতদিনে তাহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইতে আসিয়াছেন।

কার্য্যে সুদক্ষতার জন্য যশ মান ও ধন দ্বারা পুরস্কৃত নন্দকিশোর যখন মিরাটে ফিরিল তখন তাহার অধিকৃত গৃহে অন্য একজনদের বিবাহের বাদ্য বাজিতেছে। প্রতিবাসীগণ সংবাদ দিল তাহার এখান হইতে যাওয়ার এক মাসের মধ্যেই তাহার স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছিল, সে আজ প্রায় পাঁচ ছয় মাসের কথা। পত্নীর মৃত্যুর পর একটি মেয়েকে একটি লোক আসিয়া লইয়া গিয়াছেন, অপরটি কাদম্বিনীর মৃত্যুর দুইদিন পূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। হয়ত বা সেইটিই তাহার সন্তান। নন্দকিশোরের মনে এই কথাটাই সম্ভব ঠেকিল, যে মেয়েটিকে কাদম্বিনী পালন করিতেছিল তাহার পিতা আসিয়া নিশ্চয়ই তাহাকে লইয়া গিয়াছেন। ছুটীর দরখাস্ত ছিঁড়িয়া ফেলিয়া তিনি নিজের কাজে ফিরিয়া গেলেন। ইহার পর হইতে তাঁহার মুখে কেহ কোনদিন হাসি দেখিতে পায় নাই, লোকে বলিত ক্রমাগত হাড়ের উপর ইস্পাত চালাইয়া মানুষটাও ঐ দুইটা জিনিষেরই মত কঠিন হইয়া গিয়াছে।

অকালবৃদ্ধ নন্দকিশোর পেন্‌সন লইয়া বৎসর দুই কলিকাতায় আসিয়া বসিয়াছেন, ইতিমধ্যে তাঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহার হাতযশের খ্যাতি সুপ্রচারিত হইতে বিলম্ব হয় নাই, আকাঙ্ক্ষাহীন ধনে ঘর ভরিয়া উঠিতেছিল।

রাণাঘাটে রোগী দেখিয়া ফিরিবার সময় সেই কৈশোরযৌবনের স্মৃতিপূর্ণ গৃহ আজ তাঁহাকে এই পথে টানিয়া আনিল। কাদম্বিনীকে তিনি তো এই গৃহ হইতেই একদিন তাঁহার পাশে তুলিয়া লইয়াছিলেন ইহা তাঁহার পুণ্যস্মৃতির পবিত্র তীর্থ।

নন্দকিশোর যখন গভীর আবেগে তাহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া কহিলেন "আমি তোমার বাপ" তখন এই অপরিচিত শব্দটা গৌরীর কাণে ঘোর উপহাসের মত ঠেকিল। সে একটুখানি আড়ষ্ট থাকিয়া ঈষৎ বিস্মিত ও

বিরক্ত ভাবে অপরিচিতের বাহু ঠেলিয়া কহিয়া উঠিল "আমার বাপ নেই তুমি ও রকম কেন করচো? পাগল নও তো?" চকিত-নেত্রে চারিদিক চাহিয়া দেখিল—মনে মনে একটু ভয় ভয় করিতেছিল যদি সত্যই সে উন্মাদ হয়।

নন্দকিশোর ধীরে ধীরে তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন, তাঁহার মুখে মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণার চিহ্ন বর্ণে বর্ণে ফুটিয়া উঠিয়া তাহা যেন বেত্রাহত অপরাধীর মুখের মত দেখাইল।

গলির মোড়ে দুইজন লোক প্রবেশ করিল; তাহাদের দিকেই ক্রমশ অগ্রসর হইতেছিল। নন্দকিশোর সেদিকে লক্ষ্য মাত্র করেন নাই, তিনি যেমন তেমনি দাঁড়াইয়া ছিলেন; তাঁহার প্রসারিত বাহুদ্বয় অবসন্ন ভাবে দুই পার্শ্বে ঝুলিয়া পড়িয়াছিল, অবসাদে ও গভীর বেদনায় মস্তক অবনত হইয়া পড়িয়াছে। পথিকদ্বয় নিকটবর্ত্তী হইল—একজন ভক্তিনাথ অপর ব্যক্তি তাঁহার একটি ছাত্র। ভক্তিনাথ নিকটে আসিতে গৌরীর উপর দৃষ্টি পড়িতেই তিনি বিষণ্ণতার মধ্যেই একটু কৌতুকভাবে মৃদু হাসিয়া কহিলেন "গৌরি তোর শাপেই আজ আমাদের অম্‌নি ফিরতে হলোরে, তোর শ্বশুরের অসুখ করেচে—কে, নন্দকিশোর বলেই যেন—"

"চিন্‌তে পারচো ভক্তিনাথ, অভাগা তার পৃথিবীর একমাত্র আত্মীয়ের কাছেও আজ অপরিচিত—"

গৌরী কলের মত আগন্তুকের নিকটে ঘেঁষিয়া আসিয়া তাঁহার বিশাল বক্ষে ক্ষুদ্র মস্তকটি রাখিল, অজানা মনোবেগে কম্পিত স্বরে ডাকিল "বাবা!"

২৫

পৃথিবী সচলা, তাহার সুখদুঃখও সচল। তালে ছন্দে বাঁধা জগতের নিয়ম সমূহ কখনও তাল কাটাইয়া চলে না, কখনও তাহা তারায় উঠে কখনও উদারায় আবার কখনও মুদারায় নামিয়া বহিয়া যায়। গৌরীর ভাগ্যচক্র এক সময় নীচের দিকে নামিয়াছিল তাই বুঝি এবার উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে!

ভক্তিনাথ কহিলেন "নীলমাধব পীড়িত, শুনে এলাম তার স্ত্রী বলেচেন বিয়ের কথাতেই যখন বাড়ীতে রোগ ঢুকেচে তখন ও অপরা মেয়েকে ঘরে আনা হতে পারে না।"

নন্দকিশোর তখন বেশি কথা বলবার শক্তি ফিরিয়া পান নাই কেবল কন্যার দিকে চকিত নেত্রপাত করিয়া সংক্ষেপে কহিলেন "ক্ষতি কি!"

ভক্তিনাথ কহিলেন "এখন মনে হচ্চে মঙ্গলময় ঈশ্বর কি মঙ্গলই ঘটিয়েচেন। তোমার কন্যাকে তুমি যোগ্যপাত্রে দিও ভাই, আমি কি করতে পারছিলুম।"

ভক্তিনাথের কণ্ঠ সজল! নেত্রে রুদ্ধ আনন্দাশ্রু! নন্দকিশোর তাঁহার বাহুর উপর হস্ত রাখিয়া গভীর স্বরে কহিলেন "তুমিই সব করেচ ভট্‌চায, তুমি ওকে না আন্‌লে ও কোথা যেত!" বলিতে বলিতে সেই ভয়াবহ কল্পনা মনে করিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন।

বিন্ধ্যবাসিনী ভগিনীপতিকে কঠিন তিরস্কার করিতে আসিয়া তাঁহার অজস্র অশ্রুজলের স্রোতে বান ডাকাইয়া বসিলেন, আহা এ অবস্থায় আর কি কিছু বলা যায়! শেষ কালে চোখের জল শুখাইয়া গেলে নন্দকিশোর

কহিলেন "যাহোক বিন্দু এখন তোমার মেয়েটিকে নিয়ে যে একবার ওদিকে যেতে হচ্চে বোন! তার কি ঠিক করলে বল?"

বিন্ধ্যবাসিনী যে এ সম্বন্ধে কিছুই স্থির না করিয়া নিশ্চিন্ত আছেন তাহা নয়। বড় বধূ ইতি মধ্যেই এ বিষয়ে একটু চিপ্‌টান্ কাটিয়া রাখিয়াছেন, 'হলো ভাল; ঠাকুরঝি দিনকতক বোনাই বাড়ীর গিন্নিপনা করে আসচেন বোধ হয়?" এই মন্তব্য ভাই ভগিনী কাহারও ভাল লাগে নাই, ভক্তিনাথ তখনি উত্তর দেন, "তাই বা ও যেতে গেল কেন?"

বড় বধূ ঠোট টিপিয়া কহিলেন "তা গেলই বা গরীবের ঘরের চেয়ে বড় মানুষের আঁস্তাকুড়টাও ভাল।"

বিন্ধ্য নিজের মনে এই নিশ্চিত আমন্ত্রণের উত্তর ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন, অঞ্চল প্রান্তটা অন্যমনস্কভাবে পাকাইতে পাকাইতে কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া উত্তর দিলেন, "এখন নয় যখন গৌরীর বে দেবে তখন আমায় নিয়ে যেও, এখন নয়।" কথাটা যেন একটা গভীর দীর্ঘ শ্বাসের মত শুনাইল সুখ এবং বেদনা উভয়ই ইহার মধ্যে তুল্যাংশে মিশ্রিত।

নন্দকিশোর ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন "তাহলে কেমন করে আমি ওকে তোমার কাছ থেকে নিয়ে যাই! ওতো তোমারই—"

"পোড়াকপাল! আমার হয়ে তার তো সবই হয়েচে এমন মান্‌ষের আবার মেয়ে! তোমার ধন তুমি নিয়ে যাও ভাই,—"

উচ্ছ্সিত বেদনাভরা সুখে বিন্ধ্যবাসিনী রুদ্ধবাক্ হইয়া রহিলেন। হায় স্বার্থান্ধ মানবের হৃদয়! নিজেকে সে যে বলি দিয়াও ফিরিয়া পাইতে চাহে! অহংকে দলিত কীটবৎ পদতলে চাপিয়া ধরিলেও সে মরে না।

বড়বধূ ঘরের সবচেয়ে ভাল আসনখানা পাতিয়া ঠাকুরজামাইকে খাওয়াইতে বসিয়া ঘন ঘন পাখার বাতাস দিয়া কহিলেন "নেবাও ভাই তোমার জিনিষ তুমি নে যাও, মা-খেকো-মেয়ে একরত্তি থেকে বুকে করে মানুষ করা—যতন টতন করো! আমাদের প্রাণ কাঁদচে, পরের মেয়ে জোর তো নেই, শুধু এতকাল করে মরাই সার! দেখ না বিয়ের নামেই কি ছরকোট! প্রায় দু তিন শো টাকার জিনিষ পত্তরই কেনা হোল।"

নন্দকিশোর কহিলেন "সেকি কথা আপনাদের জোর নেই! সে বরং আমারই! দয়া করে দিচ্চেন তাই দুদিন নিয়ে যাচ্চি, যখনই আদেশ করবেন তখনই আমি ওকে আপনাদের চরণদর্শন করতে আন্‌বো। আপনাদের ঋণ কি শোধ হয়!"

পরদিন অতি প্রত্যূষে পাড়ায় পাড়ায় প্রচারিত হইয়া গেল সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিরুদ্দিষ্ট জামাতা এতকাল পরে হঠাৎ মেয়ে দেখিতে আসিয়াছেন। এবং শুধু তাহাই নয় এই নন্দকিশোর লাহিড়ী টাকার ছালা সঙ্গে করিয়া সেই অজানা দেশ হইতে ফিরিয়াই কন্যার এক রাজপুত্রের সহিত বিবাহ স্থির করিয়া এই গরীব ঘরের সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। বরপক্ষ এ সংবাদ শুনিয়া একজন লোক পাঠাইয়া দিলেন।

যেমন উৎসাহে লোকে শারদা-গৌরী প্রতিমা দেখিতে আসে তেমনি দলে দলে পাড়ার মেয়েরা গৌরীকে দেখিতে আসিল, উৎসাহে তখন আর কাহারও মনে ছিল না সে একটি

দুর্দ্দান্ত অশিষ্ট গ্রাম্য বালিকা। ধনী পিতার আদর তাহার উপর যেন একটা স্ত্রী এবং শ্রীর খোলস পরাইয়া দিয়া সাত রাজার ধন মাণিকটুকুর মত তাহার মূল্য বাড়াইয়া দিয়াছিল।

করুণাময়ীর দাসী আসিয়া তাঁহাকে কমলার সনির্ব্বন্ধ নিমন্ত্রণ জানাইয়া গেল, সেও শুনিয়াছিল, গৌরী পরদিন পিতার সহিত চলিয়া যাইবে। মানুষের মনে কোন অবস্থাতেই বুঝি তৃপ্তি নাই, বিবাহ বন্ধ হইল, পিতৃহীনা পিতৃস্নেহ লাভ করিল তথাপি সে সুখী হইল কই! মাসিমা সঙ্গে যাইবেন না। শুনিয়াই তাহার সকল আনন্দ ঘোর বিষাদে পর্য্যবসান হইয়া গেল, চিরকাল যে এক মুহূর্ত্তের তরেও এই গৃহ ও এই মাসিমার কোলের গণ্ডির বাহির হয় নাই আজ এক সঙ্গে এত বড় দুইটা বিরহ সে কেমন করিয়া সহিবে? ক্রন্দনের মাঝখানে সে এক সময় বলিল "তবে তো বিয়ে বন্ধ হয়ে আমার সব হলো—সে তবু তো তোমায় দেখ্‌তে পেতুম।"

মাসিমা অশ্রুধারার মধ্যে শরতের রৌদ্রবৎ মৃদু হাসিয়া সস্নেহে কহিলেন "পাগ্‌লি।" সেদিন তরকারিতে লবন ও চাল্‌তার গুড় অম্বলে মিষ্ট রসের অভাব ঘটিয়া পদে পদে রন্ধনকারিণীকে অনুযোগের পাত্রী করিয়া তুলিতে লাগিল।

নদীবক্ষে সুদৃশ্য তরণী ভাসিতেছিল, অশ্রুপরিপ্লুতা রোদনোচ্ছ্বসিতা গৌরী পিতার সহিত ইহার বক্ষে পদার্পণ করিতেই দাঁড়িমাঝিগণ ও ভৃত্য উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া অভিবাদন করিল, মুহূর্ত্তের বিস্ময়ে গৌরী সব ভুলিয়া গিয়া স্তব্ধ হইয়া চাহিল। জলের উপর ভাসমান গৃহের মত সুবৃহৎ বজরার দ্বারে লতাচিত্রিত পর্দ্দা বাতাসে উড়িয়া বিবিধ উপাদান পূর্ণ সুখবিলাসের গৃহমধ্যে যেন তাহাকে সাদরে আহ্বান করিতেছিল। ব্যগ্র কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করিল "এ বাড়ীটা তোমার?" "হ্যাঁমা, এ বজরাখানা আমিই কিনেচি।" কিন্তু হায় মাসিমা ত এ বজরায় তাহার সহিত যাইবেন না! গৌরী পিতার হাত ছাড়িয়া তীরের দিকে তীরবেগে ফিরিল "মাসিমা! চলে গেছে মাসিমা! আমি যাব না, ওগো আমি যাবোনা আমায় নামিয়ে দাও,"। উর্দ্ধস্বরে এবার সে কাঁদিয়া উঠিয়া সিঁড়ির দিকে ছুটিয়া আসিল, কিন্তু ততক্ষণে মাল্লা-মাঝিরা ক্ষিপ্র হস্তে সিঁড়ি তুলিয়া লইয়াছে।

বন্দী মৃগশিশু যেমন ব্যাধের জালমধ্য হইতে গভীর হতাশার ব্যাকুল দৃষ্টি বনান্তরাল মধ্যস্থা ব্যাকুলা জননীর প্রতি প্রেরণ করিয়া কাঁদিতে থাকে তেমনি করিয়া সে তীরাভিমুখে ভট্টাচার্য্য পরিবারের দিকে চাহিয়া চাহিয়া লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল, "আমি যাবোনা গো আমি যাবোনা" ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর প্রতিধ্বনি আর একটি পরিত্যক্ত চিত্তে তেমনি প্রাণফাটা হাহাকার বহন করিতেছিল, সে ক্রন্দন আরও করুণ আরও মর্ম্মভেদী কারণ তাহা অব্যক্ত।

"মা গৌরি! তবে কি আমি তোকে জোর করে তোর আত্মীয়দের কাছ থেকে কেড়ে আনলুম মা? তোকে কি নিজের স্বার্থের জন্য কষ্ট দিচ্চি!"

যে গভীর সংশয়পূর্ণ বিষাদের স্বরে এই কথা কয়টি উচ্চারিত হইল গৌরী ভিন্ন অন্য

কোন সংসারজ্ঞান-অভিজ্ঞ বালিকা ইহা বোধ হয় সহিতে পারিত না। কিন্তু সত্য কথা বলিতে গেলে ইহা স্বীকার করাই উচিত, গৌরীর মনে তাহার পিতার প্রতি বিন্দুমাত্রও সহানুভূতি ছিল না। জন্মাবধি যাহার কাছে কণামাত্রও সে স্নেহ পায় নাই, ইহার তাহার নিকট হইতে বরং শুনিয়াই আসিয়াছে যে তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহার প্রতি অন্যায় করিয়া আসিতেছেন,— সহসা একদিন আসিয়া কাছে টানিলে সে এখন কেমন করিয়া তাহার এতদিনকার জগৎ ছাড়িয়া একমাত্র তাঁহাকে আশ্রয় করিতে পারে? সে তীব্র ভাবে কহিল "কেন তুমি আমায় নিয়ে এলে? আমি মাসিমাকে সত্যদাকে আর ত দেখতে পাবো না, মাসিমাকে ছেড়ে আমি যে কক্ষণো থাকিনি—" বলিতে বলিতে নদীতীরবর্ত্তী শ্যামল বৃক্ষচ্ছায়া ঢাকা গ্রাম্যপথে অনেকগুলি পরিচিত মূর্ত্তির মধ্যে এক শুভ্রবসনা বিধবার অশ্রুজলে রুদ্ধ-দৃষ্টির ব্যথিত-ছায়া কল্পনা নেত্রে উদিত হইবামাত্র সে আবার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল "ও মাসিমা আমায় তুমি নেযাও— আমি যাবো না।"

ক্ষেপণিক্ষেপণচূর্ণিত তরঙ্গ ছলছল ছলাৎ শব্দিত বজরার তলায় আঘাত করিয়া যাইতে লাগিল, সোণার রৌদ্র মাখিয়া সেই ফেণমুকুট ঢেউগুলা মীনা করা জড়োয়া জিনিষের মত দেখাইতে লাগিল, গৌরীর ক্রন্দনে প্রকৃতি যেন কিছুমাত্র সহানুভূতি দেখান আবশ্যক বোধ করিলেন না। নৌকা দ্রুত চলিতেছিল, তীরে কোথাও পাকা ফসলে ক্ষেত হাসিয়া উঠিয়াছে কোথাও বাঁধা ঘাটে বাবুরা বায়ুসেবনে আসিয়াছেন, কোন বটের ছায়া ঢাকা মেটেঘাটে গ্রামের মেয়েরা গা ধুইতেছে! ছোট ছোট মেয়েগুলি জলে গা ডুবাইয়া মুখে জল পুরিয়া বিবিধ শব্দ উৎপাদন করিতেছে, পরস্পরের গায়ে জল ছোঁড়াছুঁড়ি করিয়া অভিভাবিকার গালি খাইতেছে, কোন ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িতা বালিকা জলে নামিতে না পাইয়া কাদায় বসিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে। কোথাও নির্জ্জন ঘাটে ছাঁকনি জালে জেলের মেয়ে ক্ষুদে চিংড়ি ধরিতে নিবিষ্টচিত্ত, গ্রীবা বাঁকাইয়া রাজহংস দুইটি ইচ্ছাসুখে সন্তরণ দিতেছিল। নন্দকিশোর কন্যার শেষ কথায় অন্তর মধ্যে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রথম ধাক্কায় মনে হইল নৌকা ফিরাইতে বলেন, কিন্তু মানুষের মন আশাসূত্রে মালা গাঁথিতে বড় ভালবাসে;—মুহূর্ত্তে আবার সে ইচ্ছা পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল; হয়ত দুদিন পরে এ ভাব চলিয়া যাইবে! কিছুই না বলিয়া তাই স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন। অতীতের স্মৃতিব্যথিত বক্ষ উদ্বেলিত করিয়া দুই বিন্দু অশ্রুজল ঝরিয়া পড়িল। সহসা একবার কি ভাবিয়া মুখ তুলিতেই সেই বেদনার কষাঘাতস্বরূপ বিন্দু দুটি গৌরীর নেত্রে পতিত হইল, সে ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। তখন সূর্য্যের অস্তোন্মুখ রশ্মিগুলা পশ্চিমাকাশের প্রান্তটাকে আশ্চর্য্য উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল, স্বর্ণ মিশ্রিত লালের আভায় বিদ্যুৎপ্রভ শ্বেতমেঘপুঞ্জে নূতন নূতন রং ফলিয়াছে, যেন স্বর্গবাসিনী সুরকন্যাগণের বিচিত্র বসনপুঞ্জ ইন্দ্রালয়ের চারুশিল্পী নিজের পণ্যশালায় সাজাইয়া রাখিয়াছে।

মেঘের ছায়ায় জল পর্য্যন্ত বর্ণময়, তরঙ্গের মুখে মুখে নূতন রংয়ে যেন এক গাছা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের ফুলে গাঁথা গোড়ে মালা ভাসিতেছে। দুইধারের সবুজ শোভা হেমন্তসায়াহ্নের ঈষৎ শিহরণকারী বাতাসে মৃদুস্পন্দিত, ঘন তরুরাজি ভেদ করিয়া অদূরস্থ অট্টালিকা-বাতায়ন পথে সান্ধ্য নক্ষত্রের মত একটি ক্ষীণ সন্ধ্যাদীপ জ্বলিয়া উঠিল, কোথাও নির্জ্জনের নীরবতা ভাঙ্গিয়া শঙ্খঘণ্টা বাজিয়া আসন্ন সন্ধ্যাকে বরণ করিতেছিল, গৌরীর অশ্রু পরিপ্লুতমুখে রাঙ্গা আলো লাগিয়া তাহা যেন পরীকন্যার মত অপূর্ব্ব সুন্দর দেখাইতেছিল। সে চারিদিকে চাহিয়া তারপর পিতার দিকে চাহিল, তিনি জানুর উপর চিবুক রাখিয়া নতমুখে বসিয়া আছেন, সে ধীরে ধীরে তাঁহাকে স্পর্শ করিল "আকাশে কি আগুন লেগেছে? তবে এত রাঙা কেন?"

(ক্রমশঃ)

চিত্রগুপ্ত

চিত্রগুপ্ত নহে রে সুপ্ত
মেলিয়া রেখেছে খাতা;
অন্তবিহীন নগ্ন আকাশ
সব খানি তার পাতা।
ক্রন্দন রোল মঙ্গল বোল
পাপ ও পুণ্য বাণী;
দীর্ঘশ্বাস মর্ম্ম হুতাশ
যা উঠে দিবস যামী,—

অঙ্কিত সব অঙ্কে তাহার
রহে চির দিন স্পষ্ট;
শব্দ সবেগে ঝঙ্কারি ছোটে
কখনো হয় না নষ্ট।
বিচারের দিনে হিসাবের বহি—
যখন ফেলিবে খুলি;
দেখিবে ক্ষুদ্র নিশ্বাস টুকু
তুলিতে যায় নি ভুলি।

শ্রীজগদীশচন্দ্র তরফদার।

সুখ-স্মৃতি

সুখ হ'তে সুখ-স্মৃতি দীর্ঘতর ধরয়ে মূরতি
সুখ যবে মরমে শুকায়,
দিবা-শেষে ছায়া যথা কায়া হ'তে সুবিপুলা অতি
সন্ধ্যা যবে নিকটে ঘনায়।

চম্পকের তীব্র গন্ধ হ'য়ে আসে মৃদুমন্দ
তটিনীর শীকরে মিশিয়া,
জুড়ায় সকল হিয়া দুখের ভিতর দিয়া
সুখ যবে আসে বাহিরিয়া।

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম

রাত্রি প্রায় সাড়ে এগারটায় ট্রেন বোলপুরে পঁহুছিল। ট্রেন হইতে নামিয়া আমরা থানা বরাবর চলিয়া গেলাম। দারোগা বাবু একটি বল্লমধারী চৌকিদারকে পথপ্রদর্শক-রূপে আমাদের সঙ্গী করিয়া দিলেন। জ্যোৎস্নার আলোকে পথ দেখিতে দেখিতে ঘুমন্ত মাঠের বক্ষোপরি এক ক্রোশ পরিমাণ রাস্তা বহিয়া অভীষ্ট স্থানে আসিয়া পৌঁছিলাম। সকলেই নিদ্রিত, আশ্রম কুটীরে কুটীরে আলো জ্বলিতেছে, দরজা জানালাগুলি উন্মুক্ত। কি এক বিরাট অর্থপূর্ণ গাম্ভীর্য্য সমুদায় আশ্রম-ঘেরিয়া রহিয়াছে। নিতান্ত নিষ্ঠুরের মত সুপ্ত আশ্রমের নীরবতার মাধুর্য্যহানি ঘটাইয়া এবং আশ্রমবাসীদের বিশ্রামসুখে ব্যাঘাত জন্মাইয়া আমাদের আগমন-বার্ত্তা জানাইতে হইল।

রাত্রি অবসানে অনুমান পাঁচটায় ঠন্ ঠন্ রবে ঘণ্টা পড়িল, আর অমনি বালকগণ আনন্দকোলাহলে দলে দলে শয্যা হইতে বাহিরে ছুটিয়া আসিয়া আশ্রম গুলজার করিয়া প্রভাতী সঙ্গীত গাহিয়া গাহিয়া চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। আশ্রমবাসী পাখীগুলিও উহাদের গানে প্রাণ ঢালিয়া কণ্ঠ মিলাইতে লাগিল। সঙ্গীতের পর হাতমুখ ধুইয়া সকলে উপাসনা আরম্ভ করিল। শিশু-কণ্ঠের উপাসনার প্রাণভরা করুণ পেলব সুর সুপ্তি-জড়তা ভাঙ্গিয়া দিয়া কি এক অব্যক্ত স্পন্দনে হৃদয় আলোড়িত করিয়াছিল; শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া বাহিরে চাহিয়া দেখি,—প্রান্তর পারে বিপুল কায়ায় রক্তিম-আভায় ধীরে ধীরে সূর্য্য উঠিতেছে। আশ্রমের গাছের আগায়, পাতার গায়ে সোণালি ছটা ছড়াইয়া পড়িল। চারিদিক মধুময়—সর্ব্বত্র যেন অমৃত নির্ঝর উৎসারিত। সূর্য্যোদয় অনেকবার দেখিয়াছি, কিন্তু এমন অনন্ত উদার মাঠে মোহকর উন্মাদনাপূর্ণ অরুণ-বিকাশ কখনো দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। সূর্য্যোদয়ের প্রকৃত সৌন্দর্য্য-সম্ভোগ এরূপ স্থানেই সম্ভব।

প্রাতরাশের পর প্রিয় সুহৃদ্ শিক্ষক রমণী বাবু আমাদিগকে লইয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া আশ্রমের চারিদিক দেখাইতে লাগিলেন। যে দিকে চাই সর্ব্বত্র আনন্দের অব্যাহত আত্ম-বিকাশ, আকুল উৎসব ঘটা। উৎসব বাঁশরীর বিচিত্র রাগিণী আকাশ পূর্ণ করিয়া অহরহ বাজিতেছে। ফুলের উৎসব, পাতার উৎসব, পাখীর উৎসব, সমীরের উৎসব, আলোর উৎসব—এইরূপে বিশ্ব প্রকৃতির মহামহোৎসব প্রতিদিন এখানে মানুষের প্রাণমন উৎসাহে মাতোয়ারা করিয়া রাখে। চারিদিকে বিশাল উন্মুক্ত প্রান্তর উদ্দাম উচ্ছ্বাসে দিগন্তে উছলিয়া পড়িয়াছে। এ দৃশ্য দেখিলে বিশ্বব্যাপী বিরাটের ধ্যানে স্বতই অন্তর আবিষ্ট হইয়া আসে। প্রান্তর-সমুদ্রের "আকাশ-জোড়া কোলে" একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের ন্যায় আশ্রমটি তরুলতায় ফলেফুলে সাজিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আশ্রমের সর্ব্বত্র নিবিড় তরুর মেলা—কোথাও সরলদেহ দেবদারু বীথি, কোথাও উন্নতশির বিশাল শালগাছ, কোথাও বা ফলে ভরা আমলকী বন। এই সকল তরুলতার সহিত আশ্রমশিশুদের শৈশবের সম্বন্ধ, তাই ইহাদের সরল স্বাধীন বিকাশপ্রণালীর সহিত শিশুদের আপন আপন জীবনউন্মেষের সূত্রটিও অজ্ঞাতে

মিলিয়া গিয়া কি এক নির্ম্মল রসসৌন্দর্য্যেই না ভরপুর করিয়া উহাদিগকে গড়িয়া তুলে।

বৃক্ষের তলে তলে প্রতিদিন দুবেলা ক্লাশ বসে। গাছের গোড়ায় গোড়ায় ইটের বেদীর আসন পাতা; সম্ভবতঃ আশ্রম বালকগণই সেগুলি নির্ম্মাণ করিয়া থাকিবে। এই সকল আসনে বসিয়া শিক্ষকগণ ক্লাশ করিয়া থাকেন। এক প্রান্তে প্রসিদ্ধ ছাতিমতলা—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সাধনা-ক্ষেত্র। ইহার নীচে বসিয়া মহর্ষি ধ্যানতন্ময় হইয়া যাইতেন। পূর্ব্বে এই আশ্রম ও ইহার সন্নিহিত স্থানগুলি দস্যুদের লীলাভূমি ছিল। ছাতিমতলার মাটি খুঁড়িয়া অনেকগুলি নরমুণ্ড পাওয়া গিয়াছে। শুনিয়াছি মহর্ষিকেও নাকি একবার দস্যুরা আক্রমণ করিবার সংকল্প করিয়াছিল। অবশেষে তাঁহার ঋষিমূর্ত্তি ও ধ্যানভাব দেখিয়া ভক্তিপ্লাবিত ভয়ে সরিয়া পড়ে।

এখান হইতে কিয়দ্দূরে পূর্ব্বদিকে প্রস্তরে নির্ম্মিত ভিত্তির উপর বিচিত্র কাঁচের দেয়ালে ঘেরা মন্দির। সকাল সন্ধ্যা এই মন্দিরে আশ্রমবাসীদের উপাসনা হয়। পাতায় ঢাকা পাখীর বাসার মত গাছের ফাঁকে ফাঁকে দূরে দূরে এক একখানা কুটীর। এগুলি পাকা বাড়ী নয়, কোনোটি পর্ণকুটীর কোনোটি বা টালির ঘর। ক্ষেত্রে বহু সংখ্যক গো-মহিষ দেখিলাম। আশ্রমের দুগ্ধ যোগাইবার জন্য সেইগুলি পালিত হইতেছে।

বেলা বাড়িলে স্নান করিয়া আহার করিতে গেলাম। শালপাতায় নিরামিষ ভোজন করিয়া বড়ই তৃপ্তি বোধ হইল।

দুপুর বেলা ছোট ছোট ছেলেরা দলে দলে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। হরিণ শিশুর ন্যায় কেমন উল্লাসভরা উহাদের গতি! কেহ বা পায়ে ধূলি উড়াইতে উড়াইতে আপন মনে চলিয়াছে, কোথাও দুজনে গলাগলি করিয়া কি বলিতেছে, কেহ বা গাছতলায় তলায় ফল কুড়াইয়া ফিরিতেছে, কোথাও বা দলে দলে ড্রিল করিতেছে। কিন্তু ঘণ্টা পড়িবামাত্র যে যেখানে থাকুক চারিদিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া আপন আপন স্থানে হাজির হয়।

ক্রমাগত দুই দিন আশ্রমে উৎসব। ৭ই মহর্ষির দীক্ষাগ্রহণের দিন সকলে ছাতিমতলায় সমবেত হইয়া সেই বিশেষ দিনের স্মৃতি শ্রদ্ধার সহিত অন্তরে জাগাইয়া তুলিলেন। এই দিন মহর্ষির সময়ের ন্যায় একটি মেলাও বসিয়াছিল। ৮ই আশ্রমের বার্ষিক অধিবেশনে ছাতিমতলায় সভা বসিল এবং উপাসনায়, গানে ও বক্তৃতায় সভার কার্য্য নির্ব্বাহিত হইল। আশ্রম-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা কবি রবীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিতে উৎসবের দিনগুলিতে কেমন একটা অপূর্ণতা বোধ হইতেছিল। এসময় সকলেই কাজের ভিড়ে ব্যস্ত ছিলেন বলিয়া কাহারো সহিত আলাপ করিবারও তেমন সুযোগ পাই নাই। তবে মাঝে মাঝে শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের সঙ্গলাভের সুবিধা পাইতাম। অনেক সময় তাঁহার মুখে ভাগবত ও উপনিষদের ব্যাখ্যা শুনিয়া শান্তিলাভ করিয়াছি। ক্ষিতিবাবু রসিক চূড়ামণিও বটেন। ব্রহ্মা যেমন সকলের পিতামহ, তিনিও সেরূপ সেখানে সকলের ঠাকুরদাদা। চৌপাশ ঘেরা নাতির দলে বসিয়া দাদাঠাকুর অনাবিল হাস্যরসের

ব্যবস্থা দ্বারা আসর জমাইয়া তুলেন। কিন্তু ইহার মধ্যেও তাঁহার গাম্ভীর্য্যের বেশ পরিচয় পাওয়া যায়।—

আশ্রমে বাঙ্গালী ছাত্র ছাড়া পঞ্জাব, রাজপুতানা, আসাম ও নেপাল প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশের ছাত্রও শিক্ষালাভ করিতেছে। ইহারা সকলেই বাংলা বলিতে ও লিখিতে পারে। পূর্ব্ব পশ্চিম উভয় বঙ্গের ছেলেই আছে, তন্মধ্যে জেলার হিসাবে তুলনা করিতে গেলে পূর্ব্ববঙ্গের ত্রিপুরা জেলার ছাত্রসংখ্যাই অধিক। ছাত্রসংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়া বাড়িয়া বর্ত্তমানে ১৮০রও উপরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। উৎসবের পর নূতন 'সেসন' আরম্ভ করিয়া পুনরায় ছাত্র গ্রহণ করা হইবে। সাত আট বৎসর হইতে ১২ বৎসর বয়স্ক ছেলে গ্রহণ করাই নিয়ম। প্রত্যেক ছেলের জন্য অভিভাবকদের এক মাসের খরচসহ এককালীন ৪৫৲ টাকা ও তৎপর মাসে মাসে আঠার টাকা করিয়া দিতে হয়।

এখানে বালকগণ খালি পায়ে চলিয়া, সাধারণ ধরণের বেশভূষা পরিয়া আড়ম্বরবিহীন জীবনযাপন করে। পরস্পরের মধ্যে ইহাদের যেমন ভাব, যেমন মিল, যেমন ভালবাসা তেমন সহোদরে সহোদরেও দেখা যায় না। সুখেদুঃখে একে অন্যের অন্তরে অন্তরে মিলিয়া যায়। এই প্রীতির শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া যদি কেহ কালের কবলে গড়াইয়া পড়ে, তবে তাহার স্মৃতি চিরদিন চোখের জলে বহন করে। পরলোকগত বন্ধুদের শ্মশানে বসিয়া বসিয়া আপনারা ইট গাঁথিয়া গাঁথিয়া স্মৃতিস্তম্ভ উত্তোলন করে এবং বৎসর বৎসর শ্রাদ্ধবাসরে হবিষ্যান্ন ভোজন করে। কি মধুর কি মনোরম ভাব! কি মহান আদর্শ! ৯ই পৌষ পরলোকগত ছাত্র ও শিক্ষকদের স্মরণার্থ সভা বসিয়াছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় বাধ্য হইয়া আমরা পূর্ব্বদিন চলিয়া আসিয়াছিলাম তাই সেদিন সকলের সহিত একত্র হইয়া সমবেদনা প্রকাশের সুযোগ পাই নাই।

শিক্ষকের নাম এখানে নিদারুণ আতঙ্ক জাগাইয়া ছাত্রদিগকে রোমাঞ্চিত করিতে পারে না। এখানকার শিক্ষকতায় বন্ধুত্বের ঘনিষ্ঠ সংমিশ্রণ থাকিয়া সে বিভীষিকাটাকে লাঘব করিয়া দিয়াছে। শিক্ষকগণ একদিকে যেমন শিক্ষক, অন্যদিকে সেইরূপ তত্ত্বাবধারক ও বন্ধু। তাঁহারা সতর্কের সহিত এই তিন দিক বজায় রাখিয়া ছাত্রদের সহিত মিশিয়া থাকেন। ছাত্রগণও অকুণ্ঠিতভাবে ইঁহাদের নিকট হৃদয়ের পৃষ্ঠা উন্মুক্ত করিয়া দেয়। শিক্ষকগণ ব্যতীত ছাত্রদের মধ্য হইতেও এক এক জন এক এক দলের তত্ত্বাবধারকরূপে নিযুক্ত। ঐ তত্ত্বাবধারক সমবয়স্ক হইলেও কেহই তাহাকে যথোচিত সম্মান দেখাইতে ত্রুটি করে না। ছাত্রদিগের প্রতি শাস্তির কঠোরতা বিশেষ নাই। হয়ত কোনো অপরাধে কাহারো একদিন খেলা বন্ধ হইল,—নিতান্ত ছোট ছেলের নিকট ইহাই কঠোর বলিয়া বিবেচিত হয়। মেটি কুলেশন পর্য্যন্ত পড়িয়া এ আশ্রমের শিক্ষার্থীগণ গভর্ণমেণ্ট-বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দেয়। অনেকেই কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। পাঠ্য পুস্তক বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত পুস্তক হইতে সম্পূর্ণ আলাদা, কেবল পরীক্ষার্থীদিগের গভর্ণমেণ্টের নির্ব্বাচিত

পুস্তকগুলি পড়িতে হয়। মুখস্থের হাড়ভাঙ্গা খাটুনিতে বুদ্ধিবৃত্তিকে ভোঁতা করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা এখানে নাই, কিংবা এমন কোনো কঠোরতা নাই যাহাতে লেখাপড়ায় শিক্ষার্থীর রুচি বিগড়াইয়া দেয়। আনন্দের মধ্য দিয়া যাহাতে শিশুদের অন্তরনিহিত বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষ হয়, যাহাতে সর্ব্বদা শিক্ষার্থীর অনুসন্ধিৎসা জাগাইয়া রাখা যায় এখানে তাহারই আয়োজন, সেইরূপ শিক্ষারই বন্দোবস্ত। শিক্ষা প্রধানত মুখে মুখেই দেওয়া হয়, পুস্তকের সঙ্গে ছেলেদের সম্পর্ক রাখিবার বিশেষ প্রয়োজন হয় না। সাহিত্য, গণিত, ভূগোল, ইতিহাস ব্যতীত রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার সহজ শিক্ষা সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া হয়; এবং এই উদ্দেশ্যে একটি বিজ্ঞানাগার স্থাপিত আছে। ছাত্রগণ জলবায়ু পরীক্ষা ও নক্ষত্রাদি পর্য্যবেক্ষণ করে, কীটপতঙ্গের আকৃতি প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহার নোট লিখিয়া রাখে। সেই সকল বিবরণ "তত্ত্ববোধিনী"র শেষ কয় পৃষ্ঠায় মাসে মাসে প্রকাশিত হয়। ইহাদের শারীরিক উন্নতিরও ব্যবস্থা আছে। ইহারা নানাপ্রকার ব্যায়াম, ফুটবল ক্রীকেট প্রভৃতি খেলা করে।

শুধু লেখাপাড়ার সীমারেখাতে এখানকার শিক্ষা আবদ্ধ নয়। কর্ম্মজীবন গঠনের অনুকূল শিক্ষাও দেওয়া হয়। আশ্রম বালকগণ মাটি কাটে, বৃক্ষরোপণ করে, তাছাড়াও আশ্রমের অনেক কাজ করে।

আশ্রমের সংস্রবে অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান আছে, তাহার মধ্যে একটি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। এই প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য অসভ্য সাঁওতালদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার। ছাত্রগণের চেষ্টায় এ উদ্দেশ্যের সুন্দর ফল ফলিয়া উঠিতেছে। মোটের উপর মনুষ্যত্বের সকল বিভাগের শিক্ষাই এখানে দেওয়া হয় এবং সেই শিক্ষা যাহাতে পোষাকী না হইয়া আটপৌরে রকমের হইতে পারে—যাহাতে উহার সহিত প্রাত্যহিক জীবনের যোগ সাধিত হয় তাহার একটা চেষ্টা আছে।

এ আশ্রম কোনো কোনো বিষয়ে যেমন আমাদিগকে প্রাচীনত্বের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় সেইরূপ ইহাতে নূতনত্বেরও অনেক সংমিশ্রণ দেখিতে পাই। পুরাতনকে সম্পূর্ণরূপে জাগাইয়া তোলা নানারূপেই অসম্ভব, তাই সময়ের সহিত মিলিয়া মিশিয়া পুরাতনকেই যথাসম্ভব আদর্শ রাখিয়া ইহা কার্য্য করিয়া আসিতেছে। তিনটি কারণে এ আশ্রম প্রকৃত জীবনগঠনের উপযোগী হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। প্রথম সুশিক্ষাপদ্ধতি, দ্বিতীয় জনকোলাহলের কুদৃষ্টান্ত ও কুসংসর্গ প্রভৃতির প্রভাবহীনতা, তৃতীয়টি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের সমাবেশ। প্রণালীর উপরেই যে শিক্ষার প্রধান নির্ভর ইহা বোধহয় মানিয়া লইতে কাহারো আপত্তি হইবে না। শিক্ষাপ্রণালীর কৌশল চালাইতে পারিলে মানুষের মধ্যে অসম্ভব সম্ভব হইতে দেখা যায়। আমেরিকার নবশিক্ষাপদ্ধতি সাত আট বছরের বালকদের অসাধারণ ক্ষমতা দেখাইয়া একথার সত্যতা প্রমাণ করিয়া দিতেছে। কোলাহলের বাহিরে শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা জার্ম্মানি বেশ বুঝিয়াছে। ইহাতে কুদৃষ্টান্তের সহজ আকর্ষণ হইতে দূরে রাখিয়া ছেলেদিগকে

সহজে উন্নতির পথে লইয়া যাওয়া যায় এবং জীবনের অনেক শ্রেষ্ঠশিক্ষা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য হইতে সহজে লাভ করা যায়। ইহা মানুষের প্রাণ খুলিয়া দেয়, সমুদায় উঁচুনীচু ভাবগুলিকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সমান করিয়া ফেলে, বিশ্বপ্রেমে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলে ও অনন্তের উদ্দেশ্যে মস্তক অবনত করিয়া দেয়। এইরূপে ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা এখানকার বিশেষ গৌরবস্বরূপ—যাহা আজকাল আমাদের সমাজে বড়ই দুর্লভ অথচ একান্ত প্রয়োজনীয়। বোলপুরবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া কবি রবীন্দ্রনাথ আমাদের সম্মুখে যে আদর্শ ধরিয়াছেন তাহা সমগ্র দেশের আদর্শ হওয়া উচিত। নতুবা রোগ বুঝিয়া ব্যবস্থা না করিলে আরোগ্যলাভের সকল চেষ্টা ধূম্রের আকারে শূন্যে মিলাইয়া যাইবে।

শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্ত্তী।

মোগল সাম্রাজ্য ও মিতাচার আন্দোলন

মোগল সাম্রাজ্যের সময় ভারতবর্ষে মিতাচার সংক্রান্ত আন্দোলনের বিষয় কিছু বলা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

প্রথম মোগল সম্রাট বাবর তুর্কীভাষায় লিখিত একখানি উৎকৃষ্ট আত্মজীবনী রাখিয়া গিয়াছেন। ইহা তুজাক-ই-বাবরী (Tuzak-i-Babari) বা ওয়াকিৎ-ই-বাবরী (Wakiat-i-Babari) নামে অভিহিত। আজ কাল যতগুলি বিশ্বাসযোগ্য ও প্রীতিপাঠ্য আত্মজীবনী বর্ত্তমান আছে, তাহার মধ্যে ইহা অন্যতম। ইহার একস্থলে সম্রাট লিখিতেছেন যে, প্রথম জুমদের ২৩শে তারিখ সোমবার তিনি তাঁহার রাজধানী পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত অশ্বারোহণে বহির্গত হইয়াছিলেন। পথিমধ্যে দারুণ চিন্তানলে তাঁহার অন্তর্দাহ উপস্থিত হইল। তিনি অনেকবার মনস্থ করিয়াছিলেন যে, আর কোন প্রকার মাদক দ্রব্য স্পর্শ করিবেন না; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অনুতাপ, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা সকলই বৃথা হইয়াছে। সেইদিন তিনি তৎক্ষণাৎ মদ্যপানের নিমিত্ত ব্যবহার্য্য সমস্ত স্বর্ণ ও রৌপ্যনির্ম্মিত পাত্র ও পিয়ালা তাঁহার সম্মুখে আনয়ন করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিতে আদেশ করিলেন; এবং মদ্যপানাভ্যাস ত্যাগ করিয়া চিত্তকে পবিত্র করিলেন। অতঃপর স্বর্ণ ও রৌপ্যনির্ম্মিত পানপাত্র ও অপরাপর বাসনের ভগ্নাংশগুলি দরিদ্র ভিক্ষুক ও দরবেশদিগের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিলেন। এই ঘটনার পর হইতে তিনি আর কখনও মদ্য স্পর্শ করেন নাই। কিন্তু পূর্ব্ব হইতে অতিরিক্ত মদ্যপানে তাঁহার শরীর অন্তঃসারশূন্য হইয়া গিয়াছিল; সেইজন্য তিনি অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

হুমায়ুনের জীবনীতে আমরা মদ্যপানের কোনপ্রকার উল্লেখ দেখিতে পাই না; কিন্তু জাহাঙ্গীর তাঁহার আত্মজীবনীর একাংশে লিখিয়া গিয়াছেন; "আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করিয়া বলিতেছি যে, আমার পিতামহ হুমায়ুনের ন্যায় ৪৫ বৎসর পূর্ব্বেই আমি মদ্যপান একেবারে পরিত্যাগ করিতে সক্ষম

হইব।” ইহা ব্যতীত সম্রাট হুমায়ুনের পানাভ্যাসের বিষয় আমরা আর বিশেষ কিছু অবগত নহি। এই প্রমাণ সত্য হইলেও, হুমায়ুন নিশ্চয়ই অতিরিক্ত মদ্যপায়ী ছিলেন না, এবং ৪৫ বৎসরের পূর্ব্বেই পানাভ্যাস ত্যাগ করিয়াছেলেন।

এবার মোগলকুলতিলক সম্রাট আকবরের বিষয় আলোচনা করা যাউক্। কোনো জাতিকে অধঃপতন হইতে রক্ষা করিবার জন্য করুণানিলয় ভগবান যে সকল চির-স্মরণীয় মহাপুরুষকে ধরাতলে প্রেরণ করেন, সম্রাট আকবর তাঁহাদের মধ্যে একজন। তিনি কোন প্রকার মাদকপানীয় স্পর্শ করিতেন না। বিখ্যাত ঐতিহাসিক মোল্লা আবদুল কাদের বাদৌনি তাঁহার Mutakhabut Tawarik কিম্বা Turikhi Badouni নামক গ্রন্থে মিতাচার-সংক্রান্ত আন্দোলন সম্বন্ধে সম্রাট আকবরের বলবতী চেষ্টার কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে আমরা বলিতে পারি যে, পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থের সর্ব্বত্রই আকবর ও তাঁহার দক্ষ মন্ত্রী-গণের প্রতি গ্রন্থকারের ঘৃণা স্পষ্ট লক্ষিত হয়; অতএব এ বিষয়ে তিনি যে বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা সর্ব্বাংশেই বিশ্বাস-যোগ্য। বাদৌনি লিখিতেছেন যে, চিকিৎসক আদেশ করিলে মদ্যপান দোষের ছিল না; তখন সকলেই মদ্যপান করিতে পারিত। কিন্তু পাছে মারামারি বা দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়, এইজন্য শান্তিভঙ্গকারী মদ্যপায়ী-গণের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। মদ্যপানজনিত কোনরূপ হল্লীস বা গোলমাল করা বা উৎসবকালে মদ্যপান করা একেবারেই নিয়মবিরুদ্ধ ছিল। মদ্যের দাম আইনের দ্বারা স্থিরীকৃত হইত; এবং কেবল রুগ্ন-ব্যক্তিরাই দোকানের কেরাণীদের নিকট তাহাদের নাম, পিতা ও পিতামহের নাম লেখাইয়া মদ্য ক্রয় করিতে পারিত। বাদৌনি আরও বলিয়া গিয়াছেন যে, রাজধানীর মধ্যে পাছে অধিক সংখ্যক পতিতা নারীর সমাবেশ হয় সেইজন্য শয়তানপুর (শয়তানের বাসভূমি) নামে নগরের বহির্ভাগে একটি স্বতন্ত্র স্থান তাহাদের বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। প্রজাগণকে সৎপথে রাখিবার জন্য একজন প্রধান রক্ষক, তাহার একজন সহচর ও একজন কেরাণী এই কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিল। যাহারা পূর্ব্বোক্ত পতিতা নারীগণের গৃহে যাতায়াত করিত বা তাহাদিগকে নিজেদের আলয়ে লইয়া যাইত, কর্ম্মচারীগণ তাহাদের নাম লিখিয়া রাখিত। সম্রাট আকবরও একদিন নগরের প্রধান বেশ্যাগণকে তাঁহার সম্মুখে গোপনে ডাকিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"কাহারা তোমাদের অসৎ পথে আনিয়াছে?" এবং অপরাধী ব্যক্তিগণের নাম ধাম জানিতে পারিয়া কতিপয় প্রথিত-যশা ও বিশ্বাসী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, এবং তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ দীর্ঘকাল কারারুদ্ধও ছিল

জাহাঙ্গীর তাঁহার আত্মজীবনীর একস্থলে লিখিয়া গিয়াছেন যে আকবর এতদূর মিতা-চারী ছিলেন যে, বৎসরের মধ্যে তিন মাস তিনি মাংসও স্পর্শ করিতেন না। তাঁহার জন্মমাসে রাজ্যের মধ্যে কোন প্রকার জীবহত্যা করিতে তিনি নিষেধ করিয়াছিলেন। যদিও রমজানের মাসে তিনি উপবাস করিতেন

না বটে, কিন্তু উপবাসের শেষ দিন মসজিদে গমন করিয়া রীতিমত প্রার্থনা ও বিবিধ প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্পন্ন করিতেন। অনুপবাস জনিত দোষ ক্ষালণার্থে তিনি তিন শত দাসকে মুক্তি দান করিতেন এবং দরিদ্র-দিগের মধ্যে ৫০ হাজার টাকা বিতরণ করিতেন।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে জাহাঙ্গীর একজন প্রসিদ্ধ মদ্যপায়ী বলিয়া পরিচিত। তাঁহার আত্মজীবনী পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত দুই তিন বার ব্যতীত তিনি আর কখনও মদ্য পান করেন নাই; এবং সেই কয়েক বারও তাঁহার মাতা বা ধাত্রীগণ তাঁহার রোগযন্ত্রণা উপশমের জন্য তাঁহাকে মদ্যদান করিতে বলিয়াছিলেন। একবার সম্রাট আকবর সর্দ্দি-কাশীর ঔষধরূপে তাঁহাকে গোলাপজল মিশ্রিত মদ্যপান করিতে দিয়া-ছিলেন। আফগান যুদ্ধের সময় জাহাঙ্গীর তাঁহার পিতার শিবিরে উপস্থিত ছিলেন। একদিন মৃগয়ায় গমন করিয়া জাহাঙ্গীর আহত অবস্থায় প্রত্যাগত হইলে, তাঁহাকে বলা হইয়াছিল যে এক পাত্র মদ্যপান করিলেই তাঁহার সকল যন্ত্রণা ও অবসাদ দূরীভূত হইবে। সেই সময় হইতে তিনি নিয়মিত ভাবে সুরাপানে অভ্যস্থ হইলেন এবং দিনদিন অতিরিক্ত মাত্রায় পান করিতে লাগিলেন। শেষে দ্রাক্ষামদিরা পানে তাঁহার আর কোনরূপ নেশা বা মানসিক উত্তেজনা হইত না। তিনি উগ্র সুরার আরক পান করিতে আরম্ভ করিলেন। নয় বৎসরের মধ্যে তিনি দুইবার নিঃস্যন্দিত সুরা দিবা ভাগে ১৪ পাত্র এবং রাত্রে ছয় পাত্র পান করিতে লাগিলেন। অবস্থা ক্রমশঃ এতই গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যে, পান করিবার সময় পানপাত্র তিনি ওষ্ঠে উত্তোলন করিতে পারিতেন না; অপরে তাঁহার মুখের নিকট পাত্র ধরিয়া থাকিত।

কালক্রমে তাঁহার চৈতন্য হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, নিজের সর্ব্বনাশ নিজেই সাধন করিয়াছেন। তাঁহার সিংহাসনারোহণের পরই তিনি যে দ্বাদশটি হুকুম জারি করিয়া-ছিলেন—তন্মধ্যে একটি মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত। তিনি লিখিতেছেন,—"কোন ব্যক্তি কোন প্রকার মাদক দ্রব্য প্রস্তুত করিতে কিম্বা বিক্রয় করিতে পারিবে না। যদিও আমি ১৬ বৎসর বয়স হইতে মদ্যপান করিতেছি, তথাপি আমি এই নিয়ম প্রবর্ত্তন করিতেছি। কারণ অতিরিক্ত মদ্যপানে মানুষের শরীরের বল বিনষ্ট হয় এবং মিথ্যা বাসনা মনোমধ্যে জাগরিত হয়। আমারও যে মদ্যপান হেতু এই সকল দুর্ব্বলতা জন্মিয়াছে, তাহা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি। আমি এতদূর পানাভ্যাসের বশীভূত হইয়া পড়িয়া-ছিলাম যে, এক ঘণ্টাকাল সুরাপান না করিলে আমার হস্তদ্বয় কম্পিত হইত এবং বিশ্রাম করিতেও অসমর্থ হইতাম। আমি প্রত্যহ বিশ পিয়ালা মদ্য পান করিতাম। প্রত্যেক পাত্রে অর্দ্ধসের মদিরা থাকিত। সময় সময় ইহারও অধিক পান করিতাম। কিন্তু অতিরিক্ত মদ্যপানের অভ্যাস বদ্ধমূল হইলে আমার অবস্থা অতিশয় সঙ্কটাপন্ন হইয়া দাঁড়াইবে বুঝিয়া, সময় থাকিতে এই কদভ্যাস দূর করিতে বদ্ধপরিকর হইলাম। প্রাণপণ চেষ্টায় ছয় মাসের মধ্যে মদ্যপানের পরিমাণ বিশ পিয়ালা হইতে পাঁচ পিয়ালায়

হ্রাস করিলাম। সন্ধ্যার দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে ব্যতীত অন্য কোন সময় মদ্যপান করিব না, এইরূপ নিয়ম বিধান করিলাম। কিন্তু এখন রাজ্যসংক্রান্ত কার্য্যে আমাকে এতদূর অভিনিবিষ্ট থাকিতে হয় যে, সন্ধ্যাকালীন প্রার্থনার পর তবে আমি সুরাপান করিবার সময় পাই। আমি ভগবানে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া বলিলেছি যে, আমার পিতামহ হুমায়ুনের ন্যায় ৪৫ বৎসর পূর্ব্বেই আমি মদ্যপান একেবারেই ত্যাগ করিতে পারিব। যে কার্য্যে সেসময় ভগবান তাঁহার বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, সেই কার্য্য সম্পাদন না করিতে একান্ত চেষ্টা করা, প্রত্যেক মানুষের কর্ত্তব্য এবং তদ্দ্বারাই অনন্ত মুক্তির পথ আমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত হইবে!" তার পর ৪৭ বৎসর বয়সে বোধ হয় জাহাঙ্গীর পানাভ্যাস ত্যাগ করিয়া অহিফেন সেবনে অভ্যস্থ হইয়াছিলেন।

তাঁহার রাজ্যারোহণের পর তিনি এই মর্ম্মে এক আদেশপত্র প্রচার করিয়াছিলেন যে, তাঁহার জন্মমাসে সমগ্ররাজ্যে মাংসাহার নিষিদ্ধ এবং বৎসরের মধ্যে এমন দুই একদিন নির্দ্দিষ্ট থাকিবে, যেদিন কেহই কোনপ্রকার জীবহত্যা করিতে পারিবে না। তিনি আরও ঘোষণা করিয়াছিলেন,—"আমার রাজ্যারোহণের দিন বৃহস্পতিবার মাংসাহার নিষিদ্ধ; রবিবার যেদিন ভগবান জগৎ সৃষ্টির পর বিশ্রাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেদিনও কোন জীবের প্রাণ হরণ করা অন্যায়; অতএব সেদিনও পশুবধ নিষিদ্ধ। ১১ বৎসরের অধিককাল আমার পিতা এই নিয়ম পালন করিয়াছেন; সুতরাং আমার রাজ্যের কেহ সেদিন মাংসাহার করিতে পারিবে না।"

জীবনের শেষভাগে তাঁহার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইয়াছিল। ভ্রমবশতঃ কি অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন, তাহা তিনি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার পার্থিব সুখস্পৃহা সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাপিত হইয়াছিল। বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হইবার প্রাক্কালেই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, পার্থিব সুখ ও আনন্দ, ঐশ্বর্য্য ও বংশগৌরব কিছুই চিরস্থায়ী নহে; পৃথিবীস্থ সকলই ক্ষণভঙ্গুর চঞ্চল, এবং মরণশীল। একমাত্র কর্ত্তব্য সাধনেই সুখ। ঈশ্বর তাঁহাকে মহিমান্বিত রাজশক্তি স্বেচ্ছায় অর্পণ করিয়াছেন, এবং তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য প্রজাবৃন্দকে অত্যাচার, অবিচার, ও উৎপীড়নের হাত হইতে রক্ষা করা। ইহাই ভগবানের অভিপ্রায়; এবং তাঁহার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিলেই মানবের চরমোৎকর্ষ মোক্ষ লাভ হইবে। ঈশ্বরের নাম সংগ্রহ করিবার জন্য তিনি কয়েকজন ধর্ম্মযাজককে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারা ভগবানের পাঁচশত বাইশটি নাম সংগ্রহ করিয়া কুড়ি বর্ণমালানুসারে তাহা সাজাইয়াছিলেন। সম্রাট তাঁহার বহুমূল্য পরিচ্ছদের উপর সমুদায় নাম কারুকার্য্যে শোভিত করিয়া সেলাই করাইয়া লইয়াছিলেন। তারপর তাঁহার নিজের কথায় বলি;—"আমি প্রতি শুক্রবার সাধুধার্ম্মিক ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণের সহবাসে যাপন করিতাম। সিংহাসনারোহণের এক বৎসর পূর্ব্বে আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, কোন শুক্রবার মদ্যস্পর্শ করিব না। এবং আজীবন এই প্রতিজ্ঞাপালনে শক্তি অর্জ্জন করিবার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলাম।"

যৌবনের অত্যাচারের বিষময় ফল হাতে হাতে ফলিল। জাহাঙ্গীর শীঘ্রই মৃত্যু-মুখে পতিত হইলেন। কিন্তু তাঁহার ন্যায় একজন বদ্ধপ্রকৃতি মদ্যপায়ী অমিতাচারের বিষময় ফল যে সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা তদ্বারা প্রচলিত দুইটি নিয়মের দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে। প্রথমটি তাম্রকূটসেবন দ্বিতীয়টি মদ্যপান নিবারণকল্পে। তামাকের ধূমপানে প্রজাগণের স্বাস্থ্যভঙ্গ ও মানসিক অবনতি ঘটিতেছে দেখিয়া তিনি আদেশ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার রাজ্যে কেহই তাম্রকূট সেবন করিতে পারিবে না। তাঁহার ভ্রাতা শাহা আব্বাসও ইহার সমূহ অপকারিতার বিষয় অবগত হইয়া পারস্য প্রদেশে ধূমপানের বিরুদ্ধে আদেশপত্র প্রচার করিয়াছিলেন। মদ্যপান সম্বন্ধে তিনি এই নিয়ম প্রচলিত করিলেন যে, কেহ সুরা, সরাপ, বা অন্য কোন প্রকার তরল মাদক দ্রব্য প্রস্তুত বা বিক্রয় করিতে পারিবে না। এ বিষয়ে আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি।

সম্রাট সাহাজানের বিষয় জাহাঙ্গীর বলিয়া গিয়াছেন যে, ২৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত, যদ্যপি তখন তিনি বিবাহিত ও একটি নাতি-বৃহৎ পরিবারবর্গের কর্ত্তা, তথাপি তিনি কদাপি সুরা স্পর্শও করেন নাই। সাজাহানের রাজত্ব বিষয়ক অনেকগুলি ঐতিহাসিক পুস্তক আছে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার পানাভ্যাসের কোনপ্রকার উল্লেখ আছে কিনা সন্দেহ। ঔরঙ্গজেবের বিষয় কিছু বলা বাহুল্যমাত্র। একজন প্রসিদ্ধ লেখক যথার্থই বলিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার জ্ঞানোদয়ের পরমুহূর্ত্ত হইতেই তিনি মদ্যপান ও মাংসাহার ত্যাগ করিয়াছিলেন; এবং অন্তঃকরণের বিশুদ্ধতা সাধনার্থে কোন প্রকার অপবিত্র ও নিষিদ্ধ দ্রব্য গ্রহণ করিতেন না।

অপর মোগলসম্রাটগণের ইতিহাস ও জীবনীর সহিত আমাদের বিশেষ পরিচয় নাই। তবে এই প্রসঙ্গে আমরা ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রথিতনামা দুইজনের নামোল্লেখ করিতে পারি। প্রথমতঃ মুর্শীদ কুলি খাঁ কখনও সুরা বা অন্য কোন প্রকার মাদক ভৈষজপদার্থ স্পর্শ করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, আলি বর্দ্দী খাঁ মদ্যপান ত দূরের কথা, এমন কি ধূমপান হইতেও বিরত ছিলেন।*

শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

---

* বিশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি যে, এই প্রবন্ধ রচনায় বিখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার মহাশয় লিখিত একটি ইংরাজি প্রবন্ধ ও পরম পূজনীয়া শ্রীমতী কুমুদিনী মিত্র মহোদয়ার "জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী" হইতে সাহায্য পাইয়াছি।

মানভঙ্গ

(গল্প)

১

"যাও' বলি শোন, একটা বাইসিকেল চড়ে ঘুরে বেড়াও।"

"হতাশ প্রণয়ের জন্য বাইসিকেল! সত্য বলছি ডাক্তার সাহেব, আজ আপনার মাথার ঠিক নাই।"

"না বাপু! আমার কিছু মাত্র মস্তিষ্কের রোগ ঘটে নাই। তোমার ধারণা নেই যে তাজা বাতাস আর পরিশ্রম এ দুটো জিনিষ ভাঙ্গা মনকে জোড়া লাগাতে কতটা পটু! দোকানদারেরা যেমন ভাঙ্গা ডিস আটা দিয়ে বে-মালুম জোড়া দিয়ে দেয় এই প্রকৃতিদত্ত আটা দু'টোও তেমনি ভাঙ্গা মনকে বেমালুম জোড়া দিয়ে দিতে পারে।"

"আচ্ছা আপনি সকল হতাশ প্রণয়ীকেই কি এই ব্যবস্থা দেন?"

"না—যখন অন্য কোন উপায় দেখি নে—তখনই এই ব্যবস্থা দিয়ে থাকি। এটা চরম ব্যবস্থা!"

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া নলিনীকান্ত বসু ডাঃ এম, এন, বসুর নিকট বিদায় লইয়া ধীরে ধীরে উদাস মনে বাড়ীর দিকে চলিল। আজ তাহার নিকট সমস্ত পৃথিবীটা তিক্ততায় ভরা! স্ত্রী শ্রীমতী যুথিকাবালা এক সপ্তাহের কড়ারে বাপের বাড়ী গিয়া মায়ের অনুরোধে এক মাসের উপর সেখানে রহিয়া গিয়াছেন। এই ঘটনায় স্ত্রীর ভালবাসার প্রতি স্বামীর ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। তেমন ভালবাসা থাকিলে নাকি যুথিকা এতদিন না আসিয়া থাকিতে পারিত! ভগ্ন হৃদয়ে তাই তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন স্ত্রীকে আর আনিতে যাইবেন না। পত্নীরও জেদ, স্বামী গিয়া সাধিয়া না আনিলে - তিনি শ্বশুরালয়ে আসিবেন না।

এই বিবাদে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে চির বিচ্ছেদেরই এক রকম সৃষ্টি হইয়াছে। কেহ কাহারো জেদ ছাড়িতে প্রস্তুত নহেন।

এইরূপ প্রতিজ্ঞার পর হইতে নলিনীর ক্ষুধা তৃষ্ণা একেবারেই ছিল না; রাত্রে নিদ্রা দেবীর সহিতও বনিবনাউ নাই। বন্ধুবান্ধবের সহিত দেখা সাক্ষাৎ একেবারে বন্ধ।

ডাক্তার সাহেবের ব্যবস্থা শুনিয়া তাহার মনে হইল,—"এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব! আর দাদা যখন দেখিবেন আমি দুখানা চাকার উপর বসিয়া ভাঙ্গা মন জোড়া দিতে উদ্যত হইয়াছি তখন তিনি কি বোকাই ঠাওরাইবেন আমায়!"

কিন্তু নলিনী শেষ রক্ষা করিতে পারিল না তাহাকে একখানা বাইসিকেল কিনিতেই হইল। তবে দিনের বেলা চড়িয়া সকলের উপহাসভাজন হইবার ইচ্ছা করিল না।

রাত্রি তখন বেশ গভীর, নলিনীর বাটীর সকলেই নিদ্রামগ্ন। নিদ্রা নাই কেবল নলিনীর চক্ষে! চোরের মত আস্তে আস্তে সে ঘর হইতে বাহির হইয়া বাইসিকেল খানি লইয়া রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল। গায়ে তার তখন সবচেয়ে একটা পুরাতন পোষাক আর পায়ে দুই বৎসরের পুরান টেনিস-শু!

রাস্তায় আসিয়া তাহার মনে হইল,—“বাইক চড়া অতি সহজ কাজ নিশ্চয়ই, না হলে সহরের প্রায় সকল ছেলেই এগুলো এত ব্যবহার করত না!”

গাড়ীখানা রাস্তায় দাঁড় করাইয়া নলিনী একবার উঠিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু হায়! তাহার মনের সহিত ত' গাড়ি খানার এতটুকু ঐক্য নাই! নলিনী যেমন এক দিক দিয়া উঠিতে যায় গাড়ীখানি অমনি অন্যদিকে ঝুঁকিয়া পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে সামনের চাকা এমন ভাবে ঘুরিয়া যায় যে নলিনীর পক্ষে সেটাকে আয়ত্তে রাখা দুঃসাধ্য বলিয়া মনে হইতে থাকে।

“এটা ত' দেখছি বড় কথার অবাধ্য। আমার মনের ভাবটা আদৌ বুঝতে পারে না। কি বোকা!”

যখন সে দেখিল পাশ হইতে গাড়ীতে উঠা এক রকম অসম্ভব তখন ঘুরিয়া অন্য পাশে আসিয়া দাঁড়াইল; মনে করিল কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিলে গাড়ীটা যখন অন্যমনস্ক হইবে তখন সে একলাফে উঠিয়া পড়িবে। কিন্তু গাড়ীটা আবার তাহার অপেক্ষাও চালাক। নলিনী উঠিতে না উঠিতে এক পাশে কাত হইয়া পড়িল সঙ্গে সঙ্গে সেও ধূলায় পড়িয়া গেল। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই নলিনী উঠিয়া দাঁড়াইয়া গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া ফেলিয়া বাইক ধরিয়া ভাবিতে লাগিল,—“নিশ্চয়ই কোন একটা কৌশল আছে; জানি না বলিয়াই আমি চড়িতে পারিতেছি না। তাহা না হইলে অন্য লোকেই বা চড়ে কি করিয়া?”

এবার তাহার অল্পে অল্পে স্মরণ হইল যে, অন্যলোকে গাড়ীর পিছন হইতে উঠে। সেও তেমনি ভাবে চড়িতে গেল কিন্তু তাহার কাছ হইতে গাড়ীর হাতলটা এত দূরে যে সে রকম ভাবে চড়াও তাহার পক্ষে অসম্ভব বলিয়া মনে হইতে লাগিল। কাজেই এ চেষ্টাও তাহাকে ত্যাগ করিতে হইল।

“তাই ত ব্যাটাকে বাগাই কি ক'রে? এক দণ্ডও যদি স্থির হ'য়ে দাঁড়াত'!” কিন্তু গাড়ীটা একদণ্ডও স্থির হইয়া দাঁড়াইতে একান্ত নারাজ!

আপনার অসমর্থতায় নলিনী প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলিল—“হয় চড়িব না হয় মরিব।” সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুখে একটু বিষাদের হাসি ফুটিয়া উঠিল,—মনে হইল “দুই-ই করিতে পারি!”

তাহার পর গাড়ীটা লইয়া আবার ছুটিয়া চলিল; মৎলব রহিল গাড়ী যখন আপন বেগে ছুটিয়া চলিতে থাকিবে সে তখন উঠিয়া পড়িবে। কিন্তু তাহার ভাগ্যে আর সে সুযোগ মিলিল না; গাড়ীর পিছন ধরিয়াই ক্রমাগত ছুটিতে লাগিল।

তখন তাহার দিক্‌বিদিক জ্ঞান ছিল না। কখন যে রাস্তা ছাড়িয়া মাঠের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে তাহা সে আদৌ টের পায় নাই। হঠাৎ “ও কি!” বলিয়া নলিনী উপরে চাহিয়া দেখিল তাহার মাথার উপর মস্ত একটা গাছ! সেটা মাঠের উপর একেবারে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল আর কিসের একটা ভারে নড়িতেছিল।

গাড়ীটা কিন্তু ইহাতে একটুও ভয় পাইল না, বা থামিবার কোন লক্ষণই প্রকাশ করিল না। নলিনী তখন ঊর্দ্ধমুখে,—সামনে যে একটা ডাল ভাঙ্গিয়া পড়িয়া পথটা একেবারে

জোড়া করিয়া রাখিয়াছিল তাহা সে মোটেই জানিতে পারে নাই; কাজেই বেগ সামলাইতে না পারিয়া সে গাড়ী সমেত পড়িয়া গেল। তখন প্রকৃত ব্যাপারটা আর বুঝিতে বাকি রহিল না। তাড়াতাড়ি উঠিয়া গায়ের মলা ছাড়িয়া ফেলিয়া একটা মৎলব ঠিক করিয়া লইল।

মাঠের উপর যে ডালটা ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল সেটা অনায়াসেই ধরা যায়। নলিনী ভাঙ্গা ডালটার উপর উঠিয়া সেই ডালটা বেশ শক্ত করিয়া ধরিল তাহার পর গাড়ীখানি সোজা করিয়া একলাফে উঠিয়া পড়িল। এতক্ষণে তাহার আশা পূর্ণ হইল।

হাতলটা শক্ত করিয়া ধরিয়া পা নাড়িতেই গাড়ী তীর বেগে ছুটিয়া চলিল;—হর্ষভরে মুহ্যমান নলিনী ঠিক সোজা ভাবে বসিয়া পা নাড়িতে লাগিল!—নূতন দামী গাড়িটা ক্রমেই জোরে ছুটিয়া চলিল। কিন্তু সেই চামড়া-মোড়া আসনে বসিয়া নলিনী মোটেই সুখ পাইল না;—সেটা তাহার কাছে বড় যন্ত্রণাদায়ক, বড় বিড়ম্বনা পূর্ণ মনে হইতে লাগিল। সে একদণ্ডও স্থির হইয়া বসিতে পারিল না—তপ্ত পাত্রে মাছির মত ক্রমাগত এপাশ ওপাশ করিতে লাগিল। তখন সে স্পষ্টই বুঝিতে পারিল সমস্ত রাত্রিটা এভাবে কাটান বড় সহজ হইবে না।

কিন্তু গাড়ীটা তাহার সহিত প্রথম আলাপ হইতেই বেশ সদ্ব্যবহার করিতে লাগিল, তাহাকে লইয়া সাপের মত বাঁকিতে বাঁকিতে ছুটিয়া চলিল;—তখন তাহার মনে হইতেছিল বুঝি পুকুরের মাছেরাও সারি বাঁধিয়া ঘুরিবার সময় ইহা অপেক্ষা সোজা যায়। এমন বাঁকা গতি সে আর জীবনে দেখে নাই।

প্রতি মুহূর্ত্তেই তাহার মনে হইতেছিল—"এইবার বুঝি ফেলিয়া দেয়, এই বুঝি ফুট্‌পাথে বাধিয়া, এই বুঝি দেওয়ালের গায়ে লাগিয়া সে পড়িয়া যায়! কিন্তু গাড়ীটাকে খুব বুদ্ধিমান বলিতে হইবে, একবারও সে নলিনীকে সে ভাবে বিপন্ন করিল না। আষাঢ়ের বারিধারার মতো তাহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া ঘাম ছুটিতেছিল কিন্তু তাহা মুছিবার উপায় নাই। কারণ তাহাকে সোজা হইয়া থাকিতে হইল। কিন্তু ক্রমে তাহার মনে হইতে লাগিল আর বুঝি সোজা হইয়া থাকিতে পারে না,—তখন তাহার সর্ব্বশরীর টন্‌টন্ করিতেছিল দেহটা কেবল একপেশে হইয়া পড়িতেছিল। আর সব চেয়ে বেশী কষ্ট হইতেছিল তাহার গাড়ীর দ্রুত গতিতে!

"এটা যে দেখ্‌চি আমায় অস্থির ক'রে তুললে গা! এমন বিপদেও মানুষ পড়ে? যদি একবার মুহূর্ত্তের জন্যেও থামে তবে নিশ্বাস ফেলে বাঁচি যে!" এই কথাগুলোই কেবল তখন নলিনীর মনে হইতেছিল। কিন্তু গাড়ীটা থামিবার এতটুকু লক্ষণও দেখাইল না বরং জোয়ারের স্রোতের মতো আরো জোরে ছুটিয়া চলিল।

যাহা হউক অনেক ঘোরপ্যাঁচের পর গাড়ীটা একটু মন্থর গমনে চলিতে লাগিল। এতক্ষণে নলিনী কতকটা নিশ্চিন্ত হইল। কতকটা আনন্দের সহিত সে বলিয়া উঠিল—"আঃ বাঁচা গেল এতক্ষণে!"

একমনে সে গাড়ী ছুটাইয়া চলিতে লাগিল, ঘামের জলে সমস্ত কাপড় ভিজিয়া গিয়াছিল

তৃষ্ণায় গলা একেবারে শুখাইয়া গিয়াছিল, প্রাণ ছট্ ফট্ ক'রতেছিল,—কিন্তু তবুও গাড়ীর বিরাম নাই বিশ্রাম নাই।

মাঠ পার হইয়া নলিনী বরাবর পাকারাস্তা ধ'রয়া চলিতেছিল; রাত্রে বাধা বিঘ্ন বড় একটা কিছুই ছিল না চাঁদনীর আলোয় তরতর করিয়া রাস্তার পর রাস্তা পার হইতেছিল কাজেই তাহার মনে তখন কতকটা স্ফূর্তির লক্ষণ দেখা দিয়াছিল। এখন গাড়ীটা তাহার কাছে কতকটা পরিচিত বলিয় মনে হইতেছিল।

কিন্তু শীঘ্রই একটা দোষ বাহির হইয়া প'ড়িল। তাহার মনে হইল গাড়ীটা বড় একগুঁয়ে। ডাইনে মোড় ফিরিবার সময় কেমন সে সুবোধ বালকটীর মত নীরবে চলিয়া যায় কিন্তু বামদিকে আসিবার সময়ই অবাধ্য হইয়া পড়ে। কিছুতেই সেদিকে ফিরিতে চাহে না,—কি গোঁয়ার!

বামদিকে ফিরাইবার প্রথম উদ্যমেই তাহার মনে পড়িয়া গেল, হায়! যুথিকা আজ যদি তাহার এই কষ্ট দেখিত!......হায় যুথিকা! আজ তুমি কোথায়?" এতক্ষণ পরে এই প্রথম যুথিকার কথা তাহার মনে পড়িল; প্রিয়ার প্রথম স্মরণে তাহার সমস্ত দেহটা একবার কাঁপিয়া উঠিল। মনে হইল, ডাক্তার সাহেবের কি ভ্রম! পৃথিবীর সকল সাইকেল গুলি যদি আমায় এক এক করিয়া ভাঙ্গিতে দেয় তাহা হইলেও যুথিকার স্মৃতি এ হৃদয় হইতে মুছিবে না! সেই ভ্রমরকৃষ্ণ চুলে ঢাকা নলিনীর মতো মুখখানি কখনও কি ভোলা যায়!

নলিনী নিরাশার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। নৈশ নিস্তব্ধতার মধ্যে সেটা একটা ভীষণ দৈত্যের গর্জ্জনের মত ফিরিয়া ফিরিয়া তাহার কাণে প্রতিধ্বনি আনিয়া দিতে লাগিল। যুথিকার কথা ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ গাড়ীর দোষটা সে ভুলিয়া গিয়াছিল,—হঠাৎ আবার চেতনা হইল, "বাঁদিকে এটা ফেরে না যে! কি একগুঁয়ে গাড়ীটা! একেবারে যেন প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছে—বামদিকে ফিরিব না! তবে কি করা যায়?

নলিনী জোরে একবার ঝন্‌কা দিল,—সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীটা বাঁদিকে ফিরিল কিন্তু পরক্ষণেই ডাইনে ছুটিয়া চলিতে লাগিল। কাছেই একটা ডানহাতি মোড়, নলিনী পূর্ণবেগে মোড়ের মাথায় আসিয়া দেখিল মহাবিপদ! সামনে মাল বোঝাই একটা গরুর গাড়ী, বামদিকে যাইতে না পারিলে আর রক্ষা নাই!

"হা ভগবান! এইবার আমার দশা কি হবে? হয় চাপা পড়িব না হয় গাড়ী সমেত পড়িয়া মরিব! কি ভয়ানক বিপদ!"

গাড়োয়ান উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া নলিনীকে সাবধান করিতে লাগিল। রাস্তাটা তখন ধূলায় পূর্ণ; নলিনীর চোখে মুখে ধূলা ঢুকিতে লাগিল;—সে আর চক্ষে কিছুই দেখিতে পাইল না,—মুদ্রিত চক্ষে অগ্রসর হইতে হইতে কেবল গাড়োয়ানের দুই একটী কথা শুনিতে পাইতেছিল। তাহার পর বাইক্‌টা সশব্দে মালগাড়ীর উপর আসিয়া পড়িল। হঠাৎ নলিনী চোখ চাহিয়া দেখিল গাড়ীটা কি যেন একটা দৈবচালনায় বামদিকে আসিয়া পড়িয়াছে।

"ওঃ খুব বেঁচে গেছি আজ! আর একটু

হ'লেই প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়ে যেত! এখন মুখের ধূলোটা একবার মুছে নিতে পাল্লেই বড় ভাল হ'ত, কিন্তু তার ত' কোন উপায় দেখ্‌ না।"

সে রাত্রে কখন এবং কি উপায়ে যে নলিনী বাড়ী ফিরিয়াছিল তাহা তাহার আদৌ মনে নাই;—তবে এটা বেশ স্মরণ আছে যে ফিরিবার সময় গাড়ীটী তাহারই স্কন্ধে চড়িয়া আসিয়াছিল, তাহাকে চড়িতে দেয় নাই।

(২)

বলা বাহুল্য রাত্রিভ্রমণের এইরূপ পরিশ্রান্তির পর পরদিন প্রাতঃকালে নলিনীনাথের উঠিতে বিলম্ব হইল। বেলা ৮টার সময় সে নীচে আসিয়া দেখে মহা হৈ চৈ। উঠানে অনেক লোকজন—আর সেই জনতার শীর্ষদেশে দাঁড়াইয়া একজন, মুণ্ডিতগুম্ফ, লম্বিতশ্মশ্রু, চূড়াবিহীন-ধড়াধারী বাঙ্গালী মুসলমান—হস্তের গোতাড়নী যষ্টি আস্ফালনসহকারে তাহার দাদার সহিত উচ্চ স্বরে কথা কহিতেছে। নলিনীর হৃৎপিণ্ড কাঁপিয়া উঠিল, এ ত' গত রাত্রির সেই গাড়োয়ান নহে! তাহার সন্দেহ মুহূর্ত্তে নিঃসন্দেহে পরিণত হইল। নলিনীকে দেখিবামাত্র—যেন ঈপ্সিত ধন হাতে পাইয়া সানন্দে আতাবীজবিনিন্দিত দন্তপংক্তি বিকাশিত করিয়া সেই লোকটা বলিয়া উঠিল,—"এই—এই মশায়—এই বাবুটি। আমার গাড়ীর উপর প'ড়ে গুড়ের কলসীগুলো সব উল্টে দিয়েছে। একটা আধটা নয়—দশ দশটা কলসী মশায়—বলব কি,—রাস্তাটায় যেন আলকাতরা ঢেলে দিলে। দাও মশায় এখন দামটা চুকিয়ে দাও—অনেক কষ্টে বের করেছি তোমাকে! তাতেই ত লোকে বলে—করীম বেপারীর পো ইচ্ছা করে ত—"

একজন স্ত্রীলোক অগ্রসর হইয়া তাহার কথা শেষ না হইতেই বলিয়া উঠিল, "তবু ত ভাই তোর কলসী গুড়ের,—যখন ধাক্কা খেয়ে আমার ঘিয়ের হাঁড়িটা গেল,—তখন চক্ষে যেন শরষে ফুল দেখনু। মুই মেয়ে মানুষ কি সামলতে পারি! বলি চড়তে যদি না জান,—ত পায়ে হাঁট না কেন? দেখ বাবু—তোমার এ ভাইটি বড় নচ্ছার—আমরা হলে এ'কে দড়া দিয়ে খুঁটিতে বাঁধি। কি বল সেখ চাচা!"

নলিনীর দাদা—অনেক কষ্টে তাহাদিগকে একটু শান্ত করিয়া তীব্রকণ্ঠে নলিনীকে কহিলেন—"এরা যা বলছে—শুনলে ত? সব কি সত্যি?"

নলিনীর তখন মাথা ঘুরিয়া উঠিয়াছে—বিবর্ণমুখে ক্ষীণকণ্ঠে সে কহিল—"দাদা বাইসিকেলটা একখানা গরুর গাড়ীতে লেগেছিল বটে,—কিন্তু গুড়ের কলসী ত পড়তে দেখিনি—আর আর ঘিয়ের হাঁড়ি ফেলে দিয়েছি বলেও ত জানিনে।" ভীষণ তীব্রস্বরে ইহার প্রতিবাদ উত্থিত হইল। একজন বলিল "জানুনি? তা জানবে কেন? কি রকম ভদ্রলোক তুমি গা! ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে বলে কিনা—জানুনুনি?"

আর একজন বলিল—"দেখনি! চলো আমার বাড়ীতে দেখিয়ে আনিগে। গুড়ের কলসীর টুকরগুলো আমি ত আর ফেলে আসিনি!—মশায়—সাবাস কথাদার!"

নলিনীর দাদা—কভু রুষ্ট বাক্যে—কভু মিষ্ট বচনে তাহাদিগকে বুঝাইয়া পড়াইয়া অনেক কষ্টে একটা রফারফি করিয়া ফেলিলেন।

হাতে হাতে ক্ষতিপূরণস্বরূপ অর্থ লাভ করিয়াও-অসন্তুষ্টচিত্তে গণগণ করিতে করিতে তাহারা যখন চলিয়া গেল—তখন তিনি লজ্জিত নতমুখ ভ্রাতাকে লেকচারদানে– হঠাৎ এতটা অপব্যয়জনিত ক্ষোভ নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু আপাততঃ এসুখেও তাঁহাকে বঞ্চিত হইতে হইল। তিনি দুএকটা কথা কহিতে না কহিতে দুইজন পাহারাওয়ালার সহিত একটি ভদ্রলোক তাঁহার উঠান আলোকিত করিয়া উদয় হইল। ভদ্রলোকটি আসিয়া নলিনীর প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিল—"হ্যাঁ ইনিই বটে,—এঁকেই আমি সেই বাইসিকেলটা ধরে রাস্তা দিয়ে যেতে দেখি। ঐ যে ঐ যে—বাইসিকেলটাও যে ঐ দেয়ালে রয়েছে।"

এ এক নূতন বিপদ! নলিনীর দাদার মুখের কথা মুখেই লয় পাইয়া গেল, তিনি হতভম্ব হইয়া পড়িলেন। পুলিশের লোক প্রথমে বাইসিকেলটা হস্তগত করিয়া পরে নলিনীকে গ্রেপ্তার করিল। নলিনী যে সেটা চুরী করে নাই ক্ষীণকণ্ঠে এরূপ প্রতিবাদ করিতে সে অবশ্য ত্রুটি করিল না। কিন্তু অপহৃত বাইসিকেলের নম্বর মিলিয়া গিয়াছে,—মালিকের নামের অক্ষরও ইহার একস্থলে লেখা আছে। সুতরাং তাহার কথা গ্রাহ্য করে কে! নলিনী বন্দী হইয়া তাহাদের সহিত চলিল। তাহার ভাই জামিনের বন্দোবস্তে তাহাকে মুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে উকীল বাড়ী রওয়ানা হইলেন।

* * *

এ কি! তাহারা কোথায় আনিল তাহাকে? এ যে তাহার শ্বশুরবাড়ী!

বাইসিকেলের মালিক বামাচরণ মাল-শুদ্ধ চোর হাজির শুনিয়া নীচে আসিয়া অবাক হইয়া গেলেন।— "একি তুমি নলিনি! তুমি চোর—ব্যাপারখানা কি?—

"সে সব কথা আড়ালে হলেই ভাল হয় না—"

বামাচরণ পাহারাওয়ালা ও সেই গোয়ান্দাকে নীচে বসাইয়া তাহাকে উপরে আনিয়া বলিলেন—"এইবার বল্ দেখি এ বাইসিকেলটা কোথায় পেলি? এ যে সত্যই আমার। শেষে চোর হয়ে বাড়ী ঢুকলি।

"তোমাদেরই যাদুবিদ্যার তারিফ্! আস্ত-সাধুকেও চোর বানাতে পার!"

"তুই যেমন মূর্খ তেমনি ফল। শেষে চোরাই মালটা তোকে গতালে!"

নলিনী বলিল—"অদৃষ্ট মন্দ হলে এই রকমই হয়। সব তাতেই গোলাম চোর! যাহোক এবারটা একরকম করে উদ্ধার কর, এই নাকে কাণে খৎ– আর কখনো বাইসিকেলে মনের জ্বালা নেভাতে যাব না।

বামাচরণ হাসিতে হাসিতে নীচে পুলিসের কাছে চলিয়া গেলেন,—যূথিকা গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল।

নলিনী তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া বলিল, —"ঘাট মানছি—আর এমন কর্ম্ম কখনো করব না,—তোমারি জিৎ,—তোমার বিরহকষ্ট ভুলতে গিয়েই আমার এ দুর্দ্দশা হয়েছে।"

পাশের ঘরে—তাহার ছোট শালীটি হারমোনিয়ম বাজাইয়া গান ধরিল,—"সেই ত মান ভাঙ্গাতে হোল লোক কেন হাসালে।"

শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ব্রতমন্ত্র

(৪)

সেঁজুতি-ব্রত

এই ব্রতের নাম "সেঁজুতি" না হইয়া "সপত্নী নিবারণী" হওয়াই উচিত ছিল। কারণ ইহার সকল ছড়াগুলিই সপত্নীনিবারণোদ্দেশ্যেই রচিত। এই ব্রত পুরাকালে প্রচলিত ছিল না। বল্লাল সেন প্রবর্ত্তিত কৌলিন্য-প্রথা যখন বংশ পরম্পরাগত হইল এবং যখন কুলীন ব্রাহ্মণেরা একাধিক বিবাহ করিতে আরম্ভ করিলেন তখন সপত্নী নিবারণের জন্যই এই ব্রতের সৃষ্টি হইল।

এই ব্রত কুলীন ব্রাহ্মণকন্যাদিগের মধ্যেই বেশী প্রচলিত। এই ব্রত কার্ত্তিকমাসের সংক্রান্তির দিন হইতে আরম্ভ করিয়া অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তি পর্য্যন্ত করিতে হয়। এই ব্রত চারি বৎসর করা নিয়ম। বালিকারা কার্ত্তিক মাসের সংক্রান্তির দিন সকাল বেলা স্নান করিয়া এই ব্রত করে। তারপর প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় করে। ছাতে, বারাণ্ডায়, দালানে কিম্বা প্রাঙ্গণে আলিপনার দ্বারা ছড়া অনুসারে সমস্ত আঁকিয়া লয়। ষোলটী ঘরে ষোলটী প্রদীপ জ্বালিয়া দেয়। একটী পূর্ণ ঘট বসাইয়া দেয়। সমস্ত অঙ্কিত হইয়া গেলে ধান, দূর্ব্বা, ফুল, চন্দন দিয়া কতকগুলি ছড়া বলিয়া পূজা করে। সে সমস্ত ছড়া অধিকাংশই সপত্নী বিদ্বেষে পূর্ণ বলিয়া সেগুলি লিপিবদ্ধ করিতে বিরত থাকিলাম।

হরির চরণ-ব্রত

"হরির-চরণ-ব্রত" বাংলা দেশে প্রায় সমস্ত হিন্দু বালিকাদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে। এই ব্রত বৈশাখ মাসের প্রথম দিন হইতে আরম্ভ করিয়া সংক্রান্তির দিন পর্য্যন্ত করিতে হয়। এই ব্রত চারি বৎসর করা নিয়ম। ব্রতকারিণী প্রথমে একখানি তাম্রকুণ্ডে অথবা অন্য কোন পাত্রে শ্বেত চন্দন মাখায়। তাহার উপর অঙ্গুলি দিয়া দুইখানি ছোট ছোট "হরির-চরণ" অর্থাৎ পা আঁকিয়া লয়। তৎপরে ঐ চরণ দুখানির উপর ধান, দুর্ব্বা ফুল দিয়া দুই খানি চরণ দুটী অঙ্গুলি দিয়া ধরিয়া—গত আষাঢ় মাসের "ভারতীতে" প্রকাশিত "হরির-চরণ ব্রতের" ছড়াটি বলে।

ছড়াটী তিনবার বলে। তার পর নমস্কার করে।

কুলকুলতি-ব্রত

আমার লিখিত "কুলকুলতি-ব্রতের" ছড়া ও নিয়ম একবার "ভারতীতে" প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু "কুলকুলতি-ব্রতের" আর একটি রূপ আছে তাহাতে নিম্নলিখিত দুএকটি অতিরিক্ত মন্ত্র আবৃত্তি করিতে হয়। প্রদীপটী তিনবার ঘুরাইয়া কুলপাতার উপর রাখিবার পর ব্রতকারিণী একটী ফুল লইয়া সেটি কুলপাতার উপরে হাতে ধরিয়া বলে,

"কার্ত্তিক মাসে তুলা রাশে ধুপ দীপায় নমঃ"

তৎপরে ফুলটী তুলসী গাছের গোড়ায় ফেলিয়া দেয়। এইরূপ তিনবার করে।

পরে নীচের ছড়াটী বলিয়া তুলসীগাছের তলায় জল ঢালিয়া দেয়ঃ—

"তুলসী তুলসী নারায়ণ
তুমি তুলসী বৃন্দাবন।
তোমার শিরে ঢালিলাম জল,
অন্তিমকালে দিও স্থল।"

তারপর নিম্নলিখিত ছড়াটী বলিয়া প্রণাম করেঃ—

"তুলসী তুলসী মাধবী লতা
কহ তুলসী কৃষ্ণ কথা।
কৃষ্ণকথা শুনিলাম কানে
দ্বাদশ দণ্ডবৎ তুলসীর চরণে।"

এই "কুলকুলতি ব্রতটী" পড়িবার পূর্ব্বে পাঠিকাগণ যেন আমার আগেকার "কুলকুলতি-ব্রতটী" পড়িয়া লন। তাহা না হইলে বুঝিতে কষ্ট হইতে পারে।

পুণ্য-পুকুর-ব্রত

এই ব্রত চৈত্র মাসের সংক্রান্তির দিন হইতে আরম্ভ করিয়া বৈশাখ মাসের সংক্রান্তি পর্য্যন্ত করিতে

হয়। এই ব্রত চারি বৎসর করা নিয়ম। বালিকারা চৈত্রমাসের সংক্রান্তির দিন সকাল বেলা প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে একটি গর্ত্ত খনন করে। ঐ গর্ত্তের মধ্যে একটী কাঁটাযুক্ত, সিন্দূরলেপিত বেলগাছের ডাল পুঁতিয়া দেয়। তৎপরে ঐ গর্ত্তের ভিতর জল ঢালিয়া দিয়া, ফুল, চন্দন, দূর্ব্বা লইয়া গত বৈশাখ সংখ্যা "ভারতীতে" প্রকাশিত শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবী কর্ত্তৃক লিখিত "পুণ্যি পুকুর" ব্রতের" ছড়াটী বলিয়া ফুলগুলি ঐ গর্ত্তের মধ্যে ফেলিয়া দেয়। এই রকম তিনবার করে।

পূজা শেষ হইলে নিম্নলিখিত ছড়াটী বলিয়া বর প্রার্থনা করে ঃ—

"হে হর পার্ব্বতী, দাও মাগো সুমতি,
আমি অতি হীনমতি, নাহি জানি স্তব স্তুতি।
সাবিত্রী সম সীতা, হই যেন পতিব্রতা।
মনের সুখে করি ঘর,দাও মাগো এই বর।"

শ্রীমতী রেণুকা বালা দাসী।

হালাম জাতি

কুকি, নাগা প্রভৃতির ন্যায় হালামও একটি পার্ব্বত্য জাতিবিশেষ। পার্ব্বত্য ত্রিপুরায় এবং শ্রীহট্টের স্থানে স্থানে এই জাতীয় লোকের বাস। ইহাদের আকৃতি অনেকাংশে কুকির অনুরূপ। হালামের উৎপত্তি সম্বন্ধে উহাদের মধ্যে প্রচলিত প্রবাদ এই ঃ—

"পৃথিবী যখন জলময় ছিল, তখন চতুর্দ্দশ দেবতা (১) কিঞ্চিৎ মাটি আকাশে ঝুলাইয়া দেন। ঐ মাটির কিয়দংশ ইন্দুরে কাটিয়া ভূতলে ফেলিলে তাহা হইতে খুরতাবুং নামক স্থানে এক পুরুষ ও রমণীর আবির্ভাব হয়। ঐ স্ত্রী ও পুরুষ হইতেই হালাম জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। জনশ্রুতি এই, খুরতাবুং মণিপুরের উত্তরে অবস্থিত। ব্রহ্মবাসীগণ কর্ত্তৃক জন্মভূমি হইতে বিতাড়িত হইয়া হালামেরা শ্রীহট্ট অঞ্চলে আসিয়া আশ্রয় লয়। শ্রীহট্টে পাথারিয়া পরগণা ইহাদের আদিম উপনিবেশ স্থান। উত্তরোত্তর ইহারা পার্ব্বত্য ত্রিপুরায় বসতি বিস্তার করিয়াছে। তাহাদের মতে বিড়াল, কুকুর, ছাগ, শূকর, মোরগ প্রভৃতি সকলেরই বিভিন্ন নির্দ্দিষ্ট জন্মস্থান আছে।

হালামের মধ্যে ভারা, চড়াই, লাংলু, থপ্‌লাপু, আঙ্গাচেপ, বান্‌মাহের, দাক্ষিণ, রাংরো, লাংকাই, ভিভল্‌, তেলকৈ, রূপণী, জাংতাক্‌, মরসেকং খুচম্‌, মরয়েরায় প্রভৃতি বহুসংখ্যক সাম্প্রদায়িক বিভাগ আছে। সভ্য জাতির মত আভিজাত্য বা কৌলিন্য প্রথারও অসদ্ভাব নাই। সমাজের শ্রেষ্ঠ আসনে হিন্দুর যেরূপ ব্রাহ্মণ, হালামের তদ্রূপ সাংহুইপো। তৎপরই চুয়াংতাই জাতির স্থান। সর্ব্বনিকৃষ্ট জাতি রাংরো। শ্রেষ্ঠ পদবীর লোক "মনসিব রাজা," তন্নিম্নে গাবুর, আরক, চাপিয়া ও মোক্তারের পদ। ইহাদের হস্তেই আইন কানুন, বিচারদণ্ড ইত্যাদি সমাজ-রক্ষার যাবতীয় বিষয়ের ভার অর্পিত। হালামের বিচারপতি 'মনসিব' নামটির সহিত ব্রিটিশ বিচারক মুন্‌সেফ নামের সুন্দর সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। পঞ্চায়েতি প্রথায় ইহাদের অধিকাংশ বিষয়ের বিচার হয়; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে তাহারা স্বাধীন ত্রিপুরায় ও ব্রিটিশের আইন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। সামাজিক নিয়মভঙ্গ হেতু অপরাধীর প্রতি অর্থদণ্ডের পরিবর্ত্তে মদদণ্ডের ব্যবস্থাই হালাম সমাজে অধিক প্রচলিত। ঝগড়া বিবাদ বড় একটা নাই; বহুলোকে একত্রে এক বাড়ীতে সুখে শান্তিতে বাস করে। স্ত্রীলোকগণ গৃহিণীপনা ব্যতীত হাট-বাজার এবং কৃষিকর্ম্মও করিয়া থাকে। সমাজে স্ত্রীলোকের বিলক্ষণ সম্মান। তাহারা একাকী স্বাধীন ভাবে যেখানে সেখানে বিচরণ করিতে পারে। স্ত্রীপুরুষ সকলেই নিজেদের প্রস্তুত একপ্রকার ছোট মোটা বস্ত্রে কোনরূপে লজ্জানিবারণ করে এবং জামাও গায় দেয়। স্ত্রীলোকেরা চুল রাখে, খোপা বাঁধে আর নানাবিধ ফুল ও পক্ষীর পালকে মস্তক সজ্জিত

---

(১) হরোমা হরীমা বাণী কুমারো গণকো বিধিঃ, ক্ষাব্ধি গঙ্গা শিখী কামঃ হিমাদ্রিশ্চ চতুর্দ্দশঃ।

করে। কাণে বড় বড় বহুছিদ্র করিয়া হালাম রমণী রিং, কড়ি ও বনফুল গাঁথিয়া পরে; গলায় ফুলের মালা পরে। ফুল ইহাদের প্রিয় অলঙ্কার।

হালামের বিবাহ পদ্ধতি বড়ই চমৎকার। বরকন্যার উপর পিতা মাতার গোড়ামী শাসন মোটেই চলে না। ইহাদের মতে দুইটি প্রাণের মিলনই পরিণয়। সেই জন্য স্বামী স্ত্রী পূর্ব্বেই পরস্পরকে বাছিয়া লয়। বিবাহের পূর্ব্বে পাত্র, পাত্রীর পিতার বাড়ীতে চারি বৎসর বেগারি খাটিয়া দেয়। সমাজে পণপ্রথাও প্রচলিত আছে। বাল্যবিবাহের রীতি নাই। স্ত্রী ও পুরুষ বলিষ্ঠ এবং কার্য্যক্ষম না হইলে বিবাহ হইতে পারে না। বয়সের ন্যূনাধিক্যে বিশেষ দোষ নাই; অর্থাৎ স্বামী তাহার অপেক্ষা অধিক বয়স্কা স্ত্রীও গ্রহণ করিতে পারে। ১৪।১৫ বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া ৩৫ বৎসর পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের বিবাহের কাল। বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে এবং স্ত্রীর মৃত্যুতে স্বামী বহুবার বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু স্ত্রী বর্ত্তমানে স্বামী বহু বিবাহ করিতে পারে না এবং স্বামী বর্ত্তমানে স্ত্রীও পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারে না। কোনো স্ত্রীপুরুষ এই নিয়ম লঙ্ঘন করিলে তাহাকে সামাজিক দণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয়। মোটের উপর হালামের বিবাহসংক্রান্ত নিয়মাবলী অনেকাংশে সভ্য জাতিরও অনুকরণীয়।

ইহাদের জাতীয় ভাষা আছে; কিন্তু তাহা লিখিত নহে এবং বাংলা কিংবা ইংরাজি লেখা পড়াও ইহারা জানে না। তবে অনেকেই ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলায় কথা বলিতে পারে। ঘরে মাচা বাঁধিয়া তদুপরি হালামেরা বাস করে। ইহারা নানাপ্রকার বন্য জন্তু শিকার করিয়া তাহা পোড়াইয়া শুকাইয়া এবং পচাইয়া আহার করে। সিদল নামক একরকম পচা মৎস্য খাইতে ইহারা বড়ই ভালবাসে। লবণের পরিবর্ত্তে সাধারণতঃ ক্ষারের জল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ব্যবহারিক বিদ্যা অর্থাৎ কর্ম্মকার, কুম্ভকার, স্বর্ণকার ও সূত্রধরের কার্য্যে তাহারা পটু নহে, তবে সূত্রধর কুম্ভকার ও তন্তুবায়ের কার্য্য নিতান্ত সাধারণ ধরণে নিজেদের উপযোগী সামান্য করিতে পারে। স্বর্ণ ও রৌপ্যের ব্যবহার হালামেরা আদৌ জানে না; পিত্তল ও লৌহের ব্যবহার কিছু কিছু জানে। অনেক স্থলে লৌহের কাজ বাঁশের সাহায্যে সম্পন্ন করিয়া থাকে। বাঁশ ইহাদের নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু এবং অনেক কার্য্যে ইহার ব্যবহার আছে। বাঁশের অস্ত্র, বাঁশের প্রতিমা প্রস্তুত হয়, অবশেষে সপত্র আস্ত বাঁশগাছটি দেবতারূপে পূজা পায়। সঙ্গীতে তাহাদের রুচি আছে, আর নিজেরাও সঙ্গীত চর্চ্চা করে। ইহাদের ন্যায় মৃগয়াপটু জাতি অতি অল্পই দেখা যায়। হালামের স্বজাতিবাৎসল্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সমাজে কেহ হীনাবস্থায় পতিত হইলে, অন্য দশজনে পালা ক্রমে তাহার ভরণপোষণের ব্যয়ভার গ্রহণ করে। হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত গর্ভাধান, সাধভক্ষণ, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ এবং কর্ণবেদ প্রভৃতি কয়েকটি সংস্কার প্রচলিত থাকিলেও সেগুলি তাহাদের জাতীয় প্রথানুসারে সম্পন্ন হয়। কর্ণবেধ একটি প্রসিদ্ধ উৎসব। শিশুর অষ্টম মাসে গানবাদ্যসহযোগে বিশেষ আড়ম্বরের সহিত এই কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। শুভানুষ্ঠান মাত্রেই সুরাপানের ব্যবস্থা আছে।

হালামেরা মৃতদেহ জ্বালায়। হিন্দুদের ন্যায় শব উত্তর শিরে রাখিয়া তাহাতে পুত্র, স্ত্রী, কিংবা পিতা মাতা অগ্নিসংযোগ করে। এই সময় ইহারা নানারূপ দৈব কার্য্য এবং হরিধ্বনি করে। কোন পদস্থ অথবা ধনবান্ লোকের মৃত্যুতে ঘুঙ্গ নামক বৃহৎ কাঁসর বাজায়, ঐ শব্দ শ্রবণে সমস্ত লোক একত্র হইয়া মৃত দেহের সৎকার করে। মৃতাত্মার মুক্তির জন্য শ্রাদ্ধাদিরও ব্যবস্থা আছে। মৃত ব্যক্তির পুত্র, তদভাবে স্ত্রী, তদভাবে জ্ঞাতি শ্রাদ্ধের অধিকারী। স্থল বিশেষে মাতা পিতাও শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে। ১৪।১৫ দিন অন্তর শ্রাদ্ধ হয়। কেহ কেহ ২০ দিন অন্তরও শ্রাদ্ধ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। এই সময় দৈবকার্য্যের জন্য ফল, অন্ন, বস্ত্র এবং নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য লাগে। আত্মীয় কুটুম্ব ও শ্মশানবন্ধুগণ মৃতের বাড়ীতে আহূত হইয়া শ্রাদ্ধ-বাসরে পানাহার করে। সম্পত্তির অধিকারী প্রথমতঃ পুত্র, দ্বিতীয়তঃ ভ্রাতা, তৎপর জ্ঞাতি। পুত্রদের মধ্যে সর্ব্ব কনিষ্ঠ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অংশ পায়।

হালামদের ঈশ্বরে ভক্তিবিশ্বাস আছে; পরলোক, পাপ-পুণ্য এবং স্বর্গ-নরক সম্বন্ধেও জ্ঞান আছে। ইহারা ঈশ্বরকে "পাথিয়েন" বলে। হালামেরা জড়োপাসক এবং অসংখ্য দেবদেবীর অর্চ্চনা করে। সাধারণতঃ বাঁশ দ্বারা প্রতিমা প্রস্তুত হয়। ওঝা ও গালিম্ পৌরোহিত্য কার্য্যের অধিকারী। পুরোহিতগণ দক্ষিণা-স্বরূপ চাউল, মদ ও তাম্র কিংবা রৌপ্য মুদ্রাদি প্রাপ্ত হয়। পূজার নির্দ্দিষ্ট সময় আছে—কোনো পূজা প্রাতে, কোনো পূজা মধ্যাহ্নে, কোনো পূজা অপরাহ্নে, কোনো পূজা বা রাত্রে হইয়া থাকে। চীনবাসীদের ন্যায় ইহারা ভূতপ্রেতের ভয়ে সর্ব্বদাই শঙ্কিত এবং ভূতপ্রেতের পূজাও দেয়। পাছে উপদেবতায় অনিষ্ট করে, এই আশঙ্কায় কোনো বিশেষ কার্য্য করিতেও পূর্ব্বে কোনো ব্যক্তির মধ্যে ভূত আনাইয়া সেই ভূতাবিষ্ট ব্যক্তির উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিয়া থাকে। সুকুন্দ রায় ও বুকুন্দ রায় হালামদের মতে স্বর্গের রাজা এবং দুর্গা সমস্ত দেবতার জননী। চৌদ্দ দেবতা, সুকুন্দ রায়, বুকুন্দ রায়, ছেপিতে (লক্ষ্মী), কল্লাকি (নদীর দেবতা), সুন্দ্রল পো (যমদূত) কলারায় (দেবদূত), ধনেশ্বরী (বস্ত্রের দেবতা) বিনাইক্ (গণেশ), থচ্মন্নু (হাতীর দেবতা), থলংমা (সুরমা নদীর দেবতা), আদম রাজা, আদমসিং প্রভৃতি বহুদেবতা হালাম সমাজে পূজা পায়। সর্ব্বাপেক্ষা থলংমা পূজার আড়ম্বর অধিক। এই পূজায় হাঁস, কবুতর, মোরগ, শূকর ও পাঁঠা প্রায় চারি পাঁচ শত বলি দেয় এবং ২৫।৩০ কলসী মদ দেওয়া হয়। বহু বৎসর পর অনেকে মিলিয়া চাঁদা উঠাইয়া এই পূজা করে। হিন্দুর ন্যায় চাউল, কলা, ফুল, তুলসী হালামের যাবতীয় পূজায় লাগে। সুরা ও পশুপক্ষী-বলি পূজায় লাগিলেও সকল পূজায় লাগে না। কোনো দেবতা মাংসাশী, কোনো দেবতা নিরামিষাশী, সুতরাং দেবতা বুঝিয়া বিভিন্ন উপকরণের ব্যবস্থা আছে। ভূত প্রেতের পূজা পোড়া মাছ মাংস দ্বারা হইয়া থাকে। নানারূপ বিকটাকার মূর্ত্তি গঠন দ্বারা ভূতপ্রেতের পূজা হয়। স্ত্রীলোক গর্ভবতী হইলে কিংতিং শর্ম্মা, খুলুং শর্ম্মা নামে সাত ভগিনীর এবং সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিন বুড়া দেবতার (ষষ্ঠীদেবীর) পূজা দেওয়া হয়। হিন্দুর দেবতা শিব, কালী, দুর্গাও হালাম মহলে পূজা পাইতেছে। ইহারা হিন্দুদের মত বৎসরে দুইবার (আশ্বিনে ও চৈত্রে) দুর্গা পূজা দেয়। কালী সাত প্রকার। ভদ্রকালী, শ্মশানকালী প্রভৃতি হিন্দুরই কালী হিন্দুরই মত মদ মাংসের প্রচুর উপকরণে পূজা পাইয়া থাকে।

শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্ত্তী।

চৈত্র পূর্ণিমা

পূর্ণা তিথি আজি, নির্ব্বাসন অবসান,
চন্দ্রোজ্জ্বল নীলাম্বরে যক্ষের বিমান
চলে অলকার পথে, প্রশান্ত আকাশ,
আবেগ চঞ্চল গঙ্গা, অধীর বাতাস!
গেছে জাগরণে বহু তিমির শর্ব্বরী,
ব্যর্থ কত কোজাগর শুক্লা বিভাবরী,
বসন্তের মুগ্ধ সন্ধ্যা, শারদ প্রভাত—
দীপ্ত মধ্যাহ্নের কত আলোক প্রপাত
প্রবল নিদাঘে, হায় শূন্য পথ চাহি
বিদ্যুৎ বেদনা বক্ষে অশ্রুজল বাহি
কত বর্ষা হয়েছে নিষ্ফল, ম্লান ক্ষীণ
হতেছিল ধ্রুবদীপ্তি জ্বলি বহুদিন!
লগ্ন শুভ, সম্মিলন চিত্রা চন্দ্রমার—
পুষ্পাকীর্ণ ছায়া পথে মাধব আবার!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

ভারত-শিল্প

আমাদের এই সূর্য্যকিরণোদ্ভাসিত সুবর্ণ-প্রসূ ভারতে অন্যূন দুই সহস্র বৎসর যাবৎ অব্যাহত ভাবে শিল্পচর্চ্চা হইয়া আসিয়াছে এবং সৌভাগ্যের বিষয় সে সকলের নিদর্শন প্রচুর পরিমাণে এখনও বিদ্যমান! কি খোদিত-শিল্প, কি লিখিত-শিল্প কোন শিল্পেরই আদর্শের অভাব নাই। শিল্প-গুরু শুক্রাচার্য্যের শিল্পশাস্ত্রে শিল্পের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে আমরা দেখিতে পাই,—তাম্রোৎকীর্ণ শিল্পকে স্থায়ীত্ব হিসাবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তদপেক্ষা অপকৃষ্ট প্রস্তরখোদিত শিল্প, তাহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট পটাঙ্কিত চিত্র এবং সর্ব্বাপেক্ষা অস্থায়ী প্রাচীরগাত্রাঙ্কিত (fresco painting) শিল্পের বিষয় উল্লেখ আছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষণস্থায়ী শিল্পের নিদর্শনই অজন্তাগুহা প্রভৃতির প্রাচীর গাত্রে এখনও বিদ্যমান আর এখনও বোধ হয় কিছুকাল এ নিদর্শন এই ভাবেই থাকিয়া যাইবে। ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় রাজার রাজত্বের প্রভাবে আমাদের শিল্প বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে; কিন্তু আজিকালিকার পাশ্চাত্য শিক্ষায় আমরা যেরূপ শিল্পের প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছি তখন তাহার সেরূপ সম্ভাবনা ছিল না। ভিন্ন ভিন্ন রাজার প্রভাবে তখন প্রাচীন যুগের শিল্পের বহিরাবরবে আকারগত পার্থক্য ঘটিলেও তাহার প্রাণ (spirit) বস্তুত সকল সময়েই এক ছিল।

আমাদের দেশের চিত্রশিল্প ক্রমশঃ কিরূপভাবে পূর্ব্ববৎ ক্রমবিকাশ লাভ করিতে না পারিয়া ক্রমশঃ অবনতির নিম্নতর সোপানে গিয়া পৌছিল এ বিষয়টি ধারা বাহিকরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায়, প্রাচীন শিল্পীগণ তাঁহাদের ধ্যানলভ্য শিল্প-দেবতার মূর্ত্তিটীর স্বরূপ প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেন এবং তাহাতে তাঁহাদের চিত্রের একটা বেশ সহজ-স্বচ্ছ অন্তর্নিহিত ভাব-ধারা দেখিতে পাওয়া যায়। পরে মোগল প্রভাবে ভারতের চিত্রশিল্পের এক বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। তৎকার চিত্রকরেরা সূক্ষ্ম কারুকার্য্য এবং রঞ্জন-নৈপুণ্যের প্রতিই বেশী মনোযোগ দিতে লাগিলেন। তাহার প্রধান কারণ মোগলদের আড়ম্বরপ্রিয়তা। বাস্তবচিত্র আঁকিবার প্রথা এই সময় হইতেই ভারত শিল্পে প্রথমে প্রবর্ত্তিত হয়।—কিন্তু অন্তর্ভাবটী তখনও তাহার নিজস্ব ছিল। তাহার পর 'ডচ্' প্রভৃতি য়ুরোপীয় শিল্প আমদানীর সঙ্গে সঙ্গে এদেশীয় শিল্পের গতি বিশেষ ভাবে পরিবর্ত্তিত হইল। ধীরে ধীরে ভারত-শিল্পের ভিতরের ভাবটীও ক্রমশঃ লোপ পাইতে আরম্ভ করিয়া বহিরাবরবে য়ুরোপীয় প্রভাবের অনেকগুলি লক্ষণ পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। তৎকালের য়ুরোপীয় পদ্ধতিতে আঁকা প্রাচীন তৈল চিত্রপট এবং পাটনাবাসী দেশী চিত্রকর-গণের হাতের কায দেখিলেই এ বিষয়টি স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। বিদেশীয় শিল্পীগণের ভারতাগমনের সঙ্গে সঙ্গে ভারত শিল্পের অন্তরের কথাটুকু ক্রমশঃ লোপ পাইতে বসিল। বিদেশী শিল্পীর পদ্ধতির অনুরূপ শিক্ষায়

এ দেশীয় চিত্রকরেরা নিজ নিজ শিল্পের চির-দিনের সামগ্রী নির্ব্বিচারে ছাড়িয়া তাহাদের শিষ্যত্ব স্বীকার করিল। তদবধি আমরা ভারত-শিল্পের প্রাণটী প্রায় সম্পূর্ণরূপে হারাইতে আরম্ভ করিলাম। সম্মুখে 'মডেল' রাখিয়া তুলির অগ্রে ফটো তুলিবার পদ্ধতিটী এ দেশীয় শিল্পীগণ তখন হইতেই শিক্ষা লাভ করিয়াছে।

ভাবহীন কবিতা শুধু ছন্দোবন্ধে শোভিত হইয়া গ্রথিত হইলে যেরূপ প্রাণহীন নীরস হইয়া পড়ে চিত্রের বিষয়ও ঠিক ঐ কথাই খাটে। আমাদের দেশে কি শিল্পে, কি ধর্ম্মে সকল বিষয়েই সকল মহাত্মারা আড়ম্বরের বিরোধী ছিলেন। সাধক তুকারাম আড়ম্বরপ্রিয় ধর্ম্মভানকারীদের বিষয় বলিয়াছেন :—

"কথা অতি মিষ্ট আর মন ভাল যার,
নাই বা রহিল গলে ফুলমালা তার।
আত্ম-তত্ত্ব জ্ঞানলাভ করেছে যে জন
নাইবা সে শিরে জটা করিল ধারণ।
আসক্তি নাহিক যার পরস্ত্রীর প্রতি,
ভস্ম যদি না মাখে সে কি তাহাতে ক্ষতি,
নিন্দায় যে মূক আর অন্ধ পরধনে
তুকা কহে সন্ন্যাসী কহিও সেই জনে।"

সন্ন্যাসী সংসারে কিরূপ অনাসক্ত এবং আত্ম-তত্ত্ব লাভ তাঁহার কতদূর ঘটিয়াছে সে সকলের পরিচয় সম্যকরূপে না জানিয়া শুধু তার ছাইভস্মমাখা, জটাজুটপরিশোভিত বেশ দেখিয়া যেমন তাঁহাকে সন্ন্যাসী বলিয়া গ্রহণ করা অসংগত, সেইরূপ প্রকৃত শিল্পে তাহার ভিতরের মূল কথাটী ভাবযোগে কিরূপ প্রকাশ পাইতেছে তাহা না দেখিয়া কেবল বাহিরের খুঁটীনাটী, বাহিরের আড়ম্বরে মুগ্ধ হওয়া একই প্রকার মূর্খতা।

এস্থলে জানা উচিত যে, যে কোন দেশের কবি বা চিত্রকরকে চিনিতে বা বুঝিতে হইলে তাহার জাতীয়ভাবের প্রতি সহানুভূতি ও সম্যক শ্রদ্ধার প্রয়োজন। তবেই ঐ শিল্পীর বা কবির চিত্র বা কাব্যের অন্তরের রূপ ও রসটুকু গুণী ব্যক্তির নিকট পরিপূর্ণ মূর্ত্তিতে প্রতিভাত হয়।

আমাদের শিল্পের ধর্ম্মই বৃন্তরূপ এবং আমাদের দেশে ধর্ম্মের রূপক-টিকে (simbol) লইয়াই আমাদের শিল্পের সৃষ্টি।—রূপক অর্থাৎ চিহ্ন। তৎকালে আমাদের কি সাহিত্যে, কি সঙ্গীতে, কি শিল্পে, সকল বিষয়েই রূপকের প্রচলন বহুল পরিমাণে দেখা যায়। এই ভারতীয় শিল্পের বর্ত্তমান আন্দোলনের বহুপূর্ব্বে সাহিত্যশিরোমণি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার অমূল্য 'অনুশীলন' নামক পুস্তকে চিত্তরঞ্জনী বৃত্তি সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে ভারতবর্ষের স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, চিত্রবিদ্যা ও সঙ্গীতকে ঈশ্বরোপাসনার সহায় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বঙ্কিমবাবু অবশ্য প্রাচীন গ্রীকদিগের শিল্প, আপিলিস্ বা র‍্যাফেলের চিত্র, মাইকেল এঞ্জিলো বা ফিদিয়াসের ভাস্কর্য্য, জার্ম্মণীর বিখ্যাত সঙ্গীত প্রণেতৃগণের সঙ্গীতও সেই একই উপাসনার সহায় বলিয়াছেন। ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় শিল্প বা যে কোন মহৎ কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হউক না কেন উহা যদি ধর্ম্ম এবং মহৎ ভাবপূর্ণ না হয় তবে তাহা অচিরেই মানবস্মৃতি হইতে মুছিয়া যায় ইহাই সত্যের নিয়ম।

আধুনিক য়ুরোপায় চিত্রকরসাধারণের চিত্রের মধ্যে আমরা সেরূপ ধর্ম্মভাব বা কোন মহৎভাবব্যঞ্জক দৃশ্য দেখি না—সকলেই পার্থিব সৌন্দর্য্য লইয়াই মত্ত! টারনার প্রমুখ কচিৎ দুএকটি শিল্পী ভাবমূলক চিত্র অঙ্কন করিলেও তাহা য়ুরোপীয় সাধারণের রুচি-বিরুদ্ধ হওয়ায় সে সকল চিত্র তদ্দেশে উচ্চস্থান লাভ করিতে পারে নাই—বা তাঁহাদের প্রদর্শিত পথ অন্যান্য য়ুরোপীয় শিল্পীরা গ্রহণ করেন নাই। স্বাধীনচেতা টারনার তাঁহার দেশের চিরন্তন রীতির স্রোতে গা না ঢালিয়া, দেশের জনসাধারণের অসহ্য নিন্দাবাদ সহ্য করিয়া যে সকল চিত্র স্বাধীন-ভাবে আঁকিয়াছেন তাহার মধ্যে দুএকটি চিত্রের বিষয় কিছু বলিলে বোধ হয় অপ্রা-সঙ্গিক হইবে না। আমাদের বর্ণনীয় চিত্র দুইটীর মধ্যে একটি বিরাট রণতরী। এটি একটি অতি ক্ষুদ্র ষ্টিম লঞ্চ সাহায্যে চালিত হইয়া বিখ্যাত ট্রাফালগার যুদ্ধের শেষে ধীরে ধীরে কোন বন্দরে নীত হইতেছে। রণ-পোতটী তাহার গৌরবাবসানে জীর্ণ কঙ্কালে পরিণত হইয়াছে! এদিকে সূর্য্য মধ্যাহ্নগগন কিরণপ্রভায় ঝলসিত করিয়া সন্ধ্যাগমে দিক-চক্রবালে যেখানে নীল আকাশ এবং নীল পারাবার মিশিয়া নীলিমার অনন্ত মহিমা প্রকাশ করিতেছে সেই সীমান্তবর্ত্তী অস্তাচলের ঘোর তিমিরগহ্বরে নিষ্প্রভ ও দীন মুখে প্রবেশ করিতেছে!—রণপোত-খানিও আজ ঐ অস্তাচলাবলম্বী সূর্য্যের মতই যেন হতগৌরব!—বলিয়া দিতেছে "চিরদিন কভু সমান না যায়।" অপর একটী চিত্রে শিল্পী বাস্তব-চিত্র অঙ্কনে অযথা প্রয়াসী না হইয়া তাঁহাদের দেশীয় রুচি ও রীতির মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন। একটি 'এন্‌জিন্' বহুসংখ্যক গাড়ী লইয়া মহাপ্রলয় দুর্য্যোগে বক্ষের উপর একমাত্র আগ্নেয় তেজ লইয়া সগর্ব্বে চলিয়াছে! 'এন্‌জিন'টীর বুকের উপর একেবারে প্রকাশ্যভাবে আঁকা লোহিত হৃৎপিণ্ডের মত ধক্ ধক্ করিতেছে আগুন! ঐরূপ স্থলে বাস্তব-ক্ষেত্রে আগুন দেখা না গেলেও শিল্পী দর্শকের চোখের উপর 'এন্‌জিনের' আগুন প্রবলভাবে ফুটাইয়া দিয়াছেন। ইহা দেখিয়া পাশ্চাত্য সাধারণ অবাস্তবজ্ঞানে উপেক্ষা বা নিন্দা করিলেও ইহাতে যে প্রবল অন্তর্শক্তি পরিস্ফুট তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। টারনার উল্লিখিত দুইটী চিত্রেই চিত্রের বাহ্যিক অবয়ব অপেক্ষা ভাব রেখাটীকে (expression) সবিশেষ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

বলা বাহুল্য প্রাচীন শিল্পের বিষয় জানিতে বা বুঝিতে হইলে শুধু তাহার সবিশেষ পর্য্যবেক্ষণে কোন সুফল পাইবার সম্ভাবনা নাই। আমাদের দেশীয় প্রাচীন সাহিত্যের প্রবেশদ্বার দিয়া প্রবেশ-লাভ না করিয়া এক্ষণে দেশীয় শিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিতেরা আমাদের প্রাচীন বৈষ্ণব-সাহিত্য প্রভৃতির প্রতি যেরূপ ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন প্রাচীন শিল্প সম্বন্ধেও তাঁহাদের ঠিক্ একইরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাস। বঙ্কিমবাবু প্রাচীন বৈষ্ণব-সাহিত্য সম্বন্ধে অনুশীলন পুস্তকে আধুনিক পাঠকদিগের ভ্রান্তির বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন ঃ—

"যে ব্রজলীলার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিয়াছে এবং যাহার চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে তাহার পক্ষে

উহার ফল সুফল ; যে অজ্ঞান, এই ব্রজলীলার প্রকৃত অর্থ বুঝে না, যাহার নিজের চিত্ত কলুষিত, তাহার পক্ষে ইহার ফল কুফল। * * * যাহারা রাধাকৃষ্ণকে ইন্দ্রিয়সুখরত মনে করে, তাহারা বৈষ্ণব নহে পৈশাচ। সচরাচর লোকের বিশ্বাস যে রাসলীলা অতি অশ্লীল ও জঘন্য ব্যাপার। কালে লোকে রাসলীলাকে একটা জঘন্য ব্যাপারে পরিণত করিয়াছে।—কিন্তু আদৌ ইহা ঈশ্বরোপাসনা মাত্র ; চিত্তরঞ্জনী বৃত্তিগুলিকে ঈশ্বরমুখী করা মাত্র।" গীতা সম্বন্ধে সাধারণের ধারণার বিষয় বঙ্কিমবাবু বলেন, "অনেকে শ্রীমদ্ভাগবত গীতার স্থূল উদ্দেশ্য কি তাহা না বুঝিয়া গ্রন্থের কয়েকখানি পাতা পড়িয়া মনে করেন যে আমরা গ্রন্থখানির মর্ম্মগ্রহণ করিয়াছি— এবং আধ্যাত্মিক ভাব গ্রহণে অসমর্থ হইয়া বলিয়া থাকেন "আত্মীয় অন্তরঙ্গদিগকে বধ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া অর্জ্জুন যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতেছিলেন, কৃষ্ণ তাঁহাকে প্রবৃত্তি দিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন— ইহাই গীতার বিষয়। অতএব গীতাকে ঘাতক-শাস্ত্র বলাই বিধেয়, উহাকে ভক্তি শাস্ত্র বলিব কি জন্য।" শিল্প সম্বন্ধেও আধুনিক শিক্ষিত লোকের অভিপ্রায় উল্লিখিত প্রস্তাবের ন্যায় অভিনব! বাস্তবিক দুঃখের বিষয় এই যে, আমরা আমাদের দেশের লুপ্তপ্রায় প্রাচীন কীর্ত্তি সকল দর্শন করিয়া একজন নিতান্ত অপরিচিত ভিন্নধর্ম্মাচারী বিদেশীয় পরিব্রাজকের মত ঐ সকল বস্তুর সবিশেষ অর্থবোধে অসমর্থ হইয়া বৈদেশিকের ন্যায়ই হাস্য পরিহাসের অবতারণা করিয়া থাকি। বলা বাহুল্য অদ্ভুতদর্শন বৌদ্ধ-চৈত্য-গুহাভ্যন্তরস্থ স্তূপগুলি ক্ষুদ্র মানব-বুদ্ধি ও ধারণার অতীত জগৎপিতার বিরাট বিশ্বমূর্ত্তির পরিকল্পনায় গঠিত। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ব্যোম্ এই পঞ্চভূতই পরিকল্পনাটীর বিশেষ বিষয়। অনেকে শ্রীকৃষ্ণ মহাদেব প্রভৃতি দেবদেবীর অমানুষিক ও অস্বাভাবিক বর্ণ দেখিয়া বিস্মিত হন এবং তাহা বিজ্ঞানবহির্ভূত বলিয়া উপহাস করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের বর্ণ শাস্ত্রে কেন নীলবর্ণ বলিয়া বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে তাহা যদি অনুধাবন করিয়া দেখেন তবে দেখিবেন, জগৎপিতার ধারণাতীত ও অসীম রূপের পরিকল্পনার জন্য অনন্ত নীলাকাশের এবং সুনীল পারাবারের অসীমতাজ্ঞাপক এই নীলবর্ণ যোজনা। মহাদেবের বর্ণ হিমতুষারাবৃত অমল অম্বর ভেদী হিমাচলের ন্যায় শুভ্র,— কারণ, যাবতীয় বর্ণের মিলনে শ্বেতবর্ণের উৎপত্তি,—সৃষ্টি, প্রলয়, ভূত, ভবিষ্য বর্ত্তমান সকলেরই মিলনক্ষেত্র তিনি সেই স্বয়ম্ভূ। সমুদয় নদনদী যেমন সমুদ্রে মিলিত হয় তেমনি মহাদেবের মধ্যে ভোগলালসা, কামনা, প্রভৃতি আসিয়া বিলীন হইয়াছে ;—সে সকল কামনা প্রভৃতি বিবিধ বর্ণ বিজয় করিয়া তিনি রজতনিভ কান্তি !

প্রকৃত শিল্প পারিপ্রেক্ষিক নিয়মে (perspective, সমান্তরাল বা অসমান্তরাল রেখা জালে আচ্ছাদিত করিলে ধরা পড়ে না—তাহাকে ধরিতে হইলে মানসিক ধ্যানের প্রয়োজন। শিল্পীমাত্রেই অবশ্য স্বীকার করিবেন যে, প্রকৃতির কোন একটী সুন্দর দৃশ্যের ঠিক নকল প্রস্তুত করিয়া চিত্র অঙ্কন করিলে সেই বিশেষ স্থানটীর সৌন্দর্য্যের অনেকাংশেই খর্ব্ব হইয়া থাকে! এ

সম্বন্ধে আমাদের কোন প্রাচীন কবি বলিয়াছিলেন—

"কোন মূঢ় চিত্রকরে পদ্মদেহ চিত্রকরে,
করিলে কি বাড়ে তার শোভা ?
কিম্বা সেই কোকনদে মাখাইলে মৃগমদে
অতি সুখ লভে মধুলোভা ?
কষিত কাঞ্চন কায় কিবা কার্য্য সোহাগায়
কিবা কার্য্য রসালের ছটা !
হেন মূর্খ আছে কে হে দিবে ইন্দ্রধনু দেহে
অভিনব রূপরঙ্গ ঘটা।
জ্বালিয়া ঘৃতের বাতি প্রখর ভাস্কর ভাতি
বৃদ্ধি করা দুরাশা কেবল।
কি কাজ সিন্দূরে মাজি গজমুক্তাফলরাজি,
মাজিলে কি হয় সমুজ্জ্বল !"

বস্তুতঃ প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের খর্ব্বসাধন মহৎ শিল্পের উদ্দেশ্য নহে। মহৎশিল্পীর কর্ত্তব্য ঐ দৃশ্যের একটী কোন না কোন স্থলে বিশেষ ভাবে যেখানে তাহার প্রকাশ, অর্থাৎ যেখানে তাহার কোন মহৎভাব ধরা পড়ে সেইটীকে আবিষ্কার করিয়া চিত্রপটে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করা। তরুলতা, নদ নদী প্রভৃতির হুবহু নকলে শিল্পের প্রকাশ নয়। কিন্তু —তাহার অন্তরের কথাটীকে খুঁজিয়া বাহির করাই তাহার কাজ। ভাবপ্রধান শিল্পের অন্তর্নিহিত ভাবটী বাহিরের অবগুণ্ঠন ভেদ করিয়া ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় বাহির হইয়া পড়ে। এ সম্বন্ধে জাপানী শিল্পীরা বৌদ্ধ ধর্ম্মের সহিত ভারত শিল্পের এই বিশেষত্বটীও বিশেষ ভাবে গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন। এক্ষণে এ বিষয়ে তাঁহারা আমাদের আদর্শ স্থানীয় সন্দেহ নাই। এখন যেমন পল্লীভবনের সরল সুখশান্তি ও শোভা শিক্ষিতদিগের চিত্ত আমোদিত করে না এবং বাউল কীর্ত্তন প্রভৃতি গ্রাম্য সঙ্গীতে তাঁহাদের আনন্দ বোধ হয় না, পরন্তু বিংশশতাব্দির কল-কব্জাপ্রধান লৌহ তারজাল-বিজড়িত, ইষ্টকস্তূপ গঠিত কলিকাতা এবং গ্রামোফন ও থিয়াটার প্রভৃতিতেই চিত্ত অধিক আবিষ্ট থাকে, সেইরূপ আধুনিক শিল্পীরাও তাঁহাদের অতিপ্রাচীন ভাবাবেশভরা অলকাতিলকাঙ্কিত শিল্পদেবতার উপাসনা নিতান্ত বর্ব্বরজনোচিত বলিয়া উপেক্ষা করিয়া থাকেন। আমরা বুঝি না যে একটি আমাদের দেশমাতার স্নেহামৃত—বহুকালের সঞ্চিত ধন,—অপরটি ধারকরা অনুগ্রহলব্ধ সামগ্রী। একটি যত্ন করিলে সহজে নিজে নিজেই শিক্ষা করা যায় অপরটি শিখিতে অন্যের দ্বারস্থ হইতে হয়।

বাহিরের সৌন্দর্য্য সহজেই চ'খে পড়ে কিন্তু অন্তরের কথা গোপন কন্দার হইতে খুঁজিয়া লইতে হয়। যেটী সত্য এবং প্রাণের সেটীকে বাহিরের দিকে প্রবলভাবে প্রকাশ করিবার প্রয়োজন নাই।

"True beauty lies in the concealment of Beauty."

সঙ্গীত সম্বন্ধে দেখা যায় সচরাচর ধ্রুপদ খেয়ালের স্থলে সাধারণতঃ আড়ম্বরশীল টপ্পা ও থিয়াটারের সঙ্গীতেরই আদর। খুব উচ্চ ভাবের রূপককাব্য যেরূপ সাধারণ পাঠক পাঠিকার মনোরঞ্জন করিতে পারে না সেইরূপ শ্রেষ্ঠ শিল্পও সাধারণ দর্শকের নয়নমন পরিতৃপ্ত করিতে সব সময় সমর্থ হয় না। আর্ট ত আর একটা প্রদর্শনীশোভা নয় যে, সে তাহার মনুমেণ্টের মত বিপুল কলেবর বাহির করিয়া অদ্ভুত অট্টহাস্য হাসিয়া

একটা কোন অভূতপূর্ব্ব বিস্ময়ের অবতারণা করিয়া তুলিবে! ফলকথা প্রকৃত শিল্প গভীর গবেষণা ও মহৎভাবের প্রতিসৃষ্টি! যে শিল্পী তাঁহার শিল্পে এই উচ্চভাব প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন তিনিই শিল্পজগতে অমরআখ্যা লাভ করিয়াছেন।

শ্রীঅসিতকুমার হালদার।

আমার বোম্বাই প্রবাস

(৩)

বোম্বাই সহর—জাতি বৈচিত্র্য

ভাষা অনুসারে বোম্বাই প্রেসিডেন্সি সামান্যতঃ চার ভাগে বিভক্ত হইতে পারে, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক ও সিন্ধুদেশ। ভাষার উপর হইতে জাতিনির্ণয় করাও কঠিন নহে। প্রেসিডেন্সির নানাস্থান হইতে নানা জাতীয় লোক বোম্বাই সহরে একত্রিত হইয়াছে। তাহাদের ভাষাও পৃথক্ পৃথক্, তবে উর্দ্দূ বা হিন্দির অপভ্রংশ সাধারণ সকল জাতির ভাষা বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন জাতি-সঙ্গমেই বোম্বায়ের জাতি-বৈচিত্র্য। ইহাদের সবিস্তার বিবরণ বলিতে গেলে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন—তাহা আমার উদ্দেশ্য নহে। পারসী জাতির বিবরণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এখানে গুজরাটী, মরাঠী ও মুসলমানদের কথা কিছু উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। গুজরাট ও মহারাষ্ট্র, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির দুই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড। গুজরাটের অন্তর্গত

স্যর জম্‌সেদ্‌জি জিজিভয়।

একটি দেশীয় সংস্থান আছে—গাইকওয়াড়ের বরদা তাছাড়া কচ্ছ ও কাঠেওয়াড় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র রাজ্য। এদেশে কচ্ছ ও কাঠেওয়াড়ের বন জঙ্গল এখন সিংহের একমাত্র আবাসভূমি, অন্য কোথাও পশুরাজের রাজত্বের কোন চিহ্ন দেখা যায় না। কঠেওয়াড় গুটিকতক ছোট ছোট প্রদেশে বিভক্ত যাহা এক এক রাজপুত ঠাকুরের শাসনাধীন, যেমন রাজকোট গোন্দল

জগন্নাথ শঙ্করশেঠ।

ভাওনগর নওনগর জামনগর ইত্যাদি। বোম্বায়ে যে সকল গুজরাটী আসিয়া বাস করিতেছে—বানিয়া ভাটিয়া কচ্ছী—তাহাদের অধিকাংশ বণিকজাতীয় লোক, বাণিজ্য ব্যবসায়ে রত। গুজরাটী বণিকদের অর্জ্জনস্পৃহা যেমন প্রবল, যেমন বিষয়বুদ্ধি, তাহার সঙ্গে তাহাদের উদ্যম ও কর্ম্মদক্ষতা তেমনি প্রশংসাযোগ্য। পারস্য উপসাগর ও ভারতসাগরের উপকূল প্রদেশের সহিত বাণিজ্য-সূত্র এই সকল বণিকদের হস্তে অনেককাল চলিয়া আসিতেছে। জাঞ্জিবার মস্কট প্রভৃতি স্থানে বোম্বাই বণিকদের গতিবিধি—আফ্রিকা আরবস্থান প্রভৃতি দূর দূর দেশের সহিত তাহাদের বাণিজ্য সম্বন্ধ। য়ুরোপীয়েরা প্রথম যখন এদেশে পদার্পণ করে তখন এই বণিকদের সঙ্গেই তাঁহাদের প্রধান কারবার। তাঁহাদের কোন্ একজন কর্ম্মকর্ত্তা বলিয়া গিয়াছেন—
"ইহুদী তিন এক চীন, তিন চিনে এক বেনে।"

মধ্য হিন্দুস্থান হইতে বহুসংখ্যক মারওয়াড়ীর সমাগমে গুজরাটী বণিকদের বিলক্ষণ দলপুষ্ট হইয়াছে।

মারাঠী

বোম্বায়ে মারাঠী দলবলও সামান্য নহে। দক্ষিণে কৃষ্ণানদী হইতে উত্তরে তাপ্তী পর্য্যন্ত তাহাদের ভাষা বিস্তৃত। মারাঠীরা বাণিজ্য ব্যবসায়ে সুদক্ষ নহে, ওহিসাবে বাঙ্গালীদের সঙ্গে সমান। উহাদের বুদ্ধির দৌড় অন্যদিকে। আগেকার সে শৌর্য্যবীর্য্যের কোন লক্ষণ দেখা যায় না, কেননা এখনকার কালে অসিজীবির উপর মসিজীবিরই প্রভুত্ব। আমাদের দেশে জীবিকার সঙ্কীর্ণক্ষেত্রে ডাক্তারি, ওকালতী, কেরাণীগিরি এই সকল কাজই শোভা পায়। মারাঠীদের রাজনীতি কুশলতা এখন কংগ্রেসের কার্য্যে পর্য্যবসিত, বড় জোর বড়লাটের মন্ত্রীসভা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। তাহাদের পূর্ব্ববীরত্ব লোপ পাইয়াছে। সমস্ত ভারতবর্ষের ত্রাসদায়ক বর্গীগণ এক্ষণে

হলধারণ করিয়া যথাকথঞ্চিৎ দিনপাত করিতেছে। শিবাজীর সে মাওলী সেনার বংশ এক্ষণে কোথায়?

মুসলমান

বোম্বাইবাসীর পঞ্চমাংশ মুসলমান। মুসলমানদের প্রধান দুই শ্রেণী—সুন্নী ও সিয়া। মহম্মদের উত্তরাধিকারী কালিফদের লইয়া এই দুই সম্প্রদায়ের মতভেদ। সুন্নী মুসলমানেরা আবুবকর ওমার প্রভৃতি পরম্পরাগত ইমামগণের প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি স্থাপন করে। সিয়া মুসলমানদের বিশ্বাস এই যে মহম্মদের জামাতা—তাঁহার প্রিয়তমা দুহিতা ফতেমার স্বামী যে আলি—তিনিই তাঁহার সিংহাসনাধিকারী যথার্থ ইমাম। আলির অভাগা পুত্রদ্বয় হাসেন হুসেন কারবালা রণক্ষেত্রে শত্রুহস্তে নিহত হয়, এই ঘটনা স্মরণ করিয়া মহরমের সময় সিয়াপন্থীগণ বক্ষাঘাত ও আর্ত্তনাদে হৃদয়-বিদারক শোকপ্রকাশ করিয়া থাকে। ঐ উপলক্ষে বিরুদ্ধ মতাবলম্বী সুন্নীদিগের উল্লাস ও অভিনন্দন। তুর্ক ও আরবজাতি প্রধানতঃ সুন্নী মুসলমান, পারস্যদেশে সিয়া সম্প্রদায়ের প্রাধান্য। বোম্বায়ে সিয়া মুসলমানদের সংখ্যা সম্ভবতঃ অধিক, অন্ততঃ উভয় পন্থীর সংখ্যা সমান সমান।

বোম্বাইবাসী মুসলমান অন্যতর প্রণালী অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ হইতে পারে—দেশী ও বিদেশী মুসলমান। যাহাদের আসলে হিন্দুস্থানে জন্ম ও যাহাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা স্বেচ্ছাক্রমে অথবা দায়ে পড়িয়া মুসলমানধর্ম্ম স্বীকার করিয়াছে তাহাদের দেশী মুসলমান বলা যাইতে পারে—তদ্ভিন্ন আর সকলে বিদেশী শব্দের বাচ্য। এই সমস্ত মুসলমান জাতির মধ্যে পরস্পর বিবাহ সম্বন্ধ হইয়া এক্ষণে যদিও মিশ্রজাতির সৃষ্টি হইয়াছে তথাপি তন্মধ্যে কতকগুলি সম্প্রদায় অবিমিশ্র থাকিয়া এখনো পর্য্যন্ত স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া আসিতেছে যথা কোঙ্কনী, দক্ষিণী, কচ্ছী, মেমন ইত্যাদি। বোরা বলিয়া একজাতীয় মুসলমান ফেরীওয়ালার মত দ্বারে দ্বারে জিনিস বেচিয়া বেড়ায়, তাহাদের অধিকাংশ আসলে গুজরাট হিন্দুবংশীয়, একাদশ শতাব্দীতে ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে। তাহারা সিয়াপন্থী, তাহাদের আদিম নিবাস সুরাট ও সুরাটের মুল্লাসাহেব তাহাদের ধর্ম্মযাজক। তাহাদের ভাষা গুজরাটী। বোরারা অত্যন্ত উদ্যমশীল, এমন স্থান নাই যেখানে তাহাদের গতি নাই, এমন জিনিস নাই যা তাদের বোচকায় না পাওয়া যায়। এই জাতীয় মুসলমানের মধ্য হইতেও বড় বড় লোক হইয়া গিয়াছেন, দৃষ্টান্ত স্বর্গীয় জষ্টিস বদরুদ্দীন তৈয়ব জী।

খোজা নামক আর এক সম্প্রদায় আছে তাহারাও হিন্দু-মুসলমান। খোরাসান হইতে সমাগত পীর সদরুদ্দীন কর্ত্তৃক তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ চার শত বৎসর পূর্ব্বে মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। যদিও খোজারা আপনাদিগকে মুসলমান বলিয়া পরিচয় দেয় তথাপি তাহাদের আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মানুষ্ঠান হিন্দু মুসলমান উভয় ধর্ম্ম মিশ্রিত। কাজী তাহাদের উদ্বাহক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া দেন বটে কিন্তু অনেক সময় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়া থাকে। সন্তান

ভূমিষ্ঠ হইলে পর হিন্দুমতে জাতক্রিয়ার অনুষ্ঠান হয় এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় কোরাণের কিয়দংশ ও দশাবতারের উপাখ্যান উভয়ই পঠিত হইয়া থাকে। কোরাণ ও হিন্দুশাস্ত্র এ দুয়েতেই তাদের শ্রদ্ধা, উহারা হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের তীর্থ পর্য্যটন করে ও হিন্দু শাস্ত্রোক্ত দায়াধিকার প্রভৃতি ব্যবহার প্রণালী অবলম্বন করিয়া চলে। মহম্মদের জামাতা আলীর প্রতি তাঁদের বিশেষ ভক্তি, আলী কল্কী অবতার বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস। খোজা মুসলমানদের মধ্যেও বোম্বায়ে অনেকানেক দানশীল শ্রীমন্ত সওদাগরের নাম শুনা যায়।

মুসলমানদের বিবরণ বলিতে গিয়া তাহাদের ইদানীন্তন শোচনীয় দৈন্যদশার উল্লেখ না করিয়া থাকা যায় না। সেদিন যাঁহারা সর্দ্দার জাগীরদার সেনাপতি ছিলেন, এইক্ষণে তাঁহারা অনেকে পেয়াদা ও খানসামার কাজে দীনহীনভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। যাঁহাদের সধর্ম্মীগণ পুরাকালে কাব্যসাহিত্য বিজ্ঞানক্ষেত্রে অক্ষয়কীর্ত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের বিদ্যাশিক্ষায় মনোযোগ নাই, কোরাণের দুপাতা উল্টাইয়াই তাঁহারা আপনাদিগকে সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ মনে করেন। অনেকে নিষ্কর্ম্মা উদ্যোগশূন্য, অন্যেরা নির্ধন অন্নচিন্তায় আকুল। উহার মধ্যে যাঁহারা শ্রীমন্ত তাঁহারা অর্থের সদ্ব্যবহার জানেন না—নিকৃষ্ট আমোদ প্রমোদে প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া প্রায়ই ঋণজালে আবদ্ধ হইয়া পড়েন। তাঁহারা যে এক্ষণে আপনাদের দুরবস্থা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া জাতীয় উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হইয়াছেন ইহা অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয়। তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে গবর্ণমেণ্ট যতদূর করিবার তাহা করিতেছেন, তাঁহাদের নিকট কাতর ক্রন্দনের কোন ফল নাই। বিদ্যা ও যোগ্যতা ব্যতীত

দুর্গাবাই (ডাক্তার আত্মারাম পাণ্ডুরঙ্গের কন্যা)।

পারসী স্ত্রী।

সরকারী চাকরী আদায় করা যায় না; এই বুঝিয়া তাঁহাদের সমাজের নেতাগণ যোগ্যতর উপায় অবলম্বনে তৎপর হইয়াছেন ইহা একটা শুভ লক্ষণ।

বন্ধুগণ! আমিও বলি তোমাদের নিজের হাতেই তোমাদের মুক্তি। তোমরা গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিও না। শ্রমসাধ্য শিল্প বাণিজ্য ব্যবসায়ে মনোযোগ কর—আত্ম-নির্ভর শিক্ষা কর। ইংরাজরাজ্যে যে উন্নতির পথ হিন্দু মুসলমান সকল জাতির জন্য উন্মুক্ত রহিয়াছে, সেই পথ অনুসরণ কর। তোমরা এককালে সাহিত্য বিজ্ঞান ক্ষেত্রে ইউরোপের আদর্শ ছিলে—তোমাদের নষ্ট সম্পত্তির কিয়দংশ ফিরিয়া পাইবার যদি তোমাদের বাসনা থাকে, তবে আপনাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে যত্নশীল হও। আলিগড় এখন তোমাদের একমাত্র নিজস্ব সম্পত্তি—ইহার উপর মসলিম য়ুনিবর্সিটি প্রতিষ্ঠিত হইলে তোমাদের উন্নতির পথ আরো প্রশস্ত হইবে। প্রস্তাবিত য়ুনিবর্সিটি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, গবর্ণমেণ্ট যদিও তোমাদের মূল প্রস্তাব সর্ব্বাংশে গ্রাহ্য করেন নাই তথাপি যতটা পাওয়া যাইতেছে তাহা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যাহা চাই সবটা পাইলাম না বলিয়া যতটা পাওয়া যায় তাহা ফেলিয়া দেওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। আমার শেষ কথা এই যে একতা তোমাদের জাতীয় সম্পদ, ইহা হেলায় ফেলায় হারাইও না! ইসলাম তোমাদের জাতীয় বন্ধনে আহ্বান করিতেছেন। সাবধান যেন তোমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ দলাদলি প্রবেশ না করে। ঐক্য বলের উপর তোমাদের জাতীয় উন্নতি নির্ভর করিতেছে। এক হইলে তোমাদের উত্থান, ছিন্ন ভিন্ন হইলেই পতন।

বাণিজ্য ব্যবসা

বোম্বায়ের লোকেরা বাঙ্গালীদের চেয়ে বাণিজ্য ব্যবসায়ে সুদক্ষ। বাঙ্গলাদেশের ধন চাকরীতে ও জমিদারীতে এইজন্য তাহা বড় ম্লান, তাহাতে ধনাগমের স্বাধীন স্ফূর্ত্তি দেখা যায় না। বোম্বায়ে জমিদারীর প্রতি লোকের লোভদৃষ্টি নাই, কেন না এ অঞ্চলে ভূমি সম্পর্কীয় চিরস্থায়ী বন্দবস্ত প্রচলিত নাই। রায়তওয়ারী বন্দোবস্তে সাধারণতঃ ৩০ বৎসর অন্তর রাজস্ব পরি-বর্ত্তনের নিয়ম আছে—সরকারী খাজনা দিয়া রায়তের হাতে মুনফা এত অল্প থাকে যে ভূসম্পত্তি করিতে লোকেরা লালায়িত নহে। এদেশে বাণিজ্যই ধনাগমের প্রধান উপায়। "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী" একথা বোম্বাই-বাসিরাই ভাল বুঝে। সপ্তদশ শতাব্দীতে সুরাট পশ্চিম ভারতের বাণিজ্যের প্রধান স্থান ছিল। ইউরোপের সহিত এ দেশীয় বাণিজ্য কারবার সুরাট বণিকদের হাতেই ছিল। ১৬১২ সালে ইংরাজদের কুঠী সুরাট নগরে প্রতিষ্ঠিত হয়। সুরাট হইতে বাণিজ্য স্রোত ক্রমে বোম্বায়ে বিবর্ত্তিত হইল। মোগলরাজ্য পতনের সঙ্গে সঙ্গে সুরাটের ভাগ্যলক্ষ্মী ম্লান ও মুম্বাপুরীর সৌভাগ্য উদয়। এই শ্রীবৃদ্ধি লাভের অনেকগুলি কারণ আছে। ইংলণ্ডের সান্নিধ্য, প্রশস্ত সুন্দর বন্দর, পোত নির্ম্মাণ ও সংরক্ষণের সুবিধা ইত্যাদি কারণে বোম্বাই শীঘ্রই নদীতীরবর্ত্তী সুরাট নগর ছাড়াইয়া উঠিল বোম্বাই তুলার

ব্যবসার জন্য প্রাচীনকাল হইতে প্রখ্যাত। এখানে ভারতের নানাস্থান হইতে তুলার আমদানী হইয়া বস্তাবন্দী করিয়া দেশ বিদেশে প্রেরিত হয়। এক সময়ে বোম্বাই হইতে চীনদেশে অনেক তুলা রপ্তানি হইত, এখন তাহা অনেক কমিয়া গিয়াছে। তাহার কারণ মারাঠী যুদ্ধের সময় তুলার ব্যবসা বন্ধ হওয়া—সেই সুযোগে চীনেরা আপনাদের দেশে তুলার চাস আরম্ভ করে। সেই অবধি বোম্বাই হইতে চীনদেশে তুলার রপ্তানি ক্রমশই হ্রাস হইয়া যায়।

১৮১৩ পর্য্যন্ত ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির হাতে একচেটিয়া বাণিজ্য ছিল, অন্য কেহ কোম্পানির পরওয়ানা ভিন্ন বাণিজ্য ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইতে পারিত না। বাণিজ্যের উপর এই শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া অবধি তাহার প্রকৃত উন্নতির সূত্রপাত। বোম্বায়ে তুলার ব্যবসার উত্তরোত্তর উন্নতিতে স্বাধীন বাণিজ্যের ফল প্রত্যক্ষ করা যায়। আমেরিকার যুদ্ধের সময় ঐ ব্যবসা বিশেষরূপে উত্তেজিত হয়। ১৮৬১ হইতে ৬৫ পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসর আমেরিকানদের ঘরাও যুদ্ধের দরুণ সে দেশ হইতে তুলার আমদানী বন্ধ হওয়াতে বোম্বায়ের সৌভাগ্যসূর্য্য উদয় হইল। তুলার বাজার এমনি চড়িয়া উঠিল যে ঐ কয়েক বৎসরের মধ্যে বোম্বায়ের লোকেরা নিদান ৭৮ কোটি টাকা উপার্জ্জন করে। টাকা হইলে তাহা বাড়াইবার চেষ্টা হয়—সকলে সুলভ উপায়ে ধনোপার্জ্জনে মত্ত হইয়া উঠিল। কত ব্যাঙ্ক, কত অর্থকরী অনর্থকরী কোম্পানি ভেকছত্রের ন্যায় গজাইয়া উঠিল তাহার সংখ্যা নাই। অর্থোপার্জ্জনের অন্যান্য ফন্দির মধ্যে ব্যাক্‌বে আবাদের এক প্রস্তাব মস্তক উত্তোলন করিল। ব্যাক্‌বে উপসাগরের তীরভূমি সমুদ্র হইতে উদ্ধার করিয়া বাসগৃহ নির্ম্মাণ ও অন্য আবশ্যকীয় কার্য্যে নিয়োগ করা ঐ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। লোকেরা ভাবিল জমির মূল্য তিনগুণ চারগুণ বাড়িয়া উঠিয়াছে, জনসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, দ্বীপের মধ্যে বাসযোগ্য ভূমি দুর্লভ, এ সময়ে না জানি ভূমিলাভে কতই লাভ—প্রত্যেক কাটার মূল্য ততটা সোনার দর মনে হইল। একটি কোম্পানি উঠিয়া এই কার্য্যে কটিবদ্ধ হইল—ব্যাক্‌বের সেয়ার বিক্রয় তাহার কাজ। সেয়ার কেনা ব্যাচা, এই এক রোগ জন্মিল। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই সেয়ার কিনিতে ব্যস্ত। যে দরিদ্র সে এক রাত্রির মধ্যে ধনী হইবে—লক্ষপতি ক্রোড়পতি হইবে—সকলেই সহজ উপায়ে টাকা করিতে তৎপর।

এই রোগ শুধু যে ব্যাকবের সেয়ার ব্যাপারেই বদ্ধ তাহা নহে। ব্যাক্‌বের তীরের সমতুল্য মূল্যবান্ অথবা তদপেক্ষা আরো কত অমূল্য ভূমি স্থানে স্থানে পড়িয়া আছে, মাজেগাম, সিউরী প্রভৃতি তীরদেশও উৎকৃষ্ট বন্দরে পরিণত হইতে পারে, এই বলিয়া নানান্ ফন্দি বাহির হইল। যে কোন ফন্দি অর্থপিশাচ ধূর্ত্তের মনে উদয় হয়, তাহার পৃষ্ঠপোষক এক এক Financial কোম্পানি। পরে যখন বোম্বায়ের ভূমি-ভাণ্ডার শূন্য হইল, ভূকোম্পানির গ্রাসোপযুক্ত আর কিছুই অবশিষ্ট নাই, তখন এক নূতন মড়ক আসিয়া উপস্থিত। বাঙ্গালায় পোর্টক্যানিঙ কোম্পানি উঠিয়া অর্থনাশের আর এক সুগম পথ আবিষ্কার করিল। অন্যান্য

ভোলানাথ
সারাভাই
(গুজরাটী)

সিন্ধী

স্বর্গীয় আগা খাঁ

দোরাবজী
পদমজী
পারসী

পারসী
পুরোহিত
(দস্তুর)

কাঠেওয়ারী

কোম্পানির উপর পোর্টক্যানিঙ চাপিয়া বোম্বোই বণিকদের ভাণ্ডারে যা কিছু বাকী ছিল, নিঃশেষে যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিয়া লইল।

আমেরিকার যুদ্ধাবসানের সঙ্গে সঙ্গে এই সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইল। যেমন উত্থান তেমনি পতন। তুলার দাম যেমন চড়িয়াছিল তেমনি উতরিয়া গেল। সে যে হুলুস্থূল বাধিয়া গেল তাহা বর্ণনাতীত। এই সময়ে আমরা বোম্বায়ে মাণিকজীদের বাটি হইতে এই বিপর্য্যয় কাণ্ড পর্য্যবেক্ষণ করিতেছি। এই সেয়ার মেনিয়ায় সকলে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে—এই সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেলে তেমনি আবার চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। সকলেই জানিতে পারিল এই অসংখ্য কোম্পানির মূলধন কেবল কাগজ মাত্র, কেবল সেয়ার লইয়া ইহাদের মৌখিক কারবার। বিপদের সময় দেখা গেল তাহাদের হাতে কিছুমাত্র সম্বল নাই, এই অর্জনস্পৃহার প্রকাণ্ড ইমারত তাসের দুর্গের ন্যায় এক ধাক্কায় চুরমার হইয়া গেল। তখন লোকের চোখ ফুটিল। দেখিতে পাইল যে তাহারা যে সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছে তাহার কোন মূল্য নাই। যে মাটী সে মাটীই রহিল, সোনায় পরিণত হইল না। বাণিজ্যে লোকসান অন্যত্রে ঘটিয়া থাকে কিন্তু ১৮৬৪—৬৫ সালে বম্বের যে দুর্দ্দশা তার তুলনা পাওয়া ভার। খ্যাতনামা লক্ষপতি ক্রোড়পতি একে একে নিঃসম্বল হইয়া ধুলায় পড়িয়া গড়াগড়ি, কিছুকাল পরে আমরা শুনিলাম যে, সুবিখ্যাত প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ যিনি এককালে সেয়ার বাজারের অধিনায়ক ছিলেন, যাঁহার তর্জ্জনীর ইঙ্গিতে লোকের ভাগ্যচক্র ঘূর্ণিত হইত, তিনি নিজেই ধরাশায়ী হইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছেন—তাঁহাকে ও শেষে Insolvency কোর্টের শরণাপন্ন হইতে হইল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বোম্বাই প্রাচীনকাল হইতে তুলার ব্যবসার জন্য প্রসিদ্ধ কিন্তু এ শুধু তুলার বাজার নয়। বোম্বাই তুলা হইতে পরিধেয় বস্ত্র-বয়ণ আরম্ভ করিয়া অবধি তাহার শ্রীসম্পদের এক নূতন দ্বার খুলিয়া গেল, সেই সঙ্গে শ্রমজীবিদিগের জীবিকার্জনের নূতন ক্ষেত্র প্রস্তুত হইল। কাপড়ের কল কারখানা খুলিয়া বোম্বাই আর সকল সহরকে হারাইয়া দিয়াছে। এই সকল কাপড়ের মিলে বোম্বাই সহর সমাকীর্ণ, তাহাদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। ১৮৫৪ সালে তাহার প্রথম কাপড়ের মিলের পত্তন হয়। তখন হইতে তাহার যে উন্নতির সূত্রপাত হইল, বিদেশী প্রতিদ্বন্দ্বী কলকারখানা মিলিয়া সেই উন্নতি স্রোত প্রতিরোধ করিতে পারিল না। বোম্বায়ের এই শ্রীসৌভাগ্য দেখিয়া ম্যাঞ্চেষ্টর ঈর্ষায় জ্বলিয়া উঠিল। তাহার পরিণাম সকলেই জানেন। যখন দেখে বোম্বায়ের সঙ্গে সে সম্মুখ যুদ্ধে পারিয়া উঠে না, তখন গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে তার রপ্তানী কাপড়ের উপর কর বসাইয়া তাহার বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল। একেই বলে Free trade! ইহার বিরুদ্ধে তাহার হাজার চীৎকার অরণ্যে রোদনই সার।

বোম্বাইবাসীগণ আমাদের মত নিরুদ্যম হইয়া বসিয়া নাই। এই সকল কাপড়ের কল ছাড়া তাহাদের ধন আরো অনেক

প্রকার ব্যবসা-ক্ষেত্রে নিয়োজিত হইতেছে। এখন যে বাঙ্গলাদেশও কিয়ৎপরিণামে জাগিয়া উঠিয়াছে—শিল্প বাণিজ্য বিস্তারের প্রতি জনসাধারণের মনোযোগ পড়িয়াছে ইহা এক শুভলক্ষণ বলিতে হইবে। আমাদের দেশে আপামর সাধারণ অধিকাংশ লোকেই কৃষিকার্য্যে রত, মধ্যবিত্ত লোকের সরকারী চাকরীই প্রধান উপজীবিকা। শ্রমের অভিনব দ্বার উন্মুক্ত হইয়া স্বাধীন ব্যবসাক্ষেত্র প্রসারিত হওয়া ভিন্ন এদেশের কল্যাণ নাই। ঐদিকে আমাদের সকলেরই লক্ষ্য যত্ন ও উৎসাহ যতই যায় ততই দেশের মঙ্গল।

দানশীলতা

এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখি যে বোম্বাইবাসীগণ যেমন অর্জ্জনক্ষম তেমনি দানশীল—তাঁহাদের দানশীলতা আমাদের সর্ব্বতোভাবে অনুকরণীয়। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা ধনকুবের—হিন্দু পারসী মুসলমান—দানে তাঁহারা সকলেই মুক্তহস্ত। সার্ব্বজনিক কার্য্যে বোম্বায়ের লোকদের যেমন দানের প্রাচুর্য্য, আমাদের তেমনি তঞ্চকতা। বাঙ্গলাদেশ অন্যান্য দেশের তুলনায় দানকুণ্ঠিত—সকলের চেয়ে কম দান করে। বদান্যতাগুণে বোম্বাইবাসীরা আমাদের দৃষ্টান্তস্থল।

বোম্বায়ে নামকরণ

গর্ভাধান হইতে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া পর্য্যন্ত যে ষোড়শ বৈদিক সংস্কার বিধিবদ্ধ আছে, তাহার মধ্যে নামকরণ পঞ্চম সংস্কার, জাতকর্ম্মের পর নামকরণ—সন্তান জন্মিবার দ্বাদশ দিবস পর্য্যন্ত সামান্যতঃ ইহার সময় নির্দ্দিষ্ট। সকল বর্ণের মধ্যে সময়ের এই নিয়ম নাই; ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে দ্বাদশ দিবস, ক্ষত্রিয়দের ত্রয়োদশ, বৈশ্যদের ষোড়শ, শূদ্রদের দ্বাবিংশ দিবস নামকরণের নির্দ্ধারিত কাল। আর কার্য্যগতিকে এই কালের ব্যতিক্রমও ঘটিয়া থাকে।

শুক্লরাটী ব্রাহ্মণের মধ্যে জাতকর্ম্ম প্রথা এক্ষণে প্রচলিত নাই, মারাঠী ব্রাহ্মণদের মধ্যে কেহ কেহ তাহা অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, কিন্তু নামকরণ সাধারণ হিন্দুজাতির মধ্যে প্রচলিত। লৌকিক ব্যবহারে তাহা ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে।

অশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রের মতে—

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার দ্বাদশ দিবসে, কিম্বা প্রথম মাসের অন্য কোন দিবসে, অথবা প্রথম সম্বৎসরে পিতা পুত্রের নামকরণ করিবেন। পিতা যদি বিদেশে গিয়া থাকেন, তবে তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নামকরণ করিবেন। নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া পুত্রের তিনবার মস্তক আঘ্রাণ করিবেন ঃ—

অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবসি হৃদয়াদধিজায়সে
আত্মা বৈ পুত্রনামাঽসি স জীব শরদাং শতং ॥

ককারাদি বর্গের প্রথম, দ্বিতীয় অথবা চতুর্থবর্ণ নামের আদিতে ও বিসর্গান্ত হ্রস্ব স্বর অন্তে থাকা বিধেয়। প্রতিষ্ঠাকাম ব্যক্তি দ্বি অক্ষর নাম রাখিবেন; ব্রহ্মবর্চ্চসকাম চতুরক্ষরের নাম রাখিবেন; পুরুষের নামে যুক্তাক্ষর মিলিত থাকিলে হানি নাই, কন্যার নামে আদিতে যুক্তাক্ষর না থাকে এইরূপ নাম রাখিবে, যেমন সুখদা সুভদ্রা, বরদা যশোদা, সাবিত্রী, কলাবতী ইত্যাদি। পারস্কর গৃহ্য সূত্রের মতে পুরুষের নাম তদ্ধিতান্ত (দৈবদত্তিঃ ঔপামন্যবঃ ইত্যাদি) হওয়া বিধেয় নয়। স্ত্রীর নাম তদ্ধিতান্ত হইবার বাধা নাই, যথা গান্ধারী, কৈকেয়ী, জানকী ইত্যাদি। ব্রাহ্মণের উপাধি শর্ম্মন্, ক্ষত্রিয়ের বর্ম্মন্, বৈশ্যের গুপ্ত, শূদ্রের দাস।

গোভিলীয় গৃহ্যসূত্রে নামকরণ প্রথা এইরূপ লিখিত আছে।

কুমারকে শুদ্ধ বসন পরিধান করাইয়া মাতা বাম-ভাগে উপবিষ্ট পিতার হস্তে তাহাকে দিবেন। তৎপরে পত্নী পৃষ্ঠদেশ হইতে পতিকে পরিক্রমণ করতঃ তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবেন। পতি "যজ্ঞে সুসীমে" "যথা যন্ন প্রমীয়েত পুত্রো জনিত্র্যা অধীতি" প্রভৃতি বেদমন্ত্র পাঠ করিয়া পত্নীকে কুমার প্রত্যর্পণ করিবেন। পরে "যদদশ্চন্দ্রমসীইত্যাদি মন্ত্রে চন্দ্রের অর্চনা করিয়া পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিবেন ও যথোক্তপ্রকার হোমাদি অনুষ্ঠান করিয়া পুত্রের নামকরণ করিবেন।

কালক্রমে এই বৈদিক প্রথার অনেক পরিবর্ত্তন ও রূপান্তর হইয়া আসিয়াছে।

সংস্কার পদ্ধতি প্রয়োগে নামকরণ পদ্ধতি নিম্নলিখিত প্রকার :—

একাদশ কিংবা দ্বাদশ দিবসে পিতা সন্তানের দীর্ঘায়ু ও কল্যাণ উদ্দেশে নামকরণ সঙ্কল্প করিবেন। নিম্নলিখিত নাম হইতে নাম নির্ব্বাচিত হওয়া উচিত—

১	২	৩	৪	৫	৬
কৃষ্ণ	অনন্ত	অচ্যুত	চক্রী	বৈকুণ্ঠ	জনার্দ্দন,
৭	৮	৯	১০	১১	১২
উপেন্দ্র	যজ্ঞপুরুষ	বাসুদেব	হরি	যোগীশ	পুণ্ডরীকাক্ষ।

চৈত্র হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্ত এক এক মাসের এক এক অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—চৈত্রপ্রধান কৃষ্ণ, বৈশাখপ্রধান অনন্ত ইত্যাদি। এই হেতু যে মাসে সন্তান জন্মে সেই মাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নামে তাহার নাম রাখিতে হইবে। চৈত্রে জন্মিলে তাহাকে কৃষ্ণের নাম দেওয়া বিধেয়।

অপিচ গৃহদেবতা কি কুলদেবতার নাম হইতেও সন্তানের নাম দেওয়া যায়, যথা শঙ্কর, মহাদেব, গোবিন্দ, গণেশ, গোপাল, বামন ইত্যাদি।

সংস্কার-পদ্ধতিতে নাম রাখিবার আর এক প্রথা নির্দ্দিষ্ট আছে।

একটি কাংস্যপাত্রে স্বর্ণ-লেখনী দ্বারা চতুর্ব্বিধ নাম লিখিতে হইবে। যথা

১। কুলদেবতার নাম (রাম, কৃষ্ণ, বিঠোবা ইত্যাদি)

২। মাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম (কৃষ্ণ, অনন্ত ইত্যাদি)

৩। রাশির নাম।

৪। কুলাচার অনুযায়ী নাম।

উল্লিখিত প্রকারের কাংস্যপাত্রে নাম লিখিত হইলে মাতা শিশুকে দক্ষিণ ক্রোড়ে বসাইবেন ও পিতা শিশুর দক্ষিণ কর্ণে নাম উচ্চারণ করিয়া "তদস্তু মিত্রাবরুণ" মন্ত্র পাঠ করিবেন ও পুরোহিত আশীর্ব্বাদ করিয়া কর্ম্ম সমাপণ করিবেন।

এই সকল নিয়মে ও বৈদিক অনুষ্ঠানের মধ্যে অনেক প্রভেদ প্রতীয়মান হইবে। কুলদেবতার নাম ও রাশিনাম রাখিবার প্রথা বৈদিক-কালে প্রচলিত ছিল না। অবতারবাদ হিন্দুসমাজে প্রবিষ্ট হইবার পর এই সকল নাম প্রচার হইয়াছে ইহা সহজেই প্রতীতি হয়। কি মহারাষ্ট্রে কি গুজরাটে পুত্র কন্যার নাম অধিকাংশ দেবদেবীর নাম হইতে গৃহীত। বৈদিক নাম প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে। মুসলমানদের অনুকরণে দৌলত রায়, হুকুমত রায়, খুসাল, মহতাব, হামত পারস্য ভাষায় সংরচিত প্রভৃতি কতকগুলি নাম দেখা যায়।

গুজরাটে নামকরণকে 'বারসা' (বার বাসর) বলে; ইহাতে বিশেষ কোন অনুষ্ঠানের আড়ম্বর নাই; নামকরণ কার্য্য স্ত্রীদের দ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে। সন্তানের নাম রাখিবার ভার বিশেষরূপে তাহার ফোই অর্থাৎ পিসিমার হস্তে সমর্পিত, ও এই উপলক্ষে তিনি ভ্রাতার নিকট হইতে উপহার প্রত্যাশা করেন।

গুজরাটে নামকরণের প্রথা এইরূপ,—

চারিজন বালক যাহাদের উপনয়ন হয় নাই, অথবা চারি স্ত্রী একখণ্ড রেশমের

কাপড়ের চারি কোণ করিয়া দাঁড়ায়, পরে মাতা সন্তানকে তাহাতে রাখিয়া দেন। বালকেরা অথবা মেয়েরা সেই ঝোলা দুলাইতে দুলাইতে এই শ্লোক আবৃত্তি করে—

ঝোলী পোলী পীপল পান
ফোইয়ে পাড্যুঁ (অমুক) নাম।
(পিসি রাখে অমুক নাম)

পরে মিষ্টান্ন পরিবেশন হইয়া ক্রিয়া সমাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণদের সচরাচর দুই নাম থাকে, এক ডাক নাম, এক রাশিনাম।

মারাঠীদের মধ্যে কতকগুলি নাম কেবল পরিবার ও আত্মীয়দের মধ্যেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জনসাধারণে তাহারা এক নামে পরিচিত, আপনাদের মধ্যে তাহাদের আর এক নাম ব্যবহৃত হইয়া থাকে—যথা

কৃষ্ণরাও—নানা সাহেব
ভীমরাও—তাত্যা সাহেব
খণ্ডেরাও—ভাই
গণপতরাও—বালা

এইরূপ আপ্পা আন্না প্রভৃতি আরো কতকগুলি ঘরাও নাম আছে, গুজরাটীদের মধ্যে এইরূপ নান্থু, মন্থু, মোটাভাই বলিয়া কতকগুলি নাম শ্রবণ করা যায়। অনেক সময় পিতাকে পুত্রেরা বাবার পরিবর্ত্তে হয়ত মোটাভাই বলিয়া সম্বোধন করে। মাতাকে 'মা' না বলিয়া মোটী বেন (দিদি) বলিয়া ডাকে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও জ্যেষ্ঠা ভগিনীর জন্য দাদা দিদির অনুরূপ কোন নাম নাই।

মহারাষ্ট্রী গুজরাটী ও বাঙ্গলা ভাষায় সম্বন্ধ-সূচক নামাবলী পাঠ করিয়া পাঠকগণ এই তিন ভাষায় সৌসাদৃশ্য অনেকাংশে উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

বাঙ্গলা	মারাঠী	গুজরাটী
বাপ, পিতা	বাপ, পিতা	বাপ, পিতা
মা, মাতা	আই, মাতুশ্রী	মাতা, মাতা
ভাই	ভাই	ভাই
ভগিনী, বোন	বহিন	বেন
খুড়তুতা ভাই	চুলত ভাউ	পিত্রাই
কাকা	কাকা	কাকা
কাকী	কাকী	কাকী
স্বামী	নবরা, ভ্রতার	ধনী, বর
স্ত্রী	বায়কো	বায়ড়ী
বড় ঠাকুর	জ্যেঠ	জ্যেঠ
দেওর, ঠাকুর পো	দীর	দের
ননদ	ননদ	ননদ
শ্যালা	মেহুমনা	শালা
ভাজ	ভাউজাই	ভোজাই, ভাবী
ভগিনী পতি, বোনাই	বনেবী, দাজী	বনেবী
সতীন	সবত	সোথ
মামা	মামা	মামা
পিসি	ফোই	ফোই
মাসী	মাউসী	মাউসী
বউ	স্নুন	বহু
জামাই	জঁবাই	জমাই
ঠাকুর দাদা	আজা	দাদা
দিদিমা	আজী	দাদী
পৌত্র, নাতী	নাতু	পৌত্র
ভাইপো	পুতনা	ভত্রিজ

জ্যেষ্ঠা ও মূল, এই দুই নক্ষত্র অশুভ বলিয়া পরিগণিত। এই দুই নক্ষত্রে পুত্র কি

কন্যা জন্মিলে জননী অল্পকালেই মৃত্যু আশঙ্কা করেন। এই অমঙ্গল নিবারণহেতু সেই নক্ষত্রের নামে সন্তানের নাম রাখিবার নিয়ম আছে। জ্যেষ্ঠাতে জন্ম হইলে নাম জেঠা কিম্বা জেঠী, মূল নক্ষত্রে জন্ম হইলে নাম মূলজী, মূল, শঙ্কর অথবা মূলী রাখা হইয়া থাকে। যদি অনেক সন্তান মৃত হইয়া দৈববশাৎ এক সন্তান বাঁচিয়া থাকে, তবে তাহার নাম জীবা কি জীবী রাখা হয়। যে গৃহে বালকের সংখ্যা এত অধিক যে তাহাদের যত্ন নাই, তথায় হয়ত ধূলা, কচরা, জূঠা, পূঁজা প্রভৃতি অযত্ন সূচক নাম ধরিয়া ডাকা হয়।

এদেশের নাম রাখিবার সময় পুত্রের নামের সঙ্গে পিতার নাম যোগ করিয়া দিবার এক রীতি সর্ব্বত্র প্রচলিত। মারাঠী গুজরাটী পারসী সকলেরই মধ্যে এই রীতি দৃষ্ট হয়। যথা পিতার নাম সারাভাই, পুত্রের নাম ভোলানাথ সারাভাই, পৌত্রের নাম ভীমরাও ভোলানাথ। পারসীদের মধ্যেও এইরূপ—পিতার নাম খরসদ্‌জী, পুত্রের নাম মানকজী খরসদ্‌জী, পৌত্রের নাম জাহাঙ্গীর মানকজী। অনেক স্থলে এই স্বনাম ও পিতৃনাম ভিন্ন জাতিসূচক নাম কিম্বা মর্য্যাদাসূচক কোন উপাধি দৃষ্ট হয় না। বাঙ্গালীদের মধ্যে যেমন বন্দ্যো, ভট্ট, মিত্র, দাস প্রভৃতি জাতিসূচক নাম ব্যবহৃত হয়, এখানে সেরূপ নিয়ম নাই। তবে মরাঠীদের মধ্যে অনেকেরই কুল-পদবী থাকে—যথা গোড়বোলে (মিষ্টভাষী), কড়কড়ী, জোষী, মুনসী, তর্খড়কড় ইত্যাদি। ইহা অপরিবর্ত্তনশীল বংশগত নাম।

গুজরাটে 'জী' ও 'ভাই' শব্দান্ত নামই অধিক প্রচলিত, কায়স্থ ও বণিকদের মধ্যে দেবতার নামের শেষে দাস শব্দ সংযুক্ত করিবার রীতি আছে; যেমন জগজ্জীবন দাস, লক্ষ্মণ দাস, নরোত্তম দাস ইত্যাদি। এক প্রদেশে রণছোড় নামক এক ভীরুস্বভাব দেবতা আছে, অনেকে সেই নাম ধারণ করেন। একজন নব্যসম্প্রদায়ের গুজরাটী কায়স্থ, ঐ নামের উপর চটিয়া অপনার পুত্রের নাম রণজিৎ রাখিয়াছেন। বাঙ্গলা নামের অনুকরণেও উহার মধ্যে কেহ কেহ পুত্র কন্যার নাম রাখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মারাঠা দেশে বিঠোবা নামক দেবতা বিশেষ প্রসিদ্ধ আছে, এই হেতু মারাঠীদের মধ্যে বিঠোবা, বিঠ্‌ঠলরাও অনেকের এই নাম শোনা যায়।

স্ত্রীলোকের নাম অধিকাংশ দেবী ও নদী হইতে গৃহীত হয়; যথা পার্ব্বতী, লক্ষ্মী, উমা, দুর্গা, রেবা, যমুনা। সীতা চিরদুঃখিনী বলিয়া কন্যার ঐ নাম রাখিতে বঙ্গবাসীরা যেরূপ কুণ্ঠিত, এখানে সেরূপ ভাব দেখা যায় না। সীতা জানকী প্রভৃতি নাম এদেশে অত্যন্ত প্রচলিত। এতদ্ভিন্ন পুষ্প স্বর্ণ মণিমানিক্য হইতে ও নাম দেওয়া হয়। মোতী, সোনু, জহর, রত্ন, চম্পা চামেলী এ সকল নাম ও প্রচলিত। বিবাহিতা স্ত্রী পতিগৃহে নামান্তর গ্রহণ করেন। জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূর নাম সচরাচর লক্ষ্মী রাখা হইয়া থাকে। কিন্তু তাহার বিশেষ কোন নিয়ম নাই তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে স্বামীর নাম অনুসারে স্ত্রীর নাম রচিত হয়। স্বামীর মহাদেব হইলে স্ত্রীর নাম পার্ব্বতী, শঙ্কর হইলে উমা, কৃষ্ণ হইলে রাধা, বিঠোবা হইলে রুক্মা, রাম হইলে সীতা। কন্যার নাম যদি আওড়ী

সার কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর- রেডিমণি ।

(আদুরী) থাকে, তবে আত্মারামের সঙ্গে বিবাহ হইলে তাহার নাম রাধা হইতে পারে, কেন না কৃষ্ণের আর এক নাম আত্মারাম ও কৃষ্ণের আদরিণী রাধা। গুজরাটে অনেক সময় অবিবাহিতা কন্যার প্রতি কুমারী ও বিবাহিতা স্ত্রীর প্রতি বধূ শব্দের প্রয়োগ হয়।

বাই শব্দ মর্য্যাদা সূচক—স্ত্রীদের নামের প্রথমে কি শেষে ইহা যুক্ত হয়; যথা সোনু-বাই, আনা বাই, দুর্গা বাই, বাই রতন, বাই মানক ইত্যাদি।

পারসীরা তাহাদের পারস্যদেশীয় বীর-পুরুষদের নাম সচরাচর ধারণ করে, যথা রোস্তম, যমসেদ, কাইখসরু, জাহাঙ্গীর, খুরসদ, দোরাব, সোরাব ইত্যাদি। এই সকল নামে গুজরাটের প্রথা অনুসারে জী কিম্বা ভাই যোগ করিয়া দিলে পারসী নাম সম্পূর্ণ হয়। এতদ্ভিন্ন কতকগুলি হিন্দুনামও তাহারা ব্যবহার করিয়া থাকে, রতন-জী, পদম-জী, দাদা-ভাই, আদর-জী জীবন-জী, ইত্যাদি। পারসী রমণীগণ হিন্দুস্ত্রীর নামানুযায়ী নাম ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু কতকগুলি পারস্য নামও প্রচলিত আছে, যথা সিরীণ পরোচিস্তা ইত্যাদি।

পারসীদের মধ্যে কতকগুলি অদ্ভুত অদ্ভুত পদবী ও উপাধি দৃষ্ট হয়। তাহা অনেক স্থানে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদের অবলম্বিত ব্যবসা হইতে কল্পিত বোধ হয়, তাহার দৃষ্টান্ত বাটলীওয়ালা, দারুখানাওয়ালা, ঘাস-ওয়ালা। এই সকল নামের মধ্যে দুটি নাম বোম্বাই মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ বাটলীওয়ালা ও রেডি-মনি (নগদ কড়ি)। সর জমসদজী জিজি ভাই প্রসিদ্ধ নাইটের পদবী বাটলীওয়ালা। প্রবাদ আছে যে প্রথম সরজমসদজী বোতল বিক্রয়ের ব্যবসা আরম্ভ করেন ও ক্রমে বাণিজ্য কার্য্যে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া তাহার সদ্ব্যয় দ্বারা ব্রিটিশ নাইটের উপাধি প্রাপ্ত হন। অপর একজন পারসী নাইটের উপাধি Ready money (নগদকড়ি) ইনি ভাবত নক্ষত্রের নাইট, ইহার নাম সর কত্তযাসজী জাহাঙ্গীর, ইনিও উদারতা ও বদান্যতাগুণে নাইট পদবী পাইয়াছেন। এমন কোন হিতকর বিষয় নাই যাহাতে ইহার বদান্যতা প্রকাশ না পায়, ইহার দান দেশ-কাল-পাত্র সাপেক্ষ নহে। সকল জাতির জন্যই ইহার ধনাগার মুক্ত রহিয়াছে। ইংলণ্ড বাসীদের দারিদ্র্য মোচনই বল, স্বদেশের কল্যাণ সাধনই বল, ইহার নগদ টাকা সর্ব্বত্রই কার্য্যে আইসে।

বঙ্গদেশে ও বোম্বায়ের মধ্যে তুলনা করিয়া দেখিলে দেখা যায়, বঙ্গদেশে নামরাজ্য অপেক্ষাকৃত বিস্তীর্ণ। বঙ্গবাসীর মধ্যে দেব দেবীর নামেরও অভাব নাই, এতদ্ভিন্ন প্রকৃতির মনোহর সুন্দর পদার্থ হইতে আমরা অনেক সময়ে নাম গ্রহণ করি—এদেশে প্রায় সেরূপ নাম শুনা যায় না, যেমন চারুচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, হেমচন্দ্র, শশীন্দ্র, নীলকমল ইত্যাদি। কতকগুলি নাম গুণবাচক যথা সত্য, করুণা, প্রতাপ, মনোমোহন; আর কতকগুলি নাম রাজা অথবা বীরসংজ্ঞক—যথা দেবেন্দ্র, শূরেন্দ্র, মহেন্দ্র, বরেন্দ্র, এ সকল বোম্বাই প্রদেশে প্রচলিত নাই। স্ত্রী লোকের নাম তুলনা করিয়া দেখিলেও বঙ্গাঙ্গনাদের প্রাধান্য দিতে হয়। বঙ্গাঙ্গনাদের

নামে বিচিত্রতা ও শ্রুতি মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। সৃষ্টির সমুদয় মধুর ও সুন্দর পদার্থ হইতে সেই সকল নাম সংগৃহীত। সৌদামিনী, ঊষা; নলিনী কুমুদিনী মালতী প্রভৃতি নানাজাতীয় পুষ্প; ঋতুপ্রধান বসন্ত ও শরতের অধিষ্ঠাত্রী কুমারী; সুশীলতা, দয়া, করুণা প্রভৃতি গুণ সমূহ; স্বর্ণ হীরা মুক্তা মণি মাণিক্য এ সকলি বঙ্গনারীদিগের নামের কল্পতরু। নামের সঙ্গে গুণের যোগ থাকা যদি স্বাভাবিক হয়, তবে বঙ্গস্ত্রীদের মত রূপগুণ সম্পন্ন নারীরত্ন কোথায় পাওয়া যাইবে?

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বঙ্গে ইংরেজবণিকগণের অবস্থা

(সপ্তদশ শতাব্দী)

কলিকাতায় 'ফোর্ট উইলিয়ম' প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে হুগলী ইংরেজবণিকগণের বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। নানাস্থান হইতে এই স্থানে চিনি, রেশম, পশম, অহিফেন, তণ্ডুল, গম, ঘৃত, পাট এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্য আমদানী হইত। সূত্রবস্ত্র এবং পশমবস্ত্র প্রস্তুত করিবার জন্য হুগলীর চতুষ্পার্শে অনেক তন্তুবায় বাস করিত। হুগলী নগরে পর্ত্তুগীজগণের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প ছিল না। কিন্তু তখন তাহাদিগের অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। এইরূপ হীন অবস্থায় পতিত হইয়া তাহারা স্থানীয় রাজ-সরকারের সৈন্যদলে প্রবিষ্ট হইতে বাধ্য হইত। হুগলীর উত্তরে পর্ত্তুগীজ উপনিবেশ বন্দেল (Bandel) এবং দক্ষিণে ওলন্দাজদিগের চুচুড়া (Chinsurha) নগরের মাঝখানে একটী বাঁক ছিল, তাহার নাম গোলাঘাট। এই স্থানেই অদূরদর্শিতা বশতঃ ইংরেজগণ কুঠী নির্ম্মাণ করেন। (১)

গোলাঘাটে কোম্পানীর বিবাহিত কর্ম্মচারীগণের স্থানসংকুলান হইত না। তাহারা নগরের বাহিরে বাস করিত। ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে Sreynsham Master গোলাঘাটের কুঠী পরিবর্দ্ধিত ও পুনর্নির্ম্মিত করিয়া এই মর্ম্মে আদেশ প্রদান করেন যে, যাহারা সপরিবারে নগরের বাহিরে বাস করিতেছে, অতঃপর ক্রমে ক্রমে তাহাদিগকে কুঠীর সীমায় বাস করিতে হইবে। এইরূপে যাহারা কুঠীর সীমায় বাস করিতে লাগিল, ধনাধ্যক্ষ তাহাদিগের তত্ত্বাবধান করিতেন। (২)

প্রতিনিধি (agent), হিসাবনবীশ accountant, ভাণ্ডারী, (store keeper), এবং ধনাধ্যক্ষ এই চারিজন সদস্য লইয়া হুগলীতে একটী শাসনকর্ত্তৃপক্ষ গঠিত হইল। উল্লিখিত কর্ম্মচারী চতুষ্টয়ের পরবর্ত্তী আসন সম্পাদকের (Secretary)। তিনি সম্মিলনীর প্রত্যেক অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়া সম্মিলনীর দৈনিক কার্য্যাবলী লিপিবদ্ধ

(১) Hedge's Diary, II, 238 to 240.

(২) Ib. II, 236—237.

করিয়া রাখিতেন। বৎসরান্তে লিপিবদ্ধ দৈনিক কার্য্যাবলী সমালোচিত হইয়া বিলাতে প্রেরিত হইত। ধর্ম্মযাজকের (chaplain) আসন তৃতীয়। ধনাধ্যক্ষ ও সম্পাদকের মধ্যবর্ত্তী পদ অস্ত্রচিকিৎসকের। এই সমুদয় উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর পর কেরাণী, গোমস্তা, শিক্ষানবীশ প্রভৃতি নিম্নতন কর্ম্মচারী। প্রতিনিধির বাৎসরিক বেতন একশত পাউণ্ড, ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া ১৬৮২ অব্দে দুই শত পাউণ্ডে পরিণত হইয়াছিল। ধর্ম্মযাজকগণ বৎসরে একশত পাউণ্ড পাইতেন। গোমস্তা, কেরাণী প্রভৃতির বাৎসরিক বেতন বিশ হইতে চল্লিশ পাউণ্ড। এই সমুদয় বেতন নাম মাত্র, কারণ কর্ম্মচারীগণ আপন আপন উন্নতির জন্য ভিন্নভাবে বাণিজ্য করিতে পারিত। ইহা ভিন্ন তাহারা সাধারণ ধনভাণ্ডার (public fund) হইতে নানাপ্রকার খরচা প্রাপ্ত হইত। কোম্পানীর প্রত্যেক কর্ম্মচারীর জন্য কুঠীর সীমানায় বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট থাকিত। যে সমুদয় উচ্চ পদস্থ বিবাহিত কর্ম্মচারী পৃথক ভোজনে ইচ্ছুক হইতেন, কোম্পানী তাঁহাদিগের ভোজন সামগ্রী, ভৃত্যের বেতন ও আলোর খরচ যোগাইত। (৩)

শাসনদণ্ড পরিচালিত করিবার জন্য অধ্যক্ষ (chief) আপনার অধীনে ত্রিশ চল্লিশ জন দেশীয় সৈন্য পাইতেন। ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে এই সেনাদলের সহিত বিংশতিজন ইউরোপীয়ান সৈন্য ও নিম্নশ্রেণীর একজন পদাতিক সেনানায়ক যুক্ত করা হইয়াছিল। (৪)

ইংরেজ এবং দেশীয়গণের মধ্যস্থ স্বরূপ একজন দালাল থাকিত। কোম্পানী তাহাকে চতুষ্পার্শ্বর্ত্তী স্থান সমূহে দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় করিবার জন্য প্রেরণ করিতেন। এই জন্য প্রত্যেক দ্রব্যের উপর ঐ দালালকে শতকরা তিন টাকা হারে পুরস্কার প্রদান করা হইত। এতদ্ব্যতীত কোম্পানী কখনও কখনও দেশীয় বণিকগণকে তাহাদিগের নমুনা সমেত আহ্বান করিয়া পাঠাইতেন। এবং তাহাদিগের দ্বারাই দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া লইতেন। এজন্য অবশ্য তাহাদিগকে পুর্ব্বোক্ত হারে পুরস্কার প্রদান করা হইত।

কোম্পানী কর্ত্তৃক আদিষ্ট না হইয়া কোন কর্ম্মচারী কুঠীর বহির্ভাগে অবস্থান করিতে পারিত না। (৫) কুঠীর অভ্যন্তরে বিদ্যালয়ের ন্যায় সুনিয়মে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইত। প্রাতঃকালে নয় বা দশ ঘটিকা হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ ঘটিকা এবং অপরাহ্ণে চারি ঘটিকা পর্য্যন্ত কার্য্য করিতে হইত। জলযান নির্ম্মাণের সময় কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণের আর অবসর ঘটিয়া উঠিত না। তখন হুগলী নগর অগণ্য নরনারীর কলকোলাহলে মুখরিত থাকিত।

মধ্যাহ্নে উচ্চনীচ অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সকলে সাধারণ ভোজনালয়ে (common hall) আহার করিতেন। ইংরেজ, পর্ত্তুগীজ

(৩) See Hedge's diary, II, pp 10 and 11 Ovington's voyage to Surat p. 389-91.

(৪) Ovington's Voyage p.p. 391 92.

(৫) Hedge's Diary, II, 237. Ovington's voyage 393.

বা ভারতীয় লোক দ্বারা পাকক্রিয়া সম্পন্ন হইত। কর্ম্মচারীগণের সকলেই সুরা পান করিত। ইউরোপে প্রস্তুত সুরা বিলাসসামগ্রী বলিয়া পরিগণিত ছিল। রবিবার এবং অন্যান্য পবিত্র দিনে সকলেই পশুপক্ষী শীকারে বহির্গত হইত এবং শীকারলব্ধ সামগ্রী দ্বারা উদর পূর্ত্তি করিত। প্রত্যহ চা-পান তখন সমস্ত ভারতে প্রচলিত ছিল। (৬)

রাত্রি নয় ঘটিকার সময় কুঠীর দ্বার রুদ্ধ হইত। তাহার পর সকলে একত্র হইয়া নৈশভোজন সমাধান করিতেন। (৭)

ইংরাজ বণিকদিগের আমোদপ্রমোদের পরিমাণ নিতান্ত অল্প ছিল। কখনও তাহারা তাহাদিগের ওলন্দাজ প্রতিবাসিদিগকে ভোজনে নিমন্ত্রণ করিত, আবার কখনও বা তাহারাই তাহাদিগের ওলন্দাজ প্রতিবাসী দ্বারা নিমন্ত্রিত হইত। (৮)

সময় সময় তাহারা স্থানীয় লোক সমভি ব্যাহারে শীকারে বহির্গত হইত। (৯) কিম্বা বঙ্গের প্রাচীন কীর্ত্তির নিদর্শন অবলোকন করিয়া নয়ন সার্থক করিত।(১০) কিন্তু কুঠীর নিয়মানুসারে তাহারা কখনও কুঠীর এক-ক্রোশ উত্তরে ইংরেজদিগের উদ্যানবাটিকার সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিত না।(১১)

কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণ কখনও স্নিগ্ধ উষায়, কখনও বা শান্ত সন্ধ্যায় মন্দসমীরণান্দোলিত পাদপমূলে উপবেশন করিয়া কর্ম্মক্লান্ত জীবনের ক্লান্তি দূরীভূত করিত, কখনও বা স্বচ্ছ সরোবরের শীতল সলিলে অবগাহন করিয়া শারীরিক গ্লানি অপসারিত করিত, আর কখনও বা পত্রবহুল বিটপীর স্নিগ্ধচ্ছায়ায় অঙ্গ জুড়াইত। (১২)

শীকার তাহাদিগের ব্যায়ামস্বরূপ ছিল এবং তাহারা সলিলের পরিবর্ত্তে সুরা পানীয়-রূপে ব্যবহার করিত।(১৩)

অধ্যক্ষ এবং তন্নিম্নস্থানীয় কর্ম্মচারী ভ্রমণের নিমিত্ত পাল্কী পাইতেন। সম্মিলনীর অন্যান্য কর্ম্মচারী এবং ধর্ম্মযাজকগণ প্রত্যেকে এক একটী বৃহৎ আতপত্র পাইতেন। তদ্ভিন্ন অপর কর্ম্মচারী আতপনিবারণের নিমিত্ত কোম্পানীর নিকট হইতে কিছু পাইত না।(১৪) সৈন্য পরিবেষ্টিত না হইয়া কেহ কখনও স্থানান্তরে গমনাগমন করিতে পারিত না।(১৫)

কোন কোনদিন বিবিধ সমারোহ সহকারে

(৬) See Mondelsloe's voyage in wheeler's early record's voyage of British India, edition of 1878, p. 22.

(৭) Ovington's voyage 394-98.

(৮) Tavernere's voyage, II, 81. Hedge's Diary, I, 56.

(৯) Hedge's Diary I, 66.

(১০) Ib., I, 88.

(১১) Ib., I 34, 35, II 234.

(১২) Ovington's Voyage p. 400.

(১৩) Mondelslo's voyage p. 22.

(১৪) Hyde, op. cit, p 5.

(১৫) Ovington's voyage p. 393.

শাসনকর্ত্তা উত্থানবাটিকায় গমন করিতেন। (১৬) সম্মুখে দুই ব্যক্তি চাতকপুচ্ছমুদ্রিত (Swallow Tailed) পতাকা বহন করিয়া লইয়া যাইত। (১৭)

পতাকাবাহকের পর বাদ্যকরগণ নানা প্রকার সুমিষ্ট বাদ্যযন্ত্র ধ্বনিত করিতে করিতে অগ্রসর হইত। ইহার পর অধ্যক্ষ সস্ত্রীক পাল্কীতে আরোহণ করিয়া যাইতেন। তাঁহাদের সহিত পারস্যদেশীয় অশ্বও থাকিত। চারিজন সৈনিক পুরুষ অধ্যক্ষের পাল্কী বহন করিয়া লইয়া যাইত। সম্মিলনীর অন্যান্য সদস্যগণ যানারোহণে যাইতেন। তাঁহাদিগের সহিত মহিলা থাকিলে দেশীয় প্রথা অনুসারে শকটের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইত। অন্যথা, যাহাতে দেশীয়গণ তাঁহাদিগের ঐশ্বর্য্য দর্শনে বিস্মিত হয়, এই অভিপ্রায়ে শকটের দ্বার উন্মুক্ত রাখা হইত। (১৮

বঙ্গে ইংরেজ বণিকগণ ইংরাজি পরিচ্ছদাদি ব্যবহার করিত। ১৬১৮ অব্দ পর্য্যন্ত চিত্রিত বস্ত্রের জামা প্রচলিত ছিল। এই সকল জামায় লেস্ (Lace) ব্যবহৃত হইত। ইহাই এদেশে ইংরেজদিগের চিহ্ন বলিয়া পরিগণিত ছিল। ইহা ভিন্ন কিম্বা ইহারই তুল্য অপর কিছু ভিন্ন লোকে সম্মান পাইত না। (১৯) Streynsham Master কিম্বা ধর্ম্মযাজকের মত গণ্যমান্য লোক পরচুলা পরিধান করিতেন। ২০) তাঁহারা কুঠী ভিন্ন অন্যস্থানে শতরঞ্চ পাতিয়া আহার করিতেন। (২১)

কোম্পানীর কর্ম্মচারীর মধ্যে কেহ কেহ ভারতীয় রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

তাহাদিগের মধ্যে সাধারণ বিশ্বাস ছিল অমিতাচারিতাই (দেশের জলবায়ু নহে) তাহাদিগের অকাল মৃত্যুর কারণ। ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ পরিব্রাজক Berneir লিখিতেছেন—

"তথায় বিশেষতঃ সমুদ্রের নিকটে জলবায়ু যে বিশেষ স্বাস্থ্যকর নহে, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইংলণ্ড ও হলণ্ডবাসীগণ প্রথম যখন এস্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিতে আগমন করে, তখন তাহাদিগের অনেকেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। বালেশ্বরে আমি ইংরেজগণের দুইখানি জলযান দর্শন করিয়াছিলাম, হলণ্ডবাসীগণের সহিত যুদ্ধ হেতু এই দুইখানি জলযান তথায় বৎসরাধিককাল থাকিতে বাধ্য হয়, কিন্তু তাহার পরও জলযান দুইখানি সমুদ্রে বাহির হইতে পারে নাই—কারণ, জলযানের অনেক নাবিক ইতোমধ্যে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিল। তাহারা সাবধান হইয়া এই মর্ম্মে আদেশ প্রদান করিয়াছিল যে তাহাদিগের নাবিকগণের মধ্যে কেহ এত অধিক

(১৬) Ib. p 399—400. Compare also Hyde's Diary I. 123.

(১৭) Hedge's Diary II. 237.

(১৮) See Early Annals of the English in Bengal.

(১৯) Hedge's Diary, II, 347.

(২০) Hyde, op, cit, p. 5.

(২১) Ovington's voyage 40.

পরিমাণ সুরা (Bowlpunch) পান করিতে পারিবে না, তামাক ও মদ্যের দোকানে এবং বেশ্যালয়ে এত ঘন ঘন গমন করিতে পারিবে না। বোর্ডো (Bordeaux) কেনারী (Canary) কিম্বা সিরাজের (Shiraz) মদ্য এই অস্বাস্থ্যকর স্থানের পক্ষে ঔষধ স্বরূপ, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা যদি এত অধিক মদ্য পান না করিত, তবে তাহাদিগের মধ্যে রুগ্নের সংখ্যা এত অধিক হইত না। Bowlpunch এক প্রকার মদ্য। এক প্রকার আরক, কালচিনি, লেবুর রস ও জল দ্বারা ইহা প্রস্তুত। ইহার আস্বাদ মধুর হইলেও শরীর ও স্বাস্থ্যের পক্ষে ইহা মহামারী স্বরূপ।"

পানদোষই তাহাদিগের অকালমৃত্যুর কারণ, তবুও ইহা তাহাদিগের মধ্য হইতে শীঘ্র নিরাকৃত হয় নাই। ১৬৭৮ অব্দে Pitt লিখিতেছেন,—"There is a general complaint that we drink a damnable deal of wine this year.' (২২)

কুঠীতে নানাপ্রকার সুনিয়ম সংস্থাপন করা সত্ত্বেও বঙ্গে তদানীন্তন ইংরেজ বণিকগণের কতকগুলি অপযশ উদ্‌ঘোষিত হইয়াছিল। সায়েস্তা খাঁ ইংরেজ বণিকদিগকে কোন্দলপ্রিয়, নীচপ্রকৃতি প্রভৃতি হেয় সম্বোধনে অভিহিত করিতেন।

১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণের পরিচালনা করিবার জন্য কতকগুলি নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়।

কোন ব্যক্তিকে রাত্রি নয়ঘটিকার পর গৃহে পাওয়া না গেলে, দরিদ্র সেবার জন্য তাহাকে দশটাকা জরিমানা প্রদান করিতে হইবে। যদি কোম্পানীর কোন কর্ম্মচারী প্রতিজ্ঞা করিয়া উহা প্রতিপালন না করে, তবে এরূপ প্রত্যেক অপরাধের জন্য তাহাকে বারপেন্স জরিমানা দিতে হইবে। পান দোষের জন্য প্রত্যেককে প্রত্যেকবার পাঁচশিলিং জরিমানা দিতে হইবে। সকাল সন্ধ্যায় উপাসনায় যোগ না দেওয়ার অপরাধের জরিমানা ১ শিলিং। যদি আদেশ মাত্র এই সমুদয় জরিমানা প্রদত্ত না হয়, তবে অপরাধীর সামগ্রীসম্ভার বিক্রয় করিয়া জরিমানা আদায় করা হইবে। প্রত্যেক মিথ্যা কথা বলার অপরাধে বারপেন্স জরিমানা দিতে হইবে। যদি কোম্পানীর কোন প্রোটেষ্টাণ্ট কর্ম্মচারী উপযুক্ত কারণ ব্যতীত উপাসনায় যোগ না দেয়, তবে তাহাকে এইরূপ প্রতি অপরাধের জন্য বারপেন্স জরিমানা দিতে কিম্বা এক সপ্তাহ কাল কুঠীতে অবরুদ্ধ থাকিতে হইবে। যদি কেহ এরূপ শাস্তি সত্ত্বেও স্বীয় অপরাধ পরিত্যাগ না করে, তবে তাহাকে সেণ্টজর্জ্জ দুর্গে প্রেরণ করা হইবে। যদি কেহ ব্যভিচার দোষ দুষ্ট হয় বা যদি কেহ বিবাদ বিসম্বাদ করিয়া কোম্পানীর শান্তি ভঙ্গ করে, তবে তাহাকেও গুরুতর শাস্তি উপভোগ করিবার জন্য প্রাগুক্ত দুর্গে নিক্ষেপ করা হইবে।

বৎসরের মধ্যে দুইবার এই সমুদয় নিয়ম কুঠীতে পঠিত হইবে।

জরিমানা আদায় করিবার জন্য মাসে মাসে এক এক জন কেরাণী নিযুক্ত হইত। এই সমুদয় জরিমানা বৎসরান্তে মান্দ্রাজে প্রেরিত

(২২) Hyde diary III, 5.

হইত এবং সেই স্থান হইতে দরিদ্রদিগকে দান করা হইত।

কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণ সকাল সন্ধ্যায় ভগবানের নিকট যে প্রার্থনা করিতেন, আমরা তাহার মধ্যেও তাহাদিগের ব্যক্তিগত স্বার্থের খর্ব্বতা দেখিতে পাই—সে প্রার্থনা এইরূপ। 'হে পরমকারুণিক সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর! তোমার উপর যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করে, তুমি তাহাদিগের আশ্রয়দাতা। তুমি ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের নিদান। তোমার নিকট আমাদিগের বিনীত প্রার্থনা—বহু সম্মানিত ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিয়োগকর্ত্তৃগণের উপর তোমার অপার করুণা বর্ষিত হউক,—তাঁহারা সকল কার্য্যে সার্থকতা লাভ করুন। তাঁহারা যেন রাজ্যশাসনে, বাণিজ্যব্যাপারে এবং উপনিবেশ স্থাপনে যশঃ অর্জ্জন করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহারা তাঁহাদিগের আপনাদের এবং স্বদেশের সম্মান, ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতা বর্দ্ধিত করিয়া সাধারণের আশীর্ব্বাদের পাত্র হইতে পারিবেন। হে ঈশ্বর, তুমি তাহাদিগের সৈন্যাধ্যক্ষ, প্রতিনিধি, সভাপতি এবং সম্মিলনীর অন্যান্য সভ্যদিগকে তোমার প্রতি অকপট ভক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত কর, তাঁহাদিগের মধ্যে জ্ঞান, বিশ্বস্ততা ও সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার ক্ষমতা সঞ্চারিত কর, তাহা হইলে আমরা আমাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিশ্বস্তভাবে সম্পন্ন করিতে পারিব এবং আমাদিগের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারিগণের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া ও পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইয়া শান্তিতে এবং ধর্ম্মভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিব। যে সমুদয় ভারতবাসিগণ পরিবৃত হইয়া আমরা বাস করি, তাঁহারা যেন আমাদের সংযত এবং সৎকথোপকথন শ্রবণ করিয়া পরম পিতা খৃষ্টের Gospelএর প্রতি যোগ্য সমাদর করিতে শিক্ষা করেন। মুক্তিদাতা খৃষ্ট চিরদিনই সম্মানিত, প্রশংসিত ও মহিমাযুক্ত হউন। স্বস্তি।

বাসক-সজ্জা

শিরীষে নতুন পাতা সবুজ সবুজ,
নরম গোলাপী ফুল দুলিছে সেথায়,
ছুঁইতে মাটীর বুক আরক্ত অবুঝ
বলরাম চূড়া শুধু ঝরে পড়ে যায়!

দুলালী গোলোক চাঁপা কি তার সোহাগ!
কোনখানে পাতা নাই শুধু ফুলে ফুল,
হেরিয়া ব্যাকুল তার ক্ষেপা অনুরাগ
হাসিয়া আকুল রাঙা গোলাপ পারুল!

সুনীল অপরাজিতা সে যে অতুলন,
কে কবে মানাতে তারে পারিয়াছে হার?
সমানে বরষ ভরে ফুটেছে যখন
আকাশের মত রাখি বরণ-বাহার!

বসন্তের সাড়া পেয়ে আসেনি ছুটিয়া,
সে ছিল শীতের দিনে কুসুম পূজার;—
বরষার তীক্ষ্ণ তীরে পড়েনি টুটিয়া,
নিদাঘ পারেনি নিতে মধু কলিজার!

শিহরি শিহরি অই ফুটল কামিনী,
নীরবে সুষমা খোলে রঙন কাঞ্চন,
মানেনা দোহাই তারা শাস্ত্রের কাহিনী
বাসন্তী পূজার রাখে সবে আকিঞ্চন।

অশোক চম্পার বুকে লাগায় কুঙ্কুম,
খাঁটি হয়ে ওঠে সোণা, শুধু নহে কাঁচা,
রুদ্র আরাধনা হবে, ছুটে যাবে ঘুম
হৃদয়ে অক্ষয় আলো তাই নিয়ে বাঁচা!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

বরপণ গ্রহণের বিপক্ষ যুক্তি

প্রবন্ধটি নিতান্ত কাঁচা হাতের লেখা, বরপণ গ্রহণের বিরুদ্ধে ইনি যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে পূর্ব্বপ্রবন্ধ লেখকের যুক্তি খণ্ডন করিতে পারেন নাই, ভাবের আবেগ প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র। তথাপি প্রবন্ধটি সংক্ষেপ করিয়া প্রকাশ করিলাম। ভাঃ সম্পাদিকা।

গত মাসের ভারতীতে 'বরপণ' সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা হওয়া সমাজের পক্ষে হিতকর, সেইজন্য মাননীয়া ও উদারচেতা সম্পাদিকা মহাশয়া সকলকে ঐ জটিল প্রশ্নের মীমাংসী-করণ সাহায্যার্থে মতামত প্রকাশের জন্য আহ্বান করিয়াছেন। আমি প্রবন্ধলেখকমহাশয়ের যুক্তির বিরুদ্ধে মোটামুটি দুই-চারিটী কথা বলিতে চেষ্টা করিব। ভরসা আছে যোগ্যতর এবং প্রবীণ ব্যক্তিরা আমার প্রতিপাদ্য বিষয় বিশদ ও স্পষ্টরূপ ব্যাখ্যা করিবেন। লেখকের বরপণ গ্রহণ সম্বন্ধে সমস্ত যুক্তির মর্ম্মটুকু এই। আজকাল জীবনযাত্রার উপায় বড়ই কঠোর হইয়াছে, সুতরাং স্বচ্ছলভাবে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে অর্থের একান্ত প্রয়োজন। অতএব বর বিবাহিত জীবনের "সুখ স্বচ্ছন্দতার" জন্য পণ কেন আদায় করিবে না।" আমরা এই "যুক্তি" দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি। যে কাজটা "নীচ" "ধর্ম্মবিরুদ্ধ" এবং সমাজের অনিষ্টকারক সেই কাজটী না করা ভাল— না ব্যক্তি বিশেষের "সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য" উহা করা ভাল ?(১) অর্থাৎ এ হিসাবে দস্যুবৃত্তি অথবা ডাকাতিকেও ভাল বলিতে হয়। কেন না একজনকে অপহরণ করিয়া অন্যের সুখের উপায় করা হয়। (২) লেখক বলিতেছেন "এখন দেশ মধ্যে সভ্যতার বিস্তারে জীবন যাত্রার উচ্চতর আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। লোকের বিবাহিত জীবনের দায়িত্ব জ্ঞান জন্মিতেছে, নারীজাতির প্রতি সম্মান বর্দ্ধিত হইতেছে, নারীজাতিকে সুশিক্ষিত করা হইতেছে, সুতরাং এখনকার শিক্ষিত পুরুষ এরূপ ইচ্ছা করেন না যে তাঁহার স্ত্রী দাস দাসীর মত খাটিয়া কষ্ট পায়।" ইহা ত খুব ভালো কথা। একজন লোক শিক্ষা এবং জ্ঞানলাভ করিয়া জীবনযাত্রার একটা উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং স্ত্রীকে দাসীর মত না খাটাইয়া শিক্ষিত করিয়া তাহার উপযুক্ত জীবনসঙ্গিনী করিবার ইচ্ছা পোষণ করেন। ইহা তো হইবারই কথা এবং সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। তাঁহার বিবাহিত জীবনের দায়িত্ব জন্মিয়াছে। সুতরাং উপরোক্ত সাধু উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রকৃত মানুষের মত নিজের শক্তি দ্বারা অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় ব্রতী না হইয়া, ভাবী পত্নীর পিতার ঘাড় ভাঙ্গিয়া টাকা লইয়া সুখস্বচ্ছন্দের বন্দোবস্ত করিয়া লইব এ পাপ ইচ্ছা পোষণ করিলে তাঁহাকে অশিক্ষিত এবং কাপুরুষ বলিলে অবিচার করা হয় না। (৩) তোমার পিতা আমার দাবী মত টাকা দিতে পারিতেছেন না বলিয়া তোমাকে বিবাহ করিতে পারিব না, ইহা বলিলে নারীজাতির প্রতি "সম্মান" দেখান হয় না, বরং অপমান করা হয়। হে কল্যাণময়ি তুমি সংসারের লক্ষ্মী, গৃহের আনন্দ, আমরা উভয়ে উভয়ের জন্য সৃষ্ট হইয়াছি, এস তোমরা তোমার নারীত্ব এবং মাতৃত্ব লইয়া আমার এ ক্ষুদ্র গৃহখানির অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইয়া আনন্দ এবং শোভা উৎপাদন কর। আমার এ অসম্পূর্ণ জীবনের পূর্ণতার জন্য শুধু তোমাকেই চাই। এই বলিয়া গ্রহণ করিলেই নারীকে প্রকৃত সম্মান করা হয়। লেখক পুনরায় বলিতেছেন "ইউরোপ হইতে

---

(১) নীচ বা ধর্ম্মবিরুদ্ধ কেন ?" ভাঃ সঃ

(২) অপহরণ ইহাকে কেন বলা হইল ? ভাঃ সঃ

(৩) নিজের শক্তি দ্বারা অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা না করিয়া বিবাহ করিয়া শ্বশুরান্নে প্রতিপালিত হওয়া ভাল এ কথা ত প্রবন্ধ লেখক কোথাও বলেন নাই। বিবাহের সময় পণ গ্রহণে দোষ নাই এই কথাই তিনি বলিয়াছেন।

ভাঃ সঃ

শিক্ষা লাভ করিয়া যে সকল যুবক দেশে ফিরিয়া আসিতেছেন তাঁহারা বিবাহে অধিক পণ চাহিয়া থাকেন বলিয়া তাঁহাদের বড় নিন্দা শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাতে নিন্দার বিষয় কিছুই নাই। তাঁহারা নারী জাতিকে সমুচিত সম্মান করিতে শিখিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের শিক্ষিত জীবনের জন্য অধিক টাকার প্রয়োজন।" যাঁহারা ইউরোপের মত স্বাধীন দেশে বাস ও শিক্ষা লাভ করিয়া শ্বশুরের অর্থে নিজেকে পুষ্ট করিয়া "টাকার প্রয়োজনের" সমস্যার মীমাংসা করিয়াছেন এবং "নারীজাতিকে সমুচিত সম্মান করিতে শিখিয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে আর কি বলিব তাঁহারা কৃপার পাত্র। তবে আমার কথা এই যে ইউরোপে 'শিক্ষিত' খুব কম ব্যক্তিই এই ইতর ইচ্ছা পোষণ করেন। (৪) সেখানে কেহই পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে চাহে না, কি গরীব কি বড়লোক, সকলেই নিজের পরিশ্রমে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া স্ব স্ব উন্নতি বিধান করিতে সচেষ্ট। তথায় পরের অন্নদাস হইয়া জীবন যাপন করার অপেক্ষা ঘৃণ্য জিনিস আর কিছুই নাই। সংসার যাত্রা এবং অর্থোপার্জ্জনের প্রতিযোগিতা এত কঠোর এবং তীব্র বলিয়াই সেখানকার লোকেরা এত উন্নত ও কর্ম্মঠ। এই স্বাধীনতার দেশ হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া যদি যুবকেরা নিজের নিজের চেষ্টা এবং উদ্যমের দ্বারা অর্থাভাব মোচনের উপায় না করিয়া, কন্যার পিতার সিন্ধুকের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি করেন, তবে ধিক্ তাহাদের শিক্ষা—ঠিক্ তাহাদের আদর্শ! বিবাহিত জীবনের এই 'সুখ স্বচ্ছন্দতা'র দোহাই দিয়া যদি 'বরপন' সমর্থন করা যায়, তবে নীতি এবং মনুষ্যত্বের দিক ছাড়িয়া দিলেও সমাজ এবং জাতির যথেষ্ট ক্ষতি হইবে। আমাদের যুবকেরা সবাই দেখিবে যে নিজে কষ্ট করিয়া অর্থোপার্জ্জন করা অপেক্ষা বিবাহের সময় একটা প্রকাণ্ড পণ দাবী করিয়া অর্থ সংগ্রহ করা অনেক সহজ। তাহাদের স্বাধীন উপজীবিকা অর্জ্জনের চেষ্টার মূলে কুঠারাঘাত করা হইবে। (৫) লেখক আইনের তর্কও উপস্থিত করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে 'বরপণ' যদি বন্ধ করিতে হয় তবে কন্যা এবং পুত্রকে সমভাবে সম্পত্তি ভাগ করিয়া দেওয়া উচিত। সৌভাগ্যবশতঃ আমাদের শাস্ত্রকারেরা বিশেষ যত্নপূর্ব্বক সমস্ত অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এই ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। কন্যা এবং পুত্রের মধ্যে এ পার্থক্য কেন বুঝিতে বিশেষ কষ্ট হয় না। পিতার মৃত্যুর পর পুত্রকেই পিতৃস্থানীয় হইতে হয়, ক্রিয়া কর্ম্ম সব বজায় রাখিতে হয়, ভাই, ভাইপো, ভাইঝি, পিসি, মাসি, ইত্যাদি এমন কি দূর সম্পর্কীয় কেহ থাকিলেও তাহাদের ভরণ পোষণ করিতে হয়। অনূঢ়া ভগ্নী থাকিলে তাহাদের বিবাহ দিতে হয়। আর কন্যা করেন কি! বিবাহের অব্যবহিত পরেই তাঁহাকে তৈজসপত্র লইয়া স্বামী গৃহে যাইতে হয় এবং সেখানে স্বামীর যাহা কিছু আছে সমস্ত জিনিসেরই ভোগের অধিকারিণী হন। পিতার মৃত্যুর পর তাঁহাদের কোনো ভারই গ্রহণ করিতে হয় না। অবশ্য আমি এমন বলি না যে এই জন্যই পিতা কন্যাকে কুলোর বাতাস দিয়া বাহির করিয়া দিবেন। পুত্র এবং কন্যা তুল্য স্নেহের অধিকারী; সুতরাং পিতা তাঁহার সামর্থ্যানুসারে কন্যাকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক টাকা দিবেন বই কি—এবং কে না দিয়া থাকে?. ইহাকে বরপণ বলা যায় না—ইহা স্নেহের দান। যাকে ভালবাসি তাকে দিয়াই সুখ, সুতরাং যাহার যেরূপ সামর্থ্য তদনুরূপ অর্থ নিশ্চয়ই দিবেন। সে কি আর দাবী করিতে হয়! (৬) ইংলণ্ডে Primogeniture (জ্যেষ্ঠাধিকার)

(৪) যে কন্যার অর্থ নাই ইয়োরোপে তাহার বিবাহ হওয়াই দায়। ভাঃ সঃ

(৫) এ কথাটাও মূল্যহীন। যে বরের অর্থ আছে—বিদ্যা আছে—তাহাদেরই পণ দিতে হয়। স্বাধীন উপজীবিকা যাদের নাই কোন্ পিতা মাতা তাহাকে কন্যা দান করিতে প্রস্তুত? ভাঃ সঃ

(৬) দাবী করিতে হয় বই কি। সাধারণতঃ বিপরীতই দেখা যায়। কন্যা স্নেহের ধন যতই হউন, সাধারণতঃ লক্ষপতি পিতাও কন্যাকে ১০ হাজার টাকা বেশ সহজে মনের সুখে দেন কি? কন্যার বিবাহে বরঞ্চ তাঁহারা জাঁকজমকের জন্য ইহার অধিক অর্থব্যয় করিতে পারেন। কিন্তু কন্যাকে খুব বড় একটা যৌতুক দিতে তাঁহাদের ব্যথা লাগে। ভাঃ সঃ

আইন প্রচলিত সুতরাং কেবল জ্যেষ্ঠ পুত্রই পিতার বিপুল ধনের অধিকারী। অন্যান্য পুত্রেরা ধনী পিতার সন্তান হইয়া সুখের ক্রোড়ে পালিত হইয়াও কঠোর পরিশ্রম করিয়া স্ব স্ব অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে বাধ্য হয়। (৭)

লেখক বলিতেছেন যে "বরপক্ষ কখনই কন্যাপক্ষের নিকট বলপূর্ব্বক টাকা লইতে পারে না"। আমরা বলি বলপূর্ব্বকই লন। সত্যসত্যই যে হস্তের লগুড় দ্বারা শরীরে বল প্রয়োগ করেন তা নয়। কিন্তু তদপেক্ষাও নিকৃষ্ট উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। সত্য বটে যাঁহারা অন্যায় মনে করেন তাঁহাদের "পুরুষোচিত সাহস অবলম্বন করিয়া পণ দিবনা বলিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া উচিত। কিন্তু এ পোড়া দেশে সাহসের মর্য্যাদা ও সম্মান করে কে? প্রত্যেক বর-পক্ষই যদি ধনুক ভাঙ্গা পণ করিয়া বলেন যে টাকা না দিলে কিছুতেই বিবাহ দিব না, অথচ সমাজাচার যদি এইরূপ হয় যে একটা নির্দ্দিষ্ট বয়সের মধ্যে কন্যার বিবাহ দিতেই হইবে, তবে পিতার ঋণ করিয়া বা ভিটা বিক্রয় করিয়া সেই টাকা দিতে স্বীকৃত হওয়া ছাড়া উপায় কোথায়? (৮)

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ধনী পিতারা কন্যা জামাতাকে স্নেহপূর্ব্বক যাহা দেন, তাহাকে আমরা বরপণ বলি না। উহা দান। আমার সাধ্যানুসারে আমি আমার কন্যাকে অর্থ দান করিব, সে জন্য কাহারও দাবীর প্রয়োজন নাই। যার সঙ্গতি আছে সে তো স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই দিবে। স্নেহ এমনই জিনিস। বরপণের প্রথা প্রকৃতপক্ষে মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ও দরিদ্রদিগকে নিষ্ঠুর ভাবে পীড়ন করিতেছে। যাঁহার কন্যা জন্মিয়াছে তিনিই ঘোর বিপদে পড়িয়াছেন বলিয়া মনে করেন। এমন কি যাঁহার একটী মাত্র কন্যা আছে তিনিও বিবাহের চিন্তায় আকুল। কন্যাদের বিবাহের জন্য ভিটামাটি, স্ত্রীর গহনা বিক্রয় করিয়াও ঋণ গ্রস্ত হইতে হয় এবং পুত্র ও অন্যান্য পরিজনবর্গের লেখা পড়া ও ভরণ পোষণের কোনোই উপায় থাকে না। "বিবাহিত জীবনের সুখ স্বচ্ছন্দতার" জন্য এই নিরীহ ভদ্রলোকের এই প্রকার সর্ব্বনাশ সাধন করা কি মনুষ্যত্ব ও ধর্ম্মের পরিচয়! এখনও এই পতিত দেশে এমন লোক আছেন যাঁহারা কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যে পড়িয়াও শ্বশুরের অর্থ গ্রহণ করিতে অসম্মত। দরিদ্র মাত্রেই আত্মসম্মান জ্ঞান হারায় না। (৯)

পুত্রকন্যা স্নেহের জিনিস ও আদরের বস্তু। সংসারের দুঃখে মানুষ যখন অত্যন্ত ক্লিষ্ট হয় তখন উহাদের মুখের দিকে চাইয়াই সকল ক্লেশ ভুলিয়া যায়। কিন্তু হায় আজকাল কন্যা ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র একটা অমঙ্গল আসিয়া জুটিল বলিয়া পিতামাতারা বিচলিত হইয়া উঠেন। বিবাহের বয়স হইতে না হইতেই বালিকাগণও বুঝিতে পারে তাহাদের জন্যই সংসারে এত অশান্তি এত কষ্ট, সুতরাং তাহারা নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দেয়। পণের উপযুক্ত অর্থের সংস্থান করিতে না পারা হেতু পাত্র জোটা কঠিন হইয়া উঠে। মানুষের হৃদয় কঠিন হইয়া যায় এবং প্রবৃত্তি নীচ হয়। কন্যাগণের বিবাহ দিতেই সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয় এবং পুত্র এবং অন্যান্য পরিজনবর্গদের লেখা পড়া কিংবা ভরণ পোষণের উপায় তো দূরের কথা, তাহাদের উপর ঋণের বোঝা চাপাইয়া দিয়া যান। (১০) এ তো আমরা প্রত্যহই দেখিতেছি। এক্ষণে আমরা দেখিব যে লেখক বরপণের দ্বারা যে

---

(৭) ইংলণ্ডে অভিজাতবর্গের মধ্যেই এই নিয়ম আছে—সর্ব্বসাধারণের মধ্যে নাই? ভাঃ সঃ

(৮) উপায় মনের বল—সমাজাচার অগ্রাহ্য করা। এই সাহসে সমাজ নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইবেই। চিরকালই অবস্থা অনুসারে সমাজ বিধি পরিবর্ত্তিত হইতেছে। ভাঃ সঃ

(৯) কন্যার পিতা অসমর্থ হইলে জোর করিয়া অর্থ আদায় চেষ্টা—অবশ্যই হেয় কাজ; কিন্তু শ্বশুরকে পিতার মত মনে করিয়া ধনী শ্বশুরের অর্থ লইতে কেনই বা অসম্মান বোধ হইবে? ভাঃ সঃ

(১০) কেন তাঁহারাও পুত্রের বিবাহের সময় ত টাকা লন। সে সময় ত ছাড়িয়া কথা কন না। সুতরাং হরে দরে দাঁড়ায় একই। কেবলি কন্যা যাঁহাদের—পুত্র নাই,—তাঁহাদের যে বড় বিপদ ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

কয়টী উপকার সাধন হইতেছে বলিয়াছেন, তাহা কতদূর সত্য।

১। বরপণদ্বারা বিবাহিত জীবনযাত্রার কোনোই উন্নতি হইতেছে না। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। পণের টাকা লইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিব এবং "সুখস্বচ্ছন্দতার" বিধান করিব এই কুইচ্ছা সকলের মনে উদয় হইলে কেহই আত্মচেষ্টা দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করিতে উদ্যত হইবে না। লোক অলস, অকর্ম্মণ্য ও পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িবে। ইহা অপেক্ষা জাতীয় অমঙ্গল কিছুই হইতে পারে না। আর যদিই বা ইহা স্বীকার করা যায় যে পণের টাকা লইয়া কাহারও কাহারও সুখ স্বচ্ছন্দতার বৃদ্ধি হইবে। এই সুখ স্বচ্ছন্দতা অপর এক পরিবারের সর্ব্বনাশ সাধন না করিয়া হইতে পারে না ইহাতে লাভটা কি হইল। পুরুষ মাত্রেরই নিজের পরিশ্রম ও বুদ্ধি দ্বারা উন্নতি সাধন করা উচিত। (১১)

২। বিবাহের বয়স বাড়িয়াছে সত্য। কিন্তু একথা কখনই সম্পূর্ণ সত্য নয় যে শুধু পণের টাকা সংগ্রহ করিতে না পারায় এরূপ ঘটিয়াছে। অনেক জায়গায় টাকার জোগাড় করিতে না পারায় কন্যার বিবাহ দিতে দেরী হইতেছে বটে, আবার অনেক জায়গায় দেখিতে পাওয়া যায় বাল্যবিবাহ সমাজের অনিষ্ট সাধন করিতেছে এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া পিতা ইচ্ছা পূর্ব্বক বেশী বয়সে কন্যার বিবাহ দিতেছেন। বলাবাহুল্য দেশে শিক্ষা এবং জ্ঞানবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শেষোক্ত প্রকারের ব্যক্তির সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহাই সমাজের প্রকৃত মঙ্গল। কোনো অস্বাভাবিক বা কৃত্রিম উপায়ে যদি একটা সুফল পাওয়া যায় উহা স্থায়ী বা সম্পূর্ণরূপে মঙ্গলজনক হয় না। আজকাল এমন তো অনেক দেখা যায় যে পিতার যথেষ্ট সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও বেশী বয়সে কন্যার বিবাহ দিতেছেন। আমরা শিক্ষার ফল স্বরূপ যাহা পাই তাহা জোর করিয়া উৎপাদন করিবার জন্য কি একটা গর্হিত পথ অবলম্বন করিব।

৩। বরপণের জন্য জাতির মধ্যে যে শ্রেণী বিভাগ আছে উহার বলবত্তা কমিয়া যাইতেছে—এতো কখনই মনে হয় না। লেখক কি বলিতে চান যে বরপণের জন্য রাঢ়ী, বারেন্দ্র প্রভৃতি শ্রেণী বিভাগের মধ্যে বিবাহ সংঘটিত হইতেছে। ইহা সত্য নয়। যে দুএকটি হইয়াছে তাহাও বরপণের জন্য নয়।

৪। বরপণের জন্য জাতি ভেদ উঠিয়া যাইবে—এই সিদ্ধান্তে লেখক কেমন করিয়া আসিলেন আমি বুঝিতে একেবারেই অসমর্থ। কারণ ইহার কোনো ভিত্তিভূমি নাই। যদি কখনো ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য কিংবা বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, মাঠারী ইত্যাদি জাতির মধ্যে বিবাহ প্রচলিত হয়, তবে বরপণের জন্য হইবে না। যাঁহারা এ রকম বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন তাঁহারা শুদ্ধ সমগ্রজাতি শক্তিশালী এবং এক হইবে এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া এরূপ করিবেন। বরপণের জন্য নয়। বিলাতে তো অভিজাতশ্রেণীর মধ্যে বরপণ লওয়া বিলক্ষণ প্রচলিত আছে এবং ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতেছে—কিন্তু সেখানে কি 'জাতিভেদ' উঠিয়া যাইতেছে। অনেকে বলিবেন যে সেখানে জাতিভেদই নাই। সেখানে class আছে এবং উহা আমাদের caste অপেক্ষা বেশী অনিষ্ট উৎপাদন করিতেছে। "Class, they call it in England and not caste (Vivekanda)." ইংলণ্ডে অভিজাত শ্রেণীর এবং জনসাধারণের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব চলিতেছে সবাই জানেন। এবং Socialismএর idea কত দ্রুত বিস্তার করিতেছে। ইংলণ্ডের মত

কিন্তু তাহারও শুভ ফল আছে—মেয়েদের বিবাহ যতই কঠিন হইবে ততই বিবাহের বয়স বাড়িবে, স্ত্রী শিক্ষার আদর হইবে—পূর্ব্বপ্রবন্ধলেখক একথা বলিয়াছেন। ভাঃ সঃ

(১১) বিবাহ যৌতুকের উপর নির্ভর করিয়া কেহ কি স্বাধীন উপার্জ্জনের চেষ্টা ত্যাগ করিয়াছেন? এরূপ করা যে ভাল এ কথা ত প্রবন্ধলেখক কোথাও বলেন নাই? এরূপ যিনি করেন তিনি নিতান্তই কৃপাপাত্র অতি হীন। এরূপ পাত্রকে কেহ কন্যা দান করিবেন বলিয়া ত মনে হয় না। ভাঃ সঃ

একটা class সৃষ্টি করা অপেক্ষা আমাদের জাতিভেদ অনেক ভাল। (১২)

৬। কৌলিন্যপ্রথা এক আনাও উঠিয়া যায় নাই। বরং বরপণের জন্য কুলীনদের অত্যাচার আরও বৃদ্ধি হইয়াছে। কুলীন মাত্রেই তো টাকা দাবী করে, কিন্তু কুলীন যদি আবার পাশ করা হয় তো কথাই নাই। আজকাল শিক্ষিত ব্যক্তিরা কৌলিন্য প্রথাকে সমর্থন করেন না এবং উহাকে বর্ব্বরতা আখ্যা দিয়া থাকেন, কিন্তু কাজের বেলায় উপেক্ষা করিবার সাহস জোটেনা। যেমন বিধবাবিবাহের অনেকেই পক্ষপাতী কিন্তু হাজারের মধ্যে একজনেরও নিজের বিধবা কন্যার বিবাহ দিবার সাহস নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ-শিক্ষিত ব্যক্তিরাও কন্যার বিবাহ দিবার সময় সংস্কার এবং প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে শুধু কুলীন বলিয়া বরপণ দিতেছেন, এমন রোজই দেখা যায়। কৌলিন্যপ্রথা তুলিয়া দেওয়া দূরে থাক বরপণ উহার ভিত্তি আরও দৃঢ় করিতেছে। যেদিন দেখিব বরপণ নাই, সেদিন বুঝিব কৌলিন্যপ্রথা গিয়াছে, সব মানুষই সমান। "বর ভোজনে," "বৌভাত" ইত্যাদি অনুষ্ঠানে এখনও কুলীনরা টাকা লইয়া আহার করিয়া "কুলমর্য্যাদা" রক্ষা করেন। কুলীনরা টাকা দিয়া অকুলীনে কন্যা দিতেছেন ইহা তো দেখা যায় না। খুব যদি হয়, তবে ২।১ স্থলে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে কন্যাপক্ষের অবস্থা নিতান্ত দীন বলিয়া কুলিন-বরপক্ষ পণ গ্রহণ করেন না।

৭। শ্রাদ্ধে, দোল দুর্গোৎসব ইত্যাদিতে ব্যয় সঙ্কোচ করিয়া যদি কিছু অপব্যয় কমান যায়, তবে উহা বরের পিতাকে দিতে হইবে কোন শাস্ত্রে লেখা আছে। টাকা খরচ করিবার কি আর কোনো সৎকার্য্য নাই? আসল কথাটা এই যে বিবাহ, শ্রাদ্ধ, দোল ইত্যাদিতে খরচ কিছুই কমে নাই। জিনিস পত্রাদি দুর্ম্মূল্য হওয়ায় এই সব অনুষ্ঠানে খরচ বরঞ্চ বাড়িয়াছে। অধিকন্তু ইহার উপর 'বরপণ' আসিয়া জুটিয়াছে। ফল হইতেছে এই যে লোককে আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় করিতে হইতেছে। শ্রাদ্ধ, দোল, দুর্গোৎসবাদির অনুষ্ঠানব্যয়ের প্রধান অঙ্গ হইতেছে লোকজন এবং দীনদুঃখীদের খাওয়ানো। বরের 'সুখস্বচ্ছন্দতার' জন্য, এই লোকহিতকর কার্য্য তুলিয়া দেওয়া হউক ইহা সমাজহিতৈষী কেহই বলিবেন না। আর একটা কথা এই যে, লেখক মহাশয় বলিয়াছেন যে বরপণের জন্য অপব্যয় কমিয়া যাইতেছে! বরপণের জন্যই তো বিবাহের এত খরচা; অপব্যয় কমাইতে হইলে আগে বরপণ তুলিয়া দিতে হইবে। (১৩)

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে যাঁহারা লেখা পড়া শিখিয়া সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে জীবন যাত্রার উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, দেশের কল্যাণের জন্য সমাজের হিতের জন্য তাঁহাদের সকলেরই এই প্রতিজ্ঞা করা উচিত যে আমরা পাশ্চাত্য জাতির ন্যায় প্রত্যেকে সরল ভাবে জীবনযাত্রার উপযোগী যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয়ের উপায় না করিয়া বিবাহের দায়িত্ব গ্রহণ করিব না। (১৪)

শ্রীসুবোধচন্দ্র সরকার।

---

(১২) ভাল নহে। ইচ্ছা করিলে ইংলণ্ডে কেহ ছোট ক্লাশের কাহাকেও বিবাহ করিতে পারেন—করিলে তিনি সমাজচ্যুত হইবেন না। আমাদের দেশের বর্ণবিভাগ নিয়মে এই স্বাধীনতা টুকু একেবারেই নাই; ভিন্নবর্ণে বিবাহ করিলে তোমার জাতি যাইবেই। ভাঃ সঃ

(১৩) পূর্ব্বপ্রবন্ধলেখকের মতে কন্যাদানের সহিত প্রত্যেক পিতার কন্যার যৌতুক স্বরূপ যথাসাধ্য বরপণ প্রদান করা কর্ত্তব্য—ইহা অপব্যয় নহে। ভোজবাদ্যাদি সমারোহে অর্থব্যয় করাকেই তিনি অপব্যয় বলিয়াছেন। কথাটা অসঙ্গত নহে। ভাঃ সঃ

(১৪) ইহাই সার কথা, সকল যুক্তির শ্রেষ্ঠ যুক্তি। এই কথানুরূপ কার্য্য করিলে দেশের মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী।

ভারত স্ত্রীমহামণ্ডল

দুই বৎসর পূর্ণ হইল ভারত স্ত্রীমহামণ্ডলের কলিকাতার শাখা স্থাপিত হইয়াছে। এই দুই বৎসরের অভিজ্ঞতায় স্ত্রীমহামণ্ডলের সদস্যাগণের অনেক শিক্ষা হইয়াছে। দেশের অন্তঃপুরবাসিনীদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া একান্ত আবশ্যক বোধে সেই ভার গ্রহণ করা এখন আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য স্বরূপ হইয়াছে। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা পূর্ব্বকার নারীদের অনেকগুলি স্বাভাবিক গুণ হারাইয়াছেন, অথচ আজকালকার পাশ্চাত্য শিক্ষারও সারটুকু ধরিতে পারেন নাই। তাঁহাদের আচার ব্যবহারের ভিতর অনেক কৃত্রিমতা প্রবেশ করিয়াছে। যে শিক্ষা সহজ স্বাভাবিক জ্ঞানের উপর স্থাপিত হইলে একটী অতি সুন্দর স্ত্রীপ্রকৃতি গঠিত হইতে পারে, বাহ্যিক অসারতার উপর তাহার মূল প্রোথিত হওয়ায় তাহা আমাদের দেশীয় নারীচরিত্রের বিকৃতি উৎপাদন করে। কাজেই অশিক্ষাঅজ্ঞতাবশতঃ সাংসারিক বিশৃঙ্খলতা প্রভৃতি দোষ আসিয়া প্রমাদ ঘটায়। আমাদের দেশের পুরুষদের মধ্যে শিক্ষা যেরূপ দ্রুত চলিয়াছে মেয়েদের ভিতরে সেরূপ না হওয়ায় উভয়ে একত্র সংসার পথে চলিবার সময় পরস্পরের সঙ্গে সেরূপ সামঞ্জস্য বা মিল হয় না। আমাদের অনেকগুলি শিক্ষিত যুবকের মুখে শুনিয়াছি যে তাঁহারা নিজ নিজ স্ত্রীকে কেবল সন্তানের 'নর্শ' (nurse) স্বরূপ ভাবিয়া থাকেন—তাঁহাদের সঙ্গে না কোন একটা সাধারণ বিষয়ের কথা না একটা জ্ঞানের কথা বলিয়া সুখ পান। এটা কি আমাদের ভাবিবার ও মাথা হেঁট হইবার বিষয় নহে? বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে যুবকদের মনে অনেক নূতন ভাব আসিয়াছে, নিজ নিজ পত্নীকে পুরাকালের ন্যায় যথার্থ সহধর্ম্মিণী করিবার আকাঙ্ক্ষা হইতেছে, কিন্তু প্রকৃতরূপে শিক্ষিত স্ত্রী না পাইলে সে বাসনা পূর্ণ হইবার আশা কোথায়?

ভারতস্ত্রীমহামণ্ডলের স্থাপয়িত্রী ও নেত্রীগণ বহুদিন ধরিয়া এই বর্ত্তমান সমস্যার কিরূপে মীমাংসা হইতে পারে—এই চিন্তা করিয়া এই সমিতি স্থাপন করিয়াছেন। ইঁহারা বাড়ী বাড়ী শিক্ষয়িত্রী পাঠাইয়া বিবাহিতা কন্যাদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবার এই সুযোগ পাইয়া কন্যা ও বধূদিগকে লেখাপড়া শিখাইতেছেন। কলিকাতার সর্ব্বত্রই এই স্ত্রীমহামণ্ডলের শিক্ষয়িত্রীগণ পড়াইতেছেন। বৎসর বৎসর এই সমিতির কার্য্যক্ষেত্রের কিরূপ প্রসার হইতেছে তাহা নিম্নলিখিত বার্ষিক রিপোর্ট পড়িলে পাঠকপাঠিকাগণ সহজে বুঝিতে পারিবেন।

বিগত ১২ই জানুয়ারী এই সমিতির কলিকাতার শাখার দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী সভানেত্রীর আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। কলিকাতার অনেক উচ্চপদস্থ হিন্দু ও ব্রাহ্ম মহিলা এবং প্রায় ৩০০ শত সদস্যা সভায় উপস্থিত ছিলেন। সর্ব্বপ্রথমে স্থানীয় সেক্রেটারী কর্ত্তৃক ১৯১২ সালের সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট পঠিত হয়—উহার মর্ম্ম এই;—যদিও সমিতির এখন অঙ্কুর অবস্থামাত্র তথাপি সমিতি গত বৎসর সুচারুরূপে অন্তঃপুর শিক্ষার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিয়াছেন। প্রথম বৎসর সমিতির ২১৯৪৲ টাকা আয় ছিল, কিন্তু গত বৎসর ৬৫০১৲ টাকা আয় হইয়াছিল। প্রথম বৎসর সমিতির ২৮৪২৲ টাকা ব্যয় হইয়াছিল, দ্বিতীয় বার্ষিক ব্যয়—৭৩৭৯৲ টাকা। সমিতির আট শতাধিক টাকা ঋণ হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রথম অপেক্ষা দ্বিতীয় বৎসরের আয় প্রায় তিন গুণ হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে স্ত্রীমহামণ্ডল স্বীয় কার্য্যকলাপে সকলের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। সমিতির সভ্য সংখ্যাও দিন দিন বাড়িতেছে। এখন প্রায় ৬০০ জন মহিলা ইহার সদস্যা। গত বৎসরের মধ্যে ১২৫ জন বয়স্কা ছাত্রীকে ২২ জন শিক্ষয়িত্রী দ্বারা অন্তঃপুরে শিক্ষাদান করা হইয়াছে। বৎসরান্তে যাহাতে নিয়মিতরূপে ছাত্রীগণকে পরীক্ষা করা হয় তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যাঁহারা সমিতির সদুদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যে কোন প্রকারে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জানাইয়া সেক্রেটারী রিপোর্ট সমাপ্ত করিলেন।

শিক্ষা বিস্তারের নিমিত্ত অন্তঃপুরশিক্ষার ন্যায় প্রাথমিক শিক্ষাও যে অতি প্রয়োজনীয় তাহা সমিতির সদস্যাগণের উপলব্ধি হওয়াতে ছোট ছোট বালিকাদের জন্য স্ত্রীমহামণ্ডলবালিকাবিদ্যালয় নামে একটি স্কুল বহুবাজারে খোলা হইয়াছে। সমিতির একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা তাঁহার পূজার দালানে স্থান ও বেঞ্চ চেয়ার প্রভৃতি দিয়া স্কুল স্থাপনের সহায়তা করিয়াছেন। অন্যান্য কয়েকজন সভ্য টেবিল, ঘড়ী, বোর্ড মানচিত্র বাক্স প্রভৃতি স্কুলের আবশ্যকীয় দ্রব্যগুলি দিয়াছেন। এক বৎসরে ৬০ জন ছাত্রী স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছে। তাহাদের বয়স ৪ হইতে ১০ পর্য্যন্ত। সকল ছাত্রীকে উৎসাহ দিবার জন্য এ বৎসর প্রত্যেককেই প্রাইজ দেওয়া হইয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ২টি বালিকাকে রৌপ্য পদক দেওয়া হইয়াছিল। এস্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে প্রাইজের সমস্ত খরচ সমিতির কয়েকজন মেম্বর বহন করিয়াছেন।

শ্রীমতী সরলা দেবী এই অধিবেশনে একটি সুন্দর বক্তৃতা দেন। তিনি বলিলেন এ দেশীয় স্ত্রীজাতির মধ্যে যে একটা কাজের ইচ্ছা ও উৎসাহ জন্মিয়াছে তাহার সুফল এই ভারতস্ত্রীমহামণ্ডলের কার্য্যবিস্তারের দ্বারা স্পষ্ট উপলব্ধ হইতেছে। পরে সভানেত্রী মহাশয়া বালিকাদিগকে পারিতোষিক বিতরণ করিলেন ও সকলকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন—আমাদের দেশের স্ত্রীজাতির শিক্ষার ভার এতদিন মিশনরি ও পুরুষগণের উপরেই ন্যস্ত ছিল, কিন্তু এখন ভগিনীদের শিক্ষার ভার যখন ভগিনীগণ নিজেরাই গ্রহণ করিয়াছেন তখন ইহা দ্বারা নারীজাতির শিক্ষার পথ যে অনতিবিলম্বে অবাধ ও সহজ হইয়া আসিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।"

ভারত-স্ত্রীমহামণ্ডলের সম্পাদিকা।

ভরতের মৃগশিশু

ছাড়ি গৃহ পরিজন ভোগসুখ সিংহাসন,
মৃগশিশু তোর লাগি শেষে
বহু শত বৎসরের সব তপ, যাগ জপ,
হায় হায় যায় বুঝি ভেসে!
কুশ যব ফল ফুল সবি তুই নিস্ খেয়ে,
কোশাকুশী হতে গঙ্গাজল;
সমিধ্ সাজীন হলে, তার পরে শুয়ে রবি
কোথা আমি জ্বালিব অনল?
দেবের উদ্দেশে কিছু দিতে গেলে মন্ত্র পড়ি,
হাত হ'তে তুই ল'বি কাড়ি।
ধ্যানেতে বসিলে তুই লেহন করিবি দেহ
স্পন্দহীন নাহি হতে পারি।
আয়ত নয়নে চেয়ে ভুলাইবি বেদপাঠ,
দাঁতে ধরে টানিবি বাকল,
উগ্র তাপসের তপ নষ্ট করি, ওরে মৃগ
শেষে কিরে করিবি পাগল?
সব ছাড়ি বনে আসি, রে অবোধ মৃগশিশু
তোর লাগি হলো অধোগতি।
প্রকৃতির প্রতিহিংসা! নিদারুণ! নিদারুণ!!
ভগবান্! দাও স্থির মতি।

* * *

থাক তুই, মৃগশিশু, বুকে আয়, শুষ্ক হোক্
চতুর্ব্বর্গ ফলের পাদপ,
জীবন্ত সবার চেয়ে স্নেহ প্রেম শিশুগুলি
হত্যা করি করিব কি তপ?
প্রেম সে যে রক্তসম, সঞ্চালিত মানবের
মানসের ধমনী শিরায়,
পরাণের হৃৎপিণ্ড সে রস, সে রক্তবিনা
শুষ্ক হবে, স্পন্দিবে না হায়!
চিরদিন পক্ষভরে, ঘুরিলে গগন পরে,
প্রেমপাখী বাঁচিবে কোথায়?
সব ঠাঁই হ'তে সেগো বিতাড়িত হলে শেষে
মৃগ হৃদে লভিবে কুলায়।

শ্রীকালিদাস রায়।

গিলগিটদিগের আমোদপ্রমোদ

দেওবাণী পর্ব্বতে মুক্তাগাছ

বাগরট-উপত্যকায় তাসটূ গ্রামের পূর্ব্বাংশে একটী তুষারাবৃত পর্ব্বত আছে, তাহাকে "দেববাণী" পাহাড় বলে। গিলগিটের লোকেরা বলে যে এই পাহাড়ের উপর একটী মুক্তাগাছ আছে—সেই মুক্তাগাছের মালিক সেই মুক্তাগাছ হইতে প্রচুর পরিমাণে মুক্তা সংগ্রহ করিয়া নামিয়া আসিতেছিল। হঠাৎ সে দেখিল যে বহুসংখ্যক দানব দৈত্য চীৎকার করিতে করিতে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া আসিতেছে, তখন সে প্রাণ ভয়ে মুক্তাগুলি পশ্চাতে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল, কিন্তু তবুও একটী 'পরী' তাহার সঙ্গ ছাড়িল না। পরীটী নাকি তাহার বাড়ী পর্য্যন্ত আসিয়াছিল এবং ঘরে প্রবেশ করিয়া সে দরজা বন্ধ করিয়া দিলে পরী ঘরের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে বেশ পরিবর্ত্তনের সময় লোকটী দেখিতে পাইল যে তাহার জুতার মধ্যে একটী মুক্তা ভুলক্রমে রহিয়া গিয়াছে। তখন সে তাড়াতাড়ি মুক্তাটী পরীর দিকে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল; পরী তৎক্ষণাৎ মুক্তাটী লইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

আ-তরের পশ্চিমাংশে আর একটী পাহাড় আছে, তাহাকে 'নান্‌গা' পর্ব্বত বলে, এই পর্ব্বতটী সম্বন্ধেও এই প্রকার একটি গল্প প্রচলিত আছে।

"নঙ্গ" ও "চারকতবারি"

আসতর জেলার "লাওস্‌" গ্রামে একটি ক্ষুদ্র ঝরণা আছে। সেই ঝরণাটীর নাম "নঙ্গ।" স্থানীয় অধিবাসীগণ এই ঝরণাটীকে অতিশয় পবিত্র জ্ঞান করে এবং তাহাদের অভাব জ্ঞাপন করিয়া সেই স্থানে নানাপ্রকার পূজা অর্চ্চনাদির ব্যবস্থা করে। অনাবৃষ্টিতে শস্যাদি নষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকিলে কিম্বা কখনও প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টির আবশ্যক হইলে তাহারা সেই ঝরণার জলে কোন অপবিত্র বস্তু, (যেমন কুকুরের হাড় কিম্বা এই প্রকার অন্য কোন অপবিত্র বস্তু) নিক্ষেপ করে। এরূপ করিলে নাকি যত দিন পর্য্যন্ত সেই-অপবিত্র বস্তু পুনরায় তুলিয়া ফেলা না হয় তত দিন পর্য্যন্ত বৃষ্টি হইতে থাকে!! এই পবিত্র "ঝরণা" কুপিত হইলে নানপ্রকার অনিষ্ট করিতে পারে বলিয়া স্থানীয় অধিবাসীগণের মধ্যে কেহই হাড় নিক্ষেপ করিতে চাহেনা, কাজেই বাধ্য হইয়া হাড় নিক্ষেপ করাইবার জন্য ভিন্ন স্থান হইতে লোক সংগ্রহ করিয়া আনিতে হয়। অবশ্য সেই ব্যক্তি এই গুরুতর কার্য্য করিবার জন্য বিশেষ রূপে পুরস্কৃত হইয়া থাকে। প্রত্যেক গৃহস্থের নিকট হইতে দুই সের পরিমাণ শস্য লইয়া তবে সেই ব্যক্তি জলে হাড় নিক্ষেপ করে এবং বৃষ্টির প্রয়োজন শেষ হইলে আবার হাড় তুলিয়া দেয়। 'বাগরট' উপত্যকায় এবং আস্‌তর জেলার 'তারসিং' গ্রামে "চাক্রোট'বারি" ও "কোমাচন" নামে এই প্রকার আরও দুইটী ঝরণা আছে।

"চীনার বৃক্ষ"

"শঙ্কর" একখানি বহুলোক পূর্ণ ক্ষুদ্র গ্রাম, ইহা বাগরট উপত্যকার অন্তর্গত। কথিত

আছে যে যখন এই স্থানটী পতিত অবস্থায় ছিল তখন দৈবক্রমে একদিন "শা-বুরিয়া" নামক একজন ফকীর পর্য্যটন করিতে করিতে এই স্থানে কিছুকালের নিমিত্ত বিশ্রাম করেন এবং তৃষার্ত্ত হইয়া ভগবানের নিকট পানীয় জল প্রার্থনা করেন। সেই স্থানে বিন্দুমাত্রও জল পাইবার উপায় ছিল না, কিন্তু ফকীরের করুণ প্রার্থনা বিশ্বপতির চরণপ্রান্তে পৌছিল। দেখিতে দেখিতে নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতগাত্র ভেদ করিয়া জলধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল, ফকীর সেই জল পান করিয়া তৃষ্ণা দূর করিলেন।

কিছুদিন পরে ফকীর রৌদ্রতাপ সহ করিতে না পারিয়া হস্তস্থিত লাঠিগাছটি মাটিতে পুঁতিয়া লাঠিটীকে একটী শাখাপল্লব যুক্ত চীনার বৃক্ষ করিয়া দিতে ভগবানের চরণে নিবেদন করিল। লাঠিখানি চীনার বৃক্ষের শাখায় প্রস্তুত হইয়াছিল। দেখিতে দেখিতে লাঠিখানা একটী প্রকাণ্ড চীনার বৃক্ষে পরিণত হইল এবং ফকীর সেই চীনার বৃক্ষতলে বসিয়া সাধনা করিতে লাগিল। কথিত আছে যে এই চীনার বৃক্ষের শাখা প্রশাখা ৬০০ শত গজ দূরবর্ত্তী "বাগরট" নালা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া ছিল। কালক্রমে নাকি সেই প্রকাণ্ড বৃক্ষটীকে "মঙ্গল"গণ পুড়াইয়া দেয়—কিন্তু আজ পর্য্যন্তও ৫টী ছোট ছোট বৃক্ষ সেই গুড়ি হইতে নির্গত হইয়া প্রাচীন চীনার বৃক্ষের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, এই গাছ গুলি প্রায় ৩০ গজ স্থান অধিকার করিয়াছে।

শ্রীকুন উৎসব

শ্রীকুন দেবী "নাগী সূচিয়া" দেবীর ভগিনী। আসতর জেলায় গোদাই নামক স্থানের নিকট "শাঙ্কক্" গ্রামে এই দেবীর আদিম বাসস্থান, অধিবাসীগণ অভাব জ্ঞাপন করিয়া দেবীর বেদীর সম্মুখে ছাগাদি উৎসর্গ করে। এই দেবীর ভক্তগণ কখনও গরু রাখে না কিম্বা তাহার দুগ্ধাদি খায় না। তাহাদের বিশ্বাস যে এরূপ করিলে তাহাদের গৃহপালিত অপরাপর পশুগুলি হারাইয়া যাইবে এবং শস্যাদির সমূহ ক্ষতি হইবে।

সাঙ্গালী ইন

গিলগিটের ৩ মাইল পূর্ব্বাংশে বাগরট উপত্যকায় যাইবার রাস্তায় ৩ ফুট উচ্চ দেওয়ালে ঘেরা অতিক্ষুদ্র একটি স্থান আছে; এই স্থানটীকে "সাঙ্গালী ইন" বা "শিকল রাখা" বলে। কথিত আছে যে, সেই প্রাচীর বেষ্টিত স্থানে নাকি এক গাছি সোনার শিকল বাতাসে ঝুলিয়া থাকিত, পূর্ব্বকালে কোন বিষয়ে ধর্ম্মের দোহাই দিয়া মীমাংসা করিতে হইলে উভয় পক্ষ সেই স্থানে আসিয়া প্রত্যেকেই শিকলটীকে সম্বোধন করিয়া বলিত—'হে সোনার শিকল! হে পবিত্র শিকল! আমাদের মধ্যে যে পাপিষ্ঠ তাহার গলায় তুমি তোমায় পবিত্র শৃঙ্খল দৃঢ়াবদ্ধ কর।" উভয়ের প্রার্থনা শুনিয়া শিকলগাছা আপনা হইতেই দোষী ব্যক্তির গলায় জড়াইয়া যাইত; তৎপর আইনানুসারে সকলে তাহার দণ্ডবিধান করিত। এখন আর সেই স্থানে কোন প্রকার শিকল দেখিতে পাওয়া যায় না। এ সম্বন্ধে স্থানীয় অধিবাসীগণ একটী অতি অদ্ভুত গল্পের সৃজন করিয়াছে। তাহারা বলে যে,—বাগরট উপত্যকার দুইজন লোক একদা গিলগিটে

আসিতেছিল; তাহাদের মধ্যে একজনের নিকট অল্প পরিমাণ সোনা ছিল, রাস্তায় অপর ব্যক্তি সুযোগক্রমে সেই সোনা চুরি করিয়া হস্তস্থিত লাঠির একটী ছিদ্র মধ্যে লুকাইয়া রাখে। তখন দুই জনে অনেকক্ষণ তর্ক বিতর্কের পর এই স্থির করে যে "সাঙ্গালী ইন্" দেবতার নিকট ইহার বিচার হইবে। দেব-স্থানে আসিবার পথে দোষী ব্যক্তি তাহার লাঠিখানি (যাহাতে সোনা লুকান ছিল) তাহার সঙ্গীর হস্তে প্রদান করিয়া কিছুকালের নিমিত্ত রাখিতে বলে। এইরূপে উভয়ে দেবতার নিকট উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা করে যে—"হে পবিত্র শিকল! আমাদের মধ্যে যাহার নিকট সোনা আছে তাহার গলদেশে তুমি দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হইয়া যাও।"

"সাঙ্গালী" পূর্ব্বেই তাহাদের মনের ভাব জানিতে পারিয়া ছিলেন, সুতরাং এই প্রবঞ্চক-দের বিচার না করিয়া অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ চির দিনের জন্য অদৃশ্য হইয়া গেলেন, যাহার সোনা হারাইয়াছিল, সে এই ব্যাপারে ক্রোধান্ধ হইয়া নিকটস্থ প্রাচীরে লাঠির দ্বারা প্রচণ্ড আঘাত করিবা মাত্র লাঠি ভাঙ্গিয়া সোনা বাহির হইয়া পড়িল।

অশ্বপদ রেখা

আস্তর জেলার—'এড়্গা' 'বালাস্' এবং কিনাগ্রামে যাইবার রাস্তার পার্শ্বে একটী পাহাড়ের উপর কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিশান দৃষ্ট হয়, কথিত আছে যে সেই স্থানে নাকি পাহাড়ের উপর অশ্বপদ চিহ্ন দেখা যায়; এ সম্বন্ধে প্রচলিত গল্পটী এই—

এক সময়ে এই স্থানে একটী রাক্ষস আসিয়া অধিবাসীগণের উপর অত্যন্ত উৎপীড়ন আরম্ভ করে। সকলেই ভয়ে অস্থির—কিন্তু কোন উপায় নাই। এই সময় ভগবানের অনুগ্রহে একদিন একজন মহাগুণবান্ দরবেশ আসিয়া উপস্থিত হন,—কেহ কেহ বলে যে সেই দরবেশ আর কেহ নহেন হজরত খেজার। তিনি কিনাগ্রামে নদীতীরে বিশ্রাম করেন। ফকীর একদিন দেখেন যে একটা রাক্ষস নদীর স্রোতের উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইতেছে, তখন তিনি এক লাফে ঘোড়ার চড়িয়া বিদ্যুদ্বেগে সেই রাক্ষসের উপর আসিয়া পড়িলেন, রাক্ষসও চীৎকার করিয়া দৌড়িতে লাগিল এবং ক্রমে অদৃশ্য হইয়া গেল। দরবেশ এরূপ বেগে ঘোড়া চালাইয়াছিলেন যে পাহাড় তাঁহার ভার সহ্য করিতে না পারিয়া এক স্থানে বসিয়া যায় এবং সেই স্থান হইতে অতি সুমিষ্ট জল ঝরণার আকারে বাহির হইতে থাকে। যদিও এখন সেই ঝরণার কোন প্রকার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না, তথাপি অধিবাসীগণ অতি ভক্তিভরে প্রতি বৎসর তথায় সমবেত হয়। বহুদূর হইতেও যাত্রীগণ আসিয়া উৎসবে যোগ দান করে এবং ভেড়া ছাগল প্রভৃতি উৎসর্গ করিয়া ভোজনান্তে নানাপ্রকার আমোদ আহ্লাদে মত্ত হয়।

গিলগিট রাজমালিকের পদচিহ্ন

কথিত আছে যে গিলগিটের "রা" অর্থাৎ প্রধান বংশের মালিকপ্রধানের ১ খানা পা গাধার খুরের মত ছিল। তিনি লজ্জায় সেই পাখানা কাহাকেও দেখাইতেন না বা একথা

কাহাকেও বলিতেন না। মালিকপ্রধানের একজন পুরাতন ভৃত্য কেবল এই বিষয়টী জ্ঞাত ছিল। কিন্তু প্রধানের এই গুপ্ত কথা ব্যক্ত না করার দরুণ এই ভৃত্যের একটী অদ্ভুত পীড়া জন্মিল, তাহার পেট দিনে দিনে ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। কি প্রকারে এই পীড়ার হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিবে এই চিন্তায় সে কাতর হইয়া অবশেষে একটী উপায় স্থির করিল এবং একটী পাহাড়ের উপর নির্জ্জন স্থান অনুসন্ধান করিয়া একটী ক্ষুদ্র গর্ত্তে তাহার মাথা রাখিয়া প্রাণপণে চীৎকার করিয়া—"মালিক প্রধানের একটী পা গাধার খুরের মত"—এইরূপ বলিতে লাগিল। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত না হইল—ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই প্রকার চীৎকার করিতে লাগিল, পরে রোগমুক্ত হইলে গিলগিটে ফিরিয়া আসিল। যে স্থানে বসিয়া সে এরূপ চীৎকার করিয়াছিল—কথিত আছে যে সেই স্থানে কিছু দিন পরে দুইটী চিলি গাছ জন্মিয়াছিল। ঘটনাক্রমে এক সময়—একজন রাখাল সেই স্থানে গিয়া এই বৃক্ষের ডালে একটী বাঁশী প্রস্তুত করে। বাড়ী ফিরিয়া বাঁশীটী বাজাইলে পর সকলেই অবাক হইয়া গেল। মালিক-প্রধানের ভৃত্য পাহাড়ের উপর যে সকল কথা উচ্চারণ করিয়াছিল বাঁশীতে কেবল তাহাই বাজিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে এই কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল এবং বহু দূর দূরান্তর হইতে নানা শ্রেণীর লোক এই অপূর্ব্ব বাঁশী দেখিতে ও স্বর শুনিতে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। মালিকপ্রধান যখন এই সংবাদ শুনিলেন তখন লজ্জায় ও দুঃখে উন্মত্তের মত হইলেন এবং ভৃত্যকে ডাকিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ভৃত্য ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিল না। তারপর ভৃত্য যখন জানিতে পারিল যে সেই পাহাড়ের উপরি-স্থিত চিলিবৃক্ষের শাখা দ্বারা রাখাল বাঁশী প্রস্তুত করিয়াছে তখন সে একে একে সমস্ত ঘটনা মালিকপ্রধানের নিকট ব্যক্ত করিয়া স্বীয় প্রাণ ভিক্ষা চাহিল। মালিক-প্রধান এই ঘটনা শুনিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং ভৃত্যের প্রাণদান করিলেন।

নরখাদক শ্রীবাদত

কোন সময়ে শ্রীবাদত নামে গিলগিটে একজন প্রধান ছিলেন। প্রতি দিন প্রজাগণ তাঁহাকে একটী করিয়া ভেড়া দিত। একদিন 'রা' আহারের সময় দেখিতে পাইলেন যে, সে দিনের মাংস অন্যান্য দিনের মাংস হইতে অতি সুমিষ্ট হইয়াছে। তখন তিনি এই ভেড়া কে দিয়াছে এবং কোন গ্রামে পাওয়া যায় ইহার অনুসন্ধান করিতে পাচককে আজ্ঞা করিলেন। কোতোয়াল বহু অনুসন্ধানের পর প্রধানকে জানাইল যে ভেড়াটী 'বারমাছ' গ্রামের জনৈক বৃদ্ধার নিকট হইতে আসিয়াছে। তখন সেই বুড়ীর ডাক পড়িল। রাজা ডাকিয়াছেন—কেন ডাকিয়াছেন—কি বৃত্তান্ত—বৃদ্ধা বড়ই চিন্তিতা হইল এবং কাঁদিতে কাঁদিতে 'রা' এর নিকট উপস্থিত হইল। রাজার প্রশ্ন শুনিয়া বুড়ী অনেকটা আশ্বস্ত হইল এবং বলিল—"হে দুনিয়ার মালিক! হে গিলগিট-প্রধান! এই ভেড়াটী অতি শৈশবেই মাতৃহীন হয় এবং আমি ইহার সুন্দর চেহারা দেখিয়া নিজেই ইহাকে লালনপালন করি এবং যতদিন ঘাস

খাইতে না পারে ততদিন পর্য্যন্ত নিজের বুকের দুধ খাওয়াইয়া বড় করি, কিছু দিন পূর্ব্বে হুজুরের নিকট সেই ভেড়াই প্রেরণ করিয়াছিলাম।"

শ্রীবাদত বৃদ্ধার কথায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে পুরস্কৃত করিয়া বিদায় দিলেন এবং প্রচার করিলেন যে এই মেষশাবক অতি অল্প দিন মানুষের দুধ খাইয়া যখন এই প্রকার সুখাদ্য হইয়াছিল তখন ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা যারা অনেক কাল মানুষের দুধ খায়, তাহাদের মাংস আরও কোমল ও মিষ্ট হইবে, অতএব আজ হইতে বালকবালিকাগণের উপর কর ধার্য্য করিলাম এবং আজ হইতে আমি প্রতিদিন নরমাংস চাই। এই প্রকারে শ্রীবাদত নরখাদক বলিয়া প্রচারিত হইল।

চিলি উৎসব ও কাটচাটা বংশের বিবরণ

কোন সময়ে গিলগিটে কাটচাটা বংশের একটী বর্দ্ধিষ্ণু পরিবার বাস করিত। তাহারা নিজেদের পৃথক * দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিল এবং সেই দুর্গ মধ্যে বহু সৈন্যসহ প্রবল প্রতাপে বাস করিত। ক্রমে তাহাদের প্রতাপ চারিদিকে প্রচারিত হইল এবং গিলগিটের 'রা' ভীত হইলেন। তিনি সর্ব্বদাই তাহাদের উপর খরদৃষ্টি রাখিতে লাগিলেন, কিন্তু সম্মুখ যুদ্ধে তাহাদিগকে পরাজিত করা অসম্ভব মনে করিয়া একদিন রজনী যোগে অকস্মাৎ আক্রমণ করিয়া সমুদয় সৈন্যকে হত্যা করিলেন। কেবল মাত্র একজন গর্ভবতী স্ত্রীলোক জানালা দিয়া পলাইয়া "কারগা" উপত্যকার নিকটবর্ত্তী 'দারেল' গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং তথায় তাহার একটী পুত্র জন্মে, এই বংশের অপর কেহই জীবিত না থাকায় তাহাদের ক্ষেত্রগুলি বহুদিন অনাবাদে রহিয়া যায়। অবশেষে 'রা' স্বয়ং এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া এবং অনুচরগণকে জমী আবাদ করিতে ও গম বুনিতে আদেশ করিলেন। ফসল হইলে পর দেখা গেল যে সমস্ত গমই যেন আগুনে পুড়িয়া গিয়াছে। দেখিয়া 'রা' অত্যন্ত চিন্তিত ও দুঃখিত হইলেন। এই প্রকারে পাঁচ বৎসর আবাদ করিয়া প্রতিবারই অকৃতকার্য্য হইলেন। গ্রামে মহা আন্দোলন পড়িয়া গেল। তৎপর রাজা স্বয়ং "দানিয়াল" দিগকে ডাকাইয়া ইহার প্রকৃত কারণ প্রকাশ করিতে অনুমতি করিলেন।

দানিয়ালগণ তাহাদের প্রচলিত প্রথানুসারে চিলি গাছের পাতায় অগ্নি সংযোগ করিয়া আঘ্রাণ লইল এবং উন্মত্তবৎ নাচিতে নাচিতে ঢাকের উপর কান রাখিয়া অতি মনোযোগের সহিত কি যেন শুনিতে লাগিল এবং তদবস্থায় বলিতে লাগিল—

"গিলগিটের সুখসম্পদ কাটচাটা বংশের সুখদুঃখের উপর নির্ভর করে, তাহারা ফিরিয়া আসিয়া তাহাদের শুভহস্তে বীজ বপন করিলে আবার সুফল উৎপন্ন হইবে। গিলগীটের "রা" তাহাদের উপর অতিশয় অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিয়াছে। যদি

---

* সেই দুর্গের এখন চিহ্নমাত্র নাই, এই দুর্গমধ্যে Hayward সাহেবকে কবর দেওয়া হইয়াছিল।

তাহাদের বংশের কোন ব্যক্তি নিজ হাতে এই ভূমিকর্ষণ ও বীজ বপন করে তবে পুনরায় সুফল উৎপন্ন হইবে—নচেৎ আর সুফলের প্রত্যাশা করা বৃথা।”

“কাটচাটা বংশের কোন ব্যক্তিকে ভূমি কর্ষণ করিতে হইবে এবং কতকগুলি বীজ ‘রা’ অর্থাৎ প্রধানের ধুতির একপ্রান্তে বাঁধিয়া দিবে তাহা হইতে ‘রা’ স্বয়ং দুই তিন মুঠা লইয়া জমীতে ছড়াইয়া দিবে; পরে কাটচাটা-গণ অবশিষ্ট বীজ জমিতে বপন করিবে; এরূপ করিলে সুফল উৎপন্ন হইবে নচেৎ আশা নাই।”

দানিয়ালগণের মুখ হইতে এই দৈববাণী বাহির হইবামাত্র ‘রা’ তৎক্ষণাৎ গ্রামে প্রচার করিয়া দিলেন যে, যে কেহ “কাটচাটা” বংশের কোন লোককে ধরিয়া রাজার নিকট উপস্থিত করিতে পারিবে সে বিশেষরূপে পুরস্কৃত হইবে।

এই ঘোষণা শুনিয়া গ্রামে মহা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। পুরস্কারের লোভে ‘রা’ মহাশয়ের অনুচরগণ নানাদিকে ছুটিয়া চলিল, “দারেল” ও “তাঙ্গির” নামক স্থানে যে ব্যক্তি অনুসন্ধান করিতে গিয়াছিল সে শুনিতে পাইল যে—হত্যাকাণ্ডের সময় একজন গর্ভবতী স্ত্রীলোক পলাইয়া আসিয়া ‘দারেল’ গ্রামে আশ্রয় লইয়াছে এবং তাহার একটী পুত্র সন্তান জন্মিয়াছে, সন্ধান পাইয়া তাহারা যারপরনাই আনন্দিত হইয়া এবং তৎক্ষণাৎ স্ত্রীলোকটীর বাসস্থানের অনুসন্ধান করিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইল এবং পুরস্কারের প্রলোভন দেখাইয়া তাহাকে ‘রা’ এর নিকট হাজির করিল। সকলেই তখন সন্ধান-কারীকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল এবং ‘রা’ মহাশয় স্বয়ং তাহাকে পুরস্কৃত করিলেন।

দানিয়ালদিগের উপদেশ মত ‘রা’ তখন ভূমিকর্ষণ ও বীজ বপন করিলেন এবং গিলগিটে কাটচাটা বংশের পুনঃ সংস্থাপন হেতু সেই বৎসর প্রচুর পরিমাণে ফসল উৎপন্ন হইল।

কাটচাটা বংশধরের বিবাহের পর চারিটী পুত্র সন্তান জন্মিল, তন্মধ্যে তিন জনকে ‘হুনজা’ ‘নাগর’ ও ‘ইয়াশীলের’ প্রধানগণের অনুরোধ ক্রমে তাহাদের রাজ্যে প্রেরণ করা হইল এবং একজন গিলগিটে অবস্থান করিতে লাগিল ও কাটচাটা বংশের সকলেই ভগবানের এক প্রকার অংশ বিশেষ বলিয়া সম্মান পাইতে লাগিল।

আজও পর্য্যন্ত কাটচাটাগণ ভূমি কর্ষণ করিয়া দিলে পর ‘রা’ স্বয়ং বীজ বপন করেন তারপর অন্যান্য সকলে তাহাদের অনুসরণ করে। ভূমি কর্ষণ শেষ হইলে বীজ বপনের সময় ‘রা’ একটী প্রকাণ্ড ভোজের আয়োজন করেন এবং সকলে ‘রা’ মহাশয়ের প্রাঙ্গণে সমবেত হইয়া বাঁশী ও ঢাকের বাজনায় কর্ণ বধির করিয়া দেয় এবং নানা প্রকার নৃত্য গীতে ও ক্রীড়াকৌতুকে দিন অতিবাহিত করে। তৎপর একজন কাটচাটাকে অতি আদরের সহিত ডাকিয়া আনিয়া তাহার মুখে ময়দা মাখাইয়া দেয় এবং তাহার বড় বড় চুলগুলি খুলিয়া দিলে পর সেই ব্যক্তি ষাঁড়ের মত ডাকিতে ডাকিতে ও লাফাইতে লাফাইতে ‘রা’ মহাশয়ের ক্ষেত্রের দিকে ছুটিয়া যায়। ‘রা’এর অনুচরগণ পূর্ব্ব হইতেই মাঠে একটী প্রকাণ্ড পাত্রে

গরুর খাদ্য রাখিয়া দেয়। লোকটী দৌড়িয়া গিয়া ঠিক গরুর মত পাত্রটীতে মুখ রাখিয়া খাদ্যগুলি চিবাইতে থাকে। তারপর বপন কার্য্য আরম্ভ হয়। কয়েক মুঠা বীজ কাটচাটা 'রা'এর পরিধেয় বস্ত্রে ঢালিয়া দেয়, 'রা' সেই বীজ গুলির সহিত অল্প সোনার গুড়া মিশ্রিত করিয়া কয়েক মুঠা নিজে ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিয়া কাটচাটাকে কয়েক মুঠা ছড়াইতে দেন; পরে অন্যান্য সকলে তাহাদের জমীতে বীজ বপন করে। এই দিনকে গিলগিটে চিলি বলিয়া থাকে এবং এই দিন কাটচাটা 'রা'এর নিকট হইতে এক মণ ময়দা, পাঁচ সের ঘৃত, একটী পাগড়ী, ও একটী জামা প্রাপ্ত হয়।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা।

চয়ন

স্পেনের জাতীয় ক্রীড়া

বিস্তৃত প্রাঙ্গণ ভেরীনিনাদে নিনাদিত হইতেছে। দর্শকবৃন্দ উদ্‌গ্রীবভাবে প্রতীক্ষা করিতেছে। দেখিতে দেখিতে বিচিত্রবেশধারী কতিপয় যোদ্ধ‌ৃপুরুষ সমপাদক্ষেপে রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিল। ইহারা বৃষের সহিত সংগ্রাম করিবে। শত শত দর্শকের হর্ষোৎফুল্ল আনন হইতে এই সকল যোদ্ধ‌ৃবৃন্দের প্রশংসাসূচক জয়ধ্বনি উত্থিত হইল।

উন্মুক্ত, বালুকাময়, প্রশস্ত রঙ্গভূমি। ষোল শত দর্শকের ইহাতে স্থান হইয়াছে। ইহারা ষোল শত মুখে যুযুৎসু ব্যক্তিদের প্রশংসা করিতেছে। শ্রমজীবী, শিল্পী, বাণিজ্যব্যবসায়ী, বিপণিরক্ষক, ধনী, দরিদ্র—সকলেই আজ রঙ্গভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। বৃষের সহিত নরের সংগ্রাম দেখিবার একটা বিকট ঔৎসুক্য সকলকে একত্র সমবেত করিয়াছে।

স্পেনদেশের সুতীব্র সূর্য্যরশ্মির তলে আজ এ কি মহিমান্বিত দৃশ্য! ষোল শত কণ্ঠের বর্গের বীরপাদক্ষেপে রঙ্গভূমি মধ্যে সুমন্থর পরিক্রমণ—সকলে মিলিয়া যেন কি এক মহান্ ব্যাপারের সূচনা করিতেছে। মাতাদোর, পিকাদোর, বাণ্ডারিলারো, চুলো প্রভৃতি ক্রীড়াকারী যোদ্ধা কি নির্ভীক, সুনিপুণ, বলিষ্ঠদর্শন!

বিস্তীর্ণ রঙ্গভূমির একার্দ্ধ তীব্র রৌদ্রতপ্ত, অপরার্দ্ধ ছায়াশীতল। অভিজাত ও অর্থশালী ব্যক্তিবৃন্দ ছায়াতলে বসিয়াছে; যাহারা দরিদ্র, তাহারা রৌদ্রতাপ সহ্য করিতেছে। কিন্তু উত্তেজনার অভাব কাহারও নাই। বৃষের সহিত নরের যুদ্ধ দেখিবার বিরাট বাসনা সকলের ধমনীতে উত্তপ্ত শোণিত সঞ্চালিত করিয়াছে। এমনই নির্ম্মম অথচ সজীব দৃশ্য!

দর্শকবৃন্দ ও যুদ্ধস্থানের মধ্যবর্ত্তী ‥গ্ন বালুক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া যুযুৎসু ব্যক্তিরা অপেক্ষা করিতেছে। সহসা একটা নিস্তব্ধ ভাব দেখা গেল—গভীর শ্বাসরোধকারী নিস্তব্ধতা। অদূরে একটা দরজা খুলিয়াই বন্ধ হইয়া গেল।

একটা প্রকাণ্ড জীব সবেগে রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিল। একটা বিপুলকায় কৃষ্ণবর্ণ বৃষ!

জীবনে কেবল একবার মাত্র যুদ্ধক্রীড়া দেখাইয়াই যাহাকে পশুলীলা সাঙ্গ করিতে হইবে, আরব্ধপ্রায় বিয়োগান্ত নাটকের সেই প্রধান অভিনেতা,—এইবার তাহার যুদ্ধাভিনয় আরম্ভ করিল।

অন্ধকার হইতে সহসা আলোকে তাড়িত হইয়া পশুটার চক্ষে ধাঁধা লাগিয়াছে। ব্যাণ্ডের বাদ্যধ্বনি, চতুর্দ্দিকস্থ দৃশ্যের অভিনবত্ব তাহাকে দিশাহারা করিয়াছে। প্রাণ বাঁচাইবার জন্য তাহাকে এস্থানে যুদ্ধ করিতে হইবে; ইহা বুঝিতে পারিয়াই যেন সে ক্রোধ-ভরে এক ভীষণ গর্জ্জন করিল।

কি মহান্ পশু এই সুন্দর কৃষ্ণকায় বৃষ! যুদ্ধবীর্য্য যেন মূর্ত্তি ধরিয়া এই বৃষরূপে আসিয়া দেখা দিয়াছে। সিংহ ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুও আজ ইহার অগ্রে পলায়ন করিবে।

সহসা ক্রোধরিপু আসিয়া বৃষকে আশ্রয় করিল। লড়াইকারীরা দ্রুতপদে যুদ্ধভূমিতে প্রবেশ করিয়াছে এবং বৃষটা গর্জ্জন করিতে করিতে ইতস্ততঃ ক্ষিপ্তবৎ ছুটিতেছে। তাহার গতিতে কি অত্যদ্ভুত ক্ষিপ্রতা! কত বড় বড় লম্ফ দিয়া সে সগর্জ্জনে তাহার আততায়ী-দের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে!

কিন্তু বৃষের প্রতিদ্বন্দ্বীরাও ত কম ক্ষিপ্র নহে। কি কৌশলী তাহারা! বৃষের আক্রমণ সময়ে তাহারা চীৎকার করিয়া বিদ্যুৎচমকের ন্যায় সরিয়া পড়িতেছে; রক্তবস্ত্র সঞ্চালন করিয়া বৃষকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতেছে। মাঝে মাঝে বর্ষার সূচ্যগ্রভাগও বৃষের অঙ্গে বিদ্ধ হইতেছে। বৃষটা সরোষগর্জ্জনে চতুর্দ্দিক প্রকম্পিত করিয়া ভীমবেগে আক্রমণ করিতেছে। কিন্তু তাহার হনন-প্রয়াস প্রতি-পক্ষের কৌশলচক্রে প্রতিবারই নিষ্ফল হইতেছে।

এইবার একটা যোদ্ধাকে বৃষ আয়ত্ত করিয়াছে। এক মুহূর্ত্তের শিথিলগতি ইহাকে বৃষের কবলে ফেলিয়াছে। লোকটা ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইল। মুহূর্ত্তপরে তাহার প্রাণবায়ু শূন্যে মিলাইবে। যদি তুমি প্রকৃত দর্শক হও এবং তোমার অন্তরে যদি যুদ্ধপ্রবৃত্তি থাকে, তবে তুমি এ দৃশ্যে সন্তুষ্ট হইবে। আমি খুবই প্রীত হইয়াছিলাম। আমার সহানুভূতি পূর্ব্ব হইতেই বৃষের দিকে ছিল।

উৎক্ষিপ্ত যোদ্ধা ভূপতিত হইল। চতুর্দ্দিকস্থ শত শত দর্শক চীৎকার করিয়া উঠিল। একটা জীবাণু প্রাণী মরিতে বসিয়াছে; কিন্তু হত্যা দেখিবার বিকট প্রবৃত্তি দর্শকদের হৃদয়ে সজীব ভাবে জাগিয়া উঠিয়াছে।

ধরাশায়ী যোদ্ধাকে লক্ষ্য করিয়া বৃষ বেগে ধাবমান হইল। লোকটার মৃত্যু সুনিশ্চিত। কিন্তু মানুষের চাতুরীর নিকট পশু কি করিবে! বৃষের সম্মুখে একটা রক্তবস্ত্র সঞ্চালিত হইয়াছে। বৃষ তাহা লক্ষ্য করিয়া ছুটিল। দেখিতে দেখিতে আর একটা রক্ত-বস্ত্র। বৃষ সেই দিকে দৌড়িল। আবার এইমাত্র এক যোদ্ধা তাহাকে আঘাত করিয়াছে; বৃষ তাহাকে আক্রমণ করিল। ক্রমে বৃষের ক্রোধ উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। এক মুহূর্ত্তপূর্ব্বে যে লোকটাকে সে উৎক্ষিপ্ত করিয়াছিল, তাহার কথা একেবারে ভুলিয়া গেল। এই অবসরে অচেতন যোদ্ধাকে রঙ্গভূমি হইতে অপসারিত করা হইল।

যুদ্ধ করিতে করিতে বৃষের বুদ্ধি খুলিয়াছে। গণ্ডে একটা আঘাত পাইবা মাত্র সে পশ্চাৎ ঘুরিয়া সবেগে একজন আততায়ীর উপর পড়িল। কিন্তু মারাত্মক আঘাত করিবার পূর্ব্বেই সে যোদ্ধাবর্গের সমবেত বর্শার তাড়নে ভূপতিত হইয়া শিকার ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, এই বৃষকে যদি দ্বিতীয়বার রঙ্গভূমিতে অবতরণ করিতে হইত, তাহা হইলে সে অধিকতর কৃতিত্বের সহিত আত্মরক্ষা করিত। কিন্তু তাহার ভাগ্যলিপি পূর্ব্বেই মনুষ্যকর্ত্তৃক সুনির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যতই কৌশল ও সাহসের সহিত সে আত্মরক্ষা করুক না কেন, রঙ্গস্থল হইতে সজীবদেহে তাহাকে আর ফিরিতে হইবে না। বৃষটি উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। ক্রীড়কেরা এক্ষণে অধিকতর সাবধানে অগ্রসর হইতেছে। পূর্ব্বের ন্যায় আর তাহারা অল্প সুযোগেই আক্রমণ করিতেছে না।

কতিপয় ঘোটককে এই সময়ে রঙ্গভূমিতে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। অতঃপর যে দৃশ্য দেখা গেল, তাহা বর্ণনীয় নহে। শিকারী কুকুরের তীক্ষ্ণ দশনাগ্রে শৃগাল কিংবা শশকের যে অবস্থা হয়, বৃষের শৃঙ্গ ও পদের আঘাতে ঘোটকগুলির সেই দশা হইল। কি লজ্জাকর, বীভৎস দৃশ্য! ক্রীড়ার আমোদজনক ভাব ইহাতে এক বিন্দুও নাই। বৃষের সহিত সংগ্রামে যখন কোন যোদ্ধা নিহত হয়, তখন কেহই কোনরূপ অনুকম্পা অনুভব করে না। যাহারা আঘাত করিতে আসে, তাহারা আহত কি নিহত হইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি! এরূপ নিষ্ঠুর ক্রীড়ার উহাই ত উপযুক্ত পুরস্কার।

বৃষটি ক্রমেই ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছে। পূর্ব্বের ন্যায় আর তাহার সে তেজ নাই। বলিতে গেলে, সে স্বয়ংই নিজকে পরাভূত করিতে বাধ্য হইয়াছে। এক্ষণে সে থাকিয়া থাকিয়া দাঁড়াইতেছে এবং নিঃশ্বাস লইতেছে।

একজন যোদ্ধা তরবারি হস্তে তাহার সম্মুখে অগ্রসর হইল। বৃষ দাঁড়াইয়া দেখিল কিন্তু সে নড়িল না। যোদ্ধা যাইয়া তাহার ঠিক সম্মুখে দাঁড়াইল এবং চার পাঁচ পদ দূরে থাকিয়া একটা রক্তবস্ত্র আন্দোলিত করিল। বস্ত্র লক্ষ্য করিয়া বৃষ ছুটিল, চকিতে যোদ্ধা এক পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল।

এই যোদ্ধা 'মাতাদোর'। বৃষের অঙ্গে মারাত্মক শেষ আঘাত দিবার জন্য এ ব্যক্তি রঙ্গস্থলে অবতীর্ণ হইয়াছে। শত শত দর্শকের কলরবমুখরিত রঙ্গভূমি সহসা গভীর নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিল। যুদ্ধক্রীড়া এক্ষণে চরম সীমায় উঠিয়াছে।

'মাতাদোর' দেখিতে মধ্যমাকৃতি। দেহ বলিষ্ঠ, হস্ত লঘু, মুখাবয়ব পরুষভাবব্যঞ্জক, পরিচ্ছদ চিত্রবিচিত্র। সেই পরিচ্ছদে তাহার ভীষণ মূর্ত্তি ভীষণতর দেখাইতেছে।

"মাতাদোর" দাঁড়াইয়া আছে। তাহার শাণিত কৃপাণ আলোকে বিচ্ছুরিত হইতেছে। সংগ্রামের সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক অংশের অভিনয় তাহাকে করিতে হইবে। বৃষ যখন ভীমগর্জ্জনে তাহার উপর আসিয়া পড়িবে, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে, সম্মুখে দাঁড়াইয়া, বৃষের গাত্রের চিহ্নিত স্থানে শেষ আঘাত করিতে হইবে। এক ইঞ্চি পরিমিত সেই নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে প্রহৃত স্থানের যদি কেশপরিমাণ স্খলন হয়, তবে সমস্ত পণ্ড হইবে। ক্রুদ্ধ

দর্শকবৃন্দের নিন্দাসূচক ভীষণ চীৎকার মাতাদোরের মস্তকে সরোষে বর্ষিত হইবে।

মাতাদোর দাঁড়াইয়া পুনরায় রক্তবস্ত্র আন্দোলিত করিল। বৃষ কিন্তু নড়িল না। একস্থানে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

বস্ত্রের আন্দোলন থামিতেই বৃষটা সহসা আক্রমণ করিল। মাতাদোর সতর্ক ছিল। সে সম্মুখে একপদ অগ্রসর হইল। তাহার হস্তস্থিত কৃপাণ শূন্যে সূর্য্যকরে ঝক্ ঝক্ করিয়া উঠিল।

তরবারী যথাস্থানে প্রবেশ করিয়াছে। বৃষের স্কন্ধের উপরিভাগে তাহার হাতল মাত্র দেখা যাইতেছে। চক্ষের পলক পড়িতে না পড়িতে সমুদয় কার্য্য শেষ হইয়াছে। বৃষের আক্রমণ, মাতাদোরের অগ্র-গমন বৃষ-অঙ্গে কৃপাণ প্রবেশ—সমস্ত যেন একটি কার্য্য, এক নিমিষেই সম্পন্ন হইয়া গেল।

মুহূর্ত্তের জন্য বৃষের সর্ব্বশরীর প্রস্তরবৎ কঠিন হইল। তারপর আড়ষ্ট দেহ বালুকার উপর পড়িয়া গেল।

শত শত দর্শকের আনন্দোচ্ছ্বাসে রঙ্গভূমি প্রকম্পিত হইতে লাগিল।

শ্রীদীনবন্ধু সেন।

বাতি-ঘরের রক্ষক

বাতি-ঘরের রক্ষকের মৃত্যুর পরদিন সন্ধ্যার সময় পরিদর্শক হতাশভাবে বসিয়া আছেন, এমন সময় একটি বৃদ্ধ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বলিল, সে এই কাজটি লইতে চাহে। তাহার সব চুল শাদা হইয়া গিয়াছে, শুষ্ক মুখ হইতে সাধুতার দীপ্তি ফুটিয়া বাহির হইতেছে। কোটরস্থ চোখ দুইটি কেমন একটা বিষাদের ভাবে ভরা! পরিদর্শক তাহাকে দেখিয়া সুখী হইলেন। কিন্তু এমন কঠিন কাজ এই সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ কেমন করিয়া করিবে ভাবিয়া সন্দিগ্ধ হইলেন। তিনি বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"তুমি সমুদ্রে কতদিন কাজ করেছ?"

"তিন বৎসর।"

"কিন্তু তুমি বাতি-ঘরের রক্ষকের এমন কঠিন কাজ করবে কি করে? তোমার বয়স যে বড় বেশী হ'য়েছে; রোজ নিয়ম মত কাজ করতে পারবে কি?"

হঠাৎ আবেগকম্পিত স্বরে সজল চক্ষে চাহিয়া বৃদ্ধ বলিয়া উঠিল,—"মশায়, আমি বড় শ্রান্ত, বড় ক্লান্ত; এ সুদীর্ঘ জীবনের উপর দিয়ে কত ঝড় যে বয়ে গেছে তা ঈশ্বরই জানেন। এখন আমি একটু শান্তি চাই, একটু বিশ্রাম চাই। একটা এমন জায়গা চাই যেটাকে আমার নিজের বলে আঁক্ড়ে ধরে রেখে দিতে পারবো। এই বুড়োর জীবনকে সুখী করা এখন আপনারই হাতে আমি বল্‌চি আমি ভালো লোক, আমাকে সন্দেহ করবেন না। আর এমন করে ঘুরে বেড়াতে পারি নে।"

বৃদ্ধের চক্ষে এমন একটা নিবিড় কাতরতা প্রকাশ পাইল যে, পরিদর্শক ব্যথিতভাবে বলিলেন, "আচ্ছা, তোমাকেই কাজ দিলাম, কিন্তু সাবধান একদিন যদি কাজের গোলমাল হয় তবে আর তোমার এ কাজ থাক্‌বে না।"

অপূর্ব্ব আনন্দে বৃদ্ধের শুষ্ক মুখ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল! কম্পিতস্বরে সে শুধু বলিল,—"মশায়, আপনার দয়া এ জীবনে ভুলবো না।"

সে রাত্রে সমুদ্রের উপর আলোর রেখা ঝলসিতে দেখিয়া নাবিকেরা বুঝিল বাতি-ঘরে নূতন লোক আসিয়াছে। বাতি-ঘরের জানালার ধারে বসিয়া সমুদ্রের গম্ভীর গর্জ্জন শুনিতে শুনিতে বৃদ্ধ তাহার এই নূতন জীবনটা ভালো করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিতেছিল। গহ্বরের মধ্যে লুকাইয়া শিকারীর অনুসরণ হইতে নিস্তার পাইয়া হরিণ যেমন আপনাকে নিরাপদ মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হয়, বৃদ্ধও কতকটা তেমনি নিশ্চিন্ত হইয়াছিল। তাহার কর্ম্মক্লান্ত বেদনাহত জীবনের অহরহ ঘাত-প্রতিঘাতের যে একটা বিরামের সময় আসিয়াছে ইহাতে সে অপার তৃপ্তি অনুভব করিতেছিল। একটা অসীম শান্তিতে তাহার অন্তর ভরিয়া উঠিতেছিল। সমুদ্রের ঢেউ আলোয় ঝলমল করিতেছিল! সে তাহারই দিকে চাহিয়া চাহিয়া গত জীবনটা মনের সম্মুখে আনিতে চেষ্টা করিতেছিল। সৎপথে থাকিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিয়া সে সম্মান ও প্রতিপত্তি লইয়া জীবন কাটাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু প্রতিবারেই বিফলমনোরথ হইয়াছে। জীবনকে সুখময় করিবার জন্য সে পৃথিবীর কোথায় না গিয়াছে। কোন্ কাজ না করিয়াছে! কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী কোনো দিনই তাহার প্রতি প্রসন্ন হন নাই। তাহাকে সকলেই বলিয়াছে সে অভাগা। ক্রমাগত বিফলমনোরথ হইয়া সেও মানিয়া লইয়াছে সে হতভাগ্য। এ পৃথিবীর দশজন যেমন সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে তাহার কপালে তাহা লেখা নাই। মানুষের কৃতঘ্নতায়, বিশ্বাসঘাতকতায় তাহার জীবন ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছে। এই পার্ব্বত্য দ্বীপে, এই নির্জ্জন বাতিঘরে মানুষের হাত হইতে সে রক্ষা পাইয়াছে। এখানে কাহারো নিকট হইতে কোনো অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। এত দিনে সে একটু সুখ, একটু শান্তি পাইবে। তাহার ভারাক্রান্ত তাপিত চিত্ত জুড়াইবার জন্য বিধাতা কি সুযোগই তাহাকে দিয়াছেন! এ সুখ, এ শান্তিটুকু সে ভালো করিয়া যেন উপভোগও করিতে পারিতেছিল না, পাছে আবার তাহা ভাঙ্গিয়া যায়! তাহার মনে হইতেছিল, তাহার মতো হতভাগ্যের কপালে এত সুখ সহিবে না। সে যেমন শান্তিহীন, গৃহহীন, আশ্রয়হীন ছিল দুদিন পরে তেমনি হইবে। তাহার যেন বিশ্বাস দাঁড়াইয়াছে, তাহার জীবন চিরদিনই ঝটিকা ক্ষুব্ধ থাকিবে। দিনের পর দিন সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্যে সিঁড়ি বাহিয়া উঠিয়া সে যখন বাতি জ্বালিয়া দেয়, তখন সে মনে করে এ যেন স্বপ্ন! কিন্তু সমুদ্রের গর্জ্জন আর বাতাসের হুঙ্কার শুনিতে শুনিতে সে স্বপ্ন চলিয়া যায়। যখন সমুদ্রের জল ফুলিয়া ফুলিয়া আসিয়া বাতিঘরের পাদদেশের পাহাড়ের গায়ে আছাড় খাইয়া পড়ে, তখন তাহা কামানের গর্জ্জন কিংবা বহু লোকের কোলাহলের মতো শুনায়। আবার সেই জল যখন সরিয়া যাইতে থাকে, তখন সে যেন একটা কাতর ধ্বনি, একটা দীর্ঘশ্বাস শুনিতে পায়।

কখনো কুয়াসায় চারিধার ভরিয়া গিয়া জলস্থল একাকার হইয়া যায় আবার কখনো প্রবল বাতাসে তাহা দূরে সরিয়া যাইবার পর দেখা যায় কালো কালো মেঘে আকাশ ভরিয়া গিয়াছে! যে দিন সমুদ্রে ঝড় উঠে, সে দিন বৃদ্ধ জানালায় বসিয়া বসিয়া দেখে জাহাজগুলি কি রকম ভাবে আন্দোলিত হইতেছে। জাহাজের মাস্তুলের আলো কখনো খুব উপরে উঠিতেছে আবার পরক্ষণেই কোথায় মিলাইয়া যাইতেছে! ঝড়ের বাতাস যখন সোঁ সোঁ সোঁ করিয়া গর্জ্জন করিতে থাকে, বাতাসে জলে যখন প্রবল সংগ্রাম বাধিয়া যায়, তখন, বৃদ্ধ জানালা বন্ধ করিয়া নীচে নামিয়া আসে। বাহিরে যখন এমনি প্রলয়, বাতিঘরের ভিতর তখন পরিপূর্ণ শান্তি ও নীরবতা বিরাজ করে। নিস্তব্ধ ঘরে কেবল ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দ শুনিতে শুনিতে পরিশ্রান্ত বৃদ্ধ নিদ্রার কোলে ঢলিয়া পড়ে।

এইরূপে দিন, মাস, বৎসর গেল। সমুদ্রের নাবিকেরা এক বাক্যে বলিত, এমন কর্ত্তব্য-পরায়ণ, এমন একনিষ্ঠ লোক বাতিঘরে আর কখনো আসে নাই। ঘোর অন্ধকার রাত্রিতে ভীষণ ঝড়ের সময়ে যেমন, চন্দ্রের বিমল জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত রাত্রিতেও তেমনি বাতি-ঘরের আলো সমুদ্র পথ আলোকিত করিতে থাকে।

বাতিঘরে আসিয়া বৃদ্ধ প্রথম কয়েক মাস সহরে যাইত। সেখানে হাটবাজার করিয়া ঘরে ফিরিত। লোক জনের সহিত মেলা-মেশা করিত। খবরের কাগজ পড়িয়া দেশের সংবাদ জানিয়া লইত। এই রূপে বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে দেখা গেল, বৃদ্ধ আর বাতিঘরের বাহির হয় না। সহর হইতে যে লোক নৌকা করিয়া তাহার খাবার আনিত, তাহার নিকট হইতে তাহা লইবার সময় কেবল সে বাহিরে আসিত। তাহার সহিত গল্প করিত। কিছু দিন পরে দেখা গেল খাবার লইতেও বৃদ্ধ আর বাহিরে আসে না। যে লোক খাবার লইয়া আসিত সে বাহিরে তাহা রাখিয়া দিয়া চলিয়া যাইত। পর দিন সেখানে খাবার না দেখিয়া সে বুঝিত, বৃদ্ধ বাঁচিয়া আছে। বাতি-ঘরে নিয়মিত সময়ে আলো জ্বালিতে দেখিয়া এবং খাবার লইয়া যাইতে দেখিয়া সকলে জানিত বৃদ্ধ সেখানে আছে। এ ছাড়া তাহার অস্তিত্ব-জ্ঞাপক আর কোনো চিহ্নই ছিল না। এইরূপে অল্পে অল্পে বাহিরের জগতের সহিত তাহার সকল সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া পড়িল! সেই বাতি-ঘরের বালুকাময় সমুদ্র-তীর, আর সেখানকার অনন্ত গাম্ভীর্য্য তাহার হৃদয়ের সকল প্রেম হরণ করিয়া লইল। সে বাতিঘর ছাড়িয়া আর কোথাও যাইত না। সমুদ্রের শাদা পাখীগুলি তাহার ঘরের ছাদ ভরিয়া যখন কলরব করিত, তখন সে খাবারের কিয়দংশ তাহাদের ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া দিত। প্রথমে পাখীরা সব ভয়ে পলাইয়া যাইত, কিছু পরে তাহারা বৃদ্ধের হাত হইতে খাবার খুঁটিয়া খুঁটিয়া খাইত। সমুদ্রতীর হইতে জোয়ার নামিয়া গেলে সে তীরে বেড়াইতে বেড়াইতে নানা রঙ্গে চিত্রিত ঝিনুক ও শামুক কুড়াইয়া আনিত। চাঁদনী রাত্রে যখন সমুদ্রের জলে শত শত চাঁদ খেলিত, তখন সে নৌকা করিয়া মাছ ধরিতে যাইত। যে পাহাড়ের উপর বাতিঘর ছিল তাহারই উপকূলে কোণে

কোণে কত রূপালি মাছ সুখে খেলিয়া বেড়াইত। এই রূপে সে সেই নির্জ্জন দ্বীপের সুনিবিড় শান্তি-সুখ পরম নিশ্চিন্ততার সহিত উপভোগ করিত। বাহিরে যে একটা কোলাহলপূর্ণ কর্ম্মময়, সুখে দুঃখে জড়িত, বিচ্ছেদ মিলনে আকুল জগৎ আছে সে তাহা যেন ভুলিয়া গিয়াছিল। এই বাতিঘরই তাহার একমাত্র আশ্রয়স্থল! জগৎ যখন তাহাকে বেদনা দিয়া দূরে তাড়াইয়া দিয়াছে, এই ক্ষুদ্র দ্বীপটি তখন তাহাকে স্থান দিয়া তাহার দীর্ঘ হৃদয় জড়াইয়া ধরিয়াছে! মৃত্যু পর্য্যন্ত সে এইখানে থাকিবে, আর ঐ অনন্ত সমুদ্রে তাহার সমাধি হইবে। সুতরাং বাহিরের জগৎকে ভুলিয়া সে এই পরম সুহৃদকেই বক্ষে আঁকড়িয়া ধরিয়া রহিল। বৃদ্ধ এখন সমুদ্রের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে। সে দৃষ্টি দেখিয়া মনে হয়, সে যেন এ জগতে আবদ্ধ নহে, যেন কোন সুদূরে কোন লুকানো রহস্যের অন্বেষণে ফিরিতেছে! এমন করিয়া ক্রমে সে আপনার ভিতর ডুবিয়া যাইতে লাগিল। তাহার ভালবাসার জিনিষ সেই পাহাড় সমুদ্র, বাতিঘর, সমুদ্রতীর সমুদ্রের পাখী সব একাকার হইয়া এক রহস্যময় আত্মার মধ্যে বিলীন হইয়া যাইতে লাগিল। আধো আলো, আধো ছায়ায়, আধো জাগরণ, আধো সুপ্তিতে তাহার দিন কাটিতে লাগিল। সে বড় শ্রান্ত হইয়া যে বিরাম চাহিয়াছিল ইহারই মধ্যে তাহা পাইয়া সে আপনাকে পর্য্যন্ত যেন ভুলিয়া গেল!

কিন্তু একদিন জাগরণ আসিল। সে দিন অপরাহ্নে নির্দ্দিষ্ট সময়ে বৃদ্ধ তাহার খাবার লইতে গিয়া দেখে খাবারের পাশে একটা কাগজের মোড়কে বাঁধা পার্শেল রহিয়াছে। তাহাতে তাহার নাম লেখা। কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সে তাড়াতাড়ি মোড়ক খুলিয়া দেখিল একখানা বই। বই খানার প্রথম পৃষ্ঠা দেখিতে তাহার হাত কাঁপিতে লাগিল। বইখানা পাশে সরাইয়া সে সেই বালুকাময় তীরের উপরই বসিয়া পড়িল। শীর্ণ হাত দুখানি দিয়া চোখ ঢাকিয়া ভাবিতে লাগিল, এ কি স্বপ্ন? এ বই যে তাহার স্বদেশের বিখ্যাত কবির লেখা! তারই স্বদেশী ভাষায় লিখিত! সে যখন সমস্ত জগৎ ভুলিয়া, বাহিরের সহিত কোনো সম্বন্ধ রাখিবে না মনে করিয়া এই নির্জ্জন দ্বীপে, নিস্তব্ধ বাতি-ঘরের মধ্যে আপনাকে বন্দী করিয়া ফেলিয়াছে তখন কে তাহাকে মনে করিয়া তাহারি স্বদেশের বই পাঠাইয়া দিয়া জগতের সহিত আবার তাহার সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া দিল! মাথার ভিতর সব কেমন গোলমাল হইয়া যাইতে লাগিল। বাতি-ঘরে প্রথম কাজ লইয়া সে যখন সহরে যাইত, তখন সেখানে তাহার দেশের উন্নতিবিধায়ক এক সমিতি স্থাপনের কথা শুনিয়া সে তাহার বেতনের অর্দ্ধেক টাকা সেখানে পাঠাইয়া দিয়াছিল। এতদিন পরে সেই সমিতি টাকা পাইয়া কৃতজ্ঞতা জানাইয়া এই বই পাঠাইয়া দিয়াছে। এ কথা তার মনেই পড়িল না। বইখানা পার্শ্বে রাখিয়া সে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। এই জনমানবহীন নিস্তব্ধ দ্বীপে, এই অপার জলধির মাঝখানে তার হাতে স্বদেশের বই! এ একটা অনৈসর্গিক ব্যাপার বলিয়া তার মনে হইল। বইখানা তাহাকে যেন কোন্ অতীতের কথা স্মরণ করাইয়া দিল। কোন্ মধুভরা

দেশের সৌরভময় বাতাসের একটা মৃদু হিল্লোল তাহার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত করিয়া দিল! সে চোখ বুজিয়া বসিয়া রহিল। তাহার মনে হইতেছিল চোখ খুলিলেই এ স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইবে। যে স্বর সে চিরকাল ভালবাসিয়া আসিয়াছে, সেই অর্দ্ধবিস্মৃত স্বরে সেই সুদূর হইতে কে যেন তাহাকে আহ্বান করিতেছে! অস্তগামী সূর্য্যের সোনালী রং বইখানার উপর পড়িয়া তাহাকে যেন মহিমামণ্ডিত করিয়া তুলিল। বইখানা হাতে লইবার জন্য যখন সে হাত বাড়াইল তখন তার বুক দুরু দুরু করিয়া কাঁপিতেছে। কম্পিত হস্তে সে বইএর পাতা উল্টাইয়া যাইতে লাগিল, চারিদিক তখন নীরব, নিস্তব্ধ। সমুদ্রের কল্ কল্ ছল ছল ছাড়া আর কিছুই শুনা যায় না। নীল আকাশে কোথাও একবিন্দু মেঘ নাই। সমুদ্রের পাখীগুলি সেই আকাশে ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে, প্রকৃতির সেই বিরাট গাম্ভীর্য্যের মধ্য হইতে হঠাৎ বৃদ্ধের কম্পিত কণ্ঠস্বর শুনা গেল। সে পড়িতেছে :—

"স্বাস্থ্যেরই সনে তোমার তুলনা,
হে মোর জনম ভূমি,
যে তোমা হারায় বুঝে সেই শুধু
কত আদরের তুমি!
কি পরম সাজে মাধুরী তোমার
উঠেছে আজি গো জাগি।
আজি তারি গান গাহি, মোর প্রাণ
কাঁদিছে তোমার লাগি!"

বৃদ্ধের স্বর বন্ধ হইয়া আসিল। কি এক আবেগ ভরে তাহার বুক ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। অশ্রুজল তাহার বিবর্ণ গণ্ডস্থল প্লাবিত করিয়া দিল। সে শিশুর মতো ফুপাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বালুকার উপর পড়িয়া গেল। তাহার শাদা চুল বালুকার সহিত মিশিয়া গেল। চল্লিশ বৎসর সে তার স্বদেশ দেখে নাই, স্বদেশী ভাষা শুনে নাই। এতকাল পরে সেই ভাষা কত সমুদ্র পার হইয়া আসিয়া তাহার কানে কি এক মধু গীতি শুনাইল! তাহার অসাড় প্রাণে এ কি অমৃতের উৎস ছুটাইয়া দিল। তাহার মধুর মৃদু গুঞ্জনে তাহাকে আকুল করিয়া তুলিল যে! সেই চিরপ্রিয়, সেই চিরমধুর, সেই অপার্থিব সৌন্দর্য্যভরা স্বদেশ! এক গভীর প্রেমে তাহার অন্তর পূর্ণ হইয়া উঠিল। সে প্রেমের নিকট আর সবই তুচ্ছ, সবই ছার। অশ্রুজল ফেলিতে ফেলিতে সেই প্রিয়তমের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া সে ক্ষমা ভিক্ষা করিল। নির্জ্জন পাহাড়ের মধ্যে বদ্ধ হইয়া থাকিয়া অনুভব করিবার শক্তিটুকু পর্য্যন্ত সে হারাইতে বসিয়াছিল। এখন যেন কোনো মন্ত্রবলে তাহার হৃদয় নাচিয়া উঠিল। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে সে স্বদেশকে যেমন দেখিয়াছিল, তেমনি করিয়া তাহাকে মনে আনিতে চেষ্টা করিল। সেই স্বদেশের বন জঙ্গল, পর্ব্বত, নদী। স্বদেশের ভাই ভগিনীর প্রীতিপূর্ণ মধুর মুখচ্ছবি। তাহাদের হস্তে সে যে কোনকালে নির্য্যাতন সহিয়াছে তাহা সে ভুলিয়াই গিয়াছে। এখন স্বদেশের যাহা মনে পড়িতেছে তাহাই মধুর, তাহাই প্রেমপূর্ণ। তাহাদের সেই প্রতিদিনের সংসারের কাজকর্ম্ম, মেলামেশা, গল্পগুজবের কথা নূতন করিয়া মনে পড়িয়া গেল। তাহাদের ছায়াঢাকা ছোট গ্রাম

খানি কেমন সুন্দর, সেই গ্রামের ছোট ছোট বাতিগুলি সে যেন চোখের সম্মুখে দেখিতে পাইল। তাহাদের গ্রামের প্রান্ত দিয়া যে ছোট নদী বহিয়া গিয়াছে, সে কেমন নৌকা করিয়া সেই নদীতে মাছ ধরিতে যাইত। নৌকা বাহিয়া সে যখন মোহানার নিকট যাইত তখন তার মনে হইত, আর ঘরে ফিরিব না; এমনি করিয়া বাহিয়া বাহিয়া চিরদিন কোন অজানা রাজ্যের দিকে চলিয়া যাই। তখনকার জীবন কেমন আশাপূর্ণ, কেমন উৎসাহ উদ্যমে ভরা! মনে কত সাধ, কত আকাঙ্ক্ষা—সে দেশের একজন ধনী মানী পদস্থ অধিবাসী হইয়া সুখে জীবন কাটাইয়া দিবে! বৃদ্ধ পাথরে মাথা রাখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল। তখন তাহার আর কিছুই মনে রহিল না। সে শুধু মনে করিল, তাহার উত্তপ্ত মস্তক জন্মভূমির শীতল বক্ষে রাখিয়াছে!

পরদিন প্রভাতে এক ব্যক্তি আসিয়া তাহাকে সেই সমুদ্রতীরের বালুকার উপর দেখিয়া ধাক্কা দিয়া উঠাইল।

বৃদ্ধ হতবুদ্ধি হইয়া বিস্ময়ের সহিত তাহাকে দেখিতে লাগিল। লোকটি বলিল,—"তোমার কি হয়েছে, বাতি-ঘরে কাল আলো জ্বাল নি কেন?" বৃদ্ধ নির্ব্বাক্ হইয়া তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সে বিরক্ত হইয়া বলিল,—"তোমার কি অসুখ করেছে? তুমি কেন আলো জ্বালাও নি? বাতি-ঘরে আলো না থাকায় কাল রাত্রে এইখানে একটা জাহাজ-ডুবি হয়ে চ। তোমার চাকরি গেল। এখন চল, তোমাকে এর কৈফিয়ৎ দিতে হবে।"

বৃদ্ধের মুখ একেবারে পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। সত্যই কি সে কাল আলো জ্বালায় নাই? এত বৎসর সে একান্ত নিষ্ঠার সহিত কর্ত্তব্য পালন করিয়া আসিয়াছে। একদিনের ত্রুটির কি ক্ষমা নাই? কোন্ মোহমন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া, কোন সুখ-স্বপ্নে বিভোর হইয়া সে কাল কর্ত্তব্যে অবহেলা করিয়াছে তাহা পৃথিবীর মানুষকে বুঝাইবে কি করিয়া? হায়, সে যে বড় অভাগা! এই একদিনে তাহার শরীর নুইয়া পড়িয়াছে,—তাহার চোখ একেবারে বসিয়া গিয়াছে। নূতন জীবনের যাত্রা-পথে সে বইখানা বুকে চাপিয়া ধরিয়া লোকটির সহিত নৌকায় গিয়া বসিল।

শ্রীমতী কুমুদিনী মিত্র।

মাতৃঋণ

নবম পরিচ্ছেদ

হাঁসপাতালে

সেদিন সন্ধ্যা হইতেই "ভবিষ্য জাতির আলোচনার" সম্পাদক-গৃহে সাহিত্যের আসর জমিয়া উঠিয়াছিল। উপেক্ষিত অনাদৃত সাহিত্য-রত্নগুলি সকলেই তথায় উপস্থিত হইয়া ছিল। শুষ্ক মুখ, ঈর্ষা-ক্ষরিত দৃষ্টি—প্রতিভার হতভাগা পুত্রের দল, ছিন্ন মলিন বেশে সাধ্যমত পারিপাট্য বিধান করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই আর্জেন্তঁ-গৃহে সমবেত হইয়াছিল। তাহাদিগকে দেখিলে মনে হয়, আর্জেন্তঁর নিমন্ত্রণ-পত্র যেন সকলকে ঝাঁটাইয়া এক জায়গায় জড় করিয়া দিয়াছে।

ইদা আজ ফিরিয়া আসিয়াছে,—কবি-প্রিয়া কবির বাহু-বন্ধনে আবার আসিয়া ধরা দিয়াছে, সেইজন্য আজ এই "পুনর্মিলনোৎসবের" আয়োজন। উৎসবে আর্জেন্তঁ-রচিত বিরাট বিরহ-কাব্য "প্রতিভা-ভঙ্গ" পঠিত হইবে।

ইদা ফিরিয়া আসিয়াছে, এখন এ বিরহ গানের সার্থকতা কি? তাহারই সম্মুখে তাহার অদর্শন-জনিত বেদনার ভার এমন ভাবে ছড়াইয়া দিলে, কাহার মর্ম্মই বা তাহাতে উদ্বেলিত হইবে? সার্থকতা নাই থাকুক, মর্ম্ম উদ্বেলিত নাই হোক,—ঘটনা-চক্রের সকৌতুক আবর্ত্তনে এমন একটা বিরাট কাব্য তাই বলিয়া মাটি হইয়া যাইতে পারে না! বিষয়টা লইয়া বন্ধু-বান্ধবের সহিত আর্জেন্তঁর বিস্তর জল্পনা কল্পনা চলিয়াছিল। কেহ বলিল, "ব্যাপারটা হাস্যকর হবে। প্রিয়ার পাশে বসে প্রিয়ার অদর্শনে হা-হুতাশ—এমন কাজ কৈ আর কখনও কেউ করে নি ত!" আর্জেন্তঁ কহিল, "নাই করুক! প্রতিভা গতানুগতিক পথে চলতে পারে না, কখনও" —তাহার মুখের কথা লুফিয়া একজন ভক্ত —সে বেচারা তিন দিন অনশনে কাটাইয়া আর্জেন্তঁর প্রসাদাকাঙ্ক্ষায় আসিয়াছিল—সে গর্জ্জিয়া উঠিল, "বয়ে গেল! স্ত্রী ফিরে এসেছে, তাতে কি? তার জন্য আর্টকে ত মেরে ফেলা যায় না!" আর্জেন্তঁ কহিল, "ঠিক—এই ত সমজদারের কথা। বিরহ চুলোয় যাক্—আর্ট আর্ট।"

এই আর্টের খাতিরেই আজ আর্জেন্তঁর গৃহ সুখাদ্যের স্নিগ্ধ মধুর গন্ধে ভরিয়া উঠিয়াছে। সাহিত্যিক মহারথীবৃন্দের কলকোলাহলে পূর্ণ হইয়াছে! সন্ধ্যার বাতি জ্বলিলে কার্য্য আরম্ভ হইল। প্রকাণ্ড একটা টেবিলের এক পার্শ্বে আর্জেন্তঁ ও ইদা—তাহাদিগকে ঘিরিয়া হারজ্ লাবাস্তঁাদের মরোভঁার দল বসিয়া গিয়াছিল। লাবস্তঁাদের পিয়ানোতে ঘা দিয়া খানিকটা চীৎকার করিল। সে থামিলে আর্জেন্তঁ বিচিত্র ভঙ্গীতে কাব্য পাঠে কণ্ঠ খুলিয়া দিল।

সে এক অপূর্ব্ব কৌতুককর ব্যাপার! কবি তাহার প্রিয়ার অদর্শনে ব্যথিত চিত্তের বিলাপ-উচ্ছ্বাস মুক্ত করিয়া দিয়াছে—সেই প্রিয়া কি "নিষ্ঠুরা," "হৃদয়-হীনা," "পাষাণী," "দুষ্টা" নারী! অভিযোগের অভিধান হইতে কোন সম্বোধনটিকেই এ কাব্যে আসন হইতে বঞ্চিত করা হয় নাই! গোলাপী ফিতায় কোণ-ফোড়া প্রকাণ্ড খাতার মধ্য হইতে আহা-উহুর ধারা অজস্র ধারে ঝরিয়া পড়িতেছিল। শুনিয়া ইদার কাণ মাথা ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল—ভক্তের দল সে কাব্য-সুধাপানে বিভোর হইয়া উঠিল। কাব্যের শেষে একটু 'উপসংহার' ছিল—নূতন কয়েক ছত্র যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে—কবি পড়িল—'সেই শয়তানী নারী ফিরিয়া আসিয়াছে—সেই দাসী আজ আসিয়া আবার এই পায়ে লুটাইয়া পড়িয়াছে—এই সেই দুষ্টা দাসী, আমার চরণ-তলে!" ভক্তের দল করতালি দিয়া বলিয়া উঠিল, "জয় জয় কবি, তোমারই জয়!"

করতালির দারুণ ঘটাতেও তবু কবির চিত্ত তৃপ্তি মানিল না। পত্রিকাখানি আজ দুর্দ্দশার চরম সীমায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে! এখন প্রতি মাসের পরিবর্ত্তে বৎসরের মধ্যে দুই-চারিবার তাহা দৈবাৎ যেন প্রকাশিত হয়!

পাৎলা জীর্ণ কাগজ—কালির রেখায় ভাঙ্গা অক্ষরে পৃষ্ঠাগুলি পরিপূর্ণ, শুধু বাহিরের মলাটটি জমকালো বর্ডারে লাল কালিতে ছাপা—মধ্যে কৈফিয়ৎ আঁটা—ছাপাখানার গোলযোগে প্রকাশে বিলম্ব হইল।—সঙ্গে সঙ্গে এই অপরিহার্য্য ক্রটির জন্য পাঠকপাঠিকার নিকট ক্ষমা চাহিয়া তাহাদিগকে আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে, ছাপাখানার গোলযোগ কোনমতে কাটানো গিয়াছে; এবার হইতে নিরূপিত সময়ে পত্রিকা বাহির হইবেই!

কিন্তু এ আশ্বাসেও এতটুকু লাভ ছিল না। পত্রিকা তাহার শেষ নিশ্বাসটুকু ছাড়িবার জন্য শুধু একটা অবসরের প্রতীক্ষা করিতেছিল। এমন দিনে সার্লটি ফিরিয়া আসিয়া কবির হাতে আপনাকে সমর্পণ করিয়া কহিল, "এসেছি, ওগো কবি, আমি এসেছি—আজ থেকে আবার আমি তোমার, তোমারই শুধু!"

আর্জেন্ত নির্ব্বোধ বা শয়তান যাহাই হউক,—এই দুর্ব্বলা নারীর উপর তাহার প্রভাব অসাধারণ ছিল। আপনার গর্ব্ব আস্ফালনের যন্ত্র-স্বরূপ এই নারীকে না পাইলে তাহার চলে না—ইহাকে চাই-ই। এই অনাদৃত কবি-দেবতাটি সহস্র নির্য্যাতনে তাহাকে পীড়িত ব্যথিত করিলেও ইহার দুঃখ ছিল না। এত বড় কবির সঙ্গ-সুখ-লাভে এতদিন বঞ্চিতা থাকিয়া কবির প্রতি তাহার অনুরাগ এবার যেন দ্বিগুণভাবে বাড়িয়া উঠিয়াছিল। আহা, অনাদৃত উপেক্ষিত কবি,—বাহিরের সহিত প্রবল সংঘর্ষে কাতর হইয়া পড়িতেছে, তবুও তাহার সাধনার বিরাম নাই! বাহিরের লোক গুলা মায়ার প্রভাবে কবির অন্তরের ভাবরাশি কোনমতে জানিয়া লইয়া ছন্দে নাটিকায় উপাখ্যানে তাহা জন-সমাজে প্রচারিত করিয়া দেশের লোকের বাহবা লইতেছে! আর তাহার প্রিয় কবিটি এই নিভৃত নীড়ের মধ্যে বসিয়া দারুণ ঈর্ষার বিষে শুধু জর্জ্জরিত হইয়া যাইতেছে! দুর্ভাগা কবির প্রতি এই ভক্ত নারীর এতখানি সমবেদনার ইহাও একটি প্রধান কারণ ছিল। ইহাই শুধু এই দুঃসময়ে কবির চিত্তে প্রতিভার দীপটিকে নিবিতে দেয় নাই—দুই হাতে নিরাপদ অন্তরাল রচনা করিয়া ঈর্ষার প্রলয় ঝঞ্চা হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়া জ্বালাইয়া রাখিয়াছে। একবার শুধু একটু অবসর—আর্জেন্তর প্রতিভার দীপ অমনি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে,—নিশ্চয়! সে আলোকের উজ্জ্বল রেখায় বিশ্বের লোক মুগ্ধ নেত্রে চাহিয়া দেখিবে—কি দেখিবে? শুধু কি তাহাদিগের কবিটিকে দেখিয়াই চরিতার্থ হইবে? না—! তাহার পার্শ্বে কবির প্রতিভা-দীপে তৈলদান-রতা এই নারীকেও কি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিবে না? এই একটি মাত্র আশা শুধু ইহাকে শত নির্য্যাতনেও কাতর হইতে দেয় নাই!

এই যে দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া অক্লান্ত সংগ্রাম চলিয়াছে—প্রতিভাকে ঠেলিয়া দাঁড় করাইবার জন্য অকাতর পরিশ্রম—যে সংগ্রামে কবির অপর সঙ্গীর দল,—কেহ ক্ষেত্র হইতে সরিয়া বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিয়াছে, কেহ-বা ক্ষেত্র-প্রান্তে মুমূর্ষু অবস্থায় পড়িয়া আছে—ইহার মধ্যে—এই বিরাট বিশৃঙ্খলার মধ্যে একমাত্র কবিই শুধু বিজয়-গর্ব্বে মেবারের রাণা প্রতাপসিংহের ন্যায় মাথা তুলিয়া

দাঁড়াইয়া আছে—অগাধ জলরাশির মধ্যে ক্ষুদ্র দ্বীপখণ্ডের মত জাগিয়া রহিয়াছে—প্রলয়-পয়োধি কিছুতেই তাহাকে নিমজ্জিত করিতে পারে নাই!

কাব্য পাঠ তখন শেষ হইয়া গিয়াছিল। ভক্তের দল কাব্য-সৌন্দর্য্যের মোহটুকু তখনও কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই—ইদার চোখের কোণে অশ্রুর রাশি আসিয়া সঞ্চিত হইয়াছিল। বহু চেষ্টায় ইদা তাহা ঝরিতে দেয় নাই! এমন সময় দাসী আসিয়া সংবাদ দিল, একটা লোক মাদাম আর্জেন্তঁর সহিত দেখা করিতে চাহে।

মধুচক্রে কে যেন ঘা দিল। সকলে দাঁড়াইয়া উঠিল—"কে?" "কি চায়?" "কেন এসেছে?" হু হু করিয়া প্রশ্নের ঝড় বহিয়া গেল।

দাসী কহিল, "একটা লোক।"

"কে লোক?"

"লোকটা যেন পাগলের মত! মাদামের সঙ্গে দেখা করতে চায়। আমি বললুম, এখন দেখা হবে না—মাদাম ব্যস্ত আছেন—তবু সে শুনবে না—বলছে, দেখা না করে সে কিছুতেই এখান থেকে নড়বে না। সে বলছে, ভারী দরকার। বলে সে চৌকাঠের উপর বসে পড়েছে—নড়ছে না।"

সার্লটির বুক কাঁপিয়া উঠিল। সে কহিল, "যাই, আমি দেখা করে আসি," আর্জেন্তঁ তাহার হাত ধরিয়া একটা ঝটকা দিল, কহিল, "না, না, তোমার যাওয়া হতেই পারে না! লাবাস্যাঁদ্‌র্‌, তুমি দেখে এস ত হে, ব্যাপার-খানা কি।" লাবাস্যাঁদ্‌র্‌ একটা রাগিণীর কথা ভাবিতেছিল। তুড়ি দিতে দিতে সে উঠিয়া গেল।

কবি তখন আপনার কাব্যের ব্যাখ্যা করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু বাধা পড়িল। লাবাস্যাঁদ্‌র্‌ ফিরিয়া আসিয়া কবিকে একান্তে ডাকিয়া আনিল। কবি স্তম্ভিতভাবে প্রশ্ন করিল, "ব্যাপার কি?"

"ব্যাপার আবার কি? সেই ছোঁড়াটা একে পাঠিয়েছে—তার অসুখ করেছে।"

"ছোঁড়া! জ্যাক—?"

"তা না ত আর কে! লোকটা বলেছে, জ্যাকের বড় অসুখ!"

"হুঁ! মস্ত চাল চেলেছে, ছোকরা! চল, আমি একবার যাচ্ছি।" আর্জেন্তঁ বাহিরে আসিল। আর্জেন্তঁকে দেখিয়া লোকটি উঠিয়া দাঁড়াইল। সে বেলিসার।

আর্জেন্তঁ কহিল, "তোমাকে সে পাঠিয়ে দিয়েছে, বুঝি?"

"না মশায়, পাঠায় নি কেউ। আমি আপনি এসেছি। তার কি কথা বলবার শক্তি আছে যে পাঠাবে? আজ তিন হপ্তা সে শয্যাগত। ভয়ানক জ্বর—একেবারে বেহুঁস হয়ে আছে।"

"রোগটা কি?"

"বুকের অসুখ। বুকে ভয়ানক ব্যথা; বুক কনকন করছে। ডাক্তাররা ভয় পেয়েছে, বলছে, আর এক হপ্তাও টেঁকে কি না সন্দেহ! তাই আমরা ভাবলুম—আমরা মানে আমি আর আমার স্ত্রী—ভাবলুম, তার মাকে একবার খপরটা দেওয়া উচিত ত! তাই আমি এসেছি।"

"তুমি কে?"

"আমি? আমি বেলিসার। জ্যাক আমায় আদর করে 'বেল' বলে ডাকে; তার

মাও আমাকে চেনেন। 'বেল' বললেই তিনি বুঝতে পারবেন। তিনি আমাদের বেশ জানেন।"

"শোন, বেল মশায়," কবির স্বরে একটা বিদ্রূপের সুর জাগিয়া উঠিল। কবি কহিল, "বুঝলে বেল মশায়, যারা তোমায় পাঠিয়েছে, তাদের গিয়ে তুমি বলো, এ চাল যা তারা চেলেছে, তা চমৎকার! কিন্তু এ সব চাল নেহাৎ পুরানো হয়ে গেছে। নূতন চাল কিছু চালতে বলো, তাতে যদি কার্য্যোদ্ধার হবার সম্ভাবনা থাকে!"

"চাল কি মশায়?" বেলিসার কবির বিদ্রূপ ঠিক বুঝিতে না পারিয়া কহিল, "চাল, কি বলছেন? আমার কথা বিশ্বাস করছেন না আপনি?"

বেলিসারের কথা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই আর্জেন্ত সশব্দে দ্বার বন্ধ করিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। বেলিসার হতবুদ্ধি ভাবে পথের ধারে কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল—পরে সে-ও ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ করিল।

আর্জেন্ত ফিরিয়া আসিয়া ইদাকে কহিল, "বাজে লোক একটা ভুল করে এ বাড়ীতে এসেছিল।" তখন আবার কাব্যালোচনা চলিল।

কুয়াশা-মণ্ডিত ক্ষীণ আলোক-বিচ্ছুরিত পথ ধরিয়া বেলিসার বাসায় চলিল। পথে সে শুধু ভাবিতেছিল, তাহার বন্ধুর কথা,—জ্যাকের কথা! না জানি, সে বিছানায় পড়িয়া কি অস্থির ভাবেই ছটফট করিতেছে! এতিয়ো হইতে ফিরিয়াই সে জ্বরে পড়িয়াছিল। গা যেন আগুনের মত গরম হইয়া উঠিয়াছিল, চোখ দুইটা আফিমের ফুলের মত টকটকে লাল। কপালের শিরা ফুলিয়া দপ্ দপ্ করিতেছিল। তবু জ্যাক কাহাকেও সে কথা বলে নাই।

সেই জ্বর গায়েই সে পরদিন কারখানায় গেল। শেষে দুই দিনের পর যখন একদিন সে একান্ত কাতর ভাবে বিছানায় পড়িয়া ছটফট করিতেছিল, তখন বেলিসারের স্ত্রীই তাহার এ অস্থিরতা প্রথম লক্ষ্য করিল। গায় হাত দিয়া সে দেখে, জ্যাকের গা যেন পুড়িয়া যাইতেছে। তখনই ডাক্তার আনা হইল। বহুক্ষণ ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার ললাট কুঞ্চিত করিয়া সংবাদ দিল, অসুখ বড় শক্ত। না সারিবারই সম্ভাবনা,—যদি সারে, তাহা হইলে জ্যাকের পুনর্জন্ম হইবে!

সেই অবধি জ্বরের আর বিরাম ছিল না। বেগটা কমিলেও জ্বর একেবারে ছাড়িতেছিল না; রাত্রে আবার বাড়িত। সেই প্রবল জ্বরে জ্যাক কত কি বকিত। কখনও সে তৃষিত হৃদয়ে মাকে ডাকিত, কখনও বা সিসিলের নাম করিয়া শুধু অশ্রু বর্ষণ করিত!

মাদাম বেলিসার আসিয়া সেদিন সন্ধ্যার সময় চুপি চুপি বেলিসারকে কহিল, "ওগো, আমি বড় ভাল বুঝছি না—তুমি জ্যাকের মাকে একবার খপর দাও। যেমন করে পার, তাকে একবার নিয়ে এস। মাকে দেখলে জ্যাকের প্রাণটা কতক বোধ হয় স্থির হতে পারে। জ্ঞান হলে ও যে ওর মার নাম করে না, রোগের ঘোরেই শুধু করে, এই থেকেই আমি বেশ বুঝছি, দিবারাত্রি ও শুধু ওর মার কথাই ভাবছে।"

তাই বেলিসার নানা সন্ধান করিয়া সেদিন ইদার বাটীতে গিয়াছিল। কিন্তু ইদা আসিল

না—সংবাদটুকুও সে পাইল না। নিতান্ত নিরাশ চিত্তে বেলিসার গৃহে ফিরিয়া আসিল। বেদনায় তাহার প্রাণ যেন ফাটিয়া যাইতেছিল।

বেলিসার যখন ফিরিয়া জ্যাকের কক্ষে প্রবেশ করিল, তখন ঘরে মৃদু আলো জ্বলিতেছিল। অস্পষ্ট আলোকে সে দেখিল, জ্যাকের বিছানার পার্শ্বে মাদাম বেলিসার ও লেবিদার গৃহিণী চুপি চুপি কথা কহিতেছে—আর থাকিয়া থাকিয়া জ্যাকের দীর্ঘ নিশ্বাসের শব্দ শুধু শুনা যাইতেছে। সমস্ত ঘরে যেন একটা বিভীষিকার ছায়া পড়িয়াছে! তাহাকে একাকী ফিরিতে দেখিয়া মাদাম বেলিসার উঠিয়া আসিয়া চুপি চুপি কহিল, "একলা যে ?"

তখন বেলিসার, যাহা ঘটিয়াছিল আনুপূর্ব্বিক সব খুলিয়া বলিল। শুনিয়া মাদাম বেলিসার শিহরিয়া উঠিল, "মাগো, কি সব রাক্ষস, শয়তান! ছেলেটা মরে, তবু একবার উঁকিটি মারবে না! আর তুমিই বা কেমন লোক— সে বাধা মেনে দিব্যি চলে এলে! শরীরে কিছু হায়া নেই! তুমি চীৎকার করে বললে না কেন, 'ওগো মাদাম, তোমার ছেলে জ্যাক বুঝি মরে!'"

বেলিসার বসিয়া পড়িল! গৃহে যে তিরস্কার মিলিবে, এ কথা সে বিলক্ষণ জানিত! কিন্তু উপায় কি ? সেই অত লোকের ভিড়ে কি করিয়া সে ভিতরে প্রবেশলাভ করিত ? অজস্র গলাধাক্কায় সেখানে ঠেলিয়া যে সকলে তাহাকে পথে বাহির করিয়া দিত।

মাদাম বেলিসার কহিল, "এর চেয়ে যদি আমি যেতুম, তা হলে বোধ হয় কার্য্যোদ্ধার হত!"

বেলিসার মাথা তুলিয়া নম্র স্বরে কহিল, "কিন্তু তারা যে ভিতরেই ঢুকতে দিলে না!"

"ধাক্কা দিয়ে চলে যেতে হয়—একবার কোন মতে খপরটা দিলে তার পর যা তাদের মন যেত, তাই না হয় করত!"

লেবিদার-গৃহিণী কহিল, "কিন্তু তুমি ত জান না দিদি, এই সব মেয়েদের প্রাণ কি রকম শক্ত, পাথরে গড়া!"

লেবিদার-গৃহিণীর রাগ হইয়া গিয়াছিল। ইদার প্রতি এখন আর তাহার এতটুকু মমতা ছিল না। অত করিয়া তাহার মন যোগাইয়া খোসামোদ করিয়া লেবিদার-গৃহিণী আশা করিয়াছিল, ইদা তাহাকে অর্থ সাহায্য দানে ব্যবসায়ের শ্রী-বর্দ্ধনে সহায়তা করিবে—তা কোথায় সে সাহায্য! বসন-ভূষণে অর্থ ব্যয় করিতে এতটুকু যাহার কৃপণতা নাই, গরীবকে কিছু সাহায্য করিতে গেলেই কি তাহার সেই অর্থে আগুন লাগিয়া যায়! কাজেই ইদার প্রতি তাহার ক্রোধের কারণ যথেষ্টই ছিল। আজ সেই রোষের খানিকটা প্রকাশ করিতে পাওয়ায় তাহার হাড়েও যেন একটু বাতাস লাগিল!

মাদাম বেলিসার সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া কহিল, "থাক গে ও সব কথা! এখন করি কি ? এ অবস্থায় ত ওকে আর ফেলে রাখতে পারিনে! বিনা চিকিৎসায় কি শেষে মারা যাবে ? অথচ চিকিৎসা করাতে পয়সা বড় অল্প লাগবে না—অত পয়সাই বা আমরা পাই কোথা ?"

লেবিদার-গৃহিণী কহিল, "তুমি আর কি করবে বল, দিদি ? যা না করবার, তোমরা

তাই করচ! পরের জন্যে এমন কে কবে করে থাকে? তবে আমার পরামর্শ যদি শোন ত বলি—"

"কি?"

"ওকে হাঁসপাতালে নিয়ে যাও। তদারকের অভাব হবে না সেখানে।"

"চুপ, চুপ—কি বল তুমি? জ্যাক কি আমার পর—আমার পেটের ছেলের মত যে আমি ওকে দেখি! আহা, বাছাকে কি রোগে যে পেলে—"বেলিসার-গৃহিণীর চোখে জল আসিল। জল মুছিয়া সে বিছানার পানে চাহিল—বিছানাটা খট্ করিয়া একবার নড়িয়া উঠিল। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া জ্যাক পাশ ফিরিল।

মাদাম বেলিসার চুপি চুপি কহিল "দেখ দেখি, ও বোধ হয় শুনেছে। ও রকম পড়ে আছে বলে কি তুমি মনে কর, ওর জ্ঞান নেই? জ্ঞান বেশ আছে!"

"তাতে আর হয়েছে, কি? আমি কি মন্দ কথা বলেছি? বলি, তুমি যাই ভাব না কেন গো, ও ত আর সত্যিই কিছু তোমার পেটের ছেলে নয়, মার পেটের ভাইও নয়! তোমারও এমন কিছু অর্থ-বল নেই! হাঁস-পাতালে দিলে তবু ওর চিকিৎসে হবে, তাই আমার বলা।"

বেলিসার কহিল, "কিন্তু ও যে আমার মিতে!" এতক্ষণ সে কোন কথাই কহে নাই। লেবিদার-গৃহিণীর কথায় সেও উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

লেবিদার-গৃহিণী ব্যাপার বুঝিয়া বিদায় গ্রহণ করিল।

জ্যাক সমস্তই শুনিয়াছিল। পাশে কে কি কথা বলে, সে সমস্তই তাহার কানে যায়। সে শুধু ভাণ করিয়া চক্ষু মুদিয়া থাকে। বুকের মধ্যে যে অসহ্য যাতনা আগ্নেয়-গিরির বিরাট দাহের মত অহর্নিশি জ্বলিয়া উঠিতেছিল, তাহার জ্বালার কথা কহিবার প্রবৃত্তিই তাহার ছিল না। চক্ষু মুদিয়া সে শুধু আপনার জীবন-নাট্যের প্রতি অঙ্ক প্রতি দৃশ্য পর্য্যালোচনা করিত। কি বিচিত্র ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত চলিয়াছে! ভাবিতে ভাবিতে বুকের বেদনা যখন অসহ্য হইয়া উঠে, তখন সে তাহা নীরবে শুধু সহ্য করে। সহ্য করা ছাড়া উপায়ই বা কি? প্রকাশ হইয়া পড়িলে এখনই বেলিসার ও তাহার গৃহিণী অস্থির হইয়া উঠিবে। এই সরল গ্রাম্য নর-নারীর সুগভীর স্নেহ ও অবিরাম সেবায় তাহার প্রাণ সঙ্কুচিত হইয়া পড়িত। কি করিয়া তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া যায়—ভাবিয়া সে কোন উপায়ই স্থির করিতে পারিত না। আজ লেবিদার গৃহিণীর কথায় সে যেন অকূল পাথারে কূলের সন্ধান পাইল! হাঁসপাতাল? ঠিক বলিয়াছে। সেখানেই সে যাইবে! তাহাতে আরোগ্য না মিলুক, এই নিরীহ লোকদুইটিকে মুক্তি দিয়া স্বস্তি ত তাহার মিলিবে। কিন্তু কি করিয়া তথায় যাওয়া যায়? সে যে বহুদূরে। অথচ তাহার এক পা চলিবারও সামর্থ্য নাই

দেওয়ালের দিকে চাহিয়া শুধু সে এই কথাই ভাবিতেছিল। এই দেওয়ালের দিকে চাহিয়াই সে শুইয়া থাকিত; চক্ষু মুদিত না। মূক দেওয়াল যদি সে চোখের ভাষা বুঝিয়া কথা কহিতে পারিত ত সে নিশ্চয় বলিত, সে চোখে শুধু পরিপূর্ণ ধ্বংস ও

সীমাহীন নৈরাশ্যের কাহিনী কে গভীর অক্ষরে রচিয়া রাখিয়াছে।

একাকীই সে আপনার এই বেদনার বোঝা বহন করিত, কাহাকেও তাহার অংশ দিত না। মাদাম বেলিসারের কথায় সে অধরে হাস্তরেখা স্থচিত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিত কিন্তু জলের রেখার মতই সে হাসি নিমেষে মুছিয়া যাইত! এবং মুখের সেই দারুণ শুষ্কতা ভেদ করিয়া রোগের শীর্ণ ছায়া চারিধারে বিকীর্ণ হইয়া পড়িত।

এমনই ভাবে তাহার রোগতপ্ত দিনগুলি কাটিয়া যাইতেছিল। বাহিরে শ্রমজীবি-দলের কর্ম্ম-কোলাহল ধ্বনিয়া উঠিত, জ্যাকের চিত্ত সে শব্দে কাতর হইত! কেন, তাহাকে দুর্ব্বল রোগাতুর করিয়া রাখিয়াছ, ভগবান! কেন সে অপর সকলেরই মত কার্য্যক্ষম, সুস্থ, সবল নহে? জীবনের জটিল গ্রন্থি মোচনে, কাজ-কর্ম্মের মধ্যে কেন তাহার হস্ত আজ নিবিষ্ট রাখ নাই? কাজ! কিন্তু কাহার জন্য আজ জ্যাক কাজ করিবে? কিসের আশায়? মা তাহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল, শেষে সিসিলও তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে! এখন তবে কাহার মুখ চাহিয়া, কাহার সুখের জন্য সে কাজ করিবে? মানুষ হইবে? তাহার আজ আর কে আছে, কি আছে, যাহার আশায় অলস ক্ষুব্ধ চিত্ত উত্তেজনায় আশার রাগিণীতে মাতিয়া উঠিবে? কেহ নাই, কিছু নাই! তবে আর এ জীবনে সংগ্রাম করিয়া লাভ কি? জয়ের প্রয়োজন নাই, যুদ্ধের প্রয়োজন নাই —গা এলাইয়া দিয়া বিপুল পরাজয়ের মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া দাও। ক্ষতি কি?

পরদিন প্রত্যূষে মাদাম বেলিসার জ্যাকের কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখে, দেওয়ালে হাতের ভর দিয়া দাঁড়াইয়া জ্যাক বেলিসারের সহিত কি তর্ক করিতেছে। সে সবিস্ময়ে কহিল, "এ কি জ্যাক? তুমি উঠেছ যে! শুয়ে পড়, শুয়ে পড়—এখনও তুমি ভারী দুর্ব্বল! দাঁড়াবার মেহনৎ সহ্য হবে না।"

বেলিসার কহিল, "দেখ ত! ও কিছুতে কথা শুনবে না, দাঁড়াবেই। ও বলছে, ও হাঁসপাতালে যাবে, এখানে থাকবে না।"

মাদাম বেলিসারের বুকের ভিতরটা অসহ্য বেদনায়, টন্‌টন্ করিয়া উঠিল। চোখের কোণে অশ্রুর বেগ ঠেলিয়া আসিল। কোন মতে তাহা রোধ করিয়া সে কহিল, "কেন জ্যাক? এখানে তোমার কি কষ্ট হচ্ছে, বল। বল জ্যাক, তোমার কি চাই?"

"না, না, মাদাম বেলিসার—কষ্ট কিছুই নয়। তোমরা আমার জন্য যা কচ্ছ, মা-বাপও বুঝি এমন করে না। এমন স্নেহ আর কখনও আমি পাই নি, বাপ কেমন তা ত জানিই নে। তোমাদের এ স্নেহের ঋণ স্বর্গ দিলেও শোধ হয় না। কিন্তু আর আমাকে ধরে রেখো না—ছেড়ে দাও। না, রাখবার চেষ্টাও করো না, আর। আমি মিনতি কচ্ছি, আমায় যেতে দাও। আমি যাবই।"

"কিন্তু কি করে তুমি যাবে? হেঁটে ত যেতে পারবে না—বড় কাহিল যে। তার চেয়ে একটু বল পেলে বরং যেয়ো। তখন বারণ করব না।"

"না, না, আমি এত কাহিল হই নি, এখনও। বেশ যেতে পারব। আস্তে আস্তে যাব। বেলিসার সাহায্য করবে—ওর হাত

ধরে যাব। কেমন বেলিসার, আমাকে নিয়ে যাবে না ? সেই একদিন নাস্তেয় আমি চলতে পাচ্ছিলুম না—পা টলছিল—তোমার কাঁধে ভর দিয়ে হেঁটেছিলুম—মনে পড়ে, বেলিসার ? সেই রকম করে যাব। তা ছাড়া আকাশ, পথ, এ সব দেখবার জন্য আমি অস্থির হয়ে পড়েছি। আর এ বদ্ধ ঘরে অন্ধকারের মধ্যে থাকা যায় না।”

এমন সুদৃঢ় যাহার সঙ্কল্প, তাহাকে বাধা দেওয়া মিথ্যা। নদীর জল যখন স্রোতের বেগে ছুটিতে থাকে, তখন সহস্র বাধাও সে স্রোত আঁটিয়া রাখিতে পারে না। জ্যাককেও কোন মতে ধরিয়া রাখা গেল না। মাদাম বেলিসারের ললাটে চুম্বন করিয়া বেলিসারের স্কন্ধে ভর দিয়া জ্যাক ঘরের বাহির হইল, ধীরে ধীরে দীর্ঘ সোপান অতিক্রম করিল এবং মুক্ত পথে বাহির হইল। বাহিরে আসিয়া বাড়ীটার পানে সে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া রহিল। যে গৃহে তাহার এতদিন কাটিয়াছে, আশার আশ্বাসে যে গৃহ পরিপূর্ণ ছিল, যে জায়গার প্রতি ইষ্টকখণ্ডে তাহার জীবনের সহস্র উজ্জ্বল স্মৃতি মিশিয়া রহিয়াছে এবং যে গৃহে তাহার সমস্ত আশার সমাধিও হইয়া গিয়াছে, সেই গৃহ হইতে বিদায় লইবার সময় তাহার নয়ন-পল্লব আজ সজল হইয়া উঠিল। বিদায়, বিদায়, চির-বিদায়, হে আশা নিরাশা-মণ্ডিত গৃহ, বিদায়! তাড়াতাড়ি সমস্ত দুর্ব্বলতা চাপিয়া ফেলিয়া সে বেলিসারের স্কন্ধে ভর দিয়া অগ্রসর হইল।

অত্যন্ত ধীর মৃদু পদে জ্যাক চলিল। খানিকটা পথ হাঁটিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম—এমনই ভাবে চলিতে হইল। মাথার চুল দীর্ঘ হইয়া মুখে চোখে ঝুলিয়া পড়িয়াছে, ঘামে চুল ভিজিয়া গিয়াছে,—কপাল হইতে টস্ টস্ করিয়া ঘাম ঝরিয়া পড়িতেছে। মাঝে মাঝে চোখে চারিধার কেমন ঝাপসা, আবার পরক্ষণে সব দীপ্ত হইয়া উঠিতেছে। আলো ও ছায়ার সে এক চকিত লীলাভিনয়। জনতার মধ্য দিয়া দুই জন লোক চলিয়াছে; বাহিরের কোলাহল, বাহিরের বৈচিত্র্যের প্রতি তাহাদিগের লক্ষ্যই ছিল না। তাহাদিগকে দেখিলে মনে হয় যেন পারির পশুবলের সহিত সংগ্রাম করিয়া একটি প্রাণী বিধ্বস্ত হইয়াছে; অপরটি তাহাকে জীবন-সংগ্রামের সেই নিষ্ঠুর ক্ষেত্র হইতে অত্যন্ত সাবধানে বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে—ক্ষেত্রের বাহিরে কোথাও যদি তাহার জন্য একটু শান্তি, একটু সেবা মিলিয়া যায়!

জ্যাককে লইয়া বেলিসার যখন হাঁসপাতালে পৌঁছিল, তখন বেলা পড়িয়া গিয়াছে। হাঁস-পাতালের সুদীর্ঘ বারাণ্ডায় সারি সারি বেঞ্চে অসংখ্য লোক বসিয়া। সকালে বিকালে এ জনতার বিরাম নাই! কেহ গুমরিতেছে, কেহ কাঁদিতেছে, কেহ বা সান্ত্বনা দিতেছে! চারিধারে যন্ত্রণার মৃদু গুঞ্জন ধ্বনি! সকলের মুখেই দারুণ উদ্বেগের চিহ্ন! জ্যাক আসিয়া সেই দলে যোগ দিল।

জনতা নিস্তব্ধ ছিল না। সকলেই সুখ-দুঃখের আলোচনা করিতেছিল—বেদনার রাগিণী অজস্র সুরের মূর্চ্ছনায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল! জ্যাক নির্ব্বিকার চিত্তে বসিয়া সেই সকল আলোচনা শুনিতেছিল।

সম্মুখের দ্বার খুলিয়া গেল। ডাক্তার

আসিল। অমনই চারিধারে একটা স্তব্ধতার আবরণ পড়িয়া গেল। পরক্ষণেই ঈষৎ চাঞ্চল্য! ডাক্তার আসিয়া রোগ পরীক্ষা আরম্ভ করিয়া দিল। রোগীর হাত টানিলেই তাহার বুকটা অমনি ধ্বক্ করিয়া উঠে! না জানি, কি শুনিতে হইবে। হয় আরোগ্যের সম্ভাবনা, নয় পৃথিবী হইতে বিদায় লইবার সঙ্কেত! রোগীর নিশ্বাস ফুলিয়া ফুলিয়া উঠে—স্বর কাঁপিয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে! রোগের যাতনার উপর একটা বিভীষিকার কম্পন খেলিয়া যায়।

এক নারী একটি বালককে ক্রোড়ে লইয়া ডাক্তারের সম্মুখে দাঁড়াইল। বালকের বয়স বারো বৎসর হইবে। ডাক্তার নারীর হাত ধরিয়া কহিল, "কি—? কি হয়েছে?"

"আজ্ঞে, আমার কিছু নয় বাবা—অসুখ এই ছেলের।"

"হুঁ। ছেলের? কি—কি হয়েছে? দেখি—চট্‌পট্, দেরী না—দেরী না।"

"এই যে—ও কাণে একটু খাটো আছে বাবা,—আমি বলছি—"

"কাণে খাটো? কোন্ কাণ?"

"দু কাণেই, বাবা।"

"দু কাণেই? আচ্ছা, দেখি—"

"এই যে—দাঁড়াও ত এদুয়া, দাঁড়াও—কোন্ কাণে শুনতে পাও না, বল।"

"আচ্ছা—ওষুধ পাবে।"

"তোমার কি?"

জ্যাককে লইয়া বেলিসার ডাক্তারের সম্মুখে দাঁড়াইল। জ্যাক কহিল, "অসহ্য বেদনা।"

"কোথায়?"

"বুকে। বুক যেন সর্ব্বদা জ্বলছে।"

বেলিসার কহিল, "আর জ্বর।"

ডাক্তার হুঙ্কার দিল, "তুমি থাম।" জ্যাককে কহিল, "হুঁ—তুমি মদ খাও?"

"আজ্ঞে না, আগে কখনও কখনও খেয়েছি!"

"হুঁ—তাই বল! আর কখনও খেও না—বুঝলে!"

"আজ্ঞে না, আর কখনও খাব না।"

"দেখি, জিভ্ দেখি—" জ্যাক জিভ্ বাহির করিল।

ডাক্তার কহিল, "এবার বুকটা দেখব। জামার বোতাম খোল।" জ্যাক বোতাম খুলিল। ডাক্তার যন্ত্র বসাইল। পাঁচ মিনিট ধরিয়া যন্ত্র নাড়িয়া, বুকে পিঠে টোকা দিয়া মুখ গম্ভীর করিয়া ডাক্তার কহিল, "তাই ত—"

বেলিসার কহিল, "কেমন দেখলেন?"

"ভাল না। খারাপ। খুবই খারাপ। একে কি সারা পথ হাঁটিয়ে এনেছ?"

"হাঁ, গাড়ীভাড়ার পয়সা পাব কোথায় বলুন যে—"

"অন্যায় করেছ, ভারী অন্যায় করেছ! এই শরীরে হাঁটাটা ভাল হয় নি!" তখনই ডাক্তার আদেশ দিল, "ডুলি আন।"

বেলিসার কহিল, "কি রোগটা?"

ডাক্তার মৃদু স্বরে কহিল, "রোগ আর কি? কাশীর ব্যামো। সারা দুষ্কর। দেখা যাক চেষ্টা করে।"

ডুলি আসিল। জ্যাককে ডুলির সাহায্যে হাঁসপাতালের সাঁত-দি-দিউ বিভাগে পাঠানো হইল। এ বিভাগটি যক্ষ্মা রোগীদিগের জন্য নূতন খোলা হইয়াছিল। জ্যাককে আনিয়া একটি বিছানায় শোয়াইয়া দেওয়া হইল।

নার্স আসিয়া কহিল, "এঃ, এ যে খালি কতক গুলো হাড়-পাঁজরা একটা চামড়ার খোলে ঢেকে এনেছ! কতদিন অসুখ হয়েছে?" বেলিসার নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "তা আজ্ঞে, খুব বেশী দিন নয়।"

জ্যাক কোন কথা কহিল না। পথের পরিশ্রমে তাহার চোখ ঘুমে ভরিয়া আসিয়াছিল। মুক্ত জানালা দিয়া মৃদু বায়ু ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল। সেই বাতাস যেন জ্যাকের শ্রান্ত ললাটে ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিল। জ্যাক ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুমাইয়া সে স্বপ্ন দেখিল।

—এক সুদীর্ঘ পথ—কোথায় গিয়া তাহা শেষ হইয়াছে, কিছুই বুঝা যায় না—সীমাহীন, অফুরন্ত পথ! সেই পথে অসংখ্য লোক চলিয়াছে। সে-ও চলিয়াছে! কোথায় চলিয়াছে, তাহা সে জানে না! পথের আরম্ভটা যেন কতক সেই এতিয়োর পথের মতই! তবে এতিয়োর পথ এমন দীর্ঘ নহে! ঐ দূরে তাহার অগ্রে ও কাহারা চলিয়াছে? এ কি—তাহার মা—আর—? সিসিল। ইদা ও সিসিল অগ্রে চলিয়াছে—এই পথেই! জ্যাক ডাকিল, "মা," "সিসিল—"। কেহ সাড়া দিল না, কেহ ফিরিয়াও চাহিল না! চলিয়াছে ত চলিয়াছেই! জ্যাকও চলিতে লাগিল। সহসা কতকগুলা গাছপালার আড়াল পড়িল। মা ও সিসিলকে আর দেখা গেল না। জ্যাক আপনার গতি বাড়াইয়া দিল। ঐ যে আবার দেখা যায়! ঐ যে মা আর সিসিল! সহসা আবার মধ্যে প্রকাণ্ড অন্তরাল রচিত হইয়া উঠিল। কল ও বিশাল যন্ত্রাদির বিরাট ব্যবধান! জাহাজ, রেল, এঞ্জিন তাহাদিগের বিপুল দেহ লইয়া এক দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরের সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে। জ্যাক সেই প্রাচীর লঙ্ঘনের চেষ্টা করিল। ঘর্ঘর রব করিয়া কলের চাকা ঘুরিতেছে! জ্যাকের পা তাহাতে বাধিয়া গেল! তাহার দেহ চূর্ণ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল। মাংসগুলা তাহার দেহ হইতে টুকরা-টুকরা হইয়া খসিয়া পড়িল। শীর্ণ কঙ্কালটা চাকার মধ্য হইতে ছিটকাইয়া পড়িল। তাহার পর নিমেষে দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইল।

—চারিধারে অগ্নিকুণ্ড! দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিতেছে—বুঝি এখনই তাহাকে গ্রাস করিবে! সঙ্গে সঙ্গে একটা উৎকট গন্ধ—উঃ, অসহ্য! জ্যাক পলাইয়া বাঁচিল।

—আবার নূতন দৃশ্য। জ্যাক যেন দশ বৎসরের ছোট ছেলেটি। মাদাম সেলের গৃহ হইতে বাহির হইয়া বনে সে পাখীর সন্ধানে চলিয়াছে। গলি বাঁকিতেই সম্মুখে সে দেখে, এক ডাইনী বুড়ী। কাঠের বোঝা ফেলিয়া তাহার উপর বুড়ী বসিয়াছিল—যেন সে কাহার প্রতীক্ষা করিতেছে! তাহাকে দেখিয়া জ্যাক যেমন পলাইবে, অমনই বুড়ীটা তাহাকে ধরিবার জন্য উঠিল। জ্যাক ছুট দিল; বুড়ীও তাহার পশ্চাতে ছুটিল। অবিশ্রাম গতিতে জ্যাক ছুটিতে লাগিল; বুড়ীরও ছুটের বিরাম নাই! এইবার বুঝি বুড়ী তাহাকে ধরিয়া ফেলে! শেষে অবসন্ন হইয়া জ্যাক বসিয়া পড়িল। বুড়ী আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। তখন দুইজনে যুদ্ধ চলিল, ভীষণ যুদ্ধ। জ্যাকের পরাজয় হইল। বুড়ী জ্যাককে তাহার

কাঠের বোঝার সহিত আঁটিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। জ্যাকের বুকে খচ্ খচ্ করিয়া কতকগুলা কাঠের খোঁচা ফুটিয়া গেল। যন্ত্রণায় সে চীৎকার করিয়া উঠিল, "মা গো!"

চমকিয়া জ্যাকের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তখন ভোর হইয়াছে। জ্যাক দেখিল, তাহার বিছানার পার্শ্বে নার্স। নার্স কহিতেছে, "নাও, এই ওষুধটা খেয়ে ফেল ত!"

জ্যাক ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া নার্সের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। এ ত স্বপ্ন নহে! তবু বুকের উপর এ কিসের বোঝা চাপিয়া রহিয়াছে—এক অসহ্য ভার! তাহার চাপে নিশ্বাসও যে রুদ্ধ হইয়া আসে!

দশম পরিচ্ছেদ

উপেক্ষিত

জ্যাক বালিশে ভর দিয়া বসিল; ঔষধ পান করিল। নার্স কহিল, "তোমার নাম কি?"

"জ্যাক।"

"কি কাজ কর, তুমি?"

"আমি কারিকর।"

"তোমার কেউ নেই—যাদের দেখতে চাও?"

"না" বলিয়া জ্যাক একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

নার্স আর কোন কথা কহিল না। জ্যাকের দীর্ঘনিশ্বাসে সে বুঝিল, তাহার চিত্তের তারে সে একটা নিষ্ঠুর আঘাত দিয়া ফেলিয়াছে, তাই এ প্রসঙ্গ চাপা দিবার অভিপ্রায়ে সে কহিল, "এবার তোমায় কিছু খেতে হবে। কাল সারা রাত্রি ঘুমিয়েছ। এটা ভাল লক্ষণ অবশ্য।"

জ্যাক সবে মাত্র কিছু আহার করিয়াছে—এমন সময় ডাক্তার ও তাঁহার পশ্চাতে এক দল ছাত্র আসিয়া জ্যাকের সম্মুখে দাঁড়াইল। ডাক্তার জ্যাকের বুকে যন্ত্র রাখিয়া কাণ পাতিয়া তাহার মধ্য দিয়া বুকের বিচিত্র ধ্বনি শুনিল—পরে ছাত্রদিগের হস্তে যন্ত্র দিয়া কহিল, "কি কি পাচ্ছ, বল সব" ছাত্রের দল একে একে আওড়াইয়া গেল—"সোঁ সোঁ, কড়িক্ কড়িক্, ঘোঁ-ঘোঁ শব্দ! ফুস্‌ফুসের মধ্যে হাওয়া ঢুকছে—যক্ষ্মা!"

ডাক্তার জ্যাককে কহিল, "আজ রবিবার। কেউ তোমাকে দেখ্‌তে আসবে কি?"

জ্যাক কহিল, "না।" ডাক্তার ও ছাত্রের দল চলিয়া গেল। অদূরে বেলিসার ও মাদাম বেলিসার দাঁড়াইয়াছিল; তাহারা তখন নিকটে আসিল। আঙুরের মোড়ক খুলিয়া, তাহা হইতে কয়েকটা আঙুর লইয়া জ্যাকের হাতে দিয়া, বেদানা ভাঙ্গিয়া দানা বাহির করিতে করিতে, মাদাম বেলিসার কহিল, "এখন কেমন আছ, জ্যাক? একটু ভাল বোধ হচ্ছে?"

বেলিসার স্ত্রীকে সব কথা খুলিয়া বলিয়াছিল। ডাক্তার বলিয়াছে, রোগ ভীষণ, এ রোগে জ্যাকের পরিত্রাণ নাই। তবে যে কয়টা দিন সে বাঁচিয়া থাকে, তাহাই লাভ। দারুণ যক্ষ্মার হাতে কোনদিনই কোন লোক পরিত্রাণ পায় নাই—জ্যাকেরও সেই দারুণ যক্ষ্মা হইয়াছে। কোনমতে অন্তরের বেদনা অন্তরে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া মাদাম বেলিসার সহজ ভাবেই জ্যাকের সহিত কথাবার্ত্তা কহিল; কিন্তু জ্যাক কোন উত্তর দিল না; শুধু ম্লান নয়নে সে তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

বেদানার কয়েকটি দানা জ্যাকের মুখে দিয়া তাহার দীর্ঘ কেশের মধ্যে হাত বুলাইতে বুলাইতে মাদাম বেলিসার কহিল, "শোন জ্যাক, তোমার মাকে খপর দিয়ে আনাব কি ?"

জ্যাকের ম্লান চক্ষু সহসা দীপ্ত হইল, পাণ্ডু অধরে হাসির ক্ষীণ জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল। হাঁ! ইহাই ত সে চায়! মাকে শুধু একবার দেখিবার সাধ হয়! সমস্ত প্রাণ আজ মাকে দেখিবার জন্য তৃষিত হইয়া উঠিয়াছে! কিন্তু মা কি আসিবে? যদি মা জানিতে পারে যে জ্যাক মরিতে বসিয়াছে, আর বাঁচিবে না—তাহা হইলে—? তাহা হইলে কি একবার না আসিয়া মা থাকিতে পারিবে? না, না, মা এত নিষ্ঠুর নয়! মা যদি আসে, তবে জ্যাকের এ বুকের বেদনাটাও বুঝি কিছু শান্ত হয়! মাদাম বেলিসার বলিল, "আমি তাঁকে নিয়ে এখনই আসব, জ্যাক"। মাদাম বেলিসার চলিয়া গেল। বেলিসার চুপ করিয়াই দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার বন্ধু, তাহার মিতে, তাহার সঙ্গী, জ্যাক—! সেই জ্যাক চিরদিনের জন্য তাহাদিগকে ছাড়িয়া যাইবে? বেলিসারের হৃদয়ের মধ্যে একটা দম্‌কা ঝড় যেন ঠেলিয়া ফুলিয়া গর্জ্জিয়া উঠিতেছিল!

মাদাম বেলিসার আর্জেন্তঁর গৃহে গিয়া কাহাকেও তথায় দেখিতে পাইল না। ভৃত্য কহিল, সকলে গ্রামে বেড়াইতে গিয়াছে —কখন ফিরিবে, তাহার কিছুই ঠিকানা নাই! কথাটা মাদামের বিশ্বাস হইল না। এই শীতের দিনে গ্রামে বেড়াইতে গিয়াছে? না! বেড়াইতে বাহির হইয়াছে? কখনও না! অসম্ভব! কিন্তু কি করা যায়? মাদাম বেলিসার নিতান্তই নিরাশ চিত্তে ফিরিয়া আসিল।

তাহাকে ফিরিতে দেখিয়া জ্যাক কহিল, "কি? মা এল না! আমি জানতুম, মাদাম বেলিসার যে, মা আসবে না।" কি বলিয়া সান্ত্বনা দিবে, মাদাম বেলিসার এমন একটি কথাও খুঁজিয়া পাইল না।

জ্যাক তখন চক্ষু মুদিয়া আর এক কথা ভাবিতে লাগিল। সে কথা বড় ভাল লাগে। সিসিলের কথা! সিসিল, কোথায় তুমি? তোমার জ্যাকের যে আজ প্রাণ বাহির হইয়া যায়! একবার আসিয়া দেখিবে না? সিসিল! জ্যাকের চোখের কোণ বহিয়া একটি দুইটি করিয়া অশ্রুর বিন্দু গড়াইয়া পড়িল।

মাদাম বেলিসার কহিল, "কেঁদো না জ্যাক, আমি আবার যাচ্ছি। যেমন করে পারি, তাকে নিয়ে আসবই! দেখি, সে কত বড় পাষাণী মা।"

"না, না, কাজ নেই—সে আসবে না, মা আসবে না, মাদাম বেলিসার!"

কিন্তু মাদাম বেলিসার সে কথা কাণেই তুলিল না—ইদার সন্ধানে আবার বাহির হইয়া গেল।

সার্লটি ও আর্জেন্ত তখন সবেমাত্র গাড়ী হইতে নামিয়াছে, এমন সময় উন্মাদিনীর মত ছুটিয়া আসিয়া মাদাম বেলিসার তাহাদিগের সম্মুখে দাঁড়াইল। রোষে তাহার সর্ব্ব শরীর জ্বলিতেছিল। তীব্র তীক্ষ্ণ স্বরে সে ইদাকে কহিল, "মাদাম, তুমি এখনই আমার

ইদা চমকিয়া উঠিল। "এ কি—মাদাম বেলিসার!"

"হাঁ, আমি। তোমার ছেলে জ্যাক,—তার ভারী অসুখ। বুঝি সে বাঁচে কি না—একবার তোমায় দেখবার জন্য সে অস্থির হয়ে উঠেছে! এস।"

আর্জেন্ত কহিল, "বেরো মাগী, ঢং করতে এসেছ—বটে! রোজ রোজ চালাকি পেয়েছ? অসুখ করে থাকে—বেশ, আমরা ডাক্তার পাঠাচ্ছি—তা বলে এঁকে যেতে হবে, এমন কোন কারণ নেই।"

মাদাম বেলিসার কাঁদিয়া ফেলিল; কাঁদিয়া কহিল, "ওগো, ডাক্তারের কোন ভাবনা নেই গো—অনেক ডাক্তার তাকে দেখছে এখন! সে যে হাঁসপাতালে।"

"হাঁসপাতালে?" ইদার স্বর রুদ্ধ হইয়া গেল।

"হাঁ, হাসপাতালে। কিন্তু আর বড় বেশীক্ষণ থাকচে না। যদি তুমি দেখতে চাও ত মিছে কথা কাটাকাটি না করে এখনই এস।"

আর্জেন্ত ইদার ভাব লক্ষ্য করিয়া কহিল, "এস, এস, সাল টি,—ওর কথা শোন কেন? হঠাৎ এমন গুরুতর অসুখ হল যে—"

তাহার কথায় বাধা দিয়া মাদাম বেলিসার কহিল, "ওগো, বাজে কথার সময় নেই, এখন। তা ছাড়া আমি তোমার জন্য আসিনি এখানে, শুধু বেচারা জ্যাকের বড় সাধ, তোমায় দেখে—তার সেই শেষ সাধ যদি মিটুতে পারি, তাই আমি এসেছি। ওঃ ভগবান, ভগবান, এমন মার পেটেও তুমি ছেলে দিয়েছ!"

ইদার আর সহ্য হইল না। সে বলিল, "চল, চল, আমি এখনই যাব।"

আর্জেন্ত ডাকিল "ইদা——"তাহার স্বর রূঢ়, তীব্র।

ইদা কহিল, "না, না, আমায় ক্ষমা কর। আমার জ্যাককে শুধু একটি বার আমি দেখব। একটি বার আমায় ছুটি দাও—"

মাদাম বেলিসারের হাত ধরিয়া ইদা তখনই গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। গাড়ী ছুটিল।

মাদাম বেলিসার যখন হাঁসপাতাল হইতে আর্জেন্তর গৃহের উদ্দেশে যাত্রা করিল, ঠিক তাহার পর মুহূর্তে এক কিশোরীর হাত ধরিয়া এক বৃদ্ধ হাঁসপাতালে জ্যাকের কক্ষের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ভাবনায় উভয়েরই বুক কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। কৈ জ্যাক? সে কেমন আছে?

নিমেষে জ্যাকের শয্যাপ্রান্তে আসিয়া তাহারা দাঁড়াইল। কিশোরী জ্যাকের তপ্ত ললাট স্পর্শ করিয়া ডাকিল, "জ্যাক, জ্যাক,—দেখ, চেয়ে দেখ, আমি এসেছি, আমি সিসিল।"

সত্যই সিসিল! সত্যই সে আসিয়াছে। জ্যাক চক্ষু মেলিল। এই যে, সেই সুন্দর মুখখানি,—শুধু অশ্রুর কুয়াশায় তাহা ঈষৎ ম্লান! মৃদু হাসিয়া জ্যাক আপনার দুই হাত বাড়াইয়া দিল। দুই হাত দিয়া সে সিসিলের কণ্ঠ বেষ্টন করিল! আঃ, সেই কোমল স্পর্শ,—কি মধুর!

ধীরে ধীরে সিসিলের মুখ আপনার মুখের কাছে টানিয়া আনিয়া মৃদু কণ্ঠে জ্যাক ডাকিল, "সিসিল—"

"কেন জ্যাক ?"

স্থির দৃষ্টিতে জ্যাক কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া সিসিলের মুখের পানেই চাহিয়া রহিল; পরে আবার ধীরে ধীরে ডাকিল, "সিসিল—"

"কি বলছ জ্যাক ? বল—"

"এখনও তুমি আমায় ভালবাস ?"

"বাসি জ্যাক, বড় ভালবাসি। তোমায় ছাড়া আর কাউকে কখনও ভাল বাসিনি,—কাউকে না।"

মৃত্যুর কর-স্পর্শে মমতা-হীন কঠিন এই রোগ-কাতর গৃহে এমন মধুর সুর পূর্ব্বে আর কখনও ধ্বনিত হয় নাই! ভালবাসি! জীবনের শেষ সীমা-রেখায় আসিয়া যে দাঁড়াইয়াছে, তাহার কাণে এই অক্ষরগুলা কি বিচিত্র মাধুরী ঝঙ্কৃত করিয়া তুলে!

"তুমি এসেছ সিসিল,—আমায় দেখতে এসেছ ? আমায় তুমি এত ভালবাস ? আর তবে, আমার কোন দুঃখ নেই, কোন অভাব নেই! এখন আমি হাসি মুখে মরতে পারব।"

ডাক্তার রিভাল কহিলেন, "মরবে ? ছি, ও কি কথা জ্যাক ? ভয় কি ? সেরে উঠবে। আমাদের সেবায় তুমি সেরে উঠবে। তোমার জ্বর ত এখন নেই! আজ ত তুমি ভালই আছ—জ্যাক—মুখখানিও বেশ দেখাচ্ছে!"

সত্যই আজ জ্যাকের মুখে স্বাস্থ্যের একটা উজ্জ্বল আভা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, অনেকখানি পাণ্ডুতা ঘুচিয়া গিয়াছিল। কিন্তু হায়, নিবিবার পূর্ব্বে মাটির দীপও এমন উজ্জ্বল ভাবে মুহূর্ত্তের জন্য জ্বলিয়া উঠে! অস্ত যাইবার ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে সূর্য্য—প্রভাতের তারা আকাশের গায় মিলাইয়া যাইবার পূর্ব্বক্ষণে অতিরিক্ত শুভ্রতায় ভরিয়া উঠে! জ্যাকের মুখও আজ তেমনই আভায় পরিপূর্ণ হইয়াছিল।

জ্যাক আপনার মুখের উপর সিসিলের হাত চাপিয়া রাখিল—সিসিলের মুখের দিকে আবার কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া জ্যাক কহিল, "আমার জীবনে যা কিছু অভাব ছিল, তুমি তা পূর্ণ করেছ! তুমি আমার কে ছিলে, তা কি জান, সিসিল ? আমার বন্ধু, আমার ভগ্নী, আমার স্ত্রী, আমার মা—এক কথায় আমার সর্ব্বস্ব!"

কিন্তু এ আনন্দ-জ্যোতি সহসা ম্লান হইয়া গেল। সিসিলের মুখের পানে চাহিয়া থাকিতে থাকিতেই জ্যাকের চক্ষু মুদিয়া আসিল। তাহার বিবর্ণ মুখের উপর মৃত্যুর ছায়া গাঢ় ভাবে নামিয়া আসিতেছিল। সিসিল তাহা লক্ষ্য করিল; ডাক্তার রিভালের দিকে চাহিয়া সে ডাকিল, "দাদা—"

"চুপ।"

সিসিল নিষেধ মানিল না, আবার ডাকিল, "জ্যাক—"

ধীরে জ্যাকের ওষ্ঠ নড়িল। মুদিত নয়ন-পল্লব একবার শুধু কাঁপিয়া উঠিল। জ্যাক কথা কহিবার চেষ্টা করিল—কথা বাহির হইল না। মাথা তুলিবার চেষ্টা করিল, শুধু একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল।

* * *

এমন সময় বাহিরে একটা কলরব উঠিল। "দাও, দাও, যেতে দাও—"নারীকণ্ঠে মিনতির একটা সুর উঠিল—এবং সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের

করিল। ইদা ও মাদাম বেলিসার। সঘন নিশ্বাসে ইদা কহিল, "কৈ—কৈ আমার জ্যাক?"

মাদাম বেলিসার কহিল, "এস—দেখবে বৈ কি! এমন মার পেটেও এমন ছেলে জন্মায়!"

ইদা আসিয়া জ্যাকের শয্যার সম্মুখে দাঁড়াইল। নিস্তব্ধ ঘর। জ্যাকের বুকের উপর মুখ ঢাকিয়া সিসিল শুধু নীরবে রোদন করিতেছিল। ডাক্তার রিভাল নিশ্চল জড় পুত্তলির মত জ্যাকের মুখের পানে চাহিয়া পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিলেন। ইদা ডাকিল, "জ্যাক,—বাবা আমার—"

ডাক্তার রিভাল চমকিয়া ফিরিয়া চাহিলেন, কহিলেন, "চুপ কর।"

এই জ্যাক! ইদার অত সাধের জ্যাক! এমন বিবর্ণ মলিন মুখ,—নিস্পন্দ দেহ—হাত দুইটি এলাইয়া পড়িয়াছে—জীবনের চিহ্নও যে দেখা যায় না।

কৈ! নিশ্বাস পড়ে না ত! তবে—তবে কি জ্যাক নাই? ইদার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল।

ডাক্তার ডাকিলেন, "জ্যাক—যাদু—দেখ—মা এসেছে—তোমার মা—"

ইদা কম্পিত স্বরে কহিল, "একবার চেয়ে দেখ জ্যাক—আমি এসেছি, তোমার পাষাণী মা—"

কিন্তু কে সাড়া দিবে?

ডাক্তারের দিকে চাহিয়া রুদ্ধ শ্বাসে ইদা কহিল, "তবে কি ওগো, বাছা আমার নেই—সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে?"

"না।" ডাক্তারের স্বর দৃঢ়, তীব্র! ডাক্তার কহিলেন, "সর্ব্বনাশ নয়, কড়ায় গণ্ডায় তোমার পাওনা চুকিয়ে দিয়ে সে আজ ছুটি পেয়েছে, তার সকল যাতনার শেষ হয়ে গেছে।"

সমাপ্ত।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

প্রাচ্য শিল্পসভার ষষ্ঠবার্ষিক প্রদর্শনী

প্রদর্শনী গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র সিদ্ধিদাতা শ্রী গণপতির মূর্ত্তি প্রথম চোখে পড়ে; সেই বদান্য গম্ভীর ধীর প্রসন্ন দেবতা আমাদের দেশের তরুণ শিল্পীগণের সকল দুরূহ সাধনা সফল করুন, এই প্রার্থনা করিয়া আমরাও অগ্রসর হইলাম। দক্ষিণ ভাগে শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রিত মাতৃমূর্ত্তি আমাদের হৃদয়ের একান্ত ভক্তি আকর্ষণ করিয়া লইল। সেই প্রশান্ত প্রশস্ত ললাটের অরুণ উজ্জ্বল সিন্দূর দীপ্তি, উদার নেত্রের করুণ কোমল দৃষ্টির স্নেহের অভিষেক, বরাভয় চতুর্হস্তের সুমঙ্গল আশীর্ব্বাদ, জীবনের সকল অবসাদ দূর করিয়া আশার আলোকে সম্মুখের পথ অবারিত করিয়া দেখাইয়া দিল। আমাদের মা যে একাধারে ভারতী কমলা অন্নপূর্ণা মহামায়া এবং মহাশক্তি, নিপুণ চিত্রকর কেমন সহজ সরল ভাবে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। এক সময়ে কোন রাজ-প্রতিনিধি-বিশেষের আদেশে এই ছবিখানির প্রচার রোধ করা হইয়াছিল। এখন আবার সেই ছবিখানিই বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তা মহোদয়ের সম্পত্তি দেখিয়া কত আনন্দ হইল। ইহা কেবল চিত্রকরের গুণপনার প্রমাণ নয়, সৌন্দর্য্য প্রভাবের সহজ অধিকার প্রাপ্তি নয়, ইহা তাহারও অধিক আরো কিছু, আমাদের মাতৃভূমির সম্মানের চিরন্তন গৌরব প্রচার—ভারত-মহিমার অযাচিত সাক্ষ্য। এই ছবিখানির সুলভ সংস্করণ যাহাতে প্রত্যেক ভারতবাসীর সম্পত্তি হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক, আশা

ভারতী

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর অঙ্কিত

"বিনোদিনী"

শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত

করি প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষগণ এ বিষয়ে মনোযোগ করিবেন।

তরুণ শিল্পীগণের প্রত্যেক সুন্দর ছবির কথাই বিশেষ করিয়া বলিবার ইচ্ছা হয়। কিন্তু স্থান কাল

অবলোকিতেশ্বর

(ধাতুমূর্ত্তি)

দুইই সংক্ষেপ, তাই সে স্বাভাবিক প্রলোভন সম্বরণ করিতে হইল।

শ্রীমান শৈলেন্দ্রনাথ দে কর্ত্তৃক চিত্রিত ছবিগুলির বর্ণ সৌকুমার্য্য, রেখাঙ্কণ, দুইই নিপুণতা প্রকাশক।

বিষ্ণু (ধাতুমূর্ত্তি)

বিশেষ করিয়া শকুন্তলা চিত্রে তাপস কন্যার মূক জীবের প্রতি সরল প্রীতির মধুরতা, আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিল, ইঁহার কৃষ্ণ যশোদা খানিও সুন্দর।

শ্রীমান সুরেন্দ্রনাথ কর নিতান্ত বালক, অতি অল্প দিনই এ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন; তবুও তিনি যেরূপ প্রতিভা, ক্ষমতা ও কারুকৌশল প্রকাশ করিয়াছেন

তাও বিশেষ আশাজনক। তাঁহার শ্বেতাম্বরা, শ্বেতমাল্য ভূষণা, শ্বেতবীণাহস্তা, শ্বেতপদ্মাসনা, ভারতী, নিরাময় শুভ্রতার প্রত্যক্ষ প্রকাশ—উজ্জ্বল হইয়াও কোমল, চন্দ্রালোক এবং গন্ধরাজ-দলের লাবণ্যের মত সুকুমার।

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রাবলীর প্রশংসা করা বাহুল্য। তাঁহার অঙ্কিত রঙ্গালয় নায়ক নায়িকার বিদ্রূপ চিত্রগুলি, * বিরূপতাকেও যেন সুন্দর করিয়াছে, তাঁহার বিদ্রূপ রূঢ় নয় রহস্য-মধুর। হাসি পায়, রাগ ধরে না। শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগের ছবি, প্রথম প্রেমের অস্ফুট শ্যামছায়ার প্রকাশ, যাহা চাই, যাহাকে চাই তখনও সবই অনির্দ্দিষ্ট; কল্পনার ছায়া পথে পথহারা; হৃদয়ে নেত্রে তখনও সুস্পষ্ট হইয়া ওঠে নাই, পুষ্পধনুর তূনীরে লুক্কায়িত, বাসন্তী সৌন্দর্য্যবিলীন। তাই ফুল দিয়াই তাহার আকার গড়িতে চাই, তেমনি বর্ণ সুষমা মনে জাগিয়া ওঠে, সেই সুকুমার গন্ধ কত আশার আবেগে হৃদয়কে ব্যাকুল করিতে থাকে। সে ভাষাহীন বিহ্বলতা বিশ্ব সৌন্দর্য্যে ভালবাসার ধনকে খুঁজিয়া মরে, গড়িয়া তুলিতে পারে না। বৃন্দাবন পথে রাধিকার কনকচম্পক পেলব ললিত মূর্ত্তি, শ্যামসুন্দরের চিত্র দেখিয়া + শ্রীমতীর মুগ্ধ অভিনিবেশ, দুইখানি ছবিই বড় সুন্দর। পুরী সমুদ্র-তীরে সান্ধ্যঝড়ের ছবিখানি তাঁহার অঙ্কিত একমাত্র প্রাকৃতিক দৃশ্য চিত্র—ঊর্দ্ধে আকাশ জমাট মেঘে কালো করাল, দূরে পৃথিবীর বুকের পাশে আছড়াইয়া আছড়াইয়া সুনীল সিন্ধুতরঙ্গের মুখ ফেনশ্বেত; আর মধ্যে শূন্যে অদৃশ্য বাতাস, ঝড়ের আবর্ত্তে ধূলায় ধূসর হইয়া প্রত্যক্ষ হইয়াছে। এই ছবিখানি আকারে ক্ষুদ্র হইয়াও ভাব সৌন্দর্য্যের অসীমতায় বিরাট ও সম্পূর্ণ।

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর রামায়ণ-চিত্রাবলী সংখ্যায় গতবারের অপেক্ষা অনেক বাড়িয়াছে, এগুলি সম্পূর্ণ ও সমাপ্ত না দেখিলে মনের তৃপ্তি হইবে না। এছবিগুলিও সহজ লভ্য হওয়া আবশ্যক।

শ্রীমান মকুলচন্দ্র দে কর্ত্তৃক রচিত ছবি প্রায় সকলগুলিই সুন্দর ইঁহার তুলিকার বর্ণবিকাশ বড় চিত্তহারী হইয়াছে। ইহার মধ্যে "কোথায় আলো", "ছায়া ও কায়া" উল্লেখযোগ্য।

শ্রীযুক্ত দুর্গেশচন্দ্র সিংহের "মালিকা" "মানিনী" এবং "সন্ধ্যার মেঘ" বড় সুন্দর। সন্ধ্যার মেঘে রং ফলিয়াছে ভাল, স্নিগ্ধ উজ্জ্বল ছায়ালোকের সন্নিপাত বড় নয়ন-ভুলান হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রত্যেক ছবিখানিই বিশেষত্বব্যঞ্জক। ইঁহার রেখাঙ্কন কৌশল আশ্চর্য্য, দৃঢ়তা-প্রকাশক, দুএকটানে অনেকখানি

কালী (শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় অঙ্কিত)

* এই চিত্রের কয়েকখানি এবৎসরে ভারতীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। + এই চিত্র কার্ত্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

দেখাইয়া দেন। জতুগৃহ দাহ পরে।মাতৃসহায় পঞ্চ পাণ্ডবের পলায়ন দৃশ্য অতি নিপুণতার সহিত চিত্রিত। রাত্রির নিবিড় অন্ধকার পটের গাত্রে অগ্নির গভীর শোণিত বর্ণ, কি উগ্র নিষ্ঠুরতার অভিব্যক্তি! ভ্রাতাগণের গমনের ভঙ্গীতে ত্রস্ত ব্যাকুলতা অথচ মুক্তির অভয় সুন্দররূপে প্রকাশলাভ করিয়াছে। "আলস্তে"র ছবিখানি চমৎকার। কর্ণকুন্তী চিত্রে, কর্ণের সবল, দৃঢ়, বীরযোগ্য, উন্নতবপু, তাঁহার মহৎ উদার মনেরও পরিচায়ক। অস্তগামী সূর্য্যের আরক্ত মহিমার মধ্যে বিদায়ের প্রশান্ত বিষাদ এবং মাতা কুন্তীর সঙ্কুচিত কুণ্ঠিত কাতর মূর্ত্তি সুন্দর জাগিয়াছে। "বিনোদিনী" চিত্র শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের "তুরুপ" গল্পের "বিনোদিনী"র চরিত্র লইয়া অঙ্কিত। এখানিও উল্লেখযোগ্য।

শ্রীমান অসিতকুমার হালদারের "জলকেলি" ছবিখানি সুন্দর। ইহার বিভিন্ন মূর্ত্তি-সমাবেশ, ইহার দৃষ্টি কৌশল এবং সৌন্দর্য্য বোধ বিশেষ-রূপে জ্ঞাপন করে। "রোগী যথা নিম খায়" এবং "গোয়ালিনী" আমাদের বড় ভাল লাগিয়াছে।

শ্রীরামেশ্বর প্রসাদের "মেঘমল্লার" অতি সুন্দর। আকাশে কালো মেঘের কি উদ্বেল উচ্ছ্বাস! তাহারি তালে বিরহিনীর হৃদয়ও যেন সাড়া দিয়াছে, তাই বিস্ফারিত চক্ষে কি দীপ্ত আগ্রহের প্রকাশ!

শ্রীমান ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদারের "হরপার্ব্বতী" ও "চন্দ্রকলা" অতি সুন্দর। বিষধর সর্প প্রিয়জনের প্রিয় বলিয়া

নাজির আলিবেগ

পার্ব্বতী তাহাকে ছোট ছেলেটির মত তুলিয়া ধরিয়া আদর করিতেছেন। ইংরাজীতে একটি প্রবাদ আছে, "আমাকে ভালবাস ত আমার কুকুটিকেও ভালবাসিতে হইবে;" পার্ব্বতীর এ আদর তাহার অপেক্ষাও অধিক গভীর; এ শুধু আশ্রিত প্রীতি নয়, বিপদকে বরণ; ভয়ানককে ভালবাসায় সুমধুর করিয়া শিরে ধার্য্য করা।

হাকিম মহম্মদ খাঁ রচিত 'বন্দী দারা' ছবিখানি গভীর ভাবব্যঞ্জক। বিষয়ের মোহ কেমন করিয়া জীবনের সকল মাধুর্য্য নষ্ট করে, সকল প্রীতির বন্ধন ছেদন করে, মানুষ মনুষ্যত্ব ভুলিয়া শ্মশানচারী শ্যেন শকুনির ন্যায় নিদারুণ, নিষ্ঠুর হৃৎপিণ্ড-লোভী হইয়া পড়ে, তাহা নিপুণভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। আবর্ত্ত রচনা করিয়া শকুনিগুলি যে প্রমত্ত লোভে দ্রুত নামিয়া আসিতেছে, চারিদিকে উড়িয়া পড়িতেছে দেখিলে মনে আতঙ্কের সঞ্চার হয়।

সমি উজ্জমা রচিত মোগল যোদ্ধার ছবিখানি বীরোচিত ভঙ্গীতে দর্শকের দৃষ্টি সহজেই আকর্ষণ করিয়া লয়। ইঁহার রচিত কয়েকখানি প্রাচীন চিত্রের নকল প্রদর্শিত হইয়াছে। সেগুলির সূক্ষ্ম কারুকার্য্য বিশেষ প্রশংসনীয়।

শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় অঙ্কিত "কালী" করাল ভাবের, উগ্র-সাহসের, সুন্দর চিত্র; ইহার নাম রণচণ্ডী হওয়া উচিত ছিল।

ইহা ভিন্ন অনেক পুরাতন চিত্র, ধাতুমূর্ত্তি, তৈজসপত্র প্রদর্শনী গৃহে স্থানলাভ করিয়াছে। তাহার মধ্যে "নাজির আলিবেগ"এর প্রতিকৃতি এবং বিষ্ণু ও অবলোকিতেশ্বর ধাতুমূর্ত্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

গতবৎসর যাহা দেখিয়াছিলাম তাহা অপেক্ষা এ বৎসর অনেক উন্নতি দেখিলাম। সকলেই নিজস্ব ভাব প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছেন—এই চেষ্টা সর্ব্বাপেক্ষা আশাপ্রদ। অনুকরণ সহজ ব্যাপার, আত্মভাব বিকাশই কঠিন সাধনা। তরুণ শিল্পীগণ সেই দুর্গম পথের পথিক হইয়াছেন দেখিয়া, মনে যুগপৎ আশা ও আনন্দের উদয় হইল। সুন্দর এবং মহৎ ভাবব্যঞ্জক ছবিগুলি যাহাতে সাধারণের সহজলভ্য হয় তাহা করা অত্যন্ত আবশ্যক। এমন প্রদর্শনী বৎসরে একবার কেন, মাসে একবার হইলেও অধিক মনে করি না। সাধারণের রুচি বিকারের চিকিৎসা করা, প্রতীকার করা এবং সুরুচির উন্নতিসাধন করিবার এমন প্রকৃষ্ট উপায় আর হইতে পারে না।

শিল্পীগণের অঙ্কিত প্রায় সমস্ত ছবিই এবৎসর বিক্রয় হইয়া গিয়াছে দেখিয়া আহ্লাদিত হইলাম। পুরাতনের স্মৃতি বর্ত্তমানে আমাদিগকে উদ্যোগী ও ভবিষ্যতের আশায় উৎসাহিত করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর করুক এই আমাদিগের একান্ত প্রার্থনা।

সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা

সম্প্রতি "সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা" নামক পুস্তিকাকারে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ আমার হস্তগত হয়েছে। লেখক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম. এ, আমার সতীর্থ। একই যুগে, একই বিদ্যালয়ে, একই শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকদের মধ্যে পরস্পরের মনোভাবে মিল থাকা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। বোধহয় সেই কারণ "ভারতী" পত্রিকায় প্রকাশিত বঙ্গভাষা সম্বন্ধীয় আমার প্রবন্ধটির সঙ্গে উক্ত প্রবন্ধের যে শুধু নামের মিল আছে তা নয়, মতামতের অনেকটা মিল আছে। এমন কি স্থানে স্থানে আমরা উভয়েই একই যুক্তি প্রায় একই ভাষায় প্রকাশ করেছি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ললিত বাবুর প্রবন্ধ হতে একটি প্যারা উদ্ধৃত করে দিচ্ছি:—

যাঁহারা সাধুভাষার অতিমাত্র পক্ষপাতী, তাঁহারা যদি কখনো দায়ে ঠেকিয়া একটা চলিত শব্দ ব্যবহার করিতে বাধ্য হয়েন, তবে সেটা উদ্ধরণ-চিহ্নের মধ্যে লেখেন; যেন শব্দটা অপাঙক্তেয়, সাধুভাষার শব্দগুলি সংস্পর্শজনিত পাপে লিপ্ত না হয়, সেই জন্য এই সাবধানতা। ইহা কি জাতিভেদের দেশে অনাচরণীয় জাতিদিগের প্রতি সামাজিক ব্যবহারের অনুবৃত্তি?"

বাঙ্গলা কথাকে সাহিত্যসমাজে জাতিচ্যুত করবার বিষয় আমার পূর্ব্ব প্রবন্ধে যা বলেছি, তার সঙ্গে তুলনা করলে পাঠকমাত্রই দেখতে পাবেন, যে আমরা উভয়ই মাতৃভাষার উপর এরূপ অত্যাচারের বিরোধী। তবে ললিত বাবুর সঙ্গে আমার প্রধান তফাৎ এই, যে তিনি সাধুভাষার সপক্ষে এবং বিপক্ষে কি বল্‌বার আছে, অথবা কি সচরাচর বলা হয়ে থাকে, সেই সকল কথা একত্র করে' গুছিয়ে, পাশাপাশি সাজিয়ে, পাঠকদের চোখের সুমুখে ধরে' দিয়েছেন; কিন্তু পূর্ব্বপক্ষের মতামত বিচার করে' কোনরূপ মীমাংসা করে' দেন নি। আর আমি উত্তর পক্ষের মুখপাত্র স্বরূপে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছি যে, একটু পরীক্ষা করলেই দেখতে পাওয়া যায়, যে পূর্ব্বপক্ষের তর্কযুক্তির ষোল কড়াই কাণা।

ললিত বাবু দেখাতে চান যে সমস্যাটা কি; আমি দেখাতে চাই যে মীমাংসাটা কি হওয়া উচিত। ললিতবাবু বলেছেন যে তাঁর উদ্দেশ্য, যতদূর সম্ভব নিরপেক্ষভাবে বিষয়টির আলোচনা করা। তাই, যদিচ তাঁর মনের ঝোঁক আসলে বঙ্গভাষার দিকে, তবুও তিনি পদে পদে সে ঝোঁক সামলাতে চেষ্টা করেছেন। আমি অবশ্য সে ঝোঁকটি সামলানো মোটেই কর্ত্তব্য বলে' মনে করিনে। কোন পক্ষের হয়ে ওকালতী করা দূরে থাক্, তিনি বিচারকের আসন অলঙ্কৃত করতে অস্বীকৃত হয়েছেন। এমন কি, এই উভয়পক্ষের মধ্যস্থ হয়ে একটা আপোষ মীমাংসা করে' দেওয়াটাও তিনি আবশ্যক মনে করেননি।

অপর পক্ষে, আমি বঙ্গসাহিত্যের পক্ষে যা' শ্রেয় মনে করি, তার জন্য ওকালতী করাটা কর্ত্তব্যের মধ্যে গণনা করি। সেই কারণে আমি আমার নিজের মত কেবলমাত্র প্রচার করে'ই ক্ষান্ত থাকিনে, কিন্তু সেই মতের অনুসারে বাঙ্গলা ভাষা লিখতে চেষ্টা করি। অপরকে কোন জিনিষেরই এপিঠ ওপিঠ দুপিঠ দেখিয়ে দেবার বিশেষ কোন সার্থকতা নেই, যদি না আমরা বলে' দিতে পারি যে তার মধ্যে কোন্‌টি সোজা আর কোন্‌টি উল্টো।

সব দিক রক্ষা করে' চল্‌বার উদ্দেশ্য এবং অর্থ হচ্ছে নিজেকে রক্ষা করা। আমরা সামাজিক জীবনে নিত্যই সে কাজ করে' থাকি। কিন্তু কি জীবনে, কি সাহিত্যে, কোন একটা বিশেষ মত কি ভাবকে প্রাধান্য দিতে না পারলে, আমাদের যত্ন, চেষ্টা, এবং পরিশ্রম, সবই নিরর্থক হয়ে যায়। মনোজগতেও যদি আমরা শুধু ডাঙ্গায় বাঘ আর জলে কুমীর দেখি, তাহলে আমাদের পক্ষে তটস্থ হয়ে থাকা ছাড়া উপায়ান্তর নেই। সে যাই হোক্, যখন লেখবার একটা বিশেষ রীতি সাহিত্যে চলন করা নিয়ে কথা, তখন আমাদের একটা কোন দিক অবলম্বন করতেই হবে। কেননা একসঙ্গে দু'দিকে চলা অসম্ভব। তাছাড়া যখন দুটি পথের

মধ্যে কোন্‌টি ঠিক পথ, এ সমস্যা একবার উপস্থিত হয়েছে, তখন—"এ পথও জানি ও পথও জানি, কিন্তু কি কর্‌ব মরে' আছি" একথা বলাও আমাদের মুখে শোভা পায় না; কারণ বাজে লোকে যাই মনে করুক না কেন, সাহিত্যসেবী এবং অহিফেনসেবী একই শ্রেণীর জীব নয়।

ললিতবাবুর মতে "সাধুভাষা বনাম চলিত-ভাষা, এই মামলার মীমাংসা করিতে হইলে, আধা ডিক্রী আধা ডিস্‌মিস্‌ ছাড়া উপায় নাই।" এর উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, তরমিন ডিক্রীলাভে বাদীর খরচা পোষায় না। ওরকম জিত প্রকারান্তরে হার। এক্ষেত্রে আমরা যে বাদী, সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই, কারণ আমাদের নাবালক অবস্থায় সাধুভাষীদের দল সাহিত্যক্ষেত্র বেদখল করে' বসে আছেন। আমরা শুধু সেই অন্বয়াগত সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছি।

প্রতিবাদীরা জানেন যে possession is nine points of the law, সুতরাং তাঁদের বিশ্বাস যে আমাদের মাতৃভাষার দাবী তামাদি হয়ে গেছে, ও সম্বন্ধে তাঁদের আর উচ্চবাচ্য করবার দরকার নেই। এ বিষয়ে বাক্যব্যয় করা তাঁরা কথার অপব্যয় মনে করেন। এ অবস্থায় কোন বিচারপতির নিকট পূরা ডিক্রী পাবার আশা আমাদের নেই, সুতরাং আমরা যদি আবার জবর দখল করে' নিতে পারি, তাহলেই বঙ্গসাহিত্য আমাদের আয়ত্তের ভিতর আস্‌বে,—নচেৎ নয়।

(২)

এই সমস্যার একটি চূড়ান্ত মীমাংসার প্রধান অন্তরায় হচ্ছে যে, পূর্ব্বপক্ষের বক্তব্যটি যে কি, তা আমরা প্রায়ই শুন্‌তে পাইনে। যদি কোন একটি বিশেষ রীতি সমাজে কিম্বা সাহিত্যে কিছুদিন ধরে চলে যায়, তাহলে সেটি নিজের ঝোঁকের বলেই, অর্থাৎ ইংরাজিতে যাকে বলে inertia, তারই বলে চলে। যা প্রচলিত তার জন্য কোনরূপ কৈফিয়ৎ দেওয়াটা কেউ আবশ্যক মনে করেন না। অধিকাংশ লোকের পক্ষে, জিনিষটা চল্‌ছে, এই প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে তা চলা উচিত! তা ছাড়া যাঁরা মাতৃভাষাকে ইতর ভাষা বলে' গণ্য করেন, তাঁরা হয়ত বঙ্গভাষার সাহিত্য রচনা ব্যাপারটি "নীচের উচ্চ ভাষণ" স্বরূপ মনে করেন, এবং সুবুদ্ধিবশতঃ ওরূপ দাম্ভিকতা হেসে উড়িয়ে দেওয়াটাই সঙ্গত বিবেচনা করেন।

সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস যে, প্রচলিত আচারব্যবহারকে মন দিয়ে যাচিয়ে নেওয়াতে বিপদ আছে, কেননা তাদের মতে শুধু স্ত্রীবুদ্ধি নয়, বুদ্ধিমাত্রই প্রলয়ঙ্করী। সমাজ সম্বন্ধে এ মতের কতকটা সার্থকতা থাকলেও, সাহিত্য সম্বন্ধে মোটেই নেই; কারণ যে লেখার ভিতর মানবমনের পরিচয় পাওয়া না যায়,—তা সাহিত্য নয়। সুতরাং ললিতবাবু পূর্ব্বপক্ষের মত লিপিবদ্ধ করবার চেষ্টা করে' বিষয়টি আলোচনার যোগ্য করে' তুলেছেন। একটা ধরাছোঁয়ার মত যুক্তি না পেলে, তার খণ্ডন করা অসম্ভব। কেবলমাত্র ধোঁয়ার উপর তলোয়ার চালিয়ে কোন ফল নেই। ললিতবাবু বহু অনুসন্ধান করে' সাধুভাষার সপক্ষে দুটি যুক্তি আবিষ্কার করেছেন, (১) সাধুভাষা আর্টের অনুকূল (২) চলিত ভাষার অপেক্ষা, সাধুভাষা হিন্দু-

স্থানী মারাঠী গুজরাটী প্রভৃতি ভিন্নজাতীয় লোকদের নিকট অধিক সহজবোধ্য।

আর্টের দোহাই দেওয়া যে কতদূর বাজে, এ প্রবন্ধে আমি সে সম্বন্ধে কোন আলোচনা করতে চাইনে। এদেশে প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় যে, যুক্তি যখন কোন দাঁড়াবার স্থান পায় না, তখন আর্ট প্রভৃতি বড় বড় কথার অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণ করে। যে বিষয়ে কারও কোন স্পষ্ট ধারণা নেই, সে বিষয়ে বক্তৃতা করা অনেকটা নিরাপদ, কেননা, সে বক্তৃতা যে অন্তঃসারশূন্য, এ সত্যটি সহজে ধরা পড়ে না। তথাকথিত সাধুভাষা সম্বন্ধে আমার প্রধান আপত্তি এই, যে ওরূপ কৃত্রিম ভাষায় আর্টের কোন স্থান নেই। এ বিষয়ে আমার যা বক্তব্য আছে তা আমি সময়ান্তরে স্বতন্ত্র প্রবন্ধে বলব। এস্থলে এইটুকু বলে' রাখলেই যথেষ্ট হবে, যে "রচনার যে প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন, সরলতা এবং স্পষ্টতা" (বঙ্কিমচন্দ্র)—লেখায় সেই গুণটি আনবার জন্য যথেষ্ট গুণপনার দরকার। Art-হীন লেখক নিজের মনোভাব ব্যক্ত করতে কৃতকার্য্য হন্ না।

দ্বিতীয় যুক্তিটি এতই অকিঞ্চিৎকর যে, সে সম্বন্ধে কোনরূপ উত্তর করতেই প্রবৃত্তি হয় না। আমি আজ দশ এগারো বৎসর পূর্ব্বে, আমার লিখিত এবং ভারতী-পত্রিকাতে প্রকাশিত "কথার কথা" নামক প্রবন্ধে এসম্বন্ধে যে কথা বলেছিলুম, এখানে তাই উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। যুক্তিটি বিশেষ পুরণো, স্থতরাং তার পুরণো উত্তরের পুনরাবৃত্তি অসঙ্গত নহে।

"এ বিষয়ে শাস্ত্রী মহাশয়ের মত যদি ভুল না বুঝে থাকি, তাহলে তাঁর মত সংক্ষেপে এই দাঁড়ায় যে, বাংলাকে প্রায় সংস্কৃত করে আনলে, আসামী হিন্দুস্থানী প্রভৃতি বিদেশী লোকদের পক্ষে বঙ্গভাষার শিক্ষাটা অতি সহজসাধ্য ব্যাপার হয়ে উঠবে। দ্বিতীয়তঃ, অন্য ভাষায় যা সুবিধা নাই, বাংলায় তা আছে, যে-কোন সংস্কৃত কথা যেখানে হোক্ লেখায় বসিয়ে দিলে বাংলা ভাষার বাংলাত্ব নষ্ট হয় না। অর্থাৎ যাঁরা আমাদের ভাষা জানেন না, তাঁরা যাতে সহজে বুঝতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে সাধারণ বাঙ্গালীর পক্ষে আমাদের লিখিত ভাষা দুর্ব্বোধ করে তুলতে হবে। কথাটা এতই অদ্ভুত যে এর কি উত্তর দেব ভেবে পাওয়া যায় না। স্থতরাং তাঁর অপর মতটি ঠিক কিনা দেখা যাক। আমাদের দেশের ছোট ছেলেদের বিশ্বাস যে, বাংলা কথার পিছনে অনুস্বর জুড়ে দিলেই সংস্কৃত হয়। আর প্রাপ্তবয়স্ক লোকদের মত যে, সংস্কৃত কথার অনুস্বর বিসর্গ ছেঁটে দিলেই বাংলা হয়। দুটো বিশ্বাসই সমান সত্য। বাঁদরের লেজ কেটে দিলেই কি মানুষ হয়?"

যদি কারও এরূপ ধারণা থাকে যে, উক্ত "উপায়ে রাষ্ট্রীয় একতা সংস্থাপিত হইবার পথ প্রশস্ত হইবে, কালে ভারতের সর্ব্বত্র এক ভাষা হইবে"—তাহলে সে ধারণা নিতান্ত অমূলক। ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সভ্যতা যে আকারই ধারণ করুক না কেন, একাকার হয়ে যাবে না। যা পূর্ব্বে কস্মিনকালেও হয়নি, তা পরে কস্মিনকালেও হবে না। ভারতবর্ষের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতিরা যে ভাষা, ভাব, আচার এবং আকার সম্বন্ধে নিজেদের বিশেষত্ব হারিয়ে এক জাতি হয়ে উঠবে, এ আশা করাও যা, আর কাঁঠাল গাছ ক্রমে আমগাছ হয়ে উঠবে, এ আশা করাও তাই। পুরাকালেও এদেশের দার্শনিকরা যে সমস্যার মীমাংসা করবার চেষ্টা

করেছিলেন, এ যুগের দার্শনিকদেরও সে একই সমস্যার মীমাংসা করতে হবে। সেই সমস্যা হচ্ছে বহুর মধ্যে এক দেখা। রাষ্ট্রীয় ঐক্য স্থাপনের একমাত্র উপায় হচ্ছে, ভারতবর্ষের নানা জাতির বিশেষত্ব রক্ষা করে' সকলকে এক যোগসূত্রে বন্ধন করা। রাষ্ট্রীয় ভাবনাও যখন অতি ফলাও হয়ে ওঠে, এবং দেশে বিদেশে চারিয়ে যায়, তখন সে ভাবনা দিক্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে। বঙ্গ সাহিত্যের যত শ্রীবৃদ্ধি হবে, তত তার স্বাতন্ত্র্য আরও ফুটে উঠবে, লোপ্ পাবে না।

(৩)

ললিত বাবু পণ্ডিতি বাঙ্গলার উপর বিশেষ নারাজ। আমি অবশ্য সেরকম রচনা-পদ্ধতির পক্ষপাতী নই। তবে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত লেখকদের সপক্ষে এই কথা বলবার আছে যে, তাঁরা সংস্কৃত শব্দ ভুল অর্থে ব্যবহার করেন নি। তাঁদের হাতে সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ মিষ্ট প্রয়োগ না হলেও, দুষ্ট প্রয়োগ নয়। "প্রবোধ চন্দ্রিকা" কিম্বা "পুরুষ পরীক্ষা" পড়্‌লে বাঙ্গলা আমরা না শিখি, কিন্তু ভুলে যাই নে। উক্ত বই দুখানির রচয়িতা মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কারের আমি বিশেষ পক্ষপাতী। কেননা তিনি সুপণ্ডিত এবং সুরসিক। একাধারে এই উভয় গুণ আজ-কালকার লেখকদের মধ্যে নিতান্ত দুর্লভ হয়ে পড়েছে। তা ছাড়া মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কারের গল্প বল্‌বার ক্ষমতা অসাধারণ। অল্প কথায় একটি গল্প কি করে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করে বল্‌তে হয়, তার সন্ধান তিনি জান্‌তেন।—"পুরুষ পরীক্ষা"র ভাষা ললিত বাবু যে কি কারণে "শব্দাড়ম্বরময় জড়িমা-জড়িত ভাষা" মনে করেন, তা আমি বুঝতে পারলুম না, কারণ সে ভাষা নদীর জলের ন্যায় স্বচ্ছ এবং স্রোতস্বতী!—"প্রবোধ চন্দ্রিকার" পূর্ব্বভাগের ভাষা কঠিন হলেও শুষ্ক নয়। যিনি তাতে দাঁত বসাতে পার্‌বেন, তিনিই তার রসাস্বাদ করতে পারবেন। আমাদের নব্য লেখকেরা যদি মনোযোগ দিয়ে প্রবোধ-চন্দ্রিকা পাঠ করেন, তাহলে রচনা সম্বন্ধে অনেক সদুপদেশ লাভ করতে পারবেন। যথা, 'ঘট'কে "কম্বুগ্রীব বৃকোদর" বলে' বর্ণনা করলে, তা আর্ট হয় না, এবং নর ও বিষাণ এই দুটি বাক্যকে একত্র কর্‌লে "নরবিষাণ"রূপ পদ রচিত হলেও, তার অনুরূপ মানুষের মাথায় শিং বেরোয় না; যদি কারও মাথায় বেরোয় ত সে পদকর্ত্তার!

রাজা রামমোহন রায় এবং মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কারের লেখার দোষধরা সহজ, কিন্তু আমরা যেন এ কথা ভুলে না যাই, যে এঁরাই হচ্ছেন বাঙ্গলা ভাষায় সর্ব্বপ্রথম গদ্যলেখক। বাঙ্গলা-গদ্যের রচনা-পদ্ধতি এঁদেরই উদ্ভাবন করতে হয়েছিল। তাঁদের মুস্কিল হয়েছিল শব্দ নিয়ে নয়, অন্বয় নিয়ে। রাজা রামমোহন রায়, তাঁর রচনা পড়্‌তে হলে পাঠককে কি উপায়ে তার অন্বয় করতে হবে, তার হিসেব বলে' দিয়েছেন। রাজা রামমোহন রায়ের গদ্য যে আমাদের কাছে একটু অদ্ভুত লাগে, তার প্রধান কারণ হচ্ছে যে তাঁর বিচার পদ্ধতি ও তর্কের রীতি সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃত-শাস্ত্রের ভাষ্যকারদের অনুরূপ। সে পদ্ধতিতে আমরা গদ্য লিখিনে, আমরা ইংরাজি গদ্যের সহজ এবং স্বচ্ছন্দ গতিই অনুকরণ করতে চেষ্টা করি। রামমোহন রায়ের গদ্যে বাগাড়ম্বর

নেই, সমাসের নামগন্ধও নেই, এবং সে ভাষা সংস্কৃতবহুলও নয়।

তারপর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গদ্য যে আমরা standard prose হিসাবে দেখি তার কারণ, তিনিই সর্ব্বপ্রথম প্রাঞ্জল গদ্য রচনা করেন। সে ভাষার মর্য্যাদা তার সংস্কৃতবহুলতার উপর নয়, তার syntax এর উপর নির্ভর করে। রাজা রামমোহন রায়ের ভাষার সঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা তুলনা করে' দেখলে, পাঠকমাত্রই বুঝতে পারবেন যে অন্বয়ের গুণেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে।

এই সব কারণেই পণ্ডিতি বাঙ্গলার সঙ্গে আমার কোন ঝগড়া নেই। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা বঙ্গভাষার কোনও ক্ষতি করেন নি, বরং অনেক উপকার করেছেন। বিশেষতঃ সে ভাষা যখন কোন নব্যলেখক অনুকরণ করেন না, তখন তার বিরুদ্ধে আমাদের খড়্গহস্ত হয়ে ওঠবার দরকার নেই। আসল সর্ব্বনেশে ভাষা হচ্ছে—"চন্দ্রাহত সাহিত্যিক"রা ইংরাজি বাক্য এবং পদকে যেমনতেমন করে অনুবাদ করে' যে খিচুড়ি ভাষার সৃষ্টি করছেন—সেই ভাষা। সে ভাষার হাত থেকে উদ্ধার না পেলে, বঙ্গ সাহিত্য আঁতুড়েই মারা যাবে। এবং সেই কৃত্রিম ভাষার হাত এড়াতে হলে মৌখিক ভাষার আশ্রয় নেওয়া ছাড়া আমাদের উপায়ান্তর নেই। সুতরাং "আলালি" ভাষাকে আমাদের শোধন করে' নিতে হবে। বাবু বাংলার কোনরূপ সংস্কার করা অসম্ভব, কারণ সে ভাষা হচ্ছে পণ্ডিতি বাংলার বিকার মাত্র। দুধ একবার ছিঁড়ে গেলে, তা আর কোন কাজে লাগে না। ললিত বাবুর মতে পণ্ডিতি বাংলার "কঠোর অস্থিপঞ্জর পাঠ্য-পুস্তক-নির্ব্বাচন সমিতির বায়ুশূন্য টিনের কৌটায় রক্ষিত"। আমি বলি তা নয়। স্কুলপাঠ্য-পুস্তকরূপ টিনের কৌটায় যা রক্ষিত হয়ে থাকে, তা শুধু সাধু-ভাষারূপ নটানো গরুর দুধ। সুতরাং সেই টিনের গরুর দুধ খেয়ে যারা বড় হয়, মাতৃদুগ্ধ যে তাদের মুখরোচক হয় না, তা আর আশ্চর্য্যের বিষয় নয়।

(৪)

আমাদের রচনায় কতদূর পর্য্যন্ত আরবি, পারসি, ইংরাজি প্রভৃতি বিদেশী শব্দের ব্যবহার সঙ্গত, সে বিষয়ে ললিত বাবু এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে "এক সময়ে বাঙ্গলা ভাষায় আরবি পারসি শব্দের প্রবেশ ঘটিয়াছে, এবং আজকাল ইংরাজি শব্দের প্রবেশ ঘটিতেছে। ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। সকল ভাষাতেই যাহা ঘটিয়াছে বাঙ্গলা ভাষাতেও তাহাই ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে।" এক কথায় প্রাকৃতিক নিয়মের বিপক্ষতাচরণ করায় কোন লাভ নেই। যে সকল বিদেশী শব্দ বেমালুম বঙ্গভাষার অন্তর্ভূত হয়ে গেছে, সে সকল শব্দ অবশ্য কথার মত লেখাতেও নিত্য ব্যবহার্য্য হওয়া উচিত।

কোন শব্দের উৎপত্তি বিচার করে', যে লেখক সেটিকে জোর করে, সাহিত্য হতে বহিস্কৃত করে দেবেন, তিনিই ঠক্‌বেন, কারণ ও উপায়ে শুধু অকারণে ভাষাকে সঙ্কীর্ণ করে ফেলা হয়। আমি এ বিষয়ে ললিত বাবুর মতের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী। কিন্তু একটি কথা আমাদের

মনে রাখা কর্ত্তব্য—বঙ্গভাষা বাঙ্গালী হিন্দুর ভাষা; মুসলমান ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবের বহুপূর্ব্বে গৌড়ীয় ভাষা প্রায় বর্ত্তমান আকারে গঠিত হয়ে উঠেছিল।

মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কারের মতে "অন্যান্য দেশীয় ভাষা হইতে গৌড়দেশীয় ভাষা উত্তম, —সর্ব্বোত্তমা সংস্কৃত ভাষা বাহু হেতুক।" —গৌড়ীয় প্রাকৃত অপর সকল প্রাকৃত অপেক্ষা উত্তম কি অধম, সে বিচার আমি করতে চাই নে, কিন্তু সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে বঙ্গভাষার সম্বন্ধ যে অতি ঘনিষ্ঠ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সংস্কৃত বৈয়াকরণিকদের মতে ভাষাশব্দ ত্রিবিধ, "তজ্জ-তৎসম-দেশ্য"। বঙ্গভাষায় তজ্জ এবং তৎসম শব্দের সংখ্যা অসংখ্য, দেশ্য শব্দের সংখ্যা অল্প, এবং বিদেশী শব্দের সংখ্যা অতি সামান্য।

এ বিষয়ে ফরাসী ভাষার সহিত বঙ্গভাষা এক জাতীয় ভাষা। একজন ইংরাজি লেখক ফরাসী ভাষা সম্বন্ধে যা বলেছেন সেই কথাগুলি আমি নীচে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। তার থেকে পাঠকমাত্রই দেখতে পাবেন যে, ল্যাটিন ভাষার সহিত ফরাসী ভাষার যেরূপ সম্বন্ধ, সংস্কৃত ভাষার সহিত বঙ্গভাষারও ঠিক সেই একইরূপ সম্বন্ধ :—

With a very few exceptions, every word in the French vocabulary comes straight from Latin. The influence of pre-Roman Celts is almost imperceptible; while the number of words introduced by the Frankish conquerors amounts to no more than a few hundreds.

উদ্ধৃত পদটিতে French-এর স্থানে বঙ্গভাষা, pre-Roman-এর স্থানে বাঙ্গলার আদিম অনার্য্য জাতি, Latin-এর স্থলে সংস্কৃত,—এবং Frankish এর স্থলে মুসলমান, এই কথা ক'টি বদলে নিলে, উক্ত পদটি বঙ্গভাষার সঠিক বর্ণনা হয়ে ওঠে।

ঐরূপ হওয়াতে, ফরাসী সাহিত্যের যা বিশেষ গুণ, বঙ্গসাহিত্যেরও সেই গুণ থাকা সম্ভব এবং উচিত। সে গুণ পূর্ব্বোক্ত লেখকের মতে হচ্ছে এই—

French literature is absolutely homogeneous. The genius of the French language, descended from its single stock, has triumphed most—in simplicity, in unity, in clarity, and in restraint.

সুতরাং জোর করে যদি আমরা বাঙ্গলা ভাষায় এমন সব আরবি কিম্বা পারসি শব্দ ঢোকাতে চেষ্টা করি, যা ইতিপূর্ব্বে আমাদের ভাষার অঙ্গীভূত হয়ে যায় নি, তাহলে ঐরূপ উপায়ে আমরা বঙ্গভাষা শুধু বিকৃত করে ফেলব।

সম্প্রতি বাঙ্গলা ভাষার উপর ঐরূপ জবরদস্তি করবার প্রস্তাব হয়েছে বলে এ বিষয়ে আমি বাঙ্গালী মাত্রকেই সতর্ক থাকতে অনুরোধ করি। আগন্তুক ঢাকা-ইউনিভার্সিটির রিপোর্টে দেখতে পাই, একটু ঢাকা চাপা দিয়ে ঐ প্রস্তাবই করা হয়েছে।—স্কুলপাঠ্য গ্রন্থাবলীর উপর আর্য্য আক্রমণের বিষয়ে আমি অনেকরূপ ঠাট্টা বিদ্রূপ করেছি—কিন্তু ঐ স্কুলপাঠ্য গ্রন্থাবলীর উপর এই মুসলমান আক্রমণের প্রস্তাবটি আরও ভয়ঙ্কর, কেননা, বাঙ্গলা ভাষার "তজ্জ" শব্দকে রূপান্তরিত করে' "তৎসম" করলেও বাঙ্গলা

ভাষার ধর্ম্ম নষ্ট হয় না, কিন্তু অপরিচিত এবং অগ্রাহ্য বিদেশী শব্দকে আমাদের সাহিত্যে জোর করে ঢুকিয়ে দেওয়াতে তার বিশেষত্ব নষ্ট করে' তাকে কদর্য্য এবং বিকৃত করে ফেলা হয়। এই উভয় সঙ্কট হতে উদ্ধার পাবার একটি খুব সহজ উপায় আছে। বাংলা ভাষা হতে বাংলা শব্দ সকল বহিস্কৃত করে' দিয়ে, অর্দ্ধেক সংস্কৃত এবং অর্দ্ধেক আরবী-পারসী শব্দ দিয়ে ইস্কুলপাঠ্য গ্রন্থ রচনা করলে, দুকূল রক্ষে হয়!

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

লেডি জেন্‌কিন্সের ব্যায়াম প্রদর্শনী

সামাজিক প্রসঙ্গ

লেডি জেনকিন্সের ব্যায়াম প্রদর্শনী

আমাদের লোকপ্রিয় চিফ্ জষ্টিসের পত্নী লেডি জেনকিন্সের নিমন্ত্রণে সম্প্রতি কিছুদিন পূর্ব্বে হাইকোর্টের সম্মুখে বৃহৎ ময়দানে বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল।

ব্যায়ামপ্রদর্শনী-উৎসব উপলক্ষেই এই নিমন্ত্রণ। চিফজষ্টিসপত্নী হাইকোর্টের নব্য ব্যারিষ্টার এটর্ণির দল হইতে, ক্লার্ক চাপরাশির দল পর্য্যন্ত, সকলকেই দড়ি টানা—দৌড়াদৌড়ি প্রভৃতি নানারূপ ব্যায়ামপ্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন। দ্বন্দক্ষেত্রের সকলেই প্রায় এ দেশীয় লোক, ইংরাজ কাহাকেও দেখি নাই। দুএকজন আরমেনিয়ান মাত্র ছিলেন। কেহ জিতিবামাত্র সদাশয় লাট সাহেব স্বয়ং তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে উৎসাহ প্রদান করিতেছিলেন। বিজেতাদিগকে পুরস্কারও দিলেন স্বয়ং লাট সাহেব।

লেডি জেনকিন্স যে এদেশের লোকদিগের কিরূপ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—দেশবাসীদিগকে তিনি কত [illegible] কত তাঁহার সহানুভূতি—এই ব্যায়াম আয়োজনই তাঁহার একটি জলন্ত দৃষ্টান্ত। ইহা সুসম্পন্ন করিতে অর্থ বা পরিশ্রমের তিনি কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। এই বিরাট আয়োজনের ব্যয়ভার এবং বিজেতৃদিগের পুরস্কার ব্যয় পর্য্যন্ত সমস্তই তিনি নিজে বহন করিয়াছেন। এইরূপ ক্রীড়ায় ক্রীড়ক ও দর্শক উভয়েরই কত উৎসাহ কত আনন্দ!—কেবল তাহাই নহে—এইরূপ ব্যায়াম-ক্রীড়ার স্থায়ী ফল আরও শুভ। আমরা লেডি জেনকিন্সের এই সাধু উদ্দেশ্যময় ব্যবহারে যথার্থই মুগ্ধ হইয়াছি। এই সদাশয় দম্পতির প্রতি আমাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতার উৎস স্বতঃ উৎসারিত।

বিবাহমঙ্গল—আজকাল বিবাহ উপলক্ষে কবিতা রচনা করিয়া পড়া অনুষ্ঠানের একটি অঙ্গস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সম্প্রতি জষ্টিস শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরীর কন্যা অশোকা দেবীর শুভ বিবাহ উপলক্ষে—তাঁহার ভগিনী শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবী যে কবিতা লিখিয়াছেন—তাহাতে বেশ একটু সরসতা আছে। কবিতাটির প্রধান লক্ষ্য হইতেছেন বৈবাহিক মহাশয়। আমরা পাঠকবর্গের প্রীতি সম্পাদনার্থ সেই কবিতাটির কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

(ফুলশয্যার রাত্রে বেয়াই মহাশয়কে উপহার)

সিলং হতে এসেছেন বেয়াই মশায়,
লম্বা দাড়ি শুভ্র কেশ নারদের প্রায়
হাতে নাই বীণা যন্ত্র, কণ্ঠে নাই গীতি,
বেয়ায়ের দল হেরি চিত্তে মহাভীতি।
তরুণ পূর্ণিমা চাঁদ বৈবাহিক গণে
ফাঁকি দিতে, গৃহিণীকে কমলার বনে
লুকাইয়া এসেছেন বুড়া "দীননাথ,"
কি জানি রূপসী ভার্য্যা [illegible] না বেহাত!
পথে নারী বিবর্জ্জিতা, বিরহেতে কাবু
তাহে বেয়ানের হাতে হতভম্ব বাবু,
বাক্য নাহি সরে মুখে, শ্রীহট্টের বাণী
চৌধুরীর গৃহে হবে নব আমদানী!
চন্দ্রবিন্দু লুপ্ত ভাষা, উলট্ পালট্
রাজসাহী সিলেটেতে মিলন নিকট,
চৌধুরীতে চৌধুরীতে কোলাকুলি তাই
অভিনব দৃশ্য আজি দেখিবে সবাই!
পঞ্চনদ পার হয়ে আসিয়াছে বর
অশোকা কন্যার তরে বারেন্দ্রের ঘর,
খুঁজি দেশ দেশান্তর মিলেনি এমন
চতুর্দ্ধুরী গৃহে তাই শুভ আগমন,
হুলুধ্বনি দেরে ওরে এয়ো সব সাজি,
[illegible]
দিয়া কর আশীর্ব্বাদ, বল জয় জয়,
এ শুভ বিবাহ-গ্রন্থি হোক্ পুণ্যময়।

শ্রীপ্রসন্নময়ী দেবী। ১৪ই ফাল্গুন।

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ১, সানি পার্ক, ওল্ড বালিগঞ্জ হইতে, শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।